CUL-H01908-113-249600

শারদীয়া প্রবাসী—১৩৭২

সূচীপত্র

756.3
প্রা/1

সম্পাদকীয়

উপন্যাস

ভেমডেটা—শ্রীমতী হরিরঞ্জন গুপ্ত ...
চিমনি—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ...
আমিও ভালবেসেছিলাম—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ...
ভেজাল—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ...
অসম্ভবও সম্ভব হয় (অনুবাদ)—শ্রীকৃষ্ণধন দে ...

গল্প

দেহজ—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ...
মাননীয় প্রধান অতিথি—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ...
লীনা—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী ...
গল্পের প্লট—বিমল মিত্র ...
তরঙ্গের ঝিলিপক্কী (অনুবাদ)—গীতা মুখোপাধ্যায় ...

নাটক

বনলতা মিটার—অশোক সেন ...

প্রবন্ধ

অলঙ্কারের পরিকল্পনা ...
গজদন্তশিল্প ...
বিচিত্রার কথা—শ্রীসীতা দেবী ...
কল্লোলের ঐতিহাসিক পটভূমিকা—উৎপল দত্ত ...
প্রাচীন ভারতে কেশবিন্যাসের সৌন্দর্য—ইলা পালচৌধুরী ...
পর্বতারোহণে বিফলতা সফলতার কারণ
—শ্রীবিশ্বদেব বিশ্বাস ...
অলিম্পিক—শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত ...
অপেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ—শ্রীসুধীশ্বর মিশ্র ...

শোক চট্টোপাধ্যায়

বুল চৌধুরী

বীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
মলেন্দু চক্রবর্তী
লবুল চৌধুরী

মুদ্রাকর :
ল্যাণ দাশগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ
১৭।২।১, ধর্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

র চিত্রগুলি শ্রীমতী কমলা
খ্যাত্মের সৌজন্যে ও কেশ-
র চিত্রগুলি শ্রীদেবীপ্রসাদ
ধুরী ও শ্রীমতী ইলা পাল-
র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কবিতা

পুণ্য জীবন—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ১৫৭
যাবার বেলায়—নরেন্দ্র দেব ... ১৫৮
রূপান্তরিতা—কালিদাস রায় ... ১৫৯
রাতে-ওড়া পাখী—শ্রীকৃষ্ণধন দে ... ২৩৮
স্বপ্ন সাগর—শ্রীশান্তিময় গুহ ... ২৪০
তখন ফুল ফোটে—শ্যামসুন্দর দে ... ২৪০

রঙীন চিত্র

আগমনী—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত ... ১
চারণ—আশুতোষ মিশ্র ... ১৬১
সাধু সন্দর্শনে—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ... ২৪১
চোরাকারবারী—শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্তী ... ৩৬৯

একবর্ণ চিত্র

অ্যাসিরিয়া ও পারস্যের প্রাচীন অলঙ্কারের পরিকল্পনা ... ৯
রোমান অলঙ্কারের নক্সার নমুনা ... ১০
খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর উড়িষ্যার শির ও কর্ণের গহনা। পুরুষ ও স্ত্রীর গহনা সজ্জা। ভারতীয় গহনা-শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। ... ১১
প্রাচীন হিন্দুদিগের অলঙ্কারের নক্সা ... ১২
প্রকৃতিদত্ত সৌন্দর্য সম্ভার ... ১৩
প্রকৃতির ভাণ্ডারের পত্র, পুষ্প ও ফল ... ১৪
ফুল পাতা ও ফলের সুন্দর আকৃতির পরিচয় ... ১৫
গ্রীক নক্সার নিদর্শন ... ১৬
উড়িষ্যার গোবিন্দরাম শিল্পীর নির্ম্মিত গোপাল মূর্ত্তি ... ৩৩
উড়িষ্যার প্রাচীন গজদন্তশিল্প ... ৩৫
হয়-পুচ্ছ আন্দোলিত কেশবিন্যাস—দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ... ৪১৭
সধবার কর্ত্তিত কেশে বৈধব্যের বিলাস ... ৪১৮
সনাতন বিড়ার বাঁধনে কেশবিন্যাস ... ৪২৫
জটার সেবায় সৌখীন বৈরাগ্য ... ৪২৬

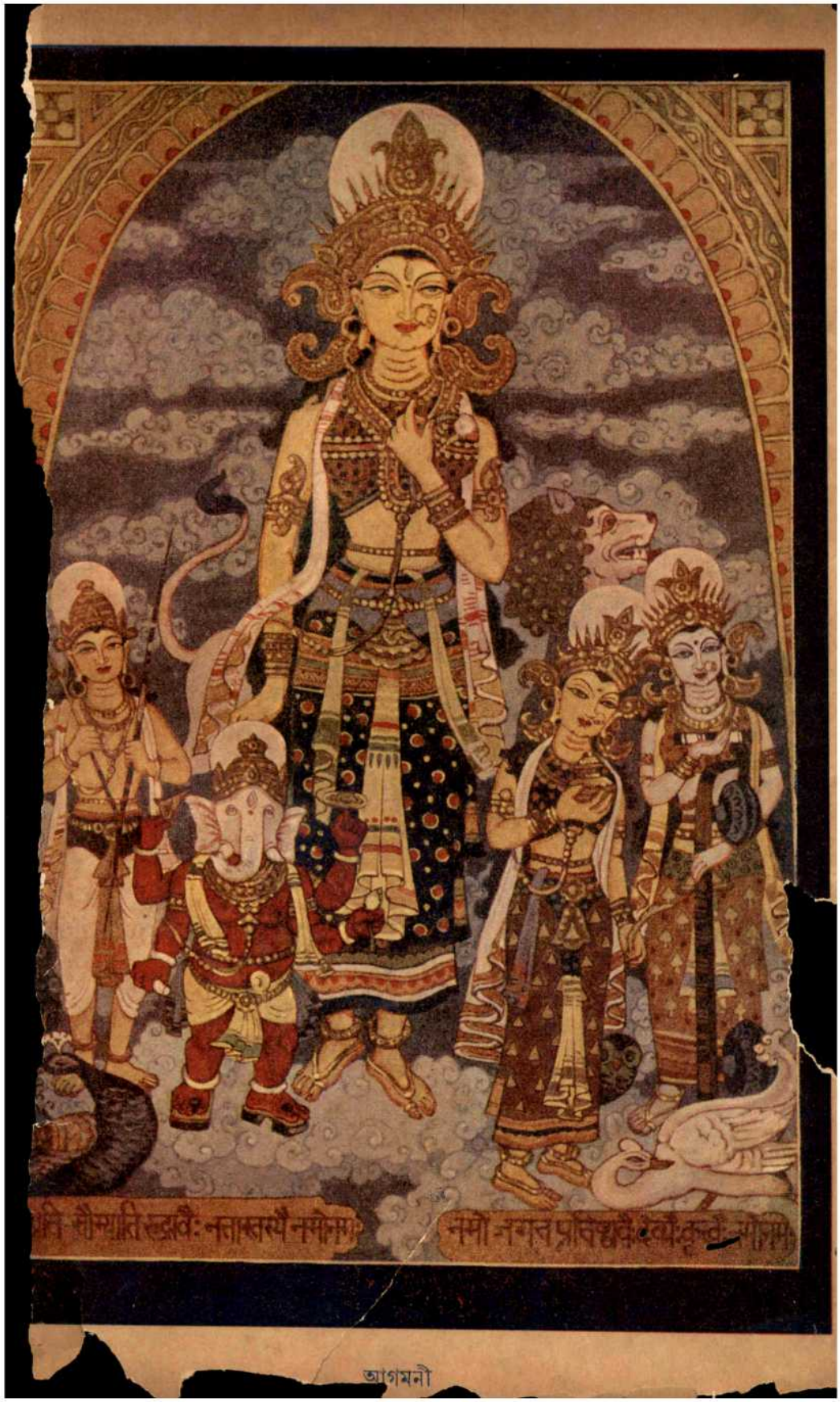

आगमनी

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

113

শারদীয়া, ১৩৭২

...দীয়া প্রবাসী

...রদীয়া প্রবাসী প্রকাশের পরিকল্পনা যাঁহারা করেন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য পূজার ছুটির সময় অল্পমূল্যে এমন ... বিচিত্র গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধ-চিত্র-সম্বলিত পুস্তক সাধারণের নিকট উপস্থিত করা, যাহা খরচের ...রচনা সম্ভারে বিশেষ সন্তোষজনক হইবে। সুলিখিত, সুপাঠ্য ও বহুচিত্রশোভিত সুদৃশ্য এই শারদীয়া প্রবাসী ...র বিরাট্ হইয়াছে। যাঁহারা গল্প-উপন্যাসের ভক্ত, তাঁহাদিগের জন্য প্রসিদ্ধ লেখকদিগের লিখিত অনেকগুলি উপন্যাস এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। পৃথক পৃথক এই সকল উপন্যাসগুলি দ্বিগুণ মূল্য দিলেও পাওয়া ...। এই পুস্তকের জন্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা সভার যে বিবরণ শ্রীমতী সীতা দেবী বিশেষ করিয়া ...য়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বাংলার কৃষ্টির ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। সাক্ষাৎ ... অভিব্যক্তি রবীন্দ্রযুগের কোন প্রতিষ্ঠান বা ঘটনা সম্বন্ধেই আজকাল দুষ্প্রাপ্য। এই কারণে এই প্রবন্ধটি ...রিয়া উল্লেখযোগ্য। শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের প্রধান কর্ম্মসচিব। তিনি টোকিও ... ক্রীড়ার বিষয়ে যে সকল বিবৃতি ও চিত্রমালা আমাদিগকে দিয়াছেন সেগুলিও অন্য কোথাও পাওয়া ...। বিশ্বদেব বিশ্বাস পর্ব্বত আরোহণে স্বনামধন্য। তিনি হিমালয়ের দুর্গম শিখরে আরোহণ করিয়া ...র্জন করিয়াছিলেন ও তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ, সেইজন্য পূর্ণরূপে সাক্ষাৎজ্ঞানলব্ধ। এই শারদীয়া প্রবাসীতে ...ত চিত্রসম্ভার বহু মূল্যবান। কেশবিন্যাস পরিকল্পনার চিত্রগুলি আঁকিয়া দিয়াছেন রূপকার-শ্রেষ্ঠ শ্রীদেবীপ্রসাদ ...ী। শিল্পীজগতে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলি সেইখানে প্রেরণা জাগ্রত করিবে, ...সঞ্চার সহজেই নিজ আবেগে প্রাণবান হইয়া উঠে।

...গুলি লিখিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীবিমল মিত্র, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ...কুমার রায়চৌধুরী। উপন্যাস লিখিয়াছেন ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবীপ্রসাদ ... শ্রীকৃষ্ণধন দে (অনুবাদ)। ইহা ব্যতীত যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই খ্যাতনামা লেখক ও ...নায় সুদক্ষ। শারদীয়া প্রবাসী পাঠ করিলে পাঠকের শুধু সময় কাটাইবার উপায় হইবে তাহা নহে, ...ব্যবহার হইবে ও সুসাহিত্য চর্চ্চা পূর্ণরূপে সাধিত হইবে। প্রবাসীর সাধারণভাবে প্রকাশিত মাসিক ... সাহিত্য, কাব্য ও অন্যান্য অকঠিন, রসরচনার সহিত রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির

আলোচনার জন্যও পঞ্চষষ্টিবর্ষ ধরিয়া বাংলার পাঠকদিগের দ্বারা আদৃত হইয়া আসিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া ইতিহাস, কৃষ্টি ও প্রগতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া প্রবাসী চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান কালের জীব কঠোর ও আয়াসসাধ্য পদ্ধতির সর্ব্বব্যাপ্ত বাধাসঙ্কুল পরিস্থিতি ও পীড়াদায়ক প্রতিক্রিয়াশীলতার কারণে মা অবসর পাইলে মানসিক বন্ধনগুলি অপেক্ষাকৃতভাবে ঢিলা করিয়া দিয়া আরাম করিতে চাহে। রীতি পদ্ধতির কুচকাওয়াজ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মানুষ কিয়ৎকালের জন্য সহজ উপভোগ্য রসের সন্ধানে বেড়ায়। শারদীয়া প্রবাসীতে আমরা ছুটির সময়ের সহজ উপভোগ্য রস-পরিবেশন চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সে সুরুচি বর্জ্জন করিয়া সেই উদ্দেশ্য সাধন চেষ্টা করা হয় নাই। বাংলা সাহিত্যের সুমার্জ্জিত আদর্শ পূর্ণরূপে রাখিয়া পাঠককে আনন্দদান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং আমাদিগের বিশ্বাস সেই চেষ্টা সফল হইয়া এইজন্য আমরা সকল লেখক, পাঠক ও সমর্থক, সাহায্যকারী ও কর্ম্মীদিগকে আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞা করিতেছি। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অসাধ্যসাধনও করিয়াছেন। ধীরে ধীরে কোন না কোনও সময় শেষ করিয়া দেওয়াই সুলেখকদিগের অভ্যাস। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহারা যেভাবে লেখার উৎকর্ষ পূর্ণমাত্রায় করিয়া যথাসময়ে পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা হেতু আমাদিগকে রচনাগুলি অতিশীঘ্র পাঠাইয়া দিয়াছেন, তা মনে হয় এই কার্য্য তাঁহাদিগের নিজ প্রিয়কার্য্য মনে করিয়াই তাঁহারা ইহা সময়ে সুসম্পন্ন করিতে করিয়াছেন। ভারতের গ্রন্থ প্রকাশের ইতিহাসে যথাসময়ে গ্রন্থ প্রকাশ অতি বিরল। আমরা আজ তাহা পারিয়াছি ভাবিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। কিন্তু সে গৌরব তাঁহাদেরই যাঁহারা বিশেষ করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমাদিগকে সক্ষম করিয়াছেন।

আজকাল পুস্তকাদি প্রকাশকার্য্য নানা কারণে বিশেষ করিয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মুদ্রণকার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা সংগ্রহ করার পথে অনেক বাধা। আমদানী মাল দুষ্প্রাপ্য। তামা ও দস্তা প্রভৃতির চিত্রমুদ্রণ ক্রমশঃ অত্যধিক ব্যয়সাধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। আলোক-চিত্র গ্রহণ ও প্লেট ফিল্ম, ছাপিবার কাগ রাসায়নিক মালের অভাবে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। ভারতের যে নিজ ক্ষমতায় সকল প্রয়োজনীয় বস্তু করিয়া লইবার কথা বহুকালাবধি শুনা যাইতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও অনেক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই যাইতেছে না। অথচ সকল কার্য্যই বিচক্ষণ পরিকল্পনা কার্য্যে সুদক্ষ মহারথীদিগের দ্বারাই করান হইতেছে শুনা যায়। মহারথীদিগকে মধ্যে মধ্যে বদল করিলে কেমন হয়?

শারদীয়া প্রবাসীতে শুধু ছুটির আনন্দের সুর ধ্বনিত হইলেই সঙ্গত হইত; কিন্তু ভারতের পুরাতন দিগের অধর্ম্মের পথের অনুচর পাকিস্তানীগণ অকারণে ভারত আক্রমণ করিয়া আনন্দের মধ্যে হিংস্র পাশবি মূর্ত্ত করিয়া রস উপভোগে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। পাকিস্তান আমাদিগের জাতীয়তাবোধের বিকার ও ন্যায়জ্ঞানের অভাব হইতে উদ্ভূত। যতদিন পাকিস্তান থাকিবে ততদিন ভারতে শান্তি থাকিবে না। এ আকস্মিক যুদ্ধ ও পিছন হইতে ছুরিমারা কখনও শেষ হইবে না, যদি না পাকিস্তান শেষ হয়। ভারতের শ তাহারা সর্ব্বদাই পাকিস্তানকে ব্যবহার করে সেই শত্রুতার অভিব্যক্তির জন্য। শত্রুতা আছে কেন? কাহারও ত অপকার করি না। সে কথার উত্তর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায় দেওয়া যাইতে পারে এতাবধি নিজেদের দুর্ব্বলতা ও একতার অভাবে বিশ্বের সকল দুর্ব্বৃত্ত জাতির লাভের ও লোভের কা আমরা যদি সবল ও মিলিত হই তাহা হইলে দুর্ব্বৃত্ত জাতিগণ তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করিবেই। বা সত্য যাহা, কল্পনা ও আদর্শের প্রলেপ দিয়া তাহার স্বরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। বাস্ত আমাদিগের বিরুদ্ধ হইলে শুধু সংগ্রামই আমাদিগের এক মাত্র অবলম্বন।

অলঙ্কারের পরিকল্পনা

উড়িষ্যা। খৃঃ দশম শতাব্দী। অশোকবৃক্ষ-দলনরতা যুবতী

কোন কিছু, তা মানুষ হোক, আসবাব হোক, মন্দির, প্রাসাদ গৃহ, কুঁড়েঘর হোক কিংবা বস্ত্র অস্ত্র বাসন বিলাসবস্তু হোক, কোন কিছু সজ্জিত, গঠিত, নির্ম্মিত করিতে হইলেই সৌন্দর্য্য অলঙ্কার বর্ণবিন্যাসের কথা উঠিতে বাধ্য। নারীদিগের প্রসাধনে, কেশরচনা, বেশবিন্যাস, অলঙ্কার ব্যবহার ও দেহসৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য আলতা ও শ্বেত কিংবা রক্তবর্ণের অপর প্রলেপ ইত্যাদির প্রয়োজন সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। অলঙ্কারের বৈচিত্র্য তাহার গঠনাকৃতি বা নক্সার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। এই নক্সা বা আকৃতির পরিকল্পনা মানুষের ইতিহাসের অতি পুরাতন কথা। যত পুরাতন যুগের ইতিহাসই আমরা চর্চ্চা করি না কেন, আমরা দেখিতে পাই নরনারীর অলঙ্কারভূষণ ও তাহার অপরূপ চিত্রবিচিত্র আকৃতি বা নক্সার বৈভব। আমাদের নিকটে এখনও যে সকল বস্তু

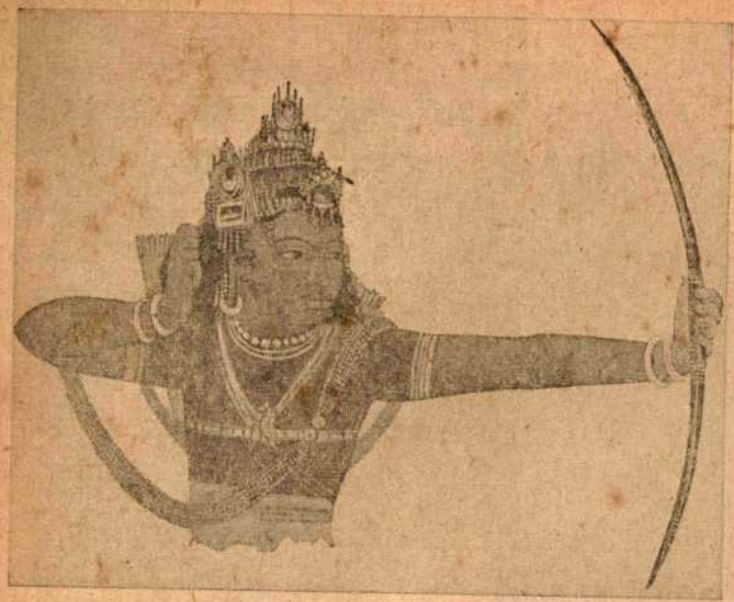

অজন্টা। খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী। যোদ্ধৃবেশে নৃপতি বা অন্যসম্ভ্রান্ত পুরুষ। মুকুটে অতিবৃহৎ মণি (বা মিনা? মিনা হওয়াই সম্ভব) বক্ষোপরি লম্বমান মণিময় ধাতু (স্বর্ণ) রজ্জুর তূণীর-বন্ধনীরূপে ব্যবহার।

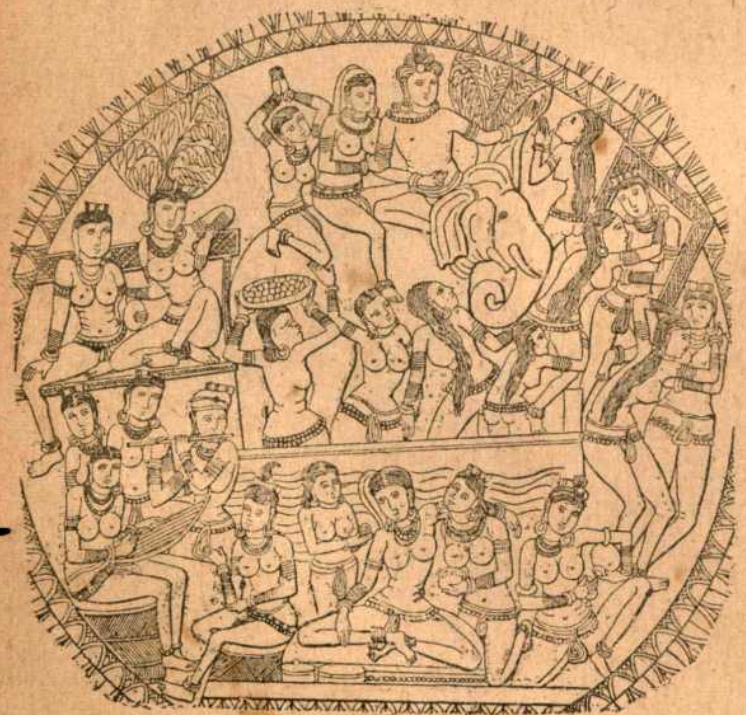

অমরাবতী। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় হইতে খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দী। গহনার আদিম পরিকল্পনা ও গহনাবাহুল্য

পাহুঁচি (ব্রেসলেট) স্বর্ণময়। দিল্লী।

চাক্ষুষভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে ; যথা পুরাতন মন্দির, প্রাসাদ, শিল্পবস্তু, চিত্র, মূর্ত্তি ইত্যাদি তাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ নয়নে অতীতের সে সৌন্দর্য্যকল্পনা গৌরবের কথা ভাবি। আকার ও আকৃতির কথা উঠিলেই আমরা দেখিতে পাই যে শুধু আকৃতি সুন্দর সুঠাম হইলেই চলে না ; তাহাকে আবার অলঙ্কৃত করিয়া সৌন্দর্য্যের উপাসক নিজ রসধ্যানের

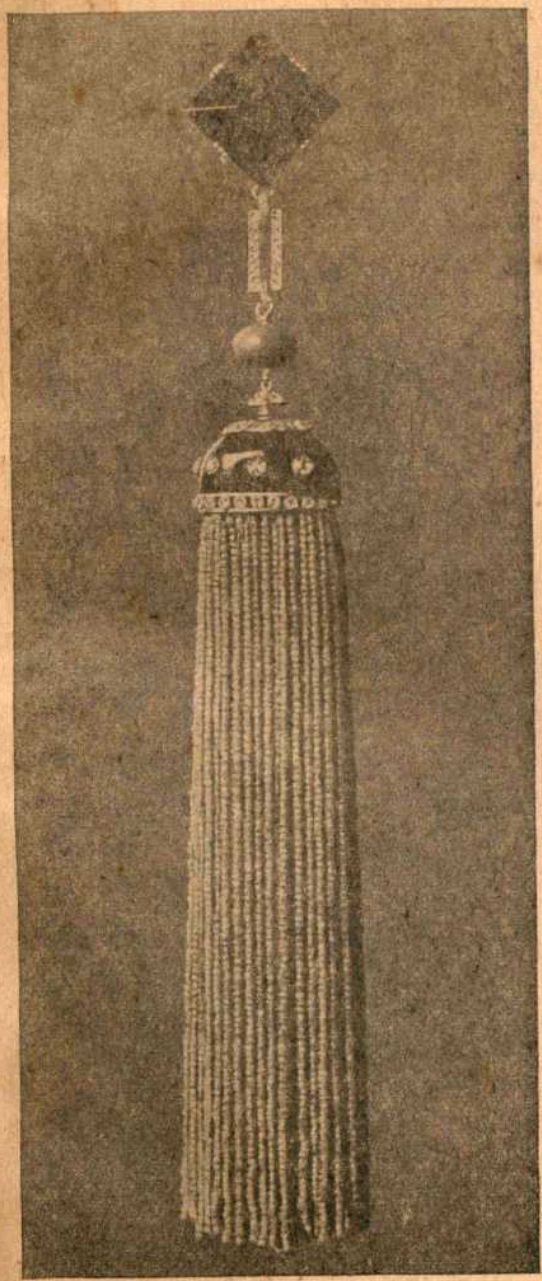

বুকের গহনা। অত্যাধুনিক প্যারি ফ্যাসন। প্রবাল, মুক্তা, হীরা ও অনিক্স (স্বল্পমূল্য কৃষ্ণ উপরত্ন)

অজন্টা। খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী

উপরে তিনটি ব্রুচ (হস্তীমূর্ত্তিযুক্ত ব্রুচ)—মান্দ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুড়। মধ্যে কঙ্কণ ও টাকার থলি—মান্দ্রাজ। নিম্নে রুদ্রাক্ষ (স্বর্ণ) মালা—মান্দ্রাজ

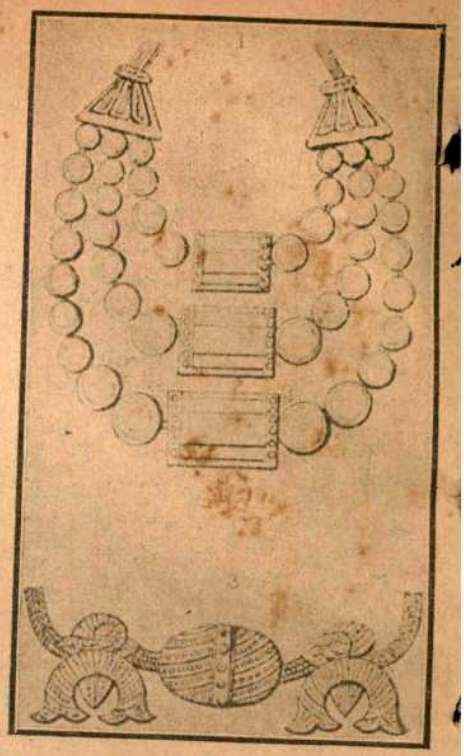

প্রাচীন বৌদ্ধযুগের হার।

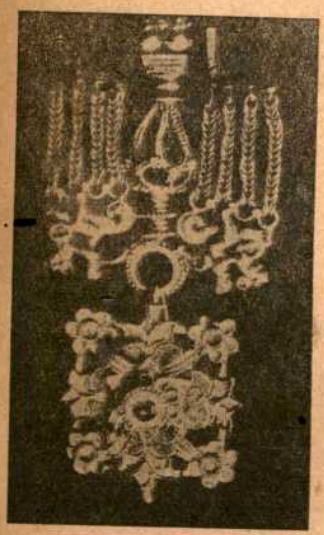

তক্ষশীলায় প্রাপ্ত মণিখচিত স্বর্ণের দুল
খৃঃ ৩য় শতাব্দী

★

দিল্লীর জড়োয়া দুল।
স্বর্ণ, মুক্তা এবং কোণশূন্য মণি সংযোজন

অজন্টা। আদিমযুগ (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) বিপুল কঙ্কন ও বাজু। বৃহৎ ধাতুহার। উপরে বৃহৎ হারের আধুনিক নিদর্শন (দার্জ্জিলিং ভুটিয়া স্ত্রীলোক)

দাক্ষিণাত্য (বা সিংহল ?) স্বর্ণময় রুদ্রাক্ষমালা ও মণিমুক্তাখচিত পদক। খৃঃ ১৮শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

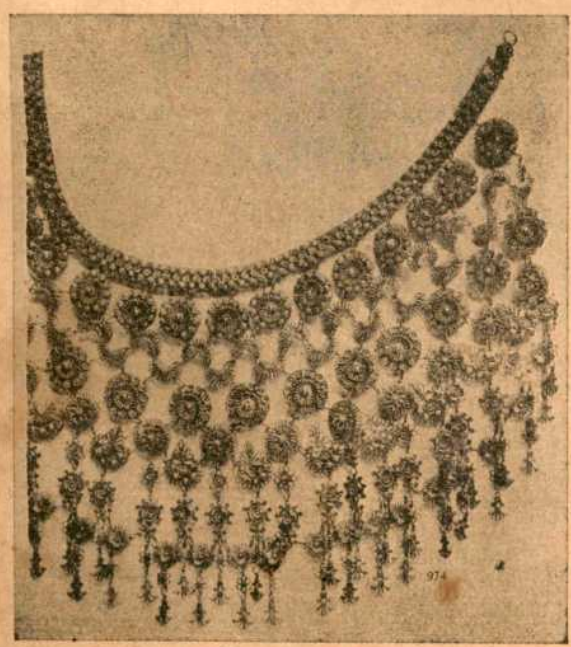

স্বর্ণময় হার। ব্রহ্মদেশ। বিশুদ্ধ হিন্দু গহনার বিদেশী সংস্করণ

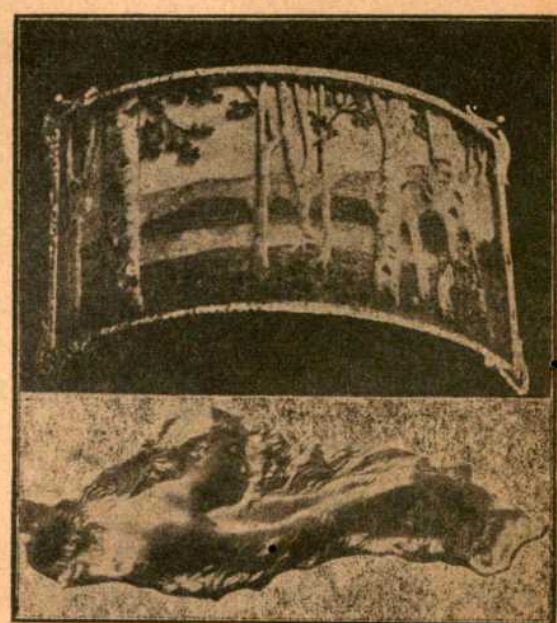

অত্যাধুনিক জর্ম্মাণ গহনা ! উপরে মিনাচিত্রাঙ্কিত কঙ্কণ (Bracelet) নীচে স্ত্রীমূর্ত্তি উৎক্ষিপ্ত স্বর্ণময় ব্রুচ। (relief work in gold)

যাদুপুর (উড়িষ্যা)। পদে নূপুরযুক্ত "মল"। কর্ণে বিরাট অখণ্ড (জোড়হীন) কুণ্ডল (গণেশ)

অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ করেন। এই যে অলঙ্কৃত করার চেষ্টা ইহার ভিতরেই আমরা মানুষের সুন্দরের আরাধনার চূড়ান্ত পরিণতি দেখিতে পাই। মানুষ সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর দেখিয়াছে তাহাই সে নিজের মনে গড়িয়া পিটিয়া কৃত্রিম আকারে আবার সৃষ্টি করিয়া অলঙ্কার গড়িয়াছে। কৈলাসের শিখর দেখিয়া সে মন্দিরের আকার কল্পনা করিয়াছে। বৃক্ষের মহাকাণ্ডে স্তম্ভের কল্পনা চিত্র আঁকিয়াছে। পর্ব্বত গুহাতে প্রাকার অলিন্দ আচ্ছাদনসম্বলিত কক্ষের রূপ দেখিয়াছে। পরে পত্র-পুষ্প-লতা-গুল্ম

অঙ্গুরী ও শির-অলঙ্কার। বোম্বাই।

সারনাথ বোধিসত্ত্ব (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী)। গলদেশের হার সকলে চারি প্রকার পরিকল্পনা। মধ্যস্তরে মণিখচিত স্বর্ণপুষ্পমালা ও তাহার কেন্দ্রে বৃহৎ জড়োয়া "খামি"। মুক্তা-মালার সঙ্গে সর্ব্বনিম্নস্তরে স্বর্ণ-ঘণ্টার সারি। কটিবন্ধে বক্রও ভগ্নরেখাপাতে কারুকার্য্য। ("ছাঁচে ঢালাই" ও "ডাইকাটা" প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ?)

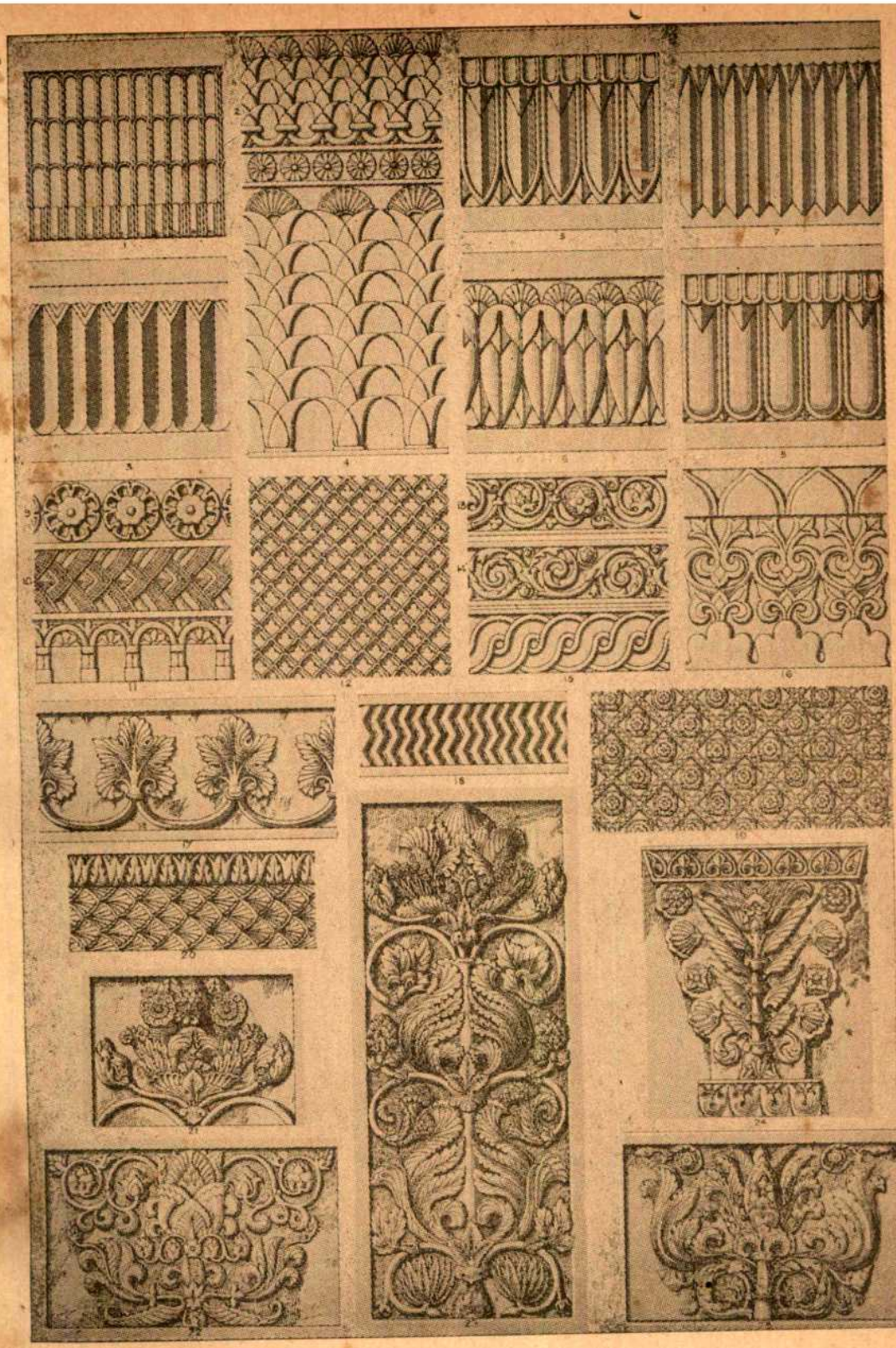

অ্যাসিরিয়া ও পারস্যের প্রাচীন অলঙ্কারের পরিকল্পনা।

রোমান অলঙ্কারের নক্সার নমুনা

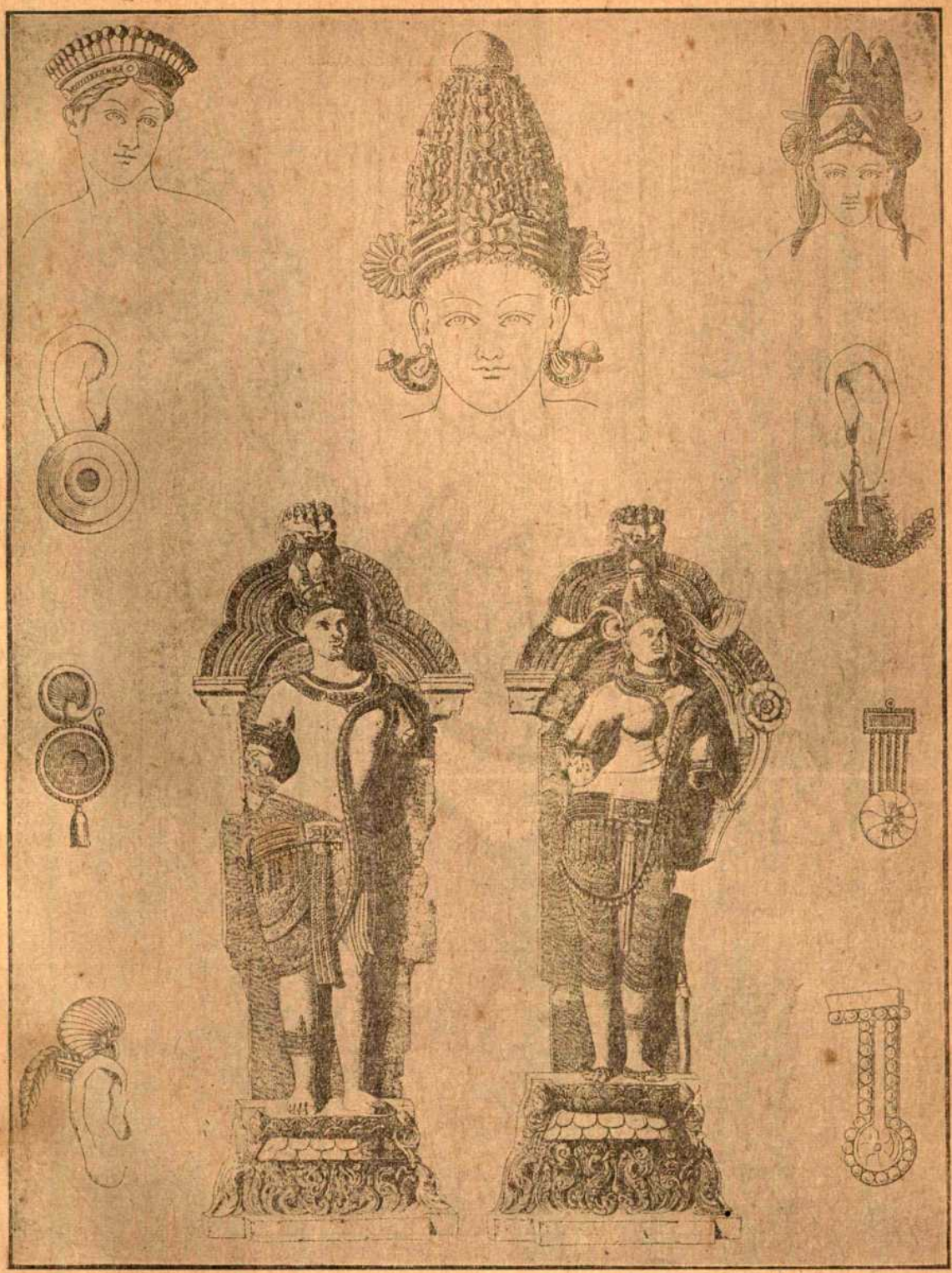

খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর উড়িষ্যার শির ও কর্ণের গহনা। পুরুষ ও স্ত্রীর গহনা সজ্জা।
ভারতীয় গহনা-শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন

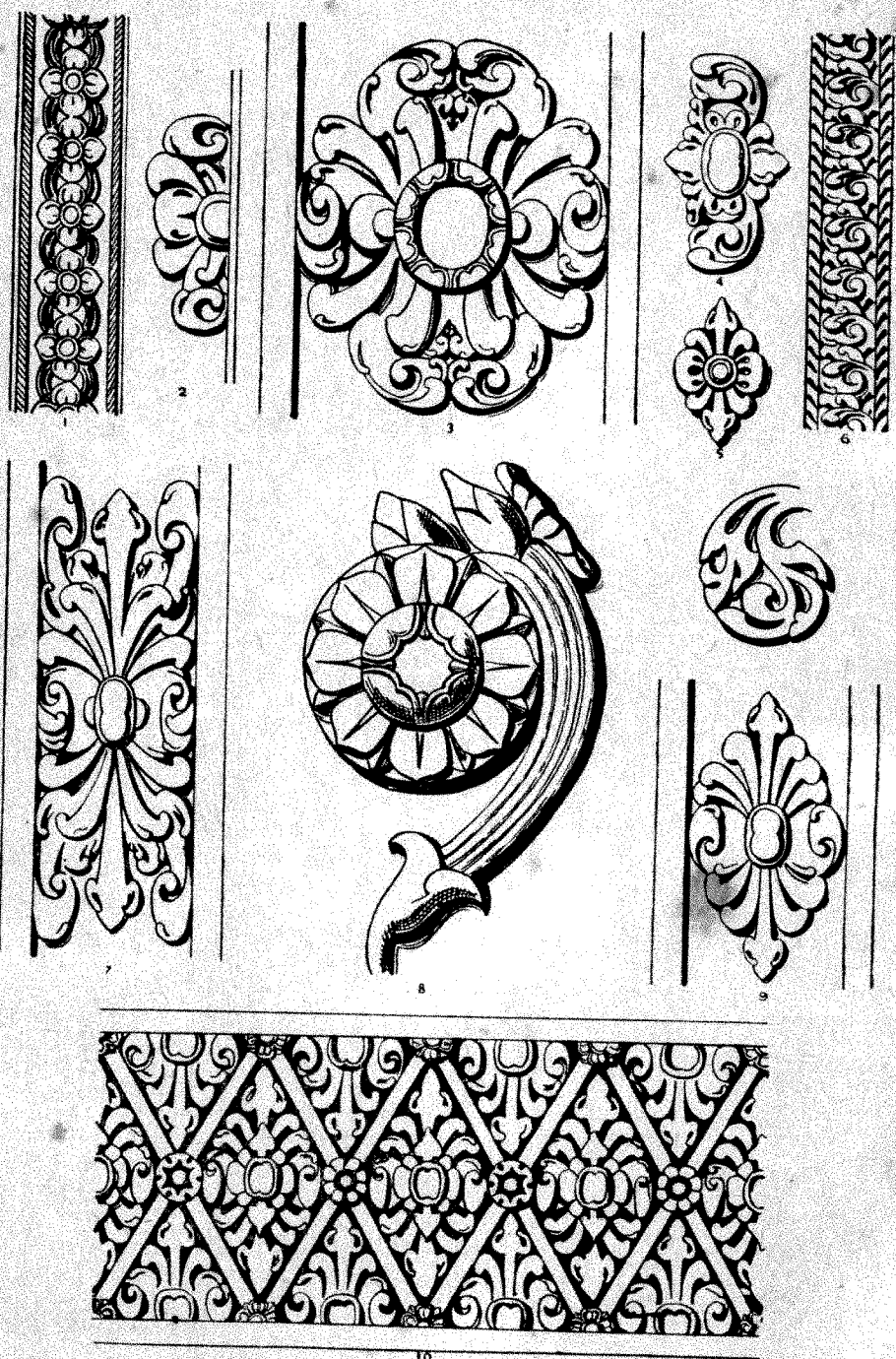

প্রাচীন হিন্দুদিগের অলঙ্কারের নক্সা

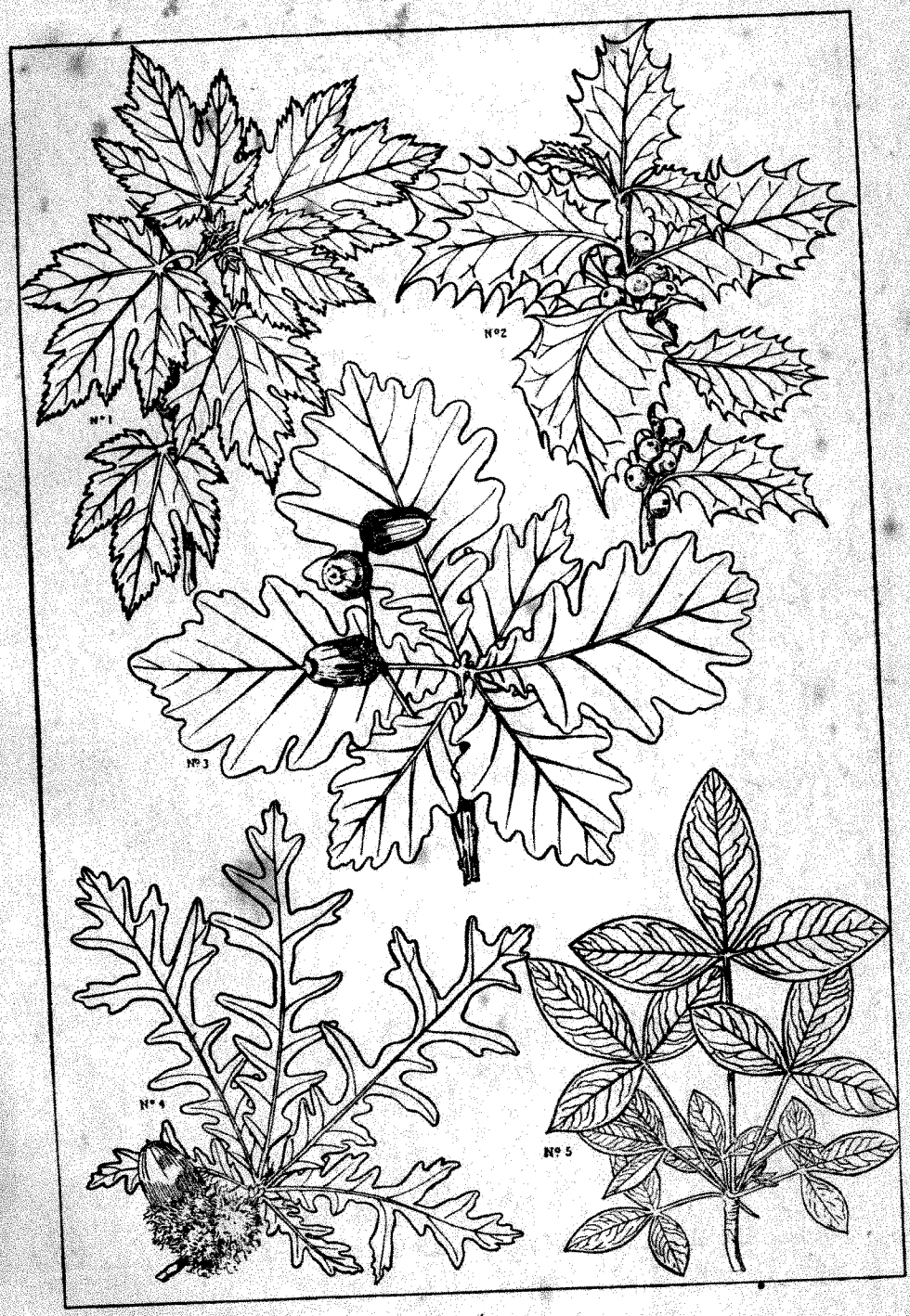

প্রকৃতিদত্ত সৌন্দর্য্য সম্ভার

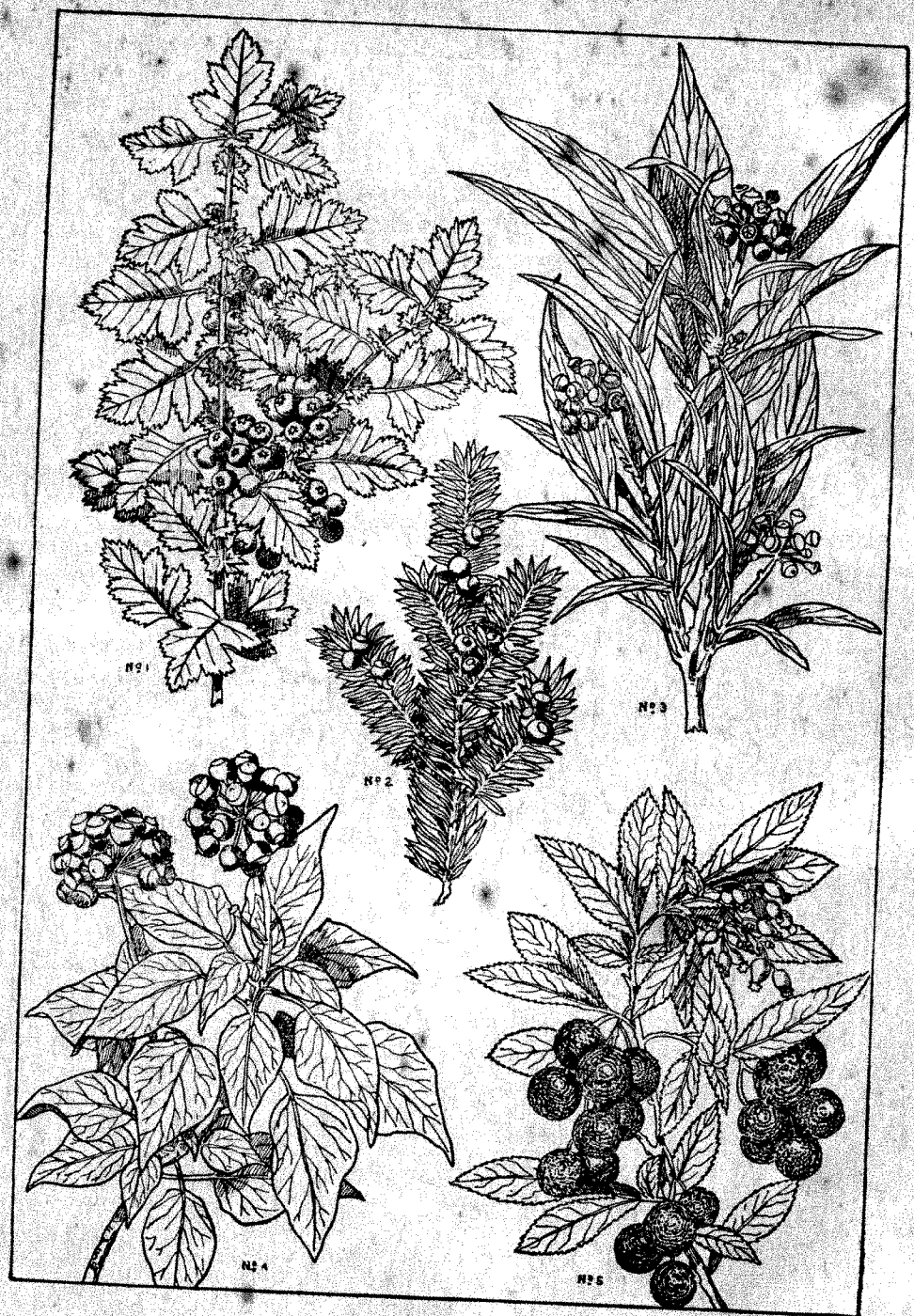

প্রকৃতির ভাণ্ডারের পত্র, পুষ্প ও ফল

ফুল পাতা ও ফলের সুন্দর আকৃতির পরিচয়।

গ্রীক নক্সার নিদর্শন

কিংবা শঙ্খ শম্বুক শুক্তির মধ্যে নব নব রূপ দেখিয়া তাহার অনুকরণে কিরীটকুণ্ডল বলয় ইত্যাদির শোভাবর্দ্ধনে মনোনিবেশ করিয়াছে।

প্রকৃতির কারুকার্য্য অতুলনীয় এবং তাহার মধ্যে পত্রপুষ্পের যে অপরূপ সূক্ষ্মরেখাকৃতির সৌন্দর্য্য তাহা মানব-মনকে আদিমকাল হইতেই বিহ্বল করিয়া আসিয়াছে। সেই সকল রূপাকৃতির অনুকরণ করিয়া মানুষ যে সকল অলঙ্কার গঠন করিয়াছে তাহার উদাহরণ আমরা অতি প্রাচীন শিল্পকলার মধ্যে দেখিতে পাই। আসিরিয়া, পারস্য, গ্রাস, রোম ও প্রাচীন ভারতের অলঙ্কার বৈচিত্র্য চর্চ্চা করিয়া আমরা মানবমনের যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কৌশলের পরিচয় পাই তাহাতে আমরা দেখি যে বর্ত্তমানের ইস্পাত, বিদ্যুৎ ও আণবিক শক্তির যুগের মানুষ সেই কার্য্যে তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের সমকক্ষ নহে। আজকার মানুষের কষ্টকল্পিত সৃজন প্রচেষ্টা শিল্পকলার ক্ষেত্রে পঙ্গু বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

আমরা যে চিত্রগুলি এখানে দেখাইতেছি সেগুলির কয়েকটি শতাধিক বর্ষেরও পূর্ব্বে অঙ্কিত। তিনটি চিত্রে দেখান হইতেছে প্রকৃতিদত্ত আকার সৌন্দর্য্য, আমরা বনেজঙ্গলে শিল্পকল্পনার মূল প্রেরণার প্রাণ বলিয়া যাহা দেখিতে পাই। পরে দেখান হইতেছে আসিরিয়া, পারস্য, গ্রীস ও রোমের অলঙ্কার কল্পনা। আর রহিয়াছে প্রাচীন বর্ত্তমান ভারতের অলঙ্কার হইতে গৃহীত কয়েকটি চিত্র। এই সকল চিত্র হইতে বোঝা যায় যে, অলঙ্কার হস্ত, পদ, কণ্ঠ, কেশ বা শরীরের অপর যে কোন অবয়বের জন্যই হউক না কেন তাহার রূপ কল্পনা মূলতঃ উদ্ভূত হয় প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারে। প্রকৃতিদত্ত যাহা, তাহাকেই সাজাইয়া-গুছাইয়া শিল্প-কলা পদ্ধতির ব্যবহার নীতির শাস্ত্রগত অঙ্গ হিসাবে অলঙ্কারে প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন পরিকল্পনার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করিয়া মানবমনের একান্ত নিজস্ব ও বাহ্যবস্তুর সকল সম্পর্কবর্জ্জিত ভাব প্রতিকৃতির অভিব্যক্তি যে সৌন্দর্য্যময় হইতে পারে না, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু সেরূপ সৃষ্টির

আধুনিক বিলাতি গহনা ও তাহার ধারণ-পদ্ধতি

মধ্যে যে কল্পনামাহাত্ম্য থাকা প্রয়োজন তাহা অল্প মানুষের মধ্যেই থাকে। যাহারা "নূতন কিছু" করিবার জন্য বিকৃত কল্পনাকে গায়ের জোরে রূপ-সৃষ্টি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের বিফলতা আজ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া সকল শিল্প-কলাতে প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু রূপকল্পনার প্রাণবানতাই তাহার প্রধান আশ্রয় ও শেষ অবধি যাহা সত্যই সুন্দর তাহাই জয়যুক্ত হয়।

দেহচ্ছেদ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

যন্ত্রণাময় একটা অন্ধকারের অবসান হ'ল। প্রথমে তরল হ'ল তমসা, তারপর খুব ধীরে ধীরে আবছা আলোয় ঘর ভরে গেল।

দেয়ালে হেলান দিয়ে বিরজাকান্ত দেখলেন। কি ভাবে একটা রাত্রির পরমায়ু শেষ হয়। কি ভাবে নতুন দিনের আলো ফোটে।

আজ দীর্ঘ সাত বছর ধরে দেখছেন। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সব ঋতুতে। রজনীর বিশেষ প্রহরে ঘুম ভেঙে যায়। মনে হয় কে যেন সবল মুষ্টিতে হৃৎপিণ্ড চেপে ধরেছে।

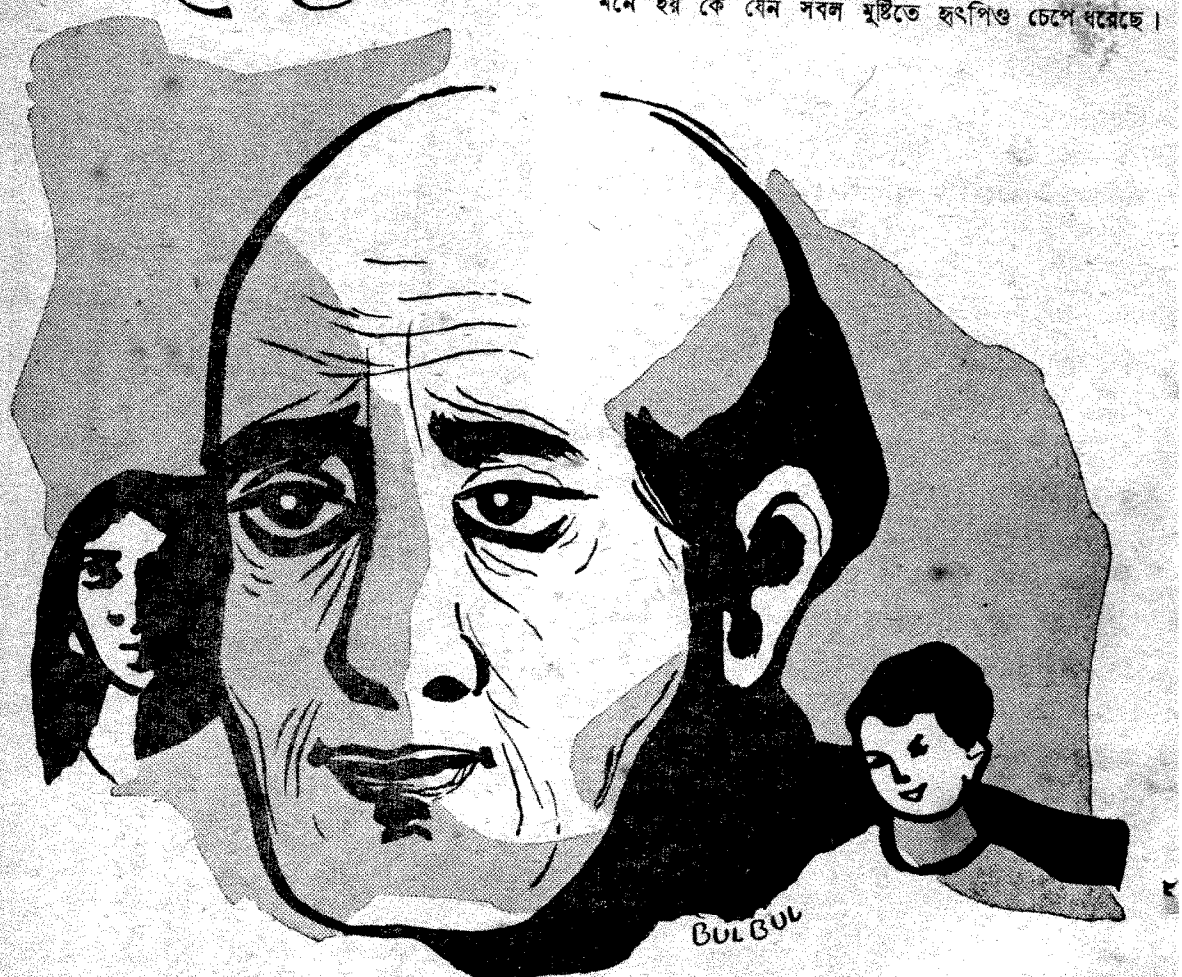

শ্বাসরোধকারী একটা যন্ত্রণা স্নায়ু, মজ্জা অবশ করে দেয়। কামারের হাপরের মতন বুকের দুটো পাশ ফুলে ফুলে ওঠে। এক বিন্দু বাতাসের জন্য শূন্য হাতের আস্ফালন চলে।

মনে হয় বিরজাকান্ত এই মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়বেন। কিন্তু পড়েন না। দুটো হাতে বুক চেপে, বিস্ফারিত দুটি চোখ মেলে বসে বসে অপরিসীম যন্ত্রণা সহ্য করেন। মৃত্যুর চেয়েও তীব্র যন্ত্রণা।

প্রথম দিকে অনেক চেষ্টা করেছেন। যখন শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল, আসল কথা চাকরি ছিল।

এলোপ্যাথি, হোমিও, কবিরাজী, অবশেষে দৈব। মাদুলি বেঁধেছেন হাতে, কোমরে। কয়েকদিন রোগের প্রকোপের কিঞ্চিৎ উপশম হয়েছিল, কিন্তু একেবারে সারে নি।

সাধু সন্ন্যাসীর কাছেও দৌড়াদৌড়ি কম করেন নি। পরিশ্রমই সার হয়েছে, হাঁপানী সারে নি। আজকাল আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

ছেড়ে দিতে বাধ্যই হয়েছেন। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর আর শরীরের তোয়াজ করার কোন অর্থ হয় না। কেউ করে না। অবশ্য যাঁরা পেন্সন পান, তাঁদের কথা আলাদা। পেন্সনের আশাতেও শরীরটা মজবুত রাখতে হয়। অন্তত সংসার যেটুকু আশা করে।

কিন্তু যাঁরা বিরজাকান্তর মতন বেসরকারি অফিসের নিম্ন পর্যায়ের কেরাণী, তাঁরা শরীরের দিকে আর দেখেন না। তাঁদের শরীরের ওপর সংসারের কোন লোভ নেই।

বসে বসেই বিরজাকান্ত নিজের সংসারের ছবি দেখেন। ছন্নছাড়া, রিক্ত ছবি।

তিনি যে ঘরে রাত্রি যাপন করেন, সেটা ঘর নয়, ঘরের ছলনা। বারান্দার চারপাশে পুরোনো ঢেউ-টিন দিয়ে ঘরের রূপ দেওয়া হয়েছে। সেই স্বল্প-পরিসর ঘরে দুজন, বিরজাকান্ত আর ছেলে অভয়। বাপ তক্তপোশে, ছেলে মাটিতে।

চোখ চাইলে, ঘরে একটু আলো প্রবেশ করলে বিরজাকান্তর প্রথম চোখ পড়ে ছেলের দিকে। ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ। অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে।

ছেলের দিকে দেখলেই বিরজাকান্তর নিজেকে পরাজিত সৈনিক বলে মনে হয়।

অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা, অনেক স্বপ্ন দিয়ে ছেলেকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। দশজনের একজন হবে অভয়। নির্ভীক, নিঃশঙ্কচিত্ত, কৃতী।

কিন্তু বার তিনেকের ধাক্কাতেও ম্যাট্রিকুলেশনের দরজা যখন খুলতে পারল না অভয়, তখন বিরজাকান্ত বেশ চিন্তিত হয়েই পড়লেন। অভয়ের অযোগ্যতা আরও নানাদিকে প্রকট হয়ে উঠল।

অফিসফেরত বিরজাকান্ত কয়েকদিন দেখলেন সঙ্গীদের সঙ্গে জুটে গলির কোণে অভয় ধূমপান করছে। ইদানীং তার পরিধেয়ও কিঞ্চিৎ রুচিবিরুদ্ধ।

শাসনের পালা সুরু হ'ল। কিছুদিন সব ঠিক চলল, আবার একই অবস্থা। এইভাবে চলার পর একদিন শাসনের সীমানার বাইরে চলে গেল সব কিছু। বিরজাকান্ত হাল ছাড়লেন।

অথচ আশ্চর্য কাণ্ড।

মেয়ে কমলা অভয়ের চেয়েও বছর দুয়েকের ছোট। ছেলেবেলা থেকে রুগ্না মাকে সামলাতেই ব্যস্ত। যে বয়সে অন্য মেয়েরা খেলাঘরে রান্নাবাড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে, প্রায় সেই বয়সেই কমলা সত্যিকারের রান্নাঘরে ঢুকে হাতাবেড়ি হাতে তুলে নিয়েছিল।

কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে কখন যে পড়ার বই নিয়ে বসত, বিরজাকান্ত লক্ষ্যই করেন নি।

একদিন লক্ষ্য করতে হ'ল।

কমলা বাপের সামনে-এসে দাঁড়াল। হেঁট হয়ে বিরজাকান্তর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, আমি কলেজে পড়ব বাবা।

বিরজাকান্ত আকাশ থেকে পড় লেন।

কলেজে?

হ্যাঁ। রাত্রে একটা টিউশনি আমি যোগাড় করেছি, কিছু টাকা সেখান থেকে পাব। তুমি মাস মাস দশটা টাকা আমায় দিতে পারবে না? তা হ'লেই হবে।

বিব্রত, হতবাক বিরজাকান্ত মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ, পারবেন।

কমলা যখন বি. এ. পাশ করল, তার মাস তিনেক পরেই বিরজাকান্তর চাকরির মেয়াদ পূর্ণ হ'ল।

বিরজাকান্ত আর বছর দুয়েক থাকবার খুব চেষ্টা করেছিলেন, কর্তৃপক্ষ রাজী হয় নি। বাদ সাধল হাঁপানী। আগেই অল্প অল্প ছিল, কিন্তু সব সময় এমন কষ্ট দিত না। বৃষ্টিতে ভিজলে কিংবা শীতের সময় নিশ্বাসের কষ্ট হ'ত। ঘুম ভেঙে যেত মাঝরাতে। মনে হ'ত কে যেন শক্ত সাঁড়াশী দিয়ে হৃৎপিণ্ড চেপে ধরেছে। মর্মান্তিক একটা যন্ত্রণা।

ক্রমে ক্রমে রোগের শক্তি বাড়ল। সর্ব ঋতুতে ব্যাধি দেহ অধিকার করে রইল। প্রতি রাত্রে কঠিন পেশীর চাপে বিরজাকান্তকে টেনে তুলল শয্যা থেকে। তারপর বাকি রাতটুকু অসহ্য একটা যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তাঁর জর্জর দেহটা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল।

এখন আহার, নিদ্রার মতন যন্ত্রণাভোগও যেন জীবনধারণের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। প্রথম রাত্রে নিদ্রা, রাত্রের অন্তিম প্রহরে নিদ্রাহীনতা, এটাই রীতি।

অবশ্য শুধু নিদ্রাহীনতা নয়, তার সঙ্গে মর্মঘাতী যন্ত্রণার অনুলেপ।

পাশের ঘরে বিরজাকান্তর দৃষ্টি চলে না, কিন্তু এখানে বসে বসেই মনশ্চক্ষে দৃশ্যটা দেখতে পান।

একটা কোণে এলোমেলো ভাবে কমলা শুয়ে আছে। হয়ত একদিন তার চোখেও স্বপ্ন ছিল। নীড় বাঁধবার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সে স্বপ্ন, সে আকাঙ্ক্ষা দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছে।

ঘরের মাঝখানে জরাজীর্ণ যে কঙ্কাল নিদ্রার মোহে আচ্ছন্ন, তাকে বিরজাকান্ত একদিন নিজে পছন্দ করে, অভিভাবকদের মতের বিরুদ্ধে এ বাড়ীতে এনে তুলেছিলেন, গৃহিণীর মর্যাদা দিয়েছিলেন, ভাবতেও বিরজাকান্তর বিস্ময় লাগে। রুদ্ধ আবেগে বুকটা হাঁপানীর দমকে ফুলে ফুলে ওঠে।

একদা আয়ত কটাক্ষময় চোখ, সুগঠিত নাসিকা, আরক্ত গণ্ড, কাজল কেশভার আজ নিশ্চিহ্ন। সৌন্দর্যের এ শ্মশানে যৌবনের অস্তরাগটুকুও কোথাও নেই। হাড় পাঁজরা আর শিরার সমষ্টির ওপর একটা চামড়ার আস্তরণ। সংসার আর সব অপহরণ করেছে।

আগে আগে মণিমালা স্বামীর পাশে ছুটে আসত। কষ্টের লাঘবের জন্য বুকে হাত বুলিয়ে দিত, দৈব ওষুধের খোঁজে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করত। আজকাল আর কিছু করে না। বছরের পর বছর ধরে একটা যন্ত্রণার সঙ্গে ঘর করে করে সব কিছু অদৃষ্টলিপি বলেই মেনে নিয়েছে।

এখন এমন অবস্থা হয়েছে, হাঁপানীর কষ্টে বিরজাকান্ত প্রাণান্তকর কষ্ট পাচ্ছেন, বুক চিরে এক বিন্দু বাতাসের জন্য একটা আর্তস্বর বেরিয়ে আসছে, আর ঠিক তার পাশেই পানের ডালা সাজিয়ে আয়েস করে পান সেজে মণিমালা মুখে পুরছে। এক জোড়া পান। সঙ্গে জর্দার ছিটে।

মাঝে মাঝে বিরজাকান্ত বলেছেন, ওগো, বুকটায় একটু হাত বুলিয়ে দাও না। বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

পানের বোঁটায় লাগানো চুণটা চুষে নিয়ে মণিমালা অম্লানবদনে বলেছে, আমি কি ধন্বন্তরী? আমি হাত বুলিয়ে দিলে কষ্ট কমবে তোমার। ভোগান্তি অদৃষ্টে আছে, কে কি করবে?

এই সংসার! বিরজাকান্ত বুঝতে পেরেছেন, যতদিন ময়দানে ঘোড়া ছুটতে পারবে, ততদিন তার আদর, ততদিন তার দানাপানি জুটবে। বুড়ো ঘোড়ার কোন কদর নেই। কেউ তার দিকে ফিরেও দেখে না।

এটা কিন্তু সংসারের সম্পূর্ণ রূপ নয়। এ ছাড়াও একটি ফাউ আছে। বিরজাকান্তর লজ্জা, তাঁর পাপ।

বছর আষ্টেক বয়স হবে অজয়ের। বিরজাকান্তর কনিষ্ঠ সন্তান।

এই দারিদ্র্যকীর্ণ, নিঃসম্বল সংসারে বাড়তি প্রাণী আসার কোন মানে হয় না, কিন্তু পৃথিবীর সব কিছু অর্থবহ, সুসমঞ্জস এমন মনে করার কোন হেতু নেই।

অজয়ের দিকে বিরজাকান্ত ফিরেও চান না। কেউ চায় না। একমাত্র কমলা ছাড়া।

খুব ছেলেবেলা থেকেই অবহেলিত, অনাদৃত শিশুটিকে কমলাই কোলে তুলে নিয়েছিল। এখনও তার স্কুলের খরচ, আবদার ঝঞ্ঝাট সব কিছুর ভার কমলাই নিয়েছে।

শুধু অজয়ের কেন, এই সংসারের কর্ণধারই এখন কমলা।

বি. এ. পাশ করার মাস তিনেকের মধ্যেই মেয়েটা যে কি করে সরকারী অফিসে একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিল, সেটা বিরজাকান্ত ভেবেই কূল পান না।

এখন সবাই বলে দেশ স্বাধীন। দেশকে নতুন রূপে রূপায়িত করে তুলতে কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। সরকারী অফিসের সংখ্যা বেড়েছে, অধিকর্তাদের সংখ্যাও। দুঃখ কতটা কমেছে দেশবাসীর, এসব বিদ্‌ঘুটে হিসাবের জট ছাড়াবার সময় এটা নয়। ত্যাগের মধ্য দিয়েই ত সুখভোগের পন্থা এদেশের ঋষিরা নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছেন। এ সব হিসাব বিরজাকান্ত করেন না। তাঁর উপরি লাভ মেয়েটা এই সব অসংখ্য অফিসের একটায় আসন পেয়েছে। মাসান্তে বাড়তি অর্থ আনছে সংসারে।

শুধু অর্থ আনাই নয়, কমলা সংসারের আরও সুরাহা করেছে। বাউণ্ডুলে ভাইটাকে কার সুপারিশের জোরে এক কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রথম ছ' মাস কিছু পায় নি। শুধু হাতুড়ি পিটে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এখন বুঝি কিছু কিছু পাচ্ছে।

কিন্তু সেটা কত বিরজাকান্ত জানেন না। তাঁকে কেউ জানানো প্রয়োজন মনে করে নি। জানতে গিয়েও অপদস্থ হয়েছিলেন।

একবার বিরজাকান্ত মণিমালাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অভয়কে কত দিচ্ছে এখন?

মণিমালা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠেছিল, তা দিয়ে তোমার দরকার? নিজের অফিসে ঢোকাবার ত মুরোদ হয় নি। কত করে তখন বলেছি। চাকরি যাচ্ছে, এবার ছেলেটাকে ঢুকিয়ে দাও। সে কথা কানে তুলেছিলে? এখন এসব কথা জিজ্ঞাসা করে কি হবে? যে টাকা সংসারে ঘাটতি পড়বে, সেটা পূরণ করবে তুমি?

আর একটি কথাও না বলে বিরজাকান্ত পায়ে পায়ে সেখান থেকে সরে এসেছিলেন। এ সংসারের এক পাশে তিনি আবর্জনার স্তূপের মতন। তাঁকে কারো কোন প্রয়োজন নেই। বরং সবাই সভয়ে পরিহার করে চলে।

অথচ এরা কেউ পিছন দিকের কথা ভাবে না। ফেলে-আসা অতীত কাহিনী।

যখন বিরজাকান্ত এমন অথর্ব, এত পঙ্গু হয়ে পড়েন নি। সংসারের জোয়ালের ভার যখন সম্পূর্ণ তাঁর কাঁধের ওপর ছিল।

ছেলেমেয়ে হয়ত অতটা জানে না, কিন্তু মণিমালার কিছুই অজানা নয়। তখন মণিমালা বরং বারণ করেছে। বলেছে, খেটে খেটে শরীরটা যে পাত করে ফেললে। এরপর শক্ত অসুখ-বিসুখ হলে কে দেখবে?

বেশ মনে আছে বিরজাকান্তর। মুচকি হেসে তিনি বলেছিলেন, কেন, তুমি? সেবা দিয়ে, প্রেম দিয়ে সারিয়ে তুলবে আমাকে।

আজ মণিমালার চোখ-মুখে শুধু বিরক্তির ছিটে, কিন্তু সেদিন ছিল লজ্জার আবির।

পাশের ঘরে শব্দ হচ্ছে।

কমলা উঠেছে। হয়ত তার মাও।

কমলাই ভোরে ওঠে। ভোরে না উঠলে এ বাড়ীর কলতলা পাওয়ার উপায় নেই। চার ঘর ভাড়াটের ওই একটি কলঘর। চারদিকে টিন দিয়ে ঘেরা। শতছিদ্র, জরাজীর্ণ টিন। মেয়েরা ভেতরে ঢুকলে তাদের ইজ্জত রক্ষার ভার বাইরের লোকের করুণাকণার ওপর। তাঁরা যদি দয়া করে সেখান থেকে সরে যান, তবেই বাঁচোয়া।

এ বিষয়ে বাড়ীওলা পীতাম্বরবাবুকে বলা হয়েছে 'বহুবার'। পুলিশ কোর্টের ঝানু উকিল পীতাম্বর ঘোষ। অমায়িক হেসে, দুটো হাত জোড় করে বলেন, কেন আর ওসব কথা বলে লজ্জা দিচ্ছেন। ওই সিমেণ্ট। সব ঠিক আছে, শুধু সিমেন্ট পেলেই একটা কলঘর তুলে দেব। আপনাদের আর বলতে হবে না।

এ সব অনেক দিনের কথা। তার পর বহুবার জোয়ার এসেছে হুগলী নদীতে, কিন্তু বাড়তি কলঘর আর হয় নি।

যাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, মুখের হাসি অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁদের পীতাম্বরবাবু বলেছেন, আপনাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পারছি। অসুবিধা করে অবশ্য আপনাদের থাকতে বলতে পারি না।

ওর ওপর আর কথা চলে না। ভাড়াটেরা ইঙ্গিতটা বুঝে চুপ করে যান।

কমলা ভোর ভোর স্নান সেরে নেয়, তা না হ'লে অফিসের সময় ভীড় হয়ে যায়। মেয়ে-পুরুষের জটলা।

স্নান সেরে উনানে আগুন দিয়ে বাপের জন্য তাড়াতাড়ি এক কাপ চা নিয়ে আসে।

তার আগেই বিরজাকান্ত মুখ-হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে থাকেন।

সূর্যের তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁপানীর টানটাও একটু কমে আসে। বিরজাকান্ত সোজা হয়ে বসেন। বুকের কফ আর শ্লেষ্মায় মেশানো যান্ত্রিক শব্দটাও থেমে যায়।

রাস্তার মোড়ে একটা টেপা কল আছে। আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে বিরজাকান্ত তার সামনে চলে যান। বস্তির ভীড় থাকে কিন্তু বিরজাকান্তকে দেখলে তারা সরে যায়।

বিরজাকান্তর চা খাওয়া শেষ হ'লে কমলা অভয়কে ডাকে।

একাধিকবার আহ্বান এবং অভয়ের না শোনার ভান করে এঁকে-বেঁকে শোওয়ার পর, এক সময় অভয় চোখ খোলে।

আটটার মধ্যে তার কারখানার হাজিরা। খেয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। দুপুর বেলা বাড়ীতে এসে খায়।

মণিমালা জাগলেই সংসারটা জেগে ওঠে।

চেঁচামেচি, হৈ হুল্লোড়ে সরগরম।

এই সময়টা লাঠিতে ভর দিয়ে বিরজাকান্ত বাইরে বেরিয়ে পড়েন। সদর রাস্তার ওপর দয়াময়ী ফার্মেসী। সেখানে গিয়ে বসেন। তিনি একলা নন, পাড়ার আরও কয়েকজন। একটা খবরের কাগজ ভাগ ভাগ করে পড়েন। পড়া শেষ হলে মাঝে মাঝে তর্কও সুরু হয়। দেশ কি ভাবে ধাপে ধাপে উচ্ছন্ন যাচ্ছে, তার ফিরিস্তি। বিরজাকান্তও উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন।

বিরজাকান্ত সব দিন ফার্মেসীতে বসেন না। বসলেও চোখ থাকে রাস্তার ওপর। ঠিক সময়ে উঠে চলে আসেন।

লাঠিতে ভর দিয়ে একেবারে পিছনে গিয়ে ডাকেন, কমলা, ও কমল।

মেজাজ খারাপ থাকলে এমন মধুর সম্বোধন শোনা যায় না, তখন বলেন, কমলী, মুখপুড়ী মেয়ে।

কিন্তু আজকাল বিরজাকান্ত মেয়ের ওপর একেবারে মেজাজ খারাপ করেন না। এই টলমলে সংসারপানসীর হাল আর দাঁড় যার হাতে, তাকে চটানো বোকামির নামান্তর।

কমলা দাঁড়িয়ে পড়ে। বেশীক্ষণ ধরে কথা বলবার মতন যথেষ্ট সময় তার হাতে নেই।

পিছন ফিরে চেয়ে বলে, কি ?

বিরজাকান্ত অন্য পথচারীদের কান বাঁচিয়ে বলেন, চ্যবনপ্রাশটা ফুরিয়ে গেছে।

স্বরে কাতরতার প্রলেপ। চ্যবনপ্রাশ নয়, জীবনের সমস্ত সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন, এমন একটা ভাব।

কমলা মনে মনে হিসাব করে। মাসের বিশ তারিখ। এখন বাড়তি কোন জিনিষ কেনার চেষ্টা প্রায় অসম্ভব। আসল চ্যবনপ্রাশের দাম অনেক। সে জিনিস কেনার সাধ্য কমলার নেই। কমলা মাঝারি দোকান থেকে তার সাধ্যানুযায়ী জিনিস কিনে এনেছিল, কিন্তু মাসের অপরাহ্ণে মাঝারি দামের চ্যবনপ্রাশও তার নাগালের বাইরে।

কিন্তু অসহায়, দুর্বল বাপকে এমন একটা কথা বলা যায় না। বিশেষ করে ওষুধের ব্যাপারে।

তাই কমলা অন্য কথা বলে।

ভাল জিনিস পেতে একটু দেরি হবে বাবা। তোমার চ্যবনপ্রাশ কি একেবারে ফুরিয়ে গেছে ?

বিরজাকান্ত থতমত খেয়ে যান। বিব্রতকণ্ঠে বলেন, একটুখানি রয়েছে এখনও। অল্প অল্প করে খেয়ে সেইটুকুতেই কদিন চালাব।

আর দাঁড়ান না বিরজাকান্ত। লাঠি ঠুকে ঠুকে বাড়ীতে ফিরে আসেন। কমলারও অপেক্ষা করার সময় নেই। তার অফিসের দেরি হয়ে যাবে।

অবসর মুহূর্তে বসে বসে বিরজাকান্ত ভাবেন।

সারা সংসারের মধ্যে এই আত্মজাই বাপের দিকে চোখ তুলে দেখে। তাঁর দুঃখে কষ্টে, ব্যথা বেদনায় সমবেদনা জানায়, শুশ্রূষা করে, সংসারের বিরাট ক্ষুধা থেকে বাঁচিয়ে যেটুকু সম্ভব, ততটুকু বাপের জন্যে সংগোপনে রেখে দেয়।

তাই আবদার, নালিশ বিরজাকান্তর সব কিছু কমলার কাছে।

মেয়ের উপার্জন নিশ্চয় নিন্দার হয়। তা না হলে এমন রংবেরংয়ের শাড়ী জোটায় কোথা থেকে, এত রকমের প্রসাধন। পথে বের হতে হলে নিজেকে নাকি দ্রষ্টব্য করে তুলতে হয়। সভ্য সমাজের এটাই রীতি।

আধময়লা শাড়ী পরে কমলা যখন বাড়ীর কাজ করে তখন মনেই হয় না এই কমলাই ফিটফাট কেতাদুরস্ত হয়ে ট্রামে-বাসে ঘোরাফেরা করে।

এক টানাপোড়েনে বাঁধা সংসারের মাকু। কোন ব্যতিক্রম নেই, কোন রকমফের। দেখে দেখে প্রায় বিরজাকান্তর মুখস্থ হয়ে গেছে। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত।

কিন্তু একদিন সংসারের রূপ বদলাল। রং বদলাল।

হঠাৎ বিরজাকান্তর খেয়াল হল।

কমলার ডাকে অভয় সকালবেলা উঠল বটে কিন্তু কারখানায় গেল না। দয়াময়ী ফার্মেসীতে খবরের কাগজের অপেক্ষা করতে করতে বিরজাকান্তর নজর পড়ে গেল।

অভয় যেন রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে।

লাঠিতে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে দুটো চোখ কুঁচকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলেন। হ্যাঁ, অভয়ই তো। একলা নয়। সঙ্গে পাড়ার কয়েকজন ছেলেও রয়েছে।

বাড়ী ফিরে মণিমালাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁগো, অভয় আজ অফিসে যায় নি?

বিরজাকান্ত কারখানা বলতেন না। বলতেন অফিস। ছেলে কারখানায় মিস্ত্রিগিরি করে এ কথা বলার মধ্যে বোধ হয় সঙ্কোচের একটা সরু তার জড়ানো ছিল। শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে খবরের কাগজে গরম গরম কথা পড়া সত্ত্বেও বিরজাকান্ত এ সঙ্কোচ জয় করতে পারেন নি।

মণিমালা ভাতের থালাটা সশব্দে মাটিতে নামিয়ে রেখে ঝঙ্কার তুলল, আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? আমি কি জানি? ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেই পার।

বিরজাকান্ত আর কথা বললেন না। মাথা নীচু করে খেতে আরম্ভ করলেন।

এ দের কথাবার্তার ধরনই এই রকম। এই সুরেই এরা কথা বলে। বাড়ীর সবাই, কেবল কমলা বাদে।

বিরজাকান্ত ঠিক করলেন বিকালের দিকে কমলা অফিস থেকে ফেরার সময় নিজে রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করবেন। ব্যাপারটা তাঁর জানা দরকার।

অভয়কে জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নেই। সোজা কথার বাঁকা বাঁকা উত্তর দেবে। তার সঙ্গে বিরজাকান্ত বিশেষ কথাবার্তাও বলেন না। নিজের মান থাকে না।

বিরজাকান্তর সামনেই অভয় সুর করে সিনেমার গান গায়। পা ঠুকে ঠুকে নাচের তাল দেয়। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যে সুরে কথা বলে, বিরজাকান্ত কানে আঙুল দিয়ে সরে আসেন।

বিকাল হতেই বিরজাকান্ত বেরিয়ে পড়লেন। চলাফেরা করতে ইদানীং বেশ একটু কষ্টও হয়। দিনের বেলা বেশী ঘোরাফেরা করলে, রাত্রে হাঁপানীর টানটা বাড়ে। কষ্টটা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

একটা সুবিধা, মোড়ে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হয় না। একটা দোকানের সামনে কতকগুলো কাঠের বেঞ্চ পাতা আছে। খদ্দেরদের জন্য। বিরজাকান্ত সেখানে বসতে পারবেন। অনেকক্ষণ দাঁড়ালে কোমর ব্যথা করে। মেরুদণ্ডে একটা যন্ত্রণা অনুভব করেন।

কমলা যখন বাস থেকে নামল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে চারদিকে।

বিরজাকান্ত এগোতে গিয়েই থেমে গেলেন।

একলা নয় কমলা, সঙ্গে আর একজন কে রয়েছে। দুজনে কথা বলতে বলতে আসছে।

কিছুটা ব্যবধান থেকে বিরজাকান্ত পিছন পিছন চলতে আরম্ভ করলেন। পাড়ার কোন ছেলে হয়ত। সম্ভবত কমলার সঙ্গে এক অফিসেই কাজ করে।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে বিরজাকান্ত দাঁড়িয়ে পড়লেন।

দুজনেই বাড়ীতে ঢুকছে। তা হলে ছেলেটি কি কোন আত্মীয়? কিন্তু এ শহরে বিরজাকান্তর কোন আত্মীয় কুটুম্ব নেই। সাতজন্মে কেউ তার খোঁজ-খবর করতে আসে না। অবশ্য খুব দূর সম্পর্কের যে দু একজন আছে, বিরজাকান্তর পক্ষেও তাদের সংবাদ রাখা সম্ভব হয় না।

একটু সময় দিয়ে বিরজাকান্ত বাড়ীতে ঢুকতে পেলেন, কিন্তু দরজাতেই বাধা।

মণিমালা এসে দাঁড়িয়েছে।

এর মধ্যে বাড়ী ঢুকছ কেন? খোলা হাওয়ায় কোথাও একটু গিয়ে বস না।

বিস্মিত, হতবাক বিরজাকান্ত আবার রাস্তায় পা দিতে দিতেই দেখতে গেলেন, তাঁর অপরিসর কামরায়, তক্তপোশের ওপর কমলা আর ছেলেটি পাশাপাশি বসে আছে।

একবার ভাবলেন, মণিমালাকে ছেলেটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, মণিমালা নেই। বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

খুব সন্তর্পণে লাঠি ঠুকে ঠুকে বিরজাকান্ত রাস্তার ওপর এসে দাঁড়ালেন।

পার্কের কোণের বেঞ্চে বসে বিরজাকান্ত দেখলেন এক সময় ছেলেটি হন হন করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

বিরজাকান্ত বাড়ী ফিরে এলেন। চৌকাঠে পা দিয়েই চমকে উঠলেন। কমলা গুন গুন করে গান গাইছে।

এ একটা নতুন ব্যাপার। কমলার গান কখনও তাঁর কাণে আসে নি। গানের গলা কমলার নেই।

কিছু বললেন না বিরজাকান্ত। আস্তে আস্তে তক্তপোশে এসে বসলেন। একটু পরেই কমলা ঘরে ঢুকল। এ ঘরের কোণে একটা কুঁজো আছে। সেই কুঁজোয় কমলা রোজ জল ভরে।

কমলা।

কমলা কুঁজোটা তুলেও আবার রেখে দিল। অন্ধকার ঘর। বাপ এসে বসে আছে, জানত না কমলা।

কমলা বাতিটা জ্বালাল। তার পর বিরজাকান্তর কাছে গিয়ে বলল, কিছু বললে বাবা?

না, মানে, জিজ্ঞাসা করছিলাম, অভয় আর বেরোয় না।

উত্তর দিতে কমলা একটু সময় নিল। কি বোধ হয় ভাবল মনে মনে। হিসাব করল, তার পর বলল, কারখানায় ধর্মঘট সুরু হয়েছে। মালিক বন্ধ করে দিয়েছে কারখানা।

বন্ধ করে দিয়েছে!

আহত পশুর আর্তনাদের মতন মনে হল বিরজাকান্তর কণ্ঠস্বর।

কমলা আর দাঁড়াল না। কুঁজো নিয়ে বাইরে চলে গেল।

কেন ধর্মঘট? কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করে? মিটমাটের কোন আশা আছে কি না এসব কথা বিরজাকান্তর মনেই এল না। সব কিছু ছাপিয়ে শুধু একটা সমস্যা প্রবল হয়ে ধরা দিল চোখের সামনে।

এ সংসারের বাড়তি কিছু টাকার পরিমাণ বন্ধ হয়ে গেল। এখন একমাত্র সম্বল কমলার উপার্জন।

এই অগ্নিমূল্যের বাজারে মানুষ যখন প্রাণপণ চেষ্টা করছে অতিরিক্ত উপার্জনের, রাই কুড়িয়ে বেল করার মতন ছোট ছোট রোজগারের বালুকণা দিয়ে অভাবের সমুদ্র বোজাবার প্রয়াস করছে, তখন একটা মানুষের উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়া যে কত মর্মান্তিক, সেটা অনুভব করতে বিরজাকান্তর একটুও বিলম্ব হল না।

এমনিতেই একদিক টানতে আর একদিক অনাবৃত হয়ে পড়ে। অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত, নির্জীব হয়ে পড়ে মানুষ। বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ, লবণাক্ত জলরাশি, কোথাও তটের ইশারা মাত্র নেই।

সংসারের লাগাম আর বিরজাকান্তর দুর্বল হাতে ন্যস্ত নয়, তবু বিরজাকান্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কমলার উপার্জন কত সেটা তাঁর জানা নেই, তবু সেটা যে আগ্রাসী সংসারের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, সেটা বুঝতে তাঁর কোন অসুবিধা হয় না।

আশ্চর্য কাণ্ড, এমন একটা সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সংসারের লোকেরা নিশ্চিন্ত মনে কি করে গান গায়, বিরজাকান্ত ভেবেই পান না।

দিন দুই পরে ছেলেটি আবার এল।

বিরজাকান্ত লাঠি হাতে বাইরে বের হচ্ছিলেন। সারাটা রাত দারুণ কষ্ট গেছে। নিশ্বাস নেবার মর্মান্তিক যন্ত্রণায় দুটো পাঁজর এখনও ব্যথায় টন টন করছে। সোজা হতে পারছেন না।

ছেলেটি একটু ইতস্তত করল তারপর বিরজাকান্তর দিকে সলজ্জ দুটি চোখ তুলে নম্র কণ্ঠে বলল, মীনাক্ষী আছে?

বিরজাকান্তর সব গোলমাল হয়ে গেল। ও নামের তো কাউকে মনে পড়ছে না। ছেলেটা কি ঠিকানা ভুল করল।

তারপরই মনে পড়ে গেল। কমলার নাম মীনাক্ষী। আটপৌরে সংসারে আটপৌরে নামটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এ বাড়ীর মেয়েদের ভাল নাম একটা থাকতে পারে, ভাল কিছু থাকতে পারে, এটা বিরজাকান্তর মনেই হয় নি।

মীনাক্ষী? দাঁড়ান দেখছি।

দেখবার জন্য বিরজাকান্ত ঘুরে দাঁড়ালেন। বাড়ীর মধ্যে ঢুকে একবার খোঁজ করবেন। কিন্তু তার আর দরকার হল না।

মণিমালা চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। দু চোখে অভ্যর্থনার দীপ, ঠোঁটে সম্ভাষণের হাসি।

এস বাবা, এস। মীনাক্ষী আছে।

বিরাজাকান্ত ধীর পায়ে সরে গেলেন। আগন্তুককে পথ ছেড়ে দিয়ে। মনে মনে ঠিক করলেন, কমলার কাছে একবার পরিচয় নেবেন ছেলেটির।

এর পর ছেলেটির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হ'তে লাগল। অফিসফেরত কমলার সঙ্গে আসত। ছুটির দিন কমলাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যেত।

কমলাকে জিজ্ঞাসা করার আর সুযোগ পাচ্ছেন না বিরজাকান্ত। নিজের শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। তা ছাড়া, কমলাও কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

একদিন ঘরে ঢুকল কমলা নয়, মণিমালা।

মণিমালা পারতপক্ষে এ ঘর মাড়ায় না। সারা দিনে রাতে বিরজাকান্তর সঙ্গে তার গোটা দুয়েক কথা হয় কি না সন্দেহ।

মণিমালাকে দেখে বিরজাকান্ত বিস্মিত নয়, শঙ্কিত হলেন।

মণিমালা তক্তপোশের পাশে বসে বলল, তোমায় একটা কাজ করতে হবে।

বিরজাকান্ত আড়চোখে চেয়ে চেয়ে মণিমালাকে দেখলেন। কি ব্যাপার? সংসারের আবর্জনা হিসাবে যাকে একপাশে ঠেলে রাখা হয়েছে, অবহেলায়, অশ্রদ্ধায়, সে আবার সংসারের কি কাজে লাগতে পারে!

বিরজাকান্ত কোন উত্তর দিলেন না। তিনি জানেন, মণিমালা তাঁর উত্তরের অপেক্ষা রাখে না।

আজ অমিয়র সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে।

কার সঙ্গে? বিরজাকান্ত আর কথা না বলে পারলেন না।

অমিয়। অমিয়। ওই যে ছেলেটি আসে।

বিরজাকান্ত দু চোখের তারায় অনাবিল বিস্ময়ের প্রতিচ্ছবি দেখে মণিমালা বুঝতে পারল মানুষটার কিছুই বোধগম্য হয় নি।

একটু ঝাঁঝালো সুরে বললে, তুমি কি চোখ-কান বুজিয়ে সংসারে থাক। বুঝতে পারছ না, কমলার ওপর অমিয়র বেশ একটু টান হয়েছে।

টান ?

মানে, ভাব হয়েছে দু'টিতে। অমিয় ছেলেটাও ভাল। প্রায় শ আড়াই মাইনে পায়। পিছটান নেই। সম্বল শুধু বুড়ি মা। কমলা সুখেই থাকবে।

মণিমালা একটু থামল। আঁচলে মুখটা মুছে নিয়ে বলল, আজ অমিয় এলে তোমার ঘরে পাঠিয়ে দেব। তুমি বেরিও না। কথাটা পাড়বে। আমাদের দিক থেকে কথাটা পাড়া উচিত। রাজীই হবে। একেবারে দিন স্থির করে ফেলবে, বুঝলে ?

বিরজাকান্তর বোঝার অপেক্ষা না করে মণিমালা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিরজাকান্ত চুপচাপ তক্তপোশের ওপর বসে রইলেন। আর কিছু অন্ধকারে নেই, অস্বচ্ছ নয়। যার ওপর এ সংসারে তিনি সবচেয়ে বেশী নির্ভর করতেন, সেই সরে যাবে। নিজের ব্যক্তিগত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য সুবিধা প্রাধান্য লাভ করবে। অন্য লোকের জীবন, প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা সব তলিয়ে যাবে স্বার্থপরতার অগাধ সলিলে।

এক সংসার ভেঙে কমলা আর এক সংসার গড়বে।

কাঠের তাকের দিকে বিরজাকান্ত একবার চেয়ে দেখলেন। সারি সারি অনেকগুলো শিশি, কৌটা সাজানো, কিন্তু সবগুলোই খালি। আজও কমলা চ্যবনপ্রাশ এনে দেয় নি। এক শিশি বড়ি যেগুলো খেলে হাঁপানীর টান একটু কমে, সেগুলোও আনবার কথা ছিল। কিন্তু রুগ্ন, জীর্ণ একটা মানুষের সামান্য প্রয়োজনের কথা আর কমলার এখন মনে নেই। নতুন নেশায় সে বিভোর।

ছেলেটি এল সন্ধ্যার মুখে।

তার আগেই মণিমালা একবার বিরজাকান্তকে তালিম দিয়ে গিয়েছিল। ঘরের বাতিটাও জেলে দিয়েছিল।

বিরজাকান্ত প্রায় প্রস্তুত।

ছেলেটি চৌকাঠে পা দিয়ে একটু ইতস্তত করল। বিরজাকান্ত ডাকলেন, এস, এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে। আমি কমলা, মানে মীনাক্ষীর বাবা।

ছেলেটি ঘরে ঢুকল। নীচু হয়ে বিরজাকান্তর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁর এক পাশে বসল।

বিরজাকান্ত একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। কোন সুবিধা নেই। কি বলতে হবে, সবই শেখানো আছে।

তুমি কমলাকে এ সংসার থেকে কেড়ে নিওনা বাবা, তাহলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

তা ছাড়া দুজনের মন জানাজানির পর্ব যখন শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন ত কোন অসুবিধাই নেই।

সামনের তাকের খালি ওষুধের শিশি, বাঁশের আলনায় টাঙান শতছিন্ন দু একটা কাপড়, বেকার পুত্র, সংসারের রিক্ত হতশ্রী রূপ সব মিলিয়ে বিরজাকান্তকে এত কষ্টে শেখান সব কিছু ভুলিয়ে দিল।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কম্পিত শিরাপ্রকট দুটি হাত দিয়ে বিরজাকান্ত ছেলেটির একটি হাত আঁকড়ে ধরলেন। স্খলিত কণ্ঠে বললেন, তুমি কমলাকে এ সংসার থেকে কেড়ে নিও না বাবা, তা হলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আর আমাদের অবলম্বন করার মতন কেউ নেই, কিছু নেই। তুমি কমলাকে ছেড়ে দাও।

কুঞ্চিত পেশী দুটি চোখের পাশ দিয়ে জলের ধারা অসহায় বিরজাকান্তর দু'টি গাল বেয়ে ঝরে পড়ল।

—)০(—

প্রাচীন পোলিশ নৃত্য—

ওবোরক নৃত্য

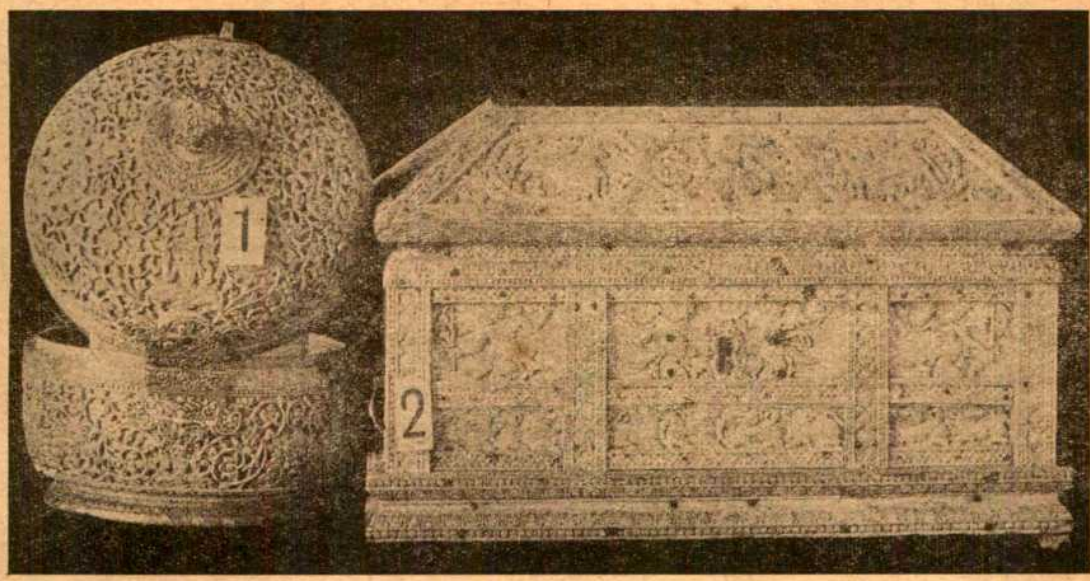

দক্ষিণ ভারতের গজদন্তশিল্প

গজদন্তশিল্প

প্রবাসীর জন্য বিশেষভাবে লিখিত

প্রাগ্-ঐতিহাসিক প্রস্তরযুগের শিল্পের যে সকল নিদর্শন আমাদের সময় পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার মধ্যে অতিকায় হস্তীর (Mammoth) দাঁতের কাজগুলি অতি সুন্দর। সে যুগের মানুষের শিল্পকলা অতি অসংস্কৃত ও আদিম, কেননা তখন এই বিষয়ে শিক্ষা দীক্ষা ত ছিলই না, উপরন্তু যন্ত্রপাতিও ছিল ততোধিক অসংস্কৃত। কিন্তু হাতীর দাঁত এমনই জিনিষ যে, সেই শিক্ষার অভাব এবং স্থূল যন্ত্রপাতি সত্ত্বেও তখনকার শিল্পীর কাজ এই সভ্যযুগের লোকের চোখে সুন্দর বলিয়াই মনে হয়।

তাহার কারণ এই যে, হাতীর দাঁত শিল্প-কার্য্যের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। কর্ত্তন, ক্ষোদন, ছেদন, ইত্যাদি কারুকার্য্যের সকল প্রথাই ইহাতে সহজ ও সরল ভাবে করা সম্ভব। সুতরাং আদিম মানুষ এই পদার্থের সাহায্যে সহজেই তাহার শিল্পচাতুর্য্য দেখাইতে সক্ষম হয়।

হাতীর দাঁত স্বভাবতই সুন্দর, মসৃণ এবং স্নিগ্ধ-স্পর্শ। এই সকল নানা কারণেই শিল্পসৌন্দর্য্যগ্রাহীর নিকট ইহা এতই আদরণীয়।

আমাদের দেশে এই শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন।

রামায়ণে ভরতের রামের অন্বেষণে যাত্রার বিবরণে ভরতের অনুচরদিগের মধ্যে গজদন্তক্ষোদকের উল্লেখ আছে। মহাভারতের হরিবংশ নামক পরে যুক্ত অংশে হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদের বিবরণে গজদন্তনির্ম্মিত বাতায়নের উল্লেখ আছে। ঐ দুই পুস্তক খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকে লিখিত বলিয়া খ্যাত। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে লিখিত অর্থশাস্ত্রে গজদন্ত নির্ম্মিত তরবারিমুষ্টি, এবং গজদন্তনির্ম্মিত মহামূল্য দ্রব্যাদির উল্লেখ আছে। ইহা ভিন্ন বাৎস্যায়ণের কামসূত্রে গজদন্তনির্ম্মিত পুত্তলিকা, গ্রীক-ঐতিহাসিক আরিয়ানের ভারতবিবরণীতে গজদন্ত-নির্ম্মিত বল্গা আভরণ, মৃচ্ছকটিকে গজদন্তনির্ম্মিত তোরণ, বৃহৎ-সংহিতায় গজদন্ত অলঙ্কৃত কাষ্ঠশয্যাসন ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, হাতীর দাঁতের কাজ আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পমধ্যে অন্যতম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এদেশে এমন কোনও গজদন্তশিল্পের নিদর্শন নাই যাহার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই হাতীর দাঁত পূজার্থ

CALCU CENTR LIBRAR

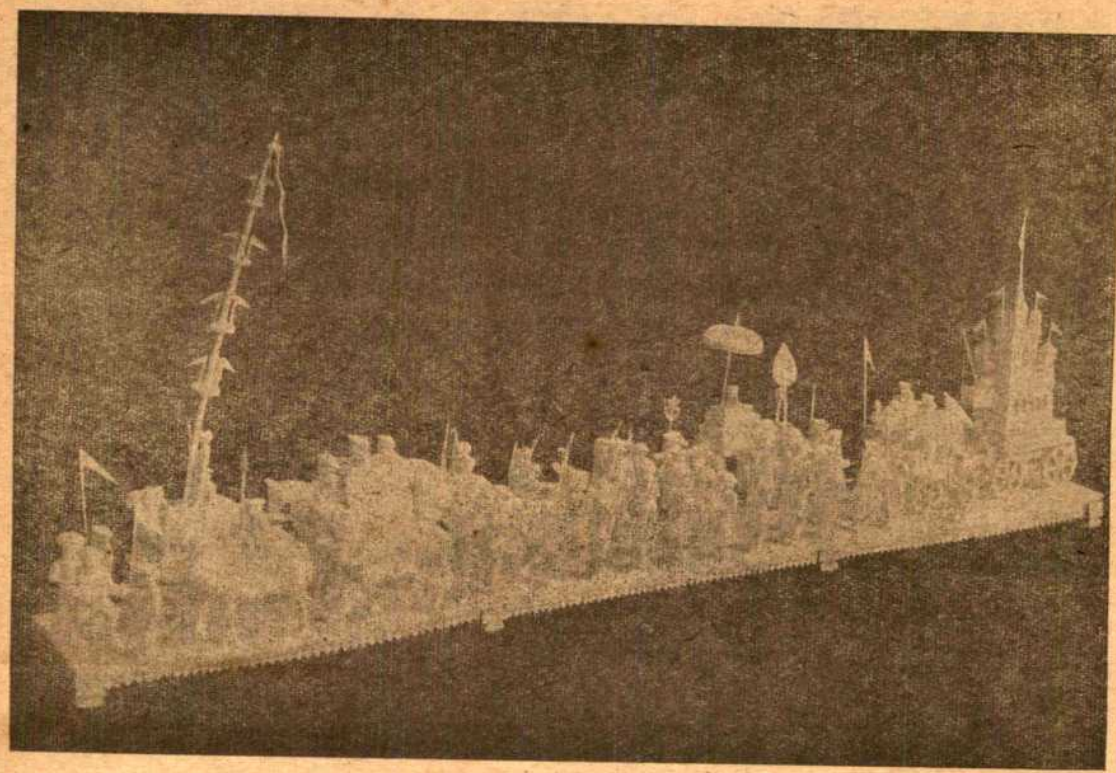

মুর্শিদাবাদের গজদন্তশিল্প। জগন্নাথের রথযাত্রা

উপকরণ হইতে পারে না। সুতরাং দেবমন্দিরে তাহার স্থান না থাকায়, গজদন্তনির্ম্মিত দ্রব্যাদি যত্নে রক্ষিত হয় নাই।

যদিও এদেশে প্রাচীন গজদন্তশিল্পের কোনও নিদর্শন নাই কিন্তু প্রাচীন গজদন্তশিল্পীর কার্য্যকুশলতার নিদর্শন আছে। সাঁচী-স্তূপের দক্ষিণ দিকের তোরণের অংশে ইহা লিখিত আছে যে ঐ অংশ "বিদিশানগরের গজদন্তশিল্পী-গণ কর্ত্তৃক ক্ষোদিত এবং উৎসর্গীকৃত" সুতরাং ঐখানে আমরা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের ভারতীয় গজদন্তশিল্পীর কারুকৌশলের নিদর্শন পাই। ব্রাহ্মণাবাদে প্রাপ্ত গজ-দন্তের 'দাবাবড়ে' খৃঃ ৮ম শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাই এদেশের ঐ শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন।

বর্ত্তমান সময়ে এদেশের নানাস্থানে হাতীর দাঁতের কাজ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে সিংহল, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, মান্দ্রাজ, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ এবং দিল্লী অঞ্চলের কাজ উৎকৃষ্ট।

ডাঃ কুমারস্বামীর মতে বৌদ্ধ সিংহল এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী। সেদেশে বুদ্ধ মূর্ত্তি হইতে গৃহদ্বারের অলঙ্কার পর্য্যন্ত নানা প্রকারের দ্রব্য এই পদার্থে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সে দেশের শিল্প ভারতীয় ভাস্কর্য্য প্রথার পরিমাপে অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই কিন্তু উড়িষ্যা বা মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের কাজ কারু-কৌশল হিসাবে উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হয়। সিংহলের কাজ প্রস্তর ভাস্কর্য্যের অনুরূপ, উড়িষ্যা মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের শিল্প দারু শিল্প এবং স্বর্ণ-রৌপ্য-কারের শিল্পের মধ্যবর্ত্তী, ইহাই আমার ধারণা।

শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ এই শিল্পে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও তাহার এতটা স্থানচ্যুতি ঘটে নাই কিন্তু বাঙ্গালীর শিল্প সম্বন্ধে স্বদেশ-প্রীতির অভাব বা বিদেশীর অনুকরণ-প্রবণতার দরুন এখন এ প্রদেশের গজদন্তশিল্প লুপ্তপ্রায়। ১৮৮৩ খৃঃ জয়পুর শিল্প-প্রদর্শনীতে মুর্শিদাবাদের লালবিহারী নামক

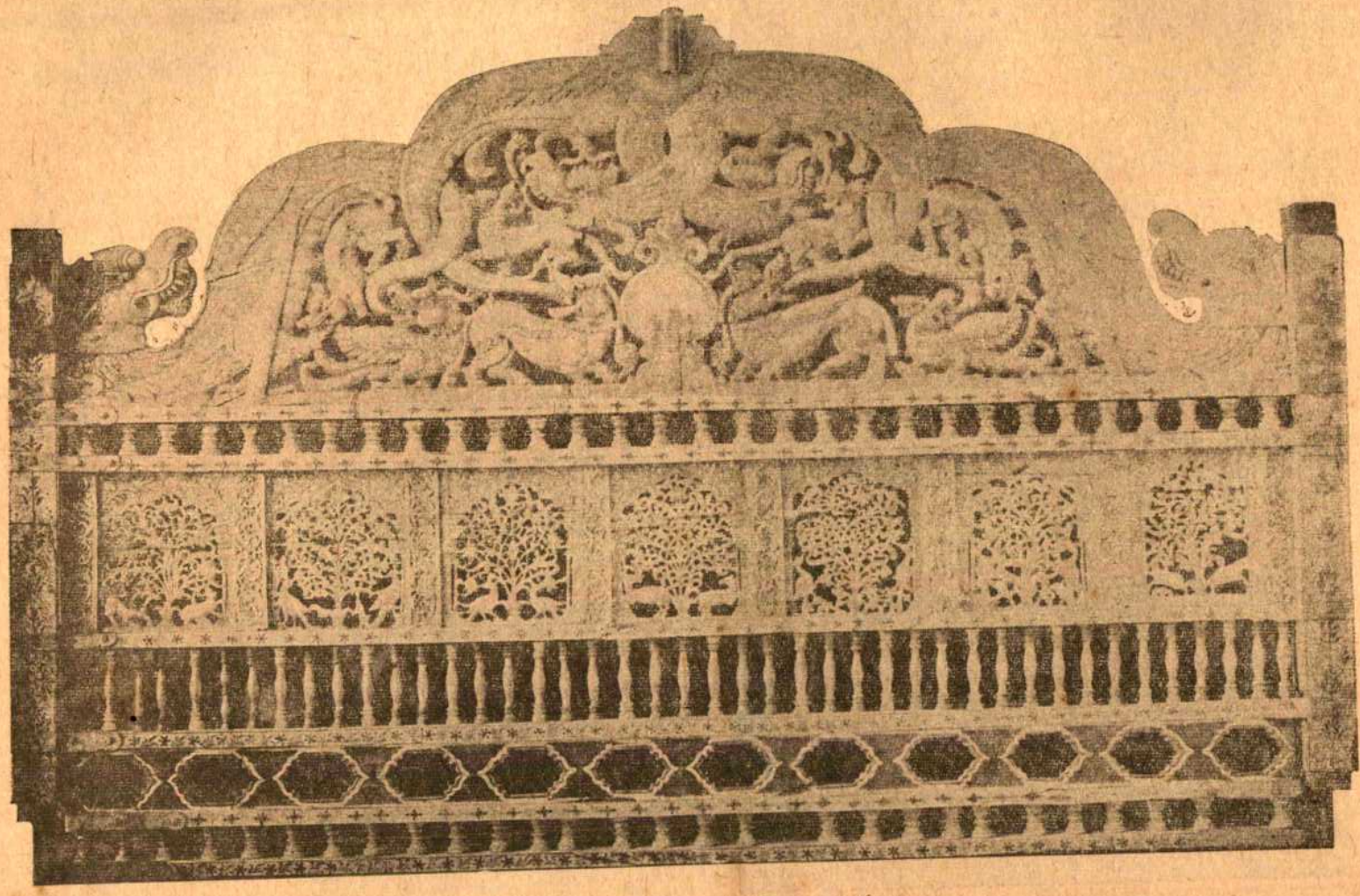

মহীশূরের প্রাচীন গজদন্ত শিল্পের নিদর্শন

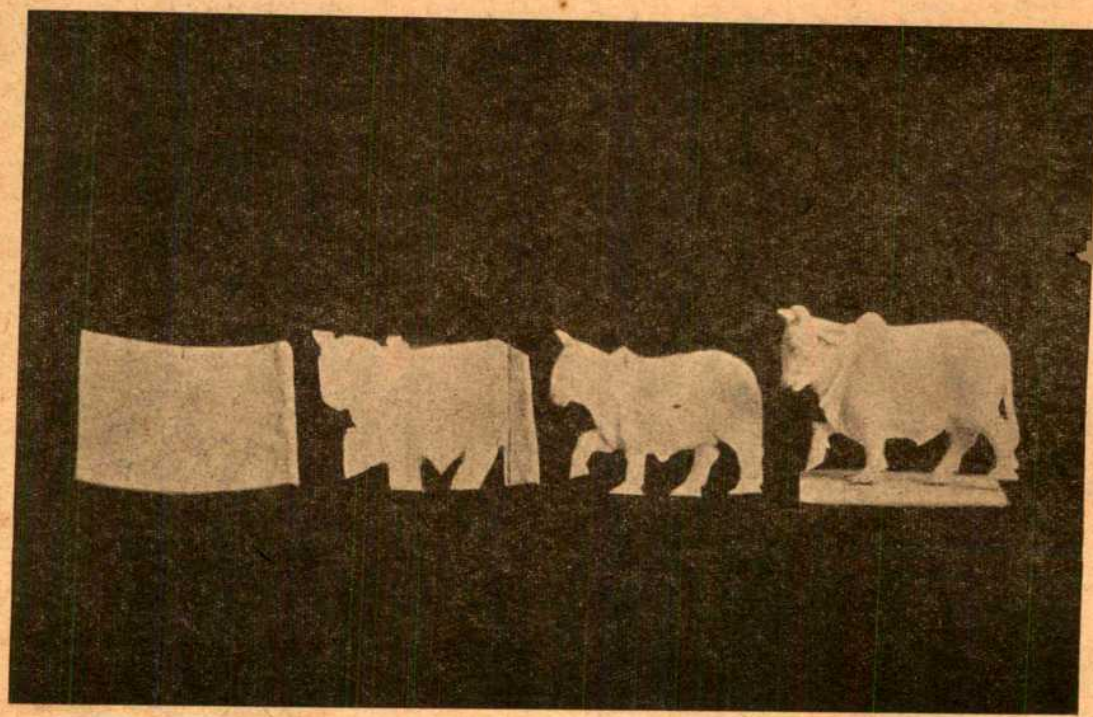

শিল্প-পদ্ধতি। খণ্ড কর্ত্তন, স্থূল আকারে পরিণতি, আকার দান, কারুকার্য্য শেষ।

শিল্পীর কাজ ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পুরস্কৃত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে এদেশে ও বিদেশে বহু প্রদর্শনীতে বঙ্গদেশের গজদন্তশিল্প অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করে। এখনকার কথা না বলাই ভাল। যাঁহারা এবিষয়ে জানিতে চাহেন তাঁহারা ১৩২০ সালের চৈত্রের প্রবাসীতে প্রকাশিত ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।

দক্ষিণ ভারতের শিল্প সেখানকার ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গের উৎসাহ দানের ফলে এখনও জীবিত আছে। উড়িষ্যার শিল্পের অবস্থা বিশেষ ভাল নহে। কিন্তু বাংলার মত শোচনীয় দুর্দ্দশা কোথাও হয় নাই।

অল্প দিন হইল দিল্লীতে এই শিল্পের খুব উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। বিদেশী ক্রেতার আদরে সেখানে অনেক শিল্পীর অন্নসংস্থান হইয়াছে। এবং এই সকল শিল্পীর মধ্যে বাঙ্গালী, শিক্ষক এবং নিপুণ কারিগরেরা কাজ করিতেছে।

শোনা যায় মুর্শিদাবাদের কোনও নবাব বিদেশ (সম্ভবতঃ পাটনা বা দিল্লী) হইতে গজদন্তশিল্পী এ প্রদেশে আনয়ন করেন। মুর্শিদাবাদের এক ভাস্কর তাহার নিকটে ঐ কার্য্য শিক্ষা করে। তাহার পুত্র তুলসী খাটুস্বর মুর্শিদাবাদ গজদন্তশিল্পের প্রাণদাতা। তুলসী সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে তিনি নবাবের আদর অনুরোধ এবং শেষে বাধা উপেক্ষা করিয়া পলাইয়া তীর্থ-ভ্রমণ করেন। তীর্থ যাত্রার খরচ নির্ব্বাহ এই নিপুণ শিল্পীর পক্ষে সহজ ছিল সামান্য যন্ত্রপাতির দ্বারা তিনি যাহা কিছু নির্ম্মাণ করিতেন তাহাই সর্ব্বজন-আদৃত এবং সহজেই বিক্রীত হইত। এইরূপে তিনি গয়া কাশী বৃন্দাবন ইত্যাদি দর্শন করিয়া শেষে জয়পুরে যান। সেখানকার মহারাজা তাঁহার শিল্পকলা-কৌশলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত এবং আদর যত্ন করেন। দীর্ঘ ১৭ বৎসর কাল প্রবাসে অতিবাহিত করিয়া তুলসী মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসেন।

উড়িষ্যার গোবিন্দরাম শিল্পীর নির্ম্মিত গোপাল মূর্ত্তি

পশ্চাৎ সম্মুখ

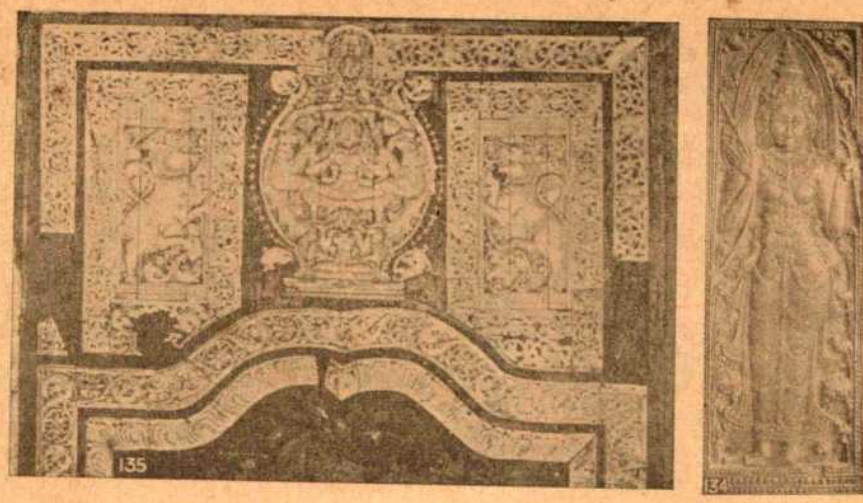

সিংহলের প্রাচীন গজদন্তশিল্প

তখন তাঁহার পূর্ব্বকার প্রভু নবাব গত। নূতন নবাব তুলসীর গুণের কথা শুনিয়াছিলেন সেইজন্য তুলসী ফিরিবা মাত্র দরবারে তাঁহাকে ডাকান হয়। নূতন নবাব তুলসীকে ভূতপূর্ব্ব নবাবের প্রতিকৃতি গজদন্তে নির্ম্মাণ করিতে বলেন। এই প্রতিকৃতি এত অবিকল হইয়াছিল যে নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তুলসীকে গত ১৭ বৎসরের বেতন দান করেন।

এই মহাগুণী শিল্পী ও তাঁহার শিষ্যবর্গের (তাঁহার আত্মীয়সকল) দ্বারা এ প্রদেশে গজদন্তশিল্পের এতই উৎকর্ষ সাধন হয় যে দিল্লীতে এখন তাঁহাদের বংশধরগণ, বংশের আদি গুরুর দেশে শিক্ষা ও দীক্ষা দান করিতে গিয়াছে। ইহা বঙ্গের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়, কিন্তু ইহাও সত্য যে এই সকল গুণী লোক নিজদেশে অনাদৃত হইয়া অন্নের কারণে বিদেশ যাইতে বাধ্য হইয়াছে।

শোনা যায় ত্রিপুরা শ্রীহট্ট ইত্যাদি পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে এখনো নিপুণ কারিগর আছে। তাহাদের কাজের নিদর্শন বাজারে দেখা যায় না, তাহাদের ঠিকানাও সাধারণে জানে না।

রংপুরে কুড়িগ্রাম অঞ্চলে পাঙ্গাগ্রামে কয়েক ঘর মুসলমান খোন্দকার পরিবার ছিল। তাহারা এককালে গজদন্তশিল্পে নিপুণ বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করে। এখন তাহাদের নামই শোনা যায় না।

এখন এদেশে গজদন্তশিল্পের যে বিশেষ অবনতি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ শিল্পীদের কারুকার্য্যে বিশেষ আড়ষ্টভাব আসিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে ক্রেতার অভাবে তাহারা তাহাদের শিল্পের ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে। দেব-দেবীর অসংস্কৃত মৃন্ময়মূর্ত্তির অনুকরণ, অল্প কয়েকটি সাবেকী সহজ আদর্শের গতানুগতিক অনুকরণ, সাধারণ খেলনা, চুড়ি আংটি ইত্যাদি, এই এখনকার শিল্পীর গণ্ডী। নূতন নক্সা বা নূতন প্রকারের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উৎসাহ বা জ্ঞান তাহার নাই, যদিও একথা বলা যায় না যে তাহার নৈপুণ্য বা কারুকৌশল লোপ পাইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় আদর ও অর্থোপার্জ্জনের পন্থা পাইলে এ বিষয়ে উন্নতি করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু সে উৎসাহ দান এবং অর্থোপার্জ্জনের পথনির্দ্দেশ করিবে কে?

মুর্শিদাবাদের শিল্পীর কাজের বিশেষত্ব তাহার সমস্ত কাজ একখণ্ড দন্ত হইতে প্রস্তুত করার চেষ্টা। খণ্ড-যোজনা দ্বারা শ্রম ও ব্যয় সংক্ষেপের সে পক্ষপাতী নহে। ইহাতে তাহার কাজ সুদৃঢ় এবং খাঁটি হয় এবং ইহা তাহার নৈপুণ্যেরও পরিচায়ক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ এবং কৌশলের সামান্য অভাব ঘটিলেই দ্রব্যটি আড়ষ্ট বা অন্য দোষযুক্ত হয়। যে শিল্পী (যথা

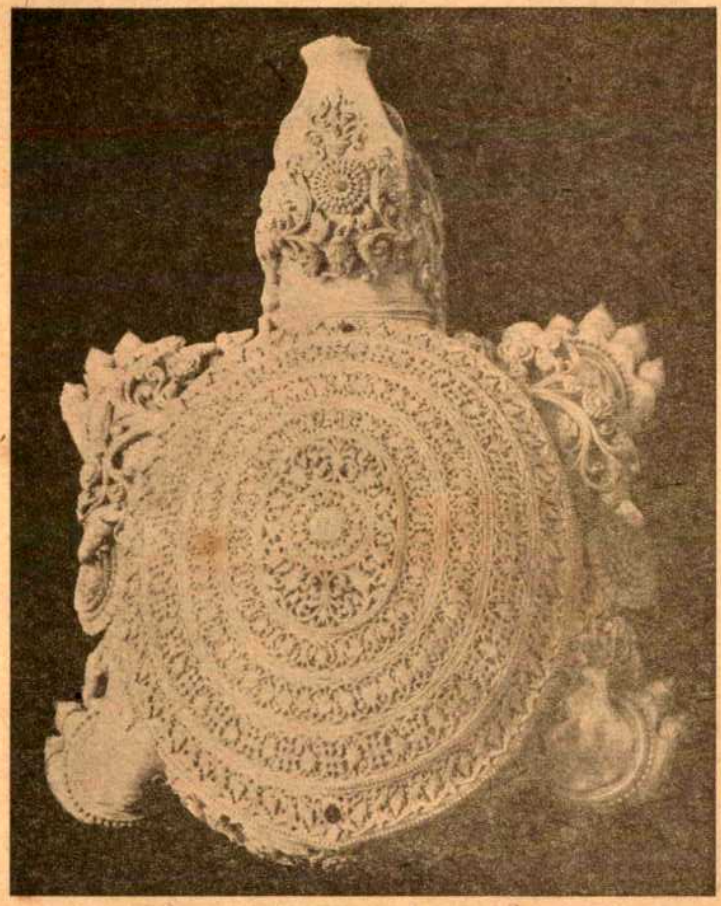

উড়িষ্যার প্রাচীন গজদন্তশিল্প

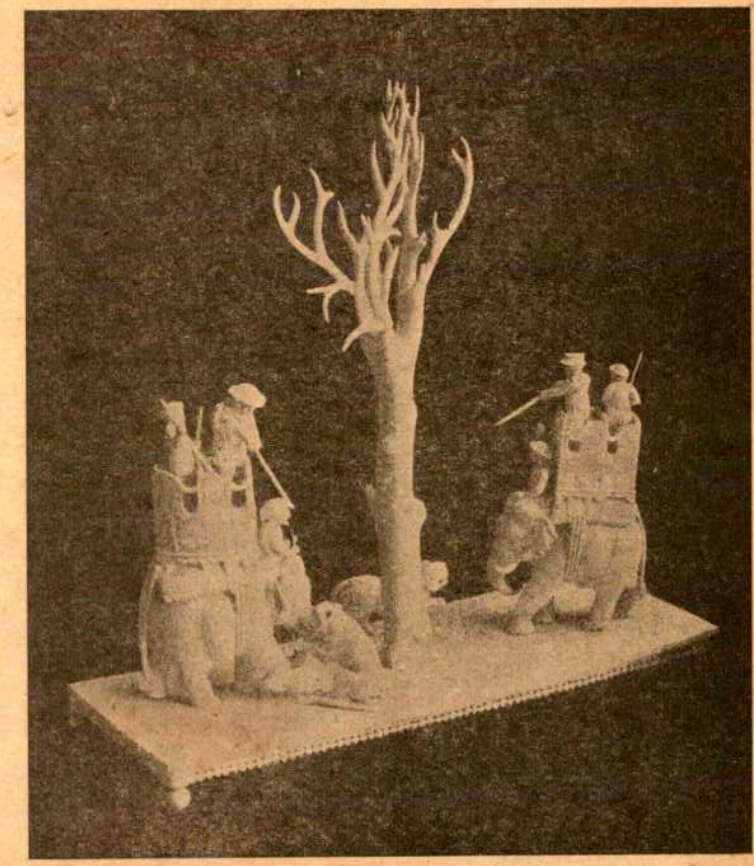

মুর্শিদাবাদের শিল্প। শিকার চিত্র

অন্যান্য প্রদেশের শিল্পী) খণ্ডযোজনা করে তাহার পক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড যোজনা করিয়া বৃহৎ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা সম্ভব। এবং এক খণ্ডে দোষ ঘটিলে তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য এক খণ্ড প্রস্তুত করিলেই চলে।

সুতরাং বঙ্গের গজদন্তশিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে এখানের কারিগরদিগকে প্রথমে আমাদের প্রাচীন শিল্পের অনুযায়ী নক্সা পরিকল্পনা ইত্যাদি শিখাইতে হইবে। তৎপরে, তাহাদের কারুকার্য্যপ্রথাও অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করাইতে হইবে। নূতন প্রকারের সৌখিন লোকের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি এবং বিদেশে আদৃত প্রাচীন দ্রব্যের নিপুণ অনুকরণ ইত্যাদিও আবশ্যক।

গজদন্তনির্ম্মিত কৌটা। ত্রিবাঙ্কুর

মূল কথা এই যে এখন একটি কারুশিল্প-বিদ্যালয় এবং একটি ব্যবহারিক শিল্পের স্থায়ী প্রদর্শনীর বিশেষ আবশ্যক। কেননা বিদেশীয় যন্ত্রাদি (যথা প্যাণ্টাগ্রাফ, নানা প্রকারের বুলি ও ক্ষোদন ছেদন, ছিদ্রকরণ ইত্যাদির যন্ত্রাদি) ব্যবহার শিক্ষা এবং এদেশের শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দর্শন ভিন্ন এই শিল্পের অবনতি রোধ করা সম্ভব হইবে না।

এখনকার শিল্পীর কার্য্যপ্রথা অতিশয় গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে একখণ্ড দাঁত মাপ অনুসারে কাটিয়া লইয়া তাহার উপর পেন্সিলের সাহায্যে নক্সা কাটা হয়। সেই নক্সার ধারায় বাটালির (রুখানি) দ্বারা মোটামুটি কাটিয়া ছাঁটিয়া দ্রব্যটি স্থূল আকৃতিতে আনিয়া, উকায় ঘষিয়া তাহাকে যথা আকারে পরিণত করা হয়। তাহার পর তুরপুন এবং বুলি (graver) বা কলম দ্বারা কাজ শেষ করিয়া, জিনিষটিকে ভিজা অবস্থায় মাছের আঁশ ও চা খড়ি দ্বারা পালিশ করা হয়। যদি কখন খণ্ড যোজন প্রয়োজন হয় যন্ত্র সাহায্যে খণ্ডগুলিতে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া হাতীর দাঁতের কীলক দ্বারা যোজনা করা হয়।

গজদন্তের স্বাভাবিক বর্ণই সাধারণতঃ বজায় রাখা হয়। কিন্তু কখন কখন লাক্ষা যোগে প্রস্তুত বর্ণ সাহায্যে ঐ সকল দ্রব্য রঞ্জন করা হইয়া থাকে। বিশেষে বাদ্য-যন্ত্রাদির অলঙ্কার এবং অঙ্গ-ভূষণ অলঙ্কারে ইহার ব্যবহার খুবই প্রচলিত। কখন কখন অন্য পদার্থের (যথা কচ্ছপ খোলস বা কাঁচকড়া) সঙ্গে ইহার যৌগিক ব্যবহার হয়। ভিজাগাপটম ও তাঞ্জোর এই প্রকার রঞ্জন ও কারু-কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

ত্রিবাঙ্কুর ও উড়িষ্যার শিল্পে এখনও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের ধারা বহিতেছে। মহীশূর সিংহল, বাংলা দেশ দিল্লী ইত্যাদিতে বৈদেশিক প্রভাব দেশীয় শিল্প-প্রথাকে গ্রাস করিয়াছে। ফলে ঐ সকল প্রদেশের গজদন্তশিল্পের বিশুদ্ধভাব আর নাই।

মহীশূরের প্রাচীন শিল্পের মৌলিকতা গিয়াছে, এখন বিদেশী ভাবাপন্ন 'রিয়ালিষ্টিক' পরিকল্পনা তাহার স্থানে অধিষ্ঠিত। এবং দিনে দিনে এইরূপে অলঙ্কার-সৌন্দর্য্য বাস্তবের ঠেলায় বিতাড়িত হইতেছে।

রাজপুতানায় জয়পুর, বিকানির, উদয়পুর এই সকল অঞ্চলে গৃহদ্বার ইত্যাদিতে গজদন্তের ব্যবহার প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহা মুঘল প্রথা অনুযায়ী অলঙ্কার কার্য্যের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদয়পুর বড়িপোল প্রাসাদে গজদন্তের এইরূপ ব্যবহারের উৎকৃষ্ট নিদর্শন আছে।

শয্যাসনে গজদন্তের ব্যবহার সম্বন্ধে বৃহৎসংহিতার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। কাশীনরেশের এইরূপ শুদ্ধ গজদন্তনির্ম্মিত এক প্রস্থ আসবাব ছিল। কোম্পানীর আমলের লুণ্ঠনকারী বিদেশী দস্যুদের হাতে তাহা পড়ে নাই কিন্তু ব্রিটিশ-শার্দ্দুল শ্রীল শ্রী লর্ড কর্জ্জন মহাশয় তাঁহার স্ত্রীর মারফৎ সংগ্রহ করেন। পরে তিনি দেশে

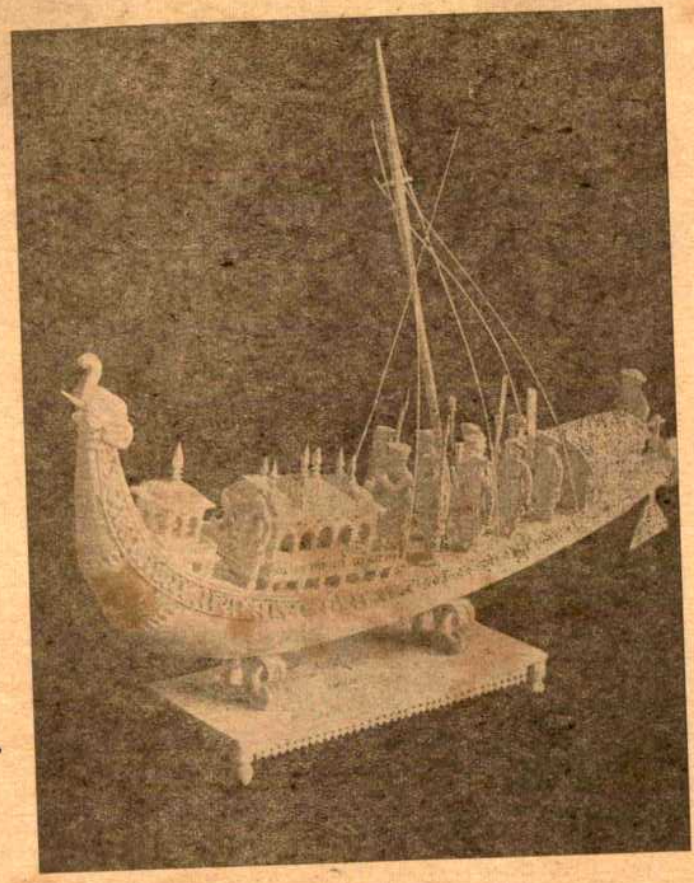

মুর্শিদাবাদ। বজরা

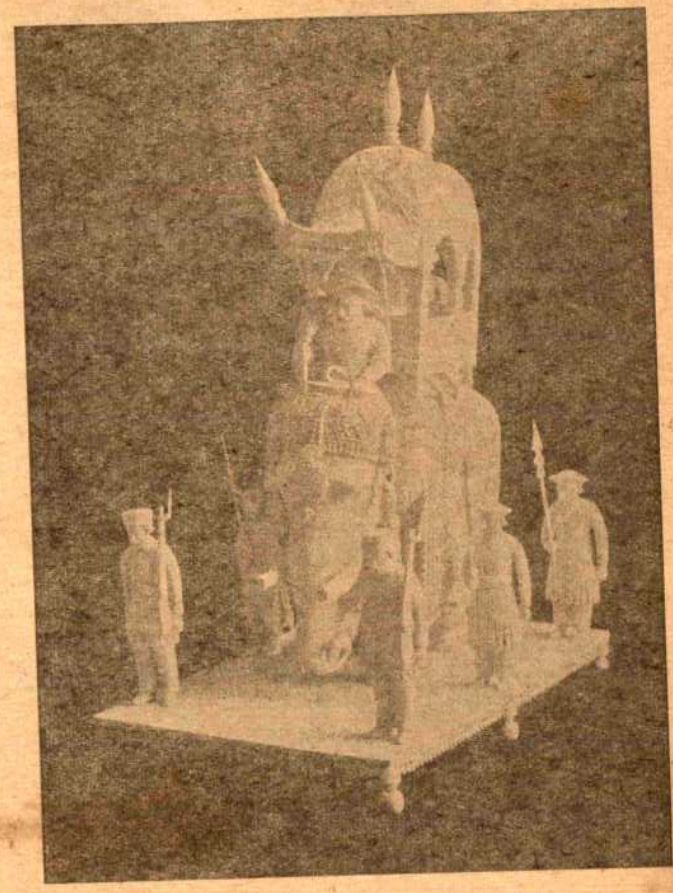

মুর্শিদাবাদ। শোভাযাত্রা

যাইবার সময় এগুলি লইয়া যাইবার চেষ্টাও করেন। কিন্তু তিনি ভুলক্রমে সে সকল আসবাব কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই কারণ তাহা ঐখানে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হয়েন। সে দুঃখ বোধ হয় তাঁর মরণ কালেও যায় নাই।

মুসলমানী যুগের অনেক অস্ত্রশস্ত্রে এই প্রকার পদার্থের ব্যবহার দেখা যায় যাহা সচরাচর মৎস্য-দন্ত (fish ivory) নামে পরিচিত। উহার মধ্যে কিছু সিন্ধুঘোটকের দংষ্ট্রা কিন্তু অধিকাংশই পুরাকালের অতিকায় হস্তীর (Mammoth) দন্ত। কিরূপে উহা এদেশে আসিল তাহা এখনো জানা যায় নাই। তবে চীন দেশে ঐ প্রকার গজদন্তের ব্যবহার বহুকাল হইতেই প্রচলিত। সাধারণতঃ ঐ প্রকারের গজদন্ত উত্তর সাইবিরিয়া অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইত।

প্রাচীন মিশর, অসুর ও বাবিল দেশ গ্রীস, রোম, ইত্যাদি প্রাচীন জনপদে গজদন্তের ব্যবহার সুপ্রচলিত ছিল। এখনও চীন ও জাপান স্থান-বিশেষতঃ চীন গজদন্তশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু এদেশের খ্যাতি অন্য সকল দেশ অপেক্ষা অধিক ছিল এবং তাহা অকারণে নহে। এদেশের প্রস্তরশিল্পী ভাস্করের কারুকৌশল ও শিল্পনৈপুণ্য যে কারণে বিখ্যাত এককালে এখানের গজদন্তশিল্পীর খ্যাতিও সেই কারণে ভুবন বিস্তারিত হয়।

আবার ভারতভূমির মধ্যে বঙ্গদেশ তাহার শিল্পী সন্তানদিগের মেধা ও পরিকল্পনার চাতুর্য্যে এই শিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করে।

১৮৬৪ খ্রী পাঞ্জাব শিল্প প্রদর্শনীর বিচারকগণের মন্তব্য হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল—

"The East has long been famed for its ivory manufacturers. From the earliest times of which we have any record, India has not only had a sufficiency of ivory for its own requirements but a large surplus for exportation. It is not improbable that cargoes of ivory from the West of India. with the Gold of Ophir were carried in ships of Tarshish to decorate the palace and temple of Solomon. From the presence of this valuable material in such abundance and the luxurious tastes of the Princes and nobles who successively surrounded themselves with all that skill could produce and wealth command, *it is natural that India should produce the most cunning workers in ivory.* This has been to a certain extent the case, *but the skill attained in the art has been chiefly confined to certain localities such as the neighbourhood of Murshidabad in Bengal* and has not been co-extensive with the distribution of the material."

"প্রাচ্যদেশ চিরকালই তাহার গজদন্তশিল্পের জন্য বিখ্যাত। ইতিহাসের প্রারম্ভকাল হইতে ভারতবর্ষে তাহার নিজের প্রয়োজনপূরণের জন্য যথেষ্ট, উপরন্তু রপ্তানীর জন্য প্রচুর পরিমাণ গজদন্ত উৎপন্ন হইত। ইহা অসম্ভব নহে যে, পশ্চিম ভারত হইতে গজদন্ত ওফিরজাত স্বর্ণের সহিত, তারশীশের নৌবাহিনী যোগে সলোমানের প্রাসাদ ও মন্দিরের শোভা বর্দ্ধনের জন্য যাইত। এই মহার্ঘ্য বস্তুর প্রাচুর্য্য এবং এই দেশের রাজন্য ও অভিজাতবর্গের বিলাসপ্রবণতা, যাহার দরুন ঐ সকল ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে নিজেদের চারিপাশে ঐশ্বর্য্য ও কারুকৌশলে লব্ধ সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি একত্র করিয়াছিলেন, ইহাতে ভারতবর্ষ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকৌশলী গজদন্তশিল্পী উৎপাদন করিবে ইহা স্বাভাবিক মাত্র। ব্যাপারও ইহাই ঘটিয়াছে কিন্তু এই শিল্পে অত্যধিক কৌশল স্থানবিশেষেই দেখা যায় **যথা বঙ্গদেশে মুর্শিদাবাদ অঞ্চল**, এবং তাহা কেবলমাত্র গজদন্তের প্রাচুর্য্যের অনুপাতে ঘটে নাই।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এক কাল ছিল যখন গজদন্তশিল্পে কারুকৌশলের উদাহরণ দিতে হইলেও মুর্শিদাবাদের নামই প্রথমেই আসিত। এখন এ বিষয়ে কিছু বলিতে হইলে এইমাত্র বলা চলে—

তে হি নো দিবসা গতাঃ।

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ইনভেটা

॥ ১ ॥

স্বর্ণেন্দু, এখানকার বাস আমার উঠল।

এখানে আজই আমার শেষরাত্রি—শেষরাত্রিরও সবটুকু নয় কারণ রাত্রি শেষ হবার আগেই রওনা হতে হবে।

মনে পড়ছে এই ত সেদিন এমনি এক রাত্রিশেষেই চিরদিনের পরিচিত গৃহকোণটি ছেড়ে এক অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের সন্ধানে পথে এসে পা দিয়েছিলাম। এবং আশ্চর্য ভাবেই আজকের এই আশ্রয়টি পেয়ে গিয়েছিলাম।

মনে হয়েছিল, বাঁচলাম—নিশ্চিন্ত হলাম।

কিন্তু বিধাতা পুরুষ বোধহয় অলক্ষ্যে বসে হেসেছিলেন—তাই পুরো পাঁচটা বছরও গেল না—আবার আজ রাত্রে সেদিনকার মত এক অনির্দিষ্ট পথে পা বাড়াতে চলেছি। আর মজা কি জান—সেদিন আমার ঘর ছাড়ার পিছনে যাদের কুটিল জঘন্য চক্রান্ত ও নীচতা ছিল আজও ঠিক তারাই আমাদের ঘর ছাড়া করল।

পথে আবার বেরুতে বাধ্য করল।

কিন্তু বলতে পার স্বর্ণেন্দু, আজ যে মানুষের মনের একটা দিক মহাশূন্যপথে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে যাতায়াতের স্বপ্ন দেখছে তাদেরই মনের অন্য দিকটায় এত অন্ধকার কেন?

নীচতার কুশ্রীতার এমন হলাহল ফেনিয়ে ফেনিয়ে ওঠে কেন।

অবিশ্যি তোমাকে আমি সেই দলে টানছি না।

তুমি ত তাদের মধ্যে থেকেও কলুষিত নও—তাদের মধ্যে থেকেও তাদের কেউ নও—তাই ত অকুণ্ঠ ধন্যবাদ—অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা তোমার প্রতি আমার যেমন চিরদিন আছে তেমনি থাকবেও চিরদিন।

সমস্ত মানুষের প্রতি আমার সমস্ত অবিশ্বাস-অশ্রদ্ধার মধ্যে তুমিই যে আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

সমস্ত মিথ্যার মধ্যে একমাত্র সত্য।

তাই যতদূরে যেখানেই যাই না কেন ধ্রুবতারার মত তোমারই দিকে যে একমাত্র তাকিয়ে আছি সর্বক্ষণ।

কুন্তী তার কোয়ার্টারে বসে চিঠিটা লিখছিল।

রাত অনেক হয়েছে।

অদূরে শয্যায় শুয়ে চার বছরের মেয়ে সীতা ঘুমাচ্ছে। এমন ছটফট করে সারারাত রাত মেয়েটা ঘুমের মধ্যে—কিছুতেই গায়ে লেপটা রাখে না।

কেবলই সরে সরে যায়—

আর কুন্তীর ঐ এক কাজ—সেই লেপ টেনে টেনে ঠিক করে দেওয়া। আশ্চর্য—মেয়েটার শীত বোধও যেন তেমন নেই।

দিব্বি উদালা গায়ে এই শীতের মধ্যেও ঘুমিয়ে থাকে।

এই কয়দিন ধরে আবার কি প্রচণ্ড হয়েই না শীতটা পড়েছে। গতকাল ও পরশু কুন্তী ত স্পষ্টই দেখেছে—বাইরে ঐ মাঠের ঘাসের উপর পাত্‌লা কাচের মত বরফ জমে আছে।

এই ঘরের পশ্চিম দিককার জানালার কাচ দুটো সীতা কয়েকদিন আগে খেলতে খেলতে কেমন করে যেন ভেঙ্গে ফেলেছে—সেক্রেটারী নীলমাধববাবুকে জানায় নি কথাটা কুন্তী—

জানায় নি তার কারণ প্রথমতঃ সে ত চলেই যাচ্ছে আর দ্বিতীয়তঃ নীলমাধববাবু হয়ত কয়েকটা বাঁকা বাঁকা কথা শুনিয়ে দিতেন।

ফাটা আর ভাঙ্গা জানালার কাচের মধ্যে দিয়ে হিমতীক্ষ্ণ হাওয়ার একটা প্রবাহ ঘরের মধ্যে এসে ঢুকছে।

জানালার পর্দাগুলো পর্যন্ত নেই—বিকেলেই সেগুলো খুলে বাক্সের মধ্যে ভরে দিয়েছিল কুন্তী।

সীতার গায়ের লেপটা আবার সরে গিয়েছে।

কুন্তী হাতের কলমটা টেবিলের 'পরে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

লেপটা সীতার গায়ে টেনে দিয়ে আবার এসে চেয়ারটায় বসল।

আপনা থেকেই যেন ঘরের চারিদিকে আবার নজর পড়ে কুন্তীর—ফিরে ফিরে তাকায় ঘরের চারিদিকে।

প্রায় দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এই ঘরটিতে সে আছে।

এক-আধ দিন ত নয়—দীর্ঘ পাঁচ পাঁচটা বছর।

কালও ছিমছাম ছিল সমস্ত ঘরটা—যেই যখন তার ঘরে এসে পা দিয়েছে বলেছে, তোমার ঘরের মধ্যে পা দিলেই কি মনে হয় জান কুন্তীদি—

কি—

এ ঘরের প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে একটা সযত্ন পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সঙ্গে একটা মমতা জড়িয়ে আছে—

আঃ, মেয়েটা আবার গায়ের লেপটা ফেলে দিয়েছে।

কুন্তীকে আবার উঠতে হ'ল—আবার সীতার গায়ের লেপটা ঠিক করে দিল। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ান চুলগুলো কপালের 'পরে গালের 'পরে এসে পড়েছে, সযত্ন মমতায় এলোমেলো চুলগুলো সীতার ঠিক করে দিল কুন্তী।

অদ্ভুত একটা আল্‌গা শ্রী আছে মেয়েটার মুখে।

মায়ের রঙ পায় নি বটে তবে মা'র বাঁ-গালের তিলটা আছে—ঠিক বাঁ-গালেই সীতার।

কালো-তিলটা।

আবার টেবিলের সামনে এসে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল কুন্তী।

গোছগাছ যা করবার সবই করে রেখেছে বিকেলে। সাঈদা এসেছিল তাকে সাহায্য করবার জন্য। তার সাহায্যেই গোছগাছ সব সেরে রেখেছে কুন্তী।

ঐ সাঈদা মেয়েটি বড় ভাল।

মেয়েটার মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা যেন মর্যাদাবোধ আছে।

মুসলমানের মেয়ে—স্বামীটা একটা দুশ্চরিত্র মাতাল—কবে বছর চারেক আগে ওর বয়স যখন মাত্র নাকি আঠের কি উনিশ তখনই তালাক হয়ে গিয়েছিল।

তারপর আবার ইচ্ছা করলেই হয়ত সাঈদা বিয়ে করতে পারত—বিশেষ করে ঐ ইসমাইল ছেলেটিকে কিন্তু করে নি।

করবেও না কোনদিন।

অথচ ইসমাইল ছেলেটি সত্যিই ওকে ভালবাসে।

দেখতেও কালোর উপর মোটামুটি মন্দ নয়—চাকরি-বাকরি করে না, কলকাতা শহরে নিজের কাঠের ক্যাবিনেটের ব্যবসা আছে পার্ক ষ্ট্রীট না কোথায়।

বেশ ফলোয়া ব্যবসা।

দু' বছরের উপর ওর পিছনে পিছনে ঘুরছেও ছেলেটা।

অত্যন্ত ভদ্র, বিনীত।

কিন্তু সাঈদা বলে, পুরুষ জাতটাকে আর আমি বিশ্বাস করি নি কুন্তীদি—

শুধিয়েছিল কুন্তী, কেন রে?

না—বিশ্বাস করি না—

সবাই ত আর মনসুর সাহেব হয় না? কুন্তী বলেছিল।

সবাই তাই—সবার মুখেই একটা করে মুখোশ।

কিন্তু ও তোকে সত্যিই ভালবাসে সঈদা।

সঈদা বলেছিল, ওটা কেতাবী কথা—গল্পের কথা। শুনতেই ভাল লাগে—সত্যিকারের জীবনে ওর কোন মূল্য নেই—

ইচ্ছা হয়েছিল সে সময় কুন্তীর সে বলে, না রে, না—তুই জানিস না তাই বলছিস—আছে রে, ভালবাসা আছে—ও বস্তুটা না থাকলে পৃথিবী এতদিন অরণ্যে পরিণত হ'ত—মরুভূমি হয়ে যেত।

কুন্তী আবার কলমটা তুলে নেয়—চিঠিটা শেষ করবার জন্যই বোধ করি।

সাঈদা বিশ্বাস হারিয়েছে তাই ওর বিশ্বাস নেই কিন্তু আমি বিশ্বাস করি স্বর্ণেন্দু—

ভালবাসা আছে—

আর ভালবাসা আছে বলেই আজও আমি বেঁচে আছি—

আমার সীতা বেঁচে আছে।

আর ভালবাসা না থাকলে এত বড় জোর তোমার 'পরে খাটাতাম কি করে আমি।

তাই মেয়েটার জন্য সত্যি দুঃখ হয় আমার।

বড় সরল, বড় সহজ মেয়েটা—কিছুটা বোধ করি ঐ কারণে নির্বোধও।

আশ্চর্য।

দেখ আমার দুঃখের শেষ নেই। আমি সাঈদার দুঃখের কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলে চলেছি তোমার কাছে।

অনেক দিন পরে এই চিঠি তোমাকে আমি লিখছি—

তা বোধ করি বছরখানেক ত হবেই—কি বল!

সেই যেবার তুমি বাঁকুড়ায় বদলী হয়ে যাও—আমার চিঠিটা ঘুরতে ঘুরতে তোমার বাঁকুড়ার নতুন ঠিকানায় গিয়ে পৌঁচেছিল।

কে জানে এক বছর বাদে আবার চিঠি দিচ্ছি—তুমি আজও বাঁকুড়ায়ই আছ কি না—যদি নাই থাক—আবার হয়ত আমার আগেকার চিঠিটার মতই ঘুরতে ঘুরতে তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছাবে।

সেই পুরানো কথাটা আজ আবার যদি বলি রাগ করবে না ত—

রাগ করো না—লক্ষ্মীটি—

এবারে একটা বিয়ে কর।

বিশ্বাস কর, সত্যিই সংবাদটা পেলে আমি খুশি হব। এবং আমার চাইতে খুশি আর কেউ হবে না জেন।

আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কেন তুমি জড়িয়ে থাকবে সারাটা জীবন এমনি করে—

যে দুর্ভাগ্যের কোন অন্ত নেই—কোনদিন শেষ হবে না—তার জন্য তুমি কেন এমনি করে একক জীবনযাপন করবে।

এতে যে আমার বড় লজ্জা করে।

মা—

চম্‌কে ফিরে তাকাল কুন্তী।

কখন সীতা শয্যার উপর উঠে বসেছে—ওরই দিকে চেয়ে আছে।

একটু জল খাব মা—

কুন্তী আবার কলমটা রেখে উঠল।

পাশেই টেবিলের 'পরে কাচের গ্লাসে জল ঢাকা ছিল—জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে সীতার সামনে ধরতেই সীতা নিজেই ছোট ছোট দু'হাতে গ্লাসটা ধরে এক চুমুকে অনেকটা জল খেয়ে আবার নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে বোধ করি ঘুমিয়েও পড়ল।

টেবিলের 'পরে রক্ষিত ঘড়িটার দিকে তাকাল কুন্তী—রাত মাত্র পৌণে দুটো।

ট্রেনের এখনও প্রায় তিন ঘণ্টারও বেশী দেরি আছে।

ট্রেনটা ভোর পাঁচটা দশে।

ষ্টেশন অবিশ্যি এখান থেকে মাইল দেড়েক মত হবে এবং বেরুতেও হবে সাড়ে চারটে নাগাদ, নচেৎ ট্রেনটা ধরা মুশকিল।

টিকিট কাটার ব্যাপার আছে—জিনিষপত্রও সঙ্গে একেবারে যে নেই তাও নয়।

এর আগের বার ত ছোট একটা সুটকেশ ছাড়া কিছুই ছিল না।

সেই সুটকেশ ও দুই মাসের সীতাকে নিয়ে এখানে এসে অনীতার ওখানে উঠেছিল।

অনীতা ত ওকে দেখে অবাক্।

সঙ্গে আবার দুই মাসের শিশু সীতা—

সীতা অবিশ্যি তখনও ওর নামকরণ হয় নি—খুকীই ছিল ওর নাম।

এখানে অনীতার স্বামী ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার ও জানত।

অনীতার স্বামী প্রভাস সেদিন অবিশ্যি বাড়ীতে ছিল না। টুরে গিয়েছিল।

॥ ২ ॥

রাত তখন প্রায় চারটে হবে।

সেও এমনি একটা কন্‌কনে শীতের শেষ রাত। পৌঁছাবার কথা রাত দেড়টায় কিন্তু ট্রেনটা লেট করে পৌঁচেছিল প্রায় তিনটের সময়।

একবার মনে হয়েছিল ঐ রাত্রে, ঐ সময় কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে যাওয়া ঠিক উচিত হবে না—কিন্তু দু'মাসের কচি বাচ্চাটা সঙ্গে—ওয়েটিং রুমের দরজাটাও কিছুতেই খোলান গেল না—অনন্যোপায় হয়েই তখন একটা

সাইকেল রিক্‌শা ভাড়া করে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হয়েছিল অনীতার বাসায়। দরজা-জানালা বন্ধ—শীতের রাত, সবাই ঘুমে অচেতন।

রিক্‌শাওয়ালাটা অনেক ডাকাডাকি করবার পর চাকরে এসে দরজা খুলে দেয়।

চাকরটাও অবাক্—কে রে বাবা এই শীতের রাত্রে একটা বাচ্চাকে নিয়ে সাধারণ বেশে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের বাড়ীতে এল।

অবিশ্যি অবাক্ হবারই কথা চাকরটার।

অতি সাধারণ বেশেই গৃহ ত্যাগ করে এসেছিল কুন্তী।

সাধারণ একটা মিলের কালো পাড়

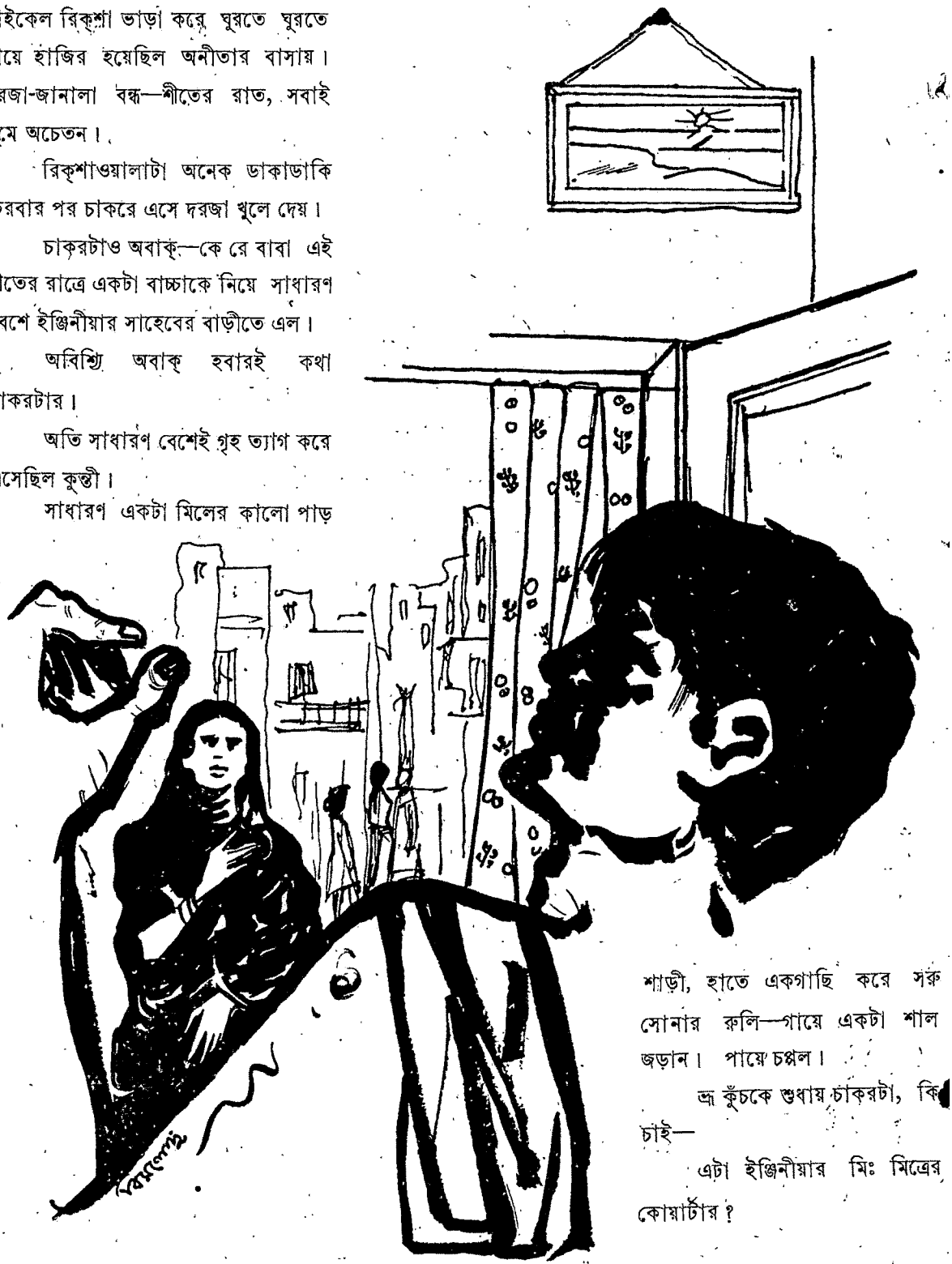

ভ্রূ কুঁচকে শুধায় চাকরটা, কি চাই—

শাড়ী, হাতে একগাছি করে সরু সোনার রুলি—গায়ে একটা শাল জড়ান। পায়ে চপ্পল।

ভ্রূ কুঁচকে শুধায় চাকরটা, কি চাই—

এটা ইঞ্জিনীয়ার মিঃ মিত্রের কোয়ার্টার?

হ্যাঁ—কিন্তু সাহেব ত বাসায় নেই—

কেউ নেই আর বাসায় ?

আছেন—মেমসাহেব আছেন—

রিক্‌শাওয়ালার ডাকাডাকিতে আগেই অনীতার ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়েছিল—সেও বাইরের ঘরে এসে প্রবেশ করে।

কে রে বিশু ?

অনীতার গলার সাড়া পেয়ে ভৃত্য বিশ্বনাথ ও সেই সঙ্গে কুন্তীও ঘুরে তাকায়।

প্রথমটায় চট্ করে অবিশ্যি চিনতে পারে নি অনীতা—কুন্তীকে দেখে।

মাথায় ঘোমটা শাল জড়ান বুকে শিশু—তা ছাড়া দেখা প্রায় বছর চারেক বাদে। সেই যে চার বছর আগে আই. এ.—পড়তে পড়তেই বিলাত-ফিরত ইঞ্জিনীয়ার প্রভাস মিত্রের সঙ্গে অনীতার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, তারপর ত আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি।

কে ?

কুন্তীও চেয়ে ছিল অনীতার মুখের দিকে।

শাড়ীর উপরে স্লিপিং গাউন জড়ান—এবং চার বছরে বেশ মুটিয়েছিল অনীতা—

অনীতা—

কে—কুন্তী চৌধুরী না !

হ্যাঁ—চিনতে পেরেছিস !

নিশ্চয়ই—কিন্তু—

সব কথা বলব—ঠাণ্ডায় বাচ্চাটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে—যদি একটু গরম জলের ব্যবস্থা করতে পারিস—

নিশ্চয়ই—আয়—

অনীতার শোবার ঘরটা বেশ গরমই ছিল।

সেই ঘরে ঢুকে অনেকটা সুস্থ বোধ করে কুন্তী। তারপর গরম জলে বাচ্চাটাকে সেক দিয়ে একটু গরম হরলিকস্ খাইয়ে নিশ্চিন্ত হয়।

অনীতার নির্দেশেই কুন্তী বাচ্চাটাকে শয্যায় শুইয়ে দেয়।

তারপর দু'জনে দু'কাপ গরম গরম চা নিয়ে মুখোমুখি বসে।

—তারপর বিয়ে করলি কবে ?—কত্তাটি কোথায় ?

অনীতার প্রশ্নে মুখ তুলে তাকাল কুন্তী। বললে, বিয়ে ?

—হ্যাঁ—

—কোথায় আর সে সৌভাগ্য হ'ল ভাই—

—তবে ?

—কি তবে ? ঐ বাচ্চা—অবিশ্যি ও আমারই বাচ্চা।

কথাগুলো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যে অনীতার মুখখানা গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠেছিল কেমন, সেটা কুন্তীর দৃষ্টি এড়ায় নি।

কুন্তী বলে, খুব বিশ্রী শোনাল ব্যাপারটা ত—ঘৃণাও নিশ্চয় হচ্ছে আমার 'পরে—

ঘৃণা—

হ্যাঁ—ঘৃণা হচ্ছে না! বিয়ে হয় নি অথচ বাচ্চা—মা হয়ে গেলাম।

অনীতা একেবারে চুপচাপ, মুখে কোন কথা নেই।

কুন্তী মৃদু হেসে বলে, ভয় নেই ভাই—তোকে বিব্রত করবার জন্য আসি নি—একটা বা দুটো দিনের বেশী থাকব না। আর থাকা উচিতও হবে না—

অনীতার মুখে তথাপি কোন কথা নেই।

কেমন করে যেন চেয়ে আছে অনীতা কুন্তীর মুখের দিকে।

কুন্তী বলেছিল, মিথ্যা একটা বানিয়ে অনায়াসেই তোর কাছে বলতে পারতাম। অনীতা—কিন্তু তাতে করে না আমার, না আমার মেয়ের সম্মান বাড়বে—তাই সত্যটাই বলেছি। যদিও আমার বিবাহ হয় নি তবু খুকী আমারই মেয়ে—কিন্তু আসল কথাটাই তোকে এখনো বলা হয় নি রে—

কি!—সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় অনীতা কুন্তীর মুখের দিকে।

এম. এ. পাশ করেছি—বাড়ীতে জায়গা হ'ল না—ঠিক হ'ল না যে তাও নয় সবটা সত্যি, বিব্রত করতে চাই নি আমার জন্য কাউকে তাই একটা চাকরির সন্ধানে বের হয়েছি—

চাকরি?

হ্যাঁ—

অনীতা তখনো কেমন যেন সংশয়ভরা দৃষ্টিতে কুন্তীর মুখের দিকে চেয়ে আছে।

হঠাৎ মৃদু হেসে বলেছিল সে সময় কুন্তী, নিশ্চয়ই অনেক কথাই তোর মনে হচ্ছে না অনীতা—ভাবছিস ব্যক্তিটি কে—ব্যক্তিটি কিন্তু একেবারে রাস্তায় ভিক্ষুক নয়—কমপিটেটিভ্ পরীক্ষা দিয়ে ভাল চাকরিও করছে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই—

মানে—

মানে তার মত হচ্ছে, বিয়েতে তার আপত্তি নেই কিন্তু ঐ খুকীকে বাদ দিয়ে। কি আব্দার বল ত, খুকী কি দোষ করল! তাই—খুকীকে নিয়ে আমি সরে এলাম—

বলিস কি—

তাছাড়া কি আর করতে পারতাম, বল!

অত বড় একটা Scoundrel-কে অমনি অমনি ছেড়ে দিলি!

দিলাম, জোর করে কি কাউকে কেউ বেঁধে রাখতে পারে, না সে বাঁধন টেকে—

তারপর—

কি তারপর?

তোর মেয়ের পরিচয় কি হবে?

কেন, আমার পরিচয়ই হবে তার পরিচয়—

পাগল—মায়ের পরিচয়ে কোন সন্তান আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে কি পরিচিত হয়েছে?

তা এখন কি করব—পরিচয় যে দেবে না তার পায়ে গিয়ে মাথা খুঁটতে হবে নাকি।

কিন্তু—

রক্ষে কর বাবা—কুন্তী চৌধুরী তার মধ্যে নেই—

অনীতা খুব খুশী না হতে পারলেও পরের দিন প্রভাস মিত্র এসে সব শুনে কিন্তু বললে, এই ত চাই—I appreciate your courage Miss Chaudhury—শুনুন—এখানকার মেয়ে স্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গে আমার বিশেষ জানা-শোনা, হৃদ্যতা আছে, তাকে বলে দেখি আপনার একটা কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না।

ভাগ্য ভাল কুন্তীর ছিল বলতেই হবে। চাকরি একটা ছিল, হয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

শুধু একটু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল কুন্তীকে সেদিন।

কুন্তী চৌধুরী নয় মিসেস কুন্তী সান্ন্যাল।

কিন্তু সে মিথ্যা শেষ পর্যন্ত টিঁকল না।

কুৎসিত ভাবে একদিন সবকিছু প্রকাশ পেয়ে গেল—

পাঁচ বছর ধরে মিথ্যার আড়ালে থেকে সত্যটা প্রকাশ পেয়ে গেল।

সেক্রেটারী বললেন, এরপর আর ত আপনার এখানে স্থান হতে পারে না, মিসেস্ সান্ন্যাল—

কুন্তী কোন জবাব দেয় নি—

মিটিং থেকে উঠে চলে এসেছিল এবং পরের দিন রেজিগনেশন লেটার একটা লিখে পাঠিয়ে দিল।

জান স্বর্ণেন্দু, তোমাকে সেদিন জানাই নি—এবং না জানিয়েই তোমার পদবীটা মাথায় তুলে নিয়ে সিঁথিতে দিয়েছিলাম সিন্দূর।

কিন্তু কি হ'ল—

এরা শেষ পর্যন্ত সেটা বিশ্বাস করল না—পাঁচ বছর বাদে স্পষ্ট জানিয়ে দিল সেটা মিথ্যা—অবিশ্যি জানতাম তোমাকে ডাকলে তুমি নিশ্চয়ই আমার পাশে এসে আজ দাঁড়াতে—সীতার পিতৃত্বকে সস্নেহে স্বীকৃতি দিতে কিন্তু তুমিই বল—তাই কি আমি পারি।

ছিঃ—

রাত শেষ হয়ে এল নাকি—

টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল কুন্তী।

না, এখনো অন্ধকার আকাশের গায়ে লেপটে আছে। সপ্তর্ষী আকাশে জ্বল জ্বল করছে।

ফিরে এল আবার টেবিলের সামনে।

ঘড়িতে সোয়া তিনটে।

ট্রাঙ্ক ও সুটকেশটা গোছানই আছে কেবল বেঁধে নিতে হবে বিছানাটা। তাও কুন্তী কারো সাহায্য না নিয়েই বেঁধে নিতে পারবে।

একা হলে কথা ছিল না কিন্তু সীতা বিছানাটা বেঁধে ফেললে ঘুমাত কি করে।

সাঈদা অবিশ্যি বলেছিল, একটা রাত কুন্তীদি, তুমি ত আমার ঘরে গিয়েও থাকতে পার, চল না—সাঈদার কোয়ার্টারে গিয়ে যে শেষ রাতটা কাটাতে পারত না কুন্তী তা নয় কিন্তু মিথ্যে বিব্রত করতে চায় নি ও বেচারীকে।

বলেছে, কিছু দরকার নেই ভাই—কয়েকটা ঘণ্টা আর মাত্র ত।

॥ ৩ ॥

স্কুলের আট-দশজন টীচার—তাদের মধ্যে একমাত্র ঐ সাঈদাই মুসলমান—এবং সেই কেবল তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নি।

তার কলঙ্ক নিয়ে হাসাহাসি করে নি বা কোন বক্রোক্তি করে নি। বরং তার পক্ষ নিয়ে অন্য সকলকে কড়া কড়া কথা বলেছে।

তার ফলে সাঈদার প্রতি কম বক্রোক্তি বর্ষিত হয় নি।

কুন্তী আবার সীতার সামনে এসে দাঁড়াল। নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

পাঁচ বছর বয়েসের আন্দাজে একটু যেন বড়-সড়ই দেখায় ওকে।

আশ্চর্য!

ঐ শিশুর মধ্যেও মানুষ পাপ দেখে।

কোন ভয় নেই তোর সীতা, তোকে আমি বাঁচিয়ে তুলবই—মানুষের পরিচয় দেবই, মানুষ—পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একদিন স্বীকার করতেই হবে তোকে।

স্বীকার করতেই হবে মানুষের জন্মের মধ্যে কোন কলঙ্ক থাকে না। কোন পাপ মানুষের জন্মকে স্পর্শ করতে পারে না।

এ কেবল তোর অগ্নিপরীক্ষা সীতা—একদিন তোর অগ্নিশুদ্ধি হবেই!

তুই নির্মল, তুই নিষ্পাপ একথা তোকে প্রমাণ করতেই হবে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একদিন তোকে হতেই হবে।

আবার টেবিলের সামনে ফিরে এসে কলমটা তুলে নিল।

চিঠিটা শেষ করতেই হবে।

আজ আবার এখানকার আমার পাঁচ বছরের বাসা ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে জানতে পারলাম আমরাই আমাদের অর্থাৎ নারীই নারীর সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু।

আমার কলঙ্কে নাকি তাদেরই সর্বাপেক্ষা বড় লজ্জা—তাদেরই সব চাইতে বেশি দুঃখ—তাই নাকি তারা আমাকে ক্ষমা করতে পারল না।

অবিশ্যি সেজন্য আমার কোন দুঃখ নেই—কিন্তু ওরা বুঝল না। আজ আমাকে সকলে মিলে ওরা হেয় প্রতিপন্ন করে, আমার গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে—নিজেদের গায়ে ত কাদা মাখলই—সমস্ত নারী জাতটার গায়েও মেখে দিল।

অথচ দেখ কি আশ্চর্য—ওদের কাছেই আমার সব চাইতে বড় দাবি ছিল, আমাকে বিচার করতে গিয়ে ওরা একবারও ভাবল না ওদের যে কেউরই সন্তান হতে পারত সীতা, সীতার জন্মবৃত্তান্তর মধ্যে অস্বাভাবিক—অত্যাশ্চর্য কিছু নেই—

প্রতিনিয়ত পৃথিবীর ঘরে ঘরে মানুষের যে জন্ম-ইতিহাস রচিত হচ্ছে সীতা তার ব্যতিক্রম নয়।

এবং সীতা যেদিন মাথা তুলে দাঁড়াবে সেদিন কি ওদের কাউকে ক্ষমা করবে!

তবু—তবু—যাবার আগে সান্ত্বনা রইল আমার সাঈদা—ঐ ভিন্নজাতের, ভিন্নধর্মের মেয়েটি।

ওদের সকলের নীচতা, কুশ্রীতা ও অবক্ষয়ের মধ্যে বিদুরের এক মুঠো ক্ষুদের মতই তার প্রীতি ও সমবেদনাটুকু অন্তত মুঠো ভরে নিয়ে যাচ্ছি সেও ত কম নয়।

এই চিঠির পর আবার কবে তোমাকে চিঠি দিতে পারব জানি না। কারণ সেদিন এমনি এক রাত্রে যখন দু'মাসের সীতাকে বুকে জাপটে ধরে ঘরের বাইরে যে অনিশ্চয়তার মধ্যে পা বাড়িয়েছিলাম আজও আবার সেই অনিশ্চয়তার মধ্যেই পা বাড়াচ্ছি।

কিছু দিন চিঠি না পেলে কিন্তু চিন্তিত হয়ো না।

জানি আজও তোমার মত বদলায় নি, আজও তুমি বলবে, তোমার ওখানে কেন চলে গেলাম না—কিন্তু কোন দিন ইতিপূর্বে তোমার সে প্রশ্নের জবাব দিই নি—আজ দিচ্ছি।

শুধু বলেছি এতদিন, ছিঃ—

কিন্তু সেটাই ত সব কথা নয়।

জানি স্বর্ণেন্দু, জানি, সীতাকে তুমি অপমান করবে না। তোমার দিক থেকে সে সম্ভাবনা কোন দিনই নেই এবং সেটা স্বপ্নেরও অগোচর কিন্তু আমার দিক বলেও ত একটা বস্তু আছে। আর যাই করি না কেন মানুষের সমস্ত কিছু নীতি ও সৌজন্যবোধের যে একটা স্বাভাবিক সীমারেখা আছে, সেটা লঙ্ঘন করবারও যে একটা নীতি আছে—তাকে কি না মেনে পারি। তা ছাড়া আমার সীতার দায়িত্ব তুমিই বা নেবে কেন যেমন কথাটা অত্যুক্তি নয়, তেমনি তোমার যে সন্তান আমার গর্ভে আসবে তাদের প্রতিও ত আমার সব কিছু বাদ দিলেও একটা কর্তব্য থাকে—তখন সেই কর্তব্যের যদি ত্রুটি ঘটে তখন নিজেকেই বা আমি নিজে ক্ষমা করব কি করে বলতে পার।

অথচ সীতা আমার যেমন প্রিয় তুমিও আমার তেমনি প্রিয়।

কিন্তু আর না—যাবার সময় হ'ল—

আজকের মত এইখানেই ইতি করলাম।

তোমার কুন্তী।

রুদ্ধ দরজার উপর করাঘাত শোনা গেল একটু পরেই।

কুন্তী খামের মধ্যে চিঠিটা ভরে সবে ঠিকানাটা লেখা তখন শেষ করেছে।

কে?—কুন্তী শুধায়।

আমি, কুন্তীদি—দরজাটা খোল—

সাঈদার গলা।

ও বলেছিল, রাত চারটেয় ত বেরুবে—তার আগে আমি আসব—

কুন্তী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। সাঈদা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

হাতে ওর একটা কেৎলি—বোধহয় চা এনেছে, খান দুই কাপ আর একটা কাগজের মোড়ক।

কেৎলিতে আবার কি আনলে?

একটু চা—

সত্যি, তোকে নিয়ে আর পারি না সাঈদা। এমন করে যাবার আগে বাঁধছিস কেন বল ত—

হয়েছে—হাত-মুখ ধুয়ে নাও। চা-টা গরম গরম থাকতে খেয়ে নাও।

প্যাকেটে আবার কি?—জিজ্ঞাসা করে কুন্তী।

ও কিছু না, এত সকালে বেরুচ্ছ—বাচ্চাটা রয়েছে সঙ্গে, পথে ক্ষিদে পেলে কোথায় কি পাবে না পাবে—তাই একটা প্যাকেট বিস্কুট দিয়ে দিচ্ছি।

বেশ, রাখ। তোমাকে না বলবার ক্ষমতাই বা কোথায় আমার সাঈদা।

কি যে বল, তুচ্ছ এক প্যাকেট বিস্কুট।

শুধু ত ঐ বিস্কুটের প্যাকেটটাই নয় ভাই—তোমার কাছে ঋণ রেখে গেলাম এজীবনে কি তাই কোনদিন শোধ করতে পারব—

ছিঃ ছিঃ কুন্তীদি, ওকথা বলো না। আমি তোমার জন্য কি করেছি যে ও কথা তুমি বলছ? বরং এই দুঃখটাই চিরকাল আমার থাকবে। আমরা মেয়েরাই তোমাকে এত বড় অপমান করে দল বেঁধে এখান থেকে তাড়িয়ে দিলাম। যাক্ ওসব কথা, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, মুখ ধুয়ে এসে চা-টা খেয়ে নাও—

পাশের বাথরুমে গিয়ে কোনমতে হাত-মুখটা ঠাণ্ডা বরফ গলানো জলেই ধুয়ে এল কুন্তী—

বাথরুমের পাশেই ছোট রান্নাঘরটা।

রান্নাঘরে সব জিনিষ রয়ে গেল। এই কয়বছরের একটি একটি করে সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক খুঁটিনাটিই ক্রয় করেছিল।

সব কিছুই সে রেখে যাচ্ছে। সাঈদা বার বার বলেছিল, সব ফেলে রেখে যাচ্ছ, আবার ত দরকার হবে—

না—দরকার যখন হবে তখন দেখা যাবে কিন্তু এখানকার কোন চিহ্নই সঙ্গে নেব না। মানুর মা দেশে গেছে, সে ফিরে এলে ওসব তাকেই দিয়ে দিও—

কিন্তু—

না রে যত বোঝা পথে কম হয় ততই ভাল।

সাঈদা কুন্তীকে খুব ভাল করেই চেনে তাই তর্ক করে নি।

ঘরে এসে ঢুকতেই চায়ের কাপটা এগিয়ে দেয় সাঈদা।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কুন্তী বলে, ঐখানে কাগজের ঐ খামটায় মানুর মার দু'মাসের মাইনে রেখে গেলাম, এলে তাকে দিও।

কলকাতায়ই ত যাচ্ছ কিন্তু কলকাতায় কোথায় উঠবে কিছু ঠিক করেছ? সাঈদা প্রশ্ন করে।

না—

তবে?

দেখি একটা আশ্রয় যতদিন না মেলে কোন একটা হোটেলে উঠব—

তোমাকে একটা কথা কাল জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম কুন্তীদি?

কি সাঈদা?—

শিশিরাংশু সেন বলে কাউকে তুমি চেন ?

হঠাৎ যেন ভূত দেখার মতই চমকে ওঠে নিজের অজ্ঞাতে কুন্তী—সাঈদার মুখের দিকে তাকায়। অর্ধোস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কি, কি নাম বললে ?—

শিশিরাংশু—চেন নাকি ?

কুন্তী ততক্ষণে নিজের আকস্মিক চমকটা সামলে নিয়েছে। বলে, কেন—কেন বল ত ?

কাল রাত্রে তোমার এখান থেকে ফিরে হেড মিস্ট্রেস্ চপলাদির সঙ্গে তোমার কথা নিয়ে আলোচনা হতে হতে হঠাৎ উত্তেজনার মধ্যে তিনি বলছিলেন—

কি, কি বলছিলেন ?

শিশিরাংশু সেনের একটা চিঠি পেয়েই নাকি—

শিশিরাংশু সেনের চিঠি !

হ্যাঁ—

সে—সে কি লিখেছে চিঠিতে—

তা ত ঠিক জানি না—বলেনও নি সব খুলে তবে এইটুকু বলেছিলেন, তার চিঠি পাবার পরই স্কুল কমিটি তোমার সম্পর্কে অনুসন্ধান করে—

কিছু কিছু বলেন নি চপলাদি চিঠিটা সম্পর্কে ? না তুমি আমার কাছে গোপন করছ সাঈদা।

গোপন করব কেন, বলেন নি উনি আর আমারও সত্যি কথা বলতে কি ঐ নোংরা ব্যাপারে মাথা গলাতে প্রবৃত্তি হয় নি। তবে একটু যা বলেছেন তা হচ্ছে—তিনিই নাকি জানিয়েছেন ঐ খুকী তোমার অবৈধ-সন্তান।

বাইরে থেকে ঠিক ঐ সময় সাইকেল-রিক্শাওয়ালার গলার স্বর শোনা গেল, মাঈজী, এখন না বেরুলে ট্রেণ ধরতে পারব না।

কুন্তী তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, আমি তৈরী রে—এক্ষুণি বের হয়ে পড়ব।

কুন্তী এগিয়ে গেল শয্যার কাছে। ঘুমন্ত মেয়ের কপালে গভীর স্নেহে হাত দিয়ে মৃদুকণ্ঠে ডাকে, সীতা সীতা, ওঠ মা—

সীতা ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসে।

মা মণি—

ওঠ, এবারে আমাদের যেতে হবে যে—

ট্রেণে চেপে আমরা যাব, তাই না মা মণি ?

হ্যাঁ, ওঠ—

কুন্তী সীতার হাত-মুখ ধুইয়ে জামাকাপড় পরিয়ে সাঈদার সাহায্যেই বিছানাটা চট্‌পট বেঁধে নেয়।

সাঈদা রিক্শাওয়ালাকে ডাকে—সে ভিতরে আসতে বলে, এগুলো নিয়ে যা—

রিক্শাওয়ালা মালপত্র একে একে নিয়ে গিয়ে সাইকেল-রিক্শায় তুলল।

শূন্য ঘরটার দিকে একবার তাকাল কুন্তী।

পাঁচ বছর এই ঘরে তার কেটেছে। পাঁচ বছরের স্মৃতি ত কম নয়। অনেক দিন, অনেক রাত্রি—অনেক মুহূর্তের ইতিহাস।

সেই ইতিহাসের স্মৃতি।

পাঁচ বছরের প্রাত্যহিকতার মধ্যে যেন ভুলেই গিয়েছিল কুন্তী—এই কোয়ার্টার আবার কোন একদিন তাকে এমনি এক রাত্রিশেষে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ভাবতে পারে নি পাঁচ বছর পরে এমনি করে এক প্রত্যূষে বাইরে আবার পা বাড়াতে হবে—অনিশ্চয়তার মধ্যে।

আশ্চর্য! সব কিছুর মূলে নাকি শিশিরাংশু।

তা হলে ব্যাপারটা শিশিরাংশুরই কীর্তি।

চল—

সাঈদার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে আবার কুন্তী। বলে, হ্যাঁ—চল।

সীতার হাত ধরে কুন্তী বাইরে বের হয়ে এল।

রিক্‌শায় উঠে বসল—

রিক্‌শাটা চলতে লাগল। পিছন ফিরে তাকাল কুন্তী, সাঈদা ঠিক তেমনি করে সামনের বারান্দায় আবছা রাত্রিশেষের আলোছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রমে ক্রমে সাঈদার ঝাপসা চেহারাটা মিলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল।

সমস্ত শহর এখনো নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে আছে।

কনকনে শীতের হাওয়া চোখে-মুখে যেন ছুঁচ বেঁধায়।

॥ ৪ ॥

রাত্রিশেষের তরল অন্ধকারের মধ্যে ট্রেণটা হু হু করে ছুটে চলেছে।

একটা প্রায়-খালি সেকেণ্ড ক্লাশ লেডিস কমপার্টমেণ্টই পেয়ে গিয়েছিস কুন্তী, সীতাকে শুইয়ে দিয়েছে বার্থটায় —সীতা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

শিশিরাংশু।

তা হলে শিশিরাংশুই শত্রুতা করেছে। কিন্তু কেন?

পৃথিবীতে যা কেউ কোনদিন করত না—করতে পারে না, তাই ত সে করেছে শিশিরাংশুর জন্য।

কিন্তু সত্যিই কি শিশিরাংশুর জন্য—

না ত—সে যা কিছু করেছে মানসীর জন্য।

সীতা যেমন আজ তার সন্তান হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরেছে, মানসীও যে ঠিক তেমনি করেই তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ছিল।

মা বেঁচে থাকলেও মানসী যে তারই কোলে-পিঠে মানুষ হয়েছে।

পক্ষাঘাতে পঙ্গু মা তখন ত মৃত বললেও চলে।

তার নিজের তখন মাত্র বার বছর বয়স—সে নিজেই বালিকা—তবু তাকেই নিতে হয়েছিল সেদিন মানসীর সকল ভার—সকল দায়িত্ব।

দিদি বলে ডাকলেও মানসীর মা কি সেই ছিল না।

আর তাই না, সত্যিকারের মায়ের প্রতি তার কোনদিন এতটুকু আকর্ষণ বা শ্রদ্ধা জাগে নি। অনুভবও করে নি সে।

এমন কি মা যেদিন মারা গেল মানসীও তখন নেহাৎ ছোটটি নয়, বছর ষোল বয়স। দীর্ঘকাল পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়িনী থেকে মা মারা গেলেন অথচ মানসী সেদিন এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলে নি। বরং সেজেগুজে সিনেমা দেখতে চলে গেছিল পালিয়ে।

রাত্রে শ্মশান থেকে ফিরে এসে মানসীকে বলেছিল ও, ছিঃ মানসী—মাকে শ্মশানে নিয়ে গেলাম আমরা আর তুই গেলি সিনেমায় পালিয়ে?

বিছানার উপর শুয়ে একটা উপন্যাস পড়ছিল মানসী। বলে, মা তাতে হয়েছে কি—তুমিই ত ছিলে, কিন্তু আমার একার ত মা নয়—

তোমারই মা, আমার কেউ নয়। তাছাড়া শিশিরাংশুদা বললে—ফোনে অমন করে—

কে, কে বললে—

শিশিরাংশুদা—

শিশিরাংশু ফিরেছে নাকি মুর্শিদাবাদ থেকে—

সে ত পরশুই ফিরেছে—

কিন্তু কই, আমার সঙ্গে ত দেখা করে নি!

হয়ত সময় পায় নি— মানসী বলে।

সেই দিন—সেই দিনই রাত্রে শুয়ে শুয়ে প্রথম মনে হয়েছিল কুন্তীর—কথাটা।

শিশিরাংশু—শিশিরাংশু কলকাতায় এসেও তার সঙ্গে দেখা করে নি।

এবং তাকে না জানিয়ে ফোনে মানসীকে ডেকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছে।

শিশিরাংশু আর স্বর্ণেন্দু। তাদের সঙ্গে কি তার আজকের পরিচয়।

দীর্ঘ পাঁচ বছরের পরিচয়।

কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা—শিশিরাংশুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা—সেটা আর যার কাছেই অস্পষ্ট থাক তাদের নিজেদের কাছে ত অস্পষ্ট নেই।

তবে—তবে এ ধরনের ব্যবহার করার শিশিরাংশুর মানেটা কি?

সেই দিন—সেই দিনই প্রথম বিশ্লেষণ করেছিল মনে মনে একক শয্যায় শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে শিশিরাংশুর ইদানীংকার ব্যবহারের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে।

বছরখানেক থেকেই যেন শিশিরাংশুর মধ্যে কেমন একটা পরিবর্তন এসেছে—

তার ব্যবহারে, তার কথায়বার্তায় যেন আর সে উত্তাপ নেই।

এবং শুধু ঐ দিনই ত নয়—মানসীকে একা একা নিয়ে আরো কয়েকদিন শিশিরাংশু বেড়াতে গিয়েছে, সিনেমায় গিয়েছে।

অথচ কথাটা তাকে জানানও প্রয়োজন মনে করে নি।

কেন মনে করে নি—কেন?

তবে কি মানসীকে শিশিরাংশু—আর ভাবতে পারে নি—কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

তবু, তবু পরদিন প্রত্যুষে শয্যা থেকে উঠে মনে মনে বলেছে কি পাগলের মত আবোল-তাবোল গতরাত্রে সব সে ভেবেছে।

শিশিরাংশু মানসীকে—ছিঃ ছিঃ—

কেমন করে ভাবতে পারল সে কথাটা।

বাবা সতীনাথ দীর্ঘ দিন ধরেই সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে স্ত্রী নর্মদার পক্ষাঘাতে অসুস্থ হবার পর থেকেই।···

কলকাতা সহরে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে—অমন রোরিং প্র্যাকটিস্ হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন ডাঃ সতীনাথ চৌধুরী।

বললেন, মিথ্যা—ওর কোন মানে হয় না—We doctors are helpless in the hands of destiny কিছু আমরা করতে পারি না—কিছু করতে পারি না আমরা—

চিকিৎসক বন্ধু-বান্ধবেরা বলেছিল, এ তুমি কি বলছ সতীনাথ—

ঠিকই বলছি—তোমরা ত এতগুলো বিলেত-ফেরত বড় বড় অভিজ্ঞ ডাক্তার ছিলে—নর্মদার কিছু করতে পারলে তোমরা—

কিন্তু তোমার স্ত্রীর যে রোগ হয়েছে তাতে আর কি করবার আছে তুমিই বল?

সেই কথাটাই ত আমি বোঝাতে চাইছি তোমাদের, কিছু করবার নেই যখন তখন কেন আর এ মিথ্যা প্রহসনের জের টানা—

এই কি একটা তোমার যুক্তি হল সতীনাথ?

যুক্তি কি না জানি না তবে একথাটা আজ তোমরা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না—আজকের দিনে আমরা এতগুলো এত বড় বড় ডাক্তার ও তোমাদের এত সব আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও ঔষধপত্র থাকা সত্ত্বেও নর্মাদা আমাদের চোখের সামনে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকবে যতদিন না সত্যি সত্যি মৃত্যু এসে তাকে এই যন্ত্রণা আর প্রতিমুহূর্তের মৃত্যু থেকে মুক্তি দেয়।

বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাপের কথাগুলো শুনছিল কুন্তী। ডাঃ মুখার্জী সতীনাথের দীর্ঘদিনের সুহৃদ এবং ঐ বাড়ীতে তার খুব বেশী যাতায়াতই ছিল—তিনি বের হয়ে আসতেই ঘর থেকে কুন্তীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়।

কুন্তীই ডাকে, কাকাবাবু—

ডাঃ মুখার্জী কুন্তীর মুখের দিকে তাকালেন, ও বোধ হয় আর সত্যিই ফিরবে না মা—

তা হলে কি হবে কাকাবাবু, বাবা যে এক মুহূর্তও ঐ ডাক্তারী—রোগী হাসপাতাল, চেম্বার ছাড়া থাকতে পারেন না—

সেইটাই ত সবচাইতে বড় আশ্চর্য লাগছে মা—কি জান মা, একটু থেমে ডাঃ মুখার্জী বলেন, একটা প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল ওর এই Medical Science-টার উপরে—শুধু বিশ্বাস নয়, আস্থাও ছিল গভীর—আর ঠিক সেইখানেই আঘাতটা লেগেছে—এটা তারই একটা প্রতিক্রিয়া।

কাকাবাবু—

হ্যাঁ মা, তোমার যেখানে ভয়—আমারও ভয়টা সেখানেই। নিজেকে যদি এই আশাভঙ্গের বিপর্যয় থেকে না উদ্ধার করতে পারে ও যে পাগল হয়ে যাবে।

পাগল অবিশ্যি হন নি সতীনাথ কিন্তু পাগল না হলেও সংসার থেকে নিজেকে যেন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে মুছে নিয়েছিলেন।

এবং মুছে নিলেন নিজেকে একেবারে সংসার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে।

বাড়ী ছেড়ে বের হয়ে পড়লেন একদিন।

বেরুবার আগের দিন রাত্রে, কুন্তীকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে।

কুন্তী এসে ঢুকল ঘরে, আমাকে ডাকছিলেন বাবা?

হ্যাঁ মা—কাল ভোরে আমি বের হয়ে যাচ্ছি—

কোথায় বাবা।

তা জানি না মা—তবে বের হয়ে যাচ্ছি—

কুন্তী নিঃশব্দে বাপের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সতীনাথ বলেন, ব্যাঙ্কে ইনস্ট্রাকসন দিয়ে দিয়েছি—তুমি তোমার নামেই চেকে টাকা ড্র করতে পারবে—এ বাড়ীটা রইল আর ব্যাঙ্কে যা রইল—তোমাদের মা যতদিন বেঁচে থাকবেন ও তোমাদের দু'বোনের কোন কষ্ট হবে না, যদি অবিশ্যি দু'হাতে সব না উড়িয়ে দাও।

বাবা—

বল মা?

আবার কবে আপনি আসবেন!

তুমি আমার মেয়ে হলেও তুমি আমার ছেলের অধিক মা—শুধু যে সেটা আমার ভাবা তাই নয় বিশ্বাস করি সেটা পুরোপুরি, তাই ত আজ এত বড় একটা দায়িত্ব তোমার ঘাড়ের উপর ফেলে দিয়ে বের হয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি—

বাবা—

শোন মা, অনেকে হয়ত আমার সম্পর্কে অনেক কথা বলবে, ভীতু—কাপুরুষ—অপদার্থ—কিন্তু মা তুমি, তোমার কাছে যাবার আগে আমি সত্য কথাটাই বলে যাচ্ছি, তোমার মার ঐ অসহায় অবস্থাটা যখনই চোখে পড়ে তখনই তোমার মার অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে, তোমার মা বলতেন আমি নাকি মস্তবড় ডাক্তার—তাই তার স্থির বিশ্বাস একটা বরাবর ছিল, তার যত কঠিন অসুখই হোক না কেন আমি ঠিক তাকে ভাল করে তুলতে পারবই। আজ তোমার মার চোখের দিকে চাইলে মনে হয় যেন সেই কথাটাই তার চোখ বলছে, তুমি আমাকে ভাল করে, আবার সুস্থ করে তুলছ না কেন? কেন—কেন—একটু থেমে আবার সতীনাথ বলেন, আজ যদি তার কথা না বন্ধ হয়ে যেত, যদি কথাটা বলতে পারতেন আমি অন্তত চিৎকার করে একটা প্রতিবাদ জানিয়ে আজ তার সত্যিকারের কথাটা জেনে নিতে পারতাম কিন্তু তারও উপায় নেই—এ পীড়ন—এ অসহ্য—দিবারাত্র আর আমি সহ্য করতে পারছি না—আমাকে যেন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করছে—আমাকে যেন পাগল করে তুলছে—

কিন্তু বাবা—মাকে ত আপনি ভাল করবার কম চেষ্টা করেন নি—চিকিৎসার দ্বারা যা সম্ভব—মা মুখে সেটা প্রকাশ না করতে পারলেও চোখে কি সেটা দেখেন নি, মনে মনে কি বোঝেন নি—কথাই বলতে পারেন না, জ্ঞান ত পুরোপুরিই আছে মার—

আমার লজ্জা, আমার দুঃখ ত মা সেইখানেই—পঙ্গু থেকেও যদি ওর মুখে অন্তত কথাটা ফোটাতে পারতাম—

সেই দিন—সেই দিন প্রথম ও শেষ কুন্তী সতীনাথের চোখে জল দেখেছিল।

দুফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়তে দেখেছিল ও। আর তাইতেই ও বুঝেছিল কত বড় দুঃখে অমন মানুষটার চোখ দিয়ে জল বের হয়ে এসেছে।

আর সে যেন কোন কথা বলতে পারে নি।

সতীনাথ বলেছিলেন, তোমাদের মা যে আমার কতখানি ছিল, সন্তান তোমরা, তোমাদের কাছে প্রকাশ করতেও পারব না—ঠিক প্রকাশ করলেও হয়ত ঠিক সেটা বুঝবে না। আজ আমার কাছে আমার এত বছরের উদ্যম, কর্মপ্রচেষ্টা, সাফল্য সব ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। সব মনে হচ্ছে মিথ্যা—তাই শুধু এই মিথ্যা, এই লজ্জা থেকে সরে যাচ্ছি।

কিন্তু বাবা, একটা পরামর্শ দেবার মতও ত কেউ আমাদের আশেপাশে রইল না—

কারো পরামর্শ নিও না মা—তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে—ভুল ত হয়ই, তার জন্য দুঃখ করো না।

আপনি কি আজই চলে যাবেন?

হ্যাঁ, আজই—

কখন?

শেষ রাত্রের দিকে—

মানসীকে ডাকব বাবা?

না—থাক—তোমার মা কি এখন জেগে আছেন?

একটু আগে দেখে এসেছিলাম জেগেই আছেন—দেখে আসব—

এস—

॥ ৫ ॥

নর্মদা জেগেই ছিল।

ডান হাত—ডান পাটা পঙ্গু, অসাড়, সেই সঙ্গে বাক্-শক্তিও অন্তর্হিত।

ফ্যাল ফ্যাল করে কেবল চেয়ে থাকে আর মধ্যে মধ্যে চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, মাসখানেক আগে থাকতেই সতীনাথ স্ত্রীর ঘরে আসা ছেড়ে দিয়েছিলেন—মনে মনে তখন বোধ হয় তার প্রস্তুতি চলেছে।

কুন্তীর অন্তত তাই মনে হয়েছিল পরে।

আর মনে হয়েছিল ভালবাসার এমন দৃষ্টান্ত বুঝি সত্যিই বিরল।

সতীনাথ যখন ঘরে গিয়ে ঢোকেন—নর্মদা তখন চোখ বুজে ছিল—ও পাশের জানালার আধ-ভেজানো কপাটের আড়াল থেকে দেখছিল সে দৃশ্য কুন্তী।

আশ্চর্য!

সতীনাথ ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই নর্মদা চোখ মেলে তাকাল। এবং অন্যদিকে মাথাটা ছিল, এবারে ঘুরিয়ে মাথাটা তাকাল সতীনাথের দিকেই।

সতীনাথ মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন নর্মদাকে সহসা তার দিকে ঘুরে তাকাতে দেখে। কথা বলতে পারছে না নর্মদা—শুধু চেয়ে আছে চোখ দুটি মেলে।

সে কি দৃষ্টি।

যেন অফুরন্ত স্নেহ—মমতা—ও ভালবাসা সেই দৃষ্টির মধ্যে।

সতীনাথ ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে শয্যাপাশে দাঁড়ালেন। ডান হাতটা তুলে নর্মদার শীর্ণ কপালের 'পরে রাখতেই নর্মদা বাঁ হাত দিয়ে স্বামীর হাতটা চেপে ধরে চোখ বুজল।

বোজা চোখের কোল বেয়ে ক্ষীণ দুটি অশ্রুর ধারা নেমে এসে শীর্ণ গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। কতক্ষণ অমনি করে রইল দুজনে।

সতীনাথ শিয়রের সামনে দাঁড়িয়ে আর নর্মদা তার বাঁ হাতটা দিয়ে সতীনাথের ডান হাতটি ধরে আছে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বোধ করি কুন্তীরই সেদিন পা ধরে গিয়েছিল।

অনেকক্ষণ পরে সতীনাথ ধীরে ধীরে স্ত্রীর মুঠি থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

নর্মদার চোখ দুটি তখন বোজা।

ঘুমাচ্ছিল কি না কে জানে।

সেই দিনই রাত্রিশেষে কখন এক সময় সতীনাথ গৃহ ছেড়ে চলে গিয়েছেন কুন্তী জানতেও পারে নি।

কিছুতেই ঘুমাবে না—জেগে থাকবে মনে মনে স্থির করেছিল কিন্তু পারে নি—শেষ রাত্রের দিকে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল কি একটা ভারী বস্তু মেঝেতে পতনের ঝন ঝন শব্দে।

পাশের ঘরে মা থাকে—পাশের ঘর থেকেই শব্দটা এসেছিল—যদিও একজন নার্স সর্বক্ষণ রাত্রে ও একজন সর্বক্ষণ দিনের বেলাতে থাকে নর্মদাকে দেখাশোনা ও পরিচর্যা করবার জন্য, তবু শব্দটা শুনে ঘুম ভেঙ্গে ছুটে যায় কুন্তী পাশের ঘরে।

কুন্তীর পদশব্দে রাত্রের নার্স ওর দিকে ফিরে তাকাল, সে তখন মেঝে থেকে ভাঙ্গা ফিডিং কাপের টুকরো-গুলো একটা একটা করে কুড়োচ্ছে।

সে বলে, দেখুন না—হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে ফিডিং কাপটা ফেলে দিয়ে ভাঙ্গলেন আপনার মা—

কুন্তী মার দিকে তাকাল।

তার মনে হয় ঐ মুহূর্তে নর্মদার চোখ দুটো যেন কি বলতে চাইছে।

কি হয়েছে মা?

নর্মদার ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে মৃদু মৃদু। বুঝতে পারে কুন্তী মা কি যেন বলবার তাকে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

মা—

কুন্তী মার হাতটা ধরে—হাতটা তখন নর্মদার কাঁপছে। কুন্তী ভয় পেয়ে যায়—তাড়াতাড়ি বারান্দায় ছুটে গিয়ে ডাঃ মুখার্জীকে ফোন করে ফিরে আসবার সময় সতীনাথের ঘরের দরজাটার দিকে তার নজর পড়ে।

দরজাটা হা হা করছে খোলা—ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে।

কি ভেবে কুন্তী ঘরের ভিতর গিয়ে পা দেয় এবং পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে যায়, সতীনাথ নেই ঘরে।

ধক্ করে ওঠে যেন বুকের ভিতরটা, বাবা—বাবা—

কারো কোন সাড়া নেই।

শুধু রাত্রিশেষের হাওয়ায় ঘরের জানালার পর্দাগুলো উড়ছে। সামনেই দেওয়ালে টাঙানো মা ও বাবার পাশাপাশি এনলার্জ ফটো দুটো।

সেই ফটোর দিকে নজর পড়ল।

সতীনাথ যেন চেয়ে আছেন তার মুখের দিকে।

আধঘণ্টার মধ্যেই ডাঃ মুখার্জী এলেন।

পরীক্ষা করে রোগিণীকে বললেন, কোন কারণে খানিকটা excitement হয়েছিল বোধ হয়—Pulse rate ও Pressureটা একটু বেড়েছে—otherwise ভয়ের কোন কারণ নেই—একটা ঘুমের ঔষধ দিয়ে চলে গেলেন ডাঃ মুখার্জী।

পরে কুন্তীর মনে হয়েছে—তবে কি মা সেই মুহূর্তে বাবার চলে যাওয়ার ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল।

কারণ ইতিপূর্বে যেমন কখনো ওরকম হয় নি তেমনি পরে যতদিন বেঁচে ছিল নর্মদা ওরকম কিছু কোনদিন হয় নি।

এদিকে—পরের দিন থেকেই সংসারের সমস্ত দায়িত্বটা এসে পড়ল কুন্তীর ঘাড়ের উপরে।

কতই বা বয়স তখন কুন্তীর।

তার উনিশ আর মানসীর—বার, সে তখন থার্ড ইয়ারে পড়ে আর মানসী পড়ে ক্লাস এইটে—স্কুলে।

সতীনাথের চলে যাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু বেশী দিন চাপা গেল না। ক্রমে ক্রমে বাড়ীর সবাই জেনে ফেলল। কিন্তু সংসারের চাকাটা অব্যাহত চলতে লাগল।

বাড়ীর একটিমাত্র মানুষ চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন পরিবর্তনই ত হয় নি। সব ব্যবস্থা যে করে রেখে গিয়েছিলেন সতীনাথ।

বিরাট বাড়ী—গাড়ি—চাকর-চাকরাণী-আয়া—ড্রাইভার—ঠাকুর আর ছিল সরকার—বনমালী সরকার।

দীর্ঘদিনের লোক ঐ বাড়ীতে ঐ বনমালী সরকার।

জ্ঞান হওয়া অবধি কুন্তী বনমালী সরকারকে দেখে আসছে—ছোট বেলায় ত কত কোলে-পিঠেও চড়েছে।

রোগা ঢ্যাঙ্গা দড়ির মত পাকানো চেহারাটা। কষ্টি পাথরের মত কালো গায়ের রঙ। মাথায় কাঁচা পাকা কদমছাঁট চুল—চোখে নিকেলের ফ্রেমে চশমা—বাঁকানো—উঁচু নাক। তোবড়ানো গাল। মুখে সর্বদাই খোঁচা খোঁচা দাড়ি থাকত।

হপ্তায় একদিনের বেশী কামাত না বনমালী সরকার।

কি শীত, কি গ্রীষ্ম একটা গলাবন্ধ খদ্দরের মোটা কোট গায়ে—হাঁটুর ওপর তোলা মোটা খদ্দরের ধুতি।

বাবা ডাকত, বনমালী বলে—মা ডাকত, ঠাকুরপো—আর ওরা দুবোনে ডাকত, বনমালী কাকা। বাড়ীর অন্যান্য সকলে বলত, সরকার মশাই—

বাড়ীর একতলায় পশ্চিমের ছোট ঘরটিতে এক কোণে থাকত বনমালী সরকার।

ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের কোন বাহুল্য ছিল না—

একটা চৌকি তার উপরে একটা সতরঞ্চি পাতা, একটা বালিশ। এক কোণে একটা টিনের পোর্টম্যাণ্টো আর একজোড়া ক্যাম্বিশের জুতো, তাও ধূলোয় ধূলোয় লালচে হয়ে গিয়েছে।

বড় হয়ে বাবার কাছে একদিন কথায় কথায় শুনেছিল কুন্তী, ব্রিটিশ আমলে লোকটা নাকি একজন দুর্ধর্ষ—

terrorist—বিপ্লবী ছিল। ঘরছাড়া গৃহহারা—কোথায় কোথায় কোন পাহাড়ে, কন্দরে, ঘনবনের মধ্যে আত্মগোপন করে বেড়াত আর দেশকে সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা স্বাধীন করবার স্বপ্ন দেখত।

কতবার সশস্ত্র ব্রিটিশের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করেছে—

দেশ স্বাধীন হবার পর যখন ফিরে এল—দেখল তার কথা কেউ জানে না—জানার প্রয়োজনও মনে করে না।

তারপরেই কথাগুলো অবিশ্যি একদিন কুন্তীই জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল।

কেন কাকা, চিনতে পারল না কেন তোমায়?

দূর পাগলী···কি এমন করেছি বল ত যে আমায় চিনে রাখতে হবে! দেশকে ভালবেসেছি সে একান্তই নিজস্ব আমার মনের তাগিদে। দেশ স্বাধীন হোক এইটাই চেয়েছিলাম—স্বাধীন দেশের একজন নাগরিক হব, হয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকব এইটুকুই চেয়েছিলাম—তার বেশী ত কিছু চাই নি—

কি বলতে গিয়েও যেন চেপে গিয়েছিল নিজেকে বনমালী সরকার।

এবং তারপর অনেকবার প্রশ্ন করেও কোন জবাব পায় নি বনমালীর কাছ থেকে কুন্তী।

যা হোক ঐ বনমালী সরকার মানুষটা নীচের একটি ছোট ঘরে সবার চোখের আড়ালে থাকলেও সে যে সতীনাথের সংসারের প্রাণকেন্দ্র ছিল সেটা বুঝতে কুন্তীর বেশীদিন দেরি হয় নি। সতীনাথকে একদিন কুন্তীই প্রশ্ন করেছিল, আপনি বনমালী কাকাকে খুব বিশ্বাস করেন, না বাবা?

একটা কথা মনে রাখিস মা—অত বিশ্বাসের জায়গা যেমন পাবে না তেমনি শুভানুধ্যায়ীও জীবনে পাবে না।

সতীনাথের গৃহত্যাগের পর কথাটা যে কত বড় সত্যি সেটা যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে কুন্তী।

বনমালী কাকা না থাকলে যে কি হ'ত কথাটা ভাবতে গিয়েও যেন বুকের ভিতরটা তার হিম হয়ে যায়।

সংবাদটা কুন্তী বনমালী কাকার কাছেই প্রথম পায়।

তার বাপ সতীনাথের কেবল যে একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক হিসাবে উপার্জন ছিল তাই নয়, দমদমার ওদিকে একটা ঔষধের কারখানাও ছিল।

এবং সেটা রীতিমত একটা লাভজনক ব্যবসা বছর তিনেক থেকে হয়েছিল। সতীনাথের পরিকল্পনা ছিল ঔষধের কারখানাটাকে বিরাট একটা কিছু গড়ে তোলা।

কুন্তী সব শুনে বলে, বাবার সে স্বপ্নকে কি আমরা সফল করে তুলতে পারি না বনমালী কাকা?

কেন পারবে না মা—নিশ্চয়ই পারবে—চেষ্টা করলেই পারবে। কিন্তু তাই বলে তুমি পড়াশোনা বন্ধ করতে এখন পারবে না—

কিন্তু—

তুমি তোমার পড়াশোনা শেষ কর, যতদিন না শেষ হয় আমি আছি—

কুন্তী মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়।···

ঐ সময়ই একদিন বাবার স্থাপিত কারখানাটা চোখে একবার দেখবার জন্য বনমালী কাকাকে অনুরোধ জানায় কুন্তী।

বনমালী বলে, বেশ ত, নিয়ে যাব—

নিয়ে যাব নয়—কবে নিয়ে যাবে বল?

কবে যেতে চাও তুমি বল?···

কাল—

কালই ?

হ্যাঁ—

বেশ—তাই যাব—

কলেজ থেকে ফিরে পরের দিন বনমালীর সঙ্গে বাপের স্থাপিত ঔষধের কারখানা দেখতে বের হয় কুন্তী—কারখানায় ঘুরে দেখতে দেখতে এক সময় এসে ল্যাবোরেটরিতে ঢোকে।

সেইখানেই কাজ করছিল শিশিরাংশু।

এম. এস-সি পাশ করে সামান্য মাইনায় ঐ কারখানায় মাস কয়েক হল সে রিসার্চ এ্যাসিস্টাণ্ট হয়ে এসে কাজ করছে।

॥ ৬ ॥

ট্রেণটা একটা ব্রীজের উপর দিয়ে পাশ করছিল।

নীচে নদী।

শীতের নদী শীর্ণা, খালি বালি আর বালি তার মধ্যে দিয়ে কোনমতে ঝির ঝির করে বহে চলেছে।

প্রথম ভোরের আলো নদীর জলে পড়ে থির থির করে কাঁপছে।

ফিরে তাকাল কুন্তী, সীতা ঘুমাচ্ছে।

হাওয়ায় মাথার চুলগুলো কপালের 'পরে এসে পড়েছে, সস্নেহে হাত দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে দেয় কুন্তী।

শিশিরাংশু—শিশিরাংশুই নাকি চিঠি দিয়েছে।

আশ্চর্য !

পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ডাঃ লাহিড়ী, তারই এ্যাসিস্টাণ্ট হিসাবে কাজ করছিল শিশিরাংশু। শিশির, কুন্তী চৌধুরী—আমাদের এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেকটার ডাঃ চৌধুরীর মেয়ে।

শিশির তাড়াতাড়ি হাত তুলে নমস্কার জানায়।

নমস্কার—

মৃদু কণ্ঠে প্রতি নমস্কার জানায় কুন্তী।

ছোটবেলায় গ্রীক্ ফেয়ারি টেলস-এ একটা এ্যাপোলোর ছবি দেখেছিল কুন্তী, ঠিক যেন তেমনি চেহারা—রংটা ফর্সা নয়, মাজা মাজা, কিন্তু দেহ-সৌষ্ঠবের যেন তুলনা নেই—সুগঠিত, সুঠাম দেহ।

ফিরে এল এক সময় কিন্তু মনের মধ্যে ছাপটা থেকে গেল।

পাঁচ দিনও গেল না, আবার একদিন কুন্তী কাউকে কিছু না বলে একাই কলেজের পর বাসে চেপে দমদম চলে গেল।

সোজা গিয়ে ঢুকল ল্যাবোরেটরীতে। সেদিন ল্যাবোরেটরীতে ডাঃ লাহিড়ী ছিলেন না—একাই শিশিরাংশু কাজ করছিল।

একটা টেষ্ট টিউবে যেন নীল রঙের কি একটা তরল পদার্থ নিয়ে বুনসেন বার্ণারের ফ্লেমে গরম করছিল।

ওটা কি গরম করছেন ?

কুন্তীর প্রশ্নে চমকে ফিরে তাকায় শিশিরাংশু, কে—ও আপনি—

কুন্তী মৃদু হাসে।

কখন এলেন আপনি ? শুধায় শিশিরাংশু।

এই ত—

কারখানায় কোন কাজ আছে বুঝি ?

না ত—

তবে ?

কি তবে ?

এখানে—কথাটা শেষ করে না—অসম্পূর্ণ রেখেই মুখ তুলে তাকায় শিশিরাংশু কুন্তীর মুখের দিকে।

হঠাৎ যেন কেমন লজ্জা বোধ করে কুন্তী।

সত্যিই ত, কি জবাব দেবে ঐ প্রশ্নের। কেন সে এসেছে—হঠাৎ কলেজ থেকে কেন এখানে সে চলে এসেছে ছুটির পর।

এদিকে মানে—কুন্তী বলে, এদিকে আমার এক বান্ধবী থাকে, তার কাছে এসেছিলাম—

ও—

হঠাৎ মনে হল কারখানাটা ঘুরে যাই, তাই—আচ্ছা চলি, নমস্কার—

কুন্তী আর দাঁড়ায় না—ল্যাবোরেটারী থেকে বের হয়ে পড়ে।

কোন এক সময় বোধ হয় একটা বাগানবাড়ী ছিল, অনেকখানি জায়গা, একটা পুকুরও আছে। মাঝখানে দোতলা একটা পাকা বাড়ী।

সতীনাথ বাড়ীটা কিনে আরো কিছু কিছু ঘর তৈরী করে ঔষধের কারখানাটার পত্তন করেছিলেন।

তিন বন্ধুতে মিলে করেছিলেন পত্তন। যদিও অংশে তারই টাকা বেশী ছিল। পরে সেই দুই বন্ধু কিছু কিছু আরো দিলেও সতীনাথের অংশটাই বেশী। এবং সতীনাথই প্রথম থেকে কারখানাটার পিছনে বেশী পরিশ্রম করেছেন।

কথাটা জানতে পেরেছিল কুন্তী তাদের সলিসিটার রায় এণ্ড বোসের কাছ থেকে। রায় এণ্ড বোসের সিনিয়ার পার্টনার মতি রায়ই বলেছিলেন, আর দুজন অংশীদার কারখানার থাকলেও তাদের মাত্র দু আনা করে চার আনা অংশ—বাকী বার আনা অংশের মালিক সতীনাথ ও তার দুই মেয়ে—কুন্তী ও মানসী।

এবং কুন্তী ও মানসী প্রাপ্তবয়স্ক হলে কোম্পানীর ডাইরেকটার হবার কথা ছিল। সেদিক দিয়ে কুন্তী গত বছর থেকে একজন ডাইরেকটার।

দুপাশে কিছু একতলা বাড়ী—কিছু পাকা গাঁথুনির উপর এ্যাসবেষ্টাসের শেড—মাঝখান দিয়ে লাল সুরকীর রাস্তা ও ধারে ধারে ফুলের কেয়ারি।

সন্ধ্যা হওয়ায় ইতিমধ্যে চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছিল—কুন্তী মাঝখানের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল।

গেট বরাবর আসতেই পিছনে পায়ের শব্দে ও ফিরে তাকায়।

শিশিরাংশু।

এ কি—আপনি—

হ্যাঁ, কিন্তু আপনার গাড়ি কোথায় ? শিশিরাংশু প্রশ্ন করে।

গাড়ি ত আমি আনি নি—

গাড়ি আনেন নি তবে—কিসে এলেন ?

কেন, বাসে—

সে কি ! বাসে এসেছেন ?

কি হয়েছে তাতে, তাছাড়া বাসেই ত আমি যাতায়াত করি—

চলুন—দাঁড়ালেন কেন ?

আবার দুজনে হাঁটতে হাঁটতে গেট পার হয়ে আসে। দরোয়ান কুন্তীকে সেলাম দেয়—ইতিমধ্যে সে জেনেছিল গতকালই কুন্তীর পরিচয়টা।

শিশিরাংশু আবার বলে, চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—

না, না, তার কোন প্রয়োজন হবে না—আমি একাই যেতে পারব—

তা পারবেন জানি—তা হলেও এভাবে একা আপনাকে আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না···তাছাড়া ডাঃ লাহিড়ী শুনলে আমাকে গালাগালি করবেন।

বাঃ, তা কেন করবেন—আমি ত একাই এসেছি, একা চলে যাব—

তা কি হয়, এ কোম্পানীর বলতে গেলে আপনি মালিক।

আমি একা মালিক হব কেন, আমার বোন আছে, আরো দুজন আছেন—

শিশিরাংশু হেসে বলে, আছেন, তবে আপানারা বার আনার মালিক, এবং খোদ ম্যানেজিং ডাইরেকটারের মেয়ে আপনি—

আপনি এত কথা জানলেন কি করে ?

কেন, ডাঃ লাহিড়ীই বলছিলেন—

দুজন রাস্তায় বের হয়ে কথা বলতে বলতে বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছিল—এরোড্রোমের দিক থেকে একটা খালি ট্যাক্সি আসতে দেখে শিশিরাংশু হাত ইশারায় ট্যাক্সিটা থামাল। ট্যাক্সিটা সামনে এসে দাঁড়াতেই শিশিরাংশু বলে, উঠুন—

কি দরকার—বাসেই ত অনায়াসে চলে যেতে পারতাম—

পারতেন ঠিকই—আর বাসে এখানকার কেউ আপনাকে দেখলেও হয়ত কিছু মনে করবে না। ভাববে, বিলাসিতা—কিন্তু তা হলেও সেটা উচিত হবে না—নিন উঠুন—

কুন্তী আর কথা বাড়ায় না। ট্যাক্সিতে উঠে বসে।

শিশিরাংশু সামনে উঠতে যাচ্ছিল, কুন্তী বাধা দেয়, বলে, ও কি—সামনে কেন, এদিকে আসুন—

না, না—সামনেই ত আমি বসতে পারব—

পারবেন তা জানি—এদিকে আসুন।

শিশিরাংশু ট্যাক্সিতে উঠে বসতেই ড্রাইভার ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়।

কলকাতার দিকে ট্যাক্সি চলে।

কুন্তীই আবার প্রশ্ন করে, তখন বাসে যাওয়া উচিত হবে না কেন বলছিলেন ?—

একটা কোম্পানীর ডাইরেকটার কখনো বাসে যায় না কি! তা ছাড়া যাবেনই বা কেন? আপনাদের ত অভাব নেই—

অভাব নেই বলেই কি ট্যাক্সিতে যেতে হবে না কি!

দেখুন মিস্ চৌধুরী, যে যাই বলুক, আপনার বাসে যাতায়াতটাকে কিন্তু আমি বলব—অহেতুক—

অহেতুক—

তা বৈ কি। কি জানেন ঐশ্বর্যের অহঙ্কারটা নিশ্চয়ই ভাল না কিন্তু তার যোগ্য সম্মানটুকু না দিলে যে ঐশ্বর্যকেই ছোট করা হয়—হয়ত বুঝতে পারবেন না ঠিক আমার কথাটা। বুঝতে ঠিক পারবেনও না। আমরা, নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা—আমরা যে কি ভাবে আমাদের নিজেদের সঙ্গে আপোষ করবার চেষ্টা করি সেটা আপনারা জানেন না বলেই আপনার মত একজন মানুষের পক্ষে বাস ও ট্যাক্সির পার্থক্যটা স্পষ্ট নয়।

কি জানি কেন শিশিরাংশুর শেষের কথাগুলোতে কেমন যেন লজ্জা বোধ করতে থাকে কুন্তী, তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়।

বলে, আপনি কোথায় থাকেন।

বেলেঘাটায়—

তা হলে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলুন—সেদিক দিয়ে যেতে—

কোন তার প্রয়োজন নেই—শিয়ালদহের ধার দিয়ে যাবার সময় আমি নেমে যেতে পারব—

না, না—তা কেন—আপনাকে আপনার বাড়ীর দরজায় একেবারে ড্রপ করে দিয়ে যাব।

শিশিরাংশু হেসে ওঠে।

হাসলেন যে—

এই জন্য যে—তার উপায় নেই—

উপায় নেই। কেন—

সে এক জলে-কাদায় সর্বক্ষণ—সর্ব season-এ প্যাচপ্যাচে অন্ধকার গলি—সেখানে গাড়ি ঢোকা ত দূরে থাক, রিক্শাও ঢুকতে পারে না—সেখানে ঢুকতে পারে একমাত্র আমাদের মত যারা—পায়ে হেঁটে সন্তর্পণে জামা-কাপড় বাঁচিয়ে—

কুন্তীর সেদিন মনে হয়েছিল শিশিরাংশুর কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যঙ্গের হুল রয়েছে।

সে আর কথাটা বাড়াবার চেষ্টা করে নি।

চলন্ত গাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসেছিল।

তারপর গাড়িটা যখন শিয়ালদহের কাছাকাছি এসেছে—কুন্তীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিল শিশিরাংশু।

সেদিনের কথাটা কুন্তীর আরো বেশী করে মনে আছে কারণ—বাড়ীতে এসে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে তাকে দাঁড়াতে হয়েছিল।

সতীনাথের সংসারে আত্মীয়-স্বজন বা আপনার জন যে ছিল না তা নয়।

কিন্তু কখনো সে সব আত্মীয়-স্বজনদের দেখা দূরে থাক নামও শোনে নি বাবার মুখে কারো কুন্তী। শুধু

কথায় কথায় জানত—গ্রামে একদা তার পিতামহ রমণীমোহনের আদিনিবাস ছিল এবং রমণীমোহন ছিলেন নাকি অতিরিক্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।...

তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়ে সতীনাথ সে সময় ভালবেসে এক ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহ করেছিলেন, এটা তিনি কোন দিনই ক্ষমা করতে—ক্ষমার চোখে দেখতে পারেন নি।

যতকাল নাকি বেঁচেছিলেন পুত্রের মুখদর্শনও আর করেন নি, নাম পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করেন নি। এবং মৃত্যুর পূর্বে উইল করে গিয়েছিলেন, তার সম্পত্তির এক কপর্দক বা রাস্তভিটার 'পরে কোন দাবিই থাকবে না সতীনাথের।

সতীনাথকে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করে গিয়েছিলেন।

তার আর এক ছেলে রতিনাথকে সব কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন। রতিনাথ গ্রামের বাড়ীতেই থাকতেন এবং কোন দিন তাকে কুন্তীরা দেখে নি।

গ্রামে থেকে জেলা আদালতে ওকালতি করতেন রতিনাথ।

সেদিন গৃহে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছে কুন্তী, ভৃত্য সাধুচরণ এসে সামনে দাঁড়াল।

বড়দিমণি—

কি রে, মা কেমন আছে?

ভাল—কিন্তু ওদিকে যে তোমার দেশ থেকে কাকা-কাকীমা ও তার দুই ছেলে এক মেয়ে এসে হাজির—

সেকি—

তুমি কলেজে যাবার কিছুক্ষণ পরেই এসেছেন—এসেই সব তচনচ করে বেড়াচ্ছেন সারা বাড়ী—

কুন্তীর কিন্তু কাকা দেশের বাড়ী থেকে এসেছেন শুনে আনন্দই হয়, সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, সত্যি—কোথায়? কোথায় কাকা—

যান উপরে, কত্তাবাবুর ঘরটা দখল করে বসেছেন—

রতিনাথ দেশ থেকে এসেছেন শুনে আনন্দ হয়েছিল কুন্তীর এই কারণে যে এত বড় বাড়ীতে মাথার উপরে কেউ নেই—রুগ্না পক্ষাঘাতগ্রস্তা মা—একমাত্র ছোট বোন মানসী, একা একা যেন কুন্তী হাঁপিয়ে উঠেছিল এই কয়দিনেই—

বাবা চলে যাওয়ায় বাড়ীটা যেন একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছিল কুন্তীর কাছে।

একমাত্র বোন মানসী—সে তার চাইতে অনেক ছোট—তা ছাড়া সে ত এখনো ছেলেমানুষ বলতে গেলে—তাকে না যায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করা বা না যায় কোন পরামর্শ গ্রহণ করা।

নিজেও সে কয়েকদিন থেকে ভাবছিল, দেশে ত তার কাকা আছেন শুনেছে সে—তাকেই না হয় ডেকে আনবে।

মাথার উপর একজন না থাকলে কেমন যেন অসহায় লাগে বড়।

যাক—কাকা নিজে থাকতেই এসে গেছেন—খুব ভাল হয়েছে।

॥ ৭ ॥

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতেই একটি মোটা-সোটা কালো সাধারণ একখানি মিলের লালপাড় শাড়ি পরণে—হাতে শাঁখা ও মোটা হাঙ্গরমুখী বালা মাথায় তেল সিন্দুর—একজন মহিলার সামনে পড়ে গেল কুন্তী।

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে কুন্তী।

মহিলাটি ভ্রূ কুঞ্চিত করে কুন্তীর আপাদমস্তক বার দুই নিরীক্ষণ করে শ্যেন দৃষ্টিতে খনখনে গলায় প্রশ্ন করে, কে গা তুমি—

কুন্তী ততক্ষণে অনুমান করে নিয়েছে মানুষটিকে। সেই যে তার সদ্য দেশগ্রাম থেকে আগত তার কাকীমা ছাড়া অন্য কেউ নয় মনে মনে সেটা সম্পর্কে স্থির হয়েই হাসি হাসি মুখে বলে, আপনিই বোধ হয় আমার কাকীমা—আমি কুন্তী, বলতে বলতে কুন্তী এগিয়ে যায় মহিলার পদধূলি নেবার জন্য।

মহিলা অর্থাৎ নিস্তারিণী দেবী—তাড়াতাড়ি কুন্তীর স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য দু পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, থাক থাক্, ছুঁয়ো না বাপু—একে সর্দির ধাত আমার, এই ভরসন্ধ্যা রাত্রে আবার নাইতে পারব না—

কুন্তী ততক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে—কিছুটা ব্যবধানে।

ইতিমধ্যে ওদিককার ঘর থেকে চটি জুতোর চটাস চটাস শব্দ করতে করতে তালগাছের মত রোগা ঢ্যাঙ্গা—চিমসে এক পুরুষ—বারান্দায় নিস্তারিণীর পাশে এসে দাঁড়ায়।

এটি কে গিন্নী—তারা—তারা—

আগন্তুকের প্রশ্নে তার দিকে এবারে ভাল করে তাকায় কুন্তী।

মাথাভরা তেল চকচকে বড় বড় বাবরী চুল—কপালে সিন্দূরের ফোঁটা, পরিধানে একটি ধুতি ও বেনিয়ান।

গায়ের বর্ণ রীতিমত যাকে বলে গৌর।

তারা—তারা—

চিনতে পারছ না?

না ত—

তোমার দাদার কন্যেরত্ন এটি—

বল কি!

হ্যাঁ—মাগো মা, এ যে বিয়ে দিলে চার ছেলের মা হয়ে যেত—

আঃ, হঠাৎ ধমকে ওঠে রতিনাথ স্ত্রীকে, থাম ত—কি আবোল-তাবোল সব বকতে সুরু করলে।

তা সত্যি কথা বললে যদি আবোল-তাবোল বকা হয় ত আমি বাপু নাচার—ঢং মিনষের—বলে মুখটা ঘুরিয়ে নিস্তারিণী স্থান ত্যাগ করে।

কুন্তী তখনো পাথরের মত দাঁড়িয়ে।

রতিনাথই কথা বলে, তোমারই নাম মা কুন্তী।

হ্যাঁ—

কুন্তী এবারে যেন কিছুটা সাহস পায়, এগিয়ে গিয়ে রতিনাথের পায়ের ধূলো নেয়।

থাক মা—থাক, বেঁচে থাকো—দেখ মা, তোমাকে না জানিয়ে দাদার ঘরটা আমি ব্যবহার করবার জন্য নিয়েছি—

তাতে কি হয়েছে, বেশ করেছেন—আপনি বাবার ঘরে থাকবেন সে ত ভালই—

আমি জানতাম—আমার মামণি, আমার অসম্মান করবে না। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে ত সব কথা হবে না, চল, ঘরে চল—

কুন্তী রতিনাথের সঙ্গে সঙ্গে অনেকদিন পরে আবার তার বাবার ঘরে এসে ঢুকল।

সতীনাথের গৃহত্যাগের পর আর সে ঘরে পা দেয় নি।

ঘরে তালা দেওয়াই থাকত, কেবল সকালে বিকালে ভৃত্য একবার ঘরটা পরিষ্কার করে রাখত।

কুন্তীরই নির্দেশ ছিল সেটা।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে রতিনাথ বলে, হয়ত একটা কথা তোমার মনে হবে মামণি, আর মনে হওয়াটাও স্বাভাবিক। এতদিন কখনো আসি নি—একটা চিঠি লিখে তোমাদের কোন খোঁজ-খবর পর্যন্ত নেই নি—আজ হঠাৎ এসে হাজির হলাম—

কুন্তী কি আর বলবে, চেয়ে থাকে কেবল রতিনাথের মুখের দিকে। তার বাবার মতই কাকার রংটা ফর্সা বটে, কিন্তু আশ্চর্য, মুখটার মধ্যে যেন কোথায়ও কোন আদলই খুঁজে পাচ্ছে না। বাবার মুখের মধ্যে যে একটা শান্ত সৌম্য গাম্ভীর্য ছিল, কাকার মুখের মধ্যে কোথায়ও যেন সেটা নেই।

কোথায় যেন সূক্ষ্ম কি একটা পার্থক্য আছে।

অথচ বাবারই সহোদর ভাই।

আর কখনো ত বাবা কাকার নামও মুখে আনেন নি। কেন—তার ঠাকুর্দা তার বাবার সঙ্গে তার মাকে বিবাহ করার জন্য সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলেন বলেই কি। মনের মধ্যে ঐ মুহূর্তে কুন্তীর সেই কথাগুলোই যেন বার বার উদয় হতে থাকে।

কি জান মা—

রতিনাথের গলার স্বরে চমকে আবার কুন্তী তার মুখের দিকে তাকায়। রতিনাথ বলে, লজ্জায় বুঝলে মা—লজ্জায়, বাবা দাদার উপর যে অন্যায় বিচার করেছিলেন তার লজ্জাটাই আমাকে সর্বদা দগ্ধ করেছে। মরবার সময় দাদাকে তার এক কপর্দকও দিলেন না—সব দিয়ে গেলেন আমাকে—তারা—তারা—

ও সব কথা থাক কাকা—বাধা দেয় কুন্তী।

কেমন লজ্জা করে তার।

না মা—থাক বললেই আজ আর সেটা চাপা দেওয়া যায় না। তা ছাড়া দাদাকে সম্পত্তিচ্যুত করা মানে ত তোমাদেরও করা—তোমাকে, মানসীকে—দাদা যদি তার বিচারে অপরাধী হনও তোমরা ত কোন অপরাধে অপরাধী নও মামণি—তবে তোমরা কেন তা সহ্য করবে। জান মা, একটু থেমে বলে রতিনাথ, সব কিছু যদি আমার জ্ঞাতসারে হ'ত—অর্থাৎ বাবা করবার সময় আমি যদি জানতে পারতাম নিশ্চয়ই আমি বাধা দিতাম, বলতাম, এত বড় অন্যায় করবেন না বাবা। কিন্তু তা ত নয়—কিছুই ত আমি জানতে পারি নি—জানলাম তার মৃত্যুর পর প্রথম। তারা—তারা—

আপনি জানতেন না?

না—ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি—তারপর তার মৃত্যুর পর যখন জানতে পারলাম—লজ্জায় দাদাকে কিছু জানাতে পারি নি—

কেন?

দাদা যদি অন্য রকমটা মনে করেন যে আমিই বাবাকে দিয়ে কৌশলে সব করিয়ে নিয়েছি—তারা—তারা—

কুন্তী আবার বাধা দেয়, ওসব কথা থাক কাকা—

তুমি ঠিকই বলেছ মা—সেই দাদারই ত মেয়ে তুমি—হবে না কেন, বলবে না কেন—তারা, তারা—আর মনে আমার সেদিন কোন পাপ ছিল না বলেই তোমরা না বলা সত্ত্বেও লোকমুখে দাদার গৃহত্যাগের সংবাদ পেয়েই

ছুটে এসেছি। তোমাদের এতবড় বিপদ বৌঠান পঙ্গু—মৃত্যুপথ যাত্রী—তোমরা দুটি শিশু, মাথার উপর একজন অভিভাবক নেই তাইত ছুটে এলাম—

বাইরে থেকে ঐ সময় বনমালী সরকারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মামণি—

আসুন বনমালী কাকা—আমি এই ঘরে—

কুন্তী তাড়াতাড়ি বলে।

একটা খাতা ও চেক বই নিয়ে বনমালী এসে ঘরে ঢোকে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাকায় রতিনাথ বনমালীর দিকে—বার কয়েক তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে কুন্তীর দিকে তাকিয়ে বলে, এ কে মা ?

বনমালী কাকা—বলেই কুন্তী বনমালীর দিকে তাকিয়ে বলে, বনমালী কাকা—ইনি আমার কাকা; দেশ থেকে এসেছেন—

গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে কেবল বলে, জানি—

আমার নিজের কাকা, বাবার সহোদর ভাই—

কুন্তীর শেষের কথাগুলোর কোন আর জবাব দেয় না বনমালী—রতিনাথের দিকে ফিরেও তাকায় না—তার দিকে তাকিয়েই বলে, তুমি বোধ হয় এখন ব্যস্ত আছ মা—থাক, না হয় কাল সকালেই হিসাবটা দেখ—আর চেক ক'টা সই করে দিও—

না, না—ওকে ছেলেমানুষকে আর বিরক্ত করা কেন বনমালীবাবু, আমি যখন এসেই পড়েছি—রতিনাথ বলে ওঠে, ছেলেমানুষ ও এখন, ওর হেসে খেলে বেড়াবার সময়, আমিই ওসব দেখতে পারব। চলুন বরং আপনার ঘরে গিয়ে দুজনে বসা যাক—বনমালী কিন্তু রতিনাথের কথায় কোন সাড়াও দেয় না—উৎসাহও দেখায় না। এমন কি রতিনাথের দিকে ফিরেও তাকায় না—ঘর থেকে বেরুবার জন্য পা বাড়ায় এবং যেতে যেতে বলে, কাল সকালেই তবে হবেখন মামণি—

বনমালী ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আর প্রচণ্ড ক্রোধে—অপমানে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল রতিনাথ ঘরের মধ্যে।

কুন্তী যেন নিজেকে হঠাৎ কেমন বিব্রত বোধ করে। অতঃপর তার কি যে করা কর্তব্য—কি করলে শোভন হবে কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারে না।

ঐ সময় প্রশ্ন করে রতিনাথ আবার, লোকটা কে মামণি ? এর কথাত কখনো শুনি নি ?

বাবার বন্ধু—

দাদার বন্ধু—তা—

অনেকদিন এখানে আছেন, বাবা ওরই হাতে আমাদের সব কিছু দিয়ে গিয়েছেন—

সে কি ! না, না, এ ত ভাল নয়—কোথাকার কে, এতবড় বিরাট সম্পত্তি—

উনি সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী মানুষ—প্রথম জীবনে বিপ্লবী ছিলেন তারপর দেশ স্বাধীন হলে—

কি বললে, বিপ্লবী—terrorist—তারা, তারা—

হ্যাঁ—

বুঝলে মা, ওরা হচ্ছে দেশের শত্রু—

এ কি বলছেন আপনি—

হ্যাঁ, তুমি জান না, গান্ধীজী কোন দিন ওদের ভাল চোখে দেখেন নি—

না, না—তা কেন হবে—ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, কানাইলাল, রাসবিহারী, সূর্য সেন—মহাত্মাজী তাদের প্রত্যেককে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন।

রতিনাথ অত্যন্ত চতুর মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে কথার সুরটা পালটে দেন। বলেন, না—না মামণি—আমি ঠিক তা বলি নি—terrorist মাত্রেই যে সব দেশপ্রেমিক ছিল তা নয়, তার মধ্যে ছদ্মবেশী অনেক কুখ্যাত ডাকাতও ছিল। যাক গে সে সব কথা, বনমালীর কথা এখন আমার মনে পড়ছে বটে দাদার মুখে দু একবার যেন শুনেছি—তা হলে ঐ সব দেখাশোনা করছে?

হ্যাঁ—আমরা ত সব বুঝি না—ব্যবসা বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার—

তা অবিশ্যি ভালই হয়েছে—মেয়েছেলেরা কি এসব পারে তাও তোমাদের মত বালিকা মাত্র যারা বয়েসে তবে আর ভয় নেই মামণি, আমি যখন এসে গেছি—তুমি নিশ্চিন্ত থাক সব, আমি দেখে দেব।

কিন্তু দেখা গেল গণ্ডগোল সেই খানেই বেধে গেল সর্বপ্রথমে।

কুন্তী চিনতে পারে নি সেদিন তার কাকাকে কিন্তু বনমালী ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন মানুষটাকে। তাই যখনই বিষয় সম্পত্তি ও ব্যবসার ব্যাপারটা রতিনাথ নিজে হাতে নেবার চেষ্টা করেন—বনমালী নানা অজুহাত দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে যান।

তবে বুদ্ধিমান রতিনাথ, খুব একটা বেশী তাড়াহুড়া করেন নি। ধীরে ধীরে তিনি কঠিন মুঠি বিস্তার করে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

রতিনাথ গৃহিণী নিস্তারিণী দেবী কিন্তু অত-শতর ধার ধারে নি—সে সোজাসুজিই এগিয়ে গিয়েছিল এবং হালহীন অন্দরের সমস্ত কর্তৃত্বটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিয়েছিল। নিস্তারিণীর বেশী বেগ পেতে হয় নি ব্যাপারটায়, কারণ কুন্তীর মা নর্মদা দেবী অসুস্থ হবার পর অন্দরের ব্যাপারটা ত চাকর-বাকর ও ঠাকুররাই যে যার নিজের ইচ্ছা ও খুশি মত অসংলগ্ন ভাবে চালাচ্ছিল।

কুন্তী ত ওসবে কখনো মাথা গলাতই না—আর মানসী ত বালিকা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

নিস্তারিণী সংসারের হালটা শক্ত হাতে ধরায় কুন্তী বরং স্বস্তি পেয়েছিল—নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচেছিল।

তাছাড়া কুন্তীর জীবনে তখন এসেছে শিশিরাংশু।

॥ ৮ ॥

শিশিরাংশু তখন কুন্তীর সমস্ত জীবনকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

কেমন করে কি ভাবে যে সে তখন দিনের পর দিন শিশিরাংশুর প্রতি একটা অঙ্গ আকর্ষণ অনুভব করেছে—কথাটা ভাবতে গেলে আজও যেন তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

কারণ স্বর্ণেন্দুও প্রায় ঠিক সেই সময়ই বলতে গেলে তার জীবনে এসেছে।

শিশিরাংশু আর স্বর্ণেন্দু।

সদ্য ঘুমভাঙ্গা আলোর ভিতর দিয়ে যেন মেল ট্রেণটা তখন কলকাতা অভিমুখে ছুটে চলেছে। বার্থের উপর শুয়ে সীতা এখনো ঘুমাচ্ছে।

বরাবরই সীতার বেলায় ঘুম ভাঙ্গে। কাজেই এখনো তার ঘুম ভাঙ্গার সময় হয় নি। হাওয়ায় সীতার পশমের মত পাত্‌লা চুলগুলো উড়ে উড়ে কেবলই কপালে এসে পড়ছে। চেয়ে চেয়ে দেখে কুন্তী সীতার ঘুমন্ত মুখখানার দিকে।

আশ্চর্য মিল।

ঠিক যেন মানসীর ছোটবেলার মুখখানা।

ঠিক তেমনি—বাঁ চোখের কোলের কাছে ছোট তিলটা পর্যন্ত।

কিন্তু মানসীর মত গায়ের রং নয়—মানসী ত কালো—যাকে বলে বেশ কালো। সতীনাথ ও নর্মদার মধ্যে একজন ছিল কালো, একজন গৌর।

মা ছিল কালো।

মায়ের রং পেয়েছে মানসী।

আর সে পেয়েছে বাবার রং।

বাবা।

আচ্ছা, বাবা কি আজো বেঁচে আছেন?

সেই যে একদিন রাত্রিশেষে চলে গেলেন আর তার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না—

বনমালী কাকা অনেক খোঁজ করেছিলেন কিন্তু কোন সংবাদই পান নি।

কত বছর হ'ল!

হিসেব করে মনে মনে—তা প্রায় দীর্ঘ নয় বছর হয়ে গেল।

পূজোর পর একবার করে বনমালী কাকা বের হতেন বাবার সন্ধানে—শেষবার এসে বলেছিলেন ফিরে এসে—যোশীমঠের কাছে নাকি একজনকে এক সন্ধ্যায় বাবার মত কাকা দেখেছিলেন কাকে।

এক সন্ন্যাসী—

আলাপ করবার চেষ্টা করেছিলেন বনমালী কাকা সন্ন্যাসীর সঙ্গে কিন্তু সন্ন্যাসী আলাপ করেন নি—তিনি মৌনব্রত নিয়েছেন।

মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ ও মাথাভরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, পরনে গেরুয়া, তবু বনমালী নাকি তাকে চিনতে পেরেছিলেন।

এবং তিনি যে বনমালীকে চিনেছিলেন সে বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ।

কুন্তীর ইচ্ছা হয়েছিল বনমালী কাকাকে নিয়ে সে যোশীমঠে যাবে কিন্তু যাওয়া আর হল না তার। একটার পর একটা বিপর্যয় তার জীবনে ঘটে গেল মাত্র মাস পাঁচেকের মত পর পর। এবং বিপর্যয় প্রথমই হচ্ছে—দীর্ঘ সাত বছর বাদে বনমালী এক সন্ধ্যা রাত্রে তাদের বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন।

কিন্তু তখন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল কুন্তী তার চাইতেও বড় বিপর্যয় তার জীবনে ঘনিয়ে এসেছে।

তার জীবনটাই একেবারে ওলোট-পালোট হতে চলেছে।

শিশিরাংশু—

আচ্ছা, কোথায় যেন পড়েছিল কুন্তী Face is the index of men—গোটা মানুষটাই তার মুখের দর্পণে প্রতিফলিত হয়—

বাজে কথা, মিথ্যা কথা—কবি-কল্পনা কিংবা সাহিত্যের সুন্দর একটি কথা।

নচেৎ শিশিরাংশু—যার অমন দেবোপম চেহারা, অমন সুন্দর স্বর্গীয় সুখ—অমন শান্ত স্বপ্নালু স্নিগ্ধ দুটি চোখ—তার ভিতরটা অমন কুৎসিত জঘন্য হীন হল কি করে।

হতে পারেই বা কি করে—

নিজের অজ্ঞাতে বুঝি আবার ফিরে তাকাল কুন্তী সামনেই বার্থের পরে নিদ্রিতা সীতার মুখখানার প্রতি—

সীতা, সীতা, তুইও কি অমন হবি মা—

হোস না রে, হোস না—ঘৃণায় মানুষ থুতু দেবে তোর গায়ে।

আচ্ছা—শিশিরাংশুর চেহারাটা দেখেই ভাল লেগেছিল বলেই কি কুন্তী সেদিন ভুলেছিল। কিন্তু ভাল লাগা আর ভালবাসা ত এক বস্তু নয়।

সে যে সত্যি সত্যিই শিশিরাংশুকে ভালবেসেছিল।

ভাল লাগা—চোখের নেশা নয়—সত্যিকারের ভালবাসা। যে ভালবাসার জন্য একদিন সে সর্বস্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিল।

আর করেও নিকি তাই—

বনমালী কাকা চলে যাবার পর সে কি নিজেই ব্যাঙ্কে গিয়ে কাকার নামে চেক সই করবার অধিকার দেয় নি—

ঔষধের কোম্পানীর ডিরেকটার তাকে করে দেয় নি।

কিন্তু বনমালী কাকা কি যাবার সময় বলে যান নি—স্পষ্ট করেই ত সব বলে গিয়েছিলেন।

অনেকদিন ধরেই বিষের ধোঁয়ার মত ধোঁয়াচ্ছিল ব্যাপারটা।

কিন্তু বনমালী কাকা যেন স্থির প্রতিজ্ঞ; কিছুতেই রতিনাথকে মেনে নেবেন না।

হাজারো অপমান—বক্রোক্তি—বিরুদ্ধাচারণ তবু—তিনি যেন অচল অটল। রতিনাথ তখন রীতিমত ক্ষেপে উঠেছেন—

যে কোন প্রকারে তখন তিনি সব কিছু থেকে বনমালীকে সরাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কুন্তী যে ব্যাপারটা একেবারে বুঝতে সেদিন পারে নি তা নয়।

বুঝতে সে পেরেছিল বৈকি, কারণ রতিনাথের আক্রমণটা ছিল স্পষ্ট এবং খোলাখুলি। সে যেন স্পষ্টই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কুন্তী বেশ একটু যেন ভীতই হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বনমালী কাকার মুখের দিকে তাকালেই সাহসটা যেন সে আবার ফিরে পেত।

তাছাড়া বুঝলেও সব কিন্তু তার মনটা ছিল সে সময় অন্যত্র।

শিশিরাংশু ইতিমধ্যে কুন্তীর কাছে প্রতিশ্রুতি পেয়ে জার্মাণীতে যাবার ব্যবস্থা প্রায় শেষ করে এনেছে। ঔষধের কারখানায় তার রিসার্চের চাকরিটাতে ইস্তফাও দিয়ে দিয়েছে শিশিরাংশু।

অবিশ্যি কুন্তীই তাকে প্ররোচিত করেছিল।

চাকরিটা কারখানার তুমি ছেড়ে দাও শিশির—কুন্তী বলে।

বল কি—তারপর—

তারপর আবার কি—দুদিন বাদে যে সমস্ত কারখানার মালিক হবে তার পক্ষে সামান্য ঐ চাকরি! তুমিই বল, ভাল দেখায় কি?

কিন্তু—তুমি ত জান কুন্তী—আমার সংসারে বুড়ো মা আছেন—দুটি অবিবাহিতা বোন, তারা কলেজে পড়ে—একটি ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। সবই ত আমার 'পরে নির্ভর—

তা জানব না কেন?

তবে?

আমি ত আছি—

প্রথমটায় কুন্তীর ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে নি শিশিরাংশু—তাই ওর মুখের দিকে তাকায়।

কুন্তী আরো স্পষ্ট করে তখন বলে, তোমাকে আর আমাকে পৃথক করে দেখছ কেন—

কুন্তী—

কুন্তীর ইঙ্গিতটা তখন স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে শিশিরের কাছে।

হ্যাঁ—তোমার যা দরকার—আমার কাছ থেকেই নিও—

বিয়ের আগেই?

বিয়ে ত একদিন হবেই—আজ না হয় কাল—

কিন্তু—না, না—ছিঃ, সে আমার বড় লজ্জা করবে—

লজ্জার কি আছে এতে—আর দুমাস বাদে তুমি জার্মাণী যাচ্ছ—যাবার আগে আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে যখন—

কুন্তী—

হ্যাঁ, বিয়ের পরে তুমি জার্মাণী চলে যাচ্ছ, যতদিন না ফিরে আস আমাকেই ত দেখতে হবে সব—

শিশিরাংশু কুন্তীর হাতটা চেপে ধরে বলে, সত্যি, তুমি আমাকে বাঁচালে কুন্তী, কি দুর্ভাবনা যে ইদানিং আমাকে ধরেছিল—

কুন্তী হাসে—তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে, শোন যে জন্য আজ বিশেষ করে তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল—

আজ্ঞা কর দেবী—দাস হুজুরের হাজির—হাসতে হাসতে শিশিরাংশু অভিনয়ের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে।

তোমার যাবার দিনও এগিয়ে এল—এবারে বনমালী কাকাকে আমাদের বিয়ের কথাটা বলি—

বেশ ত, কিন্তু আমি বলছিলাম—

কি?

জার্মাণী থেকে ফিরে এসে আমাদের বিয়েটা হলে হত না—

কেন?

তোমাকে একটা বাঁধনে এভাবে বেঁধে রেখে যাব—

সে কি কথা—বাঁধন কেন বলছ—তাই ত আমরা দুজনে চাইছি আজ—

চাইছি নিশ্চয়ই কিন্তু—কত রকম আপদ-বিপদ বিদেশে ঘটতে পারে—

ভয় নেই গো—ভয় নেই; আমার শুভেচ্ছা আর ভালবাসাই তোমাকে জেনো নির্বিঘ্নে আবার আমার কাছে পৌঁছে দেবে—

এত বিশ্বাস তোমার কুন্তী—

নয় কেন ?

সেই দিন—সেই দিন রাত্রেই গৃহে ফিরে কুন্তী দেখে বাইরের ঘরে স্বর্ণেন্দু বসে আছে একাকী—

স্বর্ণেন্দু ওকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।

এতদিন আলাপ হয়েছে তবু স্বর্ণেন্দুর কি যে লজ্জা কুন্তীর সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে আজও কথা বলতে পারে না।

ঔষধের কারখানার নতুন ডেঃ ম্যানেজার হয়ে এসেছে স্বর্ণেন্দু—মাস দশেক আগে।

অনেক অ্যাপ্লিকেশন পড়েছিল পোষ্টটার জন্য—ডাইরেকটাররা ইণ্টারভিউ নিয়ে ঐ স্বর্ণেন্দুকেই পঞ্চাশ জনের মধ্যে পছন্দ করেন।

কুন্তী নিজেও ছিল সিলেকশন বোর্ডে—

বছর খানেক হয় কুন্তী ম্যানেজিং ডাইরেকটার হয়েছে কারখানার, সেই সুবাদেই স্বর্ণেন্দুকে ঘন ঘন আসতে হয় কুন্তীর কাছে।

কি ব্যাপার স্বর্ণেন্দুবাবু, কতক্ষণ—

এই কিছুক্ষণ !

কিন্তু আপনার ফাইল কই ?

সেজন্য আসি নি—

তবে ?

আমি আপনাদের কাজে রেজিগনেশন দিয়েছি আজ—

সে কি—হঠাৎ কি হ'ল ?

ব্যাপারটা আপনাকে বলা দরকার—আমার রেজিগনেশন লেটারে অবিশ্যি আমি কোন কারণ দর্শাই নি কিন্তু আপনাকে বলব বলেই এসেছি—

বসুন—বসুন, কি ব্যাপার আমায় বলুন।

আমি অবিশ্যি জানতাম না যে—স্বর্ণেন্দু ইতঃস্তত করতে থাকে।

থামলেন কেন বলুন—

শিশিরাংশুবাবু এ বাড়ীতে বিশেষ একজন হয়ে শীঘ্রই আসছেন—

হঠাৎ কুন্তীর কপোল ও কপাল রাঙা হয়ে ওঠে লজ্জায়। সে মাথাটা নীচু করে—

অবিশ্যি—স্বর্ণেন্দু আবার বলে, very—very happy news—কিন্তু—

কুন্তী স্বর্ণেন্দুর মুখের দিকে তাকাল।

সব হয়ত পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে, তাই না ?

হুঁ—

এ সময় বোধ হয় আমার কথাটা বলা উচিত হবে না—

কেন বলুন ত—কি কথা—

শিশিরাংশুকে কতদিন আপনারা জানেন তা জানি না—আমি কিন্তু তাকে দীর্ঘদিন, মানে, কলেজ-জীবন থেকেই জানি। He was all along a brilliant student সে সবাই জানে—আমরাও জানি—কিন্তু—

কি, থামলেন কেন!

॥ ৯ ॥

দেখুন মিস চৌধুরী, স্বর্ণেন্দু একটু থেমে বলে, ক'টা মাস আপনাদের নুন খেয়েছি—তা ছাড়া আপনাদের কোম্পানী—বিশেষ করে আপনার কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি কোন দিন তা ভুলতে পারব না—তাই বলছিলাম ব্যাপারটা পাকাপাকি করার আগে শিশিরাংশুবাবুর সম্পর্কে একটু ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

কি বলতে চান আপনি স্বর্ণেন্দুবাবু, স্পষ্ট করে বলুন—

আমি যতদূর জানি—

কি?

স্বর্ণেন্দু—একটু থেমে যেন একটু ইতঃস্তত করে বলে, শিশিরাংশুবাবু বিবাহিত—

সে কি!

হ্যাঁ—একই গ্রামে আমাদের বাড়ী—সেখানে এক বিধবা ভদ্রমহিলার মেয়ের সঙ্গে ওর আলাপ হয়—তাকে বিয়ে করেছিল—

তারপর?

তারপর আমি ঠিক জানি না—তবে সে মেয়েটিকে কিছুদিন আগে দেখলাম এক অফিসে কাজ করতে।

সত্যি, সত্যি বলছেন আপনি স্বর্ণেন্দুবাবু—

আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন না—সেই মেয়েটির মানে শর্মিলার ঠিকানা আমি দিয়ে যাচ্ছি।

কুন্তী যেন হঠাৎ পাথর হয়ে যায়।

অকস্মাৎ যেন সমস্ত পৃথিবীটা শূন্য হয়ে গিয়েছে। কোথায়ও যেন এতটুকু হাওয়াও অবশিষ্ট নেই।

আমি হয়ত আপনাকে অত্যন্ত রূঢ় আঘাত দিলাম মিস্ চৌধুরী, কিন্তু আরো বেশী আঘাতের থেকে আপনাকে বাঁচাবার জন্যই, আর বিশ্বাস করুন আপনাদের মঙ্গল চিন্তা ছাড়া আমার আর কিছুই ছিল না—আচ্ছা আসি, নমস্কার—

স্বর্ণেন্দু যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায় এবং ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

স্বর্ণেন্দুবাবু—

কুন্তীর ডাকে স্বর্ণেন্দু ফিরে দাঁড়ায়।

কিন্তু আপনি ত বললেন না রেজিগনেশন কেন দিলেন?

শিশিরাংশুবাবু গতকাল হঠাৎ অফিসে গিয়েছিলেন—

কেন?

তার নাকি এক মাসের মাইনা প্রাপ্য—

সেই টাকা নিতে গিয়েছিলেন শিশিরাংশুবাবু?

হ্যাঁ—ম্যানেজার ডাঃ ভাদুড়ী ছিলেন না তাই আমার সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলেন। তাতে আমি বলি, ম্যানেজার বা আমি কেউই—কমিটির বিনা অনুমতিতে এখন আর তার সঙ্গে কিছুই করতে পারি না—তাই হঠাৎ তিনি চটে উঠলেন—

তারপর।

যাচ্ছে তাই করে আমাকে বললেন—এবং তখুনি বললেন, শীঘ্রই তিনি কোম্পানীর হর্তাকর্তা হয়ে আসছেন—তখন নাকি তিনি আমার মত দুর্বিনীতকে প্রথমেই যোগ্য শিক্ষা দেবেন।

আপনাকে একথা বললেন!

হ্যাঁ—আর পাশে সে সময় আপনার বোন—

আমার বোন—চমকে উঠে আবার কুন্তী।

হ্যাঁ, মানসী দেবী তার সঙ্গেই ছিলেন—বুঝতে তখন আমি পারলাম সমস্ত ব্যাপারটাই—টাকা অবিশ্যি তাকে আমি দিই নি, কিন্তু এর পর আর চাকরি করা কি আমার ঠিক হবে, আপনিই বলুন?—একটু থেমে আবার বলে, স্বর্ণেন্দু, তাই আজ রেজিগনেশন দিয়েছি—

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা স্বর্ণেন্দুবাবু—মানসী—মানসী কারখানায় শিশিরাংশুর সঙ্গে গিয়েছিল কাল কিন্তু আমার যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

স্বর্ণেন্দু চলে যাবার পরও কুন্তী অনেকক্ষণ সোফাটার উপর ঝিম্ দিয়ে বসে থাকে।

মানসী শিশিরাংশুর সঙ্গে কারখানায় গিয়েছিল কেমন করে তা সম্ভবপর হবে?—তার কোন এক বান্ধবীর বিয়েতে সেই দুপুরে মানসী চলে গিয়েছে, বলে গিয়েছিল ফিরতে রাত হবে।

গাড়ি নিয়ে যাবার কথায় মানসী বলেছিল, তার কোন প্রয়োজন নেই, তার বান্ধবীই তাকে পৌঁছে দেবে।

আর শিশিরাংশু, তার ত জাহাজের কি সব প্যাসেজ বুকিংয়ের ব্যাপারে সারাটা দিন ব্যস্ত থাকবার কথা।

কতক্ষণ যে কুন্তী বসেছিল সোফাটার উপর নিজেরও খেয়াল নেই, হঠাৎ এক সময় ভৃত্যের ডাকে তার খেয়াল হয়।

বড়দিমণি, আপনি এখানে বসে—

কে, গণেশ?

হ্যাঁ—বড়দিমণি।

হ্যাঁরে—বনমালী কাকা তার ঘরে আছেন?

না ত—তিনি ত এখনো ফেরেন নি—

ছোড়দিমণি?

এই ত ফিরলেন—

কুন্তী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

দোতলায় মানসী থাকে। একেবারে বারান্দার শেষ প্রান্তের ঘরটায়। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতেই কানে বাজে এসে দোতলার ক্যাদেল ক্লকটায় ঢং ঢং করে রাত্রি এগারটা ঘোষণা করছে।

অনেক রাত হয়েছে।

এত রাত হয়ে গিয়েছে ও টেরই পায় নি।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে কাকার ঘর পড়ে—রতিনাথ বোধ হয় তার রাত্রের আহারপর্ব শেষ করলেন—উদ্গার তুলতে তুলতে তারা নাম স্মরণ করছেন—তারা—তারা—

পা যেন আর চলতে চাইছে না।

কোনমতে টেনে টেনে চলে কুন্তী—মানসীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল—ঘরের দরজা ভেজান—ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের আলো দেখা যায় আর গুন গুন গান শোনা যায়।

মুহূর্তকাল ইতঃস্তত করে কুন্তী—

তারপর হাত দিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল—নাইট গাউনটা গায়ে চড়িয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাদা হাতীর দাঁতের চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল মানসী—আয়নার উপর কুন্তীর ছায়া প্রতিফলিত হতেই সে ঘুরে দাঁড়ায়—দিদিভাই—

কুন্তী ততক্ষণে দরজাটা ভিতর থেকে নিঃশব্দে বন্ধ করে দরজার 'পরে পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মানসীর মুখোমুখি।

মানসী—

কুন্তীর কঠিন মুখের দিকে চেয়ে মানসী বুঝতে পেরেছিল—বা আঁচ করতে পেরেছিল হয়ত কিছুটা ব্যাপারটা।

কিছু বলবে?

তুমি কাল আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলে কেন?

মিথ্যা কথা বলেছি!

হ্যাঁ—তোমার বান্ধবীর বিয়েতে যাবার নাম করে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

আমি, আমি মানে—কেন আমি ত—সেখানেই গিয়েছিলাম—

না, যাও নি।

তবে, কোথায় আমি গিয়েছিলাম!

সেইটাই জানতে চাইছি, কোথায় গিয়েছিলে?

বাঃ রে, তুমি ফোন করে দেখ না—

মানসী, চাপা কণ্ঠে যেন গর্জন করে ওঠে কুন্তী, শোন, আমি জানি তুমি কোথায় গিয়েছিলে—তুমি আর শিশিরাংশু—

মানসী এবারে মাথা নীচু করে, আর কোন জবাব নেই তার মুখে।

শিশিরাংশুর সঙ্গে তুমি কারখানায় গিয়েছিলে কেন? জবাব দাও।

সিনেমায় গিয়েছিলাম, ফেরার পথে শিশিরাংশুদা বললে—কারখানায় ঘুরে যাবে একবার, তাই—

আবার মিথ্যা বলছ—সিনেমায় কোন্ শোতে গিয়েছিলে?

ম্যাটিনী শোতে—

শোন, যেন আর কখনো তোমাকে আমি শিশিরাংশুর সঙ্গে না যেতে দেখি কোথায়ও বা শুনি—মনে থাকে যেন কথাটা।

বলে আর দাঁড়াল না কুন্তী—নিজের ঘরে চলে গেল।

আশ্চর্য—সেদিন কেন চোখ খোলে নি কুন্তীর—

স্বর্ণেন্দুর কথাটা কেন স্পষ্ট বুঝতে পারে নি।

হয়ত বুঝতে পারে নি শিশিরাংশুর চিন্তায় সমস্ত মনটা তার আচ্ছন্ন হয়েছিল। স্বর্ণেন্দু তার সম্পর্কে যা বলে গিয়েছে সেই কথাগুলোই মনের মধ্যে তার তোলপাড় করে ফিরছিল।

একচক্ষু হরিণের মত একদিক থেকেই সে বিপদের সম্ভাবনা ভেবে সেই দিকে চোখ মেলে রেখেছিল, অন্যদিক থেকে যে বিপদ আসতে পারে ভাবতেও পারে নি।

পরের দিন বিকেলের দিকে শিশিরাংশুর ফোন এল হঠাৎ—

ওদের সিনেমায় যাওয়ার কথা ছিল।

গতরাত থেকে কেবলই ভেবেছে কুন্তী—শিশিরাংশুকে কি করে বলা যায় কথাটা যে—সে সিনেমায় যেতে পারছে না—

কিন্তু তাকে আর বলতে হল না কথাটা—শিশিরাংশুই বললে কথাটা।

কুন্তী—

বল—

I am very sorry—হঠাৎ একটা বিশেষ কাজে আটকা পড়ে গেছি—আজ আমাদের সিনেমায় যাবার কথা ছিল, আজ পারছি না—Please don't mind—লক্ষীটি—

বেশ—

মনে করলে না ত কিছু, রাগ করলে না—

না—

ঠিক বলছ—

ঠিকই বলছি—

ফোনটা নামিয়ে রেখে দেয় কুন্তী, কিছুই যেন আর ভাল লাগছে না।

হঠাৎ যেন সমস্ত দুনিয়াটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু না—এমন করে ত চলতে পারে না।

এর একটা মীমাংসার দরকার।

মুখোমুখি স্পষ্ট করে সব বলা দরকার—শোনা দরকার—

কতবার সে বারণ করে দিয়েছে শিশিরাংশুকে এখন যেন কারখানার কেউ না জানতে পারে যে তার সঙ্গে শিশিরাংশুর বিয়ে হচ্ছে।

সেই কারণেই সে শিশিরাংশুকে তার কারখানার চাকরি ছাড়তে পর্যন্ত বাধ্য করেছে।

তাছাড়া মা পঙ্গু—শয্যাশায়িনী, তাই সে নিজের বিয়ের ব্যাপারটায় এখনো যেন মন স্থির করতে পারছিল না।

সবাই কি দৃষ্টিতে দেখবে ব্যাপারটা—একটা লজ্জাবোধও যেন তাকে পীড়ন করছিল তা ছাড়া, তার ও শিশিরাংশুর ভালবাসার ব্যাপারটা সে সযতনে নিজেদের মধ্যেই কেবল রেখেছিল—পাছে কেউ জানতে পারে বলে খুব সাবধানে মেলামেশা করেছে—

কিন্তু শিশিরাংশু এটা কি করল।

তখনো যদি জানত কুন্তী, শিশিরাংশু আরো অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছে।—

ডাঃ ভাদুড়ীর কাছ থেকে ফোন এল—

বিশেষ প্রয়োজন আছে কুন্তী যেন অবিলম্বে তার বাড়ীতে গিয়ে দেখা করে।

কুন্তী চিন্তিত মনে তখুনি গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়ে—

বেশী দূর নয় ডাঃ ভাদুড়ীর বাড়ী।

ডাঃ ভাদুড়ী তাঁর বসবার ঘরে একাই ছিলেন। কুন্তীকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন, বস মা।

কুন্তী বসল—

আজ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছি মা—শিশিরাংশু—

কি করেছে সে?

তার সঙ্গে যে তোমাদের এতটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে ইতিমধ্যে—তা অবশ্যই আমি জানতাম না—

কি হয়েছে আমাকে খুলে বলুন।

সে আজ আমার অফিসে এসেছিল—

কখন?

দুপুরে, এসে তার মাইনা চায়—তাতে আমি তোমার কথা বলি—সে তখন বলে—

কি বলেছে?

সে কথাটা আর নাই বা শুনলে মা—

কুন্তী অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, স্বর্ণেন্দুবাবু কি আর অফিসে আসছেন না?

না।

তার রেজিগনেশন আপনারা অ্যাক্সেপ্ট করেছেন?

এখনো কিছু করি নি—

ঠিক আছে, আপনি একটা মিটিং ডাকুন—আর সেই মিটিংয়ে ওকেও ডাকুন—আর একটা কথা—শিশিরাংশু-বাবু এবারে এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন—

কিন্তু মা, আমি আর কাজ করতে পারব না।

কেন ডাঃ ভাদুড়ী?

কাল যখন সত্যিই তোমাদের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে—

গড়ে যে উঠবেই সে সম্পর্কে আপনি স্থির নিশ্চিত এখন থেকেই বা কেন হচ্ছেন?

কুন্তী—

আজ আমি চলি—

কুন্তী ঘর থেকে বের হয়ে এল।

গাড়িতে বসে তার মনে হয়—জার্মাণীতে যাবে বলে কিছুদিন হল শিশিরাংশু তার মা ও ভাইবোনেদের দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে কুন্তীরই টাকায় একটা হোটেলে বর্তমানে ঘর নিয়ে আছে।

কুন্তী ড্রাইভারকে বললে, সেই হোটেলে যেতে।

হোটেলে যখন এসে পৌঁছাল রাত তখন প্রায় সোয়া নয়টা।

হোটেলের চাকর বললে, বাবু নেই, কে এক দিদিমণি এসেছিল তার সঙ্গে বের হয়েছে—

কুন্তী বলে, দরজাটা খুলে দাও—

ভৃত্য জানত কুন্তীর পরিচয়—ম্যানেজারের কাছ থেকে চাবি এনে দরজা খুলে দিল।

কুন্তী ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসল অন্ধকারেই। আলোটা আর জ্বালায় না।

॥ ১০ ॥

প্রায় এক ঘণ্টা পরে শিশিরাংশু এল।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালতেই সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট কুন্তীকে দেখে থমকে দাঁড়াল শিশিরাংশু।

তুমি—

হ্যাঁ আমি—শান্ত কণ্ঠে কুন্তী বলে ওর মুখের দিকে দুচোখের দৃষ্টি ন্যস্ত করে।

কি সৌভাগ্য, এতদিন পরে তা হলে এলে—কিন্তু অন্ধকারে অমন করে ভূতের মত বসেছিলে কেন?

শিশিরাংশু—

শিশিরাংশু একটা সিগ্রেটে অগ্নি সংযোগ করছিল ফিরে তাকাল কুন্তীর কণ্ঠস্বরে—কুন্তীর শেষের দিকের কণ্ঠস্বরটার মধ্যে কোথায় যেন একটা চমক আছে।

শিশিরাংশু থমকে যায় যেন, সিগ্রেটে আর অগ্নি সংযোগ করা হয় না—হাতের সিগ্রেট ও লাইটার হাতেই ধরা থাকে।

কিছু যেন তুমি বলবে—বলতে চাও মনে হচ্ছে কুন্তী?—

আশ্চর্য শান্ত শিশিরাংশুর কণ্ঠস্বর।

মুহূর্ত পূর্বে সে যে চমকে উঠেছিল সেটা যেন সে সামলে নিয়েছে।

বলব বলেই আমি এসেছিলাম শিশিরাংশু, কিন্তু—

কিন্তু কি, থামলে কেন?

না, থাক। কাদা ঘাঁটলেই তার কিছুটা গায়ে ছিটকে আসবেই—কিন্তু আমি, আমি ত তোমার সঙ্গে কোন প্রতারণা করি নি শিশিরাংশু, তবে তুমি—

কি আমি, কুন্তী দেবী—

তুমি এমন হীন জঘন্য ব্যবহার, এমন কুৎসিত প্রতারণা আমার সঙ্গে করলে কেন?

প্রতারণা, এসব কি বলছ কুন্তী, আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছি—

শর্মিলা কে—

হঠাৎ যেন নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই কুন্তীর মনে হয় শিশিরাংশুর সমস্ত মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল কিন্তু সামলে নিতেও তাঁর দেরি হয় না।

বলে, I see, তা হলে নামটা শুনেছ?

অতঃপর একটু থেমে সিগ্রেটটায় অগ্নি সংযোগ করে, সিগ্রেটে একটা মৃদু দীর্ঘ টান দিয়ে—বলে, অবিশ্যি আমিই তোমাকে বলতাম—

বলতে? বিস্ময়ের যেন অবধি নেই কুন্তীর।

বলতাম বৈ কি—

কি বলতে, যে শর্মিলার সঙ্গে একদিন তোমার বিয়ে হয়েছে, এবং—

থাম, থাম, don't be so melodramatic—কুন্তী—

Melodramatic ?

তা বৈ কি! প্রথম যৌবনে একটি অপরিণতবুদ্ধি পুরুষের যেমন কোন তরুণী মেয়েকে দেখলেই ভাল লাগে, it was nothing more than that—

শিশিরাংশু—একটা অস্ফুট চিৎকার যেন বের হয়ে আসে কুন্তীর কণ্ঠ থেকে।

পূর্ববৎ শান্ত কণ্ঠেই বলে চলে শিশিরাংশু, and we lived together a few days—say a few months—

তুমি তাকে বিয়ে কর নি ?

হ্যাঁ, কে জানে, হয়ত এলে-বেলে কয়েকটা অর্থহীন মন্ত্র পড়েছিলামও, কিন্তু বিয়েটা ত কয়েকটা ঐ মন্ত্র পড়া ও সামান্য একটু চোখের ভাল লাগাই সবটা নয় কুন্তী—

তার মানে সেটাকে তুমি বিয়ে বল না ?

না—

বল না ?

না, আর সেই কারণেই শর্মিলার পরবর্তীকালের ব্যাপার নিয়ে আমি এতটুকুও মাথা ঘামাই নি, She is as free as I am—

কুন্তী যেন বোবা হয়ে গিয়েছে।

গলা দিয়ে আর কোন শব্দ বের হয় না।

কথা বলার শেষ শক্তিটুকুও যেন কুন্তীর ঐ মুহূর্তে লোপ পেয়েছে।

ঘটনার আকস্মিকতায়—বিস্ময়ে অভিভূত কুন্তী কেবল নিঃশব্দে শিশিরাংশুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

শিশিরাংশু কিন্তু নির্বিকার, একান্ত নির্বিকার।

এতটুকু বিস্মিত বা এতটুকু অপ্রস্তুতও যেন হয় নি লোকটা!

মনে হয় কুন্তীর ঐ শিশিরাংশুকে সে ত চেনে না।

অথচ—

এই কটা বছর কি এক অন্ধ আবেগেই না ওকে সে আঁকড়ে ধরে ছিল।

ঐ মানুষটা শুধু তাকে মুগ্ধই করে নি—ওকে সে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালও বেসেছে। আর সেই ভালবাসার উপরেই নাকি এক মধু ভবিষ্যত সে গড়ে তুলেছিল তিল তিল করে।

এবং আজ অকস্মাৎ ব্যাপারটা ঐভাবে তার গোচরীভূত না হলে—কয়েকদিনের মধ্যেই ত তাদের রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ হয়ে যাবার কথা।

উঃ, যদি না জানতে পারত, বিয়েটা ত হয়ে যেত।

হাসতে হাসতেই ঐ লোকটা হয়ত তাকে চরম সর্বনাশ ও দুঃসহ অবর্ণনীয় এক লজ্জার মধ্যে টেনে নিয়ে যেত। এতটুকু বাধত না লোকটার।

সিগ্রেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে শান্ত কণ্ঠে শিশিরাংশু বলে, তুমি যেন হঠাৎ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লে বলে মনে হচ্ছে কুন্তী।

কুন্তী চেয়ে আছে তখনো ওর মুখের দিকে নিঃশব্দে, কোন জবাব দেয় না।

হাতের জলন্ত সিগ্রেটের অগ্রভাগের ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলে আবার শিশিরাংশু তেমনি ঠাণ্ডা গলায়—তুমি জেনে ফেলেছ দুদিন আগে—well and good অবিশ্যি—otherwise আমিই বলতাম। কয়েকদিন ভাবি নি যে বলব তাও নয়, বলব, বলব করেও বলা হয়ে ওঠে নি, আবার এও ভেবেছি, সত্যিই বলছি, কি এমন একটা ব্যাপার যা তোমার কর্ণগোচর করতেই হবে।

কথাগুলো শেষ হল না শিশিরাংশুর হঠাৎ যেন সে বলতে বলতে থেমে গেল।

সামনে উপবিষ্ট কুন্তীর মুখের দিকে হঠাৎ বুঝি চোখ পড়াতেই থেমে গেল শিশিরাংশু।

যেন কথা বলতে বলতে থম্‌কে থেমে গেল।

কুন্তী তখনো চুপ করে আছে, একটি কথাও বলে নি—

তার দুচোখের কোল বেয়ে দুটি অশ্রুর ধারা নেমেছে।

What's up, ব্যাপার কি, are you really serious, কাঁদছ নাকি ?

শিশিরাংশুর কণ্ঠস্বরে যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ময়।

কথা বলল। এতক্ষণ পরে প্রথম কথা বলল কুন্তী।

বললে, এ তুমি কি করলে শিশিরাংশু—

কুন্তী—

তুমি যে আমার সমস্ত কল্পনা, সমস্ত সম্ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলে।

ঐ দেখ, কি সব সুরু করে দিল।

শিশিরাংশু যেন ব্যাপারটা হালকা করে দেবার চেষ্টা করে।

কুন্তী বললে, সব তুমি এমনি করে নষ্ট করে দিলে।

এঃ সত্যি, তুমি দেখছি অত্যন্ত sentimental, বলতে বলতে শিশিরাংশু কুন্তীর হাতটা ধরবার জন্য এগিয়ে আসতেই দু পা—কুন্তী ছোঁয়া বাঁচিয়ে যেন সরে যায়।

কুন্তী।

না, না—তুমি আমাকে আর ছুঁয়ো না—

কি পাগলামি করছ—শিশিরাংশু আবার এগিয়ে আসবার চেষ্টা করে।

আবার ঘন হবার চেষ্টা করে।

কুন্তী আরো দূরে সরে যায়। বলে, না।

কুন্তী—

না, শিশিরাংশু, না—

কুন্তী যেন ক্ষীণ কণ্ঠে এবারে একটা আর্তনাদ করে ওঠে।

তুমি—

শেষ করতে দেয় না শিশিরাংশুকে কথাটা তার কুন্তী—বলে, তুমি অন্যের স্বামী—

কুন্তী—

তুমি শর্মিলার স্বামী—তুমি আর একজনের—

শোন, শোন, একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে তুমি এমন জটিল করে তুলছ—

এর চাইতেও জটিল মানুষের জীবনে আর কি থাকতে পারে শিশিরাংশু, মনে হয়েছিল কথাটা বলে কিন্তু ঘৃণায় লজ্জায় যেন কণ্ঠ তখন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আর তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবার মত শক্তিও বুঝি নেই তাই যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ায় কুন্তী নিঃশব্দে শেষবারের মত যেন একবার ওর দিকে তাকিয়ে।

শিশিরাংশু তাড়াতাড়ি একটু এগিয়ে এসে দরজার দিকে প্রশ্ন করে, কুন্তী, চললে নাকি ?

কিন্তু এবারেও কোন জবাব দেয় না—আরো দু'পা এগিয়ে যায় কেবল দরজার কাছে।

শিশিরাংশু বোধহয় এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হয়েছিল, কুন্তী সত্যিই চলে যাচ্ছে।

সে এবারে দরজাটা আগলে দাঁড়ায়, কুন্তী I must tell you frankly—আমি কিন্তু ভাবতে পারি নি—

কি ভাবতে পার নি ?

তুমি—

পথ ছাড় শিশিরাংশু

পথ ছাড় শিশিরাংশু—

কুন্তী।

পথ ছাড়—শিশিরাংশু আমাকে যেতে দাও।

তা হলে আমাদের—

হ্যাঁ, এইখানেই শেষ।

আমি কিন্তু বলব, একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাচ্ছে, আজকালকার যুগে এ ধরনের ঘটনা—

চুপ কর শিশিরাংশু, তোমার লজ্জা ঘৃণা বলে কোন বস্তুর বালাই না থাকতে পারে কিন্তু আমার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় লজ্জায় যেন ঘিন ঘিন করছে।

ওঃ—

হ্যাঁ—আর একটা কথা শোন, যা আমি বলে গেলাম এই আমার শেষ কথা।

শেষ কথা—

হ্যাঁ—শেষ কথা, এর পর কোন কারণেই যেন ব্যাপারটা আরো তিক্ত কববার চেষ্টা না কর—

তোমার বুঝি ধারণা তাই আমার সম্পর্কে ?—

তাই, আর একটা কথা, স্বর্ণেন্দুবাবুর কাছে শুনলাম তুমি নাকি আমাদের কারখানার অফিসে তোমার কি সব প্রাপ্য টাকার জন্য গিয়েছিলে, সেখানে আর তুমি যাবার চেষ্টা করো না। তোমার প্রাপ্য যদি কিছু থাকে ত তোমাকে ডাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে—

আর কিছু—বল—মনে হচ্ছে কুন্তী তুমি আরো কিছু যেন বলবে—

শিশিরাংশুর কণ্ঠস্বরটা তখন বেশ পরিবর্তিত মনে হয়।

ক্ষণপূর্বের কণ্ঠের সেই সহজ সুরটা আর নেই।

একটা চাপা ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ যেন কণ্ঠস্বরে ঝিলিক দিয়ে গেল।

কুন্তী কিন্তু শান্ত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ—তোমাকে জার্মাণী যাবার জন্য যে অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—সেটাও তুমি পাবে—

ধন্যবাদ, আর কিছু ?—

আর যতদিন জার্মাণী না যাও এই হোটেলের থাকবার খরচাটাও আমি দেব কারণ তোমাকে আমিই এখানে এনে তুলেছিলাম—

আবারো ধন্যবাদ—তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কুন্তী দেবী, তোমার বদান্যতা, দাক্ষিণ্য, সত্যিই প্রশংসনীয়। এখন অবিশ্যি আমি বুঝতে পারছি, হঠাৎ তোমার এই পরিবর্তনের কারণ কি—তা হলে স্বর্ণেন্দুই আজ তোমার ব —সেই লোফার, দুঃশ্চরিত্রটা—

থাম—হঠাৎ যেন গর্জন করে ওঠে কুন্তী, নিজের চরিত্র দিয়ে সকলকে বিচার করো না—

ওঃ এত দূর—প্রেম তা হলে অনেকটা এগিয়েছে বল—

ইচ্ছা হয়েছিল কুন্তীর ঐ মুহূর্তে পায়ের জুতোটা খুলে শিশিরাংশুর গালে-মুখে বসিয়ে দেয় কয়েক ঘা কিন্তু ওকে স্পর্শ করতেও যেন তখন তার ঘৃণা হচ্ছিল।

শুধু বললে, হ্যাঁ—তোমার প্রাপ্যর জন্য তার কাছেই তোমাকে জানাতে হবে—সেটা মনে রেখ—

তা রাখতে হবে বৈকি মনে—যেন একটা বিষধর সর্পের মত হিস্ হিস্ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তখন শিশিরাংশু।

বলে তীক্ষ্ণ শ্লেষ ভরা কণ্ঠে, তবে কুন্তী দেবী, তোমারও একটা কথা জানা দরকার—এর পরও যদি তুমি মনে করে থাক—শিশিরাংশু তোমার দাক্ষিণ্যের জন্যই তার হাত দুটো পেতে রাখবে ত ভুল করেছ—

কুন্তী তাকিয়ে ছিল শিশিরাংশুর মুখের দিকে।

শিশিরাংশুর কণ্ঠ স্বরে যেন তখন বিষ ঝরে পড়ছিল।

সে বলে, হ্যাঁ, জেনে যাও—তোমার জন্য আমি কোন দিনই বসেছিলাম না, আর আজও নেই—নিজের চেহারাটা বোধ হয় অনেকদিন আয়নায় দেখ না—বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখ—

তীক্ষ্ণ আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে কুন্তী, শিশিরাংশু—

শিশিরাংশু আরো বিষ কণ্ঠে ঢেলে বলে, ভেবেছ স্বর্ণেন্দুকে ঐ চেহারা দিয়ে ভোলাবে কিন্তু he is not an idiot—

আর সহ্য করতে পারে না কুন্তী, মুহূর্তে যেন একটা তীব্র অপমানের জ্বালা তার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত ছড়িয়ে যায়, সে যেন মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে যায়—ঠাস্ করে শিশিরাংশুর গালে একটা চড় বসিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, ইতর—

আর দাঁড়ায় না কুন্তী, দাঁড়াবার আর তার শক্তি নেই তখন।

সমস্ত শরীরটা তার তখন থর থর করে কাঁপছে।

ঝিম্ ঝিম্ করছে সমস্ত চেতনা।

টলতে টলতে কোন মতে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেও শিশিরাংশুর বিষাক্ত কণ্ঠস্বরে শেষ কথাগুলো যেন তার কানে বাজতে থাকে; ভেবেছ স্বর্ণেন্দুকে ঐ চেহারা দিয়ে তোমার ভোলাবে কিন্তু he is not an idiot—

কি করে যে হোটেলের সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে এক সময় কুন্তী গাড়ির মধ্যে এসে উঠে বসেছিল কিছুই তার মনে নেই।

॥ ১১ ॥

ড্রাইভার যখন জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় যাবে—তখনো কোন জবাব দেয় নি কুন্তী।

গাড়ির ব্যাক সীটে হেলান দিয়ে পড়ে ছিল।

অনেক দিনের পুরাণো ড্রাইভার কি সে বুঝেছিল কে জানে—সোজা বাড়ীর দিকেই গাড়ি চালিয়েছিল। গাড়ি ছুটে চলেছে, চারিদিকে কর্মব্যস্ত প্রবাহমান জনস্রোত কিন্তু কোন দিকেই কোন দৃষ্টি ছিল না তখন কুন্তীর।

সেই যে গাড়িতে ঢুকে মাথাটা নীচু করে হেলান দিয়ে বসেছিল সারাটা পথ আর মাথা তোলে নি, এক সময় গাড়িটা এসে বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে পোর্টিকোর নীচে এসে দাঁড়াল।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিল, দিদিমণি—

সেই ডাকে কুন্তী মুখ তুলে তাকায়।

ড্রাইভার আবার বলে, কোঠি আ-গিয়া—

কুন্তী গাড়ি থেকে নেমে এল।

তারপর টলতে টলতে সামনের হল ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

রতিনাথ কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে হলঘরে আসর জমিয়ে বসেছিলেন—কুন্তীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বলেন, এই যে কুন্তী, এঁরা সব তোমার কাছে এসেছেন, অনেকক্ষণ ধরে তোমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে বসে আছেন—

কেমন যেন শূন্য বোবা দৃষ্টিতে একবার মাত্র রতিনাথ ও অন্যান্যদের মুখের দিকে তাকাল কুন্তী তারপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল একটি কথাও না বলে।

ঘরের মধ্যে ঐ মুহূর্তে উপস্থিত সকলে ফ্যালফ্যাল করে কুন্তীর গমন পথের দিকে চেয়ে রইল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে, বারান্দা অতিক্রম করে নিজের ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল কুন্তী।

মনে হল অন্ধকার ঘরের মধ্যে কে যেন চেয়ারটার উপর বসে আছে।

ওদিককার দোতলা বাড়ীর একটা ঘরের খানিকটা আলো জানালা পথে তার ঘরে এসে ঢুকেছে সেই আলোতেই ঝাপসা ঝাপসা দেখতে পায় কুন্তী।

বলে, কে—কে, ওখানে?

আমি, মৃদু কণ্ঠে জবাব এল।

কে—মানু—

বলতে বলতে কুন্তী একটু যেন বিস্মিত হয়েই হাত বাড়িয়ে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দেয় সুইচটা টিপে।

উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে যায়।

কুন্তী দেখে চেয়ারের উপরে মানসী বসে চুপটি করে।

কেন যেন ধ্বক্ করে উঠেছিল ঐ মুহূর্তে বুকের মধ্যে কুন্তীর—মানসীর মুখের দিকে তাকাতেই।

মানসীই প্রথমে কথা বলে, দিদিভাই—

কুন্তী তখনো চেয়ে আছে বোনের মুখের দিকে।

কি হয়েছে দিদিভাই—মানসী প্রশ্ন করে, তোমার মুখটা অমন শুকনো কেন?

ও কিছু না—তুই এখানে বসে যে—

আমি—

কিছু বলবি?

হ্যাঁ, মানে—

কি—

দিদিভাই—

কি?—

তোমার কাছে আমি অনুমতি চাইব বলে বসে আছি—

অনুমতি? কিসের অনুমতি মানু—

আমি—মানসী মাথাটা নীচু করে।

কুন্তীর সঙ্গে বয়েসের তার অনেক পার্থক্য। বয়েসের সেই ব্যবধানটা চিরদিন দুজনার মধ্যে একটা সম্ভ্রমের প্রাচীর তুলে রেখেছিল।

তাছাড়া চিরদিন একটু রাশভারী—গম্ভীর প্রকৃতির কুন্তী—সকলে সব সময় তার সামনে এগুতে ঠিক যেন সাহস পেত না।

দুই বোনের পরস্পরের মধ্যে অবশ্য একটা ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তথাপি বয়েসের ঐ ব্যবধানটা ও কুন্তীর চরিত্রের গাম্ভীর্য ঠিক সহজ একটা ঘনিষ্ঠতায় কোনদিন বোধহয় দুজনকে আসতে দেয় নি, সংযম গাম্ভীর্য ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতায় কুন্তীর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল। একটা আভিজাত্য দিয়েছিল এবং যেখানে সে সংসারের মধ্যে থেকেও এক স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করেছিল। বাড়ীর মধ্যে সকলেই কুন্তীকে সে কারণে সমীহ করে চলত।

রতিনাথও সেই কারণেই ইচ্ছা থাকলেও তার লোভের হাতটা বোধকরি গুটিয়ে রেখেছিল।

এবং স্ত্রীর দিক থেকে অবিরত তাগিদ আসলেও বিশেষ অগ্রসর হতে সাহস পাচ্ছিলেন না মনের মধ্যে।

কুন্তী কথা বলত কম এবং নিজের ঘরের মধ্যেই সর্বদা প্রায় লেখাপড়া নিয়ে বা অন্য কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত।

এবং যতক্ষণ সে বাড়ীতে থাকত প্রত্যেকেই বুঝতে পারত যেন সে বাড়ীর মধ্যে কোথায়ও না কোথায়ও আছে।

মানসী যদিও কুন্তীর কাছ থেকে বরাবর যথেষ্ট ভালবাসা—স্নেহ ও প্রশ্রয় পেয়েছে তবু সে দিদিভাইকে মনে মনে ভয় করত।

তাই বুঝি কথাটা বলতে গিয়েও মানসী থিতিয়ে যায়।

কুণ্ঠায় কেমন যেন ঝিমিয়ে আসে।

কিন্তু কথাটা যে না বললেও নয়।

মানসীকে কথাটা যে বলতেই হবে।

যা হোক মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে কুন্তীই আবার প্রশ্ন করে, কিছু বলবি?—

দিদিভাই—

কি বলবি, বল না?

না থাক, অন্য এক সময় না হয় বলব—

না—কি বলতে চাস বল? কিসের অনুমতি চাইছিলি?

বলছিলাম আমি—আমি বিয়ে করব—

বিয়ে করবি?—

হ্যাঁ—

কয়েকটা মুহূর্ত যেন কুন্তীর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না।

চেয়ে থাকে ছোট বোনের মুখের দিকে—

তারপর ধীরে ধীরে এক সময় বলে, বিয়ে—তুই বিয়ে করবি?

হ্যাঁ—

মাথাটা নীচু করে মানসী।

তুই বিয়ে করতে চাস?—

হ্যাঁ দিদিভাই—তাই তোমার অনুমতি—

কে সে?—কাকে বিয়ে করতে চাস।

তুমি তাকে অবিশ্যি চেন—

আবার বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খায় যেন কুন্তী।

বলে, আমি তাকে চিনি?

হ্যাঁ, চেন। ভাল করেই চেন—

কিন্তু কে সে? কি নাম তার?—

তার নাম?

হ্যাঁ—কি নাম তার?

শিশিরাংশু।

নামটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে আবার মাথাটা নীচু করে মানসী।

কি—কি বললি—কাকে বিয়ে করতে চাস তুই—

একটা প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক্ খেয়েছে যেন কুন্তী। গলা দিয়ে অর্ধস্ফুট একটা শব্দের মতই যেন কথাগুলো বের হয়ে আসে কুন্তীর।

কি শুনছে সে—মানসী শিশিরাংশুকে বিয়ে করতে চায়।

ঠিক শুনেছে ত, না ভুল শুনলো সে—

তুই—তুই শিশিরাংশুকে বিয়ে করতে চাস?

হ্যাঁ—

না, না—না—

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে যেন প্রতিবাদ জানায় এতক্ষণে কুন্তী।

দিদিভাই—

না, না, হতে পারে না—

দিদিভাই—

এ বিয়ে হতে পারে না—

হতে পারে না?

না, না—

কিন্তু আমি যে—

মানসীকে বলতে দেয় না কুন্তী—তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে যেন ঝলসে ওঠে, বলছি এ বিয়ে হতে পারে না—এর মধ্যে আর কোন কথা—কোন কিন্তু নেই মানু—হতে পারে না।

কিন্তু কেন—কেন হতে পারে না?

আমি বলছি এ বিয়ে হতে পারে না—আর কোন প্রশ্ন করিস না আমাকে—যা এঘর থেকে—

কিন্তু দিদিভাই—

যা—যা বলছি এঘর থেকে—যা—

না, আমি যাব না—কেন হতে পারে না তোমাকে বলতে হবে—

কি বললি—বলতে হবে—

মুহূর্তে আক্রোশে যেন ফেটে পড়ল কুন্তী—এলোপাথাড়ি বোনের দুগালে গোটাকতক চড় বসিয়ে দেয়—যে বোনের গায়ে আজ পর্যন্ত কখনো হাত তোলে নি।

কুন্তীর হাতে চড় খেয়ে ঐ ভাবে মানসীও যেন হঠাৎ থমকে যায়। বোবা হয়ে যায়।

কুন্তী তখন হাঁপাচ্ছে।

মানসী ধীরে ধীরে ঘর থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

কুন্তী আর নিজেকে রোধ করতে পারে না।

ছুটে গিয়ে দুহাতে মানসীকে জড়িয়ে ধরে, মানু—

ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও তুমি আমায়—

মানসী জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু কুন্তী ছাড়ে না বোনকে। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে থাকে।

শোন, শোন—তুই জানিস না—

মানসী বলে, জানি—আমি সব জানি—

কি জানিস তুই—কিছুই জানিস না—ঐ মানুষটা সম্পর্কে তুই—he is a liar. নীচ, ভালগার—

ছেড়ে দাও তুমি আমায়—

শোন মানু, শোন, তুই ভুলে যা তাকে ভাই—

ও ঠিকই বলেছিল, তুমি শুনলে হয়ত বাধা দেবে—আমিই তখন বিশ্বাস করি নি—বলেছিলাম আমার দিদি-ভাইকে আমি জানি সে আমার জন্যে পারে না এমন কিছু দুনিয়ায় নেই। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমি ভুল করেছিলাম—

মানু শোন—তুই—তুই জানিস না—ও তোকে প্রতারণা করেছে—ও ভালবাসতে জানে না—কোনদিন কাউকে ভালবাসতে পারে না—

সর তুমি আমার পথ থেকে—মানসী বলে, আমি জানি ও প্রতারণা করে নি—ও আমাকে ভালবাসে—প্রতারণা করে নি ?

না—

জানিস তুই ও বিবাহিত—

বিবাহিত !

হঠাৎ যেন কথাটা বলে থমকে দাঁড়ায় এতক্ষণে মানসী প্রথম।

হ্যাঁ—বিবাহিত—

না—এ আমি বিশ্বাস করি না—

বিশ্বাস কর সত্যি বলছি—he is married—

না—তা হলে তার মা ভাইবোনেরা জানত—

তারা জানে না—তাদের ও জানতে দেয় নি কোনদিন—সত্যিই শিশিরাংশু বিবাহিত—আর তার সেই স্ত্রী এখনো বেঁচে—

সে স্ত্রী—

হ্যাঁ—নাম তার শর্মিলা আর এই শহরেই সে আছে—আমি তোকে ঠিকানা দেব তুই খোঁজ করে দেখ নিজে বিশ্বাস না করিস আমার কথায়—

সত্যি—সত্যি বলছ দিদিভাই—

মানসীর কণ্ঠে এতক্ষণে বুঝি সংশয়ের সুর।

হ্যাঁ—সত্যিই বলছি—ও বিবাহিত—তোকে মিথ্যা বলেছে—প্রতারণা করেছে—

মানসী ততক্ষণে বসে পড়েছে।

আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। দুহাতে মুখ ঢাকে।

কুন্তী এগিয়ে আসে মানসীর পাশে—

গভীর স্নেহে ওর মাথায় একখানি হাত রেখে বলে, মানু—আমি জানি—it is really shocking—প্রচণ্ড

ব্যথা পেয়েছিস তুই—ভুলে যা তাকে—তাছাড়া তুই জানিস না—এ বিয়ে যদি হতও কোনদিন তুই সুখী হতে পারতিস না। একটা নীচ—স্বার্থপর জঘন্য চরিত্রের মানুষ ও—

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মানসী হঠাৎ ঐ সময় কুন্তীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু আমার যে আর অন্য কোন উপায় নেই দিদিভাই—

মানু—অস্পষ্ট কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে কুন্তী।

হ্যাঁ, দিদিভাই—অন্য কোন পথ নেই—

কুন্তী যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

তার সমস্ত বোধশক্তি—সমস্ত চেতনা যেন হিম হয়ে গিয়েছে।

নির্বাক নিস্পন্দ কুন্তী কেবল বোনকে বুকের মধ্যে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দুচোখের অশ্রুর ধারা তার গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত করে দিচ্ছে।

॥ ১২ ॥

কতক্ষণ—কতক্ষণ যে তারপরও অমনি করে কুন্তী পাথর হয়ে মানসীকে বুকের মধ্যে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল নিজেও বুঝি জানে না।

হঠাৎ একসময় তারপর মানসীই ডাকে, দিদিভাই—

কি রে?

আমার যে আর কোন পথ নেই—

তুই ঘরে যা—ভাবিস না কিছু—যা—

দিদিভাই—

যা, ঘরে যা—অনেক রাত হয়েছে—

মানসী ঘর থেকে বের হয়ে গেল ক্লান্ত শিথিল পায়ে।

আর হঠাৎই যেন ঐ মুহূর্তে প্রস্থানরত ছোট বোনটির দেহের দিকে তাকিয়ে কুন্তীর মনে হল—অন্ধ সে—এত দিন কেন তার চোখে পড়ে নি—

ওর চোখের কোল—ওর চলার ভঙ্গি—

কিন্তু এখন ও কি করবে—

সেই শিশিরাংশুর সামনে গিয়ে হাত পেতে তাকে দাঁড়াতে হবে।

তাই—তাই শিশিরাংশু অমনি করে কথাগুলো তাকে বলতে পেরেছিল।

কিন্তু কবে—কবে ঘটলো ব্যাপারটা—

ইতিমধ্যে শয়তানটা মানসীর মনকে জয় করে নিয়েছে—

উঃ, কি নির্বোধ মানসীটা—একটা হীন চরিত্র শয়তানের হাতে এমনি করে সে তার নিজেকে কেমন করে সমর্পণ করল।

কিন্তু সে ত পরের কথা—মানসীকে আজ তাকে বাঁচাতে হবে।

তার মুখের আশ্বাস পেয়েই মানসী নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে গিয়েছে। কিন্তু কেমন করে—কেমন করে সে বাঁচাবে মানসীকে এই অপমানের হাত থেকে—

বাবা—কোথায় তুমি বাবা—

কোথায় গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ।
তোমার দেওয়া দায়িত্ব বইবার আর যে আমি শক্তি পাচ্ছি না বাবা।
এই কথা যদি ঘুণাক্ষরেও এখন প্রকাশ হয়ে যায়—সারা বাড়ী মুখর হয়ে উঠবে!
ঐ রতিনাথই সর্বাগ্রে চীৎকার করতে সুরু করে দেবেন।
তারপর তার স্ত্রী—
উঃ, মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে কুন্তীর।
কি অসহ্য যন্ত্রণা—

সারাটা রাত ঘরের মধ্যে পায়চারি করেছিল কুন্তী।
এবং শুধু সেই রাতই নয় তার পরের আরো দুটো রাত।
কি করবে সে এখন, কি করবে!
মানসী—মানসীর কি ব্যবস্থা করবে।
একমাত্র উপায় বিবাহ।
মানসী ও শিশিরাংশুর বিবাহ।
কুন্তীর মুখের দিকে চেয়ে মানসীও যেন ভয় পেয়ে যায়।
ভয়ে ভয়ে সে আবার দুদিন পরে কুন্তীর সামনে এসে দাঁড়ায়।

পরবর্তীকালে ব্যাপারটা অনেক ভেবেছে কুন্তী—
সেদিন কি সে ভুল করেছিল।
কিন্তু আবার এও মনে হয়েছে আর কিইবা সেদিন সে করতে পারত, আর কিইবা তার করার ছিল।
মানসীকে সেদিন সেই অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার ত আর তার কোন ক্ষমতাই ছিল না।
সামনে তার আর কোন রাস্তাই খোলা ছিল না।
হ্যাঁ ঠিক মাথা পেতে সে সেদিন চরম অপমানকেই মেনে নিয়েছিল।
শুধু মানসীর মুখের দিকে চেয়েই সেদিন কুন্তীকে ঐ অপমান মাথা পেতে নিতে হয়েছিল।
মানসী অতঃপর শুধিয়েছিল, তা হলে কি হবে দিদিভাই—
ভাবিস না, একটা কিছু উপায় হবেই—
আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি যে ও বিবাহিত ও স্ত্রী বর্তমান—
মানসী—
দিদিভাই?
তুমি এক কাজ কর—শিশিরাংশুকে একবার আমার সঙ্গে এসে দেখা করতে বল!
আমি যাব দিদি—গিয়ে তাকে হোটেল থেকে ডেকে নিয়ে আসব!
না, ফোন করে দে আসবার জন্য।

কিন্তু মানসী সেদিন কুন্তীর কথা শোনে নি।

দুপুরের দিকে কুন্তীকে কিছু না জানিয়ে চলে গিয়েছিল মানসী। এবং বিকেলের দিকে যখন সে তার ঘরের মধ্যে বসে আছে গণেশ এসে জানাল, শিশিরাংশুবাবু এসেছেন।

লাইব্রেরী ঘরে নীচেয় বসতে দে গিয়ে আমি আসছি, কুন্তী বলে।

গণেশ চলে গেল এবং একটু পরে গায়ের কাপড়টা ঠিক করে কুন্তী ঘর থেকে বেরুল।

লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে একটা বড় সোফার 'পরে গা এলিয়ে দিয়ে সামনের একটা টিপয়ের 'পর জুতো সমেত পা দুটো তুলে সিগ্রেট টানছিল শিশিরাংশু।

কুন্তীকে ঘরে ঢুকতে দেখে একটু নড়ে-চড়ে বসল বটে শিশিরাংশু কিন্তু টিপয়ের উপর থেকে পা দুটো নামাল না।

এই যে কুন্তী দেবী—হঠাৎ এত জরুরী তলব যে একেবারে বোনটিকে আমার হোটেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কঠিন ব্যঙ্গ যেন শিশিরাংশুর কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ে।

কুন্তী চমকে ওঠে শিশিরাংশুর কথাটা শুনে। বলে, মানসী—

হ্যাঁ, ফেরে নি, আপনার Decision-টা শোনবার অপেক্ষায় এখনো আমার হোটেলের ঘরেই বসে আছে—

Decision ?

তা বৈ কি!—এখন বলুন এ অধীনকে স্মরণ করেছেন কেন ?

মানসী আমার বোন শিশিরাংশুবাবু, তাই সমস্ত অপমানই আমাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। যাক্ সে কথা—মানসীকে বিয়ে করবার আগে আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই শর্মিলার কি ব্যবস্থা আপনি করছেন ?

শর্মিলা সম্পর্কে আপনার কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই কুন্তী দেবী—

আপনার হয়ত নেই কিন্তু আমার আছে—সে যাতে হঠাৎ কোনদিন আবার এসে আমার বোনের জীবনের শান্তি না নষ্ট করে, সে দিকটা—

ভয় নেই—সে আসবে না, আমার মনে হয় কিছু টাকা তাকে দিয়ে দিলে—এই ধরুন হাজার দশেক।

কে দেবে ?

কেন, আপনিই দেবেন—

আমি—

হ্যাঁ—মানসীর জীবনের সুখ-দুঃখটা আপনি না দেখলে কে দেখবে বলুন ?

কয়েকটা মুহূর্ত যেন বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কুন্তী ঐ মানুষটার দিকে। লোকটা কি শয়তান! না, শয়তানেরও হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে।

কিন্তু ঐ মানুষটার তাও বুঝি নেই।

অপরিসীম ঘৃণায় সর্বাঙ্গ ঘিন ঘিন করতে থাকে কুন্তীর। আশ্চর্য, এই জঘন্য, নীচ প্রকৃতির মানুষটাকে এতদিন মনে মনে এতখানি ভালবেসেছিল কি করে ?

অমন চমৎকার একটা মুখোস মানুষটা মুখে এঁটে রেখেছিল একটিবারও বুঝতে পারে নি কুন্তী।

বেশ, তাই হবে, কুন্তী ধীরে ধীরে এক সময় বলে, কিন্তু তাতে করেই যে ব্যাপারটা চিরদিনের মত মিটে যাবে—তা আপনি নিশ্চিত হলেন কি করে ?

নিশ্চিত—মৃদু হাসে শিশিরাংশু—দশ হাজার দূরে থাক, জীবনে কখনো একত্রে একশ টাকাও চোখে দেখে নি। তাছাড়া ও সব মেয়েদের চরিত্র ত আমার জানা আছে, যারা দেহ আর যৌবনের ফাঁদ পেতে পুরুষকে ঘায়েল করে—

কিন্তু শিশিরাংশু কথাটা শেষ করতে পারে না—আগেই তাকে তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার করে থামিয়ে দেয় কুন্তী—থামুন—থামুন—

॥ ১৩ ॥

কুন্তীর আকস্মিক চীৎকারে শিশিরাংশু থেমে গিয়েছিল।

থেমে গিয়ে কুন্তীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

থামুন—আপনি আর ঐ কথাগুলো নাই বা উচ্চারণ করলেন মুখে—বিশেষ করে আমার সামনে—তারপর একটু থেমে নিজেকে যেন অনেকটা সংযত করে প্রশ্ন করে, আপনি তার সম্পর্কে তা হলে কি ব্যবস্থা করবেন সেটাই বলুন।

শুনুন কুন্তী দেবী—আমার বক্তব্য হচ্ছে শর্মিলা সম্পর্কে কি করব না করব সেটা যখন একান্ত ভাবে আমারই ব্যাপার, আমিই না হয় ভাবলাম—আপনি সে ব্যাপারে অতটা মাথা নাই বা ঘামালেন—

প্রয়োজন বলেই আমাকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে—মানসী আমার একমাত্র বোন—

আমি বিয়ে করলে সে আমার স্ত্রী হবে—

তা হবে, কিন্তু বিয়ে করবার পর।

বেশ—তার আগে আপনি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন—

প্রশ্ন—

হ্যাঁ—

কিসের প্রশ্ন ?

মানে আপনাদের সম্পত্তির ব্যাপারটা—

সম্পত্তির—

হ্যাঁ—ডাঃ চৌধুরীর সম্পত্তির কি ব্যবস্থা হবে, যদিও আপনার গুণধর শকুনি কাকাটি এসে দরজা আগলে বসেছেন তা হলেও আমি জানি, তার কিছু করবার শক্তি নেই। সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক ত বটেই আবার আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ব্যাঙ্ক ট্র্যাঙ্কজ্যাকশনের অধিকারী আপনার বাবার উইল অনুযায়ী—

কুন্তী চেয়েছিল শিশিরাংশুর মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে—

আশ্চর্য! মানুষটা সে খবরও রেখেছে।

শিশিরাংশু বলে, চেয়ে আছেন কি আমার মুখের দিকে, সব আমি জানি—খবর রাখি—তাই বলছিলাম, মানসী সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করবেন ? সে যখন আপনারই মুখাপেক্ষী—

কুন্তীর একবার ইচ্ছা হয়েছিল চীৎকার করে লোকটার মুখের 'পরে বলে দেয়, এক কপর্দকও দেব না তাকে—কিন্তু পারে না, সঙ্গে সঙ্গে মানসীর অসহায় মুখখানা মনের পাতায় ভেসে ওঠে।

চুপ করে থাকে কুন্তী।

চুপ করে থাকলেও চলবে না কুন্তী দেবী।

উঃ, শয়তানটা জানে যে সে আজ ভাল করেই কুন্তীকে মুঠোর মধ্যে পুরেছে—ইচ্ছামত তাকে সে যে পথে চলতে বলবে কুন্তীর সেই পথেই যাওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

রাগ করেও কোন লাভ নেই।

সে আজ মানসীর জন্য সব কিছু মেনে নিতে বাধ্য।

ধীরে ধীরে তাই বলে, সেজন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।

হেসে ওঠে শিশিরাংশু, তাই কি একটা কথার কথা হল কুন্তী দেবী, কথায় বলে পর হস্তগত ধন, তার একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কি।

অর্ধেক সে পাবে বৈ কি—

আর ব্যাঙ্কের টাকা।

তাও পাবে।

কত আছে ব্যাঙ্কে।

যা আছে তার অর্ধেক পাবে সে—এখন বিয়েটা কবে হবে বলুন—

বিয়ে!

হ্যাঁ, কবে হবে তবে তাই বলুন।

ব্যস্ত কি, সম্পত্তির সব ফায়শালা হয়ে যাক, তারপর—

আমি ত বললাম সব করে দেব।

অবিশ্যি তোমার কথাকে আমি honour করি, কারণ তুমি কথার খেলাপ করবে না অন্তত কুন্তী দেবী আমি তা জানি—কিন্তু—

কি—

আরো একটা কথা আছে এর মধ্যে।

কি কথা?—

মানসীর, মানে, মানসীর শরীরের বর্তমান অবস্থাটা নিশ্চয়ই তোমার অজ্ঞাত নয় কুন্তী দেবী।

লজ্জায় ঘৃণায় কুন্তী যেন আর তাকাতে পারে না, মাথাটা নীচু করে।

বলছিলাম কি এই অবস্থায় বিয়েটা করা কি ভাল দেখাবে?

লোকটা বলে কি? চকিতে মুখ তুলে তাকায় কুন্তী—

এ—এ আপনি কি বলছেন শিশিরাংশুবাবু।

ঠিকই বলেছি—এ অবস্থায় বোধ হয় বিয়ে করাটা উচিত হবে না। মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তুমি কুন্তী দেবী, বিয়ের মাস ৬।৭-এর মধ্যেই বাচ্চা যখন হবে তখন আমার চাইতে কেলেঙ্কারীটা তারই কি বেশী হবে না—তাই বলছিলাম—

কুন্তী অবাক বিস্ময়ে যেন পাথর হয়ে মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

শিশিরাংশু বলে, তাই বলছিলাম—সবটাই সুষ্ঠু, সুন্দর ও স্বাভাবিক হওয়াই ভাল নয় কি। বিশেষ করে ডাঃ সতীনাথ চৌধুরীর মেয়ে—একটা আভিজাত্যের কৌলীন্য আছে, যদি কোন একটা ব্যবস্থা করতে পার, তোমার পক্ষে ত সেটা তেমন অসুবিধাও কিছু হবে না, বাবা ডাক্তার ছিল, অনেক ডাক্তারদের সঙ্গেই ত তোমাদের জানা-শোনা আছে—

শিশিরাংশুর জঘন্য কুৎসিত স্পষ্ট ইঙ্গিতটা যেন কুন্তীকে একেবারে বোবা করে দেয়।

মানুষটা এত জঘন্য—এত কুৎসিত।

এত নোংরা!

মুখোসটা খুলে গিয়েছে শিশিরাংশুর, ভয়াবহ কুৎসিত ক্লেদাক্ত একটা সরীসৃপ যেন—মানুষ নয়—

শিশিরাংশু আবার বলে, আপনি বুদ্ধিমতী অধিক বলা বাহুল্য।

অকস্মাৎ যেন অগ্ন্যুৎপাত ঘটলো।

ফেটে পড়ল যেন কুন্তী, যান—যান এখান থেকে বলছি—মনে করব এর চাইতে আমার বোন মরে গেছে, কিম্বা আমিই ওর গলা টিপে মেরে ফেলব—

কুন্তী ঘৃণায় আক্রোশে-অপমানে-জ্বালায় যেন থর থর করে কাঁপতে থাকে।

কথাগুলো শেষ করতে পারে না—কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় অবরুদ্ধ অশ্রুতে বুঝি।

শিশিরাংশু শান্ত কণ্ঠে বলে, মিথ্যে তুমি উত্তেজিত হচ্ছ কুন্তী দেবী, কলঙ্কর একথাটা তুমি আদৌ ভাবছ না—পয়সা তোমাদের অনেক আছে মানি কিন্তু ভেব না সেই পয়সা দিয়ে সারাটা দুনিয়ার মুখই তুমি বন্ধ করতে পারবে। আর কলঙ্ক—বিশেষ করে মেয়েদের এমনি জিনিষ যে বিষাক্ত ঘায়ের মত শুকিয়ে গেলেও কুৎসিত দাগগুলো বাকী জীবনটায় থেকেই যায়—কোনদিন মোছে না—

আপনি যাবেন কি না—যান—

বেশ, যাচ্ছি, তবে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে—কথাটা আমার কত সত্য, আর এও জানি, ফিরে আবার আমার কাছেই তোমাকে আসতে হবে—আজই হোক বা কালই হোক—of course I will wait for that—অপেক্ষা করে থাকব হোটেলেই আমি—আচ্ছা চলি, By—By—

শিশিরাংশু অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কুন্তী কিন্তু বসেই রইল।

পায়ের তলা থেকে সমস্ত মাটিটা তখন তার সরে যাচ্ছে।

এ মানসী কি করল।

কোন ভয়াবহ সর্বনাশের মধ্যে এমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে—

কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে পড়ে মানসীর অসহায়ত্বর কথাটা।

কি করবে, সে এখন কি করবে।

কি সে করতে পারে।

একদিকে মানসীর সব কিছু মান অপমান লজ্জা—পরিচয়, অন্য দিকে ঘৃণ্যতম পরাজয়।

পাগলের মতই দুটো দিন ছটফট করে বেড়াল কুন্তী।

কারো কাছে যদি একটু পরামর্শ পেত কিন্তু এক কান থেকে দশ কান হয়ে যাবে হয়ত তখন ব্যাপারটা। আর তখন সমস্ত আড়াল ভেঙ্গে গিয়ে চরম অপমান আর লজ্জা তাদের গ্রাস করবে।

না, না, তা ত সম্ভব নয়।

তা ছাড়া মানসীকে সে কথা দিয়েছে—

একদিন দুদিন করে আরো কটা দিন গেল—মানসী আজকাল এক মুহূর্তও বলতে গেলে বাড়ী থাকে না—যখন-তখন শিশিরাংশুর হোটেলে চলে যায়।

সত্যি, আর বুঝি ভাবতে পারে না কুন্তী। আর ভেবেই বা কি করবে—

মনে মনে স্থির করে কালই সে শিশিরাংশুর কাছে যাবে। বলবে, একটা উপায় সে ভেবেছে—

কিন্তু তার আগে সম্পত্তির একটা বিলি-ব্যবস্থা করা দরকার।

শিশিরাংশু নচেৎ হয়ত বেঁকে বসবে।

পরের দিন সকালেই সে তাই সে সলিসিটারের কাছে গেল, তাকে সব বললে, সম্পত্তির একটা পাকা ব্যবস্থা করতে চায় সে।

বলুন, কি ব্যবস্থা করতে চান। সলিসিটার শুধায়।

ব্যাঙ্কের টাকা সামান্য কিছু রেখে সব মানসীর নামে ট্রান্সফার করে দেবার ব্যবস্থা করুন, আর সব অস্থাবর সম্পত্তি ও কারখানা, তাও অর্ধেক অংশের শেয়ার মানসী পাবে এবং সেই শেয়ার থেকে তাকে মাসে মাসে একটা ৫০০৲ শত টাকা মত মাসোহারা দেওয়া হবে।

কখন থেকে ঐ ব্যবস্থা চালু করতে চান আপনি?

ওর বিয়ের পর থেকে—

বিয়ে কি ওর স্থির হয়েছে নাকি।

না এখনো হয় নি, তবে—

তবে—

আমি সব ব্যবস্থা আগেই করে দিতে চাই।

বেশ, তাই হবে।

তা হলে আপনি একটা ড্রাফট্ করে যত শীঘ্র পারেন আমার কাছে নিয়ে আসবেন।

আসব।

আরো দিন তিনেক বাদে একটা ড্রাফটের টাইপ কপি নিয়ে কুন্তী শিশিরাংশুর হোটেলে গিয়ে হাজির হল।

কি সৌভাগ্য, এস, এস কুন্তী দেবী।

শিশিরাংশু স্বাগত সম্ভাষণ জানায়।

আমি জানতাম অবিশ্যি তুমি আসবে, যাক, এখন বল কি বলবে? মানসীর যা ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম—

না।

না?

না, তা হবে না।

হবে না বুঝি।

না, যে শিশু এসেছে তাকে আমি এভাবে হত্যা করতে দেব না, বিয়ের পর তোমরা দূরে কোথায়ও চলে যাও।

তারপর।

সন্তান হবার পর আমাকে খবর দিও, আমি সে সন্তানের ব্যবস্থা করব।

কি ব্যবস্থাটা করবে জানতে পারি কি?

আমার কাছে সে সন্তানকে আমি নিয়ে আসব—

An absurd proposal—

শোন শিশিরাংশু, তোমাকে আমি নগদ দশ হাজার টাকা আলাদা দেব—মানসীর প্রাপ্য সম্পত্তি বাদেও এবং সে সন্তানকে আমি নিয়ে আসব, সে কথাও দিচ্ছি—

But if you don't keep your promise—তোমার কথা যদি তুমি না রাখ—

আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না ?

করি—

তবে—

বেশ, তবে তাই হবে—

এখন বল, কবে বিয়েটা হবে ?

যেদিন খুশি হতে পারে—

তুমিই তাড়াতাড়ি দিন ঠিক কর একটা, আর এই নাও সম্পত্তির ড্রাফট্—পড়ে রেখো—কাল আমি আবার আসব।

কথাটা বলে কুন্তী আর দাঁড়ায় না—উঠে দাঁড়ায় যাবার জন্য এবং দরজার দিকে দু পা এগুতেই মানসীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

মানসী ঘরে ঢুকছিল।

মানসীও কুন্তীকে ঘরে দেখে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

কিন্তু কুন্তী দাঁড়ায় না—এমন কি ফিরে মানসীর দিকে তাকায় না পর্যন্ত। ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

এস—মানসী—বস।

দিদিভাই এসেছিল—

হ্যাঁ—আমি তোমাকে বলিনি—she must come, আসবে সে, তাকে আসতে হবেই—

মানসী শিশিরাংশুর কথার কোন জবাব দেয় না।

ধীরে ধীরে সোফাটার 'পর এসে বসে।

হাতে কিসের কাগজ ওটা মানসী শুধায়।

ও কিছু না। এমনি একটা কাগজ—কাগজটা আড়াল করে ফেলে শিশিরাংশু।

শিশির—

বল—

আমাকে তুমি ক্ষমা কর শিশির, ও আমি পারব না—মা হয়ে নিজের সন্তানকে—তাছাড়া সে ত, কোন পাপ করে নি, আর আমরা যখন বিয়েই করছি—

আচ্ছা, আচ্ছা হবে, তোমার যখন এতই অনিচ্ছা—সেজন্য তোমাকে অত ভাবতে হবে না—

সত্যি, সত্যি বলছ শিশির।

হ্যাঁ, তবে—

কি তবে ?

বিয়ের পরই এখান থেকে আমরা দূরের কোথায়ও চলে যাব।

সে খুব ভাল হবে—মানসী বলে।

তারপর তোমার বাচ্চা হয়ে গেলে ফিরে আসা যাবে, আরো কিছুদিন পরে তখন আর কারো কিছু মনেও হবে না।

উঃ, ইউ আর সো নাইস শিশির, আনন্দে আত্মহারা হয়ে মানসী শিশিরাংশুকে জাপটে ধরে।

আরো দিন সাতেক পরে রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে হয়ে গেল।

এবং বিয়ে যেদিন হল—কুন্তী সকলকে নিমন্ত্রণ করে হোটেলে একটা ডিনার দিল।

বললে সে, মার অসুখ তাই বাড়ীতে কোন কিছু করা হল না।

রতিনাথ কেবল বলতে লাগলেন, একটা কায়স্থর সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিলি তুই মা—

কুন্তী বলে, ওসব আজকাল আর কেউ মানে না কাকা—

ডিনার তখনো শেষ হয় নি, কুন্তী একপাশে শিশিরাংশুকে ডেকে এনে তার হাতে একটা ভারী খাম তুলে দিল।

শিশিরাংশু শুধায়, কি এটা—

এতে নগদ দশ হাজার টাকা, তোমাদের কাল সকালের প্লেনের দুটো ইয়ার-টিকিট আর সম্পত্তির দলিল—কাল সকালেই তোমরা দিল্লী চলে যাবে—

দিল্লী!

হ্যাঁ, তারপর সেখান থেকে যেখানে যেতে চাও যেও, আমাকে একটা চিঠিতে জানিও শুধু সন্তান হবার পর—আমি গিয়ে নিয়ে আসব—

কুন্তী কথাগুলো বলে, আর দাঁড়াল না—বাড়ী থেকে ফোন এসেছিল, মার অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়েছে, সে সোজা বাড়ী চলে গেল।

বাড়ীতে পৌঁছে দুটো দুঃসংবাদ সে পর পর পেল।

মার মৃত্যু হয়েছে কয়েক মিনিট আগে এবং বনমালী কাকার খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারল আগের দিনই নাকি বনমালী সরকার কোথায় যে চলে গেছেন কেউ জানে না।

॥ ১৪ ॥

কুন্তী যেন অকূল সাগরে পড়ে।

মায়ের মৃত্যু—বনমালী কাকা নেই—মানসী ঐ ভাবে তাকে চরম আঘাত দিয়েছে—দিশেহারা সে, কি করবে ভেবে পায় না।

অনন্যোপায় হয়েই যেন কুন্তী রতিনাথের হাতে সব কিছু দেখাশোনার ভার তুলে দিল।

আর সে পারছে না।

সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আর সে পারছে না। সে দিশেহারা—ক্লান্ত—অবসন্ন।—

মানুষ এক এক সময় এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যে তখন নিজেকে প্রবাহমান ঘটনাবর্তের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন পথই বুঝি খুঁজে পায় না।

ভাল-মন্দর লাভ খতিয়ানটা পর্যন্ত তখন আর তার মনে স্থান পায় না।

কুন্তীর সেদিন ঠিক তেমনি অবস্থা।

যে মাটিতে পা রেখে সে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখছিল সেই মাটিটাই শুধু পায়ের নীচ থেকে সরে গিয়েছে তাই নয়—মনের সব চাইতে বড় বিশ্বাসের জায়গাটা হঠাৎ যেন শূন্য—ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই—কেবল ব্যর্থতা-রিক্ততার একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস যেন সমস্ত মনটাকে বিকল বিষণ্ণ করে তুলেছে।

মনের ঠিক ঐ অবস্থায় আর কিইবা সে করতে পারত।

তখন সমস্ত কিছুই ত তার কাছে দুঃসহ।

লেখাপড়া করে শিশির ও মানসীর একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে ত দিয়েছিলই, ব্যাঙ্কে যা নগদ ছিল তার সবটাই ওদের নামে ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করে দিয়েছিল।—সে তার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

স্বর্ণেন্দু বলেছিল, এ আপনি কি করছেন মিস চৌধুরী।

কুন্তী বলেছিল, এ ছাড়া আর কি উপায় ছিল বলুন ?

কিন্তু আপনি যা ভাবছেন—সর্বনাশকে ঠেকিয়ে রাখবেন—

না স্বর্ণেন্দুবাবু, সর্বনাশকে কি ঠেকান যায়, না আজ পর্যন্ত কেউ তা পেরেছে—আপনি কি বলবেন আমি জানি, মানসী সুখী হবে না কোন দিন, হতে পারে না। মিথ্যার উপরে কোন দিন কোন সত্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না তবু আমার দায়িত্বটুকু ত আমি পালন করলাম—ভাল কথা, শর্মিলার কোন খোঁজ আর আপনি করতে পেরেছিলেন ?

হ্যাঁ—

দেখা হয়েছিল আপনার সঙ্গে ?

হয়েছিল—দেখলাম সব সে জানে—

জানে !

হ্যাঁ—আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা বলতে সে বললে—কুন্তী দেবীকে বলবেন—পুরাতন একটা ভুলকে আর আমি ঘেঁটে নিজের গায়ে কাদা ছিটাব না। শিশিরাংশু আমার মন থেকে মুছে গিয়েছে—সে আজ আমার কাছে মৃত—

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে কুন্তী বলে, কি যেন চাকরি করে সে বলেছিলেন ?

হ্যাঁ, সামান্য চাকরি—একটা মার্চেন্ট অফিসে টাইপিষ্টের চাকরি, মাইনা একশত কুড়ি টাকা মত পায়—বিধবা মা এখনো বেঁচে আছে। দুজনে দমদমার ওদিকে একটা ছোট বাসা ভাড়া করে থাকে।

আমি যে ভেবেছিলাম, কিছু—

না কুন্তী দেবী—ও চেষ্টা বোধহয় না করাই ভাল।

কেন ?

ও নেবে না।

স্বর্ণেন্দুকে শেষ পর্যন্ত কুন্তী চাকরিটা ছাড়তে দেয় নি।

মানসী ও শিশিরাংশুর বিয়ের আগের দিন যখন সব ব্যবস্থা সে মনে মনে করে ফেলেছে স্বর্ণেন্দুর বাসায় গিয়ে হাজির হয়েছিল।

ভবানীপুরে হরিশ মুখার্জী রোডের একটা সরু গলির মধ্যে স্বর্ণেন্দুর বাসা।

দোতলায় খান তিনেক ঘর নিয়ে দুটি প্রাণীর নির্ঝঞ্ঝাট সংসার।

মা ও ছেলে। স্বর্ণেন্দু ও তার মা।

ভোর বেলাই গিয়ে হাজির হয়েছিল কুন্তী স্বর্ণেন্দুর ওখানে।

স্বর্ণেন্দুর মা-ই বাসায় ছিলেন—স্বর্ণেন্দু বাসায় ছিল না।

পরবর্তীকালে প্রায়ই ভেবেছে কুন্তী—ভাগ্যে সেদিন স্বর্ণেন্দুর ওখানে গিয়েছিল কুন্তী নচেৎ অতবড় সত্যটা কোনদিনই সে জানতে পারত না।

জীবনটা যে শুধু অন্ধকারই নয় আলোও আছে, এ কথাটা ত কোন দিনই তার আর জানা হত না, তার জীবনের কোন সান্ত্বনাই ত আর থাকত না—

স্বর্ণেন্দুর মাও কোনদিন ইতিপূর্বে দেখেন নি কুন্তীকে—জিজ্ঞাসা করেন—তুমি—

আপনি বোধ হয় স্বর্ণেন্দুবাবুর মা!

হ্যাঁ—

আপনি আমায় চিনবেন না—আমি কুন্তী, স্বর্ণেন্দুবাবু নেই?

একটু বাইরে গিয়েছে, এখুনি ফিরবে—এস মা—ঘরে এসে বস।

ভদ্রমহিলা কুন্তীকে ঘরে এনে বসান এবং বার বারই যেন কেন কুন্তীর মুখের দিকে তাকান।

কুন্তী বিব্রত বোধ করে।

তোমার মুখটা এত চেনা চেনা কেন মনে হচ্ছে বল ত মা—কোথায় যেন তোমায় দেখেছি মনে হচ্ছে।

হয়ত রাস্তা-ঘাটে কখনো দেখে থাকবেন—কুন্তী ইতঃস্তত করে বলে।

না মা, রাস্তায় ত আমি বড় একটা বের হই না—তুমি বোস ও আবার তাড়াতাড়ি কোথায় যেন বেরুবে, রান্নাটা চাপিয়েছি—

স্বর্ণেন্দুর মা চলে গেলেন।

কুন্তী ঘরের চারিদিক চেয়ে দেখে, মাঝারি আকারের ঘরখানি কিন্তু ঘরের প্রতিটি বস্তুতে এমন পরিচ্ছন্ন আর্টিস্টিক একটা রুচিবোধের পরিচয় ছড়ানো আছে যে কুন্তী মুগ্ধ হয়ে যায়। একটি সিংগেল বেডে পরিচ্ছন্ন বিছানা—মোরাদাবাদী একটা বেড কভারে ঢাকা।

একটি বুক-শেল্‌ফে নানা বই।

পাশের ঘরে নজর পড়ে কুন্তীর মধ্যবর্তী দরজা পথে।

ঘরের দেওয়ালে সর্বত্র—হাতে আঁকা নানা ধরনের ছবি, কৌতূহলী কুন্তী পায়ে পায়ে এক সময় পাশের ছোট ঘরটায় গিয়ে প্রবেশ করে।

স্টুডিও—

স্বর্ণেন্দুর তা হলে ছবি আঁকার সখ আছে—শুধু সখ নয়, ছবিগুলো দেখতে দেখতে কুন্তীর মনে হয় ঐ ব্যাপারে স্বর্ণেন্দু রীতিমত পারদর্শী।

এবং হঠাৎ ঈজেলের 'পরে অর্ধসমাপ্ত একখানা ছবির প্রতি নজর পড়তেই চমকে ওঠে কুন্তী, কার—কার ছবি—

মনে হচ্ছে যেন সেই—

ছবিটির নীচে ছোট করে লেখা—গোপন স্বপ্ন।

আকস্মাৎ—আকস্মাতই যেন মনের পাতায় কুন্তীর একটা আলোর ঝাপ্‌টা এসে লাগে।

চমকে ওঠে কুন্তী, কার কার ছবি ?

কিন্তু সেখানে ঐ ছবির সামনে ঐ ঘরের মধ্যে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে একাকী সাহস হয় না—তাড়াতাড়ি এ ঘরে চলে আসে কুন্তী।

আজ মনে পড়ে নতুন করে স্বর্ণেন্দুর দুটি চোখের দৃষ্টি—

সত্যিই ত, সে দৃষ্টিই ত তাকে বলেছে—সব কথা, কতদিন—অন্ধ সে, দেখতে পায় নি—।

কাজের জন্য দিনের পর দিন এসেছে তাদের বাড়ীতে—কারখানা সম্পর্কে কথাবার্তা হয়েছে—সহজে তাকায় নি স্বর্ণেন্দু তার মুখের দিকে।

মুখ নীচু করেই কথাবার্তা বলেছে কিন্তু যখন চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়েছে—

দৃষ্টি পড়ে নি—কোনদিন দৃষ্টি পড়ে নি তার, কেন পড়ে নি—

বাইরে পদশব্দ পাওয়া গেল।

পরমুহূর্তেই স্বর্ণেন্দু এসে ঘরে ঢুকল।

আপনি—

কেন, আসতে পারি না! বলে কুন্তী।

না, না—তা কেন—কিন্তু—

স্বর্ণেন্দুবাবু—

বলুন!

আজ কিন্তু একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি—

অনুরোধ।

হ্যাঁ—খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না ত?

স্বর্ণেন্দু মৃদু হাসে, তারপর বলে, বলুন—

আপনার কাজ ছাড়া চলবে না—

কিন্তু—

বললাম ত, আমার অনুরোধ—রাখবেন না আমার অনুরোধটুকু?

স্বর্ণেন্দু চুপ করে থাকে।

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ডাঃ ভাদুড়ীকেও আমি অনুরোধ করেছি, তিনিও ছাড়বেন না চাকরি বলেছেন, তাছাড়া যে কারণে আপনাদের অসম্মান হয়েছিল সে কারণ ত আর থাকল না।

কিন্তু—

না স্বর্ণেন্দুবাবু, না আপনি করতে পারবেন না। তাছাড়া আমার সব চাইতে বড় আশ্রয়টাই যে আমি হারিয়েছি আজ—

কুন্তী দেবী—

হ্যাঁ, বনমালী কাকা চলে গেছেন।

সে কি!

হ্যাঁ স্বর্ণেন্দুবাবু—কেউ আজ আর আমার পাশে নেই, আরো একটা কথা। আপনাকে ত বলি নি—

কি?

বাড়ী ঘর দোর ও অন্যান্য ব্যাপার ত সবই এতদিন বনমালী কাকা দেখছিলেন; এখন থেকে সব আমার কাকা দেখবেন।

কিন্তু—

জানি কি বলবেন আপনি, কিন্তু তাকেই বা আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখি বলুন। যে সর্বক্ষণ দুহাত বাড়িয়ে রয়েছে, তাছাড়া একটা সামান্য মানুষ আমি, কত যুদ্ধ করব একা একা বলুন ত—

আজই আমি অফিসে যাব—

ঠিক ত—

হ্যাঁ—

আঃ, আপনি আমায় বাঁচালেন স্বর্ণেন্দুবাবু—আমি—আমি যে কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব—

ঐ সময় স্বর্ণেন্দুর মা মমতাময়ী একটি কাঁচের ডিসে কিছু হালুয়া ও এক কাপ চা নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

এ কি, আপনি আবার কষ্ট করতে গেলেন কেন মা? তাড়াতাড়ি বলে ওঠে কুন্তী।

কষ্ট আবার কি মা—সামান্য এক কাপ চা—

স্বর্ণেন্দু বলে, কিন্তু মা, আমাদের বাড়ীর ঐ চা কি উনি খেতে পারবেন?

কেন? মমতাময়ী ছেলের মুখের দিকে তাকান।

মমতাময়ী সত্যি কথা বলতে কি ছেলের কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন নি, কারণ অতি সাধারণ বেশে কুন্তী এসেছিল।

সাধারণ সরু কালো পাড় একটি তাঁতের শাড়ি ও সাদা সাদামোটা একটি আদ্দির ব্লাউজ পরণে—হাতে একগাছি করে সরু সোনার চুড়ি—

দোষ নেই মমতাময়ীর, ঐ সামান্য বেশে কুন্তীকে তিনি বুঝবেন কি করে—

সামান্য বেশে দেখে তুমি চিনতে পার নি মা, কিন্তু উনি কার মেয়ে জান? সহরের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সতীনাথ চৌধুরীর মেয়ে—

কুন্তী নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মমতাময়ীর হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে বলে, কি যে বলেন স্বর্ণেন্দুবাবু আপনি—দিন মা—তাছাড়া সত্যিই আমার চায়ের পিপাসা পেয়েছিল—

মমতাময়ী ততক্ষণে নামটা শুনে চিনতে পেরেছেন কুন্তীকে। বলেন, মানে যে ঔষধের কোম্পানীতে তুই চাকরি করতিস—

হ্যাঁ মা, সেই কোম্পানীরই ম্যানেজিং ডাইরেকটার—খোদ মালিক—

স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনি যদি এমনি করে আমাকে লজ্জা দেন—তারপরই মমতাময়ীর দিকে তাকিয়ে বলে কুন্তী, আচ্ছা মা—আপনিই বলুন ত—সেই কোম্পানীর উনি এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার—উনিই কিসে কম—কিন্তু মা, ওঁকে চা দিলেন না?

এই যে আনছি—

মমতাময়ী ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

নির্মল কৌতুকে ও আনন্দে সকালটা যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল।

এবং কুন্তী স্বর্ণেন্দুর কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়ে বের হয়ে এল তার বাড়ী থেকে মনটা কানায় কানায় ভরে উঠেছে যেন।

দুঃখের ও জ্বালার অনেক বাষ্প কয়েকদিন ধরে মনটা ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল—মনটা যেন অনেকটা হালকা হয়ে যায়।

কুন্তীর মনে আছে—

পরের দিন—শিশিরাংশু ও মানসীর বিয়ে হয়ে গেল। এবং ওদের বিয়ের পর দিনই—নর্মদার মৃত্যু হয়।

নর্মদার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সর্বাগ্রে স্বর্ণেন্দু ছুটে এসেছিল—এসে কুন্তীর পাশে দাঁড়িয়েছিল।

এবং স্বর্ণেন্দু যদি কুন্তীর সেই চরম দুঃখের মুহূর্তে অমন করে সেদিন তার পাশটিতে এসে না দাঁড়াত কুন্তী আজও ভেবে পায় না সে কি করত।

বনমালী কাকা নেই—রতিনাথ কেবল নিরর্থক চেঁচামেচি করছেন—রতিনাথের স্ত্রী অনাবশ্যক জোর দিয়ে গলায় চীৎকার করে কাঁদছে—মানসীও বাড়ীতে নেই।

কুন্তী যে কি করবে ভেবে পায় না।

কেমন যেন বিহ্বল বিভ্রান্ত মার মৃত্যুশয্যার পাশটিতে বসে ছিল। কাঁদতেও বুঝি সে ভুলে গিয়েছিল।

স্বর্ণেন্দু সোজা ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে।

কুন্তী দেবী—

কুন্তী মুখ তুলে তাকাল।

চলুন—উঠুন—পাশের ঘরে চলুন—

স্বর্ণেন্দু হাত ধরে কুন্তীকে তুলেছিল।

॥ ১৫ ॥

পরবর্তীকালে একটা পত্রে কুন্তী লিখেছিল স্বর্ণেন্দুকে :

জান, স্বর্ণেন্দু—তুমি সেদিন এসে আমার মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশ থেকে হাত ধরে তুললে—আমার মনে হল—ভয় কি আমার, আর কাউকেই ত প্রয়োজন নেই আজ—তুমিই ত আছো। তুমি আমার আছো।

কানে কানে কে যেন আমায় বললে, কুন্তী, তোর ভয় নেই—স্বর্ণেন্দু তোর আছে—

তারপর কতদিন ভেবেছি—আমার জীবনের এত বড় একটা ব্যাপার কখনো আগে আমি উপলব্ধি করতে পারি নি কেন?

আমি এমনই অন্ধ যে এত বড় ভালবাসার সন্ধান পেলাম না। আচ্ছা, সত্যি করে বল ত, কবে থাকতে তুমি আমায় ভালবেসেছিলে আর আমার এমন কি সুকৃতি ছিল যে এত বড় ভালবাসা তুমি আমায় দিয়েছিলে?

এত বড় পুরস্কারের যোগ্য ত আমি নই—

ট্রেণটা একটু আগে একটা ষ্টেশনে থেমেছিল—আবার এখন চলেছে।

সীতা ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেছে।

কুন্তীর কোল ঘেঁষে বসে জানালা-পথে বাইরে তাকিয়ে আছে—

হঠাৎ কুন্তীর হাতটা ধরে টেনে সীতা বলে, দেখ—দেখ মা—তারের উপর বসে আছে লাল পাখীটা কি সুন্দর—যাঃ, উড়ে গেল, ঐ যে, কোথায় গেল মা পাখীটা—

হাওয়ায় এলো-মেলো সীতার মাথার চুলগুলো ঠিক করে দিতে দিতে সস্নেহে বলে, বোধ হয় ওর বাসায়।

বাসায় ওর কে আছে মা? ওর মা আছে?—

নিশ্চয়ই আছে—

আচ্ছা মা?—

কি—

আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

কলকাতায়—

কলকাতায় বুঝি আমাদের বাসা ?

হ্যাঁ—

তবে এতদিন বাসায় যাও নি কেন ?

সত্যিই ত, যায় নি কেন ?

সে ত তার নিজের বাড়ী—যাওয়ার ত কোন বাধাই ছিল না—আর আজও ত নেই। তার সেখানে আজও যাবার ও থাকবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

কেউ তাকে সেখানে যেতে বাধা দিতে পারে না—সাধ্য নেই কারো বাধা দেবার।

তবে—

তাছাড়া সামান্য চাকরিই বা সে করছে কেন, আর আজ কলকাতায় কোথায় গিয়ে সীতাকে নিয়ে উঠবে ভেবে আকুল হচ্ছে কেন—

আকুল ত সে নিজের জন্য নয়। সীতার জন্য—

সীতাকে কেন্দ্র করে যে প্রশ্নের কুৎসিত ঝড় উঠবে সেখানে সীতাকে নিয়ে গিয়ে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই—যে অপমানের কাদা সকলে মিলে তার গায়ে ছিটাবে—তার সীতার গায়ে ছিটাবে—তা থেকে নিজেকে এবং সীতাকে বাঁচাবার জন্যই যে সে আর সেখানে ফিরে যেতে পারে না।

সীতার দায়িত্ব যে তার দায়িত্ব।

সীতাকে যে সে গ্রহণ করেছে।

মানসীকে যে সে কথা দিয়েছে—সীতার গায়ে সে কোন কলঙ্কের দাগ লাগতে দেবে না।

হ্যাঁ, মানসীকে সেদিন সে কথা দিয়েছিল যে—

তা কি সে ভুলতে পারে।

মনে পড়ছে—

সবই মনে পড়ছে—

সাত মাস পরে হঠাৎ একদিন জরুরী তার এল লক্ষ্ণৌ থেকে—

শিগগিরী এস—মানসী।

তার পেয়েই ছুটে গিয়েছিল কুন্তী—এক মুহূর্তও আর দেরি করে নি। সে ভেবেছিল মানসী বুঝি অসুস্থ—

একটা টাঙ্গা নিয়ে অনেক ঘুরে ঘুরে তবে বাসাটা খুঁজে পেয়েছিল কুন্তী।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর ঐ-দেশী একটা দাই এসে দরজাটা খুলে দিয়েছিল।

কাকে চাই মাঈজী—দাই জিজ্ঞাসা করে।

এখানে কি শিশিরাংশুবাবু থাকে ?

দাই সে কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করে—মাঈজী কলকাতা থেকে আসছে কি না ?

কুন্তী হাঁ বলায় দাই তখন তাকে দোতলায় নিয়ে যায়।

দোতলায় ছোট দুটো ঘর পাশাপাশি—সামান্যই আসবাবপত্র ঘরে। দাইয়ের নির্দেশে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে থমকে দাঁড়াল কুন্তী—

জানালাটার সামনে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল মানসী। দাই ঘরে ঢুকে ডাকে; মাইজী—

কিরে দাই—

কথাটা বলে ফিরে তাকাতেই মানসীর কুন্তীর সঙ্গে চোখাচোখি হয় এবং মানসী মুহূর্তকাল কুন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই ছুটে এসে দুহাতে উজ্জ্বল আনন্দে কুন্তীকে জড়িয়ে ধরে বলে, দিদিভাই! কুন্তী দুহাতে ছোট বোনটিকে জড়িয়ে ধরে।

আমি জানতাম দিদিভাই তুমি আসবে—ও বলেছিল, আসবে না—

কে—শিশিরাংশু?

হ্যাঁ—

কি বলেছিল?

তুমি নাকি আসবে না—সেদিন কথা দিলেও তুমি কথা রাখবে না—আর আমি বলেছিলাম—নিশ্চয়ই তুমি আসবে—আসবে তুমি—

শিশিরাংশু কোথায়? তাকে দেখছি না।

সে ত এ সময় বাড়ীতে থাকে না—

থাকে না?

না—সারাটা দিন কোথায় থাকে—অনেক রাত্রে আসে, মাঝে মাঝে তাও আসে না—রাতটুকু থাকে, তারপর ভোর হলেই চলে যায়—

কোথায়?

জানি না—

সে কি—তুই জানিস না সারাদিন সে কোথায় থাকে?

না—

কোথায় ও চাকরি করে হয়ত—

না—

তবে কি রিসার্চ করে?

না—

তার মানে, কিছুই করে না নাকি—

মানসী মাথা নীচু করে থাকে।

কুন্তী বুঝতে পারে শিশিরাংশু সম্পর্কে মানসী আর বেশী কিছু বলতে চায় না। কি ভেবে কুন্তীও আর পীড়াপীড়ি করে না।

তা, হ্যাঁরে—কুন্তী অতঃপর বলে, তোর ছেলে না মেয়ে হল কিছুই ত আমায় জানালি না। দিদিভাই বুঝি এতই পর হয়ে গিয়েছে, এতই দূরে চলে গিয়েছে যে তোর সন্তানের জন্য আশীর্বাদটুকুও তার আর প্রয়োজন নেই?

সেই জন্যই ত তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি দিদিভাই, মানসী বলে আশীর্বাদের কথা বলছ—আজ পৃথিবীতে খুকীর তোমার আশীর্বাদটুকুই যে একমাত্র সম্বল—সেই ত তার একমাত্র পরিচয়—

কথাগুলো বলতে বলতে মানসীর চোখের কোল দুটো জলে ভিজে ওঠে।

মানসী—

চল পাশের ঘরে—

পাশের ঘরে দোতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল খুকী—

এক গুচ্ছো যূঁই ফুল যেন।

বাঃ বাঃ, ভারী সুন্দর হয়েছে ত—প্রশংসমান দৃষ্টিতে খুকীর দিকে চেয়ে চেয়ে কুন্তী বলে, দেখেছিস, তোর মত ওর গালে একটা তিলও আছে—বাবার গালে ঠিক অমনি একটি তিল ছিল, মনে আছে তোর?

হ্যাঁ—

তুই সেই তিলটি পেয়েছিস—আর তোর মেয়েও পেয়েছে—বাবার মত দেখতে তুই হয়েছিলি ঠিক ঠিক মা তাই বলত—তুই খুব সৌভাগ্যবতী হবি—বলতে বলতে লাল লাল ফোলা ফোলা গাল দুটো খুকীর টিপে দেয় কুন্তী আদর জানিয়ে।

ঘুমের মধ্যেই মুখ ফোলায় খুকী।

দেখছিস, কেমন আবার গাল ফোলাচ্ছে—বলতে বলতে আবার গাল টিপে দেয় খুকীর কুন্তী।

খুকী এবারে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে।

ওরে আমার সোনা—ওরে আমার মণি—ওরে সাতরাজার ধন—বুকে তুলে নিয়ে আদর করে কান্না থামায় কুন্তী।

কিন্তু তুই কি বলত—আবার বলে কুন্তী, সংবাদটা দিবি ত, এখন কি দিয়ে ওর মুখ দেখি বল ত?

কুন্তীর কথায় কোন সাড়া দেয় না মানসী।

ওর চোখ দুটো কেবল ছল ছল করতে থাকে।

খুকীকে শান্ত করে দোলায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে ওরা আবার পাশের ঘরে ফিরে আসে এবং তখনই কথাটা বলে মানসী।

দিদিভাই—

কিরে?

খুকীকে তোমার হাতে তুলে দেবার জন্যই কিন্তু আমি তোমায় ডেকে এনেছি জরুরী তার করে—

মানসীর কথায় চকিতে ফিরে তাকায় কুন্তী বোনের মুখের দিকে।

হ্যাঁ—দিদিভাই, মনে আছে তোমার তুমি কথা দিয়েছিলে ওর সব ভার তুমি নেবে—

মানসী—

হ্যাঁ দিদিভাই, ওকে তুমি নাও—আমি—আমি হয়ত ওকে বাঁচাতে পারব না—

তুই সেই জন্য আমায় ডেকে পাঠিয়েছিস? বিস্ময়ের যেন অবধি নেই কুন্তীর। বিয়ের আগে ওদের অমনি একটা কথা হয়েছিল বটে—ও কথাও দিয়েছিল কিন্তু সেটাকেই ওরা আজ সত্যি করে তুলতে চায় নাকি! নিজের সন্তানকে অন্যের হাতে তুলে দিতে চায়—তাই কি সম্ভব, না কেউ তা পারে!

মানসী আবার বলে, ও চায় না খুকী এখানে থাকুক—ও জন্মান অবধি একবারের জন্যও ওর মুখের দিকে তাকায় নি—আর বার বার বলছে তোমাকে ডেকে ওকে তোমার হাতে তুলে দেবার জন্য—

শিশিরের কথা ছেড়ে দে কিন্তু তুই—তুই পারবি ওকে ছেড়ে থাকতে ?

পারব—পারব দিদিভাই, আমি সব পারব ! আমি সব পারি—সব পারি—আমি ত ওর মা নই—আমি ওর কেউ নই—

মানসী—

ওকে তুমি নিয়ে যাও, না হলে হয়ত আক্রোশের বশে কোনদিন আমার অলক্ষ্যে ওর গলা টিপে মেরে রাখবে—জানতেও পারব না আমি—

মানসী—

তোমার কাছে থাকলে ও বেঁচে থাকবে—নাই বা দেখলাম ওকে, তবুও জানব ও আমার বেঁচে আছে।

আমি, আসুক সে, তার সঙ্গে কথা বলব—

না, না দিদিভাই, তার সঙ্গে তুমি কথা ব'লো না—অপমান করবে সে—

কিন্তু কেন—রাখবেই বা না কেন ওকে নিজের কাছে, ওর জন্মর জন্য কে দায়ী, সেই ত সব চাইতে বেশী দায়ী। তার সন্তানের প্রতি তার চাইতে আর কার বেশী কর্তব্য—সে বাপ—

বাপ।—বাপই বটে—

তাছাড়া—কুন্তী আবার বলে, এ কেনই বা হবে—মা বাপ বেঁচে থাকা সত্ত্বেও কোন পাপ, কোন অপরাধ নয় অনাথের মত অন্যর কাছে সে পালিত হবেই বা কেন ?

আমার গর্ভে জন্মেছে—সেই দুর্ভাগ্যে—

দুর্ভাগ্য, কিসের দুর্ভাগ্য, কুন্তী সরোষ কণ্ঠে বলে, এ অন্যায়—জবরদস্তি—জুলুম, অবিচার—

জান দিদিভাই—ও কি বলে—

কি—

ও নাকি তার সন্তান নয়—

বলেছে ঐ কথা !

হ্যাঁ—যে মেয়ে বিয়ের আগে নিজেকে এক পুরুষের কাছে সমর্পণ করতে পারে, সে নাকি—

ছিঃ ছিঃ—বলিস না, আর বলিস না—

হয়ত কে জানে—ও চলে গেলে আমাদের দুজনার মাঝখান থেকে আবার ও আগের মত হবে—আমাদের দুজনার মধ্যে প্রতি মুহূর্তের এ অসহনীয় দূরত্বের অবসান ঘটবে, তুমি আর অমত কর না দিদিভাই, ওকে তুমি নিয়ে যাও—

কিন্তু ঐ দুধের শিশু, ওকে আমি কি করে মানুষ করি বল ত।

যদি বাঁচে ও ত তোমার কাছেই বাঁচবে—

শুধু ত তাই নয়, কি বলব আমি লোককে, কাকা কাকীমা—বাড়ীশুদ্ধ সবাই যখন প্রশ্ন করবে ও কে—কি জবাব দেব আমি বলতে পারিস ?

বল, কুড়িয়ে পেয়েছ—রাস্তায় ওকে কুড়িয়ে পেয়েছ—এমন ত হয়—আর একান্তই যদি তোমার পক্ষে ওকে পালন করা না সম্ভব হয়—ওকে তোমার কাছে রাখা না সম্ভব হয়, ওকে কোন অনাথ আশ্রমে দিয়ে দিও—

মানসী—আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে কুন্তী।

হ্যাঁ—যার বাপ মা থেকেও নেই—যার বাপ মার কাছে স্থান হল না—সে অনাথ আশ্রমে ছাড়া আর কোথায় যাবে—তাকে সেখানেই যে যেতে হবে—

ঠিক আছে—থাম তুই, আর বলতে হবে না—তোরা যখন ওকে রাখবিই না—আমিই ওকে নিয়ে যাব—

॥ ১৬ ॥

সেদিন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে নি কুন্তী।

মুখে বললেও সত্যি সত্যিই যে নিজের সন্তানকে কেন এবং কত বড় দুঃখে এবং নিজে কতখানি অসহায় বলে কুন্তীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল মানসী বুঝতে পারে নি।

বুঝতে পেরেছিল অনেক পরে—

শিশিরাংশুর কাছে মানসীর সমস্ত প্রয়োজন সেই দিনই ফুরিয়ে গিয়েছিল যেদিন যে মুহূর্তে তার দেহটাকে করায়ত্ত করতে পেরেছিল। এবং সেটা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল মানসীর দেহে মাতৃত্বের সম্ভাবনাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

আকর্ষণ পরিবর্তিত হয়েছিল বিতৃষ্ণায়—

এমনিই হয়, আকর্ষণ ও লোভের বস্তু করায়ত্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আকর্ষণ ও লোভের মৃত্যু ঘটে ঐ সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই।

মানসী সেটা বুঝতে পারে নি—সরল নির্বোধ মানসীর পক্ষে সেটা বোঝাও সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ঐক জাতীয় পুরুষ আছে সংসারে যাদের কোন কিছুকে পাওয়া বা করায়ত্ত করবার আগে যেমন আকাঙ্ক্ষাটা থাকে দুর্বার —তেমনি সেটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর হয় সমাপ্তি। শুধু সমাপ্তি নয় সেই সঙ্গে বিকর্ষণের বিতৃষ্ণা।

শিশিরাংশু ছিল সেই প্রকৃতির পুরুষ। একান্ত স্বার্থপর।

শিশিরাংশু মানসীকে বিয়েই হয়ত কোনদিন করত না যদি না সেই সঙ্গে সম্পত্তি ও অর্থের স্থূল স্বার্থের ব্যাপারটা অমন স্পষ্ট ভাবে জড়িয়ে থাকত।

অতটা না হলেও কিছুটা আঁচ করতে পূর্বাহ্নে পেরেছিল বলেই কুন্তী ব্যাঙ্কের টাকাটার মোটা একটা অংশ মানসীর নামে ফিক্সড ডিপজিটে রেখে দিয়েছিল এবং মাসোহারার ব্যবস্থাটাও ছিল মানসীর নামেই।

ঐ দিন দ্বিপ্রহরেই খুকীকে নিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে ট্রেণে চেপে বসল কুন্তী, সঙ্গে এল দাই—সরাবতিয়া।

কুন্তী বুঝতে পেরেছিল খুকীকে রাখা নিজের কাছে মানসীর পক্ষে সত্যিই সম্ভব নয়—অন্য ভয় যত না থাক প্রাণের ভয় ছিল মেয়েটার।

শিশিরাংশুকে সন্তানের ব্যাপারে সত্যিই আর যেন মানসী বিশ্বাস করতে পারছিল না। রীতিমত সে ভীত-শঙ্কিত হয়েছিল অমঙ্গল আশঙ্কায়।

সত্যিই যদি তেমন কিছু ঘটে তখন আপশোষের যে আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

মা হয়েও তাই মানসী দুধের শিশু নিজের বুক থেকে ছিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কুন্তীর হাতে তুলে দিয়েছিল।

বলেছিল, ও যেন আজ থেকে তোমাকেই ওর মা বলে জানে দিদিভাই—কোনদিন—কোনদিন ওকে বল না তুমি ছাড়া ওর মা আর কেউ ছিল, তাহলে হয়ত ও কোনদিনই ওর মাকে ক্ষমা করতে পারবে না—মায়ের নামে ঘৃণায় হয়ত মুখ ফিরিয়ে নেবে—

কুন্তী জবাবে বলেছিল, তবু তোকে বলা রইল-মানসী—মেয়েকে তোর যেদিন তুই চাইবি, নিয়ে আসবি—কোন সঙ্কোচ করিস না—কোন কিন্তু করিস না—

না দিদিভাই, আর না। পারলাম না যাকে মা হয়েও নিজের বুকে ধরে রাখতে—আর এজীবনে তার দিকে হাত বাড়াব না। আজ থেকে ওর মার মৃত্যু হল—

কথাটা শেষ করতে পারে নি মানসী, ছুটে গিয়ে ঘরে খিল তুলে দিয়েছিল।

অনেক ভেবেছিল কুন্তী বদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, মানসী—দরজাটা খোল ভাই—একবার—

সাড়া দেয় নি আর মানসী।

দরজা ত খোলেই নি।

তবে আমি চললাম—

তবু সাড়া নেই।

অতঃপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল খুকীকে বুকে নিয়ে কুন্তী।

চলন্ত ট্রেণের ফার্ষ্টক্লাস কামরায় বসে আরো ভাল করে স্থির মস্তিষ্কে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা নতুন করে ভাববার চেষ্টা করে কুন্তী। ভেবে সত্যিই কুল পায় না—নিয়ে ত এল খুকীকে মানসীর কাছ থেকে—অতঃপর কি?

মেয়েটাকে যে নিয়ে এল—এখন সে কোথায় গিয়ে উঠবে—কলকাতার বাড়ীতে—কিন্তু সেখানে যখন প্রশ্নের ঝড় উঠবে—তীক্ষ্ণ কটু সমালোচনা ও ব্যঙ্গোক্তিতে বিষ ঝরতে থাকবে, তখন!—

তখন কি করবে এই মেয়েটাকে নিয়ে।

তাছাড়া একটা দুধের শিশুকে মার বুক থেকে নিয়ে এসে তাকে বাঁচিয়ে রাখা কি এতই সোজা?—প্রতিদিন—প্রতি মুহূর্তে হয়ত নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেবে।

সে সব সমস্যার সমাধান সে কেমন করে করবে!

ইতিমধ্যে মেয়েটা বোধহয় ক্ষিধের জন্য কাঁদতে সুরু করেছিল সরাবতিয়া তাকে বুকে নিয়ে বোতলে করে দুধ দিয়ে শান্ত করে।

চেয়ে চেয়ে দেখে কুন্তী।

ও ত বুঝতেও পারবে না কখন ওর ক্ষিধে পায়—কিসে ওর ব্যথা—কিসে ওর কষ্ট—কখন কেন কাঁদছে—কিছুই ত বুঝতে পারবে না।

তাই ত, এ কি করল সে—মানসী না হয় বলেছিলই—ও কেন তাকে নিয়ে আসতে গেল।

ট্রেণ থামিয়ে চেন টেনে নেমে পড়বে কি। গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে বলবে, না ভাই—এ আমি পারব না—এ দায়িত্ব আমি নিতে পারব না।

বাঃ, চেয়ে দেখে কুন্তী আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, খুকী। সত্যি কি সুন্দর, যেন একগুচ্ছ ফুল।

মানসী বলছিল, ওর চোখে আমি হত্যার সঙ্কল্প দেখেছি দিদিভাই—

না, না—কি বলছিস তুই, প্রতিবাদ জানিয়েছে কুন্তী।

হ্যাঁ—দিদি, আমার থেকে তোমরা ওকে চেন না বেশী। শুধু খুকীকে কেন হয়ত আমাদের দুজনকেই ও এক সঙ্গে গলা টিপে মেরে রাখতে পারে। যেদিন থেকে ও আমার পেটে এসেছে কথাটা জানবার পর থেকেই ওর যে কি আক্রোশ—

ঐ সব কথা শুনেও শেষ পর্যন্ত সাহস হয় নি আর কুন্তীর খুকীকে রেখে আসতে—

তাছাড়া খুকীকে নিয়ে আসলেই যদি সমস্ত সমস্যা মিটে যায়, আবার ওদের পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা ও ভালবাসার সম্পর্কটা গড়ে ওঠে—উঠুক না।

কিন্তু কলকাতার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হবে না।

কলকাতার সেই বাড়ীতে ফিরে যেতেও যেন আর মন চায় না কুন্তীর। বাড়ীটা যেন ইদানীং একটা দুঃসহ যন্ত্রণার আবাস হয়ে উঠেছে।

অশান্তিকে এড়াবার জন্য একটু একটু করে সে বাড়ীর সমস্ত অধিকার কাকা-কাকীমা ও তাদের সন্তানদের হাতে তুলে দিয়েছিল ইদানীং মায়ের মৃত্যুর পর এই কয় মাসে।

শুধু একটা ঘরে থাকা, ও দুবেলা দুটি খাওয়া।

গণেশ দুঃখ করেছে—বলেছে, ওদের তাড়িয়ে দাও দিদিমণি—কোথা থেকে এসে সব জুড়ে বসেছে—সব গ্রাস করে নিয়েছে—

কুন্তী বলেছে, ছিঃ, ওকথা বলিস না গণেশ—ওরা আমার কাকা-কাকীমা—

কিন্তু আমিও বলে রাখছি, এখনো ভাল চাও ত তাড়াও ও-গোষ্ঠী নচেৎ একদিন তোমাকেই এখান থেকে সরে যেতে হবে—

মনে মনে ভেবেছে কুন্তী ইদানীং কত সময়, সেই বোধ হয় ভাল—নিত্য ও-পীড়ন আর যন্ত্রণা থেকে দূরে সরে যাওয়াই বোধ করি ভাল—তবু ত শান্তি পাওয়া যাবে।

তাছাড়া ঘরের আশা আর নেই মনের কোথায়ও। শিশিরাংশু তার ঘরে আগুন জেলে দিয়ে গিয়েছে কামনার পুষ্পকলি আগুনে ঝলসে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

নাই বা ফেরা গেল আর কলকাতার বাড়ীতে।

ওখানে অভিশাপ আছে—মায়ের এত সাধের তৈরী বাড়ী—কটা বছরই বা মা ভোগ করতে পারল—বাপ কোথায় চলে গেল—মানসীর কি হয়ে গেল—না—ওখানে আর সে যাবে না।

॥ ১৭ ॥

কলকাতার বাড়ীতে আর ফিরে গেল না কুন্তী।

জানালও না একমাত্র স্বর্ণেন্দুকে ছাড়া অন্য কাউকে কথাটা। কলকাতার হোটেলে দুদিন থেকে সরবতিয়া ও খুকীকে নিয়ে বের হয়ে পড়ল কুন্তী—সোজা গিয়ে উঠল যশিডিতে।

যশিডিতে সতীনাথের অনেকদিন আগে একটা বাড়ী কেনা ছিল।

একটা আদিবাসী দরোয়ানের জিম্মায় বাড়ীটা তালা দেওয়াই থাকত—তবে বাড়ীতে থাকবার এক প্রস্থ বিছানা ও বাসনপত্র থেকে সুরু করে সব ব্যবস্থা ছিল।

সেখানে গিয়ে উঠে স্বর্ণেন্দুকে একটা চিঠি দিল।

স্বর্ণেদু,

যশিডিতে এসে উঠেছি—সঙ্গে আছে মানসীর নবজাত শিশুকন্যা—হতভাগিনী মেয়েটিকে ওর মা-বাপ রাখল না তাই নিয়ে এলাম সঙ্গে করে।

বাড়ীতে উঠলাম না কলকাতায় নানা কুৎসিত প্রশ্নের জবাব কেবলই দিতে হবে বলে।

তোমাকে তবু জানালাম, কারণ আমার টাকার প্রয়োজন—মাঝে মাঝে যদি তুমি এখানে কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও বড় ভাল হয়।

আর একটা কথা, কেউ কোন কারণে যেন আমার এখানকার ঠিকানাটা না জানতে পারে। ইতি—কুন্তী।

তার পর দীর্ঘ ছমাস বাদে আবার চিঠি দিয়েছিল কুন্তী স্বর্ণেন্দুকে।

স্বর্ণেন্দু,

তোমার চিঠির জবাব দিই নি বলে রাগ কর নি ত। রাগ করো না লক্ষীটি। তুমি রাগ করলে আমি দাঁড়াই কোথা বল ত।

আমার আর দ্বিতীয় আশ্রয় কোথায়—তুমি ছাড়া—আর তুমি ছাড়া আমায় আর বুঝবেই বা কে?

তুমি লিখেছ এ নাকি আমার ইচ্ছাকৃত পলায়ন—আমার ইচ্ছাকৃত অজ্ঞাতবাস। যার নাকি কোন প্রয়োজনই ছিল না। আমার নাকি কাউকে ভয় করবার কিছুই নেই।

না স্বর্ণেন্দু—পলায়ন নয়—তবে অজ্ঞাতবাস বলতে পার।

সত্যিই এ আমার মাতৃত্বের তপস্যার অজ্ঞাতবাস।

সীতা—জান ওর নাম রেখেছি আমি সীতা—হ্যাঁ, এ আমার সীতার মা হওয়ার সাধনার জন্য অজ্ঞাতবাস বলতে পার, কি আশ্চর্য দেখ—

প্রথম যখন ওকে নিয়ে আসি—আমার মনের সে দ্বিধা আর দোটানার কথাও তুমি সবই জান—কিন্তু আজ এই ছমাসেই যেন মনে হচ্ছে মানসী ওকে গর্ভে ধারণ করলেও মা ওর বুঝি আমি। আমারই সন্তান হয়ে বুঝি ও পৃথিবীতে এসেছে।

আমার ঘরে এসেছে।

শুধু খোলা সদর দুয়ার দিয়ে সকলের চোখের সামনে দিয়ে না এসে—গোপন খিড়কির ভেজান দরজাটা ঠেলে এসে ঘরে প্রবেশ করেছে আমার।

ওর আর আমার মধ্যে পূর্ব জন্মের মা ও সন্তানের প্রতিশ্রুতি ছিল নিশ্চয়ই।

এ আমাদের উভয়ের প্রতিশ্রুতি পালন।

ও আমারই সন্তান—আমি ওরই মা। তাইতেই বুঝি আমরা পরস্পর-পরস্পরকে খুঁজে পেয়েছি—শুধু একটা ব্যাপার। এই ভাবে আমি আর বসে থাকতে পারছি না—তাই চাকরির সন্ধান করছি—

তৃতীয় চিঠি কুন্তীর—আবার দশ মাস পরে।

স্বর্ণেন্দু—

এত দিনের চেষ্টা আমার সফল হয়েছে—চাকরি পেয়েছি—

তুমি লিখেছিলে এ চাকরির আমার কি দরকার ছিল—ছিল বৈকি—সীতা যদি তার দাদুর স্বীকৃতি পেত তার মা ও বাবার হাত থেকে তবে সে গ্রহণ করতে পারত তার দাদু ডাঃ সতীনাথ চৌধুরীর অর্থ সাহায্য। কিন্তু তা ত সে পায় নি—

তাছাড়া সে একান্ত আমারই সন্তান যখন। আমারই দায়িত্ব যে তাকে মানুষ করে তোলা আমার নিজস্ব অর্থে—যে অর্থের 'পরে তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

তাই এ চাকরি নিলাম।

ওর জীবনের পশ্চাতের জন্ম-পরিচয়টুকু একেবারে মুছে যাক—নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাক। কোন ঋণ যেন সেখানে না থাকে, আমি এই চাই।

ও যেন আমার সন্তান—ওর মায়ের সন্তান বলে পরিচয় দিতে পারে এই আশীর্বাদই ওকে তুমি কর। কিন্তু সে ত হল ওর পরিচয়—ওর মায়েরও নিজস্ব যে একটা পরিচয়ের দরকার—তাই তোমার কাছে এবারে আমার ভিক্ষা—

আমার কপালে ও সিঁথিতে তোমার দেওয়া—আমার স্বামীর দেওয়া একটু সিঁদুর চাই।

অনুমতি চেয়ে রাখলাম যাবার দিন কপালে এঁকে নেব।

খুব জুলুম করছি, না?

আচ্ছা, তুমি বল না—কুন্তী জুলুম তোমার 'পরে করবে না ত কার 'পরে করবে?

তাছাড়া স্ত্রীর যত জুলুম ত স্বামীর কাছেই। একথাটা নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করবে।

এক বছরের শিশুকে নিয়ে একা একাই এবারে সুদূর ইউ-পি-র এক অখ্যাত ছোট জায়গায় একটা স্কুলে গিয়ে চাকরি নিল কুন্তী।

সরবতিয়াকে ইচ্ছা করেই সঙ্গে নিল না।

পিছনের কোন চিহ্নই সে রাখতে চায় না।

তার পরের পাঁচটা বছর—

ট্রেণটার গতি কমে আসছে—

রেলওয়ে ইয়ার্ড ও অনেক লাইন পাশাপাশি—নিশ্চয়ই কোন বড় জংশন ষ্টেশনে গাড়িটা এল।

গাড়ির জানালা, পথে-মুখ বাড়াল কুন্তী—

হ্যাঁ, কোন বড় জংশনই হবে—দূরে কেবিনটা দেখা যাচ্ছে। গাড়িটা কাল ভোর নাগাদ কলকাতায় পৌঁছাবে। সেবারের মত এবারেও কোন হোটেলেই গিয়ে উঠতে হবে।

ইতিমধ্যেই সে মনে মনে ঠিক করেছে—এবারে সীতাকে কোন কনভেণ্টে রেখে দেবে সে।

হয়ত প্রথম কয়টা দিন কান্নাকাটি করবে—তারপর ধীরে ধীরে সবই ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু তখনো কুন্তী জানত না কলকাতায় তার জন্য কি সংবাদ অপেক্ষা করছে—এবং জীবনে তার কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে আকস্মিক অচিন্ত্যনীয় একটা মোড় নেওয়ার জন্য।

ঠিক ছয়টা বছর আগে যেমন আকস্মিক তার জীবনের সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গিয়েছিল—তেমনি ঠিক আবার ঘটতে চলেছে একটা ঘটনা—

প্রথমে ভেবেছিল কুন্তী—কলকাতার তার হোটেলের ঠিকানাটা স্বর্ণেন্দুকে জানাবে না। পরে কি ভেবে যেন দিন চারেক বাদে একটা কারখানায় ফোন করল।

কে?

স্বর্ণেন্দু—আমি কুন্তী—

কুন্তী—কোথা থেকে—

কলকাতার হোটেল থেকে—তারপরই হোটেলের ঠিকানাটা ও ঘরের নম্বর জানায় কুন্তী। অন্য পক্ষ শুধু শুনে যায়, কোন সাড়া দেয় না।

আসবে নাকি? কুন্তী শুধায়—

তুমি ত যেতে বললে না—

বড় লোভ হচ্ছে একটিবার তোমাকে আসতে বলি, কিন্তু—

কি—

সময় এখনো আসে নি—তাছাড়া আজকাল আমি সত্যিই বড় দুর্বল হয়ে গিয়েছি জান?

দুর্বল!

হ্যাঁ—নিজের 'পরে আর বিশ্বাস নেই—

সে তোমার অহেতুক ভয়—

না, না—সত্যি—বিশ্বাস কর—

যাক ও—কথা শোন—একটা সংবাদ বোধহয় তোমাকে আমার দেওয়া কর্তব্য—

সংবাদ!

হ্যাঁ—মানসীর সংবাদ!

কি—কি হয়েছে মানসীর?—বেঁচে আছে ত?

তা এখনো আছে, তবে—

তবে বল—থামলে কেন?

ফোনে কুন্তীর গলার স্বরটা উৎকণ্ঠায় যেন বুজে আসে।

চিঠি একটা লিখেছিল মানসী তোমাকে কারখানার ঠিকানায়—বাড়ীর ঠিকানায় লিখতে বোধহয় সাহস হয় নি—তারপর জানি না কি বিচিত্র কারণে পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টের অদৃশ্য এক চক্রজালে ফেঁসে প্রায় দীর্ঘ এক বছর বাদে আমার হাতে এসে মাত্র পরশুর আগের দিন পৌঁছায়—

কি চিঠি—পড়েছ সে চিঠিটা—

পড়েছি—

কি লিখেছে?

বিশেষ কিছু না, কলকাতার একটা ঠিকানা দিয়েছে—তোমাকে বিশেষ করে দেখা করতে জানিয়েছে—

আর কিছু লেখে নি?

না—তবে গতকাল অনেক কষ্টে খুঁজে খুঁজে রাত্রে সেই ঠিকানায় গিয়েছিলাম—

দেখা হয়েছে?

হয়েছে—কুন্তী—মানসী আজ মৃত্যুশয্যায়—

না—না—স্বর্ণেন্দু—

আমি তোমাকে ঠিকানা দিচ্ছি—পারত অবিলম্বে তার সঙ্গে দেখা কর—অতঃপর স্বর্ণেন্দু ঠিকানাটা বলে দিল—বেলগাছিয়ার একটা অখ্যাত রাস্তা।

আমি যাব—আজই—এখুনি যাব—

আজই ?

হ্যাঁ, আজই—

কিন্তু এই রাত্রে—

তা হোক—এই রাত্রেই যাব—উঃ তোমায় যদি না ফোন করতাম—একটা কথা—শিশিরাংশুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল ?

না—

সে ওখানেই আছে ত, না—

তাও জানি না।

॥ ১৮ ॥

সেই রাত্রেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় অনেক কষ্টে খুঁজে বের করে বাসাটা কুন্তী।

মিথ্যে বলে নি স্বর্ণেন্দু।

একটা অন্ধকার অপরিসর গলি।

ছোট একটা দোতলা বাড়ীর উপরের দুখানা ঘর নিয়ে ছিল মানসীরা।

মানসীরা, মানে মানসী আর একটা বুড়ী ঝি—মনোর মা। অনেকক্ষণ দরজার কড়া নাড়বার পর এক সময় মনোর মা এসে বকর বকর করতে করতে দরজাটা খুলে দিল।

চোখে অল্প দেখে মনোর মা, তার উপরে সিঁড়ির আলোটা এত অল্প যে ভাল করে সে দেখতেই পায় নি। ভেবেছিল বোধ হয় শিশিরাংশু।

বলে ওঠে, কেমন ধারা ব্যাপার বল ত তোমার বাবু—দুদিন পরে সময় হল—এদিকে মেয়েটা যে মরে—

আমি তোমার বাবু নই—কুন্তী বলে।

ও মা—আমি ভাবনু বুঝি বাবু—তা কে গা বাছা তুমি ?

আমাকে ত তুমি চিনবে না, তা এটাই কি শিশিরবাবুর বাসা ?

হ্যাঁ, বাবুর নাম ত তাই শুনেছি—

তোমার বাবু বুঝি দুদিন আসে না ?

সে গেরোর ফেরের কথা বল কেন বাছা, কেমন ধারা লোক বুঝি না, বৌটা মরছে আর তেনার দুদিন ধরে দেখা নেই। সেই যে দুদিন আগে এখুনি আসছি মনোর মা বলে বেইরে গেল, আর দেখা নেই তারপর—

বাড়ীতে আর কে আছে !

মরবার জন্য ধুকছে বৌটা আর আমি—আর কে থাকবে ?

তোমার মা কোন্ ঘরে ?

উপরে—তা তুমি বাছা কে বললে না ত—

আমি তোমার মায়ের বোন—

বোন !

হ্যাঁ, মায়ের পেটের বোন—

ও—তা হলে তুমিই—তোমার জন্যই বোধ হয় এখনো প্রাণটা বের হয় নি—এলেই যদি বাছা তা এত দেরি করে এলে—

ছোট একটা ঘর।

অল্প শক্তির টিমটিমে একটা ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে ঘরে, তারই আলোয় স্বল্পালোকিত ঘরটা।

একটা পালঙ্কের উপর মলিন শয্যায় শুয়ে ছিল পাশ ফিরে মানসী।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ঘরে পা দিয়েই কুন্তী। মুখ থেকে তার কোন শব্দ বের হয় না।

মনোর মাই ডাকে, মা—

কেন মনোর মা—ক্লান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দেয় মানসী।

দেখ চেয়ে কে এসেছে—

কে রে?

ফিরে তাকাল মানসী।

এ কি, কে শুয়ে ঐ শয্যায়, মানসী—না তার কঙ্কাল। শুধুমাত্র হাড় কখানির উপর চামড়ার আবরণটা।

কালি-ঢালা কোটরাগত চোখ—

কে?—

মানসী—

কে—দিদিভাই—এসেছ দিদিভাই—সত্যি তুমি এসেছ!

চোখের জল রোধ করতে পারে না কুন্তী। সযতনে মাথাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে বলে, আমাকে আগে জানাস নি কেন মানসী—

আগে জানালেই কি তুমি আমাকে আমার দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করতে পারতে?

মানসী—

কাঁদছ কেন দিদিভাই—এ যে আমার পাপের ফল—

পাপের ফল—

তা বৈ কি, কিন্তু সেদিন—সেদিন কেন তুমি আমায় বল নি যে ওকে তুমি ভালবাসতে—

মানসী—চাপা কণ্ঠে যেন চীৎকার করে ওঠে—

হ্যাঁ দিদিভাই—কেন ঐ কথাটা আমায় জানতে দাও নি—তবে ত এমনি করে তিনটে জীবন নষ্ট হয়ে যেত না।

কে—কে তোকে ঐ কথা বলেছে—ঐ শিশিরাংশু নিশ্চয়ই—

আর কে বলবে বল?

কিন্তু তুই বিশ্বাস কর বোন—ও একেবারে মিথ্যা, অতবড় মিথ্যা আর হতে পারে না—ওর সমস্ত মিথ্যার মত ওটাও একটা মিথ্যা—

দিদিভাই—

হ্যাঁ, তোর কাছে আজ আর কিছু গোপন করব না—তুই যেমন একদিন ওকে দেখে ভুলেছিলি—আমিও

ঠিক তেমনি ভুলেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস কর সে ভুল ভাঙ্গতে আমার বেশী দেরি হয় নি আর তাইতেই সেদিন তোকে আমি ফেরাবার চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু তুই বুঝলি না—

কিন্তু—

আজ বুঝতে পারছি তোকে সেদিন সব কথা আমার স্পষ্ট করে বলাই উচিত ছিল—তবে হয়ত আজকের এই সর্বনাশটাকে তুই-আমি দুজনেই এড়াতে পারতাম, কিন্তু এভাবে তোকে আমি মরতে দেব না—কিছুতেই না—আমি এখুনি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসছি। যাবার জন্য বোধহয় উঠে দাঁড়ায় কুন্তী।

কিন্তু তার যাওয়া হল না, হঠাৎ ঐ সময় একটা কাশি উঠল মানসীর।

কাশতে কাশতে গলা দিয়ে থকথকে রক্ত খানিকটা বের হয়ে এল—

দিদিভাই, সময় আমার ফুরিয়েছে—মিথ্যে আর তুমি ছুটোছুটি কেন করবে—ক্লান্ত কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে মানসী, তার চাইতে আমার পাশে তুমি বস—কত দিন তোমায় দেখি না—

আসছি—আমি এখুনি আসছি ভাই—ঝড়ের মতই যেন ছুটে বের হয়ে গেল কুন্তী।

ট্যাক্সিটা ছাড়ে নি কুন্তী—দাঁড়িয়েই ছিল—সেই ট্যাক্সিতে চেপেই গিয়ে একটা ডাক্তারখানা থেকে ডাঃ মুখার্জীকে ফোন করল।

কে?

ডাঃ মুখার্জী, আমি কুন্তী—ডাঃ চৌধুরীর মেয়ে—

কুন্তী—কোথা থেকে বলছ?

বেলগাছিয়ার এক ডাক্তারখানা থেকে—আপনাকে, কাকা, একবার এখুনি আসতে হবে—

কোথায়?

ঠিকানাটা বলে দিল কুন্তী।

ঠিক আছে—ডাঃ মুখার্জী বললেন, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসছি—

ডাঃ মুখার্জী এসে পরীক্ষা করে মানসীকে—কুন্তীকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

আমি সত্যিই দুঃখিত মা—

মুখার্জী কাকা—

দুটো লাংসয়ের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই মা—একেবারে ঝাঁঝরা—ক্যাভিটিতে একেবারে ভর্তি—it is too late মা—too late—

কোন আশাই কি নেই—

না মা—কোন আশাই নেই—অথচ এ রোগে আজ কি কেউ আর মরে—স্পষ্ট বুঝতে পারছি কোন তেমন চিকিৎসাই ওর হয় নি—most neglected case। কিন্তু এমনটা কি করে হল সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না—

ডাঃ মুখার্জী অতঃপর সামান্য কিছু Symptomatic চিকিৎসার ব্যবস্থা করে বার বার দুঃখ প্রকাশ করতে করতে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কুন্তী চুপ করে তারপরও কিছুক্ষণ বাইরের বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্ধকার আকাশের একটা ভগ্নাংশ বারান্দা থেকে চোখে পড়ে।

কিছু তারাও দেখা যায়।

সামনের খোলা ছাদটার ওদিকে একটা নারকেল গাছ—তার সরু সরু দীর্ঘ পাতাগুলো যেন দুলে দুলে সিপ্ সিপ্ শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস মোচন করছে—

বাবা—মানসীর ভার তুমি একদিন আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলে কিন্তু পারি নি আমি আমার কর্তব্য পালন করতে।

মানসী চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, ওকে ধরে রাখতে পারলাম না।

দিদিভাই—

ক্ষীণ কণ্ঠে ডাক শোনা গেল। মানসী ডাকছে ওকে।

কুন্তী গিয়ে ঘরে ঢুকল।

ডাঃ মুখার্জী বলে গেলেন ত কোন আশাই নেই—ম্লান বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে মানসী, আমি ত জানতামই—মিথ্যে তুমি দৌড়াদৌড়ি করলে। এস—ওই চেয়ারটায় এসে বস—

কুন্তী শয্যার উপর এসে বসতে উদ্যত হতেই বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি মানসী বলে, না, না—বিছানায় বস না তুমি—শুনেছি আমি একটু আগে, ডাঃ মুখার্জী কি বলছিলেন—তুমি ঐ চেয়ারটায় বস—

কুন্তী কিন্তু নিষেধ মানে না, ওরই পাশে শয্যায় বসে। ওর মাথায় হাতটা রাখে।

আমাকে সত্যি কথাটা বল মানসী—ও কি তোর আজ পর্যন্ত কোন চিকিৎসাই করে নি?

করবে না কেন, করেছে ত—মধ্যে মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এনে দিয়েছে—কিন্তু যার সারবার নয়—তার কি কোন ওষুধে কোন কাজ হয়, তুমিই বল?

কোন বড় ডাক্তারকে ডাকে নি?

কি করবে বড় ডাক্তার—

তোর নামে মাসোহারা আসে না?

হ্যাঁ—আসে ত।

আর তোর ব্যাঙ্কের টাকা?

সে ত কবে শেষ হয়ে গিয়েছে—কি একটা বড় রিসার্চ করছে তাতেই সব গেছে—ও কি বলে জান দিদিভাই—রিসার্চটা সাকসেসফুল হলে সেটা হবে যুগান্তকারী—সারা পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে—

তা হলে সেই রিসার্চ নিয়েই সে ব্যস্ত?

হ্যাঁ—মনোর মাও বোঝে না, দিন-রাত খিট্ খিট্ করে।

কোথায় সে রিসার্চ করে, জানিস কিছু?

শুনেছি টালিগঞ্জে কোথায়—

ঠিকানাটা জানিস না?

ফোন নাম্বারটা জানি—বলে রেখেছিল খুব প্রয়োজন হলে ডাকতে—

ফোন নাম্বারটা বলে দেয় মানসী।

কুন্তী আবার শুধায়, লক্ষ্ণৌ থেকে কবে চলে এলি?

তা বছর দুয়েক হবে—ও থাকত কলকাতায় রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত আর আমি একা একা লক্ষ্ণৌতে নিত্য রোগে ভুগি—তাই ত নিয়ে এল আমায়—

কত দিন তোর এমনি অসুখ!

তা বছর তিনেক ত হবেই—তারপরই একটু কেবল ক্লান্ত কণ্ঠে টেনে টেনে ডাকে, দিদিভাই—

কি রে—

এখন—মানে বলছিলাম ছয় বছরের ত হল, না?

সীতা ত—হ্যাঁ—

সীতা বুঝি নাম রেখেছ?

হ্যাঁ—

বেশ নাম—জনমদুঃখিনী সীতা—

নিয়ে আসব—তাকে দেখবি?

ইচ্ছা করে, খুব ইচ্ছা করে কিন্তু—না থাক, এ যা ছোঁয়াচে রোগ—তা ছাড়া আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে—যেখানে আছে সেখানে সে আমি জানি সুখেই আছে—

মানু—

দিদিভাই—আমি এখুনি যাব আর আসব—ট্যাক্সি আমার দাঁড় করানই আছে—

কিন্তু দিদিভাই—

কিছু হবে না—আমি নিয়ে আসছি তাকে—তাছাড়া কটা ওষুধও আনতে হবে—

কুন্তী তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেল—এবং মনোর মাকে বলে গেল সামনে থাকতে।—

॥ ১৯ ॥

হোটেলের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিল সীতা।

সীতা—সীতা—মেয়েকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকে কুন্তী।

কুন্তীর ডাকে ঘুম ঘুম চোখে তাকায় সীতা, মা মণি—

চল—এখুনি এক জায়গায় আমরা যাব?

কোথায় মা মণি?

সে একজনের কাছে—সে জান তোমাকে খুব ভালবাসে! মেয়েকে জামা পরাতে পরাতে কুন্তী বলে।

কে—মা মণি সে?

সে—সে—আমি যেমন—ঠিক তেমনি একজন—শোন, তাকে তুমি মা বলে ডাকবে, বুঝেছ?

মা বলে?

হ্যাঁ—

কেন মা মণি?

বাঃ, তার ত কেউ নেই—

কেউ নেই বুঝি?

না—তাই তুমি তাকে মা বলে ডাকলে তার কত আনন্দ হবে বল ত! ডাকবে ত?

ডাকব—

লক্ষ্মী মেয়ে তুমি আমার—

কুন্তী যখন সীতাকে নিয়ে মানসীর বাসায় পৌছাল মানসীর অবস্থা তখন হঠাৎ আরো খারাপ হয়ে পড়েছে—আরো বার দুই ইতিমধ্যে রক্ত বমন করে কাশতে কাশতে।

জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে—চোখ মেলতে পারছে না পর্যন্ত।

ডাঃ মুখার্জীর প্রেসক্রিপশন মত ওষুধগুলো কিনেই এনেছিল সঙ্গে করে পথের মাঝে গাড়ি থামিয়ে কুন্তী।

ঘরে ঢুকে কুন্তী ডাকে, মানু—

কে—দিদিভাই—চোখ মেলে তাকায় মানসী।

তাড়াতাড়ি এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দেয় কুন্তী মানসীকে।

কেন মিথ্যে আর ওষুধ খাওয়াচ্ছ দিদিভাই—বলতে বলতে এতক্ষণে সীতার দিকে বুঝি কুন্তীর পাশে দাঁড়ান—মানসীর নজর পড়ে।

কে—কে—দিদিভাই—

ওই ত সীতা ?

সীতা—কিন্তু চোখের দৃষ্টি আমার ঝাপসা হয়ে আসছে যে—

কুন্তী বলে সীতাকে, সীতা যাও সামনে—

সীতা আরো সামনে যায় মানসীর।

না, না—মানসী বলে, আর কাছে এস না—সীতা—

বলুন মা ?

মা—মা—সীতা—

মা—

না মা—আমি ত তোমার মা নই—আ—আমি তো—তো—মার কেউ নই—কে—উ—ন—ই—সু—সু—খে থা—শেষ হয় না কথাটা—জড়িয়ে যায়, আবার একটা কাশি তারপরই খানিকটা রক্ত—

মাথাটা টলে পড়ে বালিশের উপর।

চীৎকার করে উঠে কুন্তী—মানসী—

সীতা ডাকে, মা—

সীতাকে বুকের 'পরে টেনে নিয়ে কেঁদে ওঠে কুন্তী, ও আর সাড়া দেবে না সীতা—ও আর সাড়া দেবে না—

পাড়ার লোকদের সাহায্যেই কুন্তী শেষ ব্যবস্থা করে মানসীর এবং বেলা নয়টা নাগাদ ক্রিমেটোরিয়াম থেকে ফিরে আসে সব শেষ করে হোটেলে।

শিশিরাংশুকে খবর দেয় নি কুন্তী।

খবর ত আর নয়—শেষ বারের মত দেখা করে একটা শেষ বোঝাপড়া শুধু।

শেষ বোঝাপড়া !

বুকের মধ্যে আক্রোশের একটা অগ্নি-দহন চলেছে যেন।

শিশিরাংশু, আমি তোমায় নিষ্কৃতি দেব না। আমি এত সহজে তোমায় ছেড়ে দেব না—তুমি শুধু মানসীকেই

হত্যা কর নি—আমাদের সুখের সংসারে তুমি আগুন ধরিয়ে দিয়েছ।

মানসীকে তুমি হত্যা করেছ—সেজন্য আদালতে যাব না আমি—বিচার আমিই করব তোমার-বিচার—

ফোন গাইড দেখে ফোন নাম্বারটা মিলিয়ে শিশিরাংশুর টালিগঞ্জের ঠিকানাটা খুঁজে বের করতে খুব একটা কষ্ট হয় নি কুন্তীর।

সে ঠিক খুঁজে বের করে, মূর এ্যভিনু—

তার পর রাত আটটা নাগাদ হোটেল থেকে বের হয়ে মূর এ্যভিনুর নির্দিষ্ট ঠিকানায় এসে পৌঁছাল। জায়গাটা নতুন ডেভালাপ হয়েছে—রাস্তাটা এখনও পাকা হয় নি। নতুন নতুন সব বাড়ী, বেশ ফাঁকায় ফাঁকায় বাড়ীগুলো খরস্পর থেকে।

একটা দোতলা বাড়ীর সামনে নম্বর মিলিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামল কুন্তী।

উপর থেকে সেতারের আওয়াজ আসছে না—

কড়া নাড়তে হল না বা বেল টিপতে হল না—দরজার সামনেই একজন হিন্দুস্থানী দরোয়ান বসেছিল। মেয়ে মানুষ দেখে এবং বাবুর আত্মীয় শুনে পথ ছেড়ে দেয়।

সেতারের আওয়াজ শোনা যায়।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে কুন্তী।

সামনেই একটা বড় ঘর দোতলায়—খোলা দরজা-পথে আলোর আভাস ও সেতারের আলাপ শোনা যায়।

সোজা গিয়ে কুন্তী ঘরে ঢুকল।

একটা সোফায় বসে শিশিরাংশু—পরণে পায়জামা ও পাঞ্জাবী—হাতে সুরার পাত্র আর সামনে এক সুন্দরী তরুণী বসে সেতার বাজাচ্ছে—

শিশিরাংশু—

কুন্তীর ডাকে চমকে মুখ তুলে তাকাল শিশিরাংশু, কে—

চিনতে পারছ না বোধ হয়?

তরুণীর হাতের সেতার তখন থেমে গিয়েছে—সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে সেতারটা রেখে।

আরে—what a surprise—কুন্তী চৌধুরী না?

হ্যাঁ—কুন্তী চৌধুরী।

শান্ত গলায় জবাব দেয় কুন্তী।

সুস্বাগতম—সুস্বাগতম—welcome—দেবী—welcome—দাঁড়িয়ে কেন—এস—বস—স্বপ্না—if you don't mind—একটু পাশের ঘরে যাও—

তরুণীকে লক্ষ্য করে বলে শিশিরাংশু। স্বপ্না ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

শিশিরাংশু—আমি তোমার কাছ থেকে তোমার জবাবটা জানতে এসেছি—এবারে বলে কুন্তী।

জবাব! প্রশ্নটা করে নেশারক্তিম চোখে তাকাল শিশিরাংশু কুন্তীর দিকে।

হ্যাঁ—

কিসের জবাব বল ত কুন্তী দেবী—গলার স্বরটা যেন একটু জড়ানো শিশিরাংশুর।

মানসীকে তুমি—

আজ আবার মানসী কেন সখী। She is dead—dead to me—সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে শিশিরাংশু।

তা কি আর আমি জানি না—তাকে মেরে তারই পয়সায়—কোথায় মানসী বল?

মানসী!

হ্যাঁ—হ্যাঁ মানসী—কোথায় সে বল?

কেন তুমি জান না? তুমিত তোর বাচ্চাটাকে নিয়ে আসলে আর সে দিবারাত্র মেয়েটার কথা ভেবে ভেবে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল—

তাই বুঝি!

হ্যাঁ—তারপর একদিন মরে গেল। কেন আমি ত তোমায় চিঠি দিয়েছিলাম, পাও নি?

পেয়েছি বৈ কি?

পেয়েছ?

হ্যাঁ—সেই চিঠি পেয়েই ত এসেছি—

চিঠি পেয়ে এসেছ—কেমন যেন হঠাৎ থমকে যায় শিশিরাংশু। চেয়ে থাকে কুন্তীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ—তবে তোমার নয় মানসীর—কুন্তী কথাটা শেষ করে।

মানসীর চিঠি—সে তোমায় চিঠি লিখেছিল বুঝি?—

হ্যাঁ—আর তার মৃত্যুর কারণ যে তুমি—শেষ মুহূর্তে সেই জবানবন্দী সে দিয়ে গিয়েছে—লিখিত জবানবন্দী—

আর কিছু সে দিয়ে যায় নি?

দিয়ে গিয়েছে বৈ কি—এবং এখান থেকে সোজা থানায় গিয়ে যখন সে জবানবন্দী পেশ করে বলব—you—তুমি আমার বোন মানসীকে হত্যা করেছ—you have killed her—

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় শিশিরাংশু, এবং কুন্তীর দিকে এগুতে এগুতে বলে মানসীর কথা আজ যেতে দাও কুন্তী, if she is really dead, let her die—বিশ্বাস কর, তাকে আমি কোনদিন ভালবাসি নি—

থাম—

হ্যাঁ, বিশ্বাস কর, আমার সমস্ত মন জুড়ে চিরদিন তুমিই ছিলে, আজও আছ, I just played—played with her a nice little—কি বলব sentimental fool—তোমার ঐ মানসী, তাই যখন হাতের মুঠোর মধ্যে পেলাম, দুদিন একটু শুধু ভোগ করেছি, তার বেশী কিছু না—

তার বেশী কিছু নয়—না—তাই একটা নিরপরাধ মেয়ের জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে—

চিরকাল সব দেশে, সর্বত্র—তারাই ত victim হয়—তোমার মত একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে এতে অমন করে আশ্চর্য হচ্ছ কেন বল ত?—ও সব কথা যেতে দাও—আজ তুমি এতদিন পরে এসেছ আমার ঘরে সেইটাই একমাত্র কথা হোক—Let us celebrate that—অত দূরে দূরে দাঁড়িয়ে কেন—এস, পাশে এসে বস, কথাগুলো বলতে বলতে এগিয়ে যায় শিশিরাংশু কুন্তীর দিকে—

আর ঠিক সেই মুহূর্তে নিজের হঠকারিতার কথাটা মনে পড়ে এবং ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে ওঠে।

শিশিরাংশু সোজা এসে বেরুবার দরজাটার দিকে পিছন ফিরে ওর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়—চল—যা হয়ে গিয়েছে সে ত আর ফিরবে না—তুমিও কিছুটা ভুল করেছ, ঝোঁকের মাথায় আমি ত করেছিই—কিন্তু সে ত আমরা অনায়াসেই ভুলে যেতে পারি—এস—

কুন্তীর বুকের ভিতরটা তখন কাঁপতে সুরু করেছে—সে বেরুবার জন্য পা বাড়ায় দরজার দিকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা আড়াল করে শিশিরাংশু বলে ওঠে, সে কি এসেছ যখন—নিশ্চয়ই যাবার জন্য আস নি—

পথ ছাড় শিশিরাংশু—

তা কি হয় কুন্তী—আমার দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষার পর তুমি এলে—

শিশিরাংশু—

আর আমিই কি এ সুযোগ এমন করে হারাতে পারি—বলতে বলতে হাত বাড়ায় শিশিরাংশু ভীতত্রস্ত কুন্তীর দিকে।

কুন্তী পিছিয়ে যায় —আর সেই মুহূর্তে শিশিরাংশু ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

না, না—

ভয় কি—হাসে শিশিরাংশু, এস—অনেক তৃষ্ণা এই বুকের মধ্যে জমা হয়ে আছে—

কুন্তী যত পিছোয়—শিশিরাংশু তত এগিয়ে যায়।

শিশিরাংশু লাফিয়ে কুন্তীর হাতটা ধরে ফেলে—আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঝুঁকে পড়ে টেবিলের উপর থেকে Vat 69-এর বোতলটা তুলে নিয়ে শিশিরাংশুর মাথার উপরে সজোরে বসিয়ে দেয়—

অর্ধস্ফুট চিৎকার করে টলে পড়ে শিশিরাংশু।

মাথা কেটে একটা রক্তের ধারা সমস্ত মুখটাকে বীভৎস করে তোলে শিশিরাংশুর। সেই সঙ্গে একটা উন্মাদ আক্রোশে যেন মানুষটা হিংস্র একটা জন্তুতে পরিণত হয়।

বীভৎস সেই রক্ত মাখা মুখে কয়েকটা মুহূর্ত চেয়ে থাকে শিশিরাংশু, তারপরই এগিয়ে গিয়ে ঘরের ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা টেনে বের করে—

এগিয়ে আসছে শিশিরাংশু—পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে—ক্রমশঃ দুজনার মধ্যে ব্যবধানটা কমছে—

সোজা গুলি চালিয়ে দিল পর পর দুবার

কুন্তীর ঠিক মনে নেই—কুন্তী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উন্মাদিনীর মতই - শেষ প্রতিরোধে শিশিরাংশুর উপরে এবং জাপটে ধরেছিল দুহাতে তাকে।

তারপর একটা ধস্তাধস্তি—পিস্তল-সমেত শিশিরাংশুর হাতটা কামড়ে ধরেছিল কুন্তী—পিস্তলটা হাত থেকে মেঝেতে পড়ে যেতেই পাগলের মত ঝুঁকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে সোজা গুলী চালিয়েছিল পর পর দুবার—

ধোঁয়া বারুদের গন্ধ—একটা আর্ত চিৎকার—আর রক্ত—উঃ, সে কি রক্ত!

মাথাটার মধ্যে কেমন যেন ঘুরে উঠেছিল কুন্তীর।

সে টলে পড়ে যায়—

আর কিছু মনে নেই।

॥ ২০ ॥

বিচার হল কুন্তীর।

স্বপ্না সাক্ষী দিল—সে প্রত্যক্ষদর্শিনী—নিজের চোখে জানালা-পথে আনুপূর্বিক ঘটনাটা ঘটতে দেখেছে : পিস্তল দিয়ে হত্যা করেছে সে শিশিরাংশুকে সে রাত্রে।

কুন্তীও অস্বীকার করে নি।

হ্যাঁ, সে হত্যা করেছে শিশিরাংশুকে—তার একমাত্র বোন মানসীর অপমৃত্যুর প্রতিশোধ সে নাকি নিয়েছে—রক্তের বদলে সে রক্ত নিয়েছে—

সে বলেছে : হ্যাঁ—আমি হত্যা করেছি শিশিরাংশুকে—I killed him—দীর্ঘ দিন ধরে তাকে আমি হত্যার স্বপ্ন দেখেছি—আমার প্রতিহিংসাকে আমি তৃপ্ত করেছি—now I am satisfied—আপনাদের বিচারে যা দণ্ড আমায় দিতে চান দিন আমায়—

স্বর্ণেন্দুকে সে ডেকে পাঠিয়েছিল মাত্র একদিন।

পুলিশের হাতে ধরা দেবার পর তাকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হল। তার আগে স্বর্ণেন্দু কিছুই জানতে পারে নি—

হাজতে ডেকে পাঠিয়েছে কুন্তী স্বর্ণেন্দুকে, সংবাদটা পুলিশের মারফৎ পেয়ে মাথামুণ্ডু প্রথমটায় সে কিছুই বুঝতে পারে নি।

হাজত থেকে কুন্তী তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

স্বল্প পরিসর—নোংরা—একটা ঘরের মধ্যে বন্দিনী—প্রহরা নিযুক্ত ছিল কুন্তী!

যে পুলিশ অফিসারটি স্বর্ণেন্দুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল—প্রহরীকে দরজা খুলে দিতে বলে তিনি স্বর্ণেন্দুকে ভিতরে যাবার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

দিনের বেলাতেও টিমটিমে একটা ইলেকট্রিক আলোয় স্বল্পালোকিত ঘরটি।

একটা চৌকির উপর স্তব্ধ হয়ে হাজত ঘরের মধ্যে বসে ছিল কুন্তী।

স্বর্ণেন্দুর পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল।

স্বর্ণেন্দু থমকে দাঁড়ায় কুন্তীর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই—মাথার চুল বিস্রস্ত—সমস্ত মুখে একটা অসহ্য ক্লান্তির ছোপ

এক রাত্রেই যেন অনেক বছর বয়স পার হয়ে এসেছে কুন্তী।

এস স্বর্ণেন্দু—মৃদু কণ্ঠে কুন্তীই আহ্বান জানায়।

স্বর্ণেন্দু বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কোন কথা নেই তার মুখে।

কুন্তী আবার বলে, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি একটা গুরুদায়িত্ব তোমার কাঁধে তুলে দেব বলে—সীতা হোটেলে কাল রাত থেকে একা আছে—কান্নাকাটি সে করবে না—তাকে তুমি তোমার কাছে আপাতত নিয়ে যেও—তারপর যেমন ভাল বোঝ তার একটা ব্যবস্থা করে দিও—

কুন্তী—অনেকক্ষণ পর মৃদু কণ্ঠে ডাকে স্বর্ণেন্দু।

বল।

আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না কুন্তী—

জান স্বর্ণেন্দু—মানসী মারা গিয়েছে—

মারা গিয়েছে?

হ্যাঁ—পরশু গিয়েছিলাম রাত্রেই তোমার কাছ থেকে ঠিকানা পেয়েই তাকে দেখতে পরশু রাত্রেই কয়েকবার পর পর blood vomit করে সে মারা গেল।

ওঃ—

মানসীর সেই মৃত্যুর— কুন্তী আবার বলে, সেই হত্যার প্রতিশোধ আমি নিয়েছি—

কি—কী করেছ তুমি—

শিশিরাংশুকে আমি হত্যা করেছি—

কুন্তী—অর্ধস্ফুট একটা আর্তনাদ যেন মনে হয় স্বর্ণেন্দুর কণ্ঠে ঐ ডাকটা।

হ্যাঁ স্বর্ণেন্দু—তোমাদের বিচার ত আমি জানি তাই নিজের হাতেই বিচারের ভার নিয়েছিলাম—আর আমার কোন দুঃখ নেই, চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, লজ্জাও নেই—

সত্যি—সত্যিই তুমি—কথাটা শেষ করতে পারে না স্বর্ণেন্দু—

সত্যিই—তারপরই আবার বলে, মানসীর আত্মা নিশ্চয়ই তৃপ্ত হবে—আমি জানি, তুমি আমার সীতাকে কিন্তু দেখ—আর একটা কথা—

বল—

আজ নয়—সীতা যেদিন বুঝতে শিখবে—বড় হবে, সেদিন—

কি—

সেদিন তাকে ব'লো তার মায়ের হত্যার প্রতিশোধ একজন নিয়েছে—

কিন্তু এ তুমি কেন করলে কুন্তী—

কেন করলাম—তুমি ত বুঝতে পারবে না স্বর্ণেন্দু, মেয়েমানুষের দুঃখটা মেয়েমানুষ ছাড়া ত কেউ বুঝতে পারে না। কত বড় আঘাতে মায়ের জাত হিংস্র হয়ে ওঠে—মানুষের বুকে গুলী চালায়—সে তুমি বুঝবে না—

বুঝি বা না বুঝি—তোমাকে এমনি ভাবে আমি শেষ হয়ে যেতে দেব না—

কি করবে—বড় বড় উকিল-ব্যারিষ্টার দিয়ে আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে—কিন্তু তাতে করে সীতার চোখে কি আমাকে তোমরা কেউ কলঙ্কমুক্ত করতে পারবে? তার ঘৃণা থেকে কি আমাকে তোমরা কেউ রক্ষা করতে পারবে?

ও সব আমি কিছু জানি না—কিন্তু এ হতে পারে না—হতে আমি দেব না—

কিন্তু স্বর্ণেন্দুর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

কুন্তী যেমন হাজার অনুরোধেও তার সঙ্গে আর দেখা করে না তেমনি ধরা পড়ার পর প্রথম সে হত্যাপরাধকে স্বীকৃতি দিয়ে যে জবানবন্দী পুলিশের কাছে দিয়েছিল সে জবানবন্দীও আর প্রত্যাহার করে না।

সেই একই কথাঃ সে হত্যা করেছে—সম্পূর্ণ জ্ঞানে এবং ইচ্ছা করে শিশিরাংশুকে—সে হত্যাকারিণী—

শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ পনের বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হল।

জজ জুরীদের সঙ্গে এক মত হয়ে ঐ দণ্ড দিলেন কুন্তী চৌধুরীকে—

সেদিনও স্বর্ণেন্দু চেষ্টা করেছিল শেষবারের মত একবার কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু কুন্তী দেখা করে নি।

প্রথমে কিছুদিন কুন্তী সেণ্ট্রাল জেলে ছিল—সেখান থেকে তাকে পাঠান হল বহরমপুর জেলে।···

॥ ২১ ॥

তারপর দেখতে দেখতে দিনের পর দিন, সপ্তাহ, মাস—বছর কেটে গিয়েছে—

কুন্তী কারো কোন সংবাদ নেয় নি, কাউকে কোন সংবাদ দেয় নি—সে যেন নিজেকে একেবারে মুছে দিয়েছিল পৃথিবী থেকে।

চিঠি এসেছে স্বর্ণেন্দুর কোন দিন সে চিঠিগুলোর একটিও খুলে পড়ে নি সে।

একটার পর একটা চিঠি জমা হয়েছে কেবল।···

দেহ ভেঙ্গেছে—কপালে গালে বয়েসের চিহ্ন, বলি-রেখা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়েছে—মাথার চুল সব পেকে গিয়েছে।···সে আর একটি মেয়ের ইতিহাস, আর একটি মেয়ের জীবন-কাহিনী।

কুন্তী নামটা পর্যন্ত তখন কারো আর বুঝি মনে নেই। জেলের খাতায় নতুন নাম—নতুন পরিচয়।

১৯ নং কয়েদী।

জানানা ফাটকের ১৯ নং কয়েদী—

জেল কর্তৃপক্ষের কোন দুশ্চিন্তাই ছিল না কুন্তী সম্পর্কে। কথা বলে না কারো সঙ্গে—কোন নালিশ নেই—অভিযোগ নেই—কোন নিয়মভঙ্গ নেই—বিদ্রোহ নেই।

তাই তাদের নিয়মকানুনও ১৯ নং কয়েদীর প্রতি কিছুটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

বছর সাতেক পরে—কুন্তী আবার কথা বলল।

মিঠুয়া এল কুন্তীর জীবনে।

বছর পনেরর একটি মেয়ে—

ঐ বয়েসেই সে নাকি তার স্বামীকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছে—

কুন্তী ত অবাক হয়ে গিয়েছিল কথাটা শুনে।

অমন সুন্দর ফুলের মত একটি মেয়ে—অমন সুন্দর হাসিটি সে কাউকে বিষ দিতে পারে নাকি—মিথ্যা—হতে পারে না—

আর আশ্চর্য মেয়েটি—হয় হাসে না হয় গান গায়—

গান গায় সে, পরিচিত সব গান।

সেই প্রথমে শুধায় কুন্তীকে, তুমি কথা বল না কেন?

কুন্তী চেয়ে থাকে মিঠুয়ার মুখের দিকে।

গলায় বুঝি তোমার ব্যথা ?

কুন্তী মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ ?

আহা—আমার মার মত বুঝি গলায় তোমার ক্যানসার হয়েছে ? খুব ব্যথা করে ?

কুন্তী আবার মাথা নাড়ে—

মিঠুয়া আর কিছু বলে না—গেয়ে ওঠে ঃ

ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে
চল তোমার বিজন মন্দিরে ॥
জানি নে পথ, নাই যে আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো,
তোমার চরণশব্দ বরণ করেছি
আজ এই অরণ্য গভীরে ॥

কুন্তী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে—

মিঠুয়া গান গাইতে গাইতে কাজ করে—জেলের কাজ।

সেদিন গভীর রাত্রে বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি নেমেছে—চুপ চাপ নিজের সেলের মধ্যে কুন্তী বসেছিল—পাশের সেলেই মিঠুয়া থাকে—হঠাৎ তার গান শোনা যায় ঃ

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কখন্ তুমি এলে হে নাথ, মৃদু চরণপাতে।
ভেবেছিলাম জীবন স্বামী, তোমায় বুঝি হারাই আমি—
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে ॥

গুনগুন করে গাইছে মিঠুয়া পাশের সেলে কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে টিপ টিপ বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে প্রতিটি গানের কথা স্পষ্ট শোনা যায়—

মিঠুয়া গাইছে ঃ

যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলাম আলো
তারি মাঝে তুমি তোমার ধ্রুব তারা জ্বালো।

সারাটা রাত ধরে সেদিন গান গেয়েছিল মিঠুয়া। একটার পর একটা গান।

তার পর দিনই শুধায় কুন্তী, এখানে এলে কেন ?

বাঃ, আসব না, হাসতে হাসতে মিঠুয়া বলে, আমি যে আমার স্বামীকে বিষ দিয়ে মেরেছি—

না, না—

সত্যি—ওরা সবাই বললে—

কে, কে বললে ?

কেন আমার শাশুড়ী, আমার দেওর—ননদ—সবাই—সবাই বললে দুধের সঙ্গে নাকি বিষ দিয়ে তাকে আমি মেরেছি—

সত্যি—সত্যি তুমি মেরেছ ?

মিঠুয়া হঠাৎ যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়, বলে, কে জানে—হয়ত মেরেছি, না হলে আমার হাতের দুধ খেয়েই সেই যে সে শুলো আর উঠল না, আর ঘুম ভাঙ্গল না। কিছুতেই যখন ডেকে ডেকে উঠল না, ডাক্তার এল, বললে পরীক্ষা করে মারা গেছে, আর—আর—

বিষের ক্রিয়ায় নাকি তার মৃত্যু ঘটেছে, পুলিশে ওরা খবর দিল জান।

তারপর?

পুলিশ এল, ওকে নিয়ে গেল—তারপর পরীক্ষা করে নাকি সত্যি সত্যি বিষ পেল—কিন্তু এটা ওরা বিশ্বাস করল না—বিকাশ আমাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল—আর আমিও যে তাকে ভালবাসতাম—

বিকাশ বুঝি তোমার স্বামীর নাম?

হ্যাঁ, বাবার ছাত্র ছিল সে, বাবাও আমার স্কুল মাস্টার, মা কবে ছোটবেলা আমার মারা গেছিল বাবার কাছেই মানুষ আমি। ঐ বিকাশ আসত বাবার কাছে পড়তে, মস্ত বড় লোকের ছেলে, ও আমায় বিয়ে করতে চাইল, একদিন আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

তোমার বাবা চেষ্টা করেন নি তোমাকে বাঁচাতে?

বাবা, হ্যাঁ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তার টাকা কোথায় অত, হেরে গেলেন—আমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল, সেই খবর পেয়ে বাবা যে বিছানায় শুলেন আর উঠলেন না—

সেই থেকেই মেয়েটা যেন কাছে এসে দাঁড়াল কুন্তীর।

ভেবেছিল আর নতুন করে নিজেকে জড়াবে না কিন্তু মিঠুয়া তাকে জড়াল।—কঠিন বাঁধনে বাঁধল।

তারপর হঠাৎ একদিন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এল—

দেশ স্বাধীন হল।

অনেক কয়েদী ছাড়া গেল।

মুক্তির পরোয়ানা এল কুন্তীরও অনেকের সঙ্গে। কিন্তু মিঠুয়ার এল না, তার মাত্র তিন বৎসর হয়েছিল।

কাল চলে যাবে কুন্তী ভোরে।

মিঠুয়াটা আজ আর একবারও আসে নি ওর কাছে।

ডাকলেও সাড়া দেয় নি, কথা বলে নি।

অথচ আশ্চর্য! সারাটা দিন কাজ করে আর গুনগুন করে গান গায়। আজ কিন্তু মেয়েটার গলার শব্দ পর্যন্ত শোনা যায় নি একটি বার।

দিনের বেলা ওকে ধরবার চেষ্টা করেছে কুন্তী কিন্তু ও ধরা দেয় নি—কুন্তীর কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

মনে মনে তাই ভেবেছে কুন্তী, ধরা দিল না, নাই দিক।

আবার মায়ায় বাঁধন কেন, কেন মিথ্যে জড়ানো নিজেকে আবার—

একবার জড়িয়ে পড়েছিল, সেই বাঁধনের দাগই আজ পর্যন্ত মিলাল না।

বুকের নিভৃতে এখনো রক্তক্ষরণ করছে।

বাইরে যতই সে ভুলে থাকবার চেষ্টা করুক না কেন—একটি মুহূর্তের জন্যও কি এই কয় বছরে ভুলতে পেরেছে তাকে।

চোখ বুজলেই যে মনের পাতায় মুখটা ভেসে ওঠে।

সীতা—তার সীতা—

কত বড়টি আজ হয়েছে।

কত বয়স হল আজ সীতার, মনে মনে হিসাব করে কুন্তী, এক, দুই, তিন বছর করে হিসাব করে—

ঠিক ষোল বছরের হয়েছে সীতা এখন।

কেমন দেখতে হয়েছে।

তার মার মত কি ?

মানসীর মতই ত দেখতে ছিল সীতা—কেবল গায়ের রঙটা পেয়েছিল ফর্সা।

সীতার কি আজও তার কথা মনে আছে—

পাগল—মনে থাকে না কি কারো।

কতটুকুই বা বয়স তখন তার, নেহাৎ বালিকা, হয়ত সব মন থেকে ধুয়ে-মুছে গিয়েছে।

সামান্য ঝাপসা স্মৃতিও হয়ত মনের কোথায়ও আজ আর অবশিষ্ট নেই তার।

আর থাকবেই বা কেন—

কে সে সীতার।

কেউ ত নয়। পর—নেহাৎই পর—

তাছাড়া সে কি স্বর্ণেন্দুকে বার বার করে অনুরোধ করে নি—ও যেন ভুলে যায় আমাকে—

তবে—তবে আজ এ কান্না কেন ?

সীতা তার কে—কেউ ত নয়—

বরং সীতাই তার জীবনটাকে মরুভূমি করে দিয়েছে—শুধু তার—মানসীরও নয় কি !

না, না—এ কি ভাবছে সে—

হঠাৎ চমকে ওঠে কুন্তী—

পাশের সেলে মিঠুয়া গান গাইছে—

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।

কান্নাহাসির দিনগুলি—

সত্যিই ত—রইল ত না। মনের সোনার খাঁচা ত শূন্য—কোন কিছুই ত নেই সেখানে—

কান্নাহাসির বাঁধন তারা সইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ॥

না—সত্যিই সে বেঁধে রাখতে পারে নি কাউকে—

সবাই চলে গিয়েছে জীবনের খোলা দ্বারপথ দিয়ে একে একে—

মা—বাবা—মানসী—সর্বশেষে সীতা—

সবাই চলে গিয়েছে একে একে।

এমন কি স্বর্ণেন্দু—তাকেও সে ধরে রাখতে পারে নি।

শিথিল মুঠি ছাড়িয়ে স্বর্ণেন্দুও চলে গেল একদিন।

অন্ধকার এক যবনিকা তার সমস্ত অতীতকে এক ভয়াবহ শূন্যতায় যেন গ্রাস করে রেখেছে।

মিঠুয়া তখন গাইছে ঃ

আমার প্রাণের গানের ভাষা
শিখবে তারা ছিল আশা—
উড়ে গেল, সকল কথা কইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।

কিন্তু তাই কি সে চেয়েছিল। তা ত সে চায় নি—

সে ত ভালবাসতে চেয়েছিল—ভালবাসা পেতে চেয়েছিল—শূন্য হাত ভরে নিতে চেয়েছিল—কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল—

তার কথা কেউ বুঝল না।

কেন বুঝল না।

কার দোষ—কার ?

তার—মানসীর, না শিশিরাংশুর।

শিশিরাংশু।

না—তার প্রতিও আজ আর তার কোন অভিমান নেই।

কারাবাসের এই কয়বৎসরে তিলে তিলে কখন যেন সমস্ত অভিযোগ—সমস্ত অভিমান তার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

কারও উপরে আজ আর তার কোন অভিমান, কোন বিদ্বেষ নেই।

কারও কাছে কোন নালিশ নেই।

শিশিরাংশুর আত্মা—পরলোক বলে যদি কিছু থাকে ত সেখানে শান্তি পাক।

সে তার নিজের ছক-কাটা ভাগ্যের পথ ধরে এগিয়ে এসেছে—কেউ ত তার জন্য দায়ী নয়।

॥ ২২ ॥

আর স্বর্ণেন্দু—

জানতে পারে নি সেদিন কুন্তী স্বর্ণেন্দুর কথা।

চিঠির পর চিঠি দিয়েছে স্বর্ণেন্দু কুন্তীকে কিন্তু একখানা চিঠিরও জবাব দেয় নি কুন্তী।

প্রত্যাশায় প্রত্যাশায় দিনের পর দিন থেকেছে স্বর্ণেন্দু কিন্তু কুন্তীর কাছ থেকে চিঠির জবাব আসে নি।

আশ্চর্য।

কুন্তী কেমন করে তাকে ভুলে গেল।

এক একবার নিদারুণ অভিমান হয়েছে স্বর্ণেন্দুর—প্রতিজ্ঞা করেছে মনে মনে যে চিঠি লিখলেও জবাব দেয় না—লিখব না তাকে আর কোন চিঠি।

কিন্তু পারে নি শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে—

আবার চিঠি দিয়েছে।

কিন্তু জবাব আসে নি।

ছুটে গিয়েছে জেলখানায় দেখা করবে বলে কিন্তু—জেলার এসে জানিয়েছেন—sorry—তিনি দেখা করবেন না—

কি বললেন ?

বললেন—স্বর্ণেন্দু বলে কাউকে নাকি তিনি চেনেন না—

বলেছেন এ কথা !

হ্যাঁ—

আহা, বলেছিলেন যে সীতা এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে।

বলেছিলাম—

কি বললেন।

ঐ নামই নাকি কখনও তিনি শোনেন নি।

শেষে আর বছর তিনেক যায় নি স্বর্ণেন্দু জেলে দেখা করতে—দেখা করার চেষ্টা করতে।

সীতাও ত তখন বেশ বড়-সড় হয়েছে।

সীতাকে স্বর্ণেন্দু সাধ্যমত তার মানুষ করে তুলেছে—

কুন্তীর অনুরোধ সে রক্ষা করেছে।

চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছিল তার সীতাকে স্বীকৃতি দিতে—সামাজিক স্বীকৃতি—

তাই দিয়েছে স্বর্ণেন্দু।

পিতৃত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে।

সীতা জানে আজ স্বর্ণেন্দুই তার বাপ—সে স্বর্ণেন্দুরই একমাত্র মেয়ে—আর কুন্তী তার মা—বড় হওয়ার পর, ভাল করে জ্ঞান হবার পর সীতা কুন্তীর অয়েলপেনটিংটা দেখিয়ে যখন শুধিয়েছিল স্বর্ণেন্দুকে উনি কে বাবা, কার ছবি তোমার ঘরে—

ঐ ত তোমার মা—

মা ?

হ্যাঁ, তোমার মা—

মা মরে গিয়েছেন ?

না ত—

তবে ?

হারিয়ে গিয়েছেন তোমার মা।

হারিয়ে গিয়েছেন ?

হ্যাঁ—

তবে মাকে আমরা কেন খুঁজি না বাবা ?—

খুঁজেছি—অনেক খুঁজেছি কিন্তু পাই নি মা—তাকে খুঁজে আর পাই নি। কোথায় যে হারিয়ে গেলেন—

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দাও না কেন?

দিয়েছি বৈ-কি, তবু পাই নি।

আমি একদিন ঠিক দেখো মাকে খুঁজে বের করে আনব—

পারবি মা, পারবি?

পারব—নিশ্চয়ই পারব—

তাই আনিস মা—তাই আনিস। আমি পারলাম না, হেরে গিয়েছি—তুই তাকে খুঁজে আনিস—

আনব—

আরো বড় হয়ে কেন যেন সীতা আর সে কথা বলে না।

বোধ হয় ভুলে গিয়েছে—

কিম্বা সত্যি ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরেছে কোন মতে।

স্বর্ণেন্দু কিন্তু খোঁজ রেখেছিল বরাবর কুন্তীর।

কুন্তীর মুক্তি হবে তাও জানতে পেরেছিল। এবং মনে মনে স্থির করেছিল শেষ চেষ্টা একবার সে করবে।

তাই মুক্তির দিন সকাল সকালই সে গিয়ে হাজির হয় জেল-গেটের সামনে—

কিন্তু তখনো জানে না সে—জানতে পারে নি, আগের দিন সন্ধ্যাবেলাই কুন্তী—১৯ নং কয়েদী ছাড়া পেয়ে চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে?

হ্যাঁ—

কাল কখন?

তা বিকেল চারটে নাগাদ—অবিশ্যি আজই তার যাবার কথা কিন্তু বলে-কয়ে কালই সে চলে গিয়েছে—

কোথায় গিয়েছে কিছু জানেন!

না, তবে—

কি?

একটা চিঠি রেখে গিয়েছে—

চিঠি—

হ্যাঁ—স্বর্ণেন্দুবাবুর নামে—

আমারই নাম স্বর্ণেন্দু—কোথায়—কোথায় সে চিঠি—দিন—

জেলার ভদ্রলোক স্বর্ণেন্দুকে চিঠিটা বের করে দেন।

কুন্তীর চিঠি—

নীচে নাম সই করা কুন্তীই—

একটা চিঠি রেখে গিয়েছে

॥ ২৩ ॥

স্বর্ণেন্দু—

অনেক অপরাধ তোমার কাছে আমার এবং সব অপরাধই তুমি আমার ক্ষমা করেছ—আজকের এই শেষ অপরাধটাও ক্ষমা করবে জানি—

ক্ষমা কর।

পারলাম না—তোমার সামনে দাঁড়াতে পারলাম না—তাই চলে গেলাম।

তোমার প্রতিটি চিঠি পেয়েছি কিন্তু জবাব দিই নি—

তুমি ত জান—জবাব দেবার কিছু থাকলে নিশ্চয়ই আমি জবাব দিতাম।

কিছু ছিল না বলেই দিই নি—

জান স্বর্ণেন্দু—আজ আমার কি মনে হচ্ছে জান?—কার উপরে প্রতিহিংসা আমি নিলাম—কেনই বা নিলাম।

যাক—আজ আর সে কথা ভেবে লাভ কি—

এই চিঠির মধ্যে একটা চিঠি দিলাম—সীতা আমার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশন হবে—সব সে পাবে।

তুমি ব্যবস্থা করে দিও। সত্যি বড্ড দেখতে ইচ্ছা করছে একবার শেষ বারের মত তাকে—কিন্তু তার উপায় নেই। আর একটা কথা। আমার খোঁজ কর না আর লক্ষ্মীটি—

তোমার—চিরদিনের কুন্তী।

ক্লান্ত অবসন্ন ধুলোয় ভরা কাঁচা সড়ক ধরে কুন্তী তখনও হেঁটে চলেছে।

একা একা হেঁটে চলেছে।

পাছে স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা হয় এবং দেখা হলে যদি না এড়ান যায় তাকে তাই আগের রাত্রেই পালিয়ে এসেছে কুন্তী অনেক অনুনয়-বিনয় করে।

মিঠুয়ার গানটা কানে ভাসছে যেন এখনও :

এত বেদন হয় কি ফাঁকি
ওরা কি সব ছায়ার পাখি।
আকাশ-পরের কিছুই কি গো রইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি॥

বাড়ীতে এসে সংবাদটা পেল স্বর্ণেন্দু।
ছুটে আসে সীতা—বাবা—বাবা—জান—
কি?
মা—
মা?
হ্যাঁ—মা এসেছিলেন—
কোথায়?
এখানে!
কখন—কবে?
কাল রাত্রে—আমি তখন ঘুমাচ্ছি—
সত্যি—
হ্যাঁ বাবা, সত্যি—

সত্যিই এসেছিল কুন্তী।
ঘুমাচ্ছিল সীতা তার ঘরে—মনোর মা এসে তাকে ডেকে তে।
বুড়ী মনোর মা—
সীতা—ওঠ—ওঠ—শিগগির ওঠ—
কি হয়েছে মনোর মা—
দেখবি আয় হতভাগী কে এসেছে—
কে—কে মনোর মা—
দেখবি আয় না—

নীচের ঘরে দাঁড়িয়ে ছিল কুন্তী—
সর্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত—
চোখে মুখে চুলেও ধূলো।

মাথায় খদ্দরের শাড়ির ঘোমটা—

সীতা কিন্তু ঠিক চিনেছিল—দেখেই চিনেছিল—হুবহু বাবার ঘরের ছবির সঙ্গে যেন এক।

মা—

সীতা—

ছুটে গিয়েছিল সীতা—ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সীতার বুকে।

মা—মাগো; এতদিন কোথায় ছিলে মা? কেন আস নি এতদিন। আমি, বাবা—তোমাকে কত খুঁজেছি—কত ডেকেছি—

সীতা—

কেন মা—

আমাকে তুমি ডেকেছ—খুঁজেছ?

হ্যাঁ—কত! চল মা—উপরে চল—

এখন নয় মা—

কেন?

আমার একটু কাজ আছে—সেটা সেরে ভোর বেলা আসব—

মা—না, তুমি আর যাবে না—তুমি গেলে আর আসবে না—

আসব রে আসব—

ঠিক ত।

হ্যাঁ—

ফাঁকি দিচ্ছ না?

না রে, না—

কিন্তু বাবা এত বেলা হয়ে গেল, মা ত এখনো এল না—

স্বর্ণেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে সীতা বলে।

স্বর্ণেন্দু নিঃশব্দে ফটোটার দিকে চেয়ে থাকে—

কুন্তী যেন হাসছে।

কুন্তী হাসছে—

—)০(—

বিচিত্রার কথা

আমার প্রথম জীবনটা কেটেছিল অনেক গুণীজনের সংস্পর্শে। এঁদের ভিতর সবচেয়ে বেশি সান্নিধ্য পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের, ভগবান সুযোগও অনেক রকম ঘটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কাছাকাছি থাকবার ও কাছে যাবার। বহুদিন শান্তিনিকেতনে বাস করার সৌভাগ্য হয়েছে। যখন কলকাতায় থাকতাম, তখনও রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই কলকাতায় আসতেন। দেখাসাক্ষাতের কোন অসুবিধা ছিল না। তিনি স্বয়ং অনেকবারই আমাদের বাড়ী আসতেন, পায়ে হেঁটে বা ঠিকা গাড়ি চড়ে। জোড়াসাঁকোর বাড়ী আমাদের কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়ী থেকে বেশি দূরে ছিল না। আমরা নিজেরাও তাঁদের ওখানে যেতে কখনও কোন সঙ্কোচ বা অসুবিধা বোধ করতাম না। যদিও তখনকার দিনে মেয়েরা এখনকার মত স্বচ্ছন্দে রাস্তায় ঘাটে চলাফেরা করত না এবং ট্রামে বাসেও উঠত না, তবু ঠিকা ঘোড়ার গাড়ি চড়ে, প্রবাসী অফিসের কোন একটা দরোয়ান সঙ্গে নিয়ে আমরা প্রায়ই জোড়াসাঁকো চলে যেতাম। বাবার সঙ্গেও মাঝে মাঝে যেতাম।

রবীন্দ্রনাথের নিয়ম ছিল নতুন কোন লেখা সম্পূর্ণ হবামাত্র, তাঁর ধারে-কাছে যাঁরা থাকতেন তাঁদের পড়ে শোনান। এ সৌভাগ্যটা প্রথমে বেশির ভাগই শান্তিনিকেতনের অধিবাসীদেরই হত। তবে কলকাতার ভক্তরাও বঞ্চিত হতেন না। তিনি এখানে এলেই তাঁর নূতনতম লেখা শোনবার জন্য একটা আসর বসত। হাঁকডাক করে কিছু করা হত না, কারণ তা হলে ভীড়ের ঠেলায় দরজা জানলা ভাঙবার আশঙ্কটা সর্বদাই ছিল। কোন একজন অনুরক্ত ভক্তের বাড়ীতেই আসরটা বসত, তাঁরাই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতেন লোকজন ডাকার। আমাদের একটি রবীন্দ্রভক্তের দল গড়ে উঠেছিল কলকাতায়। আমরা সকলেই এই একসূত্রে বাঁধা ছিলাম। আমরা মুখে মুখে খবর পেয়ে ঠিক দিনে, ঠিক জায়গায় হাজির হতাম।

শ্রীসীতা দেবী

সর্বপ্রথম এরকম যে আসরের কথা আমার মনে পড়ে তা হচ্ছে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশদের বাড়ীতে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। রবীন্দ্রনাথ এই সময় "অচলায়তন" লিখেছিলেন। আমরা এ খবর শুনবামাত্র নাটকটি তাঁর মুখে শুনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ জুলাই মাসের গোড়াতেই কলকাতায় এলেন। ঠিক হল যে প্রশান্তচন্দ্রের পৈত্রিক বাসভবনে আসর বসবে এবং রবীন্দ্রনাথ নাটকটি পড়ে শোনাবেন এবং সবগুলি গানও গেয়ে শোনাবেন।

দিনটা রবিবার ছিল। যথাসময়ের অনেক আগে থেকেই জনসমাগম আরম্ভ হয়েছিল। যে ঘরে আসর বসল, তার তুলনায় লোক একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। লোক আসছে ত আসছেই। রবীন্দ্রনাথ পড়া আরম্ভ করলেন, কিন্তু কয়েকবারই নূতন শ্রোতা আসার জন্যে থেমে গিয়ে আবার গোড়ার থেকে আরম্ভ করতে হল তাঁকে। এ সবে তাঁর কোন বিরক্তি ছিল না। গানগুলিও সব গেয়ে শোনালেন, যদিও গলাটা একটু ভার থাকায় নীচু গলায়ই গাইলেন। পড়া শেষ হতেই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

আর একটা দিনের কথা মনে পড়ে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। রবীন্দ্রনাথ তখন জাপান যাত্রার আয়োজন করছেন। তারই আগে একদিন ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়ী ২৭শে কি ২৮শে এপ্রিলে কবিকে নিয়ে একটি গানের আসর বসল। গান অনেকগুলি হল, 'বলাকা'র কবিতাও কয়েকটি পড়া হল।

১৯১৭র মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ জাপান থেকে ফিরলেন। সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যেই

বোধ হয়, একদিন 'বিচিত্রা' ভবনে সকলকে ডাকা হল। আমরা এখন থেকেই এগুলিকে 'বিচিত্রা'র সম্মেলন বলতাম, যদিও ঐ নামে অনুষ্ঠান করে নামকরণ তখনও হয়েছিল কি না মনে নেই।

সেদিন প্রোগ্রাম যে বিশেষ কিছু ছিল তা নয়। গান অনেকগুলি হল, মেয়েরা অনেকগুলি গাইলেন, রবীন্দ্রনাথ নিজেও গোটা দুই গান করলেন। গল্পস্বল্প খানিক হল। ভোজনের আয়োজন প্রচুর ছিল, অতিথিরা তার যথা-যোগ্য সদ্ব্যবহার করলেন। দুজন নতুন মানুষ দেখলাম। একজন বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এঁকে চাক্ষুষ আগে দেখি নি বোধহয়। আর একজন রবীন্দ্রনাথের সেজদিদি, শরৎকুমারী দেবী। তাঁর তখন অনেক বয়স, তবু যেন রূপে ঘর আলো করে বসেছিলেন।

১৯১৭র সেপ্টেম্বর মাসে আবার 'বিচিত্রা'য় একটা আসর বসল Western music-এর। তার আগের দিন কবি আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। বললেন, "বিচিত্রায় বিকেলে Western music হবে, তোমরা যেও সব। পিয়ানো, ভায়োলিন্ ইত্যাদি আছে। আমাকে সবাই ধরেছে জর্মান গান গাইতে, অনেককাল ওসব ছেড়ে দিয়েছি, কি হবে জানি না। আমার ত সকাল থেকে মন খারাপ হয়ে আছে। যা হোক্, তোমরা যেও, গেলেই আমার exhibition দেখতে পাবে।"

পরদিন বিকেলে 'বিচিত্রা'র হলে পৌঁছে সেখানে নিজেদের দলের কাউকে না দেখে অন্দর মহলে গিয়ে ঢুকলাম। দোতলায় রবীন্দ্রনাথই খবর দিলেন, "এদিকে তোমাদের দলের দু চারজন আছেন।" অনেকক্ষণ বসে প্রতিমা দেবীদের সঙ্গে গল্পস্বল্প করে সভাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। প্রথমেই ইন্দিরা দেবী ও নলিনী দেবী একটা duet বাজালেন। তারপরও বেশ কয়েকটা বাজানা হল, গানও হল অনেকগুলি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাংলা, হিন্দী, ইংরাজি ও জর্মান সব রকম গানই গেয়ে শোনালেন। যদিও বলেছিলেন যে তাঁর মন খারাপ হয়ে আছে, তবু গাইলেন খুব ভালই। হিন্দী গানেই তাঁর গলা খুলল সবচেয়ে বেশি। একজন বাঙালী খ্রীষ্টান মহিলা গুটি দুই ইংরেজি গান গেয়ে শোনালেন। তাঁর নাম শ্রীমতী বীণা আঢ্য। বিলেত থেকে নানারকম গান গাওয়ার নতুন কায়দা শিখে এসেছিলেন তিনি।

এই সময় বিচিত্রায় উপরি উপরি দুবার "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনয় হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন আমরা দেখতে গেলাম। যথাসময়ের কিছু আগেই গিয়ে ত উপস্থিত হলাম। দর্শকরা অনেকেই এসেছেন, তবে তখনও সভা-গৃহে বসেন নি। আমরাও মেয়েদের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে তবে আসরে গেলাম। লোক হয়েছিল প্রচুর।

অভিনয় আশ্চর্য্য সুন্দর হয়েছিল। সাজ-সজ্জাগুলিও ছিল চমৎকার। কেদারের ভূমিকায় সুকুমার রায় মহাশয়ের বিকট মুখভঙ্গি এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। ভদ্রলোক এমনিতে অতি গম্ভীর ধরনের মানুষ ছিলেন, অথচ কমিক্ পার্ট আশ্চর্য রকম ভাল করতেন। বৈকুণ্ঠ সেজেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র-নাথ সেজেছিলেন তিনকড়ি। বইতে যা নেই এমন দুচার কথা মাঝে মাঝে ঢুকিয়ে দিয়ে অভিনেতারা পরস্পরকে ঠকাবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ঠকবার পাত্র কেউ ছিলেন না, সকলেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ এ অভিনয়ে যোগ দেন নি। ষ্টেজ্ ম্যানেজারের কাজ করছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে একদিন একটা প্রবন্ধ পড়লেন রবীন্দ্রনাথ, সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হল। বললেন, "ডাকঘর" অভিনয়ের সময় নিশ্চয় যেও। আমি ভাবলুম মুলুকে নেব, না ওরা দুটো পার্টই আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, আমাকে প্রহরী আর ঠাকুর্দ্দা দুইই সাজতে হবে।" মুলু আমার ছোটভাই প্রসাদের ডাকনাম ছিল। ডাক-ঘর অভিনয়ে এর আগে ঠাকুর্দ্দার পার্ট করে সে প্রশংসা পেয়েছিল। আশামুকুল বলে একটি ছোটছেলে অমলের পার্ট খুব সুন্দর করেছিল বলে রবীন্দ্রনাথ তাকেই ঐ পার্ট দেওয়া স্থির করলেন।

১০ই অক্টোবর বিচিত্রায় ডাকঘর অভিনয় দেখতে গেলাম। বিচিত্রার হলটি খুব বড় নয়, সেদিন ভীড় হয়েছিল অসম্ভব রকম। দর্শকদের মধ্যে মেয়েদেরই ভাগ বেশি। কোনমতে জায়গা করে ত বসা গেল। "আমি

চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসি" গানটি এই প্রথম শুনলাম, এতদিন সেটি কবিতা বলেই জানতাম। ইন্দিরা দেবীর নেতৃত্বে কয়েকটি মেয়ে গানটি গাইলেন।

মাধব দত্তের পার্ট করেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীবাবু কবিরাজ ও মোড়ল দুই ভূমিকাতেই অভিনয় করেছিলেন। অসিতকুমার হালদার দইওয়ালা এবং রথীন্দ্রনাথ রাজ কবিরাজ সেজেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে সুরূপা "সুধা" সেজেছিল, তাকে দেখাচ্ছিল ভারি সুন্দর। "আহা, ফুলের খবর তুমি নাকি আমার চেয়েও বেশি জান"; বাঁশির সুরের মত মিষ্ট গলায় তার এই কথাগুলি যেন এখনও কানে বাজে। শেষের দৃশ্য দুটি মানসনেত্রে এখনও দেখতে পাই।

রঙ্গমঞ্চের চন্দ্রতারাখচিত আকাশ ও চাঁদের আলো যেন সত্যকারের আকাশ ও চাঁদকেও সৌন্দর্যে হার মানিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ সাজসজ্জা কিছুই করেন নি। মাথায় শুধু গেরুয়া রঙের পাগড়ি, পরণে গেরুয়া জোব্বা, যা তিনি অনেক সময় বাড়ীতেই পরতেন। আলোর মুকুটের মত তাঁর কুঞ্চিত কেশদাম, যা তাঁর মুখের সৌন্দর্যকে দ্বিগুণিত করত, তা পাগড়ির আড়ালে চাপা দেওয়ায় আমরা মনে মনে আপত্তি অনুভব করছিলাম, কিন্তু সাজসজ্জার ব্যাপারে ত তাঁর কথার উপর আর কারো কথা চলত না। তিনি ঠাকুর্দা ও প্রহরীর পার্ট করলেন।

নাটকে গান কোথাও নেই, তবু একবার বাউল সেজে "গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে", এই গানটি গেয়ে নাচতে নাচতে রবীন্দ্রনাথ মাধব দত্তের ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলেন। আর একবার গেয়ে উঠলেন, "বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে", এটি যবনিকার অন্তরাল থেকে।

অভিনয় শেষ হবার পরেও অনেকক্ষণ আটকে রইলাম। মেয়েদের মজলিশ্ ত সহজে ভাঙে না? রঙ্গমঞ্চ থেকে নেমে রবীন্দ্রনাথ অতিথিদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। কে নাকি বলেছে যে ভাল শোনা যায় নি, আমরা শুনতে পেয়েছি কি না জানতে চাইলেন। আমরা ত সবই শুনেছিলাম, কোন অসুবিধা হয় নি।

এর কয়েকদিন পরে আবার একবার 'ডাকঘর' অভিনয় হয়েছিল বিচিত্রাতে। এটি হয়েছিল কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকে দেখাবার জন্যে। সেটাতেও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, কিন্তু ঠিক সেইদিনে বড়বাজারে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা সুরু হল, মা ভয় পেয়ে আর আমাদের যেতে দিলেন না। রবীন্দ্রনাথের কানে একথা যাওয়াতে তিনি আমাদের সাহসের অভাব নিয়ে অনেক ঠাট্টা তামাশা করলেন।

এরপর ১৪ই নভেম্বর গেলাম বিচিত্রাতে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ পাঠ শোনবার জন্যে। গিয়ে দেখলাম ঘরের একটু অদলবদল হয়েছে। মেয়েদের জন্যে একটি আলাদা প্রবেশ-পথের ব্যবস্থা হয়েছে এবং বসবার ব্যবস্থা হয়েছে সারি সারি চেয়ার পেতে। এর আগে মেঝের উপর ফরাশ পেতে দিশী দস্তুরে বসা হত।

প্রবন্ধটি বড় ছিল, পড়তে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগল। গান হয় নি। শ্রোতাদের ভিতর উপন্যাস লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখলাম। বেশভূষা ধরন ধারণ সবই অত্যন্ত সাদাসিদা। না চিনিয়ে দিলে বুঝতেই পারতাম না যে তিনি অমন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমরা আবার কবে শান্তিনিকেতন যাচ্ছি। ওখানে আমাদের মেয়েদের একটি হাতে লেখা পত্রিকা ছিল, তার নাম "শ্রেয়সী"। সেটির খবর নিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখনই কলকাতায় থাকতেন, তখনই তাঁর অনুরাগীভক্তের দল যতবার সম্ভব বিচিত্রায় আসর বসাবার চেষ্টা করতেন। প্রোগ্রাম প্রতিবারেই ছাঁটা কাটা রকম কিছু যে একটা থাকত তা নয়। আসল প্রয়োজন ছিল তাঁর কাছে যাওয়া, তাঁকে ঘিরে বসা তাঁর কথা শোনা। এই রকম ভাবেই আবার ২১শে নভেম্বর ডাক পড়ল। চিঠিতে বিষয় দেখলাম "সঙ্গীত ও সদালাপ।" সঙ্গীত অনেকগুলিই শুনলাম, গাইলেন দিনেন্দ্রনাথ এবং অজিতকুমার চক্রবর্তী। সদালাপ যা

হল তা এত নীচু গলায় যে বেশীর ভাগ কথা শুনতেই পেলাম না। রবীন্দ্রনাথ বেশীর ভাগ সময়টাই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে কাটিয়ে দিলেন। তাঁদের কথাবার্তার ছিটেফোঁটা যা কানে এল তাতে বুঝলাম যে সাহিত্যের ভাষা সাধু হওয়া উচিত না কথ্য হওয়া উচিত, এই নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। ভাল করে কিছু শুনতে না পাওয়ার দুঃখে শেষ অবধি আর বসলামই না, আগেই বাড়ী ফিরে এলাম।

এরপর যেদিন বিচিত্রায় গেলাম সেদিন ১৯১৮র ২৪শে এপ্রিল। কার্ডে দেখলাম "বিচিত্রপ্রসঙ্গ" হবে। বুঝলাম যাওয়াটাই আসল কথা। যখন পৌঁছলাম তখনও মহিলা অতিথি আর কেউ আসেন নি। প্রতিমা দেবীর সাক্ষাৎ পেলাম উপরে উঠেই। দুতলার ঘরের সজ্জার একটু পরিবর্তন দেখা গেল, অবগুণ্ঠিত বৈদ্যুতিক আলোর বদলে বড় বড় চিত্র-বিচিত্র জাপানী লণ্ঠন ঝুলছে। রবীন্দ্রনাথ এসে ঢুকলেন এই সময়। আমাদের অভ্যর্থনা করে বললেন, "এই যে তোমরা এসেছ। আমি রোজ ভাবি একবার তোমাদের বাড়ী যাব, তা এখানে এসে এমন politics-এর পাল্লায় পড়েছি যে কিছুতেই আর সময় হয়ে ওঠে না।" চেহারা তাঁর অনেক খারাপ হয়ে গেছে দেখলাম। এই সময় তাঁর বড় মেয়ে বেলা দেবী মৃত্যুশয্যায়। অমানুষিক ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে তিনি মনের বেদনা চেপে রেখে বাইরের সংসার আর জনসাধারণের দাবি মিটিয়ে চলতেন, কিন্তু ভিতরের সংগ্রামের চিহ্ন তাঁর চেহারায় মাঝে মাঝে ফুটে বেরত।

ক্রমে ক্রমে অভ্যাগত সমাগম হতে লাগল। সভার কাজ আরম্ভ হতে প্রায় সাড়ে সাতটা বাজল। হলের মধ্যে যে জায়গাটা ভদ্রলোকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, আমরা সেইটিই অধিকার করে বসেছিলাম। এখন কয়েকজন উপরে আসায় রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তোমরা এবার নিজেদের সিংহাসন অধিকার কর গিয়ে।" আমরা নিজেদের জায়গায় গিয়ে বসলাম। 'বিচিত্রা প্রসঙ্গে'র মধ্যে হল গান বাজনা এবং কবিতা পাঠ। এতে অংশ গ্রহণ করলেন শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, নলিনী দেবী, অরুন্ধতী সরকার, কবি স্বয়ং, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। কবিতা পাঠ রবীন্দ্রনাথ একলাই করলেন, একটি নূতন কবিতা, আর একটি আগেকার লেখা। সভা শেষ হল moonlight sonata দিয়ে।

১লা মে আবার বিচিত্রার সম্মিলনীর অধিবেশন। এবার আরম্ভ হল দিনুবাবুর গান দিয়ে। তারপর রবীন্দ্রনাথ কাব্য সম্বন্ধে কিছু বললেন, এবং নিজের নব রচিত একটি কবিতা পড়ে শোনালেন। শ্রোতাদের মধ্যে দুচারজন কবিও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের স্বরচিত কবিতা পড়তে অনুরোধ করলেন, কিন্তু কেউই কিছু পড়তে রাজী হলেন না। কবির কন্যা মীরা দেবী বললেন, "এ যে দেখি আমাদের আশ্রমের মেয়েদের সাহিত্য সভার মত।"

বোমানজি নামে এক পার্শী ভদ্রলোক এবং রংপুর কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও যাতে কিছু রস উপভোগ করতে পারেন এই জন্য কবি কয়েকটি ইংরেজি কবিতা পড়ে শোনালেন। এরপর কার একজনের অনুরোধে "বিদায় অভিশাপ" পড়লেন।

রবীন্দ্রনাথের পর সভায় উপস্থিত এক ভদ্রলোক 'বলাকা'র একটি কবিতা পাঠ করলেন। পড়া ভাল লাগল না। ভাবলাম এঁকে পড়তে না বললেই ভাল হত। সভাভঙ্গের পর অনেক গল্প করার জন্যে বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের এই সময় বিদেশ যাত্রার কথা ছিল। কিন্তু তখনও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষপর্ব চলছে, এবং ভারত মহাসাগরে ও প্রশান্ত মহাসাগরে জর্মান যুদ্ধজাহাজ আর সাব্‌মেরিন্ দেখা দিয়েছে বলে রব উঠল। আত্মীয়-বন্ধুদের প্রচণ্ড আপত্তিতেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ যাত্রার প্রস্তাব বাতিল করলেন।

ওঁর জন্মদিন বরাবর শান্তিনিকেতনেই হত। এবারে তিনি এখানে রইলেন, সুতরাং বিচিত্রাতেই জন্মোৎসব করার ব্যবস্থা হল। ১৯১৮র ৮ই কি ৯ই মে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। সেদিন কি প্রচণ্ড বৃষ্টি, ভয়ই করতে লাগল, জোড়াসাঁকো অবধি গিয়ে উঠতে পারব কি না। তখনও

এখনকার মতই জল দাঁড়ানর ঘটা ছিল রাস্তায়। যা হোক সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি থেমে আসাতে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যথাস্থানে পৌঁছে শুনলাম বসবার জায়গা এবার গগনেন্দ্রনাথদের বাড়ীতে করা হয়েছে। বিচিত্রার হলে খাওয়ান হবে, সেটি এখন থেকে সাজান হচ্ছে, সেখানে সভা চলবে না। ৬নং বাড়ীতে বসে খানিক গল্পস্বল্প করে তারপর একটি বালিকা পথ-প্রদর্শিকার সঙ্গে ৫নং বাড়ীতে এলাম। রবীন্দ্রনাথও প্রায় সেই সময় এলেন। সকলেই তাঁকে প্রণাম করে ফুলের মালা পরাতে লাগলেন, তাঁর নাতি, নাতনী, নাতবৌ সম্পর্কের যাঁরা তাঁরাই হলেন অগ্রণী।

ফুলের মালার ভার যখন ভয়াবহ হয়ে উঠ্‌ল তখন কবি বললেন, "না, আর বহন করতে পারব না, নাতনী নাতবৌদের সব মালা গ্রহণ করেছি, কিন্তু নাতিদের বেলায় আমি ঐখানেই গণ্ডি টানছি।" অগত্যা অবশিষ্ট যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তাঁর হাতেই মালা দিয়ে প্রণাম করলেন। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী আসার পর খানিক গান-বাজনা হল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবির জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা পড়ে শোনালেন। সকলে কবিতাটির খুব প্রশংসা করলেন। "গানের ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিছু বললেন। উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগকে লাগাম ছেড়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাতে, সভায় উপস্থিত দু একজনের কাতর মুখের ভাব দেখে আমরা কোনমতে হাসি চাপলাম। এঁরা ক'জন তখনকার কালে এ বিষয়ে বেশ কুখ্যাতই হয়ে উঠে-ছিলেন। এরপর অনেকগুলি 'মায়ার খেলার' গান হল, বর্ষার গানও হল কয়েকটা। বাইরের থেকে মৃদঙ্গের গুরুগম্ভীর ধ্বনি শোনা গেল।

গানের আসর শেষ হতেই প্রায় ৯টা বাজতে চলল। শেষ গান কবি স্বয়ং গাইলেন, "তবু মনে রেখ যদি দূরে যাই চলে।"

এরপর অতিথিরা বিচিত্রার দিকে অগ্রসর হলেন—ভদ্রলোকরাই অগ্রণী। আমরা রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করবার জন্যে একটু পিছিয়ে রইলাম এবং পরে তাঁর সঙ্গে গিয়ে বিচিত্রার দোতলাম উঠলাম। ঘরটি বড় চমৎকার সাজান হয়েছিল। "বিচিত্রা" সেদিন শুধু বিচিত্রা নয়, অপরূপা হয়ে উঠেছিল। আলপনা, আলোক আর ফুলসজ্জায় ঘরটি যেন ইন্দ্রপুরীর রূপ ধরেছিল। ঘরের চারিধার ঘুরিয়ে আসন করা হয়েছিল, আসনের সারির সামনে আর পিছনে আলপনার ছবি। প্রত্যেক অতিথির বসবার জায়গায় তাঁর নাম লেখা একখানি কার্ড, পাছে স্থানচ্যুত হয় বলে একটি অস্ফুট পদ্মকলিকা দিয়ে চাপা। আয়োজনকারীর দয়ায় দেখলাম রবীন্দ্রনাথের আসনের পাশেই আমার নাম রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বসবার পর, অতিথিরা বসলেন। নাম লেখা থাকা সত্ত্বেও দু একটি ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভুল হল। রবীন্দ্রনাথের অন্য পাশের আসনটি ছিল একটি অল্পবয়সী ও ভাল মানুষ তরুণীর। আর একটি মেয়ে এসে গায়ের জোরে সেখানে চেপে বসে পড়লেন এবং কর্মকর্তা ভুল সংশোধনের চেষ্টাটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেলেন।

অমন লোভনীয় জায়গায় বসে আনন্দ খুবই পেলাম, তবে খাওয়াটা মোটেই হল না। প্রসন্নময়ী দেবী আমার আর একপাশে বসে নিজে ছেলেবেলায় কত খেতে পারতেন তাই বলে আমাকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতেও লাভ হল না কিছু। একজন কর্মকর্তা আমি কেন কিছু খাচ্ছি না জিজ্ঞাসা করায় রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তোমরা ওকে যথেষ্ট আদর যত্ন কর নি বলে বিরক্ত মুখ করে বসে আছে। আমি ওকে খেতে বলেছি কিন্তু।"

আহারাদির পর আবার গানের আসর বসানর চেষ্টা হল, কিন্তু অনেক রাত হয়ে যাওয়াতে আর জমল না। এতেই যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন রাত বারটার কাছাকাছি।

১২ই মে রবিবার ছিল। গ্রীষ্মের জন্যে বিচিত্রা সম্মিলনী বন্ধ থাকবে মাস দেড়েক, তাই এদিন আবার সবাই গিয়ে হাজির হলাম বিচিত্রায়। প্রোগ্রাম তেমন কিছু ছিল না। একটু আগে গিয়েছিলাম বলে মহর্ষি

ভবনটি ঘুরে-ফিরে ভাল করে দেখে এলাম এবং বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে খানিক গল্প করলাম।

বিচিত্রা দেখতে দেখতে ভরে উঠল। তবে সেদিন আসর ভাল জমল না। একজন অখ্যাত নামা বিদেশিনী মহিলা ও তাঁর স্বামী আবির্ভূত হয়ে বেশ বেসুর বাজালেন। রবীন্দ্রনাথকে বাধ্য হয়ে তাঁদের সঙ্গে অনেক কথা বলতেও হল, এবং তাঁদের কথা শুনতেও হল। সবচেয়ে অরুচিকর হল সেই মহিলার স্বরচিত কবিতা পাঠ, থামতেই চান না আর তিনি। সে কবিতার মাথামণ্ডু কিছু বুঝলাম না। কবি স্থির হয়ে বসে শুনছেন, কাজেই আমরা আগে-ভাগে উঠে পালাতেও পারলাম না। যতক্ষণ কর্মভোগ ছিল বসে শুনতে হল। রবীন্দ্রনাথও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তিনি তখনই সভাভঙ্গ করে দিলেন।

এরপর যে অধিবেশনের কথা মনে পড়ে তা ১১ই জুন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ। এর আগে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা কাণ্ড হয়ে গেছে এবং কবি তাঁর নাইট উপাধি বর্জন করেছেন। সেদিন সবাই এসে বসবার পর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি কবিতা পড়ে শোনালেন। ঐ উপাধি ত্যাগ উপলক্ষেই লেখা। কবিতার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম লেখা গদ্য কবিতা কয়েকটি পড়ে শোনালেন। এই ধরনের লেখা শ্রোতাদের কেমন লাগল তা জানতে চাইলেন পড়ার পরে। অনেকেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। তারপর ছন্দ নিয়ে আলোচনা হল কিছুক্ষণ, এবং তারও পরে গান। গানগুলি নূতন, কাজেই শ্রোতাদের মধ্যে গায়ক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সুর শিখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কবিকে এক একটি গান দু তিনবার করে গাইতে হল। অবশেষে তিনি ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন।

এরপর কবি ইউরোপ যাত্রা করেন। বছর খানিক নানা দেশ ঘুরে বেড়ালেন। তখন বিচিত্রায় আর কোন উল্লেখযোগ্য আসর বসল না। তিনি ফিরলেন ১৯২১র জুলাইয়ে।

এতকাল শান্তিনিকেতনে "বর্ষামঙ্গল" হত, এবার ঠিক হল কলকাতায় হবে। বিচিত্রার ঘরে ধরবে না। টিকিট করে যখন শ্রোতাদের আসতে হবে, তখন বিপুল ভীড় হবেই। কাজেই বিচিত্রার পাশের জমিতে মস্ত মণ্ডপ বেঁধে জায়গা করা হল।

উৎসব ত হল ১৩২৮এর ভাদ্র মাসের শেষের দিকে, তবে উৎসবের রিহার্সাল্‌গুলিও কম উপভোগ্য হয় নি। জোড়াসাঁকো একেবারে গম্ গম্ করে উঠল। শান্তিনিকেতন থেকে একদল সুগায়ক ছেলে দিনুবাবুর সঙ্গে এসে হাজির হল। কলকাতার গায়ক-গায়িকার দল ত ছিলই।

বর্ষামঙ্গলের প্রথম অধিবেশনের দিন সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি। বিকেলের দিকে একটু ধরল তাই রক্ষে। কিন্তু ভীড় যা হবার তা হলই, কোথাও তিল ধারণের আর জায়গা রইল না। তবে সরস্বতীর কমল বনে, লক্ষ্মী ঠাকরুণের সেবকদের উৎপাত কিছু বেশী হয়েছিল।

একদিনে আশ মিটল না, পরের দিনও গেলাম। এই দিনই গান আর আবৃত্তি বেশি ভাল হল। "বাদল মেঘে মাদল বাজে" এই গানটি নূতন লিখে, কবি গানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। সবাই শুনে মহাখুশি।

আর একদিন হবার কথা ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ মত বদলে সদলে শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন।

এরপর বিচিত্রার উল্লেখযোগ্য অধিবেশন বিশেষ মনে পড়ে না। বিশ্বভারতীর জন্যে কবিকে প্রায় সমস্তক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হত, মাঝে মাঝে এদেশ ওদেশ ঘুরতেন অর্থসংগ্রহের জন্য। কলকাতায় আসতেন বটে, তবে কাজেই ডুবে থাকতেন। এরই মধ্যে ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারিতে সময় করে তাঁর নবরচিত "মুক্তধারা" শুনিয়ে গেলেন। বিচিত্রার ঘরে তখন সপরিবারে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করছিলেন, তাই গগনেন্দ্রনাথদের বৈঠকখানায় আসর বসল। নাটকের গানও তিনিই করলেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহের পর আমি বহুদিনের মত রেঙ্গুনে চলে যাই। কলকাতার জগৎ থেকে বেশ কিছু দিনের জন্যে নির্বাসিতই হয়ে গেলাম।

মানময় প্রধান অতিথি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

একটা মাঝারি গোছের রেল ষ্টেশন, এ ছাড়া জায়গাটার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না। সম্প্রতি এখান থেকে একটা ব্র্যাঞ্চ লাইন বেরুনোয় আস্তে আস্তে জমকে উঠছিল, একটা কারণে গতিবেগটা হঠাৎ একটু বেড়ে গেছে। মাস দুই হল, ব্র্যাঞ্চ লাইনের পরবর্তী ষ্টেশনের তেলকলের মালিক নটবর পাল একটা সিনেমা-হলও খুলে দিয়েছে। সমস্ত তল্লাটের মধ্যে নটবরদের গ্রামটাই বর্ধিষ্ণু। একটা তেলকল, একটা চালকল, হাই স্কুল, বাজারটাও বড়ই, তবু অনেক দেখেশুনে এইখানেই হলটা খুলল নটবর। জংশন ষ্টেশনটা আট-দশ মাইলের মধ্যে অনেকগুলি গ্রামের কেন্দ্রস্থল। রেল তিন দিক থেকে খদ্দের টানবে। একটা বাস-রুটেরও ওপরে পড়ে। নটবরদের গ্রামটাও এমন কিছু দূরে পড়ে না, মাইল চারেকের ভেতরেই। সিনেমার নেশা জমে এলে গেঁয়ো লোকেদের পক্ষে কিছুই নয়; এপাড় ওপাড়া।

একেবারে পাকা হল নয়, নটবর সেরকম কাঁচা কাজ করে না। শাল-বাল্লার ফ্রেম করে তাতে করোগেট-লোহার চাদর ঠোকা, ওপরে করোগেটের ছাউনি। নাম দিয়েছে 'অন্নপূর্ণা'। এখন সপ্তাহে দুটো দিন 'শো' দিচ্ছে, মঙ্গল আর শুক্রবার। লোক হচ্ছে মন্দ নয়। একটা দিন বাড়াবার কথা ভাবছে নটবর। ঘরটা খাড়া হওয়ার পর থেকে জায়গাটা যেমন নূতন করে আপনিই জমে উঠছে, তেমনি নটবরেরও চেষ্টার অন্ত নেই। জংশন হওয়ার আগে মাত্র একটি তেলেভাজা আর চিঁড়ে-মুড়ির দোকান ছিল, আর একটা বাঁশের বাতার বেঞ্চিপাতা টী-ষ্টল। এখন ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই যে টানা রাস্তা, তার ওপর পাশাপাশি দুটো খাবারের দোকান, দুটো পান-বিড়ির, একটা মুড়ি-মুড়কি, চিঁড়ের-মোয়া, বাতাসা তামাক নিয়ে মুদিখানা; একটা কাটাকাপড় আর ষ্টেশনারির দোকান, একটা চপ-কাটলেট-চা-বিস্কুটের। শেষের দুটো নটবরের নিজের, নাম যথাক্রমে 'অন্নপূর্ণা ভ্যারাইটিজ' এবং 'অন্নপূর্ণা কেবিন'। এই কেবিন আর একটা যে হেয়ার কাটিং সেলুন আছে এ দুটো শুধু সিনেমার দিনই খোলে। বাকি দোকানগুলোয় কিছু কিছু বিক্রয় রোজই হয়, বাড়ছেও। যেটুকু মন্দা যায়, সিনেমার দুটো দিনে পুষিয়ে যায়। বিশেষ করে নটবরের দোকানে। সিনেমা আসায় লোকেদের রুচি হু হু করে বদলে যাচ্ছে। শুধু রসনারই নয়, পোশাক-প্রসাধন সম্পর্কেও, মেয়ে-পুরুষ উভয় মহলে। সেলুনটাতে ত চারজন লোকে হিমসিম খেয়ে যায়। ওরাও রোজ একজন করে থাকবার কথা চিন্তা করছে।

সমস্তটুকু আমি যে জানলাম তা নিতান্তই আকস্মিকভাবে। গোবর্ধনের কাছে। নইলে অত দূরে সিনেমার দৌলতে একটা অঞ্চল কি করে দ্রুত সভ্যতার আলোকে এসে পড়ছে, তা নিয়ে আমার কোন আগ্রহ বা কৌতূহল থাকবার কথা নয়।

বাইরের বারান্দায় বিকেল বেলায় একাই বসে ছিলাম, গোবর্ধন এসে সামনের মোড়াটায় বসল। একেবারে দিন পনের আসে নি, একটু যেন শুকিয়েও গেছে।

কারণটা জিজ্ঞেস করতে বলল—"শেষের কথাটাই আগে বলে নিই দাদা, একটা জন্মের সাধ মিটিয়ে এলাম; কাল রাত্রের ব্যাপার। সাহিত্য-সভায় প্রধান অতিথি হয়ে এলাম। আজকাল ত একজোড়া করে ডায়াসে তুলছে —সভাপতি আর প্রধান অতিথি। কোন্‌টে বড় দাদা?"

বললাম—"পতিই যখন সেক্ষেত্রে ওটাই ত হওয়া উচিত।"

"তাই হতে পারতাম, নিজেই সাহস করলাম না। ভেবে দেখলাম, শুধু বুকে মালা ঝোলালেই চলবে না ত, পেটেও কিছু থাকা চাই। তার চেয়ে বাড়ীর অতিথি-অভ্যাগত, কিছু আবোল-তাবোল হয়ে গেলেও ক্ষ্যামাঘেন্না করে নেবে। ঠিক করি নি?"

হেসে প্রশ্ন করলাম—"ব্যাপারখানা কি?"

"আগে একটু চায়ের কথা বলে আসি দাদা ভেতরে, তার সঙ্গে আরও কিছু যদি এসে পড়ে। খাটুনিটা ত বেশ গেল ক'টা দিন।"

ভেতর থেকে ফিরে এসে বসতে বসতে বলল—'অবিশ্যি সে দিকটাও তাল বুঝে ম্যানেজ করে নিলাম—অতিথিকে মুখ খুলতে হল না, সভাপতিকেও নয়; কিন্তু গোড়া থেকে সবটা না শুনলে ঠিক বুঝবেন না হয়ত। ব্যস্ত আছেন?"

"সে ত দেখতেই পাচ্ছ।"—বললাম আমি।

"তা পাচ্ছি, তবে নেহাৎ যে ভুল বলছি তাও ত নয়। আমাদের ব্যস্ত থাকা মানে হাত-পা-মুখকে ব্যতিব্যস্ত

করা। আপনাদের ত তা নয়। যখন দেখছি ওগুলো গুটিয়ে দিব্যি চুপচাপ বসে আছেন তখনই হয়ত শখ করে মাথার মধ্যে একগাদা ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী নিয়ে না হোক হয়রান হচ্ছেন। আমি সেই কথা বলছি।"

হেসে বললাম—"বল তুমি। বরং ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ীর অভাবই যাচ্ছে আমার আপাততঃ।"

"তা যদি বললেন ত 'অন্নপূর্ণা হল'-এর মত বোঝাই করে দিতে পারি দাদা। শুনুন তা হলে—"

"সরষের তেল জোগাড় করা থেকে সুরু হল। আর সবগুলোর দেখাদেখি এটাও ত বাজার থেকে উধাও হয়েছে। কাকীমা বললেন—'আমার মামার বাড়ীর দিকটা দেখবি একবার? একবার যেন শুনেছিলাম পাশের গ্রামের নটবর পাল একটা কল দাঁড় করাচ্ছে।'

মেয়েলি কথা। সারা দেশটায় পালে-পাল কত নটবর পাল কলে-কলে দেশটা ছেয়ে দিয়েও এই দশা, যত করবে ওঁর মামার বাড়ীর নটবরে! তার ওপর নিজের মামার বাড়ীরই কবে মুখ দেখেছি মনে নেই, এ আবার—মারও নয়, কাকীমার মামার বাড়ী। তবু গেলাম কাকীমার একখানা চিঠি নিয়ে। পাপ মুখে বলতে নেই দাদা, কি যাত্রা করে যে বেরিয়েছিলাম, একেবারে গোড়া থেকেই প্রধান অতিথি!"

"কি রকম?"—ওর বলবার ভঙ্গিতে হেসে প্রশ্ন করলাম আমি।

"দাদু, মানে কাকীমার মামা, পনের টাকা মাইনের কেরাণী হয়ে গিলেণ্ডারের ফার্মে ঢোকেন। এ যুগের কথা নয়। ডেলি প্যাসেঞ্জারির সঙ্গে পুরুতগিরির ব্যবস্থাটা ধরে রেখেছিলেন, বড়বাবু হয়ে রিটায়ার করে এসে গুরুগিরি আরম্ভ করে দিলেন। দেখলাম বেশ খলিফা লোক দাদা। এই সময় নটবর পালের মাথায় নূতন ফিকির ঢুকেছে, তাক বুঝে গেঁথেও ফেললেন। তার গুরুবল দরকার ত।

আমায় একটা চিঠি দিলেন তাঁর নামে। সেটা নিয়ে গিয়ে দেখা করলাম। অবশ্য কাজ হল, গুরুর আদেশ, তবে ব্যবসায়ী লোক ত, একটু ল্যাজে খেলাল। এক-আধ টিন কেন, ইচ্ছে করলে সমস্ত দেশটাই তেলে ভাসিয়ে দিতে পারে, তবে জিনিসটা যে সোজা নয়, এটা একটু জানিয়ে না দিলে, যা হাহাকার যাচ্ছে, গুরুর চিঠি নিয়ে আরও সব নাতির দল জুটতে কতক্ষণ? বললে প্রতিটি ছটাক তেল কল থেকে চুঁয়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের খাতায় তার হিসেব উঠে যাচ্ছে। গুরুদেব আদেশ করেছেন, তাঁর অসীম কৃপা, কিন্তু ওরই মধ্যে থেমে একটু একটু করে সরিয়ে জমা করতে হবে। দু'দিন দেরি হতে পারে, তাড়াহুড়া আছে আমার? না থাকে ত দুটো দিন থেকে গেলে ভাল হয়। তার সঙ্গে—গুরুদেবের নাতি, ওর এমন সৌভাগ্য কি হবে?—এসবও আছে। বেশ নধর তেল-চুকচুকে শরীরটি, চুপে-চাপে নেওয়াপাতি ভুঁড়ি, কথাবার্তাও বেশ তেলা।

দু'দিন! থাকতে দিলে যে দু'মাস কামড়ে পড়ে থাকতে রাজি আছি একথা আর কি করে বোঝাই তাকে। চারিদিকে 'হা-তেল, হা-তেল'—এ সময় কলুর বাড়ীতে তেলে ভাসতে থাকা গুরুদেবের নাতিরই কি কম সৌভাগ্য?

বেশি পারা গেল না দাদা; গোবরারও চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস আছে ত। তবে, একবার ঢুকতে পারলে ভেতর মহল পর্যন্ত নেওটা হয়ে যাওয়ার ক্ষমতাটুকু আছে আপনার আশীর্বাদে, পাঁচটা দিন খাঁটি তেল খেয়ে, হেলাফেলা করে সর্বাঙ্গে মেখে, একটি ভরা টিন, তার সঙ্গে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তেল দিয়ে পিছলে আসবার জন্যে ছোট একটা খোলা টিনও নিয়ে যখন ফিরে এলাম তখন বাড়ীতে কেউ চিনতেই পারে না আমায়। ঐ পাঁচদিনে শুকনো নাড়িতে কম তেলটা ত শোষে নি, তেলে-তেলে ত্যালাপোকা হয়ে এসেছি কি না।"

হেসে বললাম—"কই, তার ত কিছুই দেখছি না। বরং মনে হচ্ছে আগে যেটুকু বা ছিল, সেটুকুও কিসে শুষে নিয়েছে।"

চা আর হালুয়া করে পাঠিয়ে দিয়েছে ভেতর থেকে; শেষ করে, রুমালে হাতমুখ মুছে গোবর্ধন বলল—

"তারপরেই যে-ছুটোছুটি যে-হয়রানিটা গেল তাতেই সব তেলানি ঘুচিয়ে দিলে কি না। তা যদি বললেন ত ঐ যে পাঁচটা দিন ছিলাম ওখানে, তার মধ্যে সব দেখেশুনে আমিও একটু লোভে পড়ে গেলাম। কি ফলাও ব্যবসা! কি কারবারী মাথা! শুধু নিজের গাঁটুকুতেই নয় ত, লক্ষ্মী বাইরে পর্যন্ত উছলে পড়েছেন। ক'দিনেরই বা কথা? এই নতুন লাইনটা বেরুবার পর থেকে···"

এর পর জংশন ষ্টেশনের পুরো বিবরণটা দিয়ে বলল—"নটবর লোক ভাল দাদা। আমি ভ্যাগাব্যাণ্ডি করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি সাহিত্য বিক্রী করে করে দুটো বই বিক্রি হবে তার জন্যে হা-পিত্তেশ করে বসে আছেন, তা বলে যে টাকার রস বুঝেছে, কি করে পাঁচশটাকে পাঁচ হাজার করা যায় তার জন্যে ফন্দি-ফিকিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে খারাপ বলতে হবে? বলুন?"

সুযোগ পেলেই খোঁচা দেয়, হেসে বললাম—"তা কি করে বলা যায়?"

"আমি কালোবাজারের কথা ধরেই বলছি কিন্তু দাদা।"

কথাটা বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার পানে। হেসে বললাম—"তেল যখন পেয়েই গেছ।"

"তেল যখন পেয়েই গেছ।"

"খোঁচাটা দিতে ছাড়লেন না দাদা, শেষ পর্যন্ত।"—গম্ভীরভাবে বলে আবার আরম্ভ করল—"থাক, যা বলছিলাম। আমি যে একটু লোভে পড়ে গেলাম তা এই ভেবে যে এমন একটা শাঁসাল লোক যত হাতে থাকে ততই ভাল। তবে ওর দিকটাও যে একেবারে না ভাবলাম এমন নয়। একটা লোক এমন একটা গঠনমূলক কাজ করছে (কি ভেবে একটু-আড়ে চেয়ে নিল গোবর্ধন) আমার যতটুকু সাধ্য করি না কেন?

"বুদ্ধিটা আমার হঠাৎই জুগিয়ে গেল দাদা। হপ্তায় দুটো দিন করে যে সিনেমা হয় একথা আগেই বলেছি। মঙ্গলবার আর শুক্রবার। আমার কপালে একটা শুক্রবার পড়ে গেল। যতটুকু জানি, তার চেয়ে জানাবার ক্ষমতাটুকু দিয়েছেন ভগবান, নটবর আমায় সাহিত্যের ভাষায় বলতে গেলে একজন 'উদীয়মান' কেউ বলে ঠাউরে নিয়েছে; বলল—'চলুন ঠাকুর, আমার ভাগ্যি একটা শো'ও পড়ে গেল, দেখে আসবেন চলুন।'

এর আগে একদিন জায়গাটা দেখিয়ে ওর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমায় সবটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। সে দিনেও অনেক কথা হল।

ডেলি দুটো করে 'শো'। আমরা সন্ধ্যেরটাই দেখলাম। তাইতেই প্রথম শো-এর বেরুতে এবং দ্বিতীয় শো-এর ঢুকতে যা দেখলাম তাতে বুঝলাম ভিড় নিতান্ত মন্দ হচ্ছে না। বাস-ট্রেণের সুবিধেটা আছে, তা ছাড়া

মাঠ ভেঙে চারিদিকের গ্রাম থেকেও লোক জোটে মন্দ নয়। দোকানগুলোয় বেশ ভিড়, বিশেষ করে নটবরের দুটোতে—'অন্নপূর্ণা কেবিন' আর 'অন্নপূর্ণা ভ্যারাইটিজ'-এ। কেবিনে একদিকে কাঠের পার্টিশন দিয়ে পর্দা ঝুলিয়ে যে দুটো ঘর করে দিয়েছে তা থেকেও মেয়েপুরুষ ঢুকতে-বেরুতে দেখলাম। পোশাক-আশাক, মেয়েদের প্রসাধন—সবতাতেই সহরের ছাপ পড়েছে। মনে মনে বললাম—সাবাস নটবর!

ট্রেণে আসতে আসতে আমায় জিজ্ঞেস করলে, দেখেশুনে আমার মতটা কি দাঁড়াল, আর কোন্ কোন্ দিক দিয়ে ইম্প্রুভমেণ্ট করা যায়, আমি ত সহরের মানুষ।

দেখেশুনে যা আসল মত সেটা ত দেওয়া যায় না দাদা, দিলে শুনছেই বা কে? কতকগুলা হিন্দী সিনেমা—গানের কলি এদিক-ওদিক শুনে বুঝতে পারলাম বোম্বাই হাওয়াও এসে গেছে। বললাম—'মত দেওয়ার ত কিছু বাকি রাখেন্ নি পালমশাই, আপনি একসঙ্গে মানসিক, আধ্যাত্মিক, পারিবারিক, সামাজিক সবরকম ইম্প্রুভমেণ্টের যা একটিমাত্র উপায় আছে আজকাল, সেটা ত ধরেই দিয়েছেন সবার সামনে, দেখলেই বেশ বোঝা যায় কাজ হু হু করে এগিয়ে যাচ্ছে। ক'দিনেরই বা পত্তন বলুন না। তবে আমার মনে হয় এর সঙ্গে আর একটা জিনিস মাঝে মাঝে জুড়ে দিলে নাম-ডাকটা আরও তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ত। তাইতেই, এই এতগুলো টাকা যে আপনি ঢাললেন দেশের কল্যাণের জন্যে সেটা উঠেও আসত তাড়াতাড়ি। শুধু পাবলিককে দেখলেই চলবে না, আবার নিজের দিকটাও একটু ভাবতে হবে ত।

গলে গেল দাদা। বললে—'বলুন আর কি করতে পারি এদের জন্যে? দেখছেনই ত কত নীচে পড়ে রয়েছে এখনও।' বললাম—'মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লাগিয়ে দিন।'

বললে—'নাম শুনেছি বটে, কিন্তু জিনিসটে কি ঠিক জানি না। দেখছেন নিজের ধান্দা থেকেই ফুরসৎ নেই, তার ওপর এই এক হাঙ্গাম ঝেঁদে বসেছি।'

বুঝিয়ে দিলাম দাদা। প্রথমটা নামটা শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, বুঝি পণ্ডিতী ব্যাপার কিছু। বললাম—ওঁ-টোঙের ধারে কাছে দিয়েও যায় না, ভয় নেই; শুধু নাচ-গান, আধুনিক-কালোয়াতি। যাদের সিনেমার পর্দায় দেখছে তাদের দু'একটাকে যদি টানতে পারা যায় তা হলে ত তীর্থস্থান হয়ে পড়ে। তখন এই টিনের চালা আর হপ্তায় দুটো দিনে কুলুবে? তবে কিছু খরচ হবে প্রথমটা।

টিকিট করা চলবে?—জিজ্ঞেস করল। বললাম—প্রথম দু'একটা ক্ষেপ আর করে কাজ নেই। এ-সব শিক্ষামূলক, গঠনমূলক বলে সহরের দিকে বড় একটা করে না, সমাজসেবাই ত। তবে জমে গেলে তখন আবার টিকিট করে তুলে নিলেই হবে।

রাজি হয়ে গেল। সেই হ্যাপা সামলে আসছি দাদা। উঃ, হ্যাপাই বৈকি! নটবর যে এতটা সভ্য করে তুলেছে এর মধ্যে অতটা আন্দাজ করতে পারি নি।"

যেন উৎকট কিসের একটা স্মৃতিতে সেকেণ্ড কয়েক চুপ করে রইল গোবর্ধন—"আমারই ভুল হয়ে গেল। প্রথমত টিকিট না করা, দ্বিতীয়ত প্রথমবারেই তারকার দিকে হাত বাড়াতে যাওয়া।"

তবু গুরুবল দাদা যে আসল তারকা কোনর নাগাল পাওয়া গেল না। যাকে ধরা গেল, সে হিসাবে তাকে তারকা না বলে জোনাকি বলাই ভাল। নন্দিতা চাকলাদার, কলকাতারই মেয়ে, একটা হিন্দী সিনেমায় দুটো ডান্স আর গান দিয়ে সবেমাত্র বেরিয়েছে, সিনেমাটা অন্নপূর্ণা হলে ক'দিন আগে দেখানও হয়েছে, তাকে এন্‌গেজ করতেই হাঁটাহাঁটি করে পায়ের জুতো ছিঁড়ে গেল। দু'টি ডান্স আর গান, দু' শ'টি টাকা। আর দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে আমাদের ক্লাবের জন্যে শ'খানেক টাকা টেনে নিলাম দাদা, অবশ্য নটবরকে বলেই। একটা সরোদ দেবে

আমাদের টুনে দত্ত, একটা কালোয়াতি, অখিল, দুটো আধুনিক, জ'টে সিঙ্গি। একটা রবীন্দ্র-সঙ্গীতও ঢুকিয়ে দিলাম দাদা, যদি শোনে ধৈর্য ধরে, খানিকটা পাপ ধুয়ে যায়। সভাপতি আবার কাকে ধরতে যাব দাদা? কোন্ কাগজে একটা আধুনিক কবিতা বেরুবার পর থেকে হাবলা দাড়ি গজিয়ে বড় চুল রাখছে, তাকে সভাপতি করে দিলাম। প্রধান অতিথির কথা বলেইছি।

সব ঠিকঠাক করে আমি আবার গিয়ে দুটো দিন থেকে খুব ভাল করে চারিয়ে এলাম ব্যাপারটা দাদা। হ্যাণ্ডবিল বিলি করে, লাউড স্পীকার ঘুরিয়ে, গোটা চারেক যে শো পাওয়া গেল তাতেও ঘটা করে স্লাইড্ দিয়ে দিলাম। হ্যাণ্ডবিলে বিশেষণের ছুট যা লাগিয়ে দিলাম, তাতে নন্দিতা চাকলাদারকে স্টারদের ছাড়িয়েও ঠেলে তুললাম আকাশে, আর টুনে জটেদের ত মনে হবে লোকের যে এই আনকোরা গন্ধর্বলোক থেকে নেমে এসেছে।

তারপর দলবল নিয়ে কালকে গিয়ে উঠলাম। গাড়ি থেকে নেমেই চক্ষুস্থির—এ আবার কোথায় এসে পৌঁছুলাম! রীতিমত এক মেলা বসে গেছে 'অন্নপূর্ণা হল'-কে ঘিরে। কতরকমের লোক, কতরকমের ফিরিওয়ালা, কত রকমারি আওয়াজ! নটবর হাজিরই ছিল তার লোক নিয়ে, আমাদের অভ্যর্থনা করে কেবিনে নিয়ে গেল। ছ'টার সময় প্রোগ্রাম সুরু, আমাদের মালা-টালা পরিয়ে ডায়াসে নিয়ে গিয়ে তুলল। ভেতরে যা অবস্থা তারও বর্ণনা দিতে হবে দাদা? এই জন্যে জিজ্ঞেস করছি সভাপতি আর প্রধান অতিথিগিরি করে আপনার ত অনেক ভোগান্তি গেছে।"

হেসে বললাম—"বাদ দিতে পার। তুমি যা ছাতু গুলেছ, ভাবছিলামই তুলবে কি করে।"

"নিলাম কিন্তু সামলে দাদা"—মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল গোবর্ধনের। বলল—"কি সংগঠনমূলক কাজ করে ফেলেছে নটবর এর মধ্যে! মনে হবে না কলকাতার বাইরে কোনও জায়গায় রয়েছি আমরা। পর্দার পেছনে বসে আমরা ঠিকঠাক হচ্ছিলাম—একটু দেরি হয়েই যায়, প্রথম কাজও ত—তা সে কি বেড়াল-ডাক, কুকুর-ডাক, কি চোখা চোখা বুলি। তারপর একটু পর্দা ফাঁক করে অডিটোরিয়ামটা দেখে ত একেবারে চক্ষুস্থির! তাকে ভিড় বলবেন? মনে হচ্ছে যেন বাক্সভরা পিণ্ডি-খেঁজুর। নটবর একবার বেরিয়ে গেল। যখন ফিরে এল, মুখটি শুকিয়ে গেছে একেবারে, বলল—ভলন্টিয়াররা ঠেকাতে পাচ্ছে না। টিনের ঘর, আর একটু চাপ বাড়লেই যে কি হতে কি হয়ে দাঁড়াবে।'

আপনার পায়ের আশীর্বাদে মাথাটা ঠিক থাকে দাদা, যত ঝড়-ঝাপটাই আসুক না কেন। কখন কি দরকার হয়, টাইম-টেবিলটা ভাল করে জানা ছিল। কি ভুলটা হয়েছে কেন বলতে যাব দাদা? বললাম—"আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন। আমাদের ওদিকে এ নিত্যিকার ব্যাপার, এর ঝাড়ন-মন্ত্র জানা আছে আমার। ভাববার কিছু নেই, শিক্ষা যত বাড়বে, নিখুঁৎ হয়ে আসবে, ততই ঐসরও বাড়বে, আর তাইতেই আপনার 'অন্নপূর্ণা হলের'ও জয়জয়কার! আপনি নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকুন।

এই সময় মেন লাইনে দু'দিক থেকে দুটো গাড়ি এসে দু'দিকে বেরিয়ে যায় আর তার মিনিট পনেরর মধ্যে তাদের প্যাসেঞ্জার নিয়ে ব্র্যাঞ্চ লাইনেরও একটা গাড়ি ছেড়ে যায়। এর পর ঘণ্টা আড়াই পরে আবার প্রায় ঐরকম ব্যবস্থা, যার ভরসায় বাইরের লোকগুলো এসেছে।

পর্দা টানিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি। হাত জোড় করে নমস্কার করে দাঁড়াতে ঠাণ্ডা হয়ে গেল এক চোট হলটা।

"আমার একটা নিবেদন অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে আপনাদের জানাতে হচ্ছে" বলে আরম্ভ করে বললাম—"একটা বিশেষ কারণে আজ আমাদের সভাপতি আর প্রধান অতিথিকে তাঁদের ভাষণ দুটো প্রথমে শেষ করে নিয়ে চলে

যেতে হবে। সেই আদি রামায়ণের যুগ থেকে কি করে আমাদের এই আর্যসংস্কৃতির উদ্ভব আর উন্নতি হল সে বিষয়ে তাঁদের ভাষণ—সংক্ষিপ্তই করবেন তাঁরা—তবু যে সময়টুকু লাগবে, আশা করি ধৈর্য ধরে বসে থাকবেন আপনারা। তার পরেই আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—যেটা প্রোগ্রামের প্রথমেই রেখেছিলাম আমরা সেটা আরম্ভ করে দোব। আপনারা দয়া করে যেন উঠে যাবেন না। দু'জনের ভাষণে যাতে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি না লাগে তার জন্যে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করব।"

অত সহজে হয় দাদা?—সে যা মেঠো গলায় চিৎকার উঠল একটা, কলকাতার রেশন-খাওয়া গলা তা পাবে কোথায়?

কিন্তু গুরুবল—ঠিক এই সময় এর ওপরও ছাপিয়ে ওদিকে ষ্টেশনে ইঞ্জিনেরও আওয়াজ উঠল, একটা গাড়ি বোধ হয় এসে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে যা হুল্লোড়—বেরিয়ে যাওয়ার, সেটা ঠেকানই দায়। কত আর বলব দাদা? —এর পর আরও দুটি তোড়। না, তখন গাড়ি ধরার হুজুগ উঠে গিয়ে ষ্টেশনের দিকে টান ধরেছে, আর কি ইঞ্জিন কখন আওয়াজ করবে সে ভরসায় কেউ দাঁড়িয়ে থাকে?

মিনিট কুড়িক পরে—যখন ফিরতি যাত্রী-বোঝাই হয়ে তিনটে গাড়িই গেল বেরিয়ে, এদিকে 'অন্নপূর্ণা হল' ত প্রায় আধাআধি খালি—এবার নটবর পালকেই পর্দা টানিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলাম। সে করজোড়ে নমস্কার করে বিনীত নিবেদন জানাল—অনেক সাধ্যসাধনা করে সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে থেকে যেতেই রাজি করেছে। এবার পূর্বের প্রোগ্রাম মতই নৃত্য-গীত আরম্ভ হবে···কিছু অন্যায় হল দাদা?" অভিমতের জন্য মুখের দিকে চেয়ে রইল গোবর্ধন।

—)০(—

প্রাচীন পোলিশ নৃত্য

কয়োনিকা সহরের নৃত্য

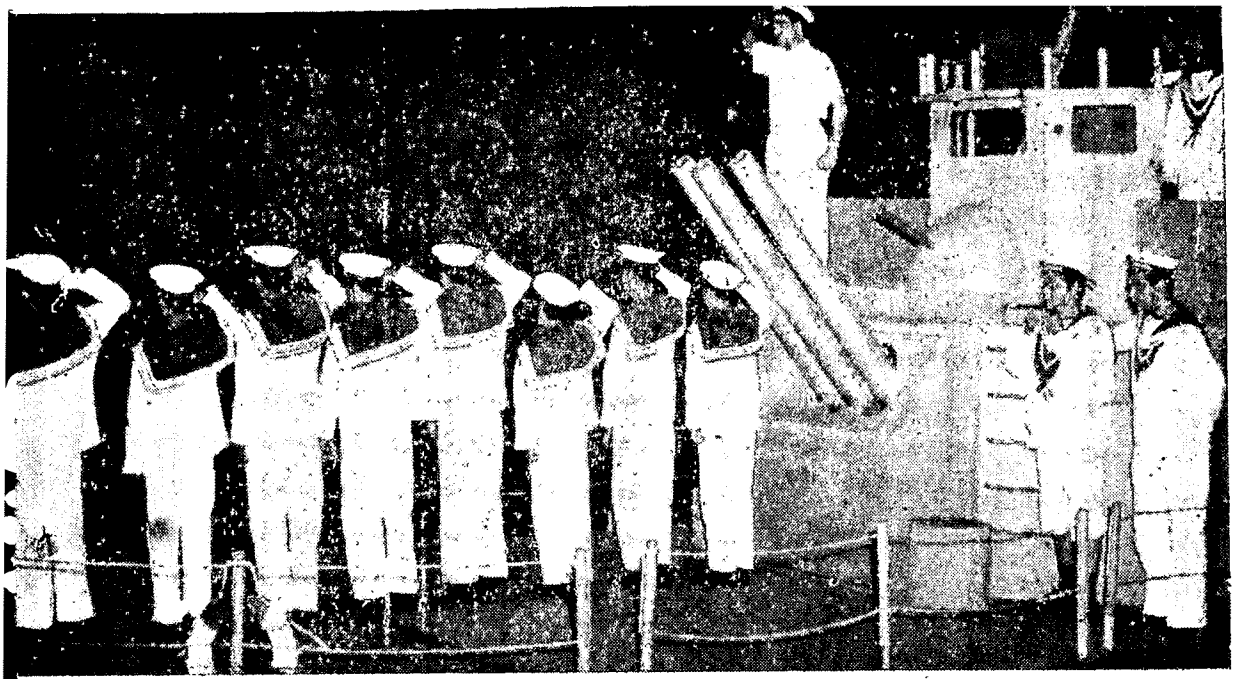

কল্লোলের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

উৎপল দত্ত

কল্লোল নাটকে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয় নি বলে মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি প্রাণপণে চিৎকার জুড়েছেন। নাটকে শুধুমাত্র ঘটনার সমষ্টি যাঁরা দেখতে চান তাঁরা যেন নাটক না দেখে সরকারের মুহাফেজখানায় গিয়ে দলিলগুলিই পড়েন। নাটক ঘটনা ছাড়াও আরো কিছু। নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ ঘটনা সাজানো, পরিবর্জন ও পরিবর্তনকে প্রভাবান্বিত না করে পারে না।

তবু আজ একটি কথা জোরের সঙ্গে উত্থাপন না করে পারছি না। আমাদের বিশ্বাস কল্লোল ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রাণপণে অক্ষত রেখেছে, এবং দু-একটি ক্ষুদ্র নাটকীয় প্রয়োজন ছাড়া কোথাও ঈষৎ বিকৃতিও ঘটতে দেয় নি। আমাদের ধারণা বিশ্বের প্রচলিত সব ঐতিহাসিক নাটকের চেয়ে কল্লোল কিছু বেশি পরিমাণেই ইতিহাসাশ্রিত। অথচ সেই কল্লোলকেই ইতিহাস-বিকৃতির দায়ে পড়তে দেখে আমাদের অনিবার্য সিদ্ধান্ত এই যে উক্ত সমালোচকবৃন্দ হয় ইতিহাস কিছুই জানেন না, নয় তাঁরা অন্য উদ্দেশ্যে অন্যের আদেশে এ ধরনের অভিযোগ করছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সরকারী মুহাফেজখানায় রক্ষিত নৌবিদ্রোহের দলিলাদি পাঠ করবার কোন সুযোগ সরকার রাখেন নি। তাই আমাদেরকে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্ভর করতে হয়েছে প্রথমত, বিদ্রোহী নাবিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উপর; দ্বিতীয়ত, তাঁদের কারুর কারুর লিখিত পুস্তিকার উপর; তৃতীয়ত, ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের গ্রন্থাদির উপর; চতুর্থত, ভারতীয়দের লেখা ইতিহাসের উপর।

১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি সকাল আটটায় তলোয়ার-এ যে ধর্মঘট সুরু হয়, তা কিন্তু বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন একাধিক স্থানে ভারতীয় সৈন্যরা দেশপ্রেমিক বিদ্রোহ সংগঠিত করেন; ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তার সংবাদ সম্পূর্ণভাবে গোপন করে-ছিলেন। দুঃখের বিষয় স্বাধীন সরকারও সেই বিদ্রোহগুলিকে প্রচার করা বা তাদের ইতিহাসে অঙ্গীভূত করা থেকে সযত্নে বিরত রয়েছেন। ১৯৪০ সালে ২১শ ভারতীয় ক্যাভালরির ১১৪ জন জোয়ান ব্রিটিশ স্বার্থে বিদেশে যেতে অস্বীকার করায় ৪ জনের ফাঁসী ও ১১০ জনের কারাবাস হয়। ৪২-এর আন্দোলনের সমর্থনে ১৭ স্থানে ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহ করে নিহত বা কারারুদ্ধ হয়। ৪২ থেকে ৪৫-এর মধ্যে অন্ততঃ ১৯ বার নৌবিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৪৪ সালে

১৯৪তম ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে মেটনটেনান্‌স্ কোম্পানীর বিদ্রোহ রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দমন করা হয়।

১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি এই দীর্ঘ সংগ্রামের চরম স্ফূর্তি হিসেবে আসে তলোয়ারের ধর্মঘট। পৃথিবীর সব নৌবিদ্রোহের আশু কারণ হিসেবে দেখা দেয় পচা খাবার, পোকাধরা মাছ, ছাতা-পড়া রুটি। তলোয়ারও তার ব্যতিক্রম নয়। উপরন্তু ব্রিটিশ অফিসারদের অসহনীয় জাতিদম্ভ ও ভারতীয়দের প্রতি তাদের উৎকট বৈষম্যমূলক ব্যবহার তলোয়ার-এ সূচীত আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়েছিল। এই জন্যই তলোয়ার-এর ধর্মঘট কমিটির দাবির মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার আওয়াজ ওঠে নি। কিন্তু ইতিহাসের গতি অমোঘ! পচা খাবারে যে লড়াই-এর আরম্ভ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে সেই লড়াই-ই বোধ করি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে উঠল। অবশ্য শুধু যে মামুলী খাওয়া-পরার দাবিতেই তলোয়ার-এর বিদ্রোহ ঘোষণা পর্যবসিত ছিল তা নয়; দুটি রাজনৈতিক দাবি ছিল এবং সে-দুটিতেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যে সবচেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তার প্রমাণ আছে। প্রথমত, আই-এন-এর যোদ্ধা সমেত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবি করে নাবিকরা বৃহত্তর এক ঐক্যের ইঙ্গিত দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল; দ্বিতীয়ত, ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতাযুদ্ধ দমনে নিযুক্ত ভারতীয় ফৌজ প্রত্যাহারের দাবি করে নাবিকরা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সামিল হতে চেয়েছিল।

১৮ই তারিখেই দুপুরের পর থেকে ধর্মঘট ব্যাপ্তিলাভ করতে থাকে; বেলা ২-১৫-কে ডেডলাইন ধরে সমুদ্রে অবস্থিত জাহাজগুলিও ব্রিটিশ অফিসারদের বন্দী করে বোম্বাই-এর দিকে ধাবিত হয়। ১৯শে ফেব্রুয়ারি ভোর-বেলায় উপকূলের কাস্‌ল্ ও ফোর্ট ব্যারাকে ধর্মঘট [illegible]। সকাল ৮টায় বন্দরে অবস্থিত পাঞ্জাব জাহাজ এক নয়া ইতিহাসের সূচনা করে, শহরের ট্রাম শ্রমিকদের কাছ থেকে চেয়ে এনে এক লাল নিশান উড়িয়ে দেয় মাস্তুলে। দেখতে দেখতে প্রায় সব জাহাজ এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। তলোয়ার-এ যাঁরা নেতৃত্ব করছিলেন তাঁরা ধর্মঘটকে এভাবে বিদ্রোহের দিকে পা বাড়াতে দেখে

কি ভেবেছিলেন জানি না, কিন্তু শান্তিপূর্ণ থাকবার পুনঃ পুনঃ আবেদন করে খানিক মানসিক উদ্বেগ যে প্রকাশ করেছিলেন তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

১৯শে রাত ৯-৩০-এ করাচীতে চমক জাহাজে নাবিকদের যে গুপ্ত অধিবেশনে বিদ্রোহকে ছড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় তা ইতিহাসের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ২০ তারিখ ভোররাত্রি ২-টোয় কলকাতা ও করাচী বিদ্রোহে সামিল হয়ে যায়। সিগন্যালারদের দান এ ব্যাপারে সমধিক তাৎপর্যসম্পন্ন। সকাল ১১টায় তলোয়ারে যে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন হয় তাতে এম. এস. খাঁ সভাপতি নির্বাচিত হন, কিন্তু খাঁ-এর শান্তি নীতি প্রথমেই চরমভাবে লাঞ্ছিত হয় যখন বেলা ২-টোয় এডমিরাল গডফ্রে হুমকি দেন; বেলা সাড়ে তিনটের মধ্যে স্ব স্ব জাহাজে প্রত্যাবর্তন না করলে নাবিকদের গ্রেপ্তার করা হবে। সেই সঙ্গে ঠিক সাড়ে তিনটেতেই মারাঠা সৈন্য দিয়ে কাস্‌ল্ ব্যারাক ঘিরে ফেলা হয়। সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় যে আলোচনা বসে তাতে গডফ্রে সব ক'টি দাবি প্রত্যাখ্যান করেন দম্ভভরে।

২১শে ফেব্রুয়ারি মারাঠা ফৌজ হটিয়ে গোরা পল্টন নিয়ে সকাল ৯টায় গডফ্রে র‍্যাটট্রে দুটি কাসল ব্যারাক আক্রমণ করে এম. এস. খাঁর সরল বিশ্বাসের শ্রাদ্ধ

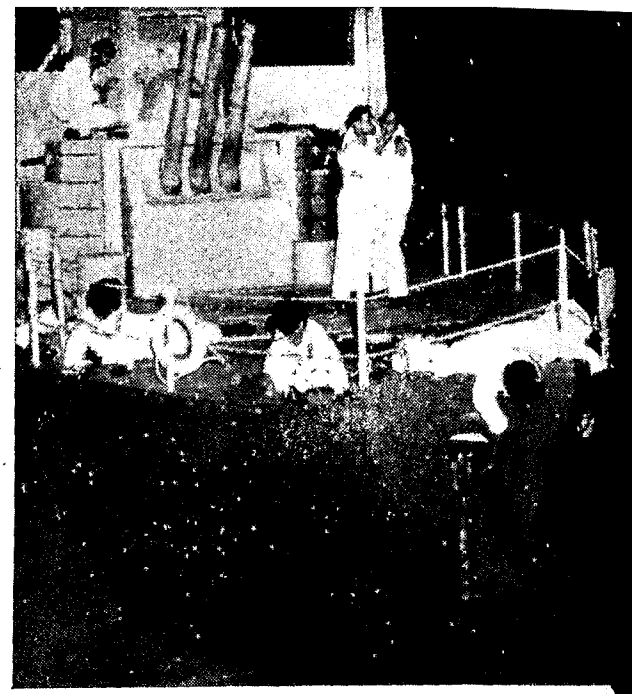

করে ছাড়লেন। কিন্তু কাস্‌ল্ ব্যারাকের বীরত্বে ও তার সাহায্যে অগ্রসর জাহাজগুলির গোলাবর্ষণে গোরা পল্টন বারবার ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। করাচীতে হিন্দুস্থান জাহাজের ওপর বিমান ও নৌ-আক্রমণ অমিত বিক্রমে প্রতিহত করেন নাবিকরা। সমস্ত উপকূলে সশস্ত্র সংগ্রাম যখন আরম্ভ হয়ে গেছে এবং গডফ্রে যখন চরমপত্র দিচ্ছেন: পুরো ভারতীয় নৌবহরকে ধ্বংস করব, তখন হঠাৎ বেলা তিনটেয় খাঁ কেন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে গডফ্রের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন সেটা রহস্যাবৃত।

২২ তারিখ কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে বোম্বাই-এ পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। সর্দার প্যাটেল কংগ্রেসের পক্ষে এই হরতালের বিরুদ্ধে যে বিবৃতি দেন তা ব্রিটিশ তোষণে এমনই আপ্লুত যে বেইমানির সদর দরজা এতেই প্রথম উদ্ঘাটিত হয়। বোম্বাইএর জনতার ওপর ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক যখন নির্বিচারে মেশিনগান চালাচ্ছে তখন প্যাটেল তথা কংগ্রেসের এই হীন আচরণ এম. এস. খাঁর শান্তিনীতির চরম পরাজয় ঘোষণা করল, কংগ্রেস লীগের কাছে নেতৃত্ব চাওয়ায় তাঁর দেউলিয়াপনা প্রমাণ করল।

সেদিনই প্যাটেল সাহেব খাঁকে হুকুম দিলেন; বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ কর: "The advice of the Congress to the R I N ratings is to lay down Arms and to go through the formality of surender which has been asked for." সেই সঙ্গে অতীব নির্লজ্জের মতন কর্তৃপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির জন্য দুঃখপ্রকাশ করতেও ছাড়লেন না প্যাটেলজী।

২৩শে ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহ কমিটির শেষ বার্তায় বলা

হল; "আমরা প্যাটেল ও জিন্নার নির্দেশে আত্মসমর্পণ করছি। প্যাটেল ও জিন্না গ্যারান্টি দিচ্ছেন আমাদের গায়ে হাত দেয়া হবে না।"

এবং অস্ত্র নামাতে না নামাতে ব্যাপক গ্রেপ্তার, প্রহার, খুন, দৈহিক নির্যাতনের স্রোত বয়ে গেল সারা এলাকায়। যে কটি জাহাজ তখনো ছিল দূর তাদের নেতৃবৃন্দকে কৌশলে মিটিং-এ ডেকে গ্রেপ্তার করতেও পিছ-পা হয় নি র‍্যাটট্রে, প্যাটেল সাহেবের সহায়তায়। সভাপতি খাঁ-র সস্তা আন্তরিকতার পরিণাম হল ব্যাপক কোর্ট মার্শাল। আর প্যাটেল জিন্নার গ্যারান্টি? কে দেখবে? প্যাটেল ও জিন্না তখন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা লাগাবার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে বড় ব্যস্ত, রেটিংরা তাই কারাগারেই যেতে পারেন স্বচ্ছন্দে।

সশস্ত্র বিদ্রোহ সফল হলেই যে পুরো আন্দোলনের নেতৃত্ব কংগ্রেস ও লীগের হাত থেকে বেরিয়ে যাবে এটা খাঁ না বুঝলেও প্যাটেল জিন্না বুঝতেন!

নৌবিদ্রোহের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ইন্দোনেশিয়ার মেরদেকা কাগজ তখন লিখেছিল: "ভারতের জন-সাধারণের কাছে ক্রমশঃ এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে অহিংসায় তাদের মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার নয়···শ্বেতকায় দৈত্যের গোলামির গুরুভার আমরা আপোষ-আলোচনায় ছুঁড়ে ফেলতে পারব না, পারব শুধু সংগ্রাম করে। ইন্দোনেশিয়া ইতিপূর্বেই তার প্রমাণ দিয়েছে।"

লীলা

শ্রী সরোজকুমার রায় চৌধুরী

ভরা দুপুরে লীনা এসে উপস্থিত। পরণে একখানি এক ইঞ্চি চওড়া কালো পাড়ের মলিন শাড়ি। গায়ে ততধিক মলিন একটি ব্লাউজ। দু'টি করপ্রকোষ্ঠ সম্পূর্ণ রিক্ত। হাতে কাগজে মোড়া একটি প্যাকেট। পিছনে দু'বছরের শিশুপুত্র রন্টু।

মা তাদের দেখে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল ঃ কি ব্যাপার ?

লীনা হেসে বললে, কেন, বাপের বাড়ী হঠাৎ আসতে নেই ?

লীনা আর বোধহয় দাঁড়াতে পারছে না। বারান্দার মেঝের ওপরেই বসে পড়ল। হাত ধরে টেনে রন্টুকেও পাশে বসাল।

অপ্রস্তুতভাবে মা বললেন, না, না, তা কেন। তবে এর আগে যখন এসেছিস, খবর দিয়েই এসেছিস। তাই বলছিলাম।

লীনা আবার তেমনি করে হাসলে ঃ তখনকার সঙ্গে এখনকার তুলনা করো না, মা। এখন কখন আসব, কখন যাব, কিছুরই ঠিক নেই।

ছ'মাস আগে লীনা বিধবা হয়েছে। তারপর এই প্রথম পিত্রালয়ে আসে। কথাগুলি তার বিপর্যস্ত জীবনের ইঙ্গিতমাত্র।

—কার সঙ্গে এলি ?

—সেজঠাকুরপো পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

—কই সে ?

—তাঁর কাজ আছে। তিনি চলে গেলেন।

এ বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া অনেকক্ষণ আগে শেষ হয়ে গেছে।

মেয়ের শুষ্ক মুখের দিকে চেয়ে মা জিজ্ঞাসা করলেন, খাবি ত ? না খেয়ে এসেছিস ?

লীনা আবার হাসলে ঃ খেয়েও আসি নি, খাবও না।

—সে আবার কি ?

লীনা বললে, আজ একাদশী, মা।

লীনা আবার হাসল। তেমনি করুণ-সুতীক্ষ্ণ হাসি। মায়ের বুকের মাঝখানে গিয়ে বিঁধল।

মা জিজ্ঞাসা করলে, সঙ্গে জিনিষপত্র কই ?

বাঁহাতের কাগজে মোড়া প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে বললে, এই ত।

বিস্মিত কণ্ঠে মা জিজ্ঞাসা করলে, ওতে কি আছে ?

—একখানা শাড়ি।

—তুই কি আজকেই চলে যাবি ?

—না। লীনা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসলে।

—তবে ? আর কাপড় আনিস নি ত ?

—কোথা পাব ?

—তোর আর কাপড় নেই ?

—না।

বৈধব্যের পর লীনা এই প্রথম বাপের বাড়ী আসছে। বলতে গেলে এক বস্ত্রে। মা বুঝলে, কিছু গোলমাল আছে। সেখানে হয়ত সুবিধা হচ্ছে না। লীনা এখানেই থাকবে। কিন্তু, তা যদি হবে, ওর গহনার বাক্সটা আনে নি ত!

সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলে।

—সেটা ওরা রেখে দিলে।

—রেখে দিলে!

—হ্যাঁ। বললে, ওটা নিয়ে যাবার দরকার নেই, এইখানেই থাকবে।

লীনা জোরে জোরে হেসে উঠল। হাসিটা খুব সুস্থ বোধ হল না।

বললে, সেই কথাই ত ভাবছি মা আজ ক'দিন থেকে। লেখাপড়া শিখি নি যে কিছু করে খাব। তুমি যতদিন আছ, দুটো খেতে-পরতে পাব। তার পরে কি হবে। শুধু দাদাদের ব্যাপার ত নয়, বৌদিরাও আছে। তারা নাও দেখতে পারে।

মায়ের বুকের ভেতরটা কিরকম করে উঠল। তাড়াতাড়ি বললে, সেকথা এখন থেকে ভাবতে হবে না। ঘরে গিয়ে বসবি চল।

সুখে দুঃখে বছর দুই কাটল।

মায়ের শরীর বোধ করি মেয়ের চিন্তাতেই ভেঙে আসছে। যত ভেঙে আসছে, সংসারের ভার ততই বৌমাদের হাতে চলে যাচ্ছে।

লীনা বুঝলে, মা আর বেশি দিন বাঁচবে না। তারপরে?

তারপরে কি তা সে জানে না; তার কল্পনাতেও আসে না। মনের মধ্যে শুধু এইটুকু বল আছে যে, গঙ্গা ত শুকিয়ে যাবে না।

কিন্তু রন্টু?

লীনা চলে গেলে তাকে কে দেখবে? সে কি করে মানুষ হবে? মনকে প্রবোধ দেয়, ব্যাটা ছেলে ত, মোট বয়েও খেতে পারবে।

বলে বটে, কিন্তু তার কথাবার্তায়, হাসি চালচলন দেখে অসুস্থ শরীরেও মা ভয় পান।

লীনা কি পাগল হয়ে যাবে নাকি?

লীনার মাকে দেখতে রমেশ মাঝে মাঝে আসে। ওরা আগে এই বাড়ীরই অন্য অংশে থাকত। এক বাড়ীর মতই হয়ে গিয়েছিল ওদের সঙ্গে। লীনা তাকে বরাবর দাদা বলে এসেছে। আজও বলে।

রমেশ এখন ভাল চাকরি করে। কষ্ট করে এ বাড়ীতে আর থাকে না। ক'খানা বাড়ীর পরে একটা গোটা বাড়ী নিয়ে রয়েছে। বাবা মারা গেছেন। বিধবা মা, গুটিকয়েক নাবালক ভাই-বোন, আর সে নিজে। এই তার সংসার।

ছেলেটি বড় ভাল।

এ বাড়ী প্রায়ই আসে। লক্ষ্য করে, লীনার মা যেন ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছে।

একদিন জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এমন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন কাকীমা? অসুখটা কি?

অসুখটা যে কি লীনার মা কোনদিন কাউকে বলে নি। ছেলেদের না, বৌদেরও না। তার কেমন মনে হল রমেশকে বোধ হয় সেকথা বলা যায়। ছেলেটি ভাল। তাকে মায়ের মতই ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

বললে, সেকথা কাউকে কোনদিন বলি নি। আজ তোকেই বলব। আমার অসুখ কি বুঝতে পারছিস না?

রমেশ ভয় পেয়ে গেল। বললে, না।

—আমার অসুখ লীনা। ওর কি হবে? আমি না থাকলে কে ওকে দেখবে? ভেবে আর দিশে পাইনে রে।

তার চোখ ছল ছল করে উঠল।

মা বলতে লাগল, দেওররা গহনাগুলো আটকে রেখে এক বস্ত্রে ওকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। তার পর থেকে তাদের আর কোন পাত্তা নেই। আর পাত্তা দেবে বলেও মনে হয় না। বৌমাদের ভাবগতিকও ভাল বোধ হচ্ছে না। আমি চোখ বুঁজলে ওরা যে মেয়েটাকে দেখবে, তেমন ভরসা পাচ্ছি না। মেয়েটাও নিজের কথা ভাবছে নিশ্চয়। ক'দিন থেকে লক্ষ্য করছি, ওর মাথাটাও যেন ঠিক নেই। বোধ হয় ভেবে-ভেবেই। আমি কি করি বল্ ত?

বলতে বলতে মায়ের গলা বুঁজে এল। চোখ দিয়ে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

রমেশ চুপ করে বসে রইল।

একটু পরে বললে, একটা কথা বলব, কাকীমা? কিছু মনে করবেন না ত?

একটা অজানিত আশঙ্কায় মায়ের বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল। শুষ্ককণ্ঠে বললে, কি কথা?

একটা ঢোক গিলে রমেশ বললে, বলছিলাম কি, ওর একটা বিয়ে দেওয়া যায় না?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত মা বিছানায় ছিটকে উঠে বসলেন: বলিস্ কি রমেশ! ওকথা মুখেও আনতে নেই। বিধবার বিয়ে!

—এখন ত আকছার হচ্ছে কাকীমা। এই জন্যেই আরও হচ্ছে। দেওর যখন বিধবা ভাজকে আশ্রয় না দেয়, ভাই যখন বিধবা বোনকে আশ্রয় না দেয়, তখন তার আর আশ্রয় কোথায়?

যুক্তি অকাট্য, কিন্তু সংস্কার তার চেয়েও বড়।

মা বললে, না, না, ওকথা নয় রমেশ। তুই অন্য উপায় ভাব।

রমেশ নিচে নামতেই লীনার সঙ্গে দেখা।

লীনা বললে, তোমরা আমার বিয়ে দিচ্ছ রমেশদা?

রমেশ তাড়াতাড়ি বললে, না। কে বললে?

—বলবে আবার কে? আমি নিজের কানেই শুনলাম যে। কিন্তু আমাকে কে বিয়ে করবে বল ত?

লীনা খিলখিল করে হেসে উঠল।

আমতা আমতা করে রমেশ বললে, যদি কেউ করে। বলা ত যায় না।

—দেখ।

লীনা একটা পাক দিয়ে চলে গেল।

লীনা বোধ হয় তক্কে তক্কে ছিল। এর পরে একদিন রমেশ আসতেই লীনা তাকে পাকড়াও করলে। ঠোঁটে সেই অপ্রকৃতিস্থ হাসি।

জিজ্ঞাসা করলে, পাত্র পেলে রমেশদা?

থতমত খেয়ে রমেশ বললে, চেষ্টা করছি।

—কর। কিন্তু পাবে না।

—কেন পাব না?

লীনা ওর একান্ত সন্নিকটে সরে এসে ফিসফিস করে বললে, রণ্টু রয়েছে যে। আমার ভার কেউ নিতে পারে। কিন্তু রণ্টুর ভার কে নেবে?

—দেখি, যদি কেউ নেয়।

—কেউ নেবে না। তুমি নিতে পার? পার না। যা তুমি পার না, তা অন্যে পারবে, এ আশা কর কেন?

লীনা খিলখিল করে হেসে উঠল: তার চেয়ে বরং এক কাজ কর।

—কি কাজ?

—তুমি ত বিয়ে-থা করলে না। রণ্টুর ভারটা যদি তুমি নাও।

—তা হলে কি হবে?

—তা হলে আমি নিশ্চিন্তে গঙ্গায় ডুব দিয়ে মরি। আমি আর পারছি না, রমেশদা। ভয় হচ্ছে, পাগল না হয়ে যাই।

বলে রমেশের দু'পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

রমেশের মুখ থেকে একটা কথাও বেরুল না। না সান্ত্বনার, না তিরস্কারের। লীনা পা ছেড়ে দিতে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে গেল।

কিন্তু কয়েকদিন পরে আবার সে একদিন এল। তার মনের মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ চলছে, তার মুখ দেখেই বোঝা যায়।

লীনাকে আড়ালে ডেকে চুপিচুপি বললে, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আমি তোমাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত।

—তুমি!

উত্তেজনায় লীনার চোখ-মুখ দিয়ে যেন আগুন বার হচ্ছিল। রমেশের কথা সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

বললে, তুমি? সত্যি?

—হ্যাঁ।

লীনার সর্বশরীর ঠকঠক করে কাঁপছিল। বললে, সত্যি? সে ভাগ্য কি আমার হবে?

লীনাকে বুকের কাছে টেনে এনে সস্নেহে রমেশ বললে, সত্যি। আসবে আমার ঘরে?

—যাব। যদি সে ভাগ্য করে থাকি। কিন্তু তুমি ঠাট্টা করছ না ত?

—না।

—কিন্তু রণ্টু?

—সেও তোমার সঙ্গে আসবে।

রমেশের বাহুপাশ থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে মুক্ত করে নিয়ে লীনা বললে, না। গত জন্মের জের নিয়ে আমি নতুন জন্ম সুরু করব না।

—তা হলে?

লীনা ধীরে ধীরে বললে, একটু ভাবতে দাও। কয়েকটা দিন ভাবতে দাও।

দিনকয়েক পরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-সংলগ্ন বাগানে গঙ্গার ধারে সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি মেয়ে আর একটি শিশুকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল।

মেয়েটি ঘোরে-ফেরে। শিশুটিকে একবার বুকে চেপে ধরে, একবার নামিয়ে দেয়, আবার বুকে চেপে ধরে। খাবারের দোকানে দাঁড় করিয়ে মাঝে মাঝে এটা-ওটা খাওয়ায়। আবার গঙ্গার ধারে ফিরে আসে।

এমনি কয়েকবার চলল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘন হয়ে আসে।

হঠাৎ একসময় গঙ্গায় ঝপাং করে একটা শব্দ হল। এবং বিদ্যুৎবেগে মেয়েটি সেই অন্ধকারের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল।

—রমেশদা!

রমেশ তার বাড়ীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। চমকে চেয়ে দেখে লীনা।

বিস্মিতভাবে বললে, লীনা! হঠাৎ এ সময়ে?

—হঠাৎই ত। মানুষ হঠাৎ আসে, হঠাৎ চলে যায়, জান না? আমিও হঠাৎ এলাম। সেই যে তুমি বলেছিলে। দেখ, একলা এলাম। পিছনের জের নিয়ে নয়। হল ত? এইবার হল ত?

বলেই একটা অট্টহাস্য করে উঠল।

লীনা উন্মাদ হয়ে গেছে।

—*—

প্রাচীন পোলিশ নৃত্য

মাঙ্গলিক উৎসবের নৃত্য

পুণ্য জীবন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দীর্ঘ যদি না হয় জীবন, দুঃখ কি বা তায়—
তীর্থ হউক, ভক্তি ও প্রেম ত্যাগে তিতিক্ষায়।
ভক্ত সাধু বীর মহতের লভুক সন্নিধি,
নবরত্ন সভার হাওয়া পাক নিরবধি,
বাণীর মৃগনাভির গন্ধে মন যেন মাতায়।

২

যুগের যুগের পরশমণি স্বদেশ বিদেশের,
স্নেহপরশ পায় যেন সে মহাপুরুষদের।
বুক ভরে তার ফোটে যেন সদাই পারিজাত।
কীর্ত্তিঘন জীবন করে নিত্য ছায়াপাত,
মুহূর্ত্ত তার যুগের চেয়ে অধিক আদরের।

৩

বুকে তাহার 'বদরিকা' 'নৈমিষারণ্য'
দেবতারা মর্ত্তে আসে তাহারি জন্য।
হরিদ্বারের মত তাহার পুণ্য জীবনবেলা,
বসে সেথা সর্ব্বজাতির পূর্ণ কুম্ভমেলা
হয়েছে যা মহাকালের প্রসাদে ধন্য।

৪

তেমন জীবন দেব তারাও আনন্দেতে চায়—
সুরভিত যজ্ঞ হোমগন্ধী সে ধোঁয়ায়।
জীবন ত নয়, ছোট সে ফুল বড়ই বেশী দর,
প্রজাপতির চম্পকহেম—মাণিক্য কেশর—
লক্ষ মহামন্ত্র লেখা একটি যার পাতায়।

যাবার বেলায়

নরেন্দ্র দেব

ফুরাল যে পথ, এসে ত পড়েছি সীমানায়।
কি ভাবে এসেছি ভেবে মরি ভয়ে, লাজে।
বেঁধেছিনু বাসা কবে এ মাটির তরু-ছায়,
সে নীড় ছাড়িতে বুকে বড় ব্যথা বাজে।
অনেক পিছনে ফিরে চাই যবে আনমনে,
ধরণী অসীম—মনে হয় শেষ নাই ;
জীবন বীণাটি থেমে গেছে কবে কোন ক্ষণে,
সুরমূর্চ্ছনা শুনিতে আর না পাই
লুকাল কোথা সে তরুণোচ্ছল হাসি গান
দেহতটে আর নাচে না কামনা-ঢেউ,
সহসা কেন যে হিম হয়ে গেল সারা প্রাণ,
পরশমণিটি চুরি কি করেছে কেউ ?

কার কালোছায়া ছেয়েছে আমার চিদাকাশ,
ঢেকেছে মনের মেদুর মুকুরখানি।
সে কি গো মৃত্যু ? মরজগতের চির ত্রাস,
দাঁড়াল দুয়ারে মুক্তি বারতা আনি।
স্বাগত জানাই মহাকাল, এস হে মরণ,
হিসাব-নিকাশ করিনি ত কিছু আমি,
শুধু দুষ্কৃতি, যতকিছু রেখেছি স্মরণ,
ত্রুটি-বিচ্যুতি জমে ওঠে দিবা-যামী।
এনেছ আদেশ ধূলিতলে মিশিয়া যাবার ?
চল্, তাই যাই, আর বাঁচা অপরাধ।
নবজন্মের বরদান পাব কি আবার,
পূর্ণ করিতে অপূর্ণ যত সাধ ?

যদি করে থাকি ক্ষমাহীন কোন পাপ
দণ্ড লইব নতশিরে প্রভু আজ,
শুনেছি ত দেয় মালিন্য ধুয়ে অনুতাপ,
নির্মল করে নাও মোরে মহারাজ !
আছে কি কোথাও হেন জন যার নাহি দোষ ?
অন্যায় কভু করেনি জীবনে যেবা ?
থাক যত দোষ, করিব না আফশোস,
নির্দোষ তব সৃষ্টিতে আছে কেবা ?
যাবার বেলায় চুপি চুপি শুধু বলে যাই,
স্বর্গ, নরক মানি না কিছুই আমি,
শুধু চাই, যিনি জগদীশ্বর—থাক্ বা নাই,
দিক-দেখা সেই অ-দেখা অরূপ স্বামী।

রূপান্তরিতা

শ্রীকালিদাস রায়

উমার বিয়ে হয়ে গেছে, থাকে স্বামীর কাছে
সাগর না হোক তের নদী পারে এখন আছে।
প্রতি-প্রাতে পথটি চেয়ে ব'সে থাকি ঠায়,
চিঠির প্রতীক্ষায়।
ছেঁড়া কাগজ পত্র গাদাগাদা
ঘাঁটছে উমার দাদা।
বাড়ীর যত কাগুজে জঞ্জাল
আবর্জনা জমল এতকাল,
ফেরিওলায় বেচতে সবি চায়
আজ সিনেমার খরচাটা সব পেতেও পারে তায়।
চেয়ে দেখে, মনুরে বল্‌লাম—
থাক না ওসব কতই পাবি দাম?
বল্‌লে মনু—এ সব আবর্জনা
এ বাড়ীতে কিছুতে রাখ্‌ব না।
বল্‌লাম 'ওরে', ওগুলো কি দেখ্‌ত দড়ি খুলে
আমার হাতে দে ত ওটা তুলে।
বল্‌লে মনু—ওসব উমার ছেঁড়া বই-এর মোট,
গানের খাতা, প্রশ্নপত্র, ইতিহাসের নোট,
স্বরলিপি, ডাইরি ছেঁড়া, কলেজ-ম্যাগাজিন
সবই মূল্যহীন।

বল্‌লাম—হা হা করে, ওরে রাখরে সবি রাখ,
যেমন আছে তেম্‌নি ওসব থাক।
বেচে ওসব কি হবে তোর লাভ,
ফিরে এসে চাইলে তারে কি দিবি জবাব?
ও যে আমার পরম আবিষ্কার,
অনেক টাকা মূল্য যে ওর বিরহী পিতার।
ওগুলোতে আছে উমার অনেকখানি মাখা,
পাতায় পাতায় তার আঙুলের ছাপ যে আছে আঁকা।

ওরা আমার স্মরায় যে রে সেই মেয়েটির হাসি,
ঘরের লক্ষ্মী ছিল যে, আজ পরের ঘরে দাসী।
বল্‌লে মনু—ওকি কথা বলছ তুমি বাবা,
সে ত খুবই সুখেই আছে মিথ্যে তোমার ভাবা।
দুমাস পরেই আসবে ফিরে দেখতে পাবে তাকে,
বললাম আমি—দেখ্‌তে পাব কাকে?
সেই মেয়েটি যার ছিল হায় কণ্ঠ ভরা গানে,
চলায় নাচন, সজল লোচন অল্পে অভিমানে,
দোলন চাঁপা ফুলটি গাঁথা পিঠে দোলন বেণী—
পিছে পিছে ছুটত যার ঐ আদর পোষা মেনী,
শাসনহারা ভাষণ ছিল মুখে—
এটা ওটা চেয়ে খাওয়া রান্নাঘরে ঢুকে
কথায় কথায় আবদেরে সুর—দেখতে পাব তায়?
বইখাতা তার দে রেখে দে আমার বিছানায়।
আর কিছু সে যায় নি হেথায় রেখে,
ঐগুলি থাক সান্ত্বনা আর শান্তি পাব দেখে।
ওতে যে তার অনেকখানি আছে,
প্রবাসিনী উমারে মোর দেয় এনে মোর কাছে।
আসবে সে কি ফিরে
কলকূজন কণ্ঠে নিয়ে, মোদের স্নেহ নীড়ে?
কবিগুরুর গান কি গাবে আর?
হয়ত হবে বর্ণনীয় নিজেরই সংসার।
শ্বশুরবাড়ীর হয়ত শাসন তায়
পরিণত করেছে এক ভদ্রমহিলায়।
বিদায় দিলাম যারে নয়ন নীরে
আসে না হায় তার উপরে সে অধিকার ফিরে।

চারণ

শিল্পী : আশুতোষ মিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

চিমনি

॥ ১ ॥

কৈশোরে একটা সময় আসে যখন মানব-শিশুর পদ-যুগল সকল বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া দ্রুত বাড়িয়া চলে। জুতা কিনিয়া দিলেই দুই মাসের মধ্যে তাহা আর পায়ে হয় না। ফলে বর্দ্ধনশীল পদযুগল জুতার সঙ্কীর্ণ বন্ধনের মধ্যে নিষ্পেষিত হইয়া জুতার মায়া ত্যাগ করিয়া নগ্ন অবস্থায় গৃহে, স্কুলে ও খেলার মাঠে ধাবমান হয়। এই সময়টা মানুষের বড় দুঃসময়। ক্রমাগত মা-বাবার অন্যায় অভিযোগ ও শাসনে মানুষ বিধ্বস্ত হইয়া উঠে। "বাবা রে বাবা, এই সেদিন নূতন জুতো-জোড়া কিনে দেওয়া হ'ল; না প'রে প'রে শুকিয়ে ফেললে! পা দুখানাও দেখতে না দেখতে এক জোড়া সালতির মত হয়ে উঠেছে। কুলি-মজুরদের মত খালি পায়ে দৌড়ে বেড়ালে আর কি হবে বল? আর জুতো পাবে না, থাক গিয়ে খালি পায়ে।"

"পায়ে লাগে বলেই ত ও-জুতো পরি না। ফোস্কা পড়ে একাকার হয়ে যায়।"

"জুতো পরা অভ্যেস করলে তবে ত ফোস্কা পড়া বন্ধ হবে? ধাঙ্গড়ের মত খালি পায়ে বেড়াবে ত কি হবে! আসুন তোমার বাবা, নূতন জুতোর বদলে খুব ঘা-কয়েক পিঠে পড়লে শিখবে এখন কি ক'রে জুতো পরতে হয়। হতভাগা ছেলে, লজ্জা নেই!"

বড় বড় হাত-পা, বয়সের আন্দাজে লম্বা-চওড়া, ফ্যালফ্যালে-চাহনি-বালক সন্তোষ মায়ের এই অন্যায় শাসনে চুপ করিয়া রহিল। গত দুই বৎসর যাবৎ এই চলিতেছে। জুতার পরে জুতা কেনা হয় আর ছোট হইয়া যায়। দুই বৎসরের পুরান কোটটার আস্তিন কনুইয়ের কাছে উঠিয়াছে ও লম্বায় নাইয়ের নিকট আসিয়া আর নামে না। মাথায় চুল কদম-ছাঁটে ছাঁটা এবং হাত-মুখ বিশেষ পরিষ্কার নহে। আট হাত ধুতিখানা কোন রকমে হাঁটুর নীচে আসিয়া ধুলা-মাখা পা দুখানাকে আরও যেন বড় করিয়া দেখাইতেছে।

"বলি, এই রকম বাঁদর সেজে যে স্কুলে যাও ত পোড়ারমুখো মাষ্টাররা কি কিছু বলে না? কি ঘেন্নার ঘেন্না!"

সন্তোষের চোখ দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল। বার-দুই ঢোক গিলিয়া বলিল, "দশ হাত ধুতি দেবে না, মান্ধাতার আমলের গেঞ্জির মত আঁট কোট আর খালি পা; তা দেখে রোজ যদু মাষ্টার বকে।"

"বেশ করে বকে! যাও কেন ঐ রকম ক'রে? দিনরাত প'রে কোটটাকে শেষ ক'রে এনেছ এরই মধ্যে! তোমার বয়েসের ছেলে আবার আট হাত কাপড় ছাড়া কি পরবে? তালগাছের মত লম্বা হচ্ছ ব'লে কি কোঁচান ধুতি আর গিলে-করা কুর্ত্তা পরিয়ে স্কুলে পাঠাতে হবে না কি?"

তালগাছের মত লম্বা, অজাতশ্মশ্রু, খোঁচা চুল ছেলেটি তাহার বড় বড় বেমানান হাত-পা লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। বয়স মাত্র বার বৎসর; কিন্তু দৈর্ঘ্যে বয়স্কদিগের সমান সমান। হাত-পায়ের স্থূলত্বের তুলনায় বিস্তার অতিরিক্ত। খেলার সাথীরা নাম রাখিয়াছে "চিম্‌নি"। বাবা বলেন, "উৎপাত! আমাদের তিন কুলে এ রকম বিদ্‌ঘুটে লম্বা ছেলে কেউ নেই। তিতুর বয়স ওর চেয়ে পাঁচ বৎসর বেশী কিন্তু ও তার চেয়ে আধ হাত মাথায় বড়। এখনি আমার সমান সমান, বয়স হ'লে না জানি কি হবে?"

ঝি বলিল, "ও খোকা, দুধটুকু খেয়ে যাও।" সন্তোষ হাত-পা সামলাইয়া চৌকাঠে মাথা বাঁচাইয়া রান্নাঘরে গিয়া দুধের বাটিটা হাতে লইল। এক পোয়া বাটিটা তাহার হাতে খেলনার মত দেখাইতে লাগিল। ঝিকে বলিল, "এইটুকু দুধে কি হবে? বড় বাটিতে দিতে পার না?"

ঝি বলিল, "ওমা, ঐ ত তোমার বাটি খোকা, আমি কি বাটি বদলেছি না কি?"

সন্তোষ বলিল, "হ্যাঃ, আমার বাটি! আমার দু-চুমুকও হয় না।"

মা পাশের ঘর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অ ঝি, কি কথা-কাটাকাটি হচ্ছে?"

ঝি বলিল, "ওমা খোকা বলছে দুধের বাটি ছোট, ওর পেট ভরে না।"

মা উত্তর দিলেন, "ওর মাপের বাটি কোথায় পাব? ওকে আর এক হাতা দুধ দিয়ে দেও।" সন্তোষ ঝির উপর জোর করিয়া আর এক বাটি পুরা দুধ আদায় করিয়া খাইয়া খেলিতে চলিল।

মাঠে যাইতেই খেলার সঙ্গীরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে চিম্‌নি এসেছে, চিম্‌নি এসেছে।"

কয়েকজন গিয়া হাত তুলিয়া তাহার মাথা ছুঁইবার অছিলায় তাহাকে দু চার চাঁটি মারিয়া বলিল, "দেখি দেখি, আজ লম্বায় কতটা বাড়লি?" সন্তোষ ওরফে চিম্‌নি নিঃশব্দে সকল অত্যাচার-সহ্য করিয়া গেল, কেননা সে বেশ বুঝিয়া লইয়াছিল যে, তাহার পক্ষে এতটা লম্বা হওয়া একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইয়াছে।

চোর-চোর খেলা হইতে লাগিল। সন্তোষ একবার চোর হইল। মোটা সুকুমার তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে মুখ ভেঙাইয়া দ্রুত পলাইবার চেষ্টা করিল। সন্তোষ এক লম্ফে তাহার লম্বা হাতখানা বাড়াইয়া সুকুমারকে খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিল। সুকুমার গাঁ গাঁ করিয়া করিয়া চেঁচাইতে লাগিল, "চিম্‌নির হাত পাঁচ গজ লম্বা, এক একবার পা ফেললে দশ গজ চলে যায়। ও কেন ও রকম ক'রে ধরবে?"

সন্তোষ বলিল, "বা রে! ঠিক ধরেছি ত। ও ফুটবলের মত মোটা গোল ব'লে পালাতে পারল না ত আমার দোষ হ'ল না কি?"

সুকুমার ভেঙচাইয়া বলিল, "আমি ফুটবল? তুই তালগাছের মত লম্বা, বাঁশের মত লম্বা লম্বা ঠ্যাং; ফের ফুটবল বলবি ত এক ঘুষি লাগাব!"

সন্তোষ বলিল, "লাগা ত দেখি ঘুষি?"

সুকুমার দৌড়িয়া সন্তোষকে ঘুষি মারিতে যাইতেই সন্তোষ হাত বাড়াইয়া তাহার মাথার চুল ধরিয়া ফেলিল। সুকুমার হাঁউমাঁউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া সন্তোষের হাতে কামড়াইয়া দিল। সন্তোষ তাহাকে এক লাথি কষাইয়া উল্টাইয়া ফেলিল।

অতঃপর কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ছেলেরা অচিরাৎ দুই দলে ভাগ হইয়া পরস্পরকে চড় কিল লাথি লাগাইতে লাগিল। গোলযোগ শুনিয়া পাড়ার বয়স্ক লোক দু-চারজন বাহির হইয়া আসিলেন। লম্বা বলিয়া সকলের চোখ সন্তোষের উপরই পড়িল। একজন যাইয়া সন্তোষকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিলেন ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন, "এত বড় ছেলে হয়ে ছোট ছোট ছেলেদের মারপিট করছে, লজ্জা করে না? চল তোমার বাবার কাছে!"

বন্দী অবস্থায় সন্তোষ পিতার দরবারে আনীত হইল।

প্রমাণ হইয়া গেল যে সে অতি অল্প বয়স্ক শিশুদের দলে ভিড়িয়া তাহাদের উপর জোর-জুলুম মারপিট করিতেছিল॥ পিতা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আজ থেকে আর তুমি মাঠে খেলতে যাবে না। বাড়ীতে বিকেল বেলা হাতের লেখ অভ্যেস করবে।" কাঁদ-কাঁদ হইয়া বেচারা সন্তোষ বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। রাত্রে পিতা সন্তোষের মাতাকে বলিলেন, "ছেলেটা গুণ্ডা হয়ে উঠেছে। আজ প্রায় কয়েকটা ছেলেকে মেরে আধমরা ক'রে ফেলেছিল। ওর উপর একটু নজর রেখ।"

মা ঝাঁঝিয়া বলিলেন, "আমি তোমার ছেলে সামলাতে পারব না। পুলিস পাহারা বসাও। আর পাড়ার ছেলেগুলিও সব বড় শান্তশিষ্ট নয়! মেরে থাকে দু-চারটেকে ত বেশ করেছে!"

সকালে সন্তোষ স্কুলে যাইবার সময় মা বলিলেন, "লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, স্কুল থেকে ফিরে এসে শোবার ঘরে বন্ধ থাকবে। মারামারি ক'রে বেড়াতে লজ্জা করে না?"

সারা বিকাল সেদিন সন্তোষ ঘরে বন্ধ রহিল। সন্ধ্যাবেলা খাইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে গিয়া মা দেখিলেন সে জড়সড় হইয়া তক্তপোষের উপর ঘুমাইয়া রহিয়াছে। তাহার প্রকাণ্ড দেহটার উপর মুখখানা একান্ত কচি ছেলের মত অসহায়। মায়ের প্রাণে পুরানো স্মৃতি জাগিয়া উঠাতে তিনি সন্তোষের মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে অনেক আদর করিয়া জাগাইলেন। বলিলেন, "সোনামাণিক, আর কখন ঐ সব পাজি ছেলেগুলোর সঙ্গে যেও না খেলতে।" সন্তোষ মায়ের আদরে হঠাৎ চীৎকার করিয়া ক্রন্দন সুরু করিল। বলিল, "আমি ওদের মারি নি। ওরাই আমায় মারছিল। রোজ মারে।"

॥ ২ ॥

চার-পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সন্তোষ বর্ত্তমানে ছয় ফুটের অধিক লম্বা হইয়াছে। এই কয় বৎসর তাহার জুতা, জামা ও কাপড় লইয়া তাহার পিতামাতা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আট হাত ধুতিগুলা হাঁটু ছাড়াইয়া উঠিবার পর তাঁহারা বাধ্য হইয়া তাহাকে দশ হাত কাপড় কিনিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু বৎসর ঘুরিতে-না-ঘুরিতে তাহার দশ হাতেও কুলাইত না। বাংলা দেশের চিরানুসৃত রীতি অনুযায়ী তাহার পিতার পুরানো ওভারকোট, কোট প্রভৃতি সন্তোষের ভাগে আসিয়া পড়িল; কিন্তু পিতার অপেক্ষা সে আকারে অনেকটা বড়, তাই বিরক্ত হইলেও পিতামাতাকে মানিয়া লইতে হইল যে তাহার গায়ে ও-সব জামা-কাপড় হইবে না। অগত্যা তাহাকে চাঁদনির বাজারে লইয়া গিয়া তাহার মাপের কোট জামা করাইয়া দেওয়া হইল। সন্তোষ মহা আনন্দে নূতন জামা-কাপড় পরিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। জুতা, সাত হইতে আট, আট হইতে নয় করিয়া ক্রমশঃ সাইজে এগারতে পৌছাইল। বাবা বলিলেন, "এর জন্য এর পর একটা পুরা মহিষ লাগবে জুতো করাতে।"

মা বলিলেন, "আজকাল যে ক্যামবিশের জুতো বেরিয়েছে তাই কিনে দাও।"

সন্তোষ ইহার পর চামড়ার জুতা ত্যাগ করিয়া কাপড়ের জুতা পরা আরম্ভ করিল। আহারে, তাহার কিছুতেই পেট ভরে না। দুধ খাওয়া দূরে থাকুক, ভাত ডাল মাছ সে যতটা খাইতে চায় তাহা তাহাকে কেহ দেয় না। দুই থালা ভাত খাইয়া আরও চাহিলে মা বলেন, "আর খেলে অসুখ করবে যে। তোর খিদে নয় ত, লোভ। যা খাস তাই ত গায়ে লাগে না। হাড়-বের-করা চেহারা, অত জোর ক'রে গিলিস নে।"

সন্তোষ বলে, "হ্যাঃ, খেতে দেবে না আর বলবে হাড়-বের-করা! যাও, আর চাই না তোমার ছাইয়ের ভাত!" বলিয়া রাগিয়া উঠিয়া চলিয়া যায়।

সিমলা হইতে সেবার তাহার মামা আসিয়া তাহাকে দেখিয়া "হোঃ হোঃ" করিয়া হাসিয়াই আকুল। বলিলেন, "আরে বাস্ রে, এ কি কাণ্ড হয়েছে? একে কি টেনে টেনে লম্বা করা হয়েছে না কি? কি সর্ব্বনাশ! এর যে কান মলতে হলেও মই লাগিয়ে উঠতে হবে।"

সন্তোষ অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বারে বারে চোক গিলিয়া, পা বদলাইয়া ও কান চুলকাইয়া সে নিজের অসোয়াস্তি এড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকলে খাইতে বসিলে মামা শীঘ্রই বুঝিলেন যে সন্তোষ ইচ্ছামত খাইতে পাইতেছে না। তিনি ভগ্নীকে বলিলেন, "ওকে একদিন হোটেলে নিয়ে খাইয়ে দেখতে হবে কত খেতে পারে।"

সন্তোষের মাতা বলিলেন, "হ্যাঁ, তবেই হয়েছে; ও তা হ'লে লোভ ক'রে খেয়ে অসুখ ক'রে বসবে এখন। বাড়ীতে যা খায় তাতে এমনি তিনজন লোকের পেট ভরে যায়। ওকে ডাক্তার দেখাব ভাবছি। পেটে পিলে-টিলে হ'ল না কি? এত খায় অথচ শুধু ক'খানা হাড়।"

মামা কিন্তু সন্তোষের হাড় কয়খানার দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেখিয়া ভাবিলেন, উহার শুধু হাড়গুলিরই খোরাক কম হইবে না। ফুটবল খেলায় মাঠে লইয়া গিয়া খেলাশেষে মামা সন্তোষকে বলিলেন, "চল্ হোটেলেই, দেখি তুই কত খেতে পারিস।" সন্তোষ বলিল, "মা বকবেন না ত? আমি ত কখনও হোটেলে খাই নি।"

মামা বলিলেন, "চল্, চল্, আমার সঙ্গে যাবি ত মা কিছু বলবেন না।"

উভয়ে পদব্রজে ময়দান পার হইয়া চৌরঙ্গীর উপরে একটি দেশী-বিলাতি-মেশান হোটেলে প্রবেশ করিলেন। সন্তোষ প্রকাণ্ড ঘর, আলো, পাখা ও উর্দ্দী-পরিহিত খানসামার ভীড় দেখিয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। মামা বলিলেন, "কি খাবি? বয়, ইধার আও।" বয় আসিয়া দাঁড়াইতে মামা বলিলেন, "টোষ্ট রুটি, মাখ্‌খন, অমলেট লেয়াও পহিলে। পিছে মাটন কাটলেট আউর ফাউল কারি পোলাও লেয়ায়গা।"

বয় চলিয়া গেল ও কিছুক্ষণ পরে হুকুমমত ভর্জ্জিত ডিম্ব প্রভৃতি লইয়া আসিল। সন্তোষ নিজের বড় বড় হাত দুখানা নাড়াচাড়া করিয়া বসিয়া রহিল। মামা বলিলেন, "খা!" সন্তোষ বলিল, "হাত ধোয়া হয় নি যে!" "ঐ কাঁটা আর ছুরি এই রকম করে ধরে খা।"

সন্তোষ ছুরি কাঁটা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া সুবিধা করিতে পারিল না। মামা বলিলেন, "থাক, হাত দিয়ে খাও।"

অতঃপর যাহা ঘটিল তাহার সম্পূর্ণ বর্ণনা সম্ভব নহে। দুইজন বয় ক্রমাগত দৌড়াদৌড়ি করিয়া টোষ্ট, মাখন, ডিমভাজা, কাটলেট আনিতে লাগিল এবং সন্তোষ সদ্য নিদ্রা হইতে উত্থিত কুম্ভকর্ণের ন্যায় সেই সকল মালমশলা উদরসাৎ করিতে লাগিল। মামা স্তব্ধবিস্ময়ে তন্ময় হইয়া সেই অপূর্ব্ব ভোজনলীলা দেখিতে লাগিলেন। কয়েক দফা ডিম রুটি কাটলেট ধ্বংস হইলে পর মামা বয়দিগকে ইসারা করিয়া পোলাও কারি আনিতে আদেশ করিলেন। সন্তোষ অবাধে দুই-তিন প্লেট পোলাও কারি খাইয়া হাসিমুখে মামাকে বলিল, "বেশ খেতে!"

মামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর খাবি?"

"হ্যাঁ, আর এক থালা খেতে পারি।"

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মামা সন্তোষের মাকে বলিলেন, "সন্তোষ আর আমি আজ রাত্রে আর খাব না, আমরা হোটেলে খেয়ে এসেছি।"

ভগ্নী বলিলেন, "কি ছাই খেয়েছ? দুখানা লুচি পাঁঠার ঝোল দিয়ে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় গিয়ে। খোকা কি এত খেয়েছে যে আর খাবে না?"

মামা বলিলেন, "আঠারটা টোষ্ট, দশটা ডিমের অমলেট, আটখানা কাটলেট, চার প্লেট পোলাও আর কারি।"

মা গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, "ওমা কি হবে গো! ওর অসুখ করবে না ত? ছোড়দা, কেন দিলে ওকে অত খেতে?"

মামা বলিলেন, "আঃ থাম না, ওর কিছু হবে না, শক্ত-হাড় জোয়ান ছোকরা, কি এমন খেয়েছে। ওকে রোজ দুটো ক'রে ডিম দিও ত, দেখবে কেমন চেহারা হবে।"

বলাবাহুল্য সন্তোষের এই অতি-ভোজনের ফলে কোন প্রকার অসুখ করিল না। মামা থাকিতে থাকিতে আর দুই-একবার তাহার কপালে ঐ প্রকার ভোজ জুটিয়া গেল। বাড়ীতেও মামার সুপারিশে তাহার জন্য প্রত্যহ দুটা ডিমের ব্যবস্থা হইল। মোটা মোটা হাড়ের উপর ঈষৎ স্থূলত্বের আভাস দেখা দিল।

ক্লাসের ছেলেরা তাহাকে চিম্‌নি বলিয়াই ডাকিত। তাহার যে একটা ভাল নাম আছে তাহা প্রায় সকলে ভুলিয়াই গিয়াছিল। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শক্তি-সামর্থ্যও খুব বাড়িয়াছিল, কিন্তু সে নিজে সে কথা জানিত না। বহু অত্যাচার করিলেও সে "আঃ কেন জ্বালাতন কর" কিংবা ঐ প্রকার কোন কথা বলিয়া চলিয়া যাইত। ছেলেদের তাহাকে

লেঙ্গি দিয়া ফেলিয়া দেওয়া, পিঠে খড়ি দিয়া "চিম্‌নি" লিখিয়া দেওয়া অথবা অপর কোন উপায়ে তাহাকে নাকাল করা একটা নিত্য কর্ম্মের মতন দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সন্তোষ বহু কষ্টে নিজের দীর্ঘ অবয়ব সামলাইয়া এই বহুমুখী অত্যাচারের মধ্যে ছাত্রজীবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। অল্প বয়সে যে-সকল খেলায় সে সময় অতিবাহিত করিত, বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে-সকল খেলার সে বাহিরে চলিয়া আসিল। চোর-চোর, চোর-পুলিস, কুমীর-কুমীর প্রভৃতি খেলা আর চলিত না। হাডুডু খেলা তাহার সহিত কেহ খেলিতে চাহিত না। সকলে বলিত, "চিম্‌নি এত লম্বা, ও এক পা না এগিয়ে সকলকে ছুঁয়ে দেয়; আর ধরে ফেললে এমন হাত-পা ছোঁড়ে যে সকলে জখম হয়ে যায়।" অথচ তাহার ক্ষিপ্রতা এতটা ছিল না যাহাতে সে অপেক্ষাকৃত বড় বড় নামজাদা দলে গিয়া খেলিতে পারে। ফুটবলের ধাক্কাধাক্কিতে সে হাত-পা সামলাইতে না পারিয়া ক্রমাগত পড়িয়া যাইত, নয়ত কাহাকেও অযথা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া 'রেফারী' কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইত। অগত্যা তাহার লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া রাস্তায় ময়দানে ঘুরিয়া বেড়ান ছাড়া অপর কোন গতি ছিল না। কোন দিন কোন বড় খেলা থাকিলে সে বহু লোকের পিছনে দাঁড়াইয়াও বিনা-পয়সায় 'ম্যাচ' দেখিয়া গৃহে ফিরিত। তাহার পিছনের লোকেরা প্রায়ই চীৎকার করিয়া বলিত, " ও মশায়, মাথাটা পকেটে রাখুন না!" সন্তোষ লজ্জিত হইয়া সরিয়া আরও পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইত।

একদিন তাহার স্কুলের একজন ছাত্র খেলার মাঠে তাহাকে 'চিম্‌নি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার ডাক-নামটা বাজারে রাষ্ট্র করিয়া দিল। কিছুদিন যাইতে-না-যাইতে সকলে সর্ব্বত্র তাহাকে 'চিম্‌নি' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। সে দুই-একবার "আমার নাম সন্তোষ" বলিয়া আপত্তি জানাইতে গিয়া সফলকাম না হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল।

একদিন একটি সুসজ্জিত যুবক তাহার পাশে দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ খেলা দেখিবার পরে তাহাকে বলিল, "ও মশায় চিম্‌নি, একটু ধোঁয়া ছাড়ুন না?"

সন্তোষ বলিল, "সে কি, ধোঁয়া কি ক'রে ছাড়ব?"

যুবক হাসিয়া একটা সিগারেট বাহির করিয়া বলিল, "এই যে, এইটে ধরিয়ে ফেলুন; ধোঁয়া ছাড়তে থাকুন!"

সন্তোষ সভয়ে বলিল, "আরে না, আমি ও সব খাই না।"

"খান না, কি হবে? খেয়ে দেখুন-না।"

"না না, বাড়ীতে জানতে পারলে ভীষণ কাণ্ড হবে।"

আশে-পাশের লোকেরা জোরে হাসিয়া উঠিল। "খোকা সিগারেট খেয়েছে জানলে, মা পাখা পেটা করবেন, হাঃ হাঃ হাঃ! ও মশায় চিম্‌নি; ধরিয়ে ফেলুন, ধরিয়ে ফেলুন।"

সকলের টিটকারি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সন্তোষ দু-চারবার চেষ্টা করিয়া সিগারেটটা ধরাইয়া ফেলিল।

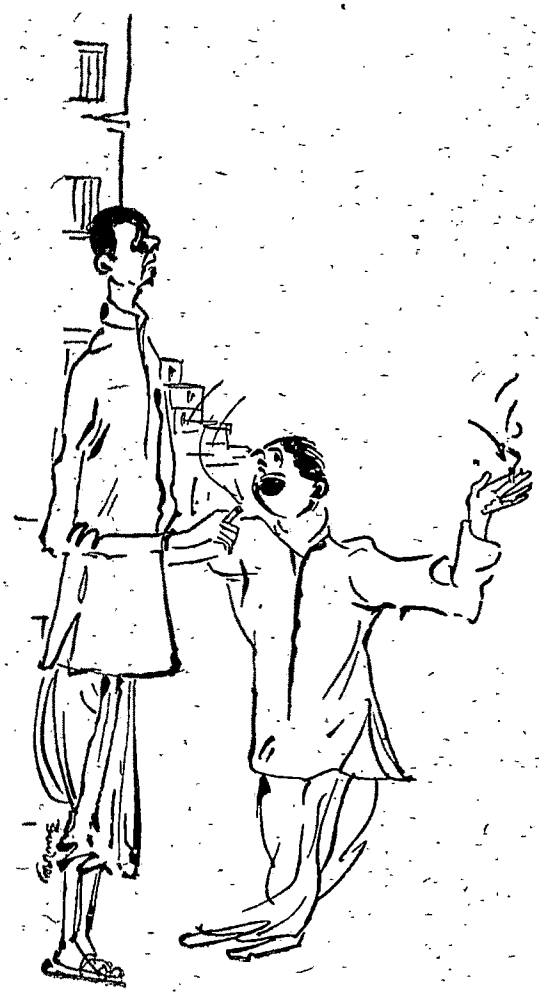

"ও মশায় চিমনি, একটু ধোঁয়া ছাড়ুন না"

একটা জোরে টান দিতেই প্রচণ্ড কাশির ধাক্কায় তাহার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া চারিদিক ঝাপসা হইয়া গেল। সে বহু কষ্টে কাশি থামাইয়া আরও দু-চার টান দিয়া সিগারেটটা ফেলিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিল। সে দূরে একটা নালার পাশে গিয়া বসিল। কেহ জল আনে, কেহ বা সিগারেট-দাতাকে গালি দেয়। এই ভাবে প্রায় ঘণ্টা দুই পরে সন্তোষ কতকটা সুস্থ হইলে পর বাড়ী ফিরিয়া গেল। মা তাহার মুখে সিগারেটের গন্ধ পাইয়া অশেষ লাঞ্ছনা করিলেন। পিতা শাসাইলেন যে সিগারেট ফুঁকিয়া বেড়াইতে হইলে এ বাড়ীতে বাস করিয়া সে প্রকার বখাটেপনা চলিবে না। সন্তোষ লজ্জায় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া না খাইয়া বারান্দার এককোণে একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। ঘুম আসিবার পূর্ব্বে শুনিল পিতা বিরক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, "যেমন চাষাড়ে চেহারা, স্বভাবও তেমনি চাষার মত হচ্ছে!"

॥ ৩ ॥

সন্তোষের বয়স আঠার হইল। এখন সে লম্বায় পাকা ছয় ফুট সাত ইঞ্চি। ছাতি ও হাত-পা দেখিলে মনে হয় কোন দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলের দলপতি। বৃক্ষকাণ্ডের মত গ্রীবাদেশ অতিক্রম করিয়া উপরে দেখিলে চোখে পড়ে ফ্যালফ্যালে এক জোড়া ঘনকৃষ্ণ চোখ, শিশুর মত নিটোল মুখশ্রী ও ঈষৎ শ্মশ্রুগুম্ফের রেখা। ম্যাট্রিক পাস করিয়া আজ প্রায় দুই বৎসর কলেজে প্রবেশ করিয়াছে। কলেজের পড়ুয়া দু-একজন বাল্যবন্ধু বলে, "চিম্‌নি, বাবা, এবারে একটু কমতে সুরু কর! নইলে কোথাও চাকরি জুটবে না। তোর জন্যে কি লোকে আপিসের 'স্পেশাল' দরজা ফোটাবে, না বড় ক'রে চেয়ার-টেবিল অর্ডার দেবে?"

কেহ প্রশংসার সুরে বলে, "বেটা কাবুলিগুলোকেও চিম্‌নির পাশে বেঁটে দেখায়! তোর ভাবনা কি, একটা ঢিলে পাজামা, ওয়েষ্ট-কোট আর পাগড়ি করিয়ে নিয়ে লাঠি-হাতে "লুফ্‌ফি" "লুফ্‌ফি" ক'রে সুদ আদায় ক'রে বেড়াবি।"

সন্তোষ লজ্জিত হইয়া বলিত, "আঃ, কেন জ্বালাতন করিস!"

বড় হইয়াছে বলিয়া আজকাল তাহাকে সংসারের নানান্ প্রকার ফুট-ফরমাস খাটিতে হয়। ইহাতে তাহার আত্মমর্য্যাদা কিছু বাড়িলেও ইহার একটা মুশকিলের দিকও ছিল। প্রায়ই শুনিতে হইত, এত বড় ধাড়ি ছেলে অথচ যদি কোন বুদ্ধিসুদ্ধি থাকে। বলি ফিরতি পয়সাগুলোও গুণে নিতে শেখ নি কি? হাঁ ক'রে কি দেখছিলি বল ত, পোড়ারমুখো দোকানদার অমনি দুটো পয়সা কম দিয়ে দিলে? আর কোন দিনও তুই শিখবি না যে জিনিসপত্তরের সরেস নিরেস কাকে বলে!"

বন্ধুরা তাহাকে দোকানপাড়ায় দেখিলেই বলিত, "আ রে চিম্‌নি কোথায় চলেছিস? কি কিনবি? চল্ চল্, দেখিয়ে দি; শেষকালে ময়রার দোকানে গিয়ে জুতো চেয়ে বসবি; নয়ত চীনের দোকানে রসগোল্লা।"

সন্তোষ বলিত, "আহা, আমি আর জানি না যে কোথায় জুতো বিক্রি হয়! এক জোড়া মিলের শাড়ী কিনতে হবে।" বন্ধুরা তাহাকে "চল্ চল্" বলিয়া কোন এক মণিহারী কিংবা স্টীল ট্রাঙ্কের দোকানে ঢুকাইয়া দিত। বড় বড় হাত-পাগুলা যেমন তাহাকে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া পারিপার্শ্বিকের সহিত সংঘর্ষণ বাঁচাইয়া চলিতে অক্ষম করিয়াছিল, তাহার মনের ধারাও সেইরূপ পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় চলিত না। ভাব ও আবেগের মোটা মোটা শাখা-প্রশাখা মাত্র তাহার অনুভূতির ক্ষেত্রে দেখা দিত। শ্লেষ, বিদ্রূপ ও অবমাননার তীক্ষ্ণ বাণগুলি তাহার মনের উপর দাগ বসাইতে পারিত না। এই কারণে তাহার মনের শান্তি অটুট থাকিত।

* * * *

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগমনে এমন সময় দেশব্যাপী একটা চাঞ্চল্যের ঝড় বহিতে আরম্ভ করিল। কেহ অকারণ ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া শহর ছাড়িয়া সুদূর গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ছুটিল, কাহারও কাজ-কারবার বন্ধ হইয়া গেল; কেহবা

সুবিধা পাইয়া ন্যায্যের অতিরিক্ত লাভে ফাঁপিয়া উঠিল। ছাত্রমহলে কেহ বলিল ইহার জয় হইলে ভাল, কেহ বলিল উহার হইলে অধিকতর মঙ্গল। নূতন নূতন কথা ভাষার বাজারে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। মামুলি লোকেও 'ব্লিৎসক্রীগ', 'ডাইভ বোম্বার,' 'পান্‌সার ডিভিসন,' 'মেসেরস্মিট,' 'ফিফ্‌থ কলাম' প্রভৃতি আওড়াইয়া দুনিয়ার সহিত পায়ে পা মিলাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। অনেকে বলিল, যুদ্ধে কোন রকম সাহায্য করা উচিত নয়, আবার প্রতিপক্ষ বলিল, জার্ম্মানী জিতিলে ভারতের সমূহ বিপদ, সুতরাং সাহায্য করাটাই বুদ্ধির কাজ। বহু লোকের মত হইল যে কোন লাভ হইলে কাজে লাগিয়া যাওয়া দরকার, বড় কথার আলোচনা গরীবের শোভা পায় না।

ছেলেদের মধ্যে অনেকে সৈন্যদলে যোগদান করিল। সন্তোষ আসিয়া মাকে বলিল, "মা, সকলে বলছে পল্টনে যেতে, যাব?" মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও মা কি সর্ব্বনাশ, পল্টনে যাবি কেন? ঘরে কি খেতে পাস না? খবরদার ও-কথা মুখে আনবি না! ঐ গুর্খা-মুর্খা খোট্টারা পল্টনে যায় যাক; তুই ভদ্রলোকের ছেলে পাইক বরকন্দাজের কাজ করবি?"

সন্তোষ বুঝিল পল্টনে যাওয়াটা যতটা নির্দ্দোষ আমোদ বলিয়া সে মনে করিয়াছিল, তাহা নহে; ইহার মধ্যে অনেক মান-সম্ভ্রমের কথা উঠে।

পল্টনের কথাটা এইখানেই শেষ হইত, কিন্তু সন্তোষের মাতা গ্রহণ উপলক্ষে গভীর রাত্রে গঙ্গাস্নানান্তে সিক্ত বস্ত্রে ময়দানের হাওয়ায় ঘণ্টাধিক চলাফেরা করিয়া নিদারুণ নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলেন ও কয়েক দিন ভুগিয়া স্বর্গলাভ করিলেন। সন্তোষের পিতা ওকালতি করিতে করিতে কখনও ধারণা করিতে পারেন নাই যে এত বড় একটা বিষয়ের এরূপ সহসা একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইতে পারে। তিনি এই নির্ম্মম আঘাতে পাগলের মত হইয়া উঠিলেন এবং চতুর্দ্দিকে খুঁজিয়া কোন প্রতিকারের পথ না পাইয়া হঠাৎ তীর্থ করিতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বাড়ীতে যে-সকল আত্মীয় আসিয়া জুটিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেই দুই-একজন কর্ত্তার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় সন্তোষদের বাড়ীতে থাকিয়া গেলেন ও বাড়ীঘর ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধান করিতে থাকিলেন। সন্তোষের অন্তরের বেদনা জমাট পাথরের মত তাহার সরল হৃদয়ের উপর চাপিয়া বসিল। এতদিন ধরিয়া সে ইহাই জানিত যে এই সহানুভূতিহীন পৃথিবীতে তাহার ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি দেহটার একমাত্র সত্যকার আশ্রয়স্থল হইল ঐ ক্ষুদ্রাকৃতি নারীর কোলে। তাহার মায়ের দেহটা যখন সকলে নির্দ্দয়ভাবে তুলিয়া লইয়া গিয়া নিমতলার ঘাটে অগ্নিসাৎ করিল, তাহার মনের উপর একাধারে অসীম বেদনা ও হতাশার ঝড় বহিয়া গেল। এই অর্থহীন অত্যাচারে তাহার প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া প্রতিহিংসার জন্য অসহায় আক্রোশে গর্জ্জাইতে লাগিল; কিন্তু সে অন্তরে অন্তরে জানিল যে ইহার প্রতিবিধান করা তাহার সাধ্যের বাহিরে।

মায়ের মৃত্যুর পরে সে প্রতিদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই নিমতলার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইত। মূক পশু যে-বেদনার টানে নিজ প্রভুর কবরের আশে-পাশে ঘুরিয়া মরে, সে প্রকারই একটা নির্ব্বাক্ শোকের তাড়নায় সন্তোষ তাহার মায়ের শেষ আশ্রয়স্থলটাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। যে সৃষ্টি তাহার মাকেই কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত ছিল, সে ত পূর্ণরূপেই জীবন্ত জাগ্রত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে চাঁদ-তারা, ফুল-পাতা, পশু-পক্ষী, তাহার মায়ের সাহায্যেই জীবনের আসরে নামিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারা সব পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে, অথচ মা নাই; বিশ্বনাট্যের এরূপ রীতি-বহির্ভূত অভিনয় তাহার নিকট নিতান্তই বেসুরো ছন্দহীন বলিয়া মনে হইত। কোন একটা মারাত্মক রকমের ভুল কোথাও হইয়াছে, নিঃসন্দেহ। গঙ্গার ঢেউগুলির দিকে চাহিয়া সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিত।

সন্তোষ কলেজে যাওয়া আরম্ভ করিল। শুনিল বন্ধুদের মধ্যে নীরেন বৈমানিক দলে যোগদান করিয়াছে। সত্যেন, অজয় ও আরও চার-পাঁচজন গোলন্দাজ পল্টনে গিয়াছে। ইহা ব্যতীত অনেক ছেলে পদাতিক সৈন্য হিসাবে

নাম লিখাইয়াছে। দুই-একজন সৈনিকের পোষাকে কলেজে ঘুরিয়া যাইত। সন্তোষকে বলিত, "আরে চিম্‌নি, কি ছাই নামতা মুখস্থ করছ, আমাদের সঙ্গে চলে এস। খুব মজা।"

সন্তোষ বলিত, "না ভাই, ও সব গুর্খা-মুর্খাদের কাজ; আমি কি ক'রে পারব?"

"আমরা সবাই গুর্খা, কেমন? তোর মতন চেহারা নিয়ে বলতে লজ্জা করে না? যত রকম খেলা খেলেছিস, এর চেয়ে বড় খেলা আর নেই, বুঝলি? মরণ-বাঁচন নিয়ে খেলা। বন্দুক, সঙ্গীন, মেশিন গান, আরমর্ডকার; কত কিছু। যাকে বলে টাকায় ষোল আনা জীবন্ত হয়ে ওঠা। আস্‌বি?"

সন্তোষ বলিত, "না ভাই, কি হবে গিয়ে?"

"হবে আবার কি? যুদ্ধ করতে শিখবি। পরে লড়াইয়ে যাবি। দু'দশটাকে মারবি, হয়ত বা মরবি। কিন্তু খুব জোর তামাশা।"

সন্তোষ বলিত, "আমার ত কারু সঙ্গে ঝগড়াই নেই ত কাকে মারব?"

"ঝগড়া নেই ত কি হয়েছে; ঝগড়া করলেই ঝগড়া জমে উঠবে। তা ছাড়া যোদ্ধালোক ঝগড়ার জন্যে যুদ্ধ করে না, যুদ্ধের জন্যে যুদ্ধ করে। রাজপুতদের ইতিহাস প'ড়ে দেখ্‌ না; বীর পুরুষের ধর্ম্মই হচ্ছে যুদ্ধ করা আর যুদ্ধে মরা।"

"আমি ত ভাই রাজপুত নই। অত কষ্ট ক'রে যুদ্ধ ক'রে মরার কি দরকার। যুদ্ধ না করলেও ত মরা যায়।"

"দূর বোকা! মরাটাই কি আসল কথা হ'ল নাকি? যুদ্ধ করাটাই আসল কথা। যথার্থ মানুষ হ'তে হ'লে যুদ্ধ করা একান্ত দরকার। আর মরা-বাঁচা একই কথা। মৃত্যুকে কাছের থেকে ঘনিষ্ঠভাবে অষ্টপ্রহর দেখতে দেখতে তার সম্বন্ধে ভয় আর থাকে না। মৃত্যু বাজে লোকের শত্রু আর যোদ্ধালোকের পরম বন্ধু।"

মৃত্যু সম্বন্ধে সন্তোষের যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাতে সে যে তার পরম শত্রু এ বিষয়ে তার মনে সন্দেহ মাত্র ছিল না। সেই ক্রূর নির্ম্মম অত্যাচারী সহিত যে আবার সখ্য হইতে পারে, তাহা সন্তোষের ধারণার অতীত। পল্টনী বন্ধুদের কথা তন্ময় হইয়া শুনিত; শুধু মৃত্যু সম্বন্ধে অতটা দরাজ ভাব তাহার মনোমত হইত না। সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, মরে গেলে কি আগে যারা মরেছে তাদের সঙ্গে আবার দেখা হয়?"

"আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্বর্গে হোক, নরকে হোক, যেখানেই যাবি দেখবি লোকে লোকারণ্য—মানে, ভূতে ভূতারণ্য আর কি! এদিকে ঔরঙ্গজেব নমাজ পড়ছে, ওদিকে রাণাপ্রতাপ সন্ধ্যা-আহ্নিকে লেগে গেছেন, ক্লাইভের সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার মহা ঝগড়া চলছে, নেপোলিয়ান আর ওয়েলিংটন সারা দিনরাত দাবা খেলে; কত বলব?"

"কি ক'রে জানলে? তোমরা ত আর মর নি।"

"মরতে হবে কেন? আমরা সব যমরাজার হবু-প্রজা, এসব কথা কি আর আমরা জানি না?"

সন্তোষ এই সকল কথাবার্ত্তার পরে কয়েক দিন খুব চিন্তান্বিত ভাবে ঘুরিতে লাগিল। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে "হুঁ হাঁ" ছাড়া বড়-একটা কিছু বলে না। তার পর হঠাৎ একদিন রিক্রুটিং আপিসে গিয়া বলিল, "আমি পল্টনে যেতে চাই।"

কেরানীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কি পল্টন?"

"এই যারা বেশী মরে-টরে এই রকম।"

সকলে তাহার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তাহার সরল সহজ উত্তরে শেষ অবধি স্থির করিল যে লোকটা পাগল নহে, তবে নির্ব্বোধ।

॥ ৪ ॥

সন্তোষকে খাকি পোষাক পরিয়া বাড়ী আসিতে দেখিয়া যেদিন তাহার আত্মীয়বর্গ চেঁচামেচি করিয়া, কাঁদিয়া তাহার পিতাকে টেলিগ্রাম করিয়া চরাচর চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার পর প্রায় তিন-চার মাস কাটিয়া গিয়াছে। তাহার পিতা পত্নীবিয়োগের শোক ভুলিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সৈন্যদল হইতে ছাড়াইয়া লইবার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সন্তোষ তাঁহাকে এ চেষ্টায় কোন সাহায্য করে নাই। ফলে সন্তোষ কলিকাতায় দিনকতক থাকিয়া কিছু দিন হইল শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য পঞ্জাব-প্রদেশে আসিয়া পুরাদমে কুচকাওয়াজ করিয়া দিন কাটাইতেছে। তাহার পঞ্জাবী শিক্ষকদের মধ্যে কেহ তাহাকে লম্বু বলিয়া সম্বোধন করে, কেহ নাম দিয়াছে বুদ্ধু। কিন্তু হঠাৎ এক দল নতুন আগন্তুকের মধ্যে তাহার এক পুরাতন বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইতেই শীঘ্রই তাহার চিম্‌নি নামটা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া পড়িল। অল্প দিনের মধ্যেই সকলে বুঝিয়া লইল এই বিরাট্ আকৃতি যুবকের মনটা শিশুর মত এবং সকলে চিম্‌নি চিহ্‌ম্‌নি অথবা শুম্‌নিকে ট্রেনিং ক্যাম্পের ম্যাসকট বলিয়া ধরিয়া লইল। সে প্যারেডের সময় লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সঙ্গের লোকদের পিছনে ফেলিয়া আগে চলিয়া যাইত; অর্ডার আর্ম্ হইতে শোল্ডার্ আর্ম্ করিতে তাল কাটিয়া ফেলিত। পট্টি বাঁধিতে গিয়া পায়ের অনেকটা খালি রাখিয়া বাহির হইয়া পড়িত্ এবং জুতার পালিশ ও জামার বোতাম তাহার কদাপি ঠিকমত ঘষামাজা থাকিত না। ইহার জন্য তাহাকে প্রায়ই ফেটিগ ডিউটি ও অন্যান্য প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত; কিন্তু সকলে তাহাকে বিশেষ সহানুভূতির চক্ষে দেখিত।

"আরে শুনেছ? কাল ইনস্‌পেকশনের সময় চিম্‌নির পায়ের পট্টিটা খুলে ঝুলে ছিল। ক্যাপ্টেন হগ ত ক্ষেপে লাল! বললে, 'এই জিরাফের মত লম্বা জানোয়ারটা কে? সরিয়ে নিয়ে যাও, সরিয়ে নিও যাও'! এন. সি. ও. বললে, 'কল্ আউট চিম্‌নি!' চিম্‌নি এক লাফে আরও সামনে এগিয়ে এল। হগ ত 'মাই গড্, মাই গড্!' ক'রে হাত দিয়ে চোখটা ঢেকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। সবাই মিলে তাড়াতাড়ি চিম্‌নির পট্টি বেঁধে ওকে ফের খাড়া করে দিলে। হগ বললে কি, 'ওকে দু-কাঁধে দুটো বন্দুক দিয়ে এক পাশে দাঁড় করিয়ে রাখ।' সমস্ত সকাল চিম্‌নি ঐ রকম ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। ডিসমিস হবার পর আলি বর্জ্জন খাঁ গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'আরে শুম্‌নি, তুম্ পট্টি কেঁও নাহি ঠিকসে লাগায়া?' চিম্‌নি বললে, 'কিসের পট্টি?' আলি বর্জ্জন ত 'তোবা, তোবা" করতে করতে চলে গেল।"

সকলে হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল, "ও পল্টনে এল কেন?"

"কি জানি বাবা! যে যাই বলুক, রাগ নেই, বিরক্তি নেই, একেবারে ভোলা মহেশ্বর।"

"সত্যিকার লড়াইয়ে গেলে ওর মুশকিল হবে। ওকে ত ছেলেধরায় ধরে নিয়ে যেতে পারে ত দুটো-একটা জার্ম্মান কি ইটালিয়ান এসে পড়লে ও কি করবে?"

"আরে তুইই বা কি এমন করবি? সবাই লড়লে ও কেমন না লড়তে পারবে?"

ইত্যাকার আলোচনার কারণ যে-চিম্‌নি সে ততক্ষণ হয়ত কোথাও সহিসদের ছেলেদের ডাণ্ডাগুলি খেলা দেখিতে ব্যস্ত থাকে। বিউগ্‌ল্ বাজিলে আবার উঠিয়া যথাস্থানে গমন করে।

* * * *

এই রকমে আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল। সন্তোষ এখন চলে ফেরে প্রায় সৈনিকের মতই; কিন্তু স্বভাব তাহার একই রকম। একদিন জন দুই-চার বন্ধুর সহিত ছুটি লইয়া বাজারে গিয়াছিল সন্ধ্যার সময়। এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়া অন্ধকার হইয়া আসিল। সকলে ক্যাম্পের দিকে ফিরিয়া চলিল। মধ্যপথে এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড বাগানের মত জায়গা ছিল। সেখানে আসিতেই হঠাৎ পাঁচ-ছয় জন লোক দৌড়িয়া আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করিল। উদ্দেশ্য পয়সা-কড়ি থাকিলে কাড়িয়া লইবে। উভয় পক্ষে খুব ধস্তাধস্তি সুরু হইল। সন্তোষের চেহারাটা বড় বলিয়াই সম্ভবত

দুই জন লোক একত্রে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। এক বন্ধু চীৎকার করিয়া বলিল, "চিম্‌নি, মার বেটাদের!" সন্তোষ ধৃত অবস্থায় দাঁড়াইয়া "আরে, আরে, আমায় ধরছ কেন?" বলিতে থাকিল। লোকগুলো তাহাকে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "পয়সা দে দেও!" সন্তোষ বলিল, "পয়সা চাও ত ধাক্কাধাক্কি কেন; ছাড়, দিচ্ছি।"

সম্ভবত সন্তোষ উহাদের নিজ হাতে পয়সা বার করিয়া দিয়া দিত কিন্তু একটা গুণ্ডা হঠাৎ একটা ইট তুলিয়া অরুণ বলিয়া একজন যুবককে মাথায় সজোরে মারিয়া বসিল। তাহার মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ করিল। সন্তোষ চীৎকার করিয়া উঠিল, "আরে, এই, মারলি কেন?" বলিয়া এক ঝটকায় যে দুই জন তাহাকে ধরিয়াছিল তাহাদের দূরে নিক্ষেপ করিয়া, এক লম্ফে ইট-হস্তে লোকটার পাগড়ি ও চুল ধরিয়া তাহাকে জমি হইতে এক হাত শূন্যে তুলিয়া ফেলিল। লোকটা এই রকম আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। বিড়াল যেমন ইন্দুর ধরিয়া ঝট্‌কা দেয়, সন্তোষ সেরূপ লোকটাকে তিন-চার ঝটকা দিয়া, "আর মারবি?" বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। সে উঠিয়া তীরবেগে পলায়ন করিল ও তাহার সহিত বাকি গুণ্ডারাও অন্তর্হিত হইল।

সেদিন ক্যাম্পে ফিরিতেই সকলে সন্তোষকে খুব তারিফ করিতে আরম্ভ করিল। "চিম্‌নি, তুই নাকি গোটা পাঁচ-ছয় গুণ্ডাকে খুব মেরেছিস?"

সন্তোষ বলিল, "বা রে, আমি ওদের মারব কেন? ওরাই ত অরুণকে ইট দিয়ে মারলে।"

এক দিন হঠাৎ সাড়া পড়িয়া গেল আগামীকল্য তাহাদের রেজিমেন্টের কোন অজানা জায়গায় যাইতে হইবে বলিয়া হুকুম আসিয়াছে। সারা দিন তাঁবু খোলা মালপত্র বাঁধা-ছাঁদা চলিল এবং রাত্রিকালে সকলে মার্চ্চ করিয়া দূরবর্ত্তী এক রেল-স্টেশনে গিয়া গাড়িতে সওয়ারী হইয়া বসিল। সারা রাত গাড়ির ঝাঁকানি ও পরস্পরের কাঁধে মাথা রাখিয়া ঢোলার পালা চলিল। ভোরবেলা রেলগাড়ী একটা অস্থায়ী রকমের স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। দূরে সমুদ্র। কেহ বলিল করাচি, কেহ বা বলিল বোম্বাই। স্টেশনে কোন নামধাম লেখা ছিল না এবং সামরিক কর্ম্মচারী ব্যতীত জনমনুষ্যের চিহ্ন দেখা গেল না। সকলে নামিয়া পড়িয়া সেইখানেই প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার মার্চ্চ সুরু করিল। ঘণ্টাধিক কাল চলিবার পরে সকলে সমুদ্রের ধারে আসিয়া পৌছাইল। সেখানে অনেকগুলি বড় বড় নৌকা ছিল, তাহাতে আরোহণ করিয়া অদূরে নোঙ্গর-করা একখানা জাহাজ, তাহাতে গিয়া পৌছাইল। জাহাজের খালাসি প্রভৃতির নিকটও কোন খবর পাওয়া গেল না যে তাহারা কোথায় আসিয়াছে বা কোথায় যাইতেছে। সকলে গন্তব্য সম্বন্ধে নির্ব্বিকার হইয়া নিজ নিজ স্থান খুঁজিয়া লইল ও অন্তত কিছুকালের জন্য প্যারেড হইতে মুক্তি পাওয়া গেল, এই ভাবিয়া খুশী হইয়া উঠিল। কিন্তু এ আনন্দ তাহাদের ক্ষণস্থায়ী হইল মাত্র। জাহাজে চড়িবার পরেই তাহাদিগকে ডেকের উপর সারিবন্দি করিয়া দাঁড় করাইয়া বুঝান সুরু হইয়া গেল যে জাহাজের কোন বিপদ হইলে কি প্রকার সঙ্কেত করা হইবে এবং তৎপরে কে কি করিবে, কোথায় যাইবে, কেমন করিয়া লাইফ-বেল্ট পরিবে ও কোন্ নৌকায় কি ভাবে চড়িয়া জলে নামিয়া পড়িবে। জাহাজ অতঃপর দুই দিন ছাড়িল না। এই সময়টা সকলে ক্রমাগত জাহাজযাত্রী সেনাদলের কর্ত্তব্য শিক্ষা করিতে লাগিল। বোট্ ড্রিল, অ্যাবান্‌ডন্ শিপ্ ইত্যাদি বহু কথা স্থল প্যারেডের বিভিন্ন সূত্রের সহিত জড়াইয়া গিয়া নবীন সেনানীদিগের মস্তিষ্ক গরম করিয়া তুলিল।

অরুণ বলিল, "ডাঙ্গায় ছিলাম ভাল বাবা! এবারে খালি ডুবুরির কাজ ছাড়া আর সব কিছু শিখতে হবে দেখছি।"

একজন বলিল, "সাঁতার জানিস?"

"সাঁতার ত জানি কিন্তু সমুদ্রে ক-শ মাইল সাঁতার দিবি, জাহাজ ডুবলে?"

সন্তোষ বলিল, "হাঙ্গর, তিমি মাছ আরও কত কি আছে; দু-মিনিটে গিলে ফেলবে।"

"তুই হাঙ্গরগুলোকে বলিস, কেন ভাই আমায় গিলছ; আমি ত তোমাদের কিছু করি নি!"

সন্তোষ বলিল, "য়াঃ।"

ভোঁ-ভোঁ করিয়া কর্ণপটাহ ফাটাইয়া দুই দিন পরে জাহাজ ছাড়িল। বন্দরের শান্ত জলরাশি ছাড়িয়া জাহাজ বাহির সমুদ্রে যাইতেই ভীষণ দোল খাইতে আরম্ভ করিল। ফলে বেশীর ভাগ লোকই মাথা ঘুরিয়া, গা গুলাইয়া বিছানার আশ্রয় গ্রহণ করিল। সকলেই পরস্পরকে ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিল, "কি হে মাথা ঘুরছে ত।" উত্তরে বুক ফুলাইয়া "হ্যাঁ, আমার ওসব মাথা-টাথা ঘোরে না।" বলিয়াই ভীষণ মুখ বিকৃত করিয়া উত্তরদাতা দৌড়াইয়া রেলিঙের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। এই প্রকারে একে একে প্রায় সকলেই শয্যা গ্রহণ করিল। খালাসিরা বলিতে লাগিল, "এই রকম ঠাণ্ডা দরিয়া, এতেই এরা মাথা ঘুরে শুয়ে পড়ছে, ঝড়বাদল হ'লে কি করত? খুব পল্টন করেছে?"

সন্তোষ সঙ্গীর অভাবে একলা ডেকে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। বসিলেই মাথা কেমন করে বলিয়া সে জাহাজের দুলুনির সহিত তালে তালে দুলিয়া চলিতে অভ্যাস করিয়া ফেলিল। খালাসিরা তাহার চেষ্টা দেখিয়া হাসিলেও বলিতে বাধ্য হইল, "হ্যাঁ, এই লম্বা লোকটা নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে বটে।" অপর যাহারা অসুস্থ হইয়া অতি শীঘ্র উঠিয়া আসিল তাহাদের মধ্যে সন্তোষের বন্ধু অরুণ একজন। যে দুই-তিন দিন সকলে শুইয়া রহিল, সন্তোষ ও অরুণ ক্রমাগত জাহাজের ডেকে এধার-ওধার করিয়া হাঁটিয়া ও গল্প করিয়া সময় কাটাইত। কথা অবশ্য বেশীর ভাগ অরুণই বলিত ও সন্তোষ অবাক হইয়া এই অদ্ভুত প্রতিভাবান যুবকের কথা শুনিতে থাকিত। এই ছেলেটি সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্টবাদী। সুখ-দুঃখ, মরা-বাঁচা, যশ-কলঙ্ক, দারিদ্র্য-ঐশ্বর্য্য, সকল কিছুই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। ভারতের যে সকল জাতি মগজের ক্ষেত্রে যশ অর্জ্জন করিতে পারে নাই, তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙালী অপেক্ষা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে শুধু এই কারণে যে, বাঙালী তাহার মগজের সাহায্যে পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জীবন কাটাইয়া দেয় এবং অপরাপর জাতিরা চোখ বন্ধ করিয়া শুধু অদৃষ্টমাত্র সম্বল করিয়া দ্রুত আগাইয়া চলে। জীবন গতির ক্ষেত্র, সেখানে মাপিয়া-জুখিয়া অঙ্ক কষিয়া কেহ বেশী দূর যাইতে পারে না।

সন্তোষ বলিত, "হ্যাঁ ভাই, তা হ'লে কলেজ ছেড়ে দিয়ে ভালই করেছি, না?"

অরুণ উত্তর দিত, "কলেজে প'ড়ে কে কবে কোন্ বড় কাজটা করেছে? দুনিয়াই হ'ল সব থেকে বড় কলেজ। সেখানে বেরিয়ে এসে যে-শিক্ষা লাভ করা যায়, তাই আসল শিক্ষা। কর্ণ, অর্জ্জুন, বিক্রমাদিত্য, রাণা প্রতাপ, রণজিৎ সিং, বাবর, আকবর, এঁরা কি কলেজে পড়েছিলেন? না, বুদ্ধদেব, যিশুখ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ এঁরাই পড়েছিলেন?"

সন্তোষ বলিত, "ঠিক বলেছিস ভাই। কলেজে পড়ে কোন লাভ নেই।"

জাহাজখানা তিন-চার দিন চলিবার পরে অসুস্থ সৈনিকের দল ক্রমশঃ টলিতে টলিতে ডেকে আসিয়া উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল। যেন বহুকাল ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া উঠিয়াছে এই প্রকার চেহারা। কিন্তু দুই দিন যাইতে-না-যাইতে প্রায় সকলেই পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। সমুদ্রের হাওয়ায় ক্ষুধা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল এবং সকলের ক্ষুধার তাড়নায় রন্ধন-বিভাগের কর্ম্মচারীরা ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

একটা সঙ্কীর্ণ জলপথ অতিক্রম করিয়া জাহাজখানা পুনরায় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত জলক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। এখানে দুই পার্শ্বে দূরে স্থল দেখা যায়। অল্প উচ্চ লালাভ পাহাড়ের সারি। হরিতের আভা মাত্র নাই। দেখিলেই বুঝা যায় শুধু শুষ্ক পাথর আর বালি। এইখানে আসিতেই জাহাজের ড্রিল প্রভৃতি হঠাৎ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। দিন-রাত সকল সময় সঙ্কেত আর ড্রিল। সকলে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া কি যেন একটা অজানা আতঙ্কে চঞ্চল হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে দ্রুতগামী শিকারী কুক্কুরের মত এক একটা যুদ্ধ-জাহাজ আসিয়া সৈন্যবাহী জাহাজটিকে দুই পাক ঘুরিয়া অন্তর্হিত হইতে লাগিল। সুদূর আকাশে বহু ঊর্দ্ধে দুই-চারিটা যুদ্ধ-বিমান তীক্ষ্ণদৃষ্টি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ভাসিয়া

ভাসিয়া পাহারা দিতে আরম্ভ করিল। জাহাজের স্থানে স্থানে ছদ্মবেশ ছাড়িয়া ফেলিয়া কয়েকটা ঊর্দ্ধ ও নিম্নমুখী কামান বাহির হইয়া পড়িল। তাহাতে গোলা ভরিয়া গোলন্দাজগণ অষ্টপ্রহর সজাগ হইয়া কাহাকে যেন মারিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল। কোন অদৃশ্য শত্রুর ভয়ে যেন সকলে নিদ্রাহীন ও বিক্ষুব্ধচিত্ত।

দুই-তিন দিন এই ভাবেই কাটিয়া গেল। রাত্রে জাহাজের কোথাও তিলমাত্র আলোকের চিহ্ন থাকে না। দিবানিশি সকলে লাইফ বেল্ট পরিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে জাহাজ ছাড়িয়া নৌকায় আশ্রয় লইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। অথচ হয় না কিছুই। বিপদ হইতে বিপদের আতঙ্ক মানুষকে অধিক ভীত-চকিত করিয়া তোলে। এই সংশয়শঙ্কিত অবস্থায় সকলের সুখ-শান্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইতে বসিল। মেজাজও বিশেষ রুক্ষ ভাব ধারণ করিল।

তৃতীয় দিবসের সূর্য্যাস্তের সময় জাহাজের উপরের ডেকে যে সকল লোক সমুদ্র ও আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পাহারা দিতেছিল তাহাদের মধ্যে একজন অস্তগামী সূর্য্যের দিকে হঠাৎ চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "অনেকগুলো কালো কালো দাগের মত কি নড়ছে-চড়ছে দেখ ত!" অপর দুই-তিন ব্যক্তি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া, বলিল, "হাওয়াই জাহাজ বলে মনে হচ্ছে।" একজন দৌড়িয়া গিয়া নিজ উপরওয়ালা কর্ম্মচারীকে বলিল যে কয়েকটা বিমান সূর্য্যের কোল ঘেঁষিয়া এই দিকে আসিতেছে। কর্ম্মচারী তাড়াতাড়ি সেই দিকে দেখিয়া অপরাপর দুই-চারি জন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া দেখাইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে কি জল্পনা করিয়া তাঁহারা বিপদের সঙ্কেত করিতে আদেশ দিলেন। ভোঁ ভোঁ ভোঁ আওয়াজে জাহাজ ক্ষণিকের মধ্যে সজাগ চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিমান-ধ্বংসী কামানের গোলন্দাজরা কামানগুলির মুখ ফিরাইয়া বিমান-আগমন-পথের আকাশে তাক করিতে আরম্ভ করিল। জাহাজের উপরের ডেক হইতে অতিরিক্ত লোকেদের নীচে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বেতারে ঘন ঘন বিপদের কথা ছড়াইয়া দেওয়া হইতে লাগিল যাহাতে রক্ষী যুদ্ধজাহাজগুলি সাহায্যের জন্য শীঘ্র আইসে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্রোধোন্মত্ত একটা রাক্ষুসে ভীমরুলের মত গোঁ গোঁ করিতে করিতে একখানা বিমান আকাশের ঊর্দ্ধদেশ হইতে গোঁৎ খাইয়া জাহাজখানার উপর আক্রমণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচটা বিমান-ধ্বংসী কামান কর্কশ কণ্ঠে জাগিয়া উঠিল। বিমানটা জাহাজের ডেকের প্রায় তিন-চার শত ফুটের মধ্যে আসিয়া দুই তিনটা বোমা ফেলিয়া রুক্ষ গর্জ্জনে আকাশ ফাটাইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল। বোমা কয়টাই জাহাজের আশে-পাশে পড়িয়া শত শত মণ জল উৎক্ষিপ্ত করিয়া জাহাজের ডেক ভিজাইয়া দিল। জাহাজটা সে-সব বিস্ফোরণের ধাক্কায় কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু অন্যভাবে জখম হইল না। তার পর একটার পর একটা বিমান প্রথমটার অনুকরণে জাহাজের উপর আসিয়া পড়িয়া বোমা ফেলিয়া অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তদুপরি মেশিন গান চালাইয়া জাহাজের ডেকে শিলাবৃষ্টির মত গুলী ছড়াইয়া সকলের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিল। গোলন্দাজ দুই-তিন জন মরিল এবং অনেকে জখম হইল। একটা বোমা জাহাজের অগ্রভাগে পড়িয়া কয়েকটা নৌকা ও ডেকের অনেকাংশ উড়াইয়া দিল। সেখানে আগুন লাগিয়া গেল কিন্তু আগুন নিবানর সুব্যবস্থায় তাহা স্বত্বর নিবিয়া গেল। বিমানগুলি পুনর্ব্বার উচ্চ হইতে আরও উচ্চে উঠিয়া আর একটা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল!

ইতিমধ্যে দূরে দুইটা ব্রিটিশ রণতরী দেখা গেল এবং তিন-চারখানা বিমানও দূরাকাশে ভাসিয়া উঠিল। শত্রুবিমান-গুলি এই সব দেখিয়া আর আক্রমণ না করিয়াই আকাশের অপর এক প্রান্তে চলিয়া গিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেল। যুদ্ধ-জাহাজগুলিও নিকটে আসিয়া সকল খবর লইয়া চলিয়া গেল। জাহাজখানা পুনরায় যেন কিছু হয় নাই এই ভাবে চলিতে লাগিল।

এই আক্রমণের পরে প্রহরী যুদ্ধ-জাহাজ ও বিমানগুলি আরও সতর্ক হইয়া সদা-সর্ব্বদা জাহাজখানার কাছাকাছি ঘোরাফেরা করিতে লাগিল ও শীঘ্রই সকলে নিরাপদে একটা বন্দরে আসিয়া পৌঁছাইল। এখানেও জাহাজ হইতে

নৌকা করিয়া সকলে স্থলে অবতীর্ণ হইল এবং কিছু দূর মার্চ্চ করিয়া অস্থায়ী রকম একটা সেনানিবাসে গিয়া উপস্থিত হইল। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার সময় যেরূপ কেহ জানিতে পারে নাই যে কোথা হইতে কোথায় যাওয়া হইতেছে, এখানেও সেইরূপ কেহ জানিল না যে কোথায় আসা হইল এবং কোথায় বা যাওয়া হইবে। এখানকার বাসিন্দাদিগের মধ্যে যাহাদের দেখা গেল তাহাদের ভাষা কেহই বুঝিতে পারিল না, সুতরাং বিষয়টা আরও অজানা থাকিয়া গেল।

কয়েক সপ্তাহ এইখানেই কাটিয়া গেল। হঠাৎ সাধারণ ড্রিল প্রভৃতি স্থগিত রাখিয়া সৈন্যগণকে পথহীন প্রান্তরের উপরে মাইলের পর মাইল লইয়া যাওয়া আরম্ভ হইল। এই সকল কসরতের সময় তাহাদের লড়াইয়ের সাচ্চা মাল-মশলা বহিয়া চলিতে হইত। শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচিবার বিভিন্ন উপায়, যথা গা ঢাকা দিয়া অগ্রসর হওয়া, দ্রুত ছড়াইয়া পড়া ও একত্র হওয়া, নানা দিক হইতে শত্রুর উপর অগ্নিবর্ষণ কেন্দ্রীভূত করা, ধোঁকা দেওয়া, বোমা ছুঁড়িয়া শত্রু নিপাত ইত্যাদি বহুবিধ যুদ্ধ-কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র আয়ত্ত করা হইতে লাগিল।

কিছুদিন গত হইলে এক দল গোলন্দাজ সৈন্য আসিয়া ইহাদের সহিত মিলিত হইল। কয়েকটা বিমানও আসিয়া জুটিল। অতঃপর কামান ও বিমান সহযোগে যুদ্ধ অভ্যাস চলিল। ইহার মধ্যে দুই-একবার শত্রু-বিমানের আবির্ভাবে সকলকে গা ঢাকা দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অদৃশ্য হইয়া থাকিতে হইত। খাওয়া, শোওয়া, রাত্রে পাহারা দেওয়া ও দিনে কঠোর রৌদ্রে প্রায় এক মণ মালপত্র বহন করিয়া বিশ-ত্রিশ মাইল দৌড়ঝাঁপ; এই ভাবেই জীবন কাটিতে লাগিল। সকলে এই দুর্দ্দান্ত জীবনযাত্রার ফলে লোহার মত শক্ত হইয়া উঠিল। অরুণ বলিল, "দু-চার ব্যাটা ইটালিয়ান কি জার্ম্মান পেলে হাতটা আরও পাকান যেত। এ যেন আমিষের মধ্যেও নিরামিষের গন্ধ।" সত্যেন বলিল, "দাঁড়াও বন্ধু! যথাসময়ে যথাসময়ে যথাস্থানে দেখা পাবে এখন। এ আমাদের গোকুলে বাড়ান হচ্ছে। হঠাৎ গিয়ে যখন ব্যাটাদের ঘাড়ে পড়ব তখন বুঝিয়ে দেব বালাম চালের ধাক্কা কত দূর পৌছয়।" সন্তোষ ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইটালিয়ান আর জার্ম্মানরা কি করেছে?"

সবাই "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলল, "তাও জানিস না, চিম্‌নি? ওরা লাখখানেক ইহুদীকে কেটে রান্না ক'রে খেয়েছে।"

"মানুষের মাংস খায়? আরে রাম রাম!"

"ওদের হাতে ধরা পড়লে আর নিস্তার নেই; তোকে দিয়ে স্রেফ কচি পাঁঠার ঝোল রেঁধে ফেলবে।"

সকলে বিকট হাস্যে বন্দী সন্তোষের পরিণতি সম্বন্ধে নিজেদের অভিমত জানাইয়া দিল। সন্তোষ বলিল, "আমায় ধরতে পারবেই না!"

মাসাধিক কাল গত হইলে এক দিন সকলে তাঁবু প্রভৃতি উঠাইয়া মার্চ্চ করিয়া পুনরায় সমুদ্রের কিনারায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই-তিন খানা ছোট ছোট জাহাজে নৌকার সাহায্যে আরোহণ করিয়া যাত্রা আরম্ভ হইল। দুই দিন পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে জাহাজগুলি তীরের দিকে অগ্রসর হইল। জাহাজের সকল নৌকা কপিকলে টানিয়া নামাইবার জন্য প্রস্তুত করা হইল। তার পর হুকুম হইল, "যে যাহার স্থানে নৌকায় চড়িয়া ব'স।" সকলে বসিলে পরে নৌকাগুলি জলে নামাইয়া দেওয়া হইল। দূরে বেলাভূমির উপর ঢেউ ভাঙিয়া পড়ার "ড্রম" "ড্রম" শব্দ কানে আসিতে লাগিল। চারিদিক নিস্তব্ধ অন্ধকার। তীরের এক জায়গা হইতে কাহারা বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে সঙ্কেত করিতেছিল। ঢেউয়ের ঝাপটায় হাবুডুবু খাইয়া নৌকাগুলি একে একে বালির উপর গিয়া পড়িতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যগণ লাফ দিয়া জলে নামিয়া ডাঙায় উঠিয়া পড়িতে লাগিল। সকল সৈন্য অবতীর্ণ হইলে পর সারবন্দি হইয়া সকলে সমুদ্রতট হইতে আরও ভিতরে চলিয়া গিয়া দাঁড়াইল। কাহারও কোন শব্দ করা অথবা আলো দিয়াশালাই জ্বালা বারণ।

সন্তোষ ফিস ফিস করিয়া অরুণকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ইটালিয়ানদের দেশ নাকি?" অরুণ বলিল, "না, চিত্রগুপ্তের সদর মুল্লুক। চুপ ক'রে থাক্ চিম্‌নি!"

রাত্রি গভীর হইল। সকলে যে যেখানে ছিল বিস্কুট চিবাইয়া বোতল হইতে জল খাইয়া শুইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে নিঃশব্দে পাহারা চলিতে লাগিল। সারা রাত্রি মাল-মশলা, কামান গোলা প্রভৃতি নিঃশব্দে জাহাজ হইতে তীরে নামান চলিতে লাগিল। ভোরের আলো যখন অন্ধকারকে শুধু অল্প মাত্র হাল্কা করিয়া তুলিয়াছে, তখন সকলে রন্ধন-বিভাগের লোকেদের অদৃশ্য হস্তে এক এক মগ কোকো পাইল এবং উহা গলাধঃকরণ করিবার পরেই নিজ নিজ কর্ম্মচারীর নিঃশব্দ আদেশে ধীর গতিতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। মাইল চার-পাঁচ পার হইবার পর হঠাৎ দূরে বামে একটা বন্দুকের শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে শত মেশিন গানের কর্কশ কলরবে ভোরের শান্ত-স্নিগ্ধ আবহাওয়া নিমেষে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সৈন্যগণ যে যেখানে ছিল সটান মাটিতে শুইয়া পড়িল ও হামা দিয়া ঝোপঝাপ উইঢিপি যাহা পাইল তাহার অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিল। শত্রুপক্ষের মেশিন গানের গুলীবর্ষণে কাহারও কিছু হইল না, কারণ তাহারা এখনও আক্রমণকারী সৈন্যদলের অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করে নাই।

দুই-চারি মিনিট গত হইলেই বাহির-সমুদ্রের পথে 'শাঁই শাঁই' শব্দ শুনা গেল ও যুদ্ধজাহাজ হইতে নিক্ষিপ্ত গোলাগুলী সৈন্যদলের মাথার উপর দিয়া শত্রুর এলাকায় পড়িয়া ফাটিতে আরম্ভ করিল। পর-মুহূর্ত্তে রণতরীর কামানের গম্ভীর গর্জ্জনে চরাচর কম্পিত হইয়া উঠিল। হুকুম আসিল নিজ নিজ স্থান খনন করিয়া পাকা হইয়া বসিবার। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় খনন-কার্য্য সুরু হইল। এবং শীঘ্রই সকলে প্রায় কোমর অবধি গর্ত্ত খুঁড়িয়া ফেলিল। শত্রুপক্ষও এতক্ষণে দিবালোকে দেখিতে পাইল যে আক্রমণকারীরা কোথায় আছে এবং অবিলম্বে তাহাদের মেশিন গান, বন্দুক প্রভৃতি যথাস্থানে গুলীবর্ষণ আরম্ভ করিল।

ইটালিয়ানগণ এই অঞ্চলে কোন আক্রমণ আশঙ্কা করে নাই এবং এই কারণে এই স্থলে তাহাদিগের সৈন্য ও অস্ত্রবল যথেষ্ট ছিল না। অল্প যাহা কিছু ছিল তাহারই সাহায্যে ঘণ্টাধিক কাল আক্রমণকারীদিগের উপর অবিশ্রান্ত গুলীবর্ষণ করিল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে চার-পাঁচখানা রণতরী হইতে গোলা বৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মানে মানে পিছু হটিয়া সরিয়া পড়িল। আকাশে বিমানে বিমানে দুই-চারিটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝুটাপুটি হইয়া গেল ও তাহাতে একখানা ইটালীয় ও একখানা ব্রিটিশ বিমান আহত হইয়া কোন মতে ভূতলে নামিয়া আসিল। রণতরীর গোলা দূর হইতে আরও দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে আর শত্রুর নাগাল পাইল না। বেলা তখন তিনটা-চারটা। হঠাৎ একটা শেষ গর্জ্জন করিয়া গোলাবর্ষণ থামিয়া গেল।

পদাতিক বাহিনীর কর্ম্মচারী অতঃপর এদিক ওদিক ধাবমান হইয়া দেখিতে লাগিলেন নিজেদের হতাহতের সংখ্যা কত হইল। সৌভাগ্যক্রমে দুই-চারিজন ব্যতীত কাহারও কোন প্রকার সাংঘাতিক চোট লাগে নাই। অতঃপর নির্ব্বিবাদে জাহাজ হইতে আরও যাহা কিছু মালপত্র ছিল তাহা নামান হইল এবং এই স্থলে পরিখা খনন করিয়া, কাঁটাতারের বেড়া দিয়া ও অন্যান্য বিলি-ব্যবস্থা করিয়া পাকা একটা আস্তানা গড়িয়া তোলা আরম্ভ হইল। দুই-চারি দিনের মধ্যে বড় বড় কামান, বেতার, রেলের লাইন, মাটির নীচে বোমা হইতে নিরাপদ গুদাম, দপ্তর, হাসপাতাল প্রভৃতি রীতিমত বসান ও গঠিত হইতে আরম্ভ করিল। একটা জাহাজ আসিয়া অনেকগুলি সাঁজোয়া গাড়ি ও ছোট বড় ট্যাঙ্ক নামাইয়া দিয়া গেল।

সাত-আট দিবস কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে লৌহবর্ম্ম-রক্ষিত রথে এক এক দল খবর-সংগ্রহকারী সৈন্য বহুদূর অবধি ঘুরিয়া আসে ও তৎপরে সেনাপতিদের সভা বসিয়া যায়। বিমান হইতেও শত শত ফোটো তুলিয়া আনা হয় ও সকল

বার্ত্তা বিচার করিয়া জল্পনা হয় কোন্ পথে শত্রুনিপাতে অগ্রসর হওয়া সমীচীন। অবশেষে এক দিন মূল শিবির সুরক্ষিত রাখিয়া, ডাহিনে বামে ও অগ্রে প্রহরীবাহিনী আগাইয়া দিয়া অভিযান আরম্ভ হইল।

অরুণ সন্তোষকে বলিল, "এই ত যুদ্ধ। বাংলার কোন গাঁয়ে এক সপ্তাহ থাকলে এতক্ষণ অর্দ্ধেক লোক জ্বরে কাঁপতে আরম্ভ করত আর ডজন দুই পিলের ঠেলায় ম'রে বসে থাকত। তা ছাড়া ওলাউঠা, বসন্ত, টাইফয়েড আরও কত কি! এ ঢের ভাল। কপালে থাকে ত ধাঁইসে লাগবে আর মরবে, নয়ত রাখে কৃষ্ণ···ইত্যাদি ইত্যাদি।"

সন্তোষ বলিল, "শত্রুই নেই ত যুদ্ধ কি হবে? আমি ত গর্ত্তের মধ্যে ব'সে বেশ ক-ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলাম।"

ধীরমন্থর গতিতে, পদে পদে অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা বিচার করিয়া অভিযান অগ্রসর হইতে লাগিল। বহু স্থলে ঘাঁটি বাঁধা হইল, যদি ফিরিয়া আসিতে হয়। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল দূর দূরান্তের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। যদি শত্রু পিছন হইতে ঘুরিয়া আসিয়া আক্রমণ করে। পিছনে রাস্তা সাফ করিতে এবং যুদ্ধোপকরণ ও রসদ সরবরাহের কার্য্য বজায় রাখিতে লোক লাগিয়া গেল। টেলিফোনের তার বসিল, মালবাহী লরী ছুটিতে লাগিল, আরও কত কিছু ব্যবস্থা হইল। যুদ্ধকার্য্য সকল কার্য্যের সেরা। ইহার শাখা-প্রশাখা অসংখ্য এবং রীতিনীতি কঠোর ক্ষমাহীন ভাবে নিখুঁত। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শত শত হুকুম চলিতেছে ও কলের মত কাজ হইতেছে। কোথাও কাহারও মনে দ্বিধা নাই, স্বেচ্ছাচার নাই, কার্য্যে ফাঁকি নাই।

জাহাজ হইতে নামিবার পরে পঁচিশ দিন কাটিয়া গিয়াছে। শত্রু চিরপলাতক। কোথাও তাহার দেখা পাওয়া গেল না, কিন্তু তাহার শ্যেন দৃষ্টি অভিযানের উপর স্থিরনিবদ্ধ নিঃসন্দেহ।

ভোরবেলা। আকাশ কুয়াশায় আধ-ঢাকা। হঠাৎ একটা ঝোপঝাড় ও উইঢিপির অন্তরাল হইতে মেশিন গানের আওয়াজ ধ্বনিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ-ত্রিশ জন সৈন্য হতাহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। ক্ষণিকের মধ্যে নিকটস্থ সৈন্যদল ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল ও শত্রুর আস্তানার উপর গুলীবর্ষণ আরম্ভ হইল। কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া শত্রুর মেশিন গান গর্জ্জাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে আরও গভীর গর্জ্জনে মর্টার কামান হইতে বড় বড় বোমা উৎক্ষিপ্ত হইয়া অভিযানের উপর পড়িতে আরম্ভ করিল। সেনাপতি মহলে সাড়া পড়িয়া গেল। জল্পনা আরম্ভ হইল শত্রু কত জন আছে এবং তাহাদের নিপাত করিয়া অভিযান অগ্রসর হইবার সহজ উপায় কি ইত্যাদি। বহু পরামর্শের পরে স্থির হইল যে এক দল সৈন্য কয়েক মাইল ঘুরিয়া শত্রুর আস্তানা পিছন হইতে আক্রমণ করিবে এবং সেই সম্মুখের সৈন্যদলও শুইয়া পড়িয়া অগ্রসর হইয়া উহাদিগের উপর বোমাবর্ষণ করিবে। দুই-তিন ঘণ্টা আয়োজনে কাটিয়া গেল এবং তৎপরে পিছন হইতে আক্রমণটা আরম্ভ হইল। বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া একদল সৈন্য পিছন হইতে সেই ঝোপঝাড় ও উইঢিপির গড়ের উপর হানা দিল। গোলাগুলির আওয়াজে চতুর্দ্দিক ভরিয়া উঠিল। অরুণ ও সন্তোষদের কোম্পানীর উপর হুকুম হইল হামা দিয়া অগ্রসর হইবার। সকলে সরীসৃপের মত ধীর গতিতে মাটির সহিত মিশিয়া পড়িয়া আগাইয়া চলিল। আধ ঘণ্টার পর সকলে শত্রুর অতি নিকটে আসিয়া পৌছাইলে পর বোমা ছুঁড়িবার আদেশ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ-ত্রিশ জন সৈন্য হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া কয়েক পদ দৌড়িয়া গিয়া বোমা ছুঁড়িয়া নিমেষের মধ্যে মাটিতে শুইয়া পড়িয়া গা ঢাকা দিল। বিস্ফোরণের শব্দ ও হতাহতের কাতর আর্ত্তনাদ মিলিয়া একটা ভয়াবহ কোলাহলের সূচনা হইল।

অরুণ বোমা-নিক্ষেপকারীর দলে ছিল। তাহার উৎসাহ কিছু অধিক থাকায় সে শত্রুপক্ষের অতি নিকটে গিয়া বোমা ফেলিয়া শুইয়া পড়িল। সে আবার উঠিয়া বোমা ছুঁড়িবে ইতিমধ্যে তিন-চারি জন ইটালিয়ান লাফ দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া তাহার উপর পড়িল। এক জন সঙ্গীন দিয়া তাহাকে আঘাত করিয়া ফেলিয়া দিল ও অপর দুই জন তাহার কাপড় ধরিয়া হিঁচড়াইয়া টানিয়া বন্দী করিয়া লইয়া চলিল। ইহা দেখিয়া সন্তোষ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া "এই, এই, মারলি কেন" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ও কয়েক লম্ফে বহু গজ পথ অতিক্রম করিয়া শত্রুদের ঘাড়ে গিয়া পড়িল।

সে বন্দুকের নলের দিকটা ধরিয়া লাঠির মত করিয়া বন্দুক ঘুরাইয়া ক্ষণিকের মধ্যে ইটালিয়ানদিগকে প্রচণ্ড আঘাতে ধরাশায়ী করিয়া দিল ও অরুণকে তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আরও পাঁচ-সাত জন শত্রুপক্ষের লোক দৌড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়া সন্তোষকে আক্রমণ করিল। "তবে রে!" বলিয়া সন্তোষ অরুণকে ছাড়িয়া আবার বন্দুকের আঘাতে সকলকে বিচলিত করিয়া তুলিল এবং অচিরাৎ ইটালিয়ানগণ ছিটকাইয়া এদিকে-ওদিকে পড়িতে লাগিল। শত্রুপক্ষ নিজেদের লোকের গুলী লাগিবে আশঙ্কায় সন্তোষের উপর গুলী চালাইতে পারিতেছিল না এবং সন্তোষও বিদ্যুৎচালিত তালবৃক্ষের ন্যায় বন্দুক গদা হস্তে উন্মত্ত আবেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। পুনরায় কয়েক জন ইটালিয়ান এই দীর্ঘাকার উন্মাদটাকে বন্দী করিবার জন্য দৌড়িয়া আসিল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সন্তোষ, ইটালিয়ান ও বন্দুক-সঙ্গীনের মিশ্রণে এক অপূর্ব্ব চলচ্চিত্র প্রাণবান হইয়া উঠিল। সন্তোষ কাহাকেও লাথি, কাহাকেও বন্দুকের আঘাত করিয়া সকলকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

কি হইত বলা যায় না কিন্তু "চিম্‌নি"র বিপদ দেখিয়া তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এতক্ষণে সজাগ হইয়া উঠিল। তার পরেই অকস্মাৎ "চিম্‌নি মার্ বেটাদের, মার্ বেটাদের" শব্দে গগন কাঁপাইয়া প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন সৈনিক বোমা ও বন্দুক হস্তে নিমেষের মধ্যে মধ্যস্থিত জমি পার হইয়া ইটালিয়ানদের উপর গিয়া পড়িল এবং অচিরাৎ সন্তোষের কয়েক জন আক্রমণকারীকে শেষ করিয়া টিপিগুলার অন্তরালস্থিত শত্রুদের উপর একাধারে শতাধিক বোমা নিক্ষেপ করিয়া লাফ দিয়া টিপির সারি টপকাইয়া অপর পার্শ্বে হাজির হইল। ইটালিয়ানগণ এইরূপ একটা তীব্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাহারা সন্তোষের লীলা দেখিতেই ব্যস্ত ছিল। এই আক্রমণে তাহারা টিপিদুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু তাহাদের বেশী দূর যাইতে হইল না। চারিদিক হইতে বেষ্টিত হইয়া তাহারা আত্মসমর্পণ করিল।

সেদিন সন্ধ্যায় আরও পনের-বিশ মাইল ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া যখন সকল সৈন্য রাত্রের মত আস্তানা গাড়িল তখন ঘন ঘন বিউগ্‌ল্ ধ্বনিতে সকল সেনাকে একত্র করিয়া একটা ভারি রকম সভা হইল। সেখানে সেনাপতিদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন তিনি সকল সৈন্যদের, তাহাদের সাহস ও যুদ্ধদক্ষতা সম্বন্ধে বহু প্রশংসা করিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি বলিলেন, "এই অভিযানের দ্রুত অগ্রসর হইবার পথে আজ যে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা প্রধানতঃ একজন সৈনিকের বেপরোয়া বীরত্বের জন্যই সত্বর সরাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়। তাহাকে আমি তাহার বীরত্বের জন্য হাবিলদার পদে উন্নীত করিলাম এবং আমার রিপোর্টে যাহাতে সে বীরত্বের জন্য উপযুক্তরূপে সম্মানিত হয় ও মেডাল পায় সে কথা লিখিব। এই বীর সৈনিকের নাম তোমরা সকলেই জান..." সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, "চিম্‌নি! চিম্‌নি!"

॥ ৫ ॥

চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। কে যেন একটা ঘনকৃষ্ণ পোঁচড়া টানিয়া আকাশের বক্ষ হইতে আলোকের শেষ বহ্নি-কণিকাটুকুও মুছিয়া তুলিয়া লইয়াছে। দূরে দূরে আকাশের সুদূর প্রাকারের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তারকার ঝিকিমিকি সেই প্রগাঢ় অন্ধকারের অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করিলেও সে স্পন্দিত আলোকমালা অন্ধকারের গভীরতাকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। দীপালির শেষে সকল প্রদীপ নিভিয়া যখন মাত্র দুটা-একটা এখানে-ওখানে টিম্‌টিম্ করিতে থাকে; অমাবস্যা যখন তার করালকৃষ্ণ মুখব্যাদান করিয়া চরাচরকে গ্রাস করিয়া ফেলে; তখন যেমন দুই-একটা মরণোন্মুখ প্রদীপের শিখা সে বিভীষিকা দূর করিতে কিছুমাত্রই পারে না, শুধু আরও প্রকট করিয়া তোলে; এই তীব্র গভীর ঘোরকৃষ্ণ রজনীর বক্ষে তারকার দ্যুতিও তেমনি নিস্তেজ প্রতীয়মান হইতেছে। উপরের আকাশ এই রকম। নীচের আকাশ আরও ভয়ঙ্কর কালোর পাথার। ধরণীর বক্ষ হইতে বিশ হাজার ফুট উপরে ভাসমান দ্রুতগতি বিমানবক্ষে বহু শত সৈনিক চলিয়াছে। কোথায় যাইতেছে তাহা দুই-এক জন উপরওয়ালা ব্যতীত কেহই জানে না। প্রত্যেক

সৈনিকের পৃষ্ঠে সুপটু হস্তে ভাঁজ-করা রেশমের প্যারাশুট বাঁধা। সকলে শুধু জানে যে সময় হইলে তাহাদের ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করিয়া ঐ অনন্ত অন্ধকারের গহ্বরে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে এবং তার পর সম্পূর্ণরূপে নিজ অদৃষ্ট ও পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া অজানার সহিত যুঝিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইবে। এই অসাধ্য সাধন ব্রতে যাহারা নামিয়াছে তাহারা সকলেই বিশেষ করিয়া বাছাই করা সৈনিক এবং এই কার্য্যের জন্য তাহারা বহুকাল ধরিয়া বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়াছে। বহু শত বার হাজার হাজার ফুট উপর হইতে প্যারাশুট লইয়া লাফাইয়া এবং একাকী বহু অস্ত্র-সরঞ্জাম বহন করিয়া দিনের পর দিন ঘুরিয়া-ফিরিয়া ও নকল যুদ্ধ সাধনান্তে আজ তাহারা প্রথম সাক্ষাৎ যুদ্ধের কার্য্যে এই কষ্টলব্ধ বিদ্যা প্রয়োগ করিতে উপস্থিত হইয়াছে। সকলে একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিতেছে—কখন হুকুম আসিবে "এইবার প্রস্তুত"। বিমানের এঞ্জিনের ঘোর কলরোলের মধ্যে কথা বলা কঠিন; কিন্তু তাহার মধ্যেই কিছু কিছু কথোপকথনের চেষ্টা চলিতেছে।

চিম্‌নি তাহার সঙ্গী অজয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা যখন নীচে পৌছুব তখন যদি একটা পুকুরের মধ্যে গিয়ে নামি তা হ'লে?" অজয় বলিল, "তোর ছিপটা সঙ্গে নিয়েছিস ত? পুকুরে পড়লে মাছ ধর্‌বি। আবার কি?" চিম্‌নি বলিল, "ধ্যেৎ। মাছ কি করে ধরব? জলে পড়লে সাঁতার দিতে হবে না?" অজয় বলিল, "সাঁতার দিবি আর মাছ ধরবি। এই কাজে শুনেছিস ত একসঙ্গে সব কিছু করতে হ'তে পারে। গা ঢাকা দিয়ে চলা, গুলী চালান, রান্না, খাওয়া, ঘুমান, শত্রুর মাল মশলা নষ্ট করা, কেল্লা, সাঁকো প্রভৃতি উড়িয়ে দেওয়া; সব একসঙ্গে। এ ত খালি সাঁতার দিতে দিতে মাছ ধরা! আমাদের কাছে এ ত জল-ভাত।" চিম্‌নি বলিল, "দূর, সাঁতার দিতে দিতে আবার কেউ মাছ ধরতে পারে?"

হঠাৎ চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ করিয়া বিমানের এঞ্জিনগুলি থামিয়া গেল। বহু উর্দ্ধে আকাশ বাহিয়া বিমানবাহিনী বায়ুবক্ষে ভাসিয়া নিঃশব্দে ক্রমশঃ নীচের দিকে চলিতে লাগিল। বহু নিম্নে কাহারা যেন আলোক-সঙ্কেতে কি জানাইতে লাগিল। অনলচক্ষু যেন কোন মহাদানব নিমীলিত নয়ন ক্ষণে ক্ষণে উন্মোচিত করিয়া উপর প্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। হুকুম আসিল, "এইবার প্রস্তুত! এখন হইতে পাঁচ মিনিট পরে সকলে নিয়মমত প্যারাশুট ঝম্পন করিবে। মাটিতে পৌছাইতে পনর-কুড়ি মিনিট সময় লাগিবে। প্রথম কর্ত্তব্য মাটিতে নামিয়া প্যারাশুট গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুঁতিয়া ফেলিবে। তৎপরে সকলে ভোর হওয়া অবধি গা ঢাকা দিয়া থাকিবে। আলো হইলে পর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটি ছোট পাহাড় দেখিবে এবং যথাসম্ভব নিঃশব্দে সকলে সেই দিকে গিয়া মিলিত হইবার চেষ্টা করিবে। একান্ত প্রয়োজনেও কেহ গুলী চালাইবে না। শত্রুকে নিঃশব্দে নিঃশেষ করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবে। সকলে প্রস্তুত!"

চিম্‌নি ও অজয় যথাস্থানে গিয়া দাঁড়াইল। বিমানের লেজের দিকে একপাশে একটা দরজা। সেই পথে ক্রমান্বয়ে এক এক করিয়া প্যারা-সৈনিক দল ঝাঁপ দিয়া সেই অতল অন্ধকারের মধ্যে পড়িতে লাগিল। ক্রমশঃ অজয় ও চিম্‌নির পালা আসিল। অজয় চিম্‌নির পিঠে একটা চড় দিয়া বলিল, "ছাতা খোলবার দড়িটা ঠিক টানিস, নয়ত মিনিট কয়েক পরেই স্বর্গের ময়দানে ডাণ্ডাগুলি খেলতে সুরু করবি।" বলিয়া সে চট্ করিয়া উন্মুক্ত পথে শূন্যে লাফাইয়া পড়িয়া অন্তর্হিত হইল। চিম্‌নি "ডাণ্ডাগুলি না ছাই"…বলিতে বলিতে পিছনের লোকটি তাহাকে এক ধাক্কায় আগাইয়া দিল। চিম্‌নি দীর্ঘ দেহটাকে ঈষৎ আয়ত্তে আনিবার জন্য ঘাড় নীচু করিয়া হাঁটু বাঁকাইয়া এক লম্ফে শূন্যমার্গে উপস্থিত হইল। তার পর এক, দুই করিয়া পাঁচ অবধি গুনিয়া নিয়মমত ছাতা খুলিবার দড়িটাকে টান দিল। প্রথমে কিছু হইল না। শূন্যপথে ডিগ্‌বাজি খাইতে খাইতে চিম্‌নি হাজারখানেক ফুট নীচে চলিয়া আসিল। একবার মনে হইল, যদি প্যারাশুট না খোলে তাহা হইলে কি হইবে; কিন্তু সে সম্ভাবনা তাহার মনে কোন ভয়ের সঞ্চার করিল না। মায়ের মৃত্যুর পর হইতেই মরণ চিম্‌নির নিকট নিজ ভয়ঙ্কর ভাব হারাইয়াছিল। মৃত্যু যেন একান্ত আকাঙ্ক্ষিত কিছু একটা, যাহার সহিত

তাহার মাতৃমূর্তি ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত। সে যেন একটা দেশ যাহা অতি সুন্দর, চির আনন্দের ও শান্তির স্নিগ্ধ ছায়ায় অবস্থিত। সেখানে পৌছান কঠিন ও কষ্টকর কিন্তু একবার পৌছাইলে নিদারুণ গ্রীষ্মে শীতল সায়রে অবগাহনের মতই শান্তি ও তৃপ্তিদায়ক। হঠাৎ প্যারাশুটটা খুলিয়া গেল ও চিম্‌নি এক ঝটকায় সোজা হইয়া মন্দগতিতে দোদুল্যমান অবস্থায় নামিয়া চলিতে লাগিল। নীচে, আরও নীচে সেই চির অন্ধকারে সীমাহীন কূপ-পথে শেষহারা গতিতে। হাত চালাইয়া দেখিয়া লইল যন্ত্রবন্দুক, পিস্তল, বোমার থলিটি, জলের বোতল, ঔষধের বাক্স প্রভৃতি ঠিক আছে কি না। উপরে তাকাইয়া দেখিল অন্ধকারের স্রোতে ভাসমান বুদ্বুদের মত প্যারাশুট দুলিতেছে। অন্ধকারে আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু সমস্ত আকাশ ছাইয়া তাহারই মত আরও অনেকে এইরূপে নামিয়া আসিতেছে মনে করিয়া তাহার মনটা খুশী হইয়া উঠিল। কিছুকাল গত হইলে নিচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল চতুর্দ্দিকে কালোর মধ্যে আরও ঘন কালো কি একটা দ্রুত তাহার দিকে উঠিয়া আসিতেছে। বুঝিল ধরণীর নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে। সে অবতরণের ধাক্কা সামলাইবার জন্য সমস্ত শরীরটাকে সজাগ করিয়া লইল। কোথায় গিয়া পড়িবে কে জানে? বৃক্ষের ডালে, কিংবা কাহারও গৃহের ছাদে, অথবা পঙ্কে কিংবা কাঁটার ঝোপে। তাহার গতি অকস্মাৎ চক্ষের পলকে শেষ হইল। সে একটা তীব্র ধাক্কা খাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে গড়াইয়া গিয়া মাটির উপর দিয়া স্কন্ধের রজ্জুর আকর্ষণে ঘর্ষিত হইয়া চলিতে লাগিল। অল্প চেষ্টাতেই এই আকর্ষণ প্রতিরোধ করিয়া চিম্‌নি দাঁড়াইয়া উঠিল। তৎপরে রজ্জুর বন্ধন খুলিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে প্যারাশুটটা যেখানে প্রকাণ্ড একটা প্রাণহীন জন্তুর দেহাবশিষ্টের মত পড়িয়া ছিল সেইখানে উপস্থিত হইল। সকল রজ্জু ও কাপড় একত্র করিয়া সে স্থান খুঁজিতে লাগিল সেগুলিকে পুঁতিয়া ফেলিবার জন্য। জায়গাটা কিছু ঝোপঝাড়ে পূর্ণ হইলেও সে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দুইটি ঝোপের মধ্যে একটা স্থান আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তৎপরে ছোট একটা ধারাল খোন্তা দিয়া একটা ঈষৎ গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া ফেলিতে তাহার অধিক সময় লাগিল না। নিঃশব্দে ঠেলিয়া ঠেলিয়া সকল রজ্জু ও রেশমের পুঁটুলি সে ঐ গর্ত্তে ভরিয়া ফেলিয়া মাটি চাপা দিয়া দিল এবং তৎপরে উদ্বৃত্ত মাটিটুকু ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দিয়া কর্ম্ম সমাধান করিল। দু-চারটা শুষ্ক পাতা ও কাঠি কুড়াইয়া সেই "কবর"-স্থলটিকে অল্প-বিস্তর ঢাকিয়া দিয়া একটা স্বাভাবিকতার সৃষ্টি করিল।

তখনও ভোর হইতে কিছু বিলম্ব ছিল। চিম্‌নি এই পরিশ্রমের পরে বোতল হইতে এক চুমুক মাত্র জল খাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে কখন কখন নানা প্রকার খুসখাস আওয়াজ আসিতে লাগিল। একবার মনে হইল মানুষের পায়ের আওয়াজ। চিম্‌নি একটা ছোট রবারের লাঠি খুলিয়া হাতে লইয়া বসিল। নিঃশব্দে কাহাকেও কাবু করিয়া ফেলিবার জন্য ইহার তুল্য অস্ত্র নাই। ইহার এক আঘাতে অতি বড় নিরেট মস্তকও ঘুরিয়া যায় ও আহত ব্যক্তি বহুক্ষণের জন্য স্বপ্নলোকে বিচরণ করে। পায়ের আওয়াজ কিন্তু নিকটে না আসিয়া ক্রমশঃ দূরে সরিয়া গেল। চিম্‌নিও দেহ এলাইয়া দিয়া অবসাদের মুদ্রায় ঝোপের আড়ালে নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল। বোধ হয় ক্ষণিকের জন্য সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ একটা অজানা কারণে সে তীব্র গতিতে সটান সজাগ হইয়া বসিল। ভোরের আলো তখনও আকাশপথে দেখা দেয় নাই; শুধু তার আগমনের আবছা একটা রেশমাত্র অন্ধকারের গভীরতাকে কতকটা দাবাইয়া আনিয়াছে। সেই ঈষৎ হাল্কা অন্ধকারের গহ্বর হইতে একটা লোক হঠাৎ একান্ত নিঃশব্দে চিম্‌নির পায়ের দিকে মাথা তুলিয়া উঠিয়া কর্কশ বিজাতীয় কণ্ঠে ও ভাষায় তাহাকে শাসাইয়া কি যেন বলিয়া উঠিল। চিম্‌নি অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে, এটা আবার কে? কোথা থেকে এল। এই, আরে···" লোকটা ক্ষিপ্ত কুকুরের মত খ্যাঁক করিয়া উঠিয়া দুই হস্তে দুইটা রিভলভার উঁচাইয়া তাহাকে উঠিতে ইঙ্গিত করিল। চিম্‌নি এবার বুঝিল এ শত্রুপক্ষ। "তবে রে, দাঁড়া! তোকে দেখাচ্ছি।" বলিয়া চিম্‌নি অর্দ্ধশায়িত অবস্থা হইতেই নিজ দেহ উৎক্ষিপ্ত করিয়া লোকটার মধ্য-প্রদেশে জোড়া পায়ে পদাঘাত করিল। লোকটার কোন অসাবধানতা দোষ ছিল না। সাধারণ মানুষ শায়িত অবস্থায়

থাকিলে, তাহা হইতে যতটা দূরে থাকিলে নিজেকে নিরাপদ বিবেচনা করা যায় সে তাহা অপেক্ষা আরও এক ফুট আন্দাজ অধিক দূরেই ছিল। অন্ধকারে সে বুঝিতে পারে নাই যে মানবদেহ কখন এতটা লম্বা হয় বা হইতে পারে। হাঁটু গুটাইয়া চিম্‌নি শুইয়া ছিল। তাহার পক্ষে চার-পাঁচ ফুট দূরের লোককে পদাঘাত করা সহজসাধ্যই ছিল। লোকটা চিম্‌নির প্রচণ্ড পদাঘাতে একটা জান্তব আওয়াজ মাত্র করিয়া ধরাশায়ী হইল। চিমনিও দ্রুত উঠিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিল। ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না; কেননা ধর্ষিত ব্যক্তি তখন স্বপ্নলোকে। চিম্‌নি "ব্যাটা, মরল না কি?" বলিয়া তাহাকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া, তাহার অস্ত্রশস্ত্র নিজের ঝোলার মধ্যে ভরিয়া লইল। তারপর অদূরে বসিয়া দেখিতে লাগিল লোকটা ওঠে কি না।

তখন আকাশ ধূসর হইতে ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। লোকটা একবার নড়িল চড়িল বলিয়া মনে হইল। চিম্‌নি তাহার সামরিক শিক্ষা অনুযায়ী তাহার হাত পা বাঁধিয়া দিল। লোকটা চোখ খুলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। চিমনি বলিল, "এই তুম কোন্ হায়?" লোকটা নির্ব্বাক। "ব্যাটা তুই কে রে? দেখতে ত চীনের মত, আবার কেমন কেমন যেন; তুই কে রে? কোন্ হায়?" লোকটা উত্তর দিল, "জাতা খাশ!" চিম্‌নি বলিল, "যাতা খাস আবার কি? আমি কেন যা তা খেতে যাব। তোর ইচ্ছে হয়, তুই খাস।" লোকটা বলিল, "এশ্‌তা।" চিমনি বলিল, "তোমার মাথা আর মণ্ডু।" তারপর লোকটাকে তুলিয়া লইয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। লোকটা তাহাকে দুই-এক বার লাথি মারিতে ও কামড়াইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু চিম্‌নি তাহার গলাটা ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দেওয়ার পরে সে শান্ত ও-সুবোধ বালকের মত চুপ করিয়া রহিল। একটা ডাঙা জমি পার হইয়া চিম্‌নি দেখিল একটা শস্যক্ষেত্র। ক্ষেত্রের অপর পার্শ্বে একটা ছোট বাড়ী।

বন্দী ব্যক্তিকে বাড়ীটার সম্মুখে একটা গাছের সহিত বাঁধিয়া ও তাহার মুখে একটা কাপড় গুঁজিয়া দিয়া চিমনি বাড়ীর মধ্যে কি আছে দেখিবার জন্য অগ্রসর হইল। বাড়ীর বারান্দাটা বেশ পরিষ্কার ও বাড়ীর ভিতরে যাইবার জন্য একটা দরজা। চিম্‌নি অতি সন্তর্পণে দরজাটা একটু ফাঁক করিয়া দেখিল, ভিতরে আধ-অন্ধকার, কিন্তু কেহ নাই। দরজাটা অল্প অল্প করিয়া আরও ফাঁক করিয়া চিম্‌নি ঘরের ভিতরে মাথা ঢুকাইয়া দেখিল একটা নেয়ারের খাট ও দেয়ালে হেলান-দেওয়া একটা সঙ্গীন-চড়ান বন্দুক। তা ছাড়া একটা ছোট টেবিলের উপরে দুটা কার্ত্তুজের বেল্ট ও একটা খাকি রঙের সামরিক থলি ও জলের বোতল। বুঝিল কোন সৈনিক ঐ ঘরে থাকে। চিম্‌নি দ্রুতগতি ঘরে ঢুকিয়া বন্দুকটি করায়ত্ত করিল ও তৎপরে ঘরের অপর দিকের দরজা খুলিয়া বাড়ীর ভিতরের বারান্দায় উপস্থিত হইল। দেখিল দুই পার্শ্বে দুইটি ঘর তালা বন্ধ ও উঠানের অপর দিকে বোধ হয় ভৃত্যদের থাকিবার একটি কাঁচা-পাকা ঘর—গাছের ডাল দিয়া ছাউনি করা। চিম্‌নি ধীরে ধীরে উঠানটা পার হইয়া নিঃশব্দে সেই ঘরটার নিকট উপস্থিত হইল। তারপর নিজের রবারের গদাটা ডান হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া এক ধাক্কায় দরজাটা খুলিয়া দিল। দরজটা এক ঝট্‌কায় খুলিয়া দেয়ালে দড়াম করিয়া লাগিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে কে যেন তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার করিল ত আর থামিতে চাহে না। সে তীব্র আর্ত্তনাদ অক্লান্ত আবেগে পাগলের মুখে ক্লারিওনেটের মত কর্ণ বধির করিয়া মুখর হইয়া উঠিল। চিম্‌নি চীৎকার করিয়া বলিল, "আরে, আরে, থাম্ না, কে রে বাবা; সাপে কামড়াল নাকি?"

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ঘরের ভিতরের স্ত্রীলোকটি আর্ত্তনাদ স্থগিত রাখিয়া বাহিরের দিকে আগাইয়া আসিল। চিম্‌নি দেখিল একটি অল্পবয়স্কা রমণী, তাহার পরিধানে রঙিন লুঙ্গি ও খাটো ঝুলের কোট; কেশপাশ জড়াইয়া জড়াইয়া মাথার উপরে পরিপাটি জটার মত করিয়া বাঁধা। চিম্‌নিকে দেখিয়া রমণী হাত-মুখ নাড়িয়া দুর্ব্বোধ্য ভাষায় অনেক কিছু প্রশ্ন করিয়া ফেলিল। চিম্‌নি কিছু না বুঝিয়া বলিল, "আরে, হাম, তুম—আপকা বাত নাহি বুঝতা।"

কে রে বাবা; সাপে কামড়াল নাকি?"

রমণী প্রত্যুত্তরে হাতের ভঙ্গিতে বুঝাইল যে চিম্‌নি দীর্ঘকায় কিন্তু অল্পায়তন ব্যক্তি কোথায়? খর্ব্বকায় ব্যক্তির বর্ণনা করিতেও তাহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। চিম্‌নি এক গাল হাসিয়া বলিল, "ও সে ব্যাটাকে গাছে বেঁধে রেখে এসেছি।" তৎপরে জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু খাবার আছে?" রমণী বুঝিতে না পারায় হাত তুলিয়া মুখে লাগাইয়া বুঝাইতে রমণী কি বলিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল ও অনতিবিলম্বেই একটা বড় বাটিতে কি সব খাদ্যদ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিল। চিম্‌নি বন্দুক, গদা, থলি প্রভৃতি একপার্শ্বে রাখিয়া খাদ্যবস্তু সন্তর্পণে চাখিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। দুই-এক গ্রাস খাইয়া মন্দ লাগিল না। সে বেশ গুছাইয়া মাটিতে বসিয়া খাইতে সুরু করিল। রমণী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে কি সব বলিয়া আরও অপর খাদ্য-সম্ভার আনিয়া বাটিতে ঢালিয়া দিতে লাগিল। চিম্‌নি দন্তবিকাশ করা ব্যতীত অপর কোন উপায়ে তাহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে অক্ষম হইয়া খাইয়া চলিতে লাগিল; প্রায় খাওয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় রমণী চিম্‌নির পশ্চাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ভয় ব্যাকুল কণ্ঠে হাঁই-মাই করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চিম্‌নি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্ব্বেই কে আসিয়া তাহার উপরে সবলে পতিত হইল ও তাহাকে কুস্তির প্যাঁচের মত করিয়া ধরিয়া উল্টাইয়া ফেলিয়া তাহার বুকে চড়িয়া বসিল। চিম্‌নি দেখিল তাহার ইতিপূর্ব্বের বন্দী কোন উপায়ে বন্ধন মুক্ত করিয়া আসিয়া তাহার উপর আক্রমণ করিয়াছে। লোকটা চট্ করিয়া নিজের জামার ভিতর হইতে একটা ছুরি বাহির করিয়া চিম্‌নির বুকে বসাইবার জন্য উদ্যত হইল। চিম্‌নি কোন উপায়ে একটা হাত ছাড়াইয়া লইয়া উহার ছুরির হাতলটা ধরিয়া ফেলিল। লোকটা খর্ব্বাকৃতি হইলেও বেশ জোরাল ছিল এবং চিম্‌নির সে যাত্রায় কি হইত বলা যায় না কিন্তু এমন-সময় ঐ রমণীটি দ্রুতগতি সেই খাবারের বড় বাটিটা তুলিয়া সবলে খর্ব্বকায় লোকটার মাথায় আঘাত করিল। লোকটা এই অতর্কিত আক্রমণে ক্ষণিকের জন্য ঘাবড়াইয়া গেল ও চিম্‌নি সেই সুযোগে তাহার হাত হইতে ছুরিটা ঝাঁকড়ানি দিয়া ফেলিয়া দিল। তারপরে এক হাতেই তাহার মাথার চুল ধরিয়া তাহাকে নিজের বুকের উপর হইতে টানিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপর চড়িয়া বসিল। "তবে রে, পেছন থেকে মারিস! তবে আমিও মারি, দেখ!" বলিয়া তাহাকে সবেগে এক চপেটাঘাত করিল। চড়ের আওয়াজটা পিস্তল ছোড়ার মত সশব্দে বাজিয়া উঠিল ও লোকটা তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। চিম্‌নি বলিল, "ব্যাটা এক চড়েই অজ্ঞান, আবার ছুরি বের করে।" বলিয়া তাহাকে আপাদমস্তক দড়ি জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তৎপরে নিজের অস্ত্রশস্ত্র সরঞ্জাম উঠাইয়া লোকটাকে কাঁধে তুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তখন বেশ আলো হইয়া গিয়াছে। এদিক-ওদিক দেখিতেই প্রায় মাইল দুই দূরে দেখিল একটা ছোট পাহাড়।

বুঝিল ঐখানেই যাইবার কথা। ঝোপঝাড় গাছপালা দেখিয়া দেখিয়া গা ঢাকা দিয়া চিম্‌নি সেই দিকে অগ্রসর হইল। কিছুদূর চলিবার পর পশ্চাতে পদধ্বনি শুনিয়া চট্ করিয়া ঘুরিয়া দেখিল সেই রমণী তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে। চিম্‌নি বলিল, "আরে তুমি, আপনি কাঁহা যাতা হায় ?"

রমণী হাসিয়া কি যেন বলিল, চিম্‌নি বুঝিল না। পরে পাহাড়টা দেখাইয়া তাহাকে বুঝাইল সে সেইখানে যাইতেছে ও তাহাকে ইঙ্গিতে বলিল ফিরিয়া যাইতে। রমণী মাথা নাড়িয়া বলিল সে যাইবে না, চিম্‌নিরই সহিত যাইবে।

চিম্‌নি বলিল, "দ্যুৎ, কোথায় যাবে ? লড়াই হবে যে।"

নারী হাসিল, কিছু বলিল না। চিম্‌নি বুঝিল বাক্যালাপে কোন ফল হইবে না। সে তখন বন্দী ব্যক্তির পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিয়া সঙ্কেতে বলিল, "আগে, আগে চল" ও তৎপরে তাহার কোমরের দড়ি হস্তে ধরিয়া পুনরায় চলিতে লাগিল।

লোকটা চিম্‌নির অলক্ষিতে ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া সোজা পথ ছাড়িয়া ডান দিকে যাইতে লাগিল। হঠাৎ এক বৃক্ষ-শোভিত উচ্চভূমির নিকটে আসিয়া স্ত্রীলোকটি দৌড়াইয়া চিম্‌নির হাত চাপিয়া ধরিয়া চিম্‌নিকে ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি বলিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও এক ঝটকায় দড়ি ছাড়াইয়া পালাইবার চেষ্টা করিল। চিম্‌নি তাহাকে হেঁচকা টানে নিজ কবলে আনিয়া পুনর্ব্বার পা বাঁধিয়া শোয়াইয়া দিল। রমণী ইসারাতে বুঝাইল ঐ বৃক্ষরাজির অপর পার্শ্বে বিপদ। চিম্‌নি বুঝিল বন্দী তাহাকে নিজের দলের লোক আছে এমন জায়গায় লইয়া যাইতেছিল। তখন তাহারা বন্দীকে পুনরায় উঠাইয়া লইয়া অতি সন্তর্পণে লুকাইয়া লুকাইয়া সেই স্থল ত্যাগ করিল। প্রায় সিকি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা একটা উচ্চ ডাঙ্গাজাতীয় স্থানে পৌঁছাইয়া ঝোপের আড়াল হইতে দেখিল যে পূর্ব্বপরিত্যক্ত বৃক্ষমালার অপর দিকে একটা সামরিক ঘাঁটির মত কিছু রহিয়াছে। সেখানে চার-পাঁচ জন সৈনিক ঘোরাফেরা করিতেছে। তাহারা পুনর্ব্বার সেই পাহাড়ের দিকে চলিতে লাগিল।

কিছুকাল চলিবার পরে চিম্‌নির সহযাত্রিণী হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল ও সঙ্কেতে চিম্‌নিকে থামিতে বলিল। তৎপরে সে বেশ জোরে জোরে শিষ দিতে আরম্ভ করিল। চিম্‌নি "আরে, আরে শুনতে পাবে যে !" বলিয়া বাধা দিতে নারী তাহাকে আশ্বস্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা নালার ভিতর হইতে একজন মধ্যবয়স্ক লোক বাহির হইয়া আসিল। সে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চিম্‌নিরা যে-স্থলে ছিল সেখানে চলিয়া আসিল। এ ব্যক্তি সাধারণ রকম বস্ত্র পরিহিত ও তাহাকে দেখিলে মনে হয় যে দীর্ঘকাল কষ্ট সহ্য করিয়া দিন কাটাইয়াছে। সে আসিয়াই রমণীকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল ও রমণী তাহাকে উত্তরে যাহা বলিল তাহা শুনিয়া খুশী হইয়া উঠিল। তৎপরে সে বিনা বাক্যব্যয়ে বন্দী সৈনিককে এক পদাঘাত করিয়া তীব্র ভাষায় দুর্ব্বোধ্য গালিগালাজ করিয়া নিজ ভূমিকার শেষ করিল। চিম্‌নি বলিল, "আরে, এ আবার কে ? মারিস কেন ওকে ?" তৎপরে তাহাদিগকে কোন কথা বুঝান অসম্ভব জানিয়া বন্দীকে পুনরায় কাঁধে তুলিয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

দুই-তিন ঘণ্টাকাল হাঁটিয়া, হামাগুড়ি দিয়া তাহারা অবশেষে সে পাহাড়টার সানুদেশে উপস্থিত হইল। চিম্‌নি অতঃপর কি করিবে চিন্তা করিতেছে এমন সময় পরিচিত প্রথামত কে হাঁকিয়া উঠিল, "হল্ট্ ! হু কামস দেয়ার ?" চিম্‌নি চীৎকার করিয়া উঠিল, "আরে আমি, হাম হায়—মানে ফ্রেণ্ড !" উত্তরে কে বলিল, "ব্যাটা সপরিবারে হাজির। আবার কাঁধে খোকাও রয়েছে। এই চিম্‌নি, বলি এগুলোকে জোটালি কোথা থেকে ?" বলিতে বলিতে অজয় ও আরও তিন-চার জন সৈনিক হঠাৎ আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। চিম্‌নি বলিল, "আমি এইটাকে ধরে এনেছি আর ওরা নিজেরাই চলে এল ত আমি কি করব।"

অজয় বলিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, তুই আর কি করবি? ওরা চলে এল।"

পাঞ্জাবী নায়ক বলিল, "আরে শুমনি, তুম একঠো আদমি পকড় ল্যায়া ত উস্‌কা বাপ বহিন কো ভি সাথ লে লিয়া?" চিম্‌নি বলিল, "ধ্যেৎ! আমি···হাম উস্‌কো ইস্‌কো কিসিকো নাহি ল্যায়া। তুম জিগাস করো।" ইতিমধ্যে একজন সেনানায়ক সে স্থলে আসিয়া পড়ায় এই আলোচনা স্থগিত রহিল। একজন দোভাষী আসিল ও তাহার সাহায্যে জানা গেল যে এই রমণী ঐ ব্যক্তির কন্যা এবং উভয়ের বাসস্থান দখল করিয়া বন্দী ব্যক্তি একটি স্থানীয় ঘাঁটি বানাইয়া বাস করিত। এই এলাকায় অধিক শত্রুসৈন্য নাই। এইরূপ ছোট ছোট ঘাঁটি মাত্র চারিদিকে আছে। শত্রুপক্ষ এই উপায়ে এই স্থলের অধিবাসীদিগের ঘরে ঘরে বাস করিয়া একাধারে দেশ দখল, পাহারা ও নিখরচায় বাস—তিন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছে। কোথায় কোথায় কি প্রকার ঘাঁটি আছে তাহার খবরও পাওয়া গেল।

আকাশবাহিনীর প্রধান সেনানায়কের নিকট এই সকল খবর পৌঁছাইলে তিনি চিম্‌নিকে তলব করিলেন ও তাহার নিকট তাহার সকল কার্য্যকলাপ মনোযোগ সহকারে শুনিলেন। তৎপরে বলিলেন যে চিম্‌নি এই অভিযানের কার্য্য সফল করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে; কেননা এত অল্প সময়ের মধ্যে এত খবর পাওয়াতে তাহারা অতঃপর বিলম্ব না করিয়াই শত্রু নিপাত কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিবে। চিম্‌নি এই জন্য বিশেষ পুরস্কার ও সম্মান লাভ করিবে। তিনি তৎপরে বলিলেন যে উক্ত রমণী ও তাহার পিতাও পুরস্কৃত হইবে ও তাহাদের যথাশীঘ্র কোন নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। রমণী ও তাহার পিতা পুরস্কার পাইয়া খুব খুশী হইল এবং দোভাষীর দ্বারা জানাইল যে তাহারা শত্রুহস্ত-মুক্ত হইয়া চিম্‌নির নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। চিম্‌নি বলিল, "আরে আমি ওদের কোথায় বাঁচালাম? ওরা ত নিজে নিজেই চলে এল। তা ছাড়া ঐ মেয়েটা বাটি দিয়ে ওকে এক ঘা না লাগালে ত ও ব্যাটাই আমায় ছুরি মেরে দিত।"

অজয় বলিল, "দূর গাধা! তুই ও মেয়েটাকে উদ্ধার করেছিস। ওর উচিত তোর গলায় মালা দেওয়া আর তোর উচিত এর পরে সুখে-স্বচ্ছন্দে চিরদিন বেঁচে থাকা। কি বল নায়কসাহেব?"

নায়ক হেঁ হেঁ করিয়া হাসিয়া বলিল, "জরুর, বেশখ, বিলকুল ঠিক বাত।"

দোভাষী তাহাদের কথাবার্ত্তা বরাবর তর্জ্জমা করিতেছিল। রমণীর পিতা তাহা শুনিয়া বলিয়া উঠিল যে, সকল পুরস্কার অপেক্ষা বড় পুরস্কার হইবে চিম্‌নির মত জামাতা লাভ করিলে। মেয়েটিকেও খুব নারাজ বলিয়া মনে হইল না। চিম্‌নি লজ্জায় লাল হইয়া ঘামিয়া উঠিয়া বলিল, "ধ্যেৎ, আমার বাবা নেই এখানে আমি বিয়ে করব কি করে? তা ছাড়া ও ত আমার কথাই বুঝবে না।"

অতঃপর সকল সৈনিকরা নানাবিধ উপহার প্রভৃতি দিয়া উক্ত রমণী ও তাহার পিতাকে বিদায় দিল। তৎপরে আসন্ন সংগ্রামের আয়োজন চলিতে লাগিল। ভোর হইতেই অনেক লোকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাওয়াই জাহাজ হইতে প্যারাশুট নিক্ষিপ্ত অপরাপর অস্ত্র সরঞ্জাম খুঁজিয়া জোগাড় করিয়া আনিয়া একত্র করিতেছিল। এখন সকলে মিলিয়া এই পাহাড়টার চারিদিকে সেই সকল ছোট-বড় কামান, যন্ত্রবন্দুক, বোমানিক্ষেপ-যন্ত্র, কাঁটাতার প্রভৃতির সাহায্যে ও মাটি কাটিয়া প্রাকার পরিখা ইত্যাদি বানাইয়া নিজেদের একটা দুর্গের মত আস্তানা গড়িয়া ফেলিল। এইখান হইতে নানাদিকে যোদ্ধাবাহিনী পাঠাইয়া শত্রুদিগকে বিধ্বস্ত করা হইবে স্থির হইল। আর একদল সৈন্য পাহাড়ের অপর পার্শ্বে গাছ কাটিয়া, জমি সমতল করিয়া হাওয়াই জাহাজ নামিবার একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। সকলেই দ্রুতগতিতে কাজ করিয়া চলিল; কেননা অনতিবিলম্বেই শত্রুপক্ষ তাহাদের আক্রমণ করিবে একথা স্থির-নিশ্চয়।

॥ ৬ ॥

পাহাড়ের উপরে একস্থলে কয়েকটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড পরস্পরের গাত্রে অল্পবিস্তর সংলগ্ন ভাবে অবস্থিত। মনে হয় যেন উন্মাদ কল্পনার আবেগে কোন এক দানব-শিল্পী কিছু একটা গড়িয়া তুলিতে গিয়া নির্ম্মাণ-কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া হঠাৎ চলিয়া গিয়াছে। এই দানবীয় কক্ষের তিন পার্শ্বের দেওয়াল দৈর্ঘ্যে একে অপরের সহিত অসমান হইলেও তাহাদের ভিতর দিয়া যাতায়াতের কোন সহজ অতিক্রম্য পথ নাই। দেওয়ালের গাত্রে শীলাখণ্ডগুলির আকার-বৈষম্যের ফলে বহুসংখ্যক ছোট-বড় গুহার সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার কোন কোনটি মানুষের বাসের উপযুক্ত। চতুর্থ পার্শ্বের দেওয়ালটি নাই বলিলেই চলে। চিম্‌নির দলের সেনানীরা এই স্থানটি অধিকার করিয়া নিজেদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। কোথাও অস্ত্র-সরঞ্জামের ভাণ্ডার, কোথাও খাদ্য অথবা ঔষধাদি রক্ষিত, কোথাও বা কয়েকটি গুহার মধ্যে সেনানীরা শয্যা বিস্তার করিয়া শয়নকক্ষ রচনা করিয়াছে। এইরূপ একটি গুহার অভ্যন্তরে চিম্‌নি, অজয় ও অপর তিন-চার জন প্যারা-সৈনিক নিদ্রা যাইতেছিল।

চিম্‌নি স্বপ্ন দেখিতেছিল যে কলিকাতার ময়দানে ফুটবল খেলা হইতেছে। ভীষণ ভীড় ও হট্টগোল। একজন খেলোয়াড় বলটাতে পদাঘাত করিতেই বলটা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমশঃ আকারে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে হইতে শোঁ শোঁ আওয়াজ করিয়া দ্রুতগতিতে সুদূর আকাশে মিশাইয়া গেল। কে যেন চিৎকার করিয়া উঠিল "গোল, গোল"। অমনি সহস্র কণ্ঠে বিকট নিনাদে "গোল, গোল" শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল। চিম্‌নি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল অজয় নিদ্রা হইতে উঠিয়া গান ধরিয়াছে, "আহা জাগি পোহাল বিভাবরী; অতি ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী"। আর একজন বলিল, "থাম্‌ না বাবা; এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পাথরের উপর শুয়ে ক্লান্ত নয়ন, না ক্লান্ত তবিয়ত।"

"ক্লান্ত 'তবিয়ত' মানে?"

"তবিয়ত মানে জানিস্‌ না? হিন্দুস্থানী কথা। সর্ব্বার্থবাচক শব্দ। 'এথি'র মত। জিনিস কিনতে চাস; 'এথি' নেই, মানে পয়সা নেই। লোক ঠেঙ্গাতে চাস, 'এথি' নেই, মানে লাঠি নেই। বিবাহ সভায় গিয়ে টোপর পরে বসেছিস, 'এথি' নেই, মানে বউ নেই। তেমনি পেট খারাপ হলে 'তবিয়ত' মানে পেট। মাথা ধরলে 'তবিয়ত' মানে মাথা। পায়ে ফোস্কা পড়লে 'তবিয়ত' মানে ঠ্যাং। এ ক্ষেত্রে শক্ত পাথরের উপর 'গ্রাউণ্ড শীট' পেতে শুয়ে 'তবিয়তে' ব্যথা হয়ে গেছে, মানে…"

"থাক্‌ আর মানে শুনে দরকার নেই। তার থেকে যাও ঘুম থেকে উঠে অবধি পেটে কিছু পড়ে নি—'এথি' নিয়ে এস গিয়ে।

চিম্‌নি জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রে, বলটা আকাশে উড়ে গেল, ত 'গোল, গোল' করে চেঁচিয়ে উঠল কেন? আকাশে কি করে গোল হ'ল?"

অজয় বলিয়া উঠিল, "এই রে, ক্ষেপে গেছে। নির্ঘাত ক্ষেপে গেছে! এই চিম্‌নি, কি আবোল-তাবোল বকছিস? আকাশে গোল কি রে? আকাশ ত তিন কোণা আর তেবড়া। জিয়োগ্রাফিতে পড়িস নি? গোল কি রে?"

চিম্‌নি বলিল, "ধ্যেৎ! "আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।"

"ওঃ, স্বপ্ন দেখছিলে? ব্যাটা আমার সোনার 'এথি', যাও ত বাবা ছোট্ট ছোট্ট পা দুখানি হাঁটি হাঁটি করে ঐ দিক থেকে ছোট্ট হাতের দুমুঠো বিস্কুট তুলে আন ত। 'তবিয়ত' চোঁ চোঁ করছে।"

চিম্‌নি বলিল, "আমায় যদি না দেয়?" "দেবে না আবার, আলবাৎ দেবে। যা না বল গিয়ে 'এথি' সাহেবের অর্ডার।" চিম্‌নি উঠিয়া চলিল।

কয়েক মিনিট পরে চিম্‌নি একটা বস্তা কাঁধে লইয়া ফিরিয়া আসিল। অজয় চিৎকার করিয়া উঠিল, "এই, থলের

মধ্যে কি রে? বললাম বিস্কুট নিয়ে আয়; না গিয়ে এক বস্তা আটা না চাল নিয়ে এল! তোকে নিয়ে আর পারা যায় না।"

"বা রে! বিস্কুটই ত নিয়ে এলাম। তুই ত বল্‌লি বিস্কুট। আমি গিয়ে জিগ্যেস করলাম বিস্কুট কোথায়। বললে ঐ থলেতে আছে। আমি উঠিয়ে আনলাম। জিগ্যেস করলে "এই কাঁহা লে যাতা।" বললাম এথি সাহেবের অর্ডার, ত ছেড়ে দিলে। হ্যাঁ রে এথি সাহেব কে। নতুন কোন অফিসার বুঝি। তোদের এত বিস্কুট দিয়ে দিলে। খুব ভাল সাহেব ত।"

সকলে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠাতে চিম্‌নি অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "যাঃ, তামাশা করছিস বুঝি।"

অজয় বলিল, "না না, তামাশা করব কেন? তামাশা সুরু হবে এক থলে বিস্কুট-সমেত ধরা পড়লে। এরোপ্লেন ছাড়া মাল আসবে না, তাই হুকুম খুব কম কম খাওয়ার আর তুই গিয়ে দশ দিনের খোরাক তুলে আনলি!"

চিম্‌নি বলিল, "তুই ত বললি, এথি সাহেব অর্ডার দিয়েছে।"

সকলে চিম্‌নির কথার উত্তর না দিয়া বিস্কুটগুলি পৃথক পৃথক পুঁটুলি বাঁধিয়া নানান খাঁজে খোঁজে লুকাইয়া ফেলিতে লাগিল। চিম্‌নি অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল।

অতঃপর সকলে বসিয়া কোকো ও বিস্কুট খাইয়া একটু আরাম করিবে বলিয়া বসিয়াছে এমন সময় কোঁ কোঁ করিয়া একটা বাঁশী বাজিয়া উঠিল। হাওয়াই আক্রমণের সঙ্কেত বুঝিয়া সকলে তীব্রগতিতে ব্যবস্থামত ছদ্মবেশের জাল প্রভৃতি এদিক ওদিক টানিয়া মাল-মশলা ঢাকা দিয়া নানান দিকে লুকাইয়া পড়িল। হুকুম ছিল শত্রুপক্ষ বোমা বর্ষণ করিলেও কোন প্রকার প্রত্যাক্রমণের চেষ্টা করা হইবে না। শত্রুকে যথাসম্ভব নিজেদের আশ্রয়স্থল জানিতে না দেওয়াই উদ্দেশ্য। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনতিউর্দ্ধে কয়েকটি শত্রু-বিমান দেখা গেল। তাহারা বোমা না ফেলিয়া শুধু ইতস্ততঃ যন্ত্র-বন্দুকের গুলী বর্ষণ করিয়া ক্রমে দূরে মিলাইয়া গেল। যে-স্থলে ভারতীয় প্যারা-সৈনিক দল আস্তানা করিয়াছিল সেদিকে কোন গুলীগোলা সৌভাগ্যক্রমে বর্ষিত হইল না। "অল ক্লীয়ার" সঙ্কেত পাইলে পর সকলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় বাহিরে আসিয়া জটলা আরম্ভ করিল। শীঘ্রই কিন্তু আদেশ আসিল যে শত্রুপক্ষ এই আস্তানার কোন খবর পাইয়াছে কি না তাহা না জানা অবধি সকলে অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। তৎক্ষণাৎ পাহাড়ের বিভিন্ন অঞ্চলে কামান ও যন্ত্র-বন্দুকের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ও পরিখাসমূহে অতিরিক্ত সৈনিক পাঠান আরম্ভ হইল। চিম্‌নি ও অজয় আরও তিন-চার জন সৈনিকের সহিত একটা যন্ত্র-বন্দুকের কেন্দ্রে প্রেরিত হইল। সেখানে তিনটি যন্ত্র-বন্দুক বসান হইয়াছিল। আশেপাশে ঘনপল্লব বৃক্ষমালা বর্ত্তমান থাকায় অতি নিকটে না আসিলে বুঝিবার উপায় ছিল না যে সে-স্থলে শত্রু-নিপাতের অত সরঞ্জাম রক্ষিত আছে। সকলে চুপ করিয়া নিজ নিজ স্থানে বসিয়া রহিল। ধূমপান অথবা কোন প্রকার আওয়াজ করা বারণ। ফিসফাস করিয়া ইসারায় কথা বলা চলে কিন্তু প্রাণ খুলিয়া গল্পগুজব করা অসম্ভব।

প্রায় দুই ঘণ্টা কাল সকলে এই প্রকার চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া কাটাইল। হঠাৎ প্রায় দুই-তিন শত গজ দূরে কতকটা ঝোপঝাড়ের-পাশ দিয়া জন চার-পাঁচ লোক বাহির হইয়া আসিল। এই স্থলে যে সেনানায়ক ছিল সে সঙ্কেতে সকলকে গুলী চালাইতে প্রস্তুত হইতে বলিল; কিন্তু যখন ঐ লোকগুলির পশ্চাতে আর কেহ আসিল না তখন ইসারায় গুলী বর্ষণ স্থগিত রাখিতে বলিল। সাত-আট জন সৈনিককে বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া অনুসরণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া সে আস্তে আস্তে অতি নিঃশব্দে গুড়ি মারিয়া উক্ত লোকগুলির আগমনপথের পাশ কাটাইয়া একটা ঘন বৃক্ষকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইল। সঙ্গীনধারী সৈনিকগণও তাহার পশ্চাতে তাহারই অনুকরণে

আগাইয়া চলিল। অনতিবিলম্বেই তাহারা যন্ত্র-বন্দুক কেন্দ্র হইতে পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে গিয়া আত্মগোপন করিয়া ওঁৎ পাতিয়া শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

শত্রুপক্ষের লোকগুলি তাহাদের প্রায় গায়ের উপর দিয়া অসন্দিগ্ধ চিত্তে যন্ত্র-বন্দুকের আস্তানার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা সঙ্গীনধারী সৈনিকদিগকে পার হইয়া যখন আরও দশ-বার গজ আগাইয়া আসিয়াছে তখন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে তীব্রগতিতে সঙ্গীনধারীরা তাহাদের আক্রমণ করিল। এক ব্যক্তি কিছু বুঝিবার পূর্ব্বেই সঙ্গীন-বিদ্ধ হইয়া পড়িয়া গেল ও অপর তিন-চার জন দ্রুত পদে যন্ত্র-বন্দুক কেন্দ্রের উপরে আসিয়া পড়িল। সম্মুখে শত্রু ও পিছনে শত্রু দেখিয়া তাহারা হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া গেল। তৎপরে যুদ্ধচেষ্টা একান্ত বিফল হইবে জানিয়া হস্তের অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কে একজন চিম্‌নিকে বলিল, "সবক'টাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল।" চিম্‌নিও এক লম্ফে একখণ্ড রজ্জু লইয়া তাহাদের সকলকে একত্রে জড়াইয়া বাঁধিয়া ফেলিল। মনে হইতে লাগিল যেন বহু-মুণ্ড ও অবয়ব-সম্পন্ন এক অতিকায় রাক্ষসকে বন্দী করা হইয়াছে। সেনানায়ক চিম্‌নিকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, বন্দিগণকে পৃথক পৃথক করিয়া বাঁধিতে। চিম্‌নি পুনর্ব্বার "আগে বললেই হ'ত, আলাদা আলাদা" বলিয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বন্ধনে বন্দী করিল।

লোকগুলাকে পিঠ-মোড়া করিয়া বাঁধিয়া একপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া সকলে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় চুপ করিয়া অজানার প্রতীক্ষায় নিযুক্ত হইল। আরও দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সেনানায়ক চিম্‌নি ও আর দুই জন সৈন্যকে বলিল পর্ব্বত অভ্যন্তরস্থ ঘাঁটি হইতে খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিতে। তাহারা নিঃশব্দে চলিয়া গেল ও আধ ঘণ্টা পরে টিনজাত খাদ্য-দ্রব্য আহরণ করিয়া ফিরিয়া আসিল। কোন প্রকার আগুন জ্বালা এখন বারণ, তাই গরম খাবার কিছু জুটিল না। সকলে পালা করিয়া খাওয়া ও পাহারায় আরও কিয়ৎকাল যাপন করিল। একজন সংবাদবাহক সৈন্য আসিয়া জানাইয়া গেল যে দুই-এক স্থানে অল্প অল্প শত্রু দেখা গিয়াছে কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই গুলী চালাইতে হয় নাই। নয়ত তাহারা কাহাকেও না দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছে অথবা নিঃশব্দ আক্রমণে হতাহত বা বন্দী হইয়াছে। অতঃপর আদেশ এই যে বিভিন্ন কেন্দ্রের সেনানায়কগণ ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত কিছু কিছু লোক পাঠাইয়া এদিক-ওদিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। এই সকল লোক কোন অবস্থাতেই অযথা শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না। যথাসম্ভব আড়ালে থাকিয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া আসিবে। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে যত দূর সম্ভব অল্প গোলমালের সৃষ্টি করিয়া শত্রু নিপাত করিবে। পলায়ন করিতে হইলে নিজেদের আস্তানার দিকে পলাইয়া আসিবে না। শত্রু যাহাতে ভুল বুঝে সেই মত উল্টা দিকে গমন করিয়া দূরে পলাইয়া থাকিয়া রাত্রিকালে ছাউনিতে ফিরিয়া আসিবে।

অজয়, চিম্‌নি ও আরও তিন-চার জন সৈন্য এই অনুসারে যন্ত্র-বন্দুক-কেন্দ্র হইতে নির্গত হইয়া অনুসন্ধান-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। মৃদু কণ্ঠে বাক্যালাপ চলিতে লাগিল এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিয়া সকলে চলিতে লাগিল। পর্ব্বতের সানুদেশে একটা নালার মত ছিল। তাহারা সেই নালা বাহিয়া ক্রমশঃ পর্ব্বত হইতে দূরে অগ্রসর হইতে লাগিল। মাইল দুই চলিলে পর একটা বাঁক ঘুরিতেই দেখা গেল বিস্তৃত একটা সমতল ভূমি ও তাহাতে চার-পাঁচখানা বিমান অবস্থিত। সকলে নিস্তব্ধে গা-ঢাকা দিয়া দেখিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে আরও দুই-একখানা বিমান বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া সেইখানে অবতীর্ণ হইল এবং তাহা হইতে দুই-তিন জন করিয়া বৈমানিক অবতরণ করিয়া কিছু-দূরে অপরাপর বৈমানিকদিগের সহিত মিলিত হইল। আরও কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে পর দেখা গেল যে আর বিমান আসিল না। তখন এই সকল সৈনিক গোপনে নিজ আস্তানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সেখানে পৌঁছিয়া

বিমান-কেন্দ্রের খবর দিতেই এক ব্যক্তিকে অবিলম্বে সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল যে শত্রুরা এইরূপ একটা বিমানের সমাবেশ করিয়াছে।

গভীর রাত্রে খবর আসিল এক বিশেষ সৈন্যদল পাঠাইয়া ঐ বিমানগুলিকে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। জন ত্রিশ সৈনিক যন্ত্র-বন্দুক প্রভৃতি লইয়া দক্ষিণ দিক হইতে সশব্দে একটা আক্রমণ আরম্ভ করিবে এবং বিমানরক্ষী শত্রুদল যখন সেই আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যস্ত থাকিবে সেই অবসরে আরও জন কুড়ি সৈনিক বোমা ইত্যাদি সহকারে উত্তর দিকের নালা হইতে বহির্গত হইয়া তীব্র আক্রমণে বিমানগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে। অজয় গেল দক্ষিণের বাহিনীর সহিত এবং চিম্‌নি রহিল উত্তর দিকের দলে।

ধীরে ধীরে সৈনিকবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ পথে চলিয়া গেল। দক্ষিণ বাহিনীকে অধিকতর পথ অতিক্রমের সময় দিবার জন্য উত্তরের দল নালাটার নিকটে গিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় আগাইয়া চলিল। প্রায় আধঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া উত্তর দিকের সৈনিকেরা নালা ছাড়িয়া সমতল ভূমির উপর উঠিয়া সরীসৃপের ন্যায় মাটির সহিত দেহ সংলগ্ন রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। উদ্দেশ্য, যথাসম্ভব বিমানগুলির নিকটে আসিয়া যাওয়া যাহাতে আক্রমণ আরম্ভ হইলে বিমানগুলি লইয়া শত্রু পলাইতে না পারে। ক্রমশঃ তাহারা বিমানগুলির দুই-তিন শত গজের মধ্যে আসিয়া পড়িল। আর অধিক নিকটে যাওয়া বুদ্ধির কার্য্য নহে, কারণ নিশ্চয়ই শত্রু পাহারার লোক মজুদ রাখিয়াছে।

হঠাৎ একটা লোমহর্ষক রকম চিৎকার করিয়া সমতল ক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে কাহারা বন্দুক চালাইয়া বিকট কোলাহলের সৃষ্টি করিল। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল হইতে নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যারাশুট-সংলগ্ন তীব্র রশ্মিদায়ক আলোকসমূহ আকাশবক্ষে দুলিতে আরম্ভ করিল। শত্রুপক্ষের তরফ হইতে দ্রুতগামী মোটর সাইকেলের ন্যায় আওয়াজ করিয়া যন্ত্র-বন্দুকসমূহ জাগিয়া উঠিল। শত্রু বৈমানিকেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে নিজ নিজ বিমান লইয়া আকাশ-মার্গে পলায়নের জন্য ছুটিল।

চিম্‌নি দুই হস্তে দুইটা বোমা লইয়া তীর বেগে তাহাদের বিমানের উপর ফেলিবার জন্য ছুটিল। সেই অলৌকিক আলোকে উদ্ভাসিত সমরক্ষেত্রে চিম্‌নির দীর্ঘ ও দ্রুতগতিশীল দেহটা আরও বিরাট ও ভীষণ দেখাইতে লাগিল। কেহ বলিল, "বাক আপ চিম্‌নি' কেহবা "সাবাস গুম্‌নি"। শত্রুদলও ক্ষণিকের জন্য মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই চলচ্চিত্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তার পরেই ধাবমান বৈমানিকেরা চিম্‌নির উপর পিস্তল চালাইয়া তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কপালগুণেই হউক বা উভয় পক্ষের গতিচাঞ্চল্যের জন্যই হউক চিম্‌নি অক্ষত শরীরে বিমানগুলির কুড়ি গজের মধ্যে আসিয়া এক, দুই করিয়া উভয় হস্তের বোমাদুইটি বিমানগুলির উপর

চিম্‌নি দুই হস্তে দুইটা বোমা লইয়া তীর বেগে তাহাদের বিমানের উপর ফেলিবার জন্য ছুটিল।

নিক্ষেপ করিয়া মাটিতে টান হইয়া শুইয়া পড়িল। সহসা যেন চতুর্দ্দিক ভূমিকম্পে কাঁপিয়া উঠিল ও দুইটি বোমার প্রায় যুগপৎ বিস্ফোরণে বজ্রাঘাতের ন্যায় একটা আওয়াজ হইল। ইতিমধ্যে অপরাপর সৈনিকরাও আসিয়া পড়িয়া নিজ নিজ বোমাগুলি সেই বিমান সমাবেশের উপর নিক্ষেপ করিয়া ভূমি আশ্রয় করিতে লাগিল। দুই-তিন মিনিটকাল এই প্রলয়লীলা চলিল ও তৎপরে একটা বিরাট্ অগ্নিকুণ্ড বিমানগুলিকে বক্ষে লইয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বোমা-নিক্ষেপকারী ভারতীয় সৈনিকেরা সেই উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুর গুলী অবহেলা করিয়া মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া দৌড়াইয়া দূরে সরিয়া আসিল। দক্ষিণের বাহিনী তখন শত্রুর রক্ষী সেনাদলের সহিত তুমুল সংগ্রামে মাতিয়া উঠিয়াছে।

চিম্‌নি ও তাহার সঙ্গীদিগের কাহারও কোন অধিক আঘাত লাগে নাই। তাহারা জ্বলন্ত বিমানগুলি পশ্চাতে রাখিয়া নালাটার নিকটে আসিয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। বিমানক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে তখন তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধটা ঠিক কি রকম দাঁড়াইত তাহা বলা যায় না। কখন শত্রুপক্ষ কখনও বা ভারতীয় সৈনিকেরা জয়লাভ করিবে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শত্রুদল বিমানগুলি ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় আরও ক্রুদ্ধ ও মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিল। ভারতীয় সেনানীরা তাহাদের উপর অবিরল গুলীবর্ষণ করিয়াও তাহাদের হার মানাইতে সমর্থ হইতেছিল না। তাহারা বিমানক্ষেত্রের এক কোণে একটা আস্তানার মতন গড়িয়াছিল। সেই স্থলে অল্পস্বল্প দ্রব্য সরঞ্জাম ও নিজেদের হস্তে দ্রুত-উৎক্ষিপ্ত প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতির আড়ালে অবস্থিত রহিয়া তাহারা মহাতেজে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। ভারতীয়েরা দুই-এক বার বিপুল বিক্রমে তাহাদের আস্তানার উপর অগ্রসর হইয়া, দুই-চারি জন হতাহত হওয়াতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। উত্তর প্রান্তের সৈন্যদিগের নেতা তখন শত্রুদিগকে বিপরীত দিক হইতে আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

জমাদার ধরম সিং চিম্‌নিকে বলিল, "আরে শুমনি, তুম বহুত আচ্ছা বম্ মারা।"

চিম্‌নি বলিল, "ধ্যেৎ! ক্যা বহুত আচ্ছা? হাম কো আওর বড়া বম্ দেগা তো হাম ছুড়নে পারতা হায়। খালি হামার লোহাকা টুপিমে একটো ছেঁদা হো গিয়া।" চিম্‌নির শিরস্ত্রাণ স্টীলের টুপিতে এক পাশে একটা গুলী লাগিয়া একটা নালা কাটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া ধরম সিং বলিল, "তুমহারা নশিব আচ্ছা হায়। আওর থোড়া ভিতর হোতা, তুমহারা জান চলা যাতা। তুম বহুত বচ গয়া।"

চিম্‌নি বলিল, "বহুত কৈসে বাঁচা? যেতনা বাঁচা থা ওতনাই তো বাঁচা হায়।"

জমাদার সাহেব চিম্‌নির মস্তিষ্ক সম্বন্ধে একটা রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নিজ কার্য্যে মনোযোগ দিল। ইতিমধ্যে সকলে নিজ নিজ অস্ত্র কায়দা মতন ঠিক করিয়া অগ্রসর হইবার আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেনানায়ক অবিলম্বে আদেশ দিলেন সকলে ছড়াইয়া পড়িয়া একে অপর হইতে অন্তত বিশ ফুটের ব্যবধানে অর্দ্ধাবৃত্তাকার গঠনে মাটিতে শুইয়া পড়িয়া শত্রুর ক্রমশঃ নিকটে আসিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে হইবে। যতক্ষণ শত্রুপক্ষ তাহাদের এ প্রচেষ্টা লক্ষ্য না করে ততক্ষণ কোন গুলীগোলা চালাইবার প্রয়োজন নাই। যদি এইরূপে অলক্ষিতে তাহাদের যথেষ্ট নিকটে আসা যায় তাহা হইলে বোমা ছুড়িয়া তাহাদের বিধ্বস্ত করিতে পারা যাইবে। তাহা না পারিলে গুলী চালাইয়া তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া অবশেষে সঙ্গীন চড়াইয়া আক্রমণ করিতে হইবে। সকলে একে অপর হইতে দূরে সরিয়া সরিয়া শীঘ্রই উক্তরূপ অর্দ্ধবৃত্তাকারে গঠিত হইয়া ধীরে ধীরে শত্রুকে ঘিরিয়া ফেলিবার জন্য অগ্রসর হইল। যখন শত্রুর আস্তানা হইতে তাহারা প্রায় একশত গজ দূরে তখন শত্রুপক্ষের কেহ তাহাদের আগমন লক্ষ্য করিয়া একটা যন্ত্র-বন্দুক ঘুরাইয়া তাহাদের দিকে চালাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে ব্যক্তি একই স্থানে গুলী চালাইতে লাগিল। সেই স্থলে যে সৈনিকটি ছিল সে সেই ঘনবর্ষার জলবর্ষণের মত গুলীবৃষ্টিতে আগাইতে অক্ষম হইয়া অসাড়ের মত নিজ স্থলে

শুইয়া রহিল। অপর সৈন্যেরা সেই অবসরে আরও আগাইয়া পড়িল। শত্রু হইতে প্রায় ৫০ গজ ব্যবধানে আসিলে পর হুকুম হইল বোমা নিক্ষেপ করিবার জন্য। এক প্রান্তের এক ব্যক্তি উঠিয়া দ্রুতবেগে কয়েক মুহূর্ত্ত তীব্র গতিতে দৌড়াইয়া একটা বোমা নিক্ষেপ করিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল। বোমাটা শত্রুদের নিকটে পড়িলেও তাহাদের কোন অনিষ্ট করিল না। শত্রুদের পক্ষ হইতে সেই দিকে দশ-বারটা বন্দুকের গুলী একাধারে বর্ষিত হইতে সুরু করিল। ইতিমধ্যে অপর প্রান্তের এক ব্যক্তি উঠিয়া সবেগে ছুটিয়া গিয়া তাহার বোমাটা শত্রুদের উপরে নিক্ষেপ করিয়া শুইয়া পড়িল। পুনরায় শত্রুপক্ষ সেইদিকে গুলী চালাইতে আরম্ভ করিল। তার পরে ক্রমান্বয়ে এক বার এদিক এক বার ওদিক হইতে এক জন এক জন করিয়া উঠিয়া ঐরূপে বোমা ফেলিতে লাগিল। শত্রুরা এতক্ষণে তিন-চারটা যন্ত্র-বন্দুক অপর দিক হইতে ঘুরাইয়া এই দিকের আক্রমণকারীদের উপর অনর্গল গুলী চালাইতে লাগিল। এ অবস্থায় শীঘ্রই আর কাহারও পক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বোমা নিক্ষেপ করা সম্ভব হইল না। দুই-এক জন সাংঘাতিক ভাবে আহত হইল, এবং আহত দিগকে টানিয়া লইয়া পিছনে রাখিয়া আসিতে হইল। চিম্‌নি এক জন আহতকে লইয়া ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয়া নালার দিকে ফিরিয়া চলিল। সেখানে পৌছিয়া দেখিল তাহাদের সঙ্গে যে 'মেশিন গানটা আসিয়াছিল সেটা নালার ভিতরের পশ্চাৎরক্ষী সৈনিকদিগের নিকট রহিয়াছে। সে বলিল সেই যন্ত্রটিকে লইয়া গিয়া শত্রুদের উপর চালাইবে। কেহ আপত্তি করিল না। সকলে বলিল সে যদি একাকী চার মণ ওজনের জিনিসটাকে লইয়া যাইতে পারে ত লইয়া যাউক। চিম্‌নি সমস্ত যন্ত্রটা ও গুলীর বাক্স প্রভৃতি একটা আহত বহন করিবার হাত-খাটের উপরে বাঁধিয়া লইয়া দড়ি দিয়া নিজের কোমরের সহিত বোঝাটা লটকাইয়া লইল। তার পর হামা দিয়া সেই বিরাট্ বোঝা টানিয়া সে বিপুল শক্তিতে যুদ্ধস্থলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পরিশ্রমে ও কষ্টে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু সে ক্রমশঃ ক্ষতবিক্ষত শরীরে টানিয়া টানিয়া সমস্ত আসবাব যথাস্থানে লইয়া আসিল। সেনানায়ক চিৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল সে কি টানিয়া আনিতেছেন।

চিম্‌নি বলিল, "মেশিন গান।"

সেনানায়ক বলিল, "কি বললে? পুরা 'মেশিন গান' তুমি একলা এনেছ?"

চিম্‌নি বলিল, "হাঁ।"

সেনানায়ক তখন হাত-খোন্তা দিয়া মাটি কাটিয়া একটা গাদা করিতে লাগিল এবং অশেষ পরিশ্রমে মিনিট দশ-পনরর মধ্যে একটা উচ্চ মতন আড়ালের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। সেই আড়ালের আশ্রয়ে আরও তিন-চারজন আসিয়া শীঘ্রই সে-স্থলে একটা ভাল রকম গুলীরোধক চিপি গড়িয়া ফেলিল। তৎপরে সেই 'মেশিন গান' খাড়া করিয়া শত্রুর উপর চালান আরও হইল। শত্রুপক্ষ হঠাৎ খোলা ময়দানের মধ্যে একটা 'মেসিন গান গর্জ্জাইয়া উঠিতে দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য হতভম্ব হইয়া গেল। সেই সুযোগে তিন-চার জন সৈনিক দ্রুতবেগে উঠিয়া তাহাদের আস্তানার ঠিক ভিতরে কয়েকটা বোমা ছুঁড়িয়া দিল। গভীর গর্জ্জনে সেই সকল বোমা ফাটিয়া যখন ধোঁয়া সরিয়া গেল তখন দেখা গেল শত্রুদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন জীবিত আছে। তাহাদের চিৎকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বলা হইল। কিন্তু তাহারা সে কথার উত্তর না দিয়া সমানে গুলী চালাইতে লাগিল। দক্ষিণ দিকের ভারতীয় সেনানীরা এতক্ষণ বিশেষ কিছু করিতেছিল না। তাহারা এইবার বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া হঠাৎ বিকট হুঙ্কারে শত্রুর দিকে ধাবমান হইল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র শত্রু। তাহারা মরিয়া হইয়া উহার মধ্যেই কয়েকজন এদিকে ও কয়েকজন ওদিকে গুলী চালাইবার চেষ্টা করিল। উত্তরের সৈনিকেরাও এই সময়ে তীব্র গতিতে তাহাদের উপর সঙ্গীন আক্রমণ করিল। শত্রুরা এই যুগপৎ আক্রমণ আর প্রতিরোধ করিতে পারিল না। তাহারাও তলোয়ার ও সঙ্গীন লইয়া একটা ক্ষুদ্র গণ্ডিতে একত্রে দাঁড়াইয়া লড়িতে লাগিল। তাহারা সকলেই মরিত; শুধু এক পার্শ্বে একটা দড়ির জাল পড়িয়াছিল, সেইটা চিম্‌নির চোখে পড়াতে সে জালটাকে দুই চার

পাট করিয়া হঠাৎ নিজেদের দলের লোকদের মাথার উপর দিয়া ছুঁড়িয়া শত্রুদের শেষ কয়েকজনের উপর ফেলিয়া দিল। গায়ের উপর জাল আসিয়া পড়ায় শত্রুদের হাত চালান বন্ধ হইয়া গেল ও সেই সুযোগে সকলে একযোগে তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদের নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল।

এইরূপে বিমানক্ষেত্রটি দখল করিয়া ও চার-পাঁচখানা শত্রু-বিমান ধ্বংস করিয়া সকলে নিজেদের পর্ব্বত অন্তরালস্থিত আস্তানায় ফিরিয়া চলিল। অজয় আহত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার আঘাত সাংঘাতিক নহে বলিয়া হাঁটিয়াই চলিতেছিল। সে বলিল, "এই চিম্‌নি, আমি স্বপ্ন দেখলাম তিনটে বোয়াল মাছ সিগারেট ধরিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে।" চিম্‌নি বলিল, "কি করে বেড়াতে বেরল? বোয়াল মাছের কি পা আছে?"

অজয় বলিল, "পা নেই ত কি? চাকা ত আছে। চাকার উপরে চলেছে বোঁ বোঁ করে আর ধোঁয়া ছাড়ছে।"

চিম্‌নি বলিল, "ধ্যাৎ।"

॥ ৭ ॥

যে পর্ব্বতের ভিতরে আকাশবাহী সৈনিকেরা আস্তানা করিয়া শত্রুর অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার দক্ষিণেই শত্রুপক্ষের হাওয়াই জাহাজ-কেন্দ্রগুলি ছিল। পর্ব্বতের উত্তরে একটি গভীর অথচ শুধু কুড়ি-পঁচিশ হাত চওড়া পাহাড়ে নদী ও তাহার অপর পারে আর একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত। সেনাপতির আদেশ অনুসারে পাঁচ-ছয় জন সৈনিক ছোট্ট নদীটি পার হইয়া অপর দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। আকাশবাহিনী যদিও এই প্রদেশের মানচিত্রাদি সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিল এবং ভৌগোলিক ভাবে কোন কিছুই সেনাপতির অজ্ঞাত ছিল না, তবুও এই অঞ্চলে শত্রুর ঘাঁটি, গতিবিধি ও অবস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহার সকল সংবাদ যথাশীঘ্র জ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। আকাশবাহিনীর অভিযানের মূল উদ্দেশ্য আংশিক ভাবে এই প্রদেশ অধিকার করিয়া শত্রুকে হটাইয়া রাখা, যাহাতে অপরাপর আরও প্যারা-সৈনিক দল এই স্থলে অবতরণ করিয়া ক্রমশঃ এই স্থানে নিজ পক্ষের হাওয়াই জাহাজ-কেন্দ্রাদি গঠন করিয়া লইয়া পূর্ণ সামরিক শক্তির সমাবেশপূর্ব্বক শত্রুর উপর আক্রমণের ব্যবস্থা করিতে পারে। চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া কেহ যুদ্ধ করিতে পারে না। সেইজন্য প্রয়োজন ছিল শত্রুকে দক্ষিণে রাখিয়া উত্তর দিক শত্রুবিমুক্ত রাখা। সুতরাং আদেশ হইল যে পর্য্যবেক্ষণকারী সৈনিকেরা দুই-তিন দিন ধরিয়া মানচিত্র অবলম্বনে পূর্ণ এলাকা ঘুরিয়া দেখিয়া আসিবে যে, উত্তরে কোথাও শত্রু সমাবেশ আছে কি না এবং থাকিলে তাহাদের শক্তি কি প্রকার ও কিরূপে তাহাদের বিনাশ-ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই পর্য্যবেক্ষণ দলের নেতা হইল একজন মারাঠা লেফ্‌টেনাণ্ট ও তাহার সঙ্গে চলিল একজন রাজপুত জমাদার, চিম্‌নি ও আরও দুই-তিন জন কষ্টসহিষ্ণু সৈনিক।

নদীটি পার হইয়া এই ক্ষুদ্রবাহিনী অপর দিকের পর্ব্বতটি অতিক্রম করিয়া প্রথমত পূর্ব্বদিকে চলিল। উদ্দেশ্য দশ-পনর মাইল পূর্ব্বমুখে গমন করিয়া পুনরায় উত্তরে চলিয়া, পরে পশ্চিমে কুড়ি-পঁচিশ মাইল গিয়া সর্ব্বশেষে দক্ষিণ মার্গে আস্তানায় প্রত্যাবর্ত্তন করা। প্রাতে যাত্রারম্ভ করিয়া দ্বিপ্রহর নাগাদ তাহারা পূর্ব্বদিকে যতটা অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন প্রায় ততদূর আসিয়া পড়িল। দলনেতা অতঃপর সকলকে বিশ্রামের আদেশ দিলেন। সকলে একটা ঝরণার ধারে অস্ত্রশস্ত্রের বোঝা নামাইয়া ফেলিয়া স্নান করিয়া টিনজাত খাদ্যের সাহায্যে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিল। কোন প্রকার আগুন জ্বালাইয়া কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে বলিয়া তাহারা সঙ্গের বোতলের জল খাইয়াই কার্য্য সমাধা করিল।

লেফ্‌টেনাণ্ট চিম্‌নির ইতিপূর্ব্বের কার্য্যকলাপ ও তাহার সরল চরিত্রের কথা জানিতেন। তিনি তাই সকলের চিত্তবিনোদনের জন্য চিম্‌নির সহিত গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "সন্তোষ, তোমার এত বুদ্ধি ত তুমি আইন-ব্যবসায় না করে পল্টনে নাম লেখালে কেন?"

চিম্‌নি বলিল, "আহা, আমি আবার কবে আইন পড়লাম যে ওকালতি করব? আমি ত মা মারা যেতেই ঠিক করলাম মরে দেখতে হবে কোথায় যায়। আইন পড়লে কি আর মরা যায়?"

লেফ্‌টেনান্ট বলিলেন, "তা কেন যাবে না। এত উকিল ব্যারিষ্টার, জজ, সব মরছে আর তুমি বলছ আইন পড়লে মরা যায় না। বাঃ কি বুদ্ধি তোমার!"

"আহা, তারা ত বুড়ো হয়ে নয়ত অসুখ হয়ে মরে, আমি ত বুড়োও হই নি আর আমার অসুখও করে নি ত আমি মরতাম কি করে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু মরা না মরা ত কপালের লেখার উপর নির্ভর করে। এই ত তুমি পল্টনে এত দিন রয়েছ কই মরলে না ত?"

চিম্‌নি অবাকচক্ষে লেফ্‌টেনান্টের দিকে চাহিয়া বলিল, "সত্যিই ত, মরি নি ত। আপনি ঠিক বলেছেন। আচ্ছা যারা মরে তাদের কপালে কি লেখা থাকে?"

"তা কি কেউ জানে? অদৃশ্য অক্ষরে ভগবান কি লেখেন তা কি মানুষে পড়তে পারে?"

"তা হলে ত বড় মুশ্‌কিল। এমনই লেখা যে কেউ পড়তে পারে না, আবার না পড়তে পারলে জানাও যায় না যে কে কবে মরবে। বড়ই মুশ্‌কিলের ব্যাপার।"

চিম্‌নি উদাসনেত্রে দূরের গাছগুলির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মনে হইল যেন মৃত্যু তাহার পরম বাঞ্ছিত ও তাহার সহিত মিলনের আশা সুদূরপরাহত জানিয়া হায় তাহার ব্যর্থতার ব্যথায় ভারাক্রান্ত।

লেফ্‌টেনান্ট রসিকতার পরিণাম এরূপ বিয়োগান্ত ভাব ধারণ করিবে ভাবিতে পারেন নাই। তিনি অবস্থা ঘুরাইবার জন্য বলিলেন, "আরে মরবে ঠিক, তার জন্য এত ভাবনা কেন? এই ধর না, সৃষ্টির আরম্ভ থেকে কেউ কোন দিন না মরে বাঁচে নি।"

চিম্‌নি উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "সে কথা ঠিক, কেউ বাঁচে না। সকলেই শেষ অবধি-মরে। তা হ'লে আর ভাবনা কি।"

রাজপুত জমাদার কলিকাতায় বহুকাল ছিল বলিয়া বাংলা বলিবার জন্য সতত ব্যগ্র থাকিত। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কুছু ভাবনা নাহি আসে। বরা বাজিলে পর দাঁত মে দাঁত জরুর লাগবেই করবে, আউর মৌতভি আই-বেই করবে। তুম বে-ফিকির রহো। মা, দিদি, দিদিকা দিদি, দাদীকা দাদী সকল জনের সঙ্গে মুলাকাৎ হোবে।"

জমাদারের কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল এবং চিম্‌নিও হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিল। হাওয়াটা এইরূপে পরিষ্কার হইয়া গেল ও সকলে যদি অকস্মাৎ শত্রুরা আক্রমণ করে তাহা হইলে কি করা হইবে তাহার আলোচনা করিতে লাগিল।

লেফ্‌টেনান্ট গা-ঢাকা দিয়া অগ্রসর হওয়া, কামুফ্লাজ বা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া, নিঃশব্দে গমন করিবার পদ্ধতি প্রভৃতি নানান্ কথা বলিলে পর চিম্‌নি প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, শত্রু যদি না থাকে তা হ'লে ত অত সাবধানে চলার দরকার হবে না।"

লেফ্‌টেনান্ট বলিলেন, "শত্রু আছে কি না আছে তা ত তুমি জান না, সুতরাং ধরে নিতে হবে যে শত্রু সর্ব্বত্রই রয়েছে, আর তাই ভেবেই খুব সাবধানে চলতে হবে।"

চিম্‌নি বলিল, "তা হ'লে বন্দুক-টন্দুক পাশে নামিয়ে না রেখে হাতে নিয়ে বসাই ভাল।" বলিয়া সে নিজের বন্দুকটি তুলিয়া লইল। সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। অতঃপর আরও কিয়ৎকাল গল্প-গুজব করিয়া সকলে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। প্রায় ঘণ্টাধিককাল সকলে যথাসম্ভব অল্প আওয়াজ করিয়া পথ অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে

চলিতে সুরু করিল। শীঘ্রই জঙ্গলের ঘন বৃক্ষমালা ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতে লাগিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ গা-ঢাকা দিয়া চলা আর সম্ভব রহিল না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তরুকুঞ্জের মধ্যে মধ্যে অনেকটা করিয়া অনতিদীর্ঘ ঝোপঝাড়ের আবির্ভাব হইল। সুতরাং স্থানে স্থানে সকলকে নিচু হইয়া চলিতে হইল। ক্রমে কোথাও কোথাও কৃষিকার্য্যের নিদর্শন পাওয়া যাইতে লাগিল ও বহু দূরে এক-আধটা মানব-বাসস্থানও লক্ষিত হইল। এখন সকলে ছড়াইয়া পড়িয়া বিভিন্ন পথে ঘুরিয়া-ফিরিয়া এক-একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পুনর্মিলিত হইয়া পুনরায় বিক্ষিপ্ত হইয়া উক্তরূপে সর্ব্বদিক পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক আবার আর এক স্থলে মিলিত হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। এইরূপে চলার ফলে তাহাদের সন্ধ্যা অবধি খুব বেশী দূর পৌছান হইল না। সূর্য্যাস্তের অল্পক্ষণ পরেই চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া আসিল ও বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে তারকার ঝিকিমিকি জাগিয়া উঠিলেও অন্ধকার জমাট হইয়া চরাচরকে চাপিয়া ধরিল। জলপ্রপাতের নিরন্তর ঝর্ঝর নিনাদের মতই অবিশ্রাম ঝিল্লিরবে চতুর্দ্দিক মুখর হইয়া উঠিল। একটা উচ্চ টিলার অন্তরালে কয়েকটা গাছের মধ্যে সকলে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া লইয়া স্বল্পতেজ টর্চ্চ-বাতির সাহায্যে ভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া পালাক্রমে পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিয়া শুইয়া পড়িল। পাহারা দিবার প্রধান উদ্দেশ্য অতর্কিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে নিদ্রার ঘোরে কেহ কোনপ্রকার শব্দ না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখা। ভোরের দিকে জমাদার সাহেব চিম্‌নিকে উঠাইয়া দিয়া বলিল, "এইবার তুমহার পাহারা কাম আসে। নিন্দ করবে না আওর দুসমন দেখবে ত গোলি মারিবে না। আস্তেসে সবকো উঠাবে।"

বন্দুক কাঁধে লইয়া পায়চারি সুরু করিল।

চিম্‌নি, "আচ্ছা" বলিয়া বন্দুক কাঁধে লইয়া পায়চারি সুরু করিল। চতুর্দ্দিক তখনও ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অথচ আকাশে-বাতাসে রাত্রিশেষের আমেজ ধরিয়াছে বেশ বুঝা যায়। একটা সর্ব্বব্যাপী অবসন্ন ভাব, যেন ভোরের আগমন অপেক্ষায় দীর্ঘ রজনী জাগিয়া বসিয়া প্রকৃতি-রাণী নিদ্রাক্রান্তা। তারকারও যেন নিদ্রাজড়িত নয়নে নিষ্প্রভদৃষ্টি। বাতাসে ঈষৎ শৈত্যভাব। ক্রমশঃ সে গভীর অন্ধকারে একটা ধূসরতা লক্ষিত হইতে আরম্ভ করিল। দূরে এক একটা বৃহত্তর বৃক্ষকুঞ্জ ভৌতিকরূপ ধরিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল। কোথা হইতে কুয়াশা নামিয়া আসিল। চিম্‌নি অবিশ্রাম পায়চারি করিয়া চলিয়াছে এবং সজাগ দৃষ্টিতে চারিদিক বারে বারে দেখিয়া লইতেছে। ঐ যে ঝোপের মত একটা কি,

ওটা ঝোপই, না আর কিছু? ঠিক একই স্থানে রহিয়াছে ত, না ক্রমশঃ আগাইয়া আসিতেছে? না, ঠিকই আছে। এইরূপ জল্পনা করিয়া ও মধ্যে মধ্যে সঙ্গীদের ঘুমন্ত মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সময় কাটাইতে লাগিল। জমাদার সাহেব মাঝে কি স্বপ্ন দেখিয়া "বহুত আচ্ছা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অপর একজন বাঙালী সৈনিক তাহাতে জাগিয়া উঠিয়া বলিল, "ব্যাটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও হুকুম তামিল করছে।" চিম্‌নি বলিল, "এই চুপ! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আবার হুকুম তামিল কি করে করবে, ও স্বপ্ন দেখছে।" সে লোকটি চিম্‌নিকে মুখ ভ্যাঙ্গাইয়া বলিল, "তালগাছের ফলেরও ভিতরে কিছু থাকে; তোর মাথাটা একেবারে নিরেট।" চিম্‌নি ক্ষুব্ধ স্বরে উত্তর দিল, "একেবারে নিরেট কেন হবে, ও স্বপ্ন দেখল না ত আওয়াজ করল কেন?" অপর ব্যক্তি এই আলোচনার নিষ্ফলতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তাজ্ঞাপক একটা ভঙ্গি করিয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। চিম্‌নি পুনরায় পাহারার কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল অন্ধকারে গুড়ি মারিয়া কে যেন আস্তে আস্তে বৃক্ষান্তরালে গা-ঢাকা দিয়া আগাইয়া আসিতেছে। দূরে ঘন ধূসরের বক্ষে ভাসমান অপেক্ষাকৃত একটা জমাট কালো ছায়ামূর্ত্তি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের পার্শ্বে বারে বারে ফুটিয়া উঠিতেছে ও ঈষৎ আন্দোলিত গতিতে পুনরায় অপর বৃক্ষের আড়ালে অদৃশ্য হইতেছে। চিম্‌নি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল উহা কোন্ দিকে যায়। আকৃতি ও আয়তন-বিচারে বোধ হইল উহা কোন মানব-মূর্ত্তিই শুধু দেহ আনত করিয়া চলিতেছে। অল্পক্ষণেই সন্দেহভঞ্জন হইল ও চিম্‌নি বুঝিল লোকটা যথাসাধ্য গাছের আড়ালে থাকিয়া তাদের দিকেই আসিতেছে। সে তৎক্ষণাৎ লেফ্‌টেনান্টকে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া দিল ও বলিল, "একটা লোক গুড়ি মেরে মেরে এদিকে চলে আসছে।" হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলেও লেফ্‌টেনাণ্ট নিমেষের মধ্যে সজাগ হইয়া উঠিয়া পড়িলেন ও চিম্‌নির নির্দ্দেশমত সেই সচল ছায়ামূর্ত্তিকে দেখিয়া জমাদার ও অপর সৈনিকদিগকে জাগাইয়া দিলেন। ফিস্‌ফাস্ করিয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল ও ঠিক হইল যে দুইজন ঘাঁটি আগলাইয়া থাকিবে ও অপর সকলে দূরে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া আগমনকারীর অপেক্ষা করিবে। যাহার নিকট দিয়াই ও-ব্যক্তি যাইবে সে অবিলম্বে এবং বিদ্যুৎ-গতিতে তাহার উপর রবারের গদা চালাইয়া তাহাকে নিপাতিত করিবে। তৎপরে তাহাকে ঠিকমত কাবু করিয়া বন্দী করা হইবে। সকলে নিঃশব্দে মূর্ত্তিটার আগমন-পথের এধারে-ওধারে লুকাইয়া পড়িল ও নিশ্চলভাবে নিজ নিজ স্থানে ওঁৎ পাতিয়া শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। জলস্রোতে চালিত অর্দ্ধনিমগ্ন বস্তু যেমন দূরে থাকিতে ক্ষণে ক্ষণে অদৃশ্য হইয়া গিয়াও ক্রমশঃ নিকটে আসিয়া পূর্ণরূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠে, এই ছায়ামূর্ত্তিও তেমনি ক্রমশঃ কাছে আসিয়া পড়িল ও তাহার গতিবিধি বেশ ভাল করিয়াই দেখা যাইতে লাগিল। যখন সে সৈনিকদিগের আস্তানা হইতে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে তখন সে হঠাৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। মনে হইল যেন দেখিতেছে আশেপাশে কেহ আছে কি না। কিছুক্ষণ এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃক্ষের আড়াল হইতে একটা ধাবমান অতিকায় ছায়ামূর্ত্তি প্রথম ছায়ামূর্ত্তির উপর হঠাৎ ছিটকাইয়া গিয়া পড়িল ও আক্রান্ত ছায়ামূর্ত্তি একটা বিকট পাশবিক আওয়াজ করিয়া দৌড়াইতে সুরু করিল। আক্রমণকারী তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিলেও তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না। অপর সকলে তীরবেগে ছুটিয়া গিয়া উক্ত দুই জনের উপরে নিপতিত হইল ও কিয়ৎকালের জন্য একটা ঝুটাপুটির শব্দ ব্যতীত আর কিছু শ্রুতিগোচর হইল না।

লেফ্‌টেনান্ট নিজ আস্তানায় দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া এই অভিনয় দেখিতেছিলেন। চিম্‌নির মত অতবড় একটা মানুষকেও যে টানিয়া লইয়া যায় সে যে কি প্রকার শক্তিশালী পুরুষ তাহাই ভাবিতেছিলেন। এখন তিনি নিজস্থান ছাড়িয়া পিস্তল-হস্তে দ্রুত দৌড়িয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি একাধারে বিস্মিত ও হতভম্ব হইয়া গেলেন। দেখিলেন চার বীরপুরুষে মিলিয়া একটা অশ্বেতরকে পাড়িয়া ফেলিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে ও উক্ত জীবটি প্রাণপণে নিজ জাতির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য লাথি চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। পাছে কেহ

ছাড়িলে অপরকে পদাঘাতে বিধ্বস্ত হইতে হয় এই ভয়ে কেহই জানোয়ারটাকে ছাড়িতে পারিতেছে না। লেফ্‌টেনাণ্ট অগত্যা একটা রজ্জু সংগ্রহ করিয়া অশ্বেতরটার পিছনের পা দুইটা বাঁধিয়া দিলেন, উক্ত পদদ্বয়ের অধিকারী সৈনিকেরা উহার সামনের পা দুইটা বাঁধিয়া ফেলিল। অতঃপর সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। চিম্‌নি অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া বলিল, "ব্যাটা যে মানুষ নয় তা কি করে বুঝব? এক বাড়ি মারলাম ত কোথায় পড়ে যাবে, না হিঁ হিঁ করে মারলে এক লাথি। ভাগ্যিস ব্যাটার 'এম' ঠিক হয় নি নয় ত…"

একজন বলিয়া উঠিল, "নয় ত চিম্‌নি এতক্ষণে বাগবাজারের বড় রাস্তায় পৌঁছে যেত।"

চিম্‌নি বলিল, "যাঃ, এক লাথিতে কেউ অতদূর যেতে পারে, ধেৎ।"

এই অপরূপ হাস্যকর ঘটনার পর সকলে আস্তানায় ফিরিয়া আসিয়া মুখহাত ধুইয়া কিছু খাইয়া ঈষৎ অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই পুনরায় বাহির হইয়া পড়িল। এই অঞ্চলে দেখা গেল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ব্যতীত অপর কোনপ্রকার শহরাদি নাই। অল্প-স্বল্প চাষ হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলই জঙ্গলে পূর্ণ। কোথাও শত্রুর কোন ঘাঁটি অথবা বিমানকেন্দ্র ইত্যাদি লক্ষিত হইল না। তাহারা বেশ অবলীলাক্রমে অগ্রসর হইয়া মধ্যাহ্নকালে প্রায় পনর মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বিশ্রামের জন্য গমন স্থগিত করিল। সকলে কিছু আহার করিয়া শুইয়া পড়িল, শুধু রাত্রের ন্যায় পাহারার ব্যবস্থা রহিল। রাজপুত জমাদার বলিল, "আরে চিম্‌নি তুমহি যাদু জানে। একটা জিন্দা আদমিকে পাকড়িয়ে খচ্চর বানিয়ে দিলে। তুমহারা দেখলে ত হামারা ডর করে।"

চিম্‌নি বলিল "দুর! ওটা আবার মানুষ ছিল নাকি? আমি ওকে এক লাঠি মারতেই হিঁ হিঁ করে ডেকে উঠল। আমি আবার যাদু জানলাম কি করে?"

জমাদার বলিল, "ওই একহি বাত আসে। তুম ওকে লাঠিসে মারলে আওর ও খচ্চর বনে গেল। তুমহারা লাঠিমে যায় আসে।"

চিম্‌নি সন্দিগ্ধ নয়নে রবারের লাঠিটার দিকে চাহিয়া বলিল, "ধেৎ"।

ঘণ্টা-দুই বিশ্রাম করিবার পর সকলে আবার যাত্রা করিল ও চার-পাঁচ-ঘণ্টা চলিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতে আরম্ভ করিলে রাত্রিযাপনের জন্য শিবির স্থাপন করিল। এত পথ অতিক্রম করিয়াও কোন শত্রুর সাক্ষাৎ না পাইয়া তাহারা আগুন জ্বালিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা করিল। একটা ঘন বৃক্ষকুঞ্জের মধ্যে কয়েকটা মোটা মোটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে আগুন জ্বালাইল যেন দূর হইতে দৃষ্টিগোচর না হয়। রাত্রে দূর হইতে ধোঁয়া দেখা যাইবার কোন আশঙ্কা ছিল না। প্রায় দুই দিন পরে গরম গরম খাদ্য মিলিবে জানিয়া সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আগুনটা ঠিক মত জ্বলিতে আরম্ভ করিতেই সর্ব্বাগ্রে একজন চা বানাইয়া ফেলিল ও সকলে পরম তৃপ্তির সহিত চা পান করিয়া হৃষ্টচিত্তে নৈশ-ভোজনের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময় নানা প্রকার আওয়াজ ও আগুন প্রভৃতি দেখিয়া একটা খরগোস নিজ বিবর ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইতে গেল। চিম্‌নি "আরে, আরে" বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে নিজ রবারের গদাটা তুলিয়া লইয়া সেই পলাতক খরগোসটার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। সেই আন্দাজের মার কপালক্রমে অব্যর্থ সন্ধানে খরগোসটার উপরে গিয়া লাগিল ও খরগোসটা মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া গেল। জমাদার সাহেব এরূপ শিকার পড়িতে দেখিয়া মহোৎসাহে দৌড়িয়া গিয়া খরগোসটাকে তুলিয়া আনিলেন ও বলিলেন, "চিম্‌নি দেখ, তুমহারা লাঠিমে যাদু আসে কি না। এই দেখ লাঠিটো শিকারের পিছে পিছে গিয়ে ঠিক উসকো মারে ফেললে কি না।"

চিম্‌নি একবার খরগোস ও একবার গদাটার দিকে চাহিয়া জমাদারের কথাটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা তদ্বিচারে দোমনা ভাবে কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিল, "আরে না না, যাদু না ছাই। ওটা চোট লেগে পড়ে গেল।"

সকলে অতঃপর শিকারলব্ধ মাংস রন্ধন করিয়া ভোজনাদি সম্পন্ন করিতে লাগিয়া গেল। খাওয়াটা সেদিন ভালমতই হইল। পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় পাহারার ব্যবস্থা করিয়া ইহার পরে সকলে শুইয়া পড়িল। আজকার রাত্রে প্রথম প্রহরেই চিম্‌নিকে পাহারার কার্য্যে লাগাইয়া দেওয়া হইল। চিম্‌নি দুই জোয়ানের খোরাক একেলা খাইয়া ক্রমাগত হাই তুলিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। প্রায় আধ ঘণ্টা সে এইরূপে বায়ুমণ্ডলে আন্দোলন সৃষ্টি করিবার পর, বাঙালী ছেলেটি উঠিয়া পড়িল ও তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। চিম্‌নি জিজ্ঞাসা করিল, "আরে তুমি ঘুমোলে না যে?"

সে বলিল, "তুমি যে রকম বিরহী বিষধরের মত ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছ তাতে কোন মানুষের পক্ষে ঘুমোনো সম্ভব নয়।"

চিম্‌নি অবাক হইয়া বলিল, "দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম কখন আবার? হাই উঠছে ত কি করব?"

সে ছেলেটি বলিল, "হাই উঠছে? হাই না হাউই? হাই, হাইয়ার, হাইয়েষ্ট। এই যে আড়াই বিঘত হাঁ করে শোঁ শোঁ করে দম ছাড়ছ, ওর নাম হাই না, ও হ'ল হাইয়েষ্ট, মানে হাইয়ের ঠাকুরদাদা। দোহাই বাবা, তোমার পাহারার পালা শেষ হোক, তারপরে শুতে যাব। খালি স্বপ্ন দেখছি বাখরগঞ্জে কালবৈশাখীর ঝড়ে উকিল, মক্কেল, মুন্সেফ, পেয়াদাসুদ্ধ কাছারি-বাড়ী উড়ে গেছে, খালি একটা বটগাছতলায় তুমি একলা দাঁড়িয়ে হাই তুলছ।"

বক্তৃতাটা দিয়া ছেলেটি দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া পড়িল আর নকল যন্ত্রণা-আর্ত্তনাদের অভিনয় করিতে লাগিল। চিম্‌নি বলিল, "আরে তোর হ'ল কি? অসুখ করছে নাকি?"

জমাদার সাহেবের এই সব আওয়াজে ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে একটা বিকট হাই তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "আরে, এত হল্লা হইসে কেন, কেউ মরিয়েসে নাকি।"

লেফ্‌টেনাণ্টের এবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি রাগত কণ্ঠে, "এই, সব চুপ!" বলিতেই সকলে পুনরায় চুপচাপ নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং চিম্‌নিও নিজের পাহারার কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

রাত্রি ভোর হইলে চা পান করিয়া আবার যাত্রা আরম্ভ করিল ও কিছুদূর উত্তরে গিয়া তৎপরে পশ্চিমে গমন সুরু করিল। মধ্যাহ্ন অবধি সকল স্থান উত্তম রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পশ্চিম দিকে চলিতে লাগিল ও বিশ্রামের পরেও সেই ভাবেই চলিল।

তৃতীয় রাত্রি আরম্ভ হইবার আগেই পশ্চিমে যতদূর যাওয়া প্রয়োজন তাহা শেষ হইল ও পর দিন সকলে আস্তানায় ফিরিয়া যাইবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নিশাযাপন করিতে নিরত হইল। এ রাত্রিতে এমন কিছু ঘটিল না যাহা লিপিবদ্ধ করা যায়। রাত্রি শেষ হইলে এই ক্ষুদ্র সেনাদল ভোজনাদি সারিয়া লইয়া দক্ষিণ দিকে আস্তানা অভিমুখে যাত্রা করিল। মধ্যাহ্নকালে যখন তাহারা প্রায় অর্দ্ধেকের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তখন দূরে বিমানের আওয়াজ শুনা যাইতে লাগিল। শীঘ্রই আকাশের দূর প্রান্তে চারটা বিমান লক্ষিত হইল ও সেগুলি কিছু নিকটে আসিতেই বুঝা গেল শত্রু-বিমান। ভারতীয় সৈনিকেরা অবিলম্বে গা-ঢাকা দিয়া নিশ্চল ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বিমানগুলি অধিক উর্দ্ধে ছিল না, কেবল পাঁচ-ছয় শত ফুট মাত্র। মনে হইল যেন চতুর্দ্দিক দেখিয়া-দেখিয়া চলিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিমানগুলি উপর দিয়া গভীর নিনাদে চলিয়া গেল ও সকলে উঠিয়া চলিতে সুরু করিল কিন্তু হঠাৎ একটা বিমান সুদূর চক্রবালের কোণ হইতে কাত হইয়া তীর বেগে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আবার সকলে দ্রুতগতি এদিকে-ওদিকে লুকাইয়া পড়িল। বিমানখানা উহারা যে স্থলে লুকাইয়াছিল তাহার উপরে পৌঁছিলে পর বিমানস্থ লোকেরা চতুর্দ্দিকে 'মেশিনগান' চালাইয়া গুলীবৃষ্টি করিতে লাগিল। বেশ বুঝা গেল তাহারা কিছু একটা সন্দেহ করিয়াছে নতুবা এরূপ কার্য্যের অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না। মেশিনগানের শব্দে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল ও ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত গুলীর আঘাতে ধূলাবালি প্রস্তরখণ্ড উড়িয়া

একটা ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। বিমানখানা তিনবার-চারবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়া এইরূপে গুলীবর্ষণ করিয়া অবশেষে চলিয়া গেল। কিন্তু এই ঘটনার পর হইতেই ক্রমাগত শত্রুবিমান চারিদিক হইতে আসিয়া উক্ত এলাকায় দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। ভারতীয় সৈনিকদলের এই কারণে অগ্রসর হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল ও প্রায় দিবাশেষেও তাহারা আস্তানার চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে আসিতে পারিল না। লেফ্‌টেনাণ্ট স্থির করিলেন রাত্রিকালে ভোজনাদি করিয়া পুনরায় চলিতে হইবে যাহাতে সেই রাত্রেই সকলে শিবিরে পৌঁছাইতে পারে।

প্রায় দুই ঘণ্টাকাল রাত্রিকালে নিঃশব্দে চলিয়া তাহারা শিবিরের নিকটে নদীর অপর পারে উপস্থিত হইল ও কয়েক ঘণ্টার জন্য শুইয়া পড়িল। প্রাতে অন্ধকার থাকিতেই উঠিয়া সকলে অপর পারের নিজ দলের লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অল্প আলো হইলে পর পর্ব্বতের উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত এক পাহারা-কেন্দ্রের প্রহরীরা ইহাদিগকে দেখিয়া অগ্রসর হইবার সঙ্কেত করিল ও এই ক্ষুদ্র সেনাদল তখন নদীর দিকে নামিতে আরম্ভ করিল। নদীর কিনারা অবধি আসিয়া যখন তাহাদের সর্ব্বসম্মুখের সৈনিক নদী-গহ্বরে নামিতে উদ্যত হইল সেই সময়ে দূরের বালুকার উপরে ছড়ান কয়েকটা বড় বড় শিলাখণ্ডের আড়াল হইতে কাহারা হঠাৎ মেশিনগান চালাইয়া গুলীবর্ষণ সুরু করিল। সে ব্যক্তি ঘটনাচক্রে বাঁচিয়া গেল কিন্তু অতঃপর নদী পার হওয়া অপেক্ষা অধিক সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল এই গুপ্ত শত্রুদের সংখ্যা ও শক্তি নির্দ্ধারণ করা। শিবিরের এত নিকটে শত্রুসৈন্য কি করিয়া আসিল তাহাও ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। অপর পারের লোকেদের সহিত সঙ্কেতে কথা চলিল এবং আদেশ হইল এই নূতন শত্রুদলের খবর লইয়া ও তাহাদের নিপাত করিবার ব্যবস্থা করিয়া তৎপরে ফিরিয়া আসিতে। এই আদেশ অনুসারে সকলে গুড়ি মারিয়া শত্রুর আশ্রয়স্থল শিলাস্তূপগুলির ঠিক সামনাসামনি কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বহু সাবধানে গাছের আড়ালে আড়ালে হামাগুড়ি দিয়া অবশেষে সেই শিলাস্তূপের প্রতিমুখে নদীর অপর পারের একটা ঘন বৃক্ষকুঞ্জের মধ্যে তাহারা উপস্থিত হইল। লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব দুরবীন্ দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন কত লোক কেমন ভাবে আছে সেখানে। এ বিষয়ে তাঁহাকে হতাশ হইতে হইল, কেননা, শিলাখণ্ডগুলি খুবই কাছে থাকায় তাহার আড়ালে কে আছে দেখা গেল না, শুধু এক স্থানে দুইটা পাথরের ফাঁক দিয়া একটা মেশিনগানের নল ঈষৎ বাহির হইয়া আছে। অতঃপর একজন কিছু দূরে সরিয়া গিয়া অপর পারে সঙ্কেতে এই খবর দিলে পরে হুকুম আসিল, "কত শত্রু থাকিতে পারে বিচার কর ও দেখ নিকটে অপরাপর স্থানে কোন শত্রুসৈন্য আছে কিনা। ইহাও দেখ যে কোন উপায়ে এই গুপ্ত শত্রুদলকে বিনাশ করা যায় কি না।" লেফ্‌টেনাণ্ট দুইজন সৈনিককে আরও ঘুরিয়া দেখিয়া আসিতে বলিলেন আরও কোন শত্রু সৈন্য দেখা যায় কি না। তাহারা চলিয়া গেল। তৎপরে তিনি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিতে লাগিলেন কোন উপায়ে ইহাদের মারা যায় কি না। বোমা ফেলিয়া মারিতে হইলে খোলা জায়গায় বাহির হইয়া বোমা নিক্ষেপ করিতে হইবে এবং শত্রুর গোচর হইলেই তাহারা গুলীবর্ষণ করিবে। সুতরাং কি উপায়? লেফ্‌টেনাণ্ট সকলকে প্রশ্ন করিলেন কাহারও কোন উপায় মনে হইতেছে কি না, যাহাতে শত্রুদিগকে ধ্বংস করা যায়। জমাদার সাহেব বলিলেন, সকলে মিলিয়া বিভিন্ন দিক্ হইতে একজোটে আক্রমণ করিলে দুই-একজন মরিবে হয়ত কিন্তু উহাদের উপর বোমা পড়িবেই দুই-চারিটা। অপর এক ব্যক্তি বলিল, দিনের বেলা কিছু না করিয়া রাত্রি অবধি অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত। সে সময়ে শত্রুর পক্ষে কাহারও আগমন বা আক্রমণ লক্ষ্য করিয়া গুলীবর্ষণ সহজ হইবে না। চিম্‌নি বলিল, সে একেলাই দৌড়িয়া উহাদের উপর বোমা নিক্ষেপ করিতে পারে। এ সকল পরামর্শের কোনটিই লেফ্‌টেনাণ্টের মনঃপূতঃ হইল না। প্রথমতঃ বোমা ইত্যাদি দিবাভাগে চালাইলেই দূরে বৃহত্তর শত্রু সেনাদল থাকিলে তাহারা বুঝিতে পারিবে ভারতীয়েরা কোথায় আছে এবং রাত্রিকালে ঐ প্রকার ঘটিলে ব্যাপারটা আরও প্রকট হইয়া উঠিবে। যত নিঃশব্দে এই শত্রুদলকে

নিঃশেষ করা যাইবে ততই অধিক নিজেদের সুবিধা, কেননা, আরও অনেক ভারতীয় সৈনিক আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বে শত্রুর সহিত বড় রকম সংঘর্ষ ঘটা সমীচীন নহে। কোন উপায় না দেখিয়া ও বোমা ব্যতীত অপর অস্ত্র ব্যবহার সম্ভব নয় জানিয়া অবশেষে স্থির হইল অপর পারের লোকেদের সহিত পুনরায় পরামর্শ করা। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল সঙ্কেতে আলাপ চলিল ও তৎপরে অপর পারের সেনাপতি একটা মতলব স্থির করিলেন ও এপারের লোকেদের তাহা জানাইলেন। অনতিবিলম্বেই অপর দিক হইতে এক ব্যক্তি একটা তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহার সহিত একটা হাল্কা ও শক্ত সুতা এপারে পাঠাইল। সেই সুতাটা টানিয়া লইতে তাহার সঙ্গে একটা মোটা সুতা আসিল ও এই ভাবে ক্রমশঃ একটা মোটা কাছি আসিয়া পৌঁছিল। অতঃপর এই পার হইতে সরু সুতাটা একটা তীর-ধনুক তৈয়ার করিয়া অপর পার্শ্বে নিক্ষেপ করা হইল ও ক্রমশঃ টানিয়া টানিয়া কাছিটার এক মোড় অপর দিকে পাঠান হইল। এই উপায়ে কাছিটা টানিয়া ছাড়িয়া উভয় দিকের পরস্পরের সহিত একটা অখণ্ড চলনশীল রজ্জুবন্ধনীর সম্বন্ধের সৃষ্টি হইল। এর পর লেফ্‌টেনাণ্ট হুকুম দিলেন ছোট ছোট গাছ ও বড় বড় গাছের ডাল কাটিয়া কাছিটার সহিত সূক্ষ্মতর রজ্জুর দ্বারা ফাঁসগিরা বাঁধিয়া লটকাইয়া দিতে। কাছিটা যেমন ঘুরিতে সুরু করিল তেমনি স্থানে স্থানে ফাঁস খুলিয়া গিয়া বৃক্ষ ও বৃক্ষকাণ্ডগুলি নদীর বক্ষে রক্ষিত হইতে লাগিল। প্রায় তিন-চার ঘণ্টার পরিশ্রমের ফলে শত্রুকেন্দ্র শিলাস্তূপের সম্মুখে, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট দূরে ক্ষীণস্রোতা নদীর বালুবক্ষে একটা বিরাট্ শাখা ও বৃক্ষকাণ্ডের বাঁধ গড়িয়া উঠিয়া উঠিল। তাহার অন্তরালে কি ঘটিতেছে তাহা শিলাস্তূপের ভিতর হইতে কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবে না। শত্রুরা এই মতলব বুঝিয়া এই শাখা-সেতুর উপরে ক্ষণে ক্ষণে ও যথাতথা গুলীবর্ষণ আরম্ভ করিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই চিম্‌নি একটা স্থূলতর ও অনতিদীর্ঘ সরীসৃপের ন্যায় এই শাখা-স্তূপের অন্তরালে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ এক, দুই, করিয়া দুইটা বোমা শত্রুদের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার পরে আরও দুই-তিন জন ঐ ভাবে বোমা ফেলিয়া শত্রুদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। কিছুক্ষণ পরেই শত্রুপক্ষের মেশিনগানটা থামিয়া গেল। তখন আর একটা বোমা ফেলিবার পরে এপার-ওপার উভয় দিক হইতে জন কুড়ি পঁচিশ সৈনিক দ্রুতবেগে শিলা-স্তূপের উপর আক্রমণ করিল। কেহ কোনপ্রকার বাধা দিল না এবং সকলে অনায়াসে সেস্থলে পৌঁছিয়া দেখিল মাত্র চারজন শত্রুসৈন্য একটা মেশিন গান লইয়া সেখানে ছিল। ইহার মধ্যে দুইজন মৃত ও একজন মৃতপ্রায়। তৃতীয় ব্যক্তির দুই হস্তেই জখম ও সে যুদ্ধে অক্ষম। তাহাকে লইয়া সকলে নদীর পরপারে মূল আস্তানায় ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ করিতে না করিতেই ঘোর কলরোলে প্রায় পনর-কুড়িখানা শত্রুবিমান আসিয়া পর্ব্বতদেশে যথাতথা বোমাবর্ষণ আরম্ভ করিল ও কোথাও কিছুমাত্র সন্দেহ হইলেই সে স্থলে গুলীবর্ষণ করিয়া ধূলা উড়াইতে লাগিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া বারে বারে তাহারা এই প্রকার আক্রমণ চালাইতে লাগিল এবং বিশেষ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টাসত্ত্বেও ভারতীয়দের মধ্যে কয়েকজন হতাহত হইল।

ভারতীয় শিবির হইতে অতঃপর ক্রমাগত বেতারে খবর পাঠান চলিতে লাগিল ও শীঘ্রই নিজেদের তরফের বিমান সমাবেশ সুরু হইল। দুই-তিন দিন ধরিয়া ক্রমাগত আকাশ-যুদ্ধ চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই দুই চারখানা করিয়া বিমান হঠাৎ হঠাৎ আহত পক্ষীর মত ঘুরিয়া পাক খাইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। কখন কখন বৈমানিকেরা ডানা-ভাঙ্গা বিমান ত্যাগ করিয়া প্যারাশুট যোগে দুলিয়া দুলিয়া নামিয়া আসিয়া বন্দী অথবা সপক্ষে মিলিত হইতে লাগিল। চিম্‌নি বলিল, "ওরাই লড়াই করুক, আর আমরা খালি গর্ত্তের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকি।"

তাহার সঙ্গী একজন বলিল, "বিনা পয়সায় তামাশা দেখেছিস, তার আবার গদি-আঁটা চেয়ার চাস না কি?"

চিম্‌নি বলিল, "আরে তা নয়; লড়াই করতে হবে না? খালি গর্ত্তে বসে থাকব?"

সঙ্গী বলিল, "তা না বসতে চাস ত যা না ঘুরে বেড়িয়ে বেড়া। শুধু এক দমকা মেশিন গানের গুলী লাগলে চিম্‌নি চালুনি হয়ে যাবি।"

চিম্‌নি বলল, "দুৎ, চালুনি হয়ে যাব কি করে? মানুষ আবার চালুনি হয়ে যায়?"

চতুর্থ দিবসে শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণ-ক্ষেত্র ক্রমশঃ এই অঞ্চল হইতে সরিয়া সরিয়া আরও সুদূর দক্ষিণে চলিয়া গেল। ভারতীয় বিমান-সৈনিকেরা বহু চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সরাইয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইল। যতক্ষণ তাহারা এই অঞ্চলে যুদ্ধ করিতেছিল ততক্ষণ বাহির হইতে বিমানযোগে অপর সৈনিক আনয়ন অসম্ভব ছিল। যে বিমান-ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করা হইতেছিল, এখন সকল সৈনিক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাহা শেষ করিয়া ফেলিল ও তৎপরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় উত্তর-আসামের সুদূর প্রান্ত হইতে সৈন্যবাহী বিমানসকল আসিয়া পৌঁছাইতে লাগিল। চার পাঁচ দিনের মধ্যেই এত সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র মালমশলা আসিয়া পড়িল যাহাতে আর পাহাড়ের মধ্যে লুকাইয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন রহিল না। এই সকল নূতন সৈন্যদল প্রত্যহ উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া এই প্রদেশ পূর্ণরূপে পুনরধিকার করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে পর দক্ষিণে অভিযান করা স্থির হইল।

এই দক্ষিণ অভিযান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই শত্রুপক্ষ পর্ব্বত শিবির হইতে দশ মাইল আন্দাজ দূরে কয়েকটা কামান আনিয়া বসাইল ও ভারতীয়দের অবস্থান না জানা সত্ত্বেও আন্দাজে গোলাবৃষ্টি সুরু করিল। তাহারা যদি বিমানযোগে গোলা কোথায় পড়িতেছে দেখিয়া লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিত তাহা হইলে ভারতীয়দের বিশেষ ক্ষতি হইত। কিন্তু ভারতীয় বিমানবাহিনী শত্রু-বিমানগুলিকে দূরে হঠাইয়া রাখায় সে সুবিধা তাহাদের হইল না ও আন্দাজে গোলা চালানোতে ভারতীয় সৈন্যদলের অল্পই ক্ষতি হইল। তথাপি হুকুম হইল যে তিন চারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া ত্রিশ- চল্লিশ জন সৈন্য রাত্রিকালে কামানগুলির সন্ধানে যাইবে ও সেগুলি ধ্বংস করিয়া আসিবে। চিম্‌নি ও অজয় এইরূপ একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হইল ও সেইদিন রাত্রে তাহারা সাব-মেশিনগান, বোমা ও অন্যান্য হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যাত্রা করিল। সাধারণ ভাবে কামানগুলি কোন্ দিকে বসান হইয়াছে তাহা অনুমানে জানা ছিল ও সেই দিকেই রাত্রির অন্ধকারে অতি সাবধানে ইহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। ফিস্‌ফাস করিয়া গল্প চলিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে সকলে কিয়ৎকাল নিঃশব্দে স্থির হইয়া থাকিয়া দূরের আওয়াজ বিচার করিয়া লইয়া আবার অগ্রসর হইতে লাগিল।

অজয় বলিল, "এই তুই নাকি একরকম কৌশল বের করেছিস খচ্চর ধরবার?"

চিম্‌নি বলিল, "ধ্যেৎ, খচ্চর ধরতে যাব কেন? ওটাকে মানুষ ভেবে ধরেছিলাম।"

অজয় মন্তব্য করিল, "খচ্চরকে তুই যদি মানুষ ভাবিস তা হ'লে তোকে যদি কেউ জিরাফ ভাবে তাতে কি দোষ হবে?

'চিম্‌নি চিম্‌নি তুই যে রকম লম্বা
জিরাফের চেয়ে কোন্ অংশেতে কম বা'।"

চিম্‌নি চটিয়া উঠিয়া বলিল, "এই কি বকছিস? আমার নামে ছড়া কাটছিস কেন? আমার থলেতে বিস্কুট এনেছি তোকে দেব না।"

অজয় অনুতপ্ত সুরে বলিল, "না ভাই দিস, আর ছড়া কাটব না তোর নামে।"

ভোরের দিকে একটা জঙ্গলের মধ্যে একটু কিছু খাইয়া লইয়া তাহারা আবার চলিল। একবার চুপ করিয়া দাঁড়াইবার পর মনে হইল দূরে পদধ্বনি। দলপতি উত্তম রূপে শুনিয়া বলিলেন, "এই কয়েকটা লোক আসছে। সব এদিকে ওদিকে গাছে উঠে লুকিয়ে পড়।" সকলে অচিরাৎ বৃক্ষশাখায় আত্মগোপন করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। দুই-চার মিনিটের মধ্যেই তিনজন শত্রুসেনা সেই পথে আসিতেছে দেখা গেল। তাহারা বেশ নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে চলিতেছিল কিন্তু চিম্‌নি ও অজয় যে গাছটায় উঠিয়াছিল সেই গাছটা পার হইয়াই একজন মাটির দিকে দেখাইয়া দুর্ব্বোধ্য ভাষায় সঙ্গীদের কি যেন বলিতে লাগিল। অজয় ও চিম্‌নি দেখিল মাটিতে বুট-পরা পায়ের দাগ দেখাইয়া কথা

বলিতেছে। অর্থাৎ ভারতীয়েরা যে সেই পথে আসিয়াছে তাহা তাহাদের পদচিহ্নে বুঝা যাইতেছে। লোকগুলা অতঃপর খুব সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। পায়ের দাগ দেখিয়া-দেখিয়া শীঘ্রই তাহারা চিম্‌নিদের গাছটার নিচে আসিয়া মাথা তুলিয়া বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার মধ্যে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ একটা লোক চিৎকার করিয়া কি বলিয়া নিজের বন্দুকটা তুলিয়া উপরের দিকে তাক করিল। কিন্তু সে ঘোড়া টিপিবার পূর্ব্বেই গাছের উপর হইতে "এইও, খবরদার!" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া চিম্‌নি হুড়মুড় করিয়া ডালপালা ভাঙ্গিয়া তাহাদের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল ও লাথি, চড়, ঘুষি মারিয়া তাহাদের ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল। লোকগুলা গাছ হইতে এরূপ ভাবে কেহ লাফাইয়া পড়িবে আশা করে নাই ও চিম্‌নির দীর্ঘাকৃতি দেহ দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। চিম্‌নির সহিত উহাদের মারামারি চলিতে চলিতেই অজয় ও অপর এক বৃক্ষ হইতে আরও দুই-তিন জন লাফাইয়া পড়িয়া শত্রুদের কাবু করিয়া ফেলিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। লোকগুলোকে লইয়া কি করা হইবে তাহাও একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু অবশেষে অপরাপর দলের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের কয়েকজন রক্ষীর সহিত শিবিরে বন্দী অবস্থায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কামান কেন্দ্রগুলি যে বেশ নিকটে তাহা এখন সহজেই বোধগম্য হইল। থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের গভীর গর্জ্জনে অরণ্যদেশ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল ও দিক অনুমানে বুঝা গেল দুইটা বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে কামান দাগা হইতেছে। সকলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল ও ক্রমশঃ একটা কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ ভাঙা জমির উপরিস্থিত বৃক্ষমালার অন্তরাল হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে কামান দাগার অগ্নিস্ফুরণ পরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল। তখন সকলে বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া সন্ধ্যার অপেক্ষায় সময় অতিবাহন করিতে লাগিল। উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার শীর্ষে পাহারা বসান হইল যাহাতে শত্রুপক্ষের কেহ আসিলে সকলে সতর্ক হইয়া যাইতে পারে।

এক জায়গায় একটা খুব বড় গাছ ঝড়ে পড়িয়া ভূমিসাৎ হইয়াছিল। অজয় ও চিম্‌নি তাহার আড়ালে শুইয়া পড়িল ও পুরনো কথা আওড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল। অজয় বলিল, "হাঁরে, তুই এই প্যারাট্রুপের দলে এলি কেন?"

চিম্‌নি উত্তর দিল, "আমি ত জানতাম না যে হাওয়াই জাহাজের কাজ। সকলে নাম লিখছিল, আমি জিগ্‌গেস করলাম 'কি রে?' ত বললে প্যারাট্রুপ। আমি বললাম, আমিও সেইখানে যাব, ত নাম লিখে নিলে। প্রথমে ত একটা ঘরের মধ্যে দড়ি ধরে লাফালাফি, দেয়াল টপকান, উপর থেকে লাফ দেওয়া। আমিও ভাবলাম সার্কাস শেখাচ্ছে। তার পরে শুনলাম হাওয়াই জাহাজ থেকে লাফাতে হবে। কত উপর থেকে তা জানতাম না। এখন ত বেশ লাগে।"

অজয় বলিল, "তোর বাবার চিঠি পাস না?"

চিম্‌নি বলিল, "হ্যাঁ, লিখেছিলেন সৎপথে থেকে চলবে, এই সব। আমিও লিখেছিলাম যে আমি মিথ্যে কথা বলি না; কিন্তু কখন কখন বিস্কুট-টিস্কুট চুরি করতে হয়, নয় ত খাব কি? বাবা মাঝে মাঝে কাশী যান কিনা তাই অনেক সময় উত্তর আসতে দেরি হয়।"

"ত বাবা যদি লেখেন যে তুই চুরি করে বিস্কুট খেয়েছিস, তোকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ত কি করবি? বামুন, গোবর এ সব পাবি কোথায়?"

চিম্‌নি চিন্তিত হইয়া পড়িল। বলিল, "বাবা যদি লেখেন ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এ দেশে খুঁজলে বামুন আর গোবর পাওয়া যাবে না?" তার পর উৎফুল্ল হইয়া "আরে, ঐ সেই ট্যারা সুবেদার ওর নাম ত তেওয়ারী, ও ত বামুন, আর একটা গরু খুঁজে বের করা যাবে এখন।"

অজয় তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "হ্যাঁরে হ্যাঁ, ঢের গোবর পাওয়া যাবে, তুই কিছু ভাবিস নে।"

সন্ধ্যা তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনীর মধ্যে দূত পাঠাইয়া ঠিক হইয়া গেল কে কোন্ দিক

দিয়া কামানকেন্দ্রের উপর আক্রমণ করিবে, চিম্‌নিদের দল খাইয়া-দাইয়া রাত্রি অধিক হইবার পূর্ব্বেই একটা কামানকেন্দ্র প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার পিছনে চলিয়া গেল। শুধু তিনজন সম্মুখে দূরে দূরে খানা-খন্দর দেখিয়া তাহার মধ্যে লুকাইয়া রহিল। সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে পর সম্মুখের তিন ব্যক্তি নিজ নিজ গর্ত্তের ভিতর হইতে সবে মেশিন গান চালাইয়া কামান-কেন্দ্রটার উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থলের শত্রুসৈন্যরা তাহাদের উপরে অবিরল ধারে গুলীবৃষ্টি আরম্ভ করিল। এই প্রবল প্রত্যাক্রমণে তাহারা গর্ত্তের বাহিরে মাথাটুকুও বাহির করিতে না পারিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। গুলীবর্ষণ কিছু কমামাত্র আবার ঐ তিনজন সাব-মেশিনগান চালাইতে আরম্ভ করিল। তখন শত্রুপক্ষ একটা মর্টার কামানে গোলা ভরিয়া তাহাদের উপর গোলা ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। কিন্তু এ কার্য্য সফল হইবার পূর্ব্বেই ভারতীয় দলের মূল বাহিনী পশ্চাৎ হইতে কামানকেন্দ্রের উপর ঘোরতর আক্রমণ করিল। শত্রুপক্ষ সম্মুখের লোকদের লইয়া এত ব্যস্ত ছিল যে পিছনের আক্রমণের জন্য তাহারা প্রস্তুতই ছিল না। সর্ব্বাগ্রে চিম্‌নি এক এক লম্ফে দশ-বার হাত পার হইয়া আসিয়া গোটা দুই ধূম্র-উৎপাদক বোমা ছুঁড়িয়া নিজেদের আগমন অল্পাধিক অদৃশ্য করিয়া দিল ও ধূম্রপ্রাকার ভেদ করিয়া যখন সকলে শত্রুর উপর পতিত হইল তখন তাহারা বিশেষ একটা যুদ্ধ করিতে পারিল না। বেশীর ভাগই দাঁড়াইয়া মরিল ও বাকি সকলে বন্দী হইল।

শত্রুপক্ষের লোকবল নিকটেই অধিক সংখ্যায় আছে জানিয়া দলপতি তাড়াতাড়ি কামানগুলিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়া ও সেই স্থলে কয়েকটি বিলম্বে বিস্ফোরক বোমা স্থাপিত করিয়া সদলে পুনরায় জঙ্গলের মধ্যে ফিরিয়া গেলেন। শত্রু-পক্ষের সৈন্যরা কামানকেন্দ্রে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গভীর নিনাদে বোমাগুলি এক এক করিয়া ফাটিতে আরম্ভ করিল। ভারতীয়েরা ততক্ষণে দ্রুতগতি অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে ঢুকিয়া পড়িয়া শত্রুর প্রত্যাক্রমণের সীমানার বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে সকলে শিবিরে প্রত্যাগমন করিলে পর খবর পাইল যে স্থলপথে বহু সহস্র ভারতীয় সৈন্য উত্তম অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া এই প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে ও অতঃপর প্যারা-সৈনিকগণ দুই মাসের ছুটিতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। কয়েকদিনের মধ্যেই বহুসংখ্যক সৈন্য আসিয়া পড়িল ও ছুটির পালা সুরু হইল।

চিম্‌নি ও অজয় একটা সৈন্যবাহী বিমানে চড়িয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া চলিল। চিম্‌নি বলিল, "আরে লড়াইটা জমতে না জমতেই বাড়ী পাঠিয়ে দিল।"

অজয় বলিল, "চল না, বাড়ী গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে।"

চিম্‌নি বলিল, "দ্যুৎ।"

॥ ৮ ॥

চিম্‌নি ও অজয় যখন কলিকাতায় পৌঁছিল তাহাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইল সামরিক দপ্তরে নামধাম ঠিকানা লিখাইয়া কবে কোথায় কি ভাবে তাহাদের ডাকিলেই সন্ধান পাওয়া যাইবে ইত্যাদি সকল খবর বিভিন্ন "ফর্মে" লিপিবদ্ধ করাইয়া দেওয়া। কারণ সামরিক ছুটির অর্থ অতি সীমাবদ্ধ এবং যে কোন সময়ে অতি অকস্মাৎ সে ছুটির অবসান ঘটিতে পারে। দপ্তরে বহুবার "কান্" অর্থাৎ পূর্ণ মনোনিবিষ্ট মুদ্রায় দাঁড়াইয়া ও "অ্যাজ ইউওয়ার" বা "যেমন ছিলে তেমনে" ফিরিয়া গিয়া কার্য্য শেষ হইল। বেশ কিছু টাকা পয়সাও পাওয়া গেল নানা হিসাবে। ক্যানটিনে গিয়া চিম্‌নি ও অজয় অল্প কিছু জলযোগ করিয়া লইবে মনস্থ করিল। চিম্‌নি বলিল, "আট আণ্ডা দেকে একঠো অমলেট, দশ স্লাইজ টোষ্ট মাক্‌খন আউর খালি দুধসে বড়া এক মগ কোকো মাংতা।"

লোকটা চিম্‌নির দিকে হতাশা ও পরম ভক্তি মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া পাশের লোকটাকে বলিল, "আরে ভাই, জলদি লাও যো বোলা। নহিতো সবকো খা যায়গা।"

চিম্‌নি ও অজয় একটা টেবিলে গিয়া বসিল। হঠাৎ পিছন হইতে একজন আসিয়া চিম্‌নির পৃষ্ঠে একটা পটকা ছোঁড়ার মত আওয়াজ করিয়া এক চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "আরে চিম্‌নি! তুই কোথা থেকে এলি?"

চিম্‌নি দেখিল তাহার ইটালিয়ানদের সহিত সংঘর্ষণকালের বন্ধু অরুণ। সে বলিল, "আরে তুই! কোথায় ছিলি এতদিন?"

অরুণ বলিল, "আরে, তা জানিস না? নন্দন কাননে, ঐরাবতের হাতীশালে আর উচ্চৈশ্রবার আস্তাবলে খবরদারির কাজে মহা ব্যস্ত ছিলাম। শচীদেবীর গালাগালি সহ্য হ'ল না, তাই চলে এলাম।"

অজয় হাস্য করিতে লাগিল, চিম্‌নি হাঁ করিয়া অরুণের কথা শুনিয়া বলিল, "আরে তুই আস্তাবলে হাতীশালে কেন গেলি? তুই কি সহিস, না মাহুত? আই ঐ শচীদেবীটা কে? ও তোকে গালাগালি দিতে গেল কেন? তুই ত 'সোলজার'।"

সকলে আরও হাসিয়া উঠিতে চিম্‌নি বলিল, "ও, ঠাট্টা করছিস? ধ্যেৎ!"

খাবার আসিয়া গেল ও চিম্‌নি অতি শীঘ্র তাহার অংশের সদ্গতি করিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল। অরুণ বলিল, "তোর ক্ষিদে নেই, হ'ল কি রে? এই দিকে আউর একঠো আট আণ্ডাকা অমলেট আউর দশ স্লাইস মাক্‌খন্ রুটি লেয়া দেও।"

চিম্‌নি বলিল, "আরে করছিস কি? আমি এখন বাড়ী যাব। আর সেখানে গেলেই ফের খেতে দেবে।"

অরুণ বলিল, "তুই ত আরও আধ হাত লম্বা হয়েছিস, পেটে জায়গাও বেড়েছে, খেয়ে নে, খেয়ে নে।"

চিম্‌নি কি করিবে খাইয়া লইল। তাহার দেহের দৈর্ঘ্য সৈনিকের কার্য্যে দৌড়ঝাঁপ করিয়া আরও এক ইঞ্চি বাড়িয়া এখন ছয় ফুট আট ইঞ্চি হইয়াছে। ক্ষুধামান্দ্যেরও কোন লক্ষণ দেখা দেয় নাই।

পরের দিন কোথায় সকলে মিলিত হইবে তাহা ঠিক করিয়া যে যাহার গৃহের দিকে জিনিসপত্র লইয়া যাত্রা করিল। চিম্‌নি নিজের বাড়ী চলিল। জিনিসপত্র লইয়া একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া বাড়ী পৌছাইতে বেশী সময় লাগিল না। বাড়ীতে শুধু এক দূর সম্পর্কের পিসিমা ও পিতা ছিলেন তখন। চিম্‌নি তাঁহাদের প্রণাম করিয়া বসিল। পিসিমা তাহার দৈর্ঘ্যপ্রস্থে দিশাহারা হইয়া বলিলেন "আহা, বীরপুরুষের মতই চেহারা বটে! কে বলবে বাঙ্গালীর ঘরের ছেলে!"

পিতা বলিলেন, "হ্যাঁ, আরও বেড়েছে। শুনেছি আমার প্রপিতামহ এই রকম লম্বা, চৌড়া ছিলেন। তিনি নাকি দুই হাতে একটা পুরা বিশ হাত বাঁশ ঘুরিয়ে চোর-ডাকাত তাড়িয়েছিলেন।"

পিসিমা বলিলেন, "হ্যাঁ, সে গল্প আমরাও শুনেছি। চল বাবা, চল, মুখ-হাত ধুয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে খেয়ে নাও।"

চিম্‌নি নিজের সামরিক পোষাক ছাড়িয়া নিজে আগেকার কাপড় জামা-বাহির করিয়া পরিবার প্রচেষ্টায় লাগিল। জামা একটি ছোট মনে হইল। কারণ বুকের বিস্তার কিছু বাড়িয়া গিয়াছে মনে হইল। যাহা হউক খাইতে বসিল। পিসিমার নিজ হস্তের রান্না। চিমনি অবাধে যাহা পাতে দেওয়া হয় তাহা খাইয়া চলিল।

পিসিমা লজ্জিত কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা সন্তু, তোমার পেট ভরছে না, তুমি বরং দই মিষ্টি খাও।"

চিম্‌নি অবলীলাক্রমে সের দেড়েক দধি ও গোটা আষ্টেক রসগোল্লা খাইয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়াছিল কিন্তু সে আরও খাইতে পারিত। পিসিমা মনস্থ করিলেন অতঃপর সন্তুর জন্য ৪।৫ জনের মত রান্না করিবেন।

পাড়ার ছেলেরা আসিয়া বলিল, "আরে চিম্‌নি, আমরা শুনলাম তোকে জেনারেল করে দিয়েছে, কেননা তুই সকলের চেয়ে লম্বা।"

চিম্‌নি বলিল, "দুর! লম্বা দেখে যেন প্রমোশন হয়। আমি ত খালি হাবিলদার।"

সকলে বলিল, "না, না, তুই জেনারেল। তুই জানিস না।"

চিমনি বলিল, "কেন যা তা বলছিস। লেফ্‌টেনান্ট শুনলে আমায় শক্ত-গারদ করে দেবে। তার মানে কি জানিস? একটা গর্ত্তের মধ্যে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একবার হয়েছিল কি, একটা খচ্চরকে লাথি মেরেছিলাম বলে।"

ছেলেরা বলিল, "আরে, তুই খচ্চরকে লাথি মারলি? না খচ্চরটা তোকে লাথি মারল?"

চিম্‌নি বলিল, "মানে আর কি, খচ্চরটাই আগে আমায় লাথি মেরেছিল। আমি ওকে একটা পাল্টা লাথি মারতেই ব্যাটা খোঁড়া হয়ে গেল। আর মহা হাল্লা লেগে গেল। আমায় ধরে 'তিন রোজ শক্ত গারদ' দিয়ে দিলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেজায় খিদে পেত।"

ছেলেরা বলিল, "তোর ত দাঁড়িয়ে, শুয়ে, বসে সব অবস্থাতেই খিদে পায়; তাই না?"

চিরানুসৃত নিয়মের নির্দ্দেশে চিম্‌নি বিকালের দিকে মাতার স্মৃতিজড়িত সেই গঙ্গার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। এইখানেই মাকে তার শেষ দেখা। মৃত্যু তার মায়ের মুখশ্রীতে কোন দুঃখ-কষ্টের ছায়াপাত করিতে পারে নাই। মা যেন হাসি মুখে পৃথিবীর কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। সেই কথা মনে করিয়া চিমনি চোখ মুছিতে মুছিতে সে স্থান ছাড়িয়া গৃহে ফিরিয়া চলিল।

সান্ধ্য-ভোজনের ব্যবস্থা পিসিমা যাহা করিয়াছিলেন তাহাতে চিম্‌নিকে পরাজয় মানিতে হইল। প্রথমে বেগুন ভাজা ও ঘৃতস্নাত ছোলার ডাল দিয়া গোটা কুড়ি লুচি খাইয়া পরে আসিল দই মাছ ও আরও লুচি। তৎপরে আসিল কচি পাঁঠার ঝোল ও লুচি। ৬০।৭০ খানা লুচি ও দেড়-দুই সের মৎস্য ও মাংস চিম্‌নির মুখ সীমান্ত অতিক্রম করিলে পর চিমনি বলিল, "আর খাওয়া যাচ্ছে না।"

পিসিমা বলিলেন, "সে কি? এখনও দই, মিষ্টি, পায়েস বাকি। তা ছাড়া ফল রয়েছে।"

চিম্‌নি বলিল, "আচ্ছা পিসিমা, একটু একটু দিন।" পিসিমা তাহাকে এরূপ পরিমাণে পরিবেশন করিলেন যে চিম্‌নি পাতে কিছু ফেলিয়া উঠিতে বাধ্য হইল।

পিতা পরে তাহার আহারের বর্ণনা শুনিয়া মন্তব্য করিলেন, "এই রকম সৈন্য যদি দুই-চার লাখ থাকে, তা হলে গবর্ণমেণ্ট ফেল হয়ে যাবে সন্দেহ নেই।"

পিসিমা বলিলেন, "না, না, বয়েসের ছেলে, খাবে বৈকি।"

চিম্‌নি বরাবরই খাটে শোওয়া অসম্ভব বোধ করিয়া মাটিতে বিছানা পাতিয়া শুইত। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া আবার তাহাই করিতে হইল। ভোজনটা ভাল মতই হইয়াছিল বলিয়া ঘুমও প্রগাঢ় রকমই হইল; কিন্তু সামরিক কায়দায় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল ভোর ৪ টার সময়। সে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া বাহিরে নির্গত হইল। গৃহে তখন সকলেই নিদ্রামগ্ন। একটা চায়ের দোকান খোলা ছিল। সেখানে গিয়া চিম্‌নি এক পেয়ালা চায়ে পাঁচ চামচ চিনি ও প্রচুর দুধ দিয়া খাইয়া লইয়া প্রাতঃভ্রমণে চলিল। সকলে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল যে একজন অতি দীর্ঘকায় যুবক খাট ধুতি ও টান জামা পরিয়া চলিয়াছে। কেহ কেহ হাসিল। চিম্‌নিও হাসিল। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টায় ৫।৬ মাইল ঘোরা শেষ করিয়া চিমনি বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বাড়ীতে দেখিল বহু লোক উপস্থিত। সকলেই নিকট বা দূর সম্পর্কের আত্মীয়। কাহাকেও প্রণাম ও কাহাকেও প্রণাম না করিয়া অভ্যর্থনা কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর চিম্‌নির পরীক্ষা আরম্ভ হইল। সে এতদিন কোথায় ছিল। ওঃ, যুদ্ধে গিয়েছিল। কেন, যুদ্ধে কেন গেল? অনেক বেতন দিত নাকি গভর্ণমেণ্ট? কত বেতন? যুদ্ধ কোথায় হ'ল? মিশরে, আফ্রিকা আর বর্ম্মায়। কেন ঐ সব জায়গায় যুদ্ধ কেন

হ'ল? তা জানি না। তা হ'লে যুদ্ধে গেলে কেন? বেশীর ভাগ লোকই ত যায় নি। বরং কলকাতায় বোমা পড়বার পরে মারোয়াড়ী, হিন্দুস্থানী আর আরও কেউ কেউ সহর ছেড়ে পালিয়েছে। যুদ্ধ করতে কেমন লাগল? ভাল।

কটা লোক মারলে? জান না? সে কি কথা; লোক মারলে অথচ কটা তা জাননা? সত্যিই যুদ্ধে গিয়েছিলে না আর কোথাও গিয়ে চাকরি-বাকরি করছিলে?

চিম্‌নি প্রশ্নের তাড়ায় শেষ অবধি "এই আসছি" বলে পলায়ন দিতে বাধ্য হইল। রান্নাঘরে পিসিমা তাহাকে সের খানেক মোহনভোগ ও আধ সের দুধ খাইয়ে দিয়ে বললেন "যাও বাবা, বাইরে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে এস গিয়ে। এই সব আপদরা এসে এখন তোমার মাথা ধরিয়ে দেবে আজেবাজে কথা বলে।" চিম্‌নি পিসিমার সহিত একমত ছিল। সে বাহিরে চলিল।

একখানা খবরের কাগজ কিনিয়া লইয়া হেদোর ধারে একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। এক জায়গায় দেখিল লেখা রহিয়াছে, "আপনার ক্ষুধা হয় না? খাদ্য দেখিলে মুখ বিকৃত করিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া ল'ন? বাদশাহী লবণ ব্যবহার করুন। রাজহংসের ন্যায় অবিরাম আহারে সক্ষম হইবেন। ইহার সহিত সুলতানশাহী বটিকা ব্যবহার করিলে ক্ষুধায় আকুল হইয়া 'কি খাই কি খাই' করিয়া ঘুরিতে হইবে।" ইত্যাদি। চিম্‌নি বিজ্ঞাপন পড়িয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন ভদ্রলোক বেঞ্চির অপর প্রান্তে বসিয়াছিলেন, তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি মশায়? কি হল?"

চিম্‌নি বলিল, "বাদশাহী লবণ আর সুলতানশাহী গুলি খেলে এত খিদে বেড়ে যাবে যে তার সীমা থাকবে না। আমার ত এমনিতেই এত খিদে হয় যে বাড়ী থেকে বাবা তাড়িয়ে দেবে বলে ভয় হয়।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "বলেন কি? আমার ত খেতে ইচ্ছেই হয় না একেবারে। দেখি, দেখি, কি লবণ আর গুলি?" চিম্‌নি তাঁহাকে কাগজখানা দিয়া অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল যে তিনি কি প্রকার জীব। খাইবার ইচ্ছা হয় না, এ প্রকার মানব কল্পনার অতীত। ভদ্রলোক বলিলেন, "এ সব বাজে কথা। ঠকিয়ে পয়সা নেবার চেষ্টা।" চিম্‌নি বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়। খিদে ত এমনিতেই হয়। খিদে থামাতেই পয়সা খরচ হয়।"

ভদ্রলোক ভক্তিবিস্ময়জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "আপনার রোজ খিদে হয়?"

চিম্‌নি বলিল, "হ্যাঁ, সমস্ত ক্ষণই খিদে হয়। খেলেও খিদে যায় না। এই ত প্রায় চার বাটি মোহনভোগ খেয়ে এলাম আর আধ সের দুধ। এখনও বেশ খিদে রয়েছে।

ভদ্রলোক তাহার দিকে বিস্ফারিত নয়নে তাকাইয়া বলিলেন, "মশায়ের কি করা হয়?"

চিম্‌নি বলিল, "আমি এখন ছুটিতে রয়েছি। তা নইলে যুদ্ধ করি।"

"অ্যাঁ! যুদ্ধ করেন?' সে আবার কি?"

"হ্যাঁ, তাই ত করি। এইত চার-পাঁচদিন আগেও যুদ্ধ হয়েছিল।"

লোকটি সন্দেহের দৃষ্টিতে চিম্‌নির দিকে চাহিয়া, কাগজখানা বেঞ্চির উপর রাখিয়া দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, নিশ্চয়ই চিম্‌নি পাগল কিংবা নেশা করিয়া বসিয়া আছে। খাট ধুতি আর ক্ষুদ্রায়তন পিরান পরিধান করিয়া কেহ যুদ্ধ করে একথা তাহার মনে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারিল না।

চিম্‌নি ভাবিল লোকটা নিশ্চয় পাগল নয়ত নির্ব্বোধ, তাহা নহিলে যুদ্ধের নামে চমকিয়া উঠিয়া পলায়নের কারণ কি হইতে পারে। অতঃপর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন স্নানাহার ও আগন্তুকদিগের সহিত কথোপকথন।

বৈকালে চিম্‌নি গড়ের মাঠের দিকে চলিল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখে একটা বেঞ্চিতে অজয় ও অরুণ বসিয়াছিল। চিম্‌নিকে দেখিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আরে, আরে, একেবারে রাজার জামাই বলে মনে হচ্ছে।"

চিম্‌নি বলিল, "কেনরে কেন রাজার জামাই কেন?"

অজয় বলিল, "মানে আর কি, রাজার খোপা কিংবা তার গাধা, মানে নিকট সম্পর্কের রাজার কেউ।

চিমনি বলিল, "দ্যুৎ"।

তাহারা উঠিয়া চলিল ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে। সেখানে দুই চারটে ঘোড়াকে কসরত করান হইতেছিল। সেগুলি অতি সাধারণ জাতীয় শুধু নাম রক্ষার উপায়মাত্র বলিলেই হয়।

চিম্‌নি বলিল, "এগুলোকে দৌড় করায় কেন? কি লাভ হয়।"

অরুণ বলিল, ঘোড়াদের আত্মা নেই কি না। দৌড়ে দৌড়ে আত্মা গজিয়ে ওঠে আর তখন সেই আত্মা সের দরে বিক্রি হয়। প্রাচীন কালে অশ্বমেধ যজ্ঞ হ'ত, তখন এক একটা ঘোড়া সারা দুনিয়া দৌড় মেরে চলে আসত; একেবারে চর্ব্বির ফোঁটায় ফোঁটায় আত্মা। আর রাজা, মহারাজারা সেই আত্মা নিয়ে ছিনিমিনি খেলত।"

চিম্‌নি বলিল, "তোর মাথা খারাপ। চর্ব্বির মধ্যে আত্মা কি করে থাকবে?"

"আরে তুই জানিস নে। চর্ব্বির মধ্যেই আত্মা থাকে। দেখিস নে এই মন্দিরের সেবায়েতদের গায়ে কত চর্ব্বি। আর পূজুরী বামুনগুলোর গায়েও আত্মায় ঠাসা চর্ব্বি; মানে চর্ব্বিতে ঠাসা আত্মা।"

চিমনি বলিল, "আবোল-তাবোল বকিস নে।"

একদিকে ঐ স্থলে খুব চানাচুর বিক্রির ভিড়। অনেক চানাচুর বিক্রেতা পলাতক হইলেও অন্ধকারের আগে অনেকগুলি খুঞ্চেওয়ালা ওখানে আসিয়া নানা প্রকার অখাদ্য রসনা-তৃপ্তিকর বস্তু বিক্রয় করিত। অন্ধকারের কিছু পূর্ব্বেই তাহারা ও অধিকাংশ ক্রেতারাও স্থান ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইত। ব্ল্যাক আউট তখনও প্রবল ভাবে চালিত ও সহরে লোকজন কাক-কোকিলের মতই সূর্য্যের সঙ্গে তাল রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সহরে নারী, বালক-বালিকা প্রভৃতির সংখ্যা কমই। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সৈন্যে রাস্তাঘাট পূর্ণ। অধিকাংশ সৈন্য আমেরিকান, বৃটিশ ও ভারতীয়। অজয়, অরুণ ও চিম্‌নি চীনাবাদাম ক্রয় করিতে গিয়া অনেকগুলি লোকের মধ্যে গিয়া পড়িল। কেহ কেহ ধাক্কাধাক্কি করিতে আরম্ভ করিল। একজন চিম্‌নিকে ধাক্কা দেওয়াতে চিম্‌নি বলিল, "আরে বাবা, ধাক্কাধাক্কি করছ কেন?"

সে ব্যক্তি বলিল, "কেঁও গালি দেতা?"

"কোথায় আবার গালি দিয়া? বোলতা হায় ধাক্কাধাক্কি মত কর।"

"হাঁ গালি নহি দিয়া? ম্যয় ঝুট বোলতা ক্যা?" বলিয়া সে সজোরে চিম্‌নিকে ধাক্কা দিল। চিম্‌নি তাহাতে স্থানভ্রষ্ট হইল না কিন্তু তাহার মনে ক্রোধের উৎপত্তি হইল। সে বলিল, "আরে গালি নহি দিয়া আউর তুম ধাক্কা দেতা হায়।" সে ব্যক্তি আরও জোরে ধাক্কা দিল ও অরুণ তাহাকে সজোরে টানিয়া সেখান হইতে বাহিরে ঠেলিয়া দিল। সে একটা ইট তুলিয়া অরুণকে মারিতে আসিল।

চিম্‌নি বলিল, "আরে আরে, কাহে মারতা?" বলিয়া তাহার হাত হইতে ইটখানা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে আর এক হাতে ঘাড় ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ফেলিল। বলিল, "আবার মারপিট করে গা, না চুপ রহেগা।" সে ব্যক্তি ঐ ভাবে শূন্যে উত্থিত হইয়া বুঝিল চিম্‌নির শরীরে অমানুষিক শক্তি।

সে বলিল, "ছোড় দেও।" ছাড়িয়া দিতে সে চলিয়া গেল। বলিল, "দানো হায়।"

চিম্‌নি অজয় ও অরুণকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রে দানো কিরে?"

অজয় বলিল, "তা জানিস না? দানোর ডিম দেখিস নি কখন? এক একটা ফুটবলের চেয়ে দশগুণ বড়।"

চিম্‌নি বলিল, তা আমি দানো হব কি করে? আমি ত মানুষ। আর ডিম পাড়ে ত পাখীতে নয়ত কুমীরে। ব্যাটার মাথা খারাপ।"

॥ ৯ ॥

ছুটিটা আরম্ভ হইয়াছিল ভাল ভাবেই। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া, গল্প-গুজব আর ঘুরিয়া বেড়ান। কোন দুঃখ ছিল না। অজয় আর অরুণ আরও পাঁচ সাত জন সৈনিক ও সাধারণ বন্ধু-বান্ধব জুটাইয়া ফেলিল এবং ইহারা সকলে হাঁটিয়া কখনও ডায়মণ্ডহারবার, কখনও বারাসত কি হুগলি বেড়াইয়া আসিত। ইহাতে সারাদিন পায়ে হাঁটিয়া স্বাস্থ্যও ভাল থাকিত এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা পদব্রজে গমন করিয়া সৈনিক-সুলভ অন্তহীন হণ্টন অভ্যাসও বজায় থাকিত। দিন কাটিতেছিল ভালই। এমন সময় আকাশের অজানা কোণে যেমন ঝড়ের মেঘ হঠাৎ তাহার আবির্ভাবে কঠোর নির্ঘোষে জীব জগতকে সচকিত করিয়া জানাইয়া দেয়, তেমনি আকস্মিক ও তীব্র গতিতে কালের করাল ছায়া অদৃষ্টের নির্ম্মম বিধানে বাংলার গ্রামে গ্রামে গৃহস্থের কুটিরে কুটিরে মৃত্যুর বিভীষিকা মাখাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ দেখা গেল চাউলের মূল্য চার টাকা হইতে উঠিয়া উঠিয়া ষোলো আঠার কুড়ি করিয়া ত্রিশের উপরে চলিয়া গেল। অদৃষ্ট আসিল দেশরক্ষকদিগের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া। রাজ দরবারের ইংরেজ মুসলমান হিন্দু উজির নাজির মন্ত্রী মনসবদার ও সভাসদ সকলে মিলিয়া লোলুপ আগ্রহে গরীবের খাদ্যবস্তু লইয়া লাভের খেলা আরম্ভ করিল। হুকুমনামা বাহির হইতে লাগিল দিস্তায় দিস্তায় ও সকলের মরাইয়ের ধান এই ঘৃণ্য ব্যবসার আড়তদারদিগের গুপ্ত আড়তে জমা হইতে লাগিল। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ ঘরবাড়ী গহনা বাসন বিক্রয় করিয়া এক মুঠি চাউল কিনিতে ছুটিল। কিন্তু মৃত্যু আরও দ্রুতগতিতে তাহাদিগের গতিরোধ করিয়া নিষ্ঠুর হস্তে নরনারী শিশু নির্ব্বিশেষে সকলকে পিষিয়া মারিতে আরম্ভ করিল। দলে দলে শীর্ণকায় নরনারী সহরের দিকে চলিতে লাগিল। পথের ধারে অনাহারে মৃত গ্রামবাসীদের দেহ শৃগাল গৃধিনীভুক্ত হইয়া সে বীভৎসতা শত গুণ বাড়াইয়া দিল। কলিকাতার রাজপথে ক্রমশঃ মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইতে লাগিল। বড়বাজারের গলিতে গলিতে চাউলের বস্তা পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া গুদামে গুদামে লুক্কায়িত ও কারখানা দপ্তর ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত লোকেদের জন্য তাহা অতি উচ্চমূল্যে সরবরাহ হইতেছিল। কিন্তু সেই সকল গলিরই আশেপাশে মৃত শিশুকোলে মুমূর্ষু মাতার কণ্ঠের শেষ কাতরোক্তি শুনা যাইতে লাগিল। তাহাদিগকে সে অবস্থায় খাইতে দিলেও বাঁচান সম্ভব হইত না। শত শত, ক্রমশঃ সহস্র সহস্র ও শেষে লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী এইভাবে অবস্থাপন্ন ও শক্তিমান নর-দেহধারী রাজ-দরবার ও বাজারের হিংস্র পশুদিগের ঐশ্বর্য্য লালসার নিকট আত্ম বলিদান করিল। এই নৃশংস হত্যানাট্যে যাহারা প্রধান প্রধান অভিনেতা ছিল তাহাদের কলঙ্ক রাজ-দরবারের অভিষেক বারিতে নির্ম্মুক্ত করিবার চেষ্টা হইল, অনেকটা সফলও হইল সেই চেষ্টা; কিন্তু এই যে একটা সমগ্র জাতিকে নিদারুণ ক্ষুধা-যন্ত্রণা দিয়া ও মমতাহীন নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করা হইল, তাহার মহাপাপ কি কোনও পাপীকে স্পর্শ করিল না? ভগবানের ইচ্ছায় যে সকল শাণিত অস্ত্রচ্ছেদী ও মর্ম্মঘাতী পীড়া মানুষকে আক্রমণ করে সেই সকল ব্যাধি এই হৃদয়হীন জন্তুগুলোর কাহারও কেন হইল না?

অজয়, অরুণ, চিম্‌নি ও অন্যান্য যুবকগণ প্রথমে ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝিতে পারে নাই। শুধু দেখিত গ্রামাঞ্চলে বেড়াইতে যাইলে একটা নিদারুণ ভীতির আবহাওয়া। উহাদিগকে দেখিলে চাষাদিগের গৃহের দরজা বন্ধ হইত। জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কেহ বলিত, "ধান কিনতে এসেছ নাকি তোমরা? সব ধান ত নিয়ে গেছে আগেই শমন দিয়ে।" ইত্যাদি বর্ণনায় তাহারা বুঝিল যে গবর্ণমেণ্টের হুকুমে চাষীদিগের ধান জোর করিয়া কিনিয়া লওয়া হইতেছে। এবং তাহারা যখন নিজেরা সেই ধান বা চাউল ক্রয় করিতে যাইতেছে তখন তাহাদিগকে দশগুণ দাম দিয়া ক্রয় করিতে হইতেছে।

চিম্‌নি বলিল, "জোর করে কিনে নিচ্ছে কেমন করে? আর যদি তাই নিচ্ছে ত ওরাও কেন জোর করে দোকানদারদের কাছ থেকে জিনিস কিনে নিচ্ছে না?"

অজয় বলিল, "যাদের গায়ে জোর নেই তারা কি করে জোর করে কিছু করবে? সবাই ত আর সাত ফুট লম্বা নয়। আর ওদের ভয় হয়।"

"কেন ভয় হয়? জিনিস কিনতে আবার ভয় হবে কেন?"

এই সকল আলোচনায় কোন লাভ হইত না। মৃত্যুর করাল ছায়া ক্রমশঃ নিকট হইতে আরো নিকটে আসিয়া কলিকাতার রাজপথ বিভীষিকাময় করিয়া তুলিল। পথে বাহির হইলেই শুধু অনাহারে মৃত্যুর দৃশ্য। এবং সকলেই অতি সহজে বুঝিত যে তাহা মানবতাবিরুদ্ধ এবং হীন চক্রান্ত-প্রসূত নির্ম্মম লোলুপতার নিদর্শন। পুরাতনকালে নৈসর্গিক কারণে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ হইলে কখন কখন বহু লোকের প্রাণ গিয়াছে ইতিহাসে দেখা গিয়াছে; কিন্তু তাহার মধ্যে মানুষের গুপ্ত ষড়যন্ত্র, ব্যবসার বাজার ও তাহার সহিত রাজ-দরবারের কূট-সহযোগিতা কখনও দেখা যায় নাই। কাল যে চাউল চারি টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে সেই চাউলই বারে বারে মিথ্যাভাবে ক্রীত-বিক্রীত হইয়া চক্রবৃদ্ধি রীতি অনুসরণে ত্রিশ টাকায় দাঁড়াইল কেমন করিয়া তাহা সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে না পারিলেও লোকে ইহা বুঝিল যে উপরের শাসক ও আড়তের মালিকের মিলিত ষড়যন্ত্রে এক প্রকার জোর করিয়াই চাউল ছিনাইয়া লইয়া কিনিয়া আড়তজাত করা হইতেছে এবং লোকে ব্যবসাদার ও অজানা ঘুষখোরদিগের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির জন্য অনশনে প্রাণ দিতে বাধ্য হইতেছে।

অজয়, অরুণ ও চিম্‌নির অন্যান্য নবলব্ধ বন্ধুগণ এই দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া কেল্লাতে যাতায়াত করিয়া বাহিরে যে সকল সৈন্যগণ থাকিত তাহাদিগের সাহায্যে চাউল আটা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া এ-পাড়া ও-পাড়ার অন্নসত্রগুলিতে দিতে লাগিল। এই কার্য্যে ব্রিটিশ আকাশ বাহিনীর ও আমেরিকান সৈন্যগণ তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিত। কতশত বস্তা চাউল, আটা, শুকান কড়াইশুঁটি প্রভৃতি চিম্‌নি ও তাহার বন্ধুগণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের জন্য সংগ্রহ করিয়া দিল তাহার ইয়ত্তা নাই। কয়েকটি আমেরিকান সৈন্য এই বিষয়ে তাহাদিগের সহিত আলোচনা করিত। তাহারা বলিত, "যে সব দোকানদাররা কালোবাজার চালাচ্ছে তাদের ভাল রকম করে সাজা দিলেই এই সব বন্ধ হয়ে যায়।" "কথা হ'ল সাজা দেবে কে? আমরা শুনছি বড় বড় সরকারী মহারথীরা কালোবাজারের গুপ্ত অংশীদার।" "তাই না কি? তা হ'লে সেই সব লোকেদেরও উত্তম-মধ্যম দেওয়া দরকার।" "জানা গেলে দেওয়া যায় কিন্তু কে কোথায়, কেমন করে এই সব করছে জানাও শক্ত।" আরও কত আলোচনা চলত। কি উপায়ে কালোবাজারের পাপীদিগের শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে সে বিষয়ে আমেরিকানদিগের মতামত খুবই মনোযোগের সহিত সকলে শুনিত। চিম্‌নি কালোবাজার কোথায় প্রায়ই খুঁজিয়া বেড়াইত। ভোর চারটার সময় কোন ভারবাহী গাড়িতে অনেক বস্তা দেখিলে সে দৌড়াইয়া সেগুলির পিছনে যাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিত কোথায় যায় তাহারা। এই উপায়ে দুই-একবার কয়েকটা জায়গা দেখিয়া লইয়া পরে সেই সকল অঞ্চলের ছেলেদিগের সহিত ভাব করিয়া খোঁজ লইত যে সেই সব বাড়ীগুলিতে চাউলের গুদাম আছে কি না। শেষ পর্য্যন্ত সে একটা গুপ্ত গুদাম আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। সকলকে সে-কথা বলিতে ভারতীয়, ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যগণ নানান খোঁজ খবর করিবার ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিল।

কয়েকদিনের মধ্যেই সঠিক জানা গেল যে চিম্‌নির আবিষ্কৃত গুদামটিতে চাউল জমা রহিয়াছে প্রচুর। গোপনে নানাপ্রকার আয়োজন চলিতে লাগিল। তারপর একদা রাত্রি ২টার সময় ঐ গুদামখানার সম্মুখে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশখানা সামরিক লরী জমা হইয়া গেল। অধিকাংশই আমেরিকান সেনাবাহিনীর যানবাহনের অন্তর্গত। সেগুলি সব একত্র হইলে পরে চার-পাঁচখানা জীপ গাড়ি সেখানে পৌছাইল এবং তাহা হইতে অনেক রংবেরঙের পোশাক পরিহিত সৈন্য নামিয়া গুদামের দিকে চলিল। ঐ সঙ্গে একদল বাঙ্গালী ছেলে আসিয়া জুটিল। তাহাদিগের যে দলপতি তাহার দেহের দৈর্ঘ্য দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। যে সকল আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্য সেখানে ছিল এই লোকটির তুলনায় সকলকেই খর্ব্বকায় মনে হইতেছিল।

আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্যগণ গুদামের দরজায় গিয়া জোরে জোরে আঘাত করিতে, ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দুই-তিনজন পশ্চিমা দারোয়ান বাহিরে আসিতেই দুইজন করিয়া আমেরিকান তাহাদিগকে হাতে হাতকড়া লাগাইয়া টানিয়া একটা জীপের মধ্যে বসাইয়া দিল ও সঙ্কেতে বুঝাইল যেন তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে; নয়ত রিভলভার রহিয়াছে সকলের নিকটে। অতঃপর বাঙ্গালী ছেলের দল গুদামের ভিতর হইতে চাউলের বস্তা বাহির করিয়া লরী-গুলিতে তুলিতে লাগিল। এক একটা লরীতে কম-বেশী একশত বস্তা উঠান হইলে পর লরীখানা ধীরে ধীরে চলিয়া যাইল। এই ভাবে সকল লরীগুলিতেই মাল বোঝাই হইল এবং সেগুলি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বাঙ্গালী ছেলেগুলিও এক একটি লরীতে দুই-তিনজন করিয়া ক্রমশঃ চলিয়া গেল। শেষে যাহারা রহিল তাহারা জীপগুলিতে চড়িয়া পড়িল। জীপগুলি এদিকে-ওদিকে চলিয়া গেল। যে জীপটিতে পশ্চিমা দারোয়ানদিগকে উঠান হইয়াছিল সেখানা গড়ের মাঠের দিকে চলিয়া গেল।

সেই রাত্রে কলিকাতার বহু জায়গায় যে সকল গরীবদিগকে খাওয়াইবার জন্য অন্নসত্র খোলা হইয়াছিল সকলগুলিতেই দশ-বিশ বস্তা করিয়া চাউল সরবরাহ হইয়া গেল। ইহা ব্যতীত বহু বস্তিতে গরীব লোকে এক এক বস্তা চাউল পাইয়া দুই হাত তুলিয়া আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্যদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

সকালবেলা চিম্‌নি ঘুম ছাড়িয়া না উঠাতে পিসিমা বলিলেন, "কি হ'ল তোমার? শরীর খারাপ না কি?"

চিম্‌নি বলিল, "এই একটু গায়ে ব্যথা, আর কিছু নয়। ও ঠিক হয়ে যাবে এখন।"

আটটার সময় পশ্চিমা দারোয়ানদিগের মনিব-বাড়ীতে গিয়া দারোয়ানরা বলিল, রাত্রে তাহাদিগকে মিলিটারী আসিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল ও ডায়মণ্ডহারবারের পথে ছাড়িয়া দিয়া তাহারা চলিয়া যায়। গুদামে গিয়া তাহারা দেখিল গুদাম প্রায় খালি। পুলিশে যাওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু জানা-শোনা পুলিশ অফিসারগণ বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, দারোয়ানগুলি ষড়যন্ত্র করিয়া মাল চুরি করাইয়াছে। আমেরিকানদিগের গল্প উহাদের গঞ্জিকা-পানের ফল বলিয়া মনে হয়; বাস্তবতা বা সত্যের আভাস মাত্রও তাহাতে লক্ষিত হয় না। সহরময় বিদেশী সৈন্যদের খ্যাতি খুব ছড়াইয়া পড়িল। তাহারা নিজেরা না খাইয়া সেই খাদ্যবস্তু গরীবদের দিয়া থাকে। চিম্‌নি দুই-একজন আমেরিকান সৈন্য-বন্ধুদিগের সহিত সময় সময় ঘুরিতে বাহির হইত। তাহারা বলিত, "চিম্‌নি শোন। আর একটা ঐ রকম গুদাম খুঁজে বের কর। আর একবার আমরা ব্যবস্থা করি দুষ্টের দমন ও গরীবের খাওয়াইবার।"

চিম্‌নি বলিত, "দেখছি ত খুঁজে। পেলেই জানাব।" চাউলের সন্ধান পাওয়া না যাইলেও, টিনের দুধ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রায়ই চিম্‌নি ও তাহার বন্ধুগণ মিলিটারি লোকেদের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া বস্তিমহলে বিতরণ করিত। ইহাতে সর্ব্বত্র চিম্‌নি মহারাজের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল।

চিম্‌নি বলিত, "আর ত মাত্র কিছুদিন ছুটির বাকী। তারপরেই ত আমরা চলে যাব। এগুলো তখন খাবে কি?"

অজয় বলিত, "খাবি খাবে আর কি?"

চিম্‌নি বলিত, "খাবি কি?"

"এই যা কোন খাবার না খেলে লোকে খায়।"

চিম্‌নি বলিত, "ধ্যেৎ, কি যে বকিস! কিছু না খেলে আবার কি খায়? কিছুই ত খায় না।"

অরুণ বলিত, "ও এক রকমের মারাত্মক এথি। বুঝেছিস?"

চিম্‌নি সেদিন বাড়ীর বাইরে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রাস্তা দেখিতেছিল। কত লোক, ঠেলা গাড়ি, রিক্‌শা আর ঝাঁকা-মুটে। সে ভাবিতেছিল এত লোকজন শুধু শুধু খালি ঘুরিয়া বেড়ায় কেন। কোথা হইতে আইসে, ইহারা কোথায়ই

বা যায়। এইরূপ চিন্তার স্রোতে বাধা পড়িল। দেখিল একজন স্ত্রীলোক একটি ছোট শিশুকে কোলে করিয়া আসিয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইয়াছে। অতি শীর্ণ দেহ স্ত্রীলোকটির। বহুকাল খায় নাই বা আধ-পেটা খাইয়াছে মনে হয়।

করুণ কণ্ঠে নারী বলিল, "বাবা আমার ছেলেটাকে একটু এইখানে শুইয়ে দিয়ে আমি হাত-পা ঐ রাস্তার কলে একটু ধুয়ে নিচ্ছি। ছেলেটাকে একটু দেখো বাবা।"

চিম্‌নি, "হ্যাঁ, কি বললে, ছেলে কি করবে?" কি যেন বলিতে গেল, ইতিমধ্যে শিশুকে চিম্‌নির পাশে রোয়াকের উপর শোয়াইয়া দিয়া নারী কলতলা খুঁজিতে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরেও স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া না আসায় চিম্‌নি ব্যস্ত হইয়া, "আরে, কোথায় গেল? এই ছেলেটা এইবার হাল্লা সুরু করবে।" বলিতে বলিতে ছেলেটি হাল্লা সুরু করিল। এবং বেশ রীতিমত সতেজে।

চিম্‌নি বলিল, "আরে, থাম্ থাম্, তোর মা আসছে।" কে আর থামে চিম্‌নির কথায়। শিশুর চীৎকারে রাস্তার ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ও সন্তোষদা, ওটা আবার কোথায় পেলে? ও কার ছেলে?"

অরুণ আসিয়া উপস্থিত হইল ঠিক ঐ সময়। বলিল, "এই, তুই ছেলে কোলে করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? তোর আবার ছেলে হ'ল কবে?"

চিম্‌নি বলিল, "আরে দ্যুৎ! আমার ছেলে হবে কেন? ঐ ত ওর মা ওখানে পা ধুতে গেল।"

"হ্যাঁ ওর মা পা ধুতে গেল আর তুই অমনি ওকে কোলে করে সামলাতে লাগলি কেমন? বেশ, বেশ! আরে ডাক না ওর মাকে, গেল কোথায় সে? তার নাম কি? বলি ও খোকার মা! কোথায় গেলে গো? চলে এস না, ছেলে কাঁদছে যে।"

চিম্‌নি বলিল, "তুই ধর না ছেলেটাকে। আমি দেখে আসি কোথায় গেল ওর মা।"

"না বাবা, আমি তোমার ছেলে ধরছি না। তুমিও আবার পা ধুতে চলে যাবে আর তারপর তুমিও আসবে না, আর তোমার পাও আসবে না, আমি থাকব ছেলে কোলে করে। ওর মধ্যে আমি নেই। তুই ছেলে কোলে দাঁড়িয়ে থাক আমি দেখে আসছি ওর মা কোথায় পা ধুচ্ছে।" খানিকক্ষণ পরে সে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল ছেলের মা কোথাও নাই।

চিম্‌নি ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, "বলিল, বারে! এ ত বেশ! আমার ঘাড়ে ছেলেটাকে চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়ল। এখন আমি এটাকে নিয়ে কি করব?"

"কেন, মানুষ কর। ছেলে মানুষ করার আনন্দ পায় লোকে কত খরচা করে। বিয়ে, বৌভাত, গাড়ি ভাড়া, ডাক্তার, বদ্যি, কত কিছু। এ দেখ স্রেফ বিনা খরচে ছেলে পেয়ে গেলি।"

চিম্‌নি বলিল. "আমি চাই না ছেলে। তুই নিয়ে যা না।"

"উঁহু বাবা, সেটি হবে না। তোমার ছেলে তোমারই থাক।" ছেলে এতক্ষণে চিৎকারে পাড়া মাথায় তুলিয়াছে। ভিতর হইতে পিসিমা আসিয়া বলিলেন, "ওমা, ওমা, এ কি গো! এ কার ছেলে। কোথা থেকে এলো!"

চিম্‌নি বলিল, "ওর মা রেখে পা ধুতে গেল, আর এল না।"

পিসিমা গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, "ওমা, এ কার না কার ছেলে। এখন কি হবে। যা কাঁদছে! দেও, আমায় দেও, দেখি থামাই ওর কান্না।"

ছেলেটি পিসিমার নিকটে গিয়া একটু চুপ করিল। তাহাকে লইয়া পিসিমা ভিতরে চলিয়া গেলেন ও অতঃপর ক্রন্দন না শুনা যাওয়াতে আন্দাজ করা হইল যে শিশু চিম্‌নি অপেক্ষা তাহার পিসিমাকেই অধিক প্রিয়জন বলিয়া মনে করে। চিম্‌নি এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল সেই স্ত্রীলোকটি কোথায়। তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না

এবং পাড়ার লোকেরা বলিল সে নিশ্চয় শিশুকে খাওয়াইতে পারে না বলিয়া তাহাকে একটা ভাল বাড়ীতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিল, "আজকাল অনেকে খেতে না পেয়ে ছেলেমেয়ে বিক্রী করে দিচ্ছে।"

চিমনি বলিল 'বিক্রী করছে কেমন করে? ছেলেমেয়ে কি বিক্রী করা যায়?"

অজয় বলিল, "আরে ছেলেমেয়ে কেন, তোকেও বিক্রী করে দেওয়া যেতে পারে। এই ধর, চিড়িয়াখানার জিরাফটা মরে গেল আর অন্য জিরাফ পাওয়া যাচ্ছে না। তা তোকে জিরাফ সাজিয়ে রেখে দেওয়া হ'ল। চিড়িয়াখানার লোকেরা তা হলে পয়সা দেবে না?"

চিমনি বলিল, "যাঃ! আমার কি জিরাফের মত চারটে পা—না গায়ের চামড়া ঘোড়ার মত?"

"আরে তাতে কিছু হয় না। আমরা বলে দেব এটা কঙ্গোর জিরাফ নয়, বঙ্গোর জিরাফ।"

চিমনি বলিল "দ্যুৎ!"

স্ত্রীলোকটিকে খুঁজিয়া না পাইয়া চিম্‌নি বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দেখিল পিসিমা তাহার পুরাণ ধুতি ছিঁড়িয়া শিশুটির বস্ত্র পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিতেছেন। "এখন দেখ দিখি এর সব কাঁথা কপ্‌নি কোথা থেকে জুটবে? দাদা বললেন, সন্তুর পুরাণ কাপড়গুলো কোথায় একটা বাক্সবন্দি হয়ে আছে। সে বাবা পেলাম না। এই বাচ্চাটাও দুধ খেয়ে পরা ছিল যা তা ভিজিয়ে দিলে। যাও ত বাবা, ওটা ধুয়ে দিয়েছি, ওটাকে শুকুতে দিয়ে দাও।"

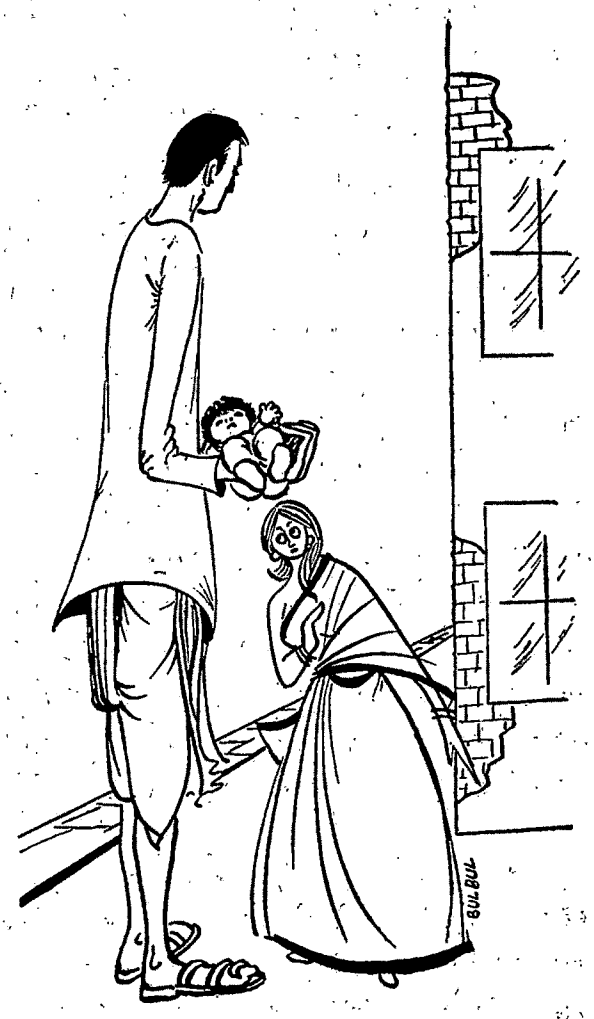

ছেলেটাকে একটু দেখো বাবা

চিম্‌নি শিশুর বিজাতীয় পরিধান বস্ত্রটি একটি দড়ি বাঁধিয়া টাঙ্গাইয়া দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দড়িতে তিন-চার খানা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড ঝুলিতে লাগিল। এবং চিম্‌নি এই নূতন কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইতে লাগিল।

পিসিমা বলিলেন, "কে বলবে আইবুড় ছেলে? দেখত কেমন সব ধুয়ে শুকুতে দিচ্ছে?"

অজয় তখনও সেইখানে বসিয়া সেই দৃশ্য উপভোগ করিতেছিল। সে বলিল, "হ্যাঁ পিসিমা, কে বলবে আইবুড়ো ছেলে? ঠিক যেন পাঁচ ছেলের বাবা!"

চিম্‌নি বলিল, "তুই থাম ত! তোর যখন ছেলেপিলে হবে, তুই কিছুই পারবি না। আমি ত তবু কাপড় কাচতে শিখে নিলাম।

অজয় বলিল, "তোর বিনা পয়সার ছেলের তুই বিনা পয়সার ঝি। আমার ছেলে-পিলে হবার অনেক আগেই সানাই বেজে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে এত হৈ-হাল্লা হবে যে দূর সম্পর্কের সব মেয়েরা এসে জুটে যাবে। পরে দরকার হলে কাপড় কাচবার লোকের অভাব হবে না।

চিম্‌নি বলিল, "আমার ত আর বিয়ে হয় নি আর ঐ ছেলেটাও ত আমার নয়। ওর মা ওকে ফেলে পালিয়ে গেছে ত আমি কি করব?"

"কিছু না, কিছু না। শুধু যেখানে মা'রা ছেলে ফেলে পালিয়ে যায় সেখানে গিয়ে তোমার ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থেক না।"

চিম্‌নি বলিল, "আমি যেন ওর কাছে ওর ছেলেটাকে চাইলাম!"

ইহার পরে কিছুদিন চিম্‌নি বিশেষ বাড়ীর বাইরে যাইত না। তাহার পড়িয়া-পাওয়া ছেলের পরিচর্য্যা করিতে পিসিমাকে সে সাহায্য করিত সারাক্ষণ। পাড়ার কোন কোন মহিলার দৌলতে কয়েকটা কাঁথা জুটিয়া গেল। একটা বালিস সেলাই করিয়া লওয়া হইল। এবং দুধের বাটি, চামচ প্রভৃতি বাড়ীতেই পাওয়া গেল। পিসিমা মাঝে মাঝে কাতর কণ্ঠে বলিতেন, "কার যে ছেলে, কোন্ জাত, কিছুই জানি না। মেলেচ্ছ কি আর কিছু হ'লে মুশ কিল হবে। আমি ত বাবা দিনে চারবার চান করছি। তা হলেও কচি ছেলে, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ত!"

কচি ছেলে তাহার কচিত্ব অগ্রাহ্য করিয়া যাহা পাই তাহা খাই নীতি অনুসরণ করিয়া সকলের ভাতের থালার দিকে হাত বাড়াইতে আরম্ভ করিল। চিম্‌নি তাহাকে আদর করিয়া খাঁদা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। খাঁদার নাসিকা ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনায় গঠিত হয় নাই; কিন্তু তাহার গঠনে খর্ব্ব ভাব বিশেষ প্রকট ছিল না। বলা যাইতে পারে নামটা অকারণে প্রযুক্ত ও অতিরঞ্জিত ছিল। অজয়, অরুণ বলিত "ছেলেটা দেখতে বাপের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে।" আমেরিকান বন্ধুরা বলিত, "ভেরি কিউট!" খাঁদার প্রাপ্তি দিবসকে তাহার জন্মদিন স্থির করা হইল ও ঐ হিসাবে তাহার বয়স ধার্য্য হইল এক বৎসর আঠার দিন। পিসিমা বলিতেন, "খাঁদু ভাল জাতেরই হবে। দেখ না, নাকের পোঁটা যতক্ষণ না মুছে দেওয়া হয় ততক্ষণ কি রকম রেগে চেঁচায়? ছোট ঘরের ছেলেপিলে নোংরা থাকলে কিছু বলে না।" এই অকাট্য যুক্তিতে নিসন্দেহে প্রমাণ হইয়া গেল যে খাঁদা উচ্চ বংশজাত।

॥ ১০ ॥

সকলের যাইবার সময় নিকট হইয়া আসিল। আর আট দশ দিনের পরেই চিম্‌নির সৈন্যদলে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কোথায় যে যাওয়া হইবে তাহা কেহই বলিতে পারিবে না; কারণ সামরিক চলাফেরার মধ্যে গন্তব্য স্থান গোপন রাখা বিশেষ করিয়া প্রয়োজন হয়। চিম্‌নিকে তাহার পিতা বলিলেন, "আমার ত বয়স বেড়ে চলেছে আর যুদ্ধেরও আয়ু বেড়েই চলেছে। তোমার সঙ্গে তুমি ফিরে এলে দেখা হবে কি না তাও জানি না। যাই হোক তুমি যত সাবধানে থাকা যায় থাকবার চেষ্টা করো। যদিও খুব সাবধান হয়ে যুদ্ধ করা যায় না।"

চিম্‌নি বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু যুদ্ধের নিয়মই হচ্ছে সাবধানে লড়া। আগে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে তবে অন্যদের আক্রমণ করতে শিখতে হয়।"

পিতা বলিলেন, "তা তুমি করো, যতটা সম্ভব।"

পিসিমা বলিলেন, "এই বাচ্চা ছেলেটাকে ত এই বুড়ীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে চললে। আমি ভেবেছিলাম একটা বিয়ে-থাওয়ার ব্যবস্থা করে বৌএর হাতে পুষ্যিটিকে দিয়ে ছুটি নেব। তা কি আর হয়। সন্তু চলল যুদ্ধ জয় করতে আর আমি রইলাম ওর পুষ্যি সামলাতে।"

খাঁদু এই সকল আলোচনা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করা উচিত হইবে না বুঝিয়া চিম্‌নির কোলে উঠিয়া বিভিন্ন জান্তব শব্দ উচ্চারণ করিয়া নিজের মত ব্যক্ত করিতে লাগিল।

চিম্‌নি বলিল, "এই, তুই চুপ কর! তোর কথা কেউ বুঝতে পারে না।"

খাঁদু চিৎকার করিয়া জানাইল সেও বয়স্কদিগের কথা বুঝিতে পারে না। সুতরাং কাহারও অভিযোগ করিবার কোন

সাক্ষাৎ কারণ দেখা যাইতেছে না। পিসিমা ও চিম্‌নির পিতা উভয়ে একমত হইয়া বলিলেন চিমনি যাইবার পূর্ব্বে খাঁদুর একটা নামকরণ ও অন্নপ্রাশন করিয়া দিলে ভাল হয়। কেননা খাঁদু নামটা খুব উচ্চমূল্যের নাম নহে। এবং অন্নপ্রাশনটাও করিয়া দেওয়াই উচিত। চিম্‌নির এ সকল বিষয়ে খুব সুপ্রতিষ্ঠিত মতামত কিছু ছিল না। নামটা একটা যা হয় হলেই হয়। কারণ সন্তোষ যদি চিম্‌নিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে তাহা হইলে শুদ্ধ নামের মাহাত্ম্য কোথায় থাকে? সে প্রশ্ন করিল নামটা কি দেওয়া হবে। বাবা বলিলেন, কোন একটা দেবতার নাম দিলে ভাল। পিসিমা ভাবিলেন অতি সুন্দর অথবা মূল্যবান কিছু হইলে আরও ভাল। চিম্‌নির মনে হইল অর্জ্জুন কিংবা মেঘনাদ, কেননা বড় যোদ্ধা ছিলেন তাঁরা। দুই-চারদিন কাটিয়া গেল নাম যাচাই করিয়া। অন্নপ্রাশনের দিন ঠিক হইল। চিম্‌নির বন্ধু-বান্ধব দশ পনের জনকে নিমন্ত্রণ করা হইল। ছেলের মা নেই ত মামাই বা থাকিবে কি করিয়া। সকলে বলিল চিম্‌নি ছেলেটির মামার স্থান গ্রহণ করিলেই ভাল হয়। কেননা ছেলের মা নিজ পিত্রালয়েই নিশ্চয় ছেলেকে রাখিয়া গিয়াছে ধরা উচিত।

চিম্‌নি বলিল, "আমি কেন ওর মামা হতে যাব?"

"তুমি ওর মামা নয়ত কি? কাকা, ভাই, কি দাদামশাই? তুমি ওর হয় বাবা নয় মামা। বাবা যখন নও, তখন মামাই হতে হবে।"

চিম্‌নি মানিয়া লইয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ওর মামাই হব।"

নাম দিবার কথাটা আর ঠেকান সম্ভব হইল না। মা যাহাকে ভুলিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার নাম কি ভোলানাথ দেওয়া যায়? ইন্দ্র, চন্দ্র, বিষ্ণু, কৃষ্ণ ইত্যাদি সবই দেখা হইল। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শরৎ পছন্দ হইল না, মহা মুশ্‌কিল।

পিসিমা বলিলেন, "নাম দিয়ে দাও শিবকুমার"।

পিতা বলিলেন, "আমরা শাক্ত নই। শিবকুমার চলবে না। বরং নাম দিয়ে দাও পান্নালাল কিংবা পঙ্কজকুমার।"

অজয় অরুণ বলিল, "পান্নালাল নামটা খোট্টাই। ও চলবে না। জয়ন্তজয় নামটা ভাল। কিংবা প্রশান্ত।"

চিম্‌নি বলিল, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও নাম। খাঁদু ত খাঁদুই থাক।"

অরুণ চিৎকার করিয়া উঠিল, "ইউরেকা ইউরেকা, মানে এথি হয়েছে। ওত কার ছেলে তা কেউ জানে না। ইয়োরোপে বাবার নাম না-জানা থাকলে বাবার নামের জায়গায় দেশের রাজার নাম লিখে দেয়। কেননা রাজাই দেশের লোকের বাবা। ওর নাম দিয়ে দাও রাজকুমার। আর মহা বীর পুরুষ হবে বলে সিংহ। শ্রীরাজকুমার সিংহ। ভাল নাম। চিম্‌নির ছেলে ত ধোঁয়া! সে রকম ত নাম হয় না।"

সকলে বিষয়টার মীমাংসা হইল বুঝিয়া অন্তত মানিয়া লইল খাঁদুর নাম শ্রীরাজকুমার সিংহ। নামকরণ ও অন্নপ্রাশন সমারোহবর্জ্জিতভাবে অনুষ্ঠিত হইল। চিম্‌নি মাতুলের ভূমিকার অনুষ্ঠানে নামিতে আপত্তি করায় অরুণ বলিল, "আরে শোন, মামা তিন প্রকার হয় জানিস না। যে মামা মানুষ করে সে বাবা-মামা, যে সঙ্গে খেলা করে আর দাদামশায়ের তৃতীয় পক্ষের সন্তান সে হ'ল দাদা-মামা আর সবশেষে হল মামা-মামা, মানে নিছক অতি সাধারণ ঘরোয়া ঢংএর মায়ের ভাই। তুই হ'লি চতুর্থ ও নূতন সংস্করণের মামা। তোর নাম দিলাম নাই মামা, তার মানে কানা মামার চেয়ে খারাপ! মামা নয় অথচ মামা।"

চিমনি বলিল, "উঃ, মাথা ধরে গেল তোর কথায়! দে চায়টা আর পায়েস।" বলিয়া অন্নপ্রাশনের কর্ত্তব্য শেষ করিল। পরদিন খাঁদুর পেট খারাপ হইল।

পিসিমা বলিলেন, "ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।"

চিমনি বলিল, "কোন্ ডাক্তার?"

অজয় বলিল, "আমি একটা ডাক্তার জানি, সে আলো জেলে রং-বেরংএর সব রোগ সারিয়ে দেয়। বলে লুমিনোপ্যাথিক চিকিৎসা। চল্, তার কাছে নিয়ে চল।"

সকলে লুমিনোপ্যাথ ডাক্তার চিদম্বর পাকড়াশির নিকটে চলিল খাঁদুকে লইয়া। লুমিনোপ্যাথ মহাশয় ছেলেকে দেখিয়া বলিলেন, "ইহার পিতা কোন্‌জন।"

অজয়, অরুণ ও চিমনি একসঙ্গে বলিল, "আমরা।"

"সে কি মশায়? আপনারা মানে? তিন জনেই ওর পিতা? কি বলেন!"

"মানে আর কি, ওকে আমরাই পালন করি। ওর মা-বাবা নেই বা থাকলেও কোথায় আছে আমরা জানি না"

"অর্থাৎ ও হ'ল অরফ্যান, মানে পিতৃমাতৃহীন। যাই হোক দুই টাকা দিন।" দুই টাকা দেওয়া হইলে প্রশ্ন হইল, "ও কি নাক চুলকায়?"

অজয় বলিল, "আমি ওর নাক চুলকে দিচ্ছি। ও ত বাচ্চা, নিজে পারবে না।"

"আরে না মশায়, সিম্পটম জানা দরকার। নাক চুলকালে কমলা রংএর আলো, আর না চুলকলে বেগুনে।" বলিয়া ডাক্তার বেগুনে আলো জ্বালিয়া দিলেন ছয়-সাতটা। আলোর আবির্ভাবে খাঁদু বিকট চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ডাক্তার বলিলেন, "নীল!" বলিতেই বেগুনে আলোগুলি নিভিয়া গিয়া নীল আলোতে ঘর ভরিয়া গেল। খাঁদু থতমত খাইয়া চুপ করিল। ডাক্তার অতঃপর লাল আলো জ্বালিয়া দিয়া বলিলেন, "ঠিক হয়ে গেছে। কাল থেকে আর অসুখ থাকবে না।"

অজয়, অরুণ ও চিম্‌নি খাঁদুকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া চলিল। অজয় বলিল, "ব্যাটা গাঁজাখোর! আলো জেলে অসুখ সারায়—ধাপ্পাবাজি!"

অরুণ বলিল, "আতশবাজি, ভেল্‌কিবাজি, খাঁদার ত অসুখ সেরেইছে, চিম্‌নিরও জ্বর ছেড়ে গেছে।"

চিম্‌নি বলিল, "আমার আবার জ্বর হ'ল কোথায়?"

আরে হ'তে ত পারে। এখন আর হবে না। বুঝলি কি না।"

"না, বুঝলাম না। জ্বর না হলে ছাড়ে কেমন করে?"

"কেন হবে না? গরুর গলার বাঁধন না থাকলে গরু কি করে বাঁধন-ছাড়া হয়ে যায়? লক্ষ্মী না থাকলেও লক্ষ্মীছাড়া হয় কি করে? হেঁঃ, তুই ভারি পণ্ডিত!"

চিম্‌নি বলিল, "আচ্ছা ভাই, তুই জিতেছিস।"

সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল খাঁদুর জন্য অনেকগুলি উপহারের পুলিন্দা আসিয়াছে। খুলিয়া দেখা গেল নানা প্রকার পোশাক, খেলনা ও রকমারি মগ, গেলাস, বাটি, চামচ, আয়না চিরুণী, বুরুশ ইত্যাদি। পাঠিয়েছে যত দেশী বিদেশী সৈন্য বন্ধুরা। কেউ লিখেছে, "রাজকুমারের নামকরণের উপহার।" কেউ বা লিখেছে, "চিম্‌নির পরে যে চিম্‌নি-হবে, তার জন্য।" একজন লিখেছে, "আমাদের রক্ষাকবচ রাজকুমার।" চিম্‌নির পিতা ও পিসিমা এই সব মূল্যবান উপহার পাইয়া খুবই খুসী হইলেন। খাঁদু তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পেটের যন্ত্রণা প্রশমিত বলিয়া মনে হইল। লুমিনোপ্যাথির জোরেই হউক কিংবা আত্মবলেই হউক তাহার ঘুম দেখিয়া বোধ হইল যে সে খুবই আরামে নিদ্রা দিতেছে।

ইহার পরের কয়েকটা দিন শীঘ্রই কাটিয়া গেল। বিদায় লওয়া ও নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সময় কাটাইবার প্রকৃষ্ট উপায়। খালি দুনিয়ার লোক আসে, চা লেমনেড খায়। নমস্কার কোলাকুলি করে আর চলিয়া যায়। বুড়ো বুড়ো যাঁরা আসেন তাঁদের প্রণাম করিয়া চিম্‌নির কোমরে ব্যথা হইয়া গেল। কেহ কেহ দুই চারি টাকা দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অজয় ও অরুণও কিছু কিছু এথি প্রাপ্তি হইতেছে দেখিয়া চিম্‌নিকে বলিল, "খুব জোরসে পেন্নাম করবি, বুঝলি? ওতে

খারাপ আর বদ লোকে খুব খুসী হয় আর টংকা দিয়ে ফেলে। আর বয়স বেশী যাদের তারা অনেক পাপ করবার সুবিধে আর সময় পেয়েছে কি না সেই জন্যে বেশ বদলোক বেশীর ভাগই। আর পেন্নাম করলেই এথি বের করে, আশীর্ব্বাদ করে।"

চিম্‌নি বলিল, "না, সবাই খারাপ হবে কেন? ঐ ত কাল গোবরার বাবা এসে আশীর্ব্বাদ করে দুটো টাকা দিল। বললে, 'বেঁচে থেঁকো বেঁচে থেঁকো'। ও কি করে খারাপ হ'ল? চোখে দেখে না, কানে শোনে না, হাঁটতে পারে না, তার ওপরে খোনা।"

"আরে খারাপ লোকের ক্ষমতা থাকে দারুণ রকমের। অন্ধ বোবা কালা খোঁড়া নুলো হলেও বদলোক বদ না হয়ে যায় না। মরে গিয়েও ভূত হয়ে অন্ধকারে লেঙ্গী মারে যাকে পায় তাকে। তুই জানিস না।"

চিম্‌নি বলিল, "তা হতে পারে। আমি কিন্তু ভূত-প্রেত দেখি নি কখনও। তোরা দেখেছিস?"

"হ্যাঁ, দেখেছি বৈ কি। এই ত ছিদামের মা ছাদ থেকে পড়ে মরে গেল আর এখন ছিদামদের বাড়ীর ছাদে আর কেউ উঠতে পারে না। উঠলেই নাকি-সুরে ডেকে বলে 'নাফিয়ে পঁড়, নাফিয়ে পঁড়'। অনেক সময় আবার ধাক্কাও দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করে। ছিদামের মা ছিল মহা দজ্জাল। ছিদামরা সাত ভাই। সকলে দুবার করে বিয়ে করেছে। আর চোদ্দটা বউই মারা গেছে শাশুড়ীর জ্বালায়।"

চিম্‌নি জিজ্ঞাসা করিল, "তারাও মরে ভূত হয়েছে?"

"আরে দূর! ভূত হবে কি করে? পেত্নী হতে পারত কিন্তু লাইসেন্স জোগাড় করবার পয়সাই ছিল না কোনোটার। শাশুড়ী ওদের হাতে একটা পয়সাও দিত না।"

"পেত্নী হতে লাইসেন্স লাগে? কি যে বলিস।"

"আলবাৎ লাগে! খালি বেম্মোদত্যি আর মামদোগুলো বিনা ফি তে ভূত হয়ে থাকে। বামুনগুলো হয় জাত দেখিয়ে আর মামদোগুলো হয় মুসলমানরা ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি বলে।"

"চিম্‌নি হাঁ করিয়া শুনিয়া বলিল, "আমার কিন্তু ভাই তোর কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। তুই বানিয়ে বলছিস না?"

অজয় ও অরুণ সমস্বরে বলিল, "তাও আবার হয় না কি? সব কথা একেবারে পুরো সত্যি কথা। তুই মরলে সব নিজেই দেখতে পাবি।"

ইহার উপর কোন কথা চলে না। চিম্‌নি মানিয়া লইল যে ভূতপেত্নী হইতে হইলে ফি দিয়া লাইসেন্স লইতে হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা কে ফি নেয়? মরা লোকে টাকা দেয়ই বা কি করে?"

"এই ত! সন্দেহ, খালি সন্দেহ, বিশ্বাস করতে জানিস না খালি সন্দেহ। গবর্ণমেণ্ট কি করে টাকা নেয়? গবর্ণমেণ্টের কি হাত আছে? আর গবর্ণমেণ্টকে কেউ দেখেছে কখন? দেখেছে হরে, নরে, শ্যামা, যোদো আরও দু'শ দালাল আর কেরাণীকে। গবর্ণমেণ্ট যেমন নিরাকার আর 'বিশুদ্ধ ও হস্তদ্বারা স্পর্শিত নহে', কেবল তার এজেন্টরা ফি, ট্যাক্স, ঘুষ, দক্ষিণা আর উপরি পাওনার টাকা নেয়; এও সেই রকম, ভূতপেত্নী নিরাকার। তাদের অসংখ্য আফিস দপ্তর আছে, সেইখানে টাকা দেও আর লাইসেন্স বেরিয়ে আসবে 'অমুক শেওড়া তোমাকে এগার বছর, এগার মাস ও এগার দিনের জন্যে দেওয়া হল'।"

"এগার, এগার কেন?"

"ঐ ত! খালি কেন, কেন! এগার মানে হ'ল একাদশ। ভূত, পেত্নীরা একাই দশের সমান। এমনি তাদের ঠেলা। তাই এগার।"

চিম্‌নি অতঃপর চুপ করিল। অরুণ বলিল, "যাদু, কোথাও লুকিয়ে এগার টাকা এগার আনা এগার পাই ক্যাস রেখে দিও, দেখবে দুদিনে ভূতে নিয়ে গেছে। বার টাকা রাখ, দেখবে মানুষে নিয়ে গেছে। এবার বুঝলে।"

অজয় বলিল, "টাকা রাখতে বললে ও কিছুতেই বুঝতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে পকেট চেপে বসে থাকে।"

চিম্‌নি বলিল, "ধ্যাৎ!"

যাবার দিন মহা সোরগোল। তের-চোদ্দটা ছোট ছোট পুঁটুলি। তাতে এই আছে, ঐ আছে, তাই আছে। সৈনিকের তৈজসপত্রে বাড়াবাড়ি হইলে চলে না। সুতরাং জিনিসগুলির পরে কি অবস্থা হইবে সে কথা কেহ ভাবিল না। কড়াপাকের সন্দেশ, আচার, আমসত্ত্ব ও নারিকেলের চিপিটক গ্রহণে বিশেষ উৎসাহ, কারণ বেশীদূর বহন করিয়া চলিতে হইবে না। সুপারি, মশলা ও চা, তাও ব্যবহার্য্য। কিন্তু রেশমের জামা, শিখীপক্ষরচিত বাজনী অথবা শল্লকীকণ্টকের ঝাঁপি লইয়া নববিবাহিতা বধূদিগের শ্বশুরালয় গমন শোভাযুক্ত হয়। সৈন্যের যুদ্ধযাত্রার সরঞ্জাম হিসাবে সেই সকলের বিশেষ কার্য্যকারিতা আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রথমে গৃহত্যাগ করিয়া সকলে সৈন্য-শিবিরে হাজিরা দিবে ও পরে আদেশ নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্থানে গমন করিয়া অজানা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে সামরিক যানবাহনে, তাহা স্থলের কি আকাশের যাহা হইবে, তাহাতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। সকলের সঙ্গে কি লইতে হইবে তাহা একেবারে ধরাবাঁধা এবং যেটুকু লইবার তাহার অধিক যাহা কিছু তাহা লইয়া যাওয়ার কোন উপায় নাই। সুতরাং যাহা খাওয়া যায় তাহা খাইয়া লওয়া হইল ও বাকী সামগ্রী জমা রাখিয়া, অর্থাৎ একপ্রকার বিসর্জ্জন দিয়াই সকলে নিজ নিজ দলে উপস্থিতি লিখাইতে চলিয়া গেল। অজয়, অরুণ ও চিম্‌নি যথাস্থানে পৌছিয়া নাম লিখাইয়া পুনরায় অবসর কাটাইতে চায়ের ক্যান্টিনে গিয়া বসিল। ইহারা প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া নানা প্রকার উপহারলব্ধ খাদ্যবস্তু সম্ভোগে ব্যস্ত ছিল। এখনও অনেক বাকী রহিয়াছে দেখিয়া অপরাপর অপেক্ষাকৃত অল্প সৌভাগ্যবান সৈনিকদিগকে ডাকিয়া খাদ্যের ভাগ দিবার প্রস্তাব করায় শীঘ্রই খাদ্যসম্ভার অদৃশ্য হইয়া গেল।

চিম্‌নি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "যাঃ ফুরিয়ে গেল।"

অরুণ সুর করিয়া বলিতে লাগিল, "এলোই যে কখন, খেলোই যে কে, গেলোই যে কখন আর কোথায়, দেখলোই না কেউ। এমনি করেই আসে যায় সব, এর উপরেই দর্শন আর কাব্য।"

অজয় বলিল, "এই রে, ক্ষেপে গেছে, বেশী খেয়ে আর বদহজমের ঠেলায়। হ্যাঁ বাবা, চার ডজন লাড্ডু খেয়ে ত ফাঁক করে দিলে। এর মধ্যে আমি ত দেখছি যা দর্শনের ছিল, তার অদর্শন। তুমি কি জেগে জেগে স্বপ্ন দর্শন করছ বিগত আকার ভীম নাগস্য কিংবা তস্য ব্রাদার্স প্রজাত কঠিন পক্ব সন্দেশের।"

একজন মুসলমান নায়েক কয়েকটা সন্দেশ খাইয়া আর নাই দেখিয়া গান ধরিল, "হাঁয় মেরা যো থা সো"...ইত্যাদি।

চিম্‌নি বলিল, "আমসত্ত্ব খাবে? আছে।"

সে বলিল, "আরে রাম সত্য রহিম ভি সত্য দে দেও, দে দেও! মরদবাচ্চা যো মিলতা খা লেতা।"

চিম্‌নি তাহাকে আমসত্ত্ব দিয়া বলিল, "রাম রহিম নয়, আম।"

সে বলিল, "সবহিমে রামরহিম। ক্যা বাত, ক্যা বাত! বহুত খুব!"

অতঃপর সারি দিয়া সকলে গাড়ি চড়িবার জন্য প্রস্তুত হইল। পৃষ্ঠে থলি, হস্তে বন্দুক ও পার্শ্বে বিছানার সুগোল লম্বাটে পুঁটুলি। গাড়ির পর গাড়ি বোঝাই হইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে শিবির ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কিছু সৈন্য গেল জাহাজ ঘাটে, কিছু রেল স্টেশন ও হাওয়াই জাহাজের আখড়ায়।

অজয়, অরুণ, চিমনি ও অপরাপর তাহাদিগের দলের সৈন্যগণ গিয়া উপস্থিত হইল শেয়ালদার রেল স্টেশনে। সেখানে তাহারা নিজ নিজ মালপত্র লইয়া পদব্রজে একটা সাইডিংএ গিয়া একটা ট্রেণ দাঁড় করান ছিল তাহাতে আরোহণ করিল। কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ ছাড়িল। কোথায় যাওয়া হইতেছে কেহ বুঝিল না। যথাক্রমে গভীর রাত্রে তাহারা গিয়া পদ্মার একটা জাহাজঘাটে উপস্থিত হইল ও একটা জাহাজে উঠিয়া পদ্মাবক্ষে বহু ঘণ্টা ধরিয়া চলিল। পরদিন তাহারা এক স্থলে জাহাজ হইতে নামিয়া পুনরায় ট্রেণে উঠিল। মধ্যে মধ্যে খাওয়া-দাওয়া চলিতেছিল সামরিক রীতিমত এবং অকাতর ভোজনের পূর্ব্ব অর্জ্জিত গুরুত্ব ক্রমশঃ লোপ পাইয়া এখন উদরাঞ্চলে একটা চিরবর্ত্তমান শূন্যতাবোধ সকলেরই অনুভূতিক্ষেত্রে প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। চিম্‌নি বলিল, "খাওয়া একটা বদ অভ্যেস। যত খাবে ততই যেন খিদে বেড়ে চলে।"

অজয় বলিল, "বিশেষ করে তোমার ঐ ছোট্ট মুখখানার ভিতর দিয়ে যে কত খাবারই পার হয়ে গেল দেখলাম, কিন্তু কখনও শুনলাম না যে পেট ভরেছে।"

চিমনি অনুযোগের সুরে বলিল, "তা পেট না ভরলেও বলতে হবে ভরেছে?"

অরুণ বলিল, "না না, তা কেন বলবে? সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা বলা মহাপাপ। তবে কথা হচ্ছে পেট ভরে না কেন? খাবার কম, না পেটটিই একটু জাহাজী ধরনের?"

চিম্‌নি উত্তর দিল, "আরও দুবার খেতে দিলেই ত আর খিদে পায় না। ২৪ ঘণ্টায় মাত্র দুবার পুরো খাওয়া আর দুবার খালি বিস্কুট-চা কি ঐ রকম কিছু। চারবার ভাল করে খেতে দিলেই হয়; আর বার দুই জল-খাবার।"

অজয় বলিল, "খেতে লাগবে আট ঘন্টা, মুখ-হাত ধুতে দুই ঘণ্টা, স্নান করতে, কাপড় বদলাতে দুই ঘণ্টা, ঘুম দেবে আট ঘণ্টা, গল্প-গুজবে দুই ঘণ্টা—এই গেল বাইশ ঘন্টা। আর কাজ করবে দুই ঘণ্টা। অত খাটুনি সহ্য হবে কি করে?"

চিম্‌নি বলিল, "না না, আট ঘণ্টা দশ ঘণ্টা কাজ করেও ঘুমবার খাবার সময় ঠিক হয়ে যায়।" অপর সকলের মতে স্থির হইল যে চিম্‌নি খাওয়ার গতিবেগে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী।

ক্রমশঃ নদী জলা ও বৃহৎ বৃহৎ সায়র পার হইয়া এমন স্থানে গাড়ি পৌঁছাইল যে মনে হইতে লাগিল বাংলা দেশই নহে। দূরে নীলাভ পর্ব্বতমালা দেখা যাইতে লাগিল। একটা দুইটা বিমানও দেখা যাইল। সকলে জল্পনা করিতে লাগিল কোথায় আসিয়া পড়া গিয়াছে। কেহ বলিল, আসাম। কেহ বলিল, ভুটানের পাহাড়। একজন বলিল, যেখানেই হউক না কেন, সুবিধার জায়গা নহে। বিমানগুলি উড়িতেছে, মানে শত্রুরা অধিক দূরে নাই। এমন সময় ট্রেন থামাইয়া একটি ছোট ষ্টেশনে গাড়ির ছাদগুলির উপরে জালে আটকানো ডালপালা সাজাইয়া ট্রেণটিকে আকাশ হইতে অদৃশ্য করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইল। সকল সেনাগণ ঐ কার্য্যে লাগিয়া গেল ও শীঘ্রই ট্রেণটি পারিপার্শ্বিকের সহিত মিলিয়া গিয়া অপরের দৃষ্টিতে স্বরূপ হারাইয়া ফেলিল। কিছু সৈন্য এক জায়গায় নামিয়া গেল। শুনা গেল, বেস ক্যাম্প। অরুণ, অজয় ও চিমনি বাকী সৈন্যদিগের সহিত আরও প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল চলিয়া অবশেষে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিল।

খুব নিকটেই যুদ্ধ চলিতেছে কেননা হাসপাতালে অনেক নতুন আহত সৈনিক। চিমনিদের গাড়ি পৌঁছাইতেই অনেক যুদ্ধক্লান্ত সৈনিক তাহাতে চড়িয়া বসিল। বলিল, "আমরা দম নিতে যাচ্ছি। ১৫ দিন পরে ফের মিলেঙ্গে। আপনারা ত বেশ হৃষ্টপুষ্ট মানে অনেক দিন ফ্রন্ট ছেড়ে পেছনে আরাম করছিলেন। এখানে খুব জোঁক। সাবধানে থাকবেন।"

"জায়গাটার নাম কি?"

"ওঃ জায়গাটা? এটা হিল ফোরটিন। মানে ১৪ নং পাহাড়।"

"ও নাম নেই, শুধু নম্বর?"

"হ্যাঁ ষ্টেশনটারও নাম নেই। শুধু আমাদের নামও আছে, নম্বরও আছে।"

দূরে মধ্যে মধ্যে কামানের গর্জ্জন শুনা যাইতেছিল। অতি নিকট হইতেও কামান দাগা হইতেছিল ভারতীয় প্রত্যাক্রমণের প্রচেষ্টায়। উর্দ্ধে উড়ন্ত বিমানগুলি প্রায় দৃষ্টির অন্তরালে মেঘের উপরে থাকিয়া শত্রু সেনাদিগের আস্তানা পর্য্যবেক্ষণ বা তাহার উপর বোমা বর্ষণ চেষ্টা করিতেছিল। কখন কখন অপর পক্ষের বিমানের আবির্ভাবে ক্রীড়ানিরত শ্যেন পক্ষীসুলভ ইতঃস্তত অতিদ্রুত তীব্রগতির খেলা দেখা যাইতেছিল। একটা বিমান অতি দূরে বহু উচ্চে ভাসিয়াছিল। যেন তাহার এই সকল মারপ্যাঁচের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এইরূপ দলছাড়া নিরপেক্ষ ভাব। হঠাৎ সেই বিমানটি জ্যামুক্ত তীরের মত উপর হইতে নিচের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল। মনে হইল যেন তাহার উদ্দেশ্য বজ্রগতিতে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ ধূলিকণায় পরিণত হইয়া যাওয়া। গতি বাড়িয়া বাড়িয়া এতই দ্রুত হইল যে সকলে বলিল বিমানটি'র ঐ শেষ হইল। কিন্তু ইহার মধ্যেও সেই বিমান হইতে অনবরত মেসিনগানের গুলী চলিতেছিল ও তাহার পতন-পথে দুই-তিনটি শত্রু-বিমান গুলী লাগিয়া আহত পক্ষীর ন্যায় বেসামালভাবে পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিল। একজন বলিল, ঐ প্লেনটা ঠিক বীরু ঘোষ চালাচ্ছে, ও ঐ রকম করে এ্যাটাক করে। এইবার দেখবে গোঁৎ খেয়ে ফের উঠে যাবে আর উঠবার সময়ও দুটো একটাকে ডাউন করে দেবে।"

"বীরু ঘোষটা-কে?"

"আরে তাও জান না? বীরভদ্র ঘোষ। ফ্লাইট ক্যাপ্টেন নাকি? ও সব উড়ুক্কুগুলোর র‍্যাঙ্ক মনে রাখা আমাদের মত পায়দল পথিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। বীরু ঘোষ প্রায় গোটা ষোল জাপানীকে কাৎ করেছে এখন অবধি।"

এই সময় দেখা গেল ভারতীয় বিমানখানা মাটির খুব কাছে আসিয়া গিয়াছে এবং মনে হইল তাহার পতন ও ধ্বংস অনিবার্য্য। কিন্তু মাটির প্রায় একশত ফুটের মধ্যে আসিয়া বিমানটা মাথা তুলিয়া হাউয়ের মত শূন্যমার্গে মহাতেজে উঠিতে লাগিল। সকলে চিৎকার করিয়া উঠিল, "ব্রাভো, ব্রাভো! জিতা রহো! বহুত আচ্ছা, সাবাস!" পূর্ব্বকার বক্তা আবার বলিল, "এ বীরু ঘোষ ছাড়া কেউ নয়। দেখনা, আরও দু একটাকে উঠবার সময় দেবে ঠাণ্ডা করে।" বিমানটির পথ আটকাইয়া দুইটি শত্রু বিমান তীব্র বেগে অগ্রসর হইল। ভারতীয় বিমানবীর হঠাৎ লুপিং দ্য লুপ করিয়া সেই বিমানগুলির ক্রমান্বয়ে উপরে-নিচে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় গুলী চালাইয়া পুনর্ব্বার উর্দ্ধে উঠিয়া অতি দ্রুতগতিতে ভারতের ঘাঁটির দিকে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। জাপানী বিমানের মধ্যে একটির পেট্রল আধারে আগুন লাগিয়া যাওয়াতে, জাপানী বিমান-চালক ও গানার প্যারাসুটযোগে অবতরণ আরম্ভ করিল। বিমানটি আকাশে ভাসমান অগ্নিকুণ্ডের মত ক্রমশঃ মাটিতে পতিত হইল।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে দূরে দ্রুম দ্রুম শব্দ হইতে আরম্ভ হইল ও শীঘ্রই প্রায় ত্রিশখানা শত্রু বিমান দেখা যাইল। ভারতীয় বিমান-ধ্বংস কামানগুলি দুরুপ-ধুরুপ-দুরুপ-ধং শব্দ করিয়া জাগিয়া উঠিল ও আকাশে তাহাদিগের গোলাগুলীর বিস্ফোরণে বৃহদাকার ধূম্রপুষ্প ফুটিয়া উঠিয়া এই প্রাণঘাতী লীলার ভীষণতাকে একটা সৌন্দর্য্যের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া দিল। ট্রেসারের রং-বেরংএর রেখাগুলি পরস্পরের পথ কাটিয়া একটা অদ্ভুত রেখাচিত্রের সৃষ্টি করিল। ভারতীয় বিমান, আমেরিকান বিমান ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা ঐ নামহীন রেল ষ্টেশনের উপরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শত্রু বিমানগুলি বেশ কিছু বোমা ফেলিয়া ঘুরিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বোমার মধ্যে তাহাদিগের তাড়াহুড়ার জন্য অনেকগুলিই এদিকে-ওদিকে দূরে দূরে পড়িল। কিন্তু তিন-চারটি বোমা যেখানে সৈন্যদের তাঁবুগুলি ছিল সেইখানে পড়িল। ইহাতে, যদিও সকল সৈন্যরাই ছড়াইয়া পড়িয়া মাটিতে শুইয়া গিয়াছিল তাহা হইলেও কয়েকজন হতাহত হইল। সৌভাগ্যক্রমে চিম্‌নি, অজয় ও অরুণ অন্যান্য নিজদলের সৈন্যদিগের সহিত ষ্টেশনের পিছনে

একটা বাগানে লুকাইয়াছিল ও সেদিকে বোমা পড়ে নাই। কিন্তু কয়েকজন হতাহত হইয়াছে শুনিয়া সকলের মনেই বেশ ক্রোধের সঞ্চার হইল।

অজয় বলিল, "ব্যাটাদের উপর আক্রমণ করে আজ রাত্রেই সবগুলোকে সাবাড় করে দিলে ঠিক হয়। লড়বার ইচ্ছে নেই, বোমা ফেলে পলায়ন! ছিঁচকে বদমাইসি।"

চিম্‌নি বলিল, "ওরা কোথায় আছে তা ত আমরা জানি না। আক্রমণ করবি কি করে?"

"আরে, মিলিটারি গোয়েন্দারা সব জানে নাড়ী-নক্ষত্র তন্ন তন্ন করে।" এ পক্ষের বিমানগুলি তাড়া করিয়া কিছুদূর ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিল। অ্যাক অ্যাকের আওয়াজ আর দুই চারিটি আকাশে ফুটে-ওঠা ধোঁয়ার ফুল মাত্র দেখা গেল।

সেই দিন রাত্রে এই সকল নব আগত সৈন্যগণ শত্রুদিগের নিকটতম সম্মুখ এলাকায় গিয়া ঘাঁটি দখল করিয়া বসিল। এইখানে সকলেরই গর্ত্তের মধ্যে নয়ত সুড়ঙ্গের ভিতরে থাকিতে হয়। প্রায় দুই তিনশত গজ দূরে শত্রুপক্ষেরও সারি সারি মেসিনগান ও মর্টার রক্ষিত মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তৈয়ারী পরিখা মালা। কোথাও কোথাও কংক্রীট নির্ম্মিত তোপের আস্তানা। সৈন্যদিগকে পালা করিয়া ঘুমাইতে দেওয়া হইল। ভোর যখন হয় নাই, আকাশে ধূসর রংএর আভাসও দেখা দেয় নাই, তখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল সৈন্যকে তাহাদিগের অতঃপর কি কর্ত্তব্য তাহা বুঝাইয়া সুবেদার, জমাদারগণ চলিয়া গেলেন। হঠাৎ দিকবিদিক প্রলয়ের তাণ্ডবধ্বনিতে কম্পিত হইয়া উঠিল। শত্রুদিগের আস্তানাগুলির উপর পশ্চাৎ হইতে ভারতীয় কামানের গোলাবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল, প্রায় এক মাইল জায়গা জুড়িয়া ক্ষণে ক্ষণে বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশটি করিয়া গোলা আসিয়া পড়িয়া বিস্ফোরিত হইতে লাগিল। মিনিটে একবার, তারপরে দুইবার, তারপরে অনর্গল। সৈন্যগণকে বলা হইয়াছিল, গোলাবৃষ্টি থামিবামাত্র তাহারা সঙ্গীন চড়াইয়া অগ্রসর হইবে ও শত্রুর আস্তানাগুলি দখল করিবে। এক এক দল সৈন্যের সহিত দুইদিকে মেসিনগান থাকিবে। পঞ্চাশ গজের নিকটে পৌঁছিলে গ্রেনেড ফেলিয়া শত্রুদিগকে পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়া তৎপরে দখল-কার্য্য শেষ করা হইবে। দশ মিনিট কাল গোলাবর্ষণ হইবার পর হঠাৎ একটা স্তব্ধতার আবির্ভাব হইল। সঙ্গে সঙ্গে, "বন্দেমাতরম, ওয়া গুরুজিকি ফতে, আল্লা হো-আকবর ও গুর্খা, গুর্খা" ধ্বনিতে চরাচর কম্পিত করিয়া ভারতীয় সৈন্যদল নিজেদের বিবর হইতে নির্গত হইয়া ক্রোধোন্মত্ত সিংহের ন্যায় শত্রুর উপর আক্রমণে অগ্রসর হইল। অপরদিক হইতে অমনি ভারতীয় আস্তানাগুলির উপর গোলা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই প্রকার হইবে জানিয়াই সেনাপতিগণ ঠিক সময় বুঝিয়া আস্তানা ত্যাগ করিয়া সৈন্যগণকে অগ্রে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ভারতীয় বাহিনীর উপর যে সকল শত্রুসেনা অক্ষত ছিল তাহারা গুলী চালাইতে আরম্ভ করিল। ভারতীয় সৈন্যগণ তখনও প্রায় শত্রুদিগের আস্তানা হইতে দেড়শত গজ দূরে। দলপতিদিগের আদেশে প্রতি দশ-পনের গজ ব্যবধানস্থিত এক একজন সৈনিক দ্রুতগতিতে দৌড়াইয়া অগ্রসর হইয়া প্রায় পঞ্চাশ গজ আগে যাইয়া ধূম্র বোমা ছুঁড়িয়া শত্রুদিগের গুলী চালানতে অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া দিল। এই ধূম্র যবনিকার অন্তরালে ভারতীয় সৈন্যগণ আরও অগ্রসর হইয়া যখন শত্রুপক্ষের পঞ্চাশ-ষাট গজ মাত্র দূরে তখন পুনর্ব্বার গ্রেনেড নিক্ষেপ আরম্ভ হইল। এইবারে শত্রুর আস্তানার ভিতরে বোমা ফাটিয়া শত্রুকে গর্ত্ত ছাড়িয়া পলায়নে বাধ্য করা হইতে লাগিল। ভারতীয় সৈন্যগণ লাফ দিয়া সেই সকল গর্ত্তে নামিয়া সঙ্গীন দিয়া শত্রু নিপাত আরম্ভ করিল। পিস্তল, ছোরা, সঙ্গীন ও গদারূপে ব্যবহৃত বন্দুকের আঘাতে বহু শত্রুসেনা ইহলীলা সম্বরণ করিল এবং আরও অধিক সংখ্যক হইল আহত ও বন্দী। অজয়, অরুণ ও চিম্‌নি এখন অবধি উত্তম রূপেই যুদ্ধকার্য্য চালাইতেছিল। চিম্‌নি গ্রেনেড ছুঁড়িতে বিশেষ তৎপর বলিয়া সে ক্রমাগত সেই কার্য্যই করিতেছিল। এখন পরিখার মাটির প্রাকার উল্লম্ফনে অতিক্রম করিয়া তিন বন্ধু শত্রু দমন করিতে লাগিল। চিম্‌নির আকার দেখিয়া দুইজন আত্মসমর্পণ করিল ও একজন সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে দেখা

গেল। পরিখার একটা শাখা সুড়ঙ্গ হইতে একটা বন্দুকের নল বাহির হইতেছে দেখিয়া অজয় পাশ হইতে এক পদাঘাতে নলটা সরাইয়া দিল। বন্দুকটা সশব্দে আওয়াজ করিয়া গুলীটা উল্টা দিকের দেওয়ালে বিদ্ধ হইল। যে বন্দুকটা ধরিয়া ছিল সে হঠাৎ সেটা ছাড়িয়া দিয়া এক লম্ফে বাহিরে আসিয়া অজয়কে একটা ছোরা দিয়া আঘাত করিতে উদ্যত হইল। চিম্‌নি তাহা দেখিয়া সটান শুইয়া পড়িয়া লোকটার পা ধরিয়া এক টান মারিল। সে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইতে অজয় তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহার হাত মুচড়াইয়া ছোরাটা কাড়িয়া লইল। চিম্‌নি উঠিয়া দেখিল পরিখার অপরদিকে প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে একজন মরার মত পড়িয়াছিল। সে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা গ্রেনেড ছুঁড়িবার চেষ্টা করিতেছে। সে ব্যক্তি গ্রেনেড ছুঁড়িয়া মারিলে ভারতীয় বহু সৈন্য হতাহত হইবে নিশ্চয়ই জানিয়া চিম্‌নি নিজের বন্দুকের নলের দিক ধরিয়া বন্দুকটা গদার মত ঘুরাইয়া নিক্ষেপ করিল। গ্রেনেড হস্তে লোকটা প্রায় তাহা ছুঁড়িয়াছে এমন সময় চিম্‌নির বন্দুকটা তাহার বুকে গিয়া লাগিল। সে বজ্রাহতের মতই ভূপতিত হইল ও গ্রেনেডটা সেইখানেই বিস্ফোরিত হইয়া তাহার জীবন তৎক্ষণাৎ শেষ হইল। পিছন হইতে একজন সুবেদার চিম্‌নির পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "বহুত আচ্ছা কিয়া, সাবাস!" চিমনি হাসিয়া বলিল, "হামলোগকো মারতা থা ত হাম মার দিয়া। বন্দুক ত চলা গিয়া।" "কই পরোয়া নাহি। আউর বন্দুক হায়।"

অতঃপর শত্রু পরিখা দখল করিয়া তাহার মাটির প্রাকার উল্টা দিকে গঠন করা হইতে লাগিল। ভারতীয় বিমান এখন প্রভাতের অল্প আলোকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল শত্রুদিগের কামানগুলি কোথায় আছে। এবং কখন কখন বোমা ফেলিয়া কামানগুলিকে নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দূর হইতে দুই-একটা কামান দাগিয়া শত্রুপক্ষ ভারতীয় আক্রমণ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ভারতীয় গোলন্দাজগণ নিজেদের কামানগুলি আরও আগাইয়া আনিয়া তাহাদিগের উপর প্রত্যাক্রমণ চালাইয়া নিজেদের সামরিক পরিস্থিতি সুরক্ষিত করিয়া লইতে লাগিল। এইভাবে কয়েক ঘন্টাকাল অতিবাহিত হইলে পর শত্রু-সৈন্যদিগের দূরের আস্তানা হইতে দলে দলে সৈন্য আসিয়া দল বাড়াইতে লাগিল। ভারতীয় সৈন্য সংখ্যাও বাড়িয়া চলিল। তারপর বিমান আক্রমণ ও গোলাবর্ষণ অদল-বদল করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখ ভাগে সর্ব্বত্র চালিত হইল। মধ্যে মধ্যে পদাতিক সৈন্যের আক্রমণ। ভারতীয় সৈন্যগণ কিছুতেই নিজেদের নব-অধিকৃত পরিখামালা ছাড়িয়া হটিল না। বরং আরও অগ্রে গিয়া পরিখা খনন করিয়া যুদ্ধকেন্দ্র ক্রমশঃ শত্রুর এলাকার দিকে ঠেলিয়া দিতে লাগিল। চিম্‌নি, ইতিমধ্যে হামা দিয়া বাহিরে গিয়া নিজের হারান বন্দুকটি উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিল। আহতগণকে ক্রমশঃ পশ্চাতের হাসপাতালে পাঠান হইল এবং হত যাহারা তাহাদিগের সৎকারের ব্যবস্থা করিবার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত লোকেরা লাগিয়া গেল। সন্ধ্যা অবধি সঙ্গে আনা রসদে চালাইয়া এখন রান্নাকরা খাদ্যের আবির্ভাব হইল।

অজয় বলিল, "শুখনো মুখে শুখনো ছোলা জল দিয়ে গিলে গিলে মনে হচ্ছে পণ্ডিত মশায়ের শাস্তির প্রেসক্রপশন।"

অরুণ বলিল, "সেটা কি রকম?"

অজয় বলিল, "তাও জানিস না? দুপুর রোদে ছাদের গরম সিমেন্টের উপর একপায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দু'হাতে দু'খানা থান ইট ধরিয়ে দিয়ে মুখে শুখনো ছাতু ঠুসে দিতে হবে এক মুঠো। তার পর মাথার উপরে একটা সুপুরি রেখে তার উপরে খড়ম দিয়ে ঠুকতে হবে। মানে আর কি যুদ্ধ-শিক্ষার প্রথম পাঠ।"

এক এক মগ সুরুয়া আর একটা করে পাঁউরুটি এই সময় হস্তে পড়িল এবং সেই আনন্দে সকলে শুষ্ক ছাতুর কিংবা ছোলার কথা ভুলিয়া যাইল। ইহার পরে মাংস আলু পেঁয়াজ ও শাক একত্র রন্ধন করা ও বড় বড় হাত-রুটি। শেষে

অর্দ্ধেক টিনের দুধ ও অর্দ্ধেক চা প্রচুর চিনি দিয়া। চিম্‌নিকে প্রত্যেকটি দু'বার দেওয়া হইল এবং চিম্‌নি তাহা অনায়াসে খাইয়া সুখের নিঃশ্বাস ফেলিয়া একমুঠো শুখনো খেজুর জোরাল দন্তের সাহায্যে চর্ব্বণ করিতে লাগিল।

অজয় বলিল, "আমরা কলেজে শিখেছিলাম পারপিচুয়াল মোশন বা চিরস্থায়ী গতি বলে কিছু নেই। কিন্তু সে সময় বৈজ্ঞানিকরা চিম্‌নির চোয়ালের গতি সম্বন্ধে কিছু জানতেন না।"

চিম্‌নি বলিল, "চোয়ালের আবার গতি কি? ও ত খালি নড়ে-চড়ে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, নড়ে-চড়ে বলে নড়ে-চড়ে! সে কি নড়া, আর সে কি চড়া! এক একবার নড়ে অমনি এক পোয়া নেমে যায়; এক একবার চড়ে অমনি আর এক পোয়া নেমে যায়। আমরা এই দেখতে দেখতে নিজেদের আর মানুষ বলেই মনে করতে পারি না। ও হ'ল অতি-মানব, মহাপুরুষ, আধ মুণে সন্তোষ, কলির কুম্ভকর্ণ।"

চিম্‌নি খেজুরগুলি শেষ করিয়া এক মুঠো চীনা বাদাম তুলিয়া লইয়া বলিল, "ধ্যেৎ!"

ভারতীয় সেনাবাহিনী অগ্রগামী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত একের পর একটি পাহাড় দখল করিয়া চলিতে লাগিল। এই স্থলে যুদ্ধক্ষেত্র প্রায় দৈর্ঘ্যে দুই শত মাইল ব্যাপিয়া ছড়ান ছিল। টেলিফোনের তার লাগাইয়া কিছু দূরে দূরে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া অগ্রসর হওয়া চলিতে লাগিল। পশ্চাতে কোনও শত্রু না লুক্কায়িত থাকিয়া যায় তাহা তল্লাস করিয়া দেখিয়া লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে কিছু সময় কাটিয়া যাইত; কিন্তু তাহা হইলেও সেই বিরাট বাহিনী প্রত্যেক দিন পাঁচ-দশ মাইল অগ্রসর হইতে পারিত। দশ পনের দিন পরে তাহারা এরূপ স্থলে আসিয়া পড়িল যে সেখানে চতুর্দ্দিকে পাহাড় ও ঘন জঙ্গল। মাঝে মাঝে বৃক্ষশাখায় লুক্কায়িত শত্রু সৈন্যগণ হঠাৎ হঠাৎ গুলী চালাইয়া ভারতীয় সৈন্যদিগকে মারিবার চেষ্টা করিত। এই কারণে শতাধিক সৈন্য হতাহত হইল। বৃক্ষশাখার অন্তরালে লুক্কায়িত শত্রুর সন্ধান করিয়া অগ্রসর হওয়া আরও গতিমান্দ্যের সৃষ্টি করিল। একষট্টি সংখ্যক পাহাড়টা শত্রুরা বিশেষভাবে সুরক্ষিত করিয়া ঘাঁটি বাঁধিয়াছিল। পাহাড়টা একটা অতিকায় হস্তীর মত। পৃষ্ঠদেশ সমতল ও বহু মেসিনগান ও তোপের সমাবেশে সম্মুখ আক্রমণে দখল করিয়া লওয়া প্রায় অসম্ভব। ভারতীয় বাহিনী যখন একষট্টির পাহাড়ে গোলাবর্ষণ সুরু করিল তখন দেখা যাইল যে তাহাতে শত্রুর একটাও তোপ বন্ধ হইল না। বিমান হইতে দেখিলে মনে হয় কোথাও কিছু নাই। কিন্তু সৈন্যরা আক্রমণ করিতে যাইলে উপর হইতে বৃষ্টিধারার ন্যায় মেসিনগানের গুলী চলে, আবার তাক করিয়া ভারতীয় কামানের আস্তানার উপর গোলাও চালায় পাহাড়ের উপর হইতে। ব্যাপারটা কি ঠিক বোধগম্য হয় না এবং অগ্রগমন তিন-চারদিন একেবারে স্থগিত। একদিন গভীর রাত্রে বিভিন্ন দলের সৈন্যদিগের নিকট জানিতে চাওয়া হইল যে পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া অপর প্রান্তে গিয়া দেখা যায় কি না শত্রুদিগের বিলিব্যবস্থা কি প্রকার। বিপদজনক কাজ বলিয়া বলা হইল স্বেচ্ছায় যাহারা যাইতে প্রস্তুত আছে শুধু তাহাদিগকেই এই কার্য্যের ভার দেওয়া হইবে। অজয়, অরুণ ও চিম্‌নি অবিলম্বে বলিল তাহারা যাইতে প্রস্তুত। অতঃপর কিভাবে যাইবে, কি উপায়ে শত্রুদিগকে নিঃশব্দে মারিয়া বা অজ্ঞান করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইবে ইত্যাদি শিক্ষা হইল। কোনও বন্দুক, বোমা, মেসিনগান ব্যবহার করা হইবে না। দশ-বারটি দলে ভাগ হইয়া এই মৃত্যুকে অগ্রাহ্যকারী প্রায় দেড়শত সৈন্য রাত্রি ১২টার পরে যাত্রা আরম্ভ করিল। চিম্‌নি ও তাহার বন্ধুগণ পাহাড়ের উত্তরদিক ধরিয়া পাহাড় পর্য্যবেষ্টন করিয়া চলিল। প্রায় সিকি মাইল যাইবার পরেই মনে হইল সম্মুখে কে নড়িয়া উঠিল। সকলে একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া মাটিতে শুইয়া রহিল। চিম্‌নি একটা ত্রিশ ফুট দড়ির একদিকে একটা ক্ষুদ্র লৌহগোলক বাঁধা অস্ত্র লইয়া সরীসৃপের ন্যায় ধীরগতিতে সেই দিকে চলিল। যাহা নড়িতেছিল তাহা হইতে প্রায় কুড়ি ফুট দূরে শুইয়া দেখিল একজন শত্রুসৈন্য পাহারা দিতেছে। সে যখন অগ্রপশ্চাৎ গতিতে ভ্রমণ করিতে করিতে চিম্‌নির দিকে পশ্চাৎ ফিরাইল চিমনি উঠিয়া সেই রজ্জুনিবদ্ধ লৌহগোলক সজোরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে আঘাত করিল। সে ব্যক্তি কোন আওয়াজ না করিয়া পড়িয়া গেল। চিম্‌নি দড়ি টানিয়া লৌহ গোলকটি পুনরায় নিজ হস্তে ফিরাইয়া নিয়া ঐ

ব্যক্তির নিকটে গিয়া তাহাকে উত্তমরূপে বাঁধিয়া ফেলিল ও মুখের ভিতর একটি বস্ত্রখণ্ড ঢুকাইয়া তাহাকে জ্ঞান হইলেও শব্দ করিতে অক্ষম করিয়া দিল। ইহার পরে ক্রমশঃ তাহারা আরও তিন-চারিজন শত্রুকে নানান কৌশলে কাবু করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া একষট্টি সংখ্যক পাহাড়ের অপর পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিল শত্রুপক্ষ বৃক্ষশাখা আচ্ছাদিত এমন সকল পথ নির্ম্মাণ করিয়াছে যে সেগুলি উপর হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই পথেই শত্রু-সৈন্যেরা অনায়াসে গুপ্তভাবে চলাফেরা করিতে পারে এবং চেন ও ক্যাপষ্টান সহযোগে কামানগুলিকে পর্ব্বত-শিখরে তুলিয়া ছোঁড়া হইয়া যাইলে পুনরায় নিজেদের দিকে নামাইয়া পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটিয়া লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করে। মেসিনগানও ঐ ভাবে পর্ব্বতশিখরের অপরদিকে লুক্কায়িত রাখা হয়।

চিম্‌নির দল বিভিন্নস্থলে চার-পাঁচ ঘণ্টা পরে বিস্ফোরিত হইবে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফাটিবার যন্ত্র-সংযুক্ত বোমা রাখিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে নিজস্থানে ফিরিয়া গেল। যাইবার সময় হাত-পা-বাঁধা বন্দীগুলিকে টানিয়া টানিয়া লইয়া গেল। যখন তাহারা সকলে ফিরিয়া আসিল তখনও ভোর হয় নাই। অতঃপর সকল সৈন্যগণ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ভোর হইতেই শত্রুদিগের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতে লাগিল। সম্ভবত অনেক সান্ত্রী গায়েব দেখিয়া তাহারা কিছু একটা সন্দেহ করিয়া তাহার বিরুদ্ধ-ব্যবস্থা করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে বিকট শব্দে বোমা ফাটা আরম্ভ হইল। শত্রুগণ স্বভাবতই মনে করিল সেইদিক হইতে কোন আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং পর্ব্বতশিখর হইতে কামান মেসিনগান প্রভৃতি ঘুরাইয়া অপর পার্শ্বে গোলাগুলী চালান আরম্ভ হইল এবং এইরূপ কার্য্য আরম্ভ হইতেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনী নিজ আস্তানা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল। পাহাড়ের অপর পার্শ্বে তখন মধ্যে মধ্যে বোমা ফাটিবার আওয়াজ হইতেছে এবং শত্রুসৈন্যেরা সেই সকল বিস্ফোরণ স্থানের উপর অনর্গল গুলী বর্ষণ করিয়া চলিতেছিল। এইদিকে ভারতীয় সৈন্যগণ ক্রমশঃ গা ঢাকা দিয়া নিঃশব্দে প্রায় পর্ব্বতচূড়ায় গিয়া পৌছিয়াছে। তখনও শত্রুপক্ষের কেহ বিশেষ এইদিকে দৃষ্টি দিতেছিল না। এবং ভারতীয় সৈন্যগণও কোনপ্রকার শত্রুসংঘাতে জড়িত না হইয়াই পর্ব্বত আরোহণে সক্ষম হইয়াছিল। পর্ব্বতশিখরে স্বাভাবিক বৃক্ষলতার আবরণ ততটা না থাকাতে শেষ অবধি ভারতীয় সৈন্যগণ উন্মুক্তস্থানে আসিয়া পড়িল। তখন তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া শত্রুপক্ষ তাহাদিগের উপর গুলী চালাইতে আরম্ভ করিল। তাহারাও শত্রুদিগের উপর একাধারে বহু শত বোমা ছুঁড়িয়া সমগ্র পর্ব্বতটিকে প্রলয়ের অগ্নিতে স্নান করাইয়া দিল। এবং অচিরাৎ পর্ব্বতশিখর দখল করিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। কামান উঠাইবার-নামাইবার একটা পথ চিমনিরা যে স্থলে ছিল সেইখানেই ছিল। কামানটি পাহাড়ের গাত্রে কিছু নিচে একটা ধাপ কাটিয়া বসান ছিল। এখন শত্রুগণ সেইটিকে ঘুরাইয়া ঊর্দ্ধমুখে তাক করিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল। ভারতীয়েরা সেইখানে দুইটি মেসিনগান থাকায় নিচে নামিয়া কামানটি নিজেদের হাতে আনিবার সুবিধা পাইতেছিল না। চিম্‌নি এই সময় অজয় ও অরুণকে লইয়া একটা বিরাট প্রস্তরখণ্ড গাছের ডালের চাড় দিয়া ধীরে ধীরে ওই স্থলে সরাইয়া আনিতে লাগিল।

সুবেদার বলিলেন, "ক্যা হো রহা ?"

চিম্‌নি বলিল, "ইসকো উ লোগকো উপর ঠেল দেগা।"

সুবেদার তাহাতে সায় দিলেন ও আরও পাঁচ সাতজন সৈন্যকে উহাদিগের সহিত ঐ কার্য্যে লাগাইয়া দিলেন। বিরাট প্রস্তরখণ্ডটি ক্রমশঃ যথাস্থানে আসিয়া গেল এবং এই সময়ে নিচের কামানটিও চালাইবার লক্ষণ দেখা গেল। ভারতীয় সৈন্যগণ এখন একটি দীর্ঘ বৃক্ষকাণ্ড কাটিয়া আনিয়া প্রস্তরখণ্ডটির গায়ে লাগাইয়া সকলে একত্রে ঠেলিতে সুরু করিল। প্রস্তরখণ্ডটি গড়াইতে আরম্ভ করিল এবং দ্রুত হইতে দ্রুততর গতিতে কয়েক গজ চলিয়া ঢালুর পথে আসিয়া গড়াইয়া নামিতে লাগিল। সেই বিরাট প্রস্তর-গোলক উপর হইতে গড়াইয়া আসিতে দেখিয়া সকল শত্রুসৈন্য কামান

ও মেসিনগান ছাড়িয়া দুই পার্শ্বের জঙ্গলে পলায়ন করিল। প্রস্তরটি কামানের উপরে গিয়া পড়িয়া কামান সমেত সমতল ধাপটি অতিক্রম করিয়া গড়াইয়া একেবারে নিচে চলিয়া গেল। ভারতীয় সৈন্যগণও এই সময় আক্রমণ করিয়া পর্ব্বতের পাদদেশ অবধি দখল করিয়া লইল। অতঃপর শত্রুপক্ষ এই অঞ্চলে ক্রমাগত হটিয়া যাইতে লাগিল এবং ভারতীয়েরা সর্ব্বত্র মাটির নিচে লুকান মাইন বা বিস্ফোরক দিয়া সাঁজোয়া গাড়ি, কামান ইত্যাদি উড়াইয়া দিবার বৃহৎ বৃহৎ বোমা দেখিয়া, খুঁজিয়া নিরাপদ ও বেকার করিয়া দিয়া শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। ফলে তাহাদিগের গতি কমিয়া গিয়া শেষ অবধি তাহারা শত্রু আর দেখিতেই পাইত না। বিমানগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া খোঁজ লইয়া জানাইত শত্রুগণ প্রায় সর্ব্ব-সময়েই ভারতীয় সেনাদল হইতে বহু দূরে থাকিত। যুদ্ধ এই অঞ্চলে এক প্রকার শেষ হইয়া আসিল বলিলেই চলে। শুধু ক্রমাগত জঙ্গলের ভিতর দিয়া অগুয়ান হওয়া।

চিম্‌নি বাড়ীতে পিতাকে পত্রে লিখিল, "বহুদিন কোন শত্রুর দেখা পাই নাই। শত্রুর মধ্যে জোঁক, বিছে, সাপ আর খাবারের অভাব। দিনে আমরা কুড়ি মাইল এগিয়ে যাই, কিন্তু খাওয়ার ব্যবস্থা মাত্র দুইবার। জলখাবারটা নামমাত্র।"

পিসিমা পত্রখানি পাঠ করিয়া ভ্রাতাকে বলিলেন, "আহা, বাছার আমার কি কষ্ট!"

ভ্রাতা নির্দ্দয় সহানুভূতিহীনভাবে বলিলেন, "সন্তোষের খিদে আমরাও কোনদিন মেটাতে পারি নি; এখন দেখ, গভর্ণমেণ্টও ফেল। পারছে না ওর পেট ভরাতে।"

পিসিমা বলিলেন, "বয়সের ছেলে, খাবে না? তার উপর কত বড় শরীরখানা ওর! পালোয়ানের মত। শুনেছি পালোয়ানরা চুমুক দিয়ে এক সের গাওয়া ঘি খেয়ে নেয়। তা ছাড়া দুসের বাদাম এক সের কিসমিস আর আধ সের পেস্তা। এক এক বার পাঁচ সের মাংস আর আড়াই সের দুধ খায়।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ' শুনেছি আশানন্দ ঢেঁকি একটা পুরো পাঁঠার ঝোল খেয়ে ফেলত, দেড়শখানা লুচি দিয়ে। আর খেত একশটা সন্দেশ। তাই বলে সন্তোষকে তাই খেতে হবে?"

পিসিমা বলিলেন, "তা দিলে ও খেতে পারত।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়, কিন্তু দেবার কোন দরকার নেই। ও না খেয়েই বেশ চলেফিরে বেড়াচ্ছে। বেশী খেলে বেকার হয়ে যাবে।"

॥ ১১ ॥

হঠাৎ একদিন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। আমাদের সৈন্যদল তখন একটা বিদেশী বন্দরে জাহাজের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কেহ বলিল ছমাস লাগিবে জাহাজ আসিতে, কেহ বলিল এক বৎসর। প্রায় রোজই জাহাজ আসিত, কিন্তু তাহাতে চড়িয়া ফিরিয়া যাইত আমেরিকান ও বৃটিশ সৈন্যগণ। সেগুলি না কি তাহাদিগের জাহাজ। ভারতীয় সৈন্যদিগের জাহাজ না কি তখনও জোগাড় হইয়া উঠে নাই।

অজয় বলিল, "সবই ঘুষের ব্যাপার। আমাদের নিজেদের জাহাজ নেই, আর অত টাকাও নেই যে ঘুষ দিয়ে জাহাজ জোগাড় করে নেব।"

চিম্‌নি বলিল, "আচ্ছা, আমরা ত এসেছি এখানে পায়ে হেঁটে। অনেকদিন লেগেছে, কিন্তু বসে না থেকে হেঁটে ফিরে যাওয়া ত যেতে পারে।"

অরুণ বলিল, "ওহে খোকন, এখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। সব কণ্ট্রাক্টর দিয়ে কাজ। খাবার কণ্ট্রাক্ট, থাকবার কণ্ট্রাক্ট, নিয়ে যাবার কণ্ট্রাক্ট; এমন কি মরে গেলেও পোড়ান কি কবর দেবার কণ্ট্রাক্ট। বুঝেছ? তোমার মত

খোকাদের ইচ্ছেয় কাজ হবেনা। সবেতেই সব মহারথীদের শেয়ার আছে। হেঁটে ফিরে যাওয়া-টাওয়া ভুলে যাও। খাও-দাও ঘুমোও, আর কন্ট্রাক্টরদের পয়সা লুঠতে দাও। যথাসময়ে যথাস্থানে পৌছে দেবে।"

মাসখানেক পরে একটা ছোট জাহাজ আসিল এবং চিম্‌নিদের দল তাহাতে উঠিয়া ভারত অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিল। কিন্তু দশ পনের দিন সমুদ্রে দোল খাইয়া তাহারা যে-স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহা কোথায় কিছু বোঝা যাইল না। কেহ বলিল মাদ্রাজ, কেহ বলিল করাচি; কিন্তু শেষ অবধি দেখা যাইল তাহারা কোচিন বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জাহাজ হইতে নামিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার শিবির স্থাপন করিয়া নিজেদের বাসের ব্যবস্থা করিতে হইল। কারণ যথেষ্ট ট্রেণের ব্যবস্থা নাই। এবং পূর্ব্ব হইতে এখানে দশ-বারো হাজার সৈন্য আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। দিনে একখানা ট্রেণ লাগিলে তাহাতে কিছু কিছু করিয়া সৈন্যগণ মাদ্রাজ, সেকেন্দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে চলিয়া যাইত। অরুণের মতে ইহাতেও কন্ট্রাক্টরদিগের কারসাজি দেখা যাইত।

অবশেষে, প্রায় জাহাজ হইতে নামিবার আট দশ দিবস গত হইলে তাহাদিগের ট্রেণ আসিয়া লাগিল। তাহারা ট্রেণে উঠিয়া চলিল এবং সাত-আট দিবস নানা স্থানে সাইডিংএ বসিয়া থাকিয়া শেষে হাওড়া স্টেশনে পৌছিল। হাওড়াতে আসিয়া যে কয় ঘণ্টা লাগিল কলিকাতার সৈন্য-শিবিরে পৌছাইতে তাহার জন্যও অজয় ও অরুণ কন্ট্রাক্টর-দিগকে গালি দিয়া মন হাল্কা করিতে লাগিল।

চিম্‌নি বলিল, "তোরা সবেতেই কন্ট্রাক্টর দেখিস। আমরা ত যাচ্ছি মিলিটারি ট্রাকে চড়ে। এতে কন্ট্রাক্টর কোথায়?"

"সে তুই জানিস না। দেখবি এখন, সব তেল চুরি করে গাড়িগুলোকে অচল করে রেখেছিল। নয়ত আসতে দেরি হ'ল কেন?"

"তেল কি করে চুরি করবে? গাড়িগুলো ত আমাদের নিজেদের লোকেরা চালাচ্ছে।"

"আরে, ওরা চার্জ্জ নিয়েছে তেল চুরি হয়ে যাবার পরে। তুই কি বুঝিস? কন্ট্রাক্টর থাকলে গাড়ির টায়ার, ব্যাটারী, হুড, সব কিছু চুরি হয়ে যায়।"

চিম্‌নি বলিল, "তা হ'লে গাড়িগুলোই বা চুরি করে নেয় না কেন?"

"আরে তা হ'লে ত চুরি ঐ একবারেই শেষ হয়ে যাবে। ঘোড়া চুরি করে যা লাভ, ঘোড়ার দানা চুরি করতে থাকলে দু' তিন বছরে দুটো ঘোড়ার দাম উঠে যায়। এই যেমন ধর, তোর আর নিজের কতই বা দাম হবে? ধরা যাক দু হাজার টাকা। অতও কেউ দেবে না তোর জন্যে; কিন্তু তর্কের খাতিরে ধরা যাক দু হাজার। কিন্তু তুই দিনে পনর টাকার খাবার খাস্। তার থেকে যদি কন্ট্রাক্টরগুলো রোজ পাঁচ টাকা প্রমাণ রসদ সরিয়ে ফেলতে পারে তাহলেই ত বছরে তারা ১৮২৫৲ পেয়ে যাবে। দু বছরে ৩৬৫০৲—প্রায় এক জোড়া চিম্‌নির দাম!"

চিম্‌নি বলিল, "ধ্যেৎ! আমায় আবার কে কিনবে? মানুষ যেন বিক্রি হয়?"

ছাউনিতে আসিয়া তাহাদিগকে জ্ঞাত করা হইল যে তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের কলিকাতায় বাসস্থান আছে তাহারা প্রত্যহ একবার রিপোর্ট করিয়া নিজ গৃহে যাইয়া থাকিতে পারে। অন্য সকল সৈন্য ছাউনিতেই থাকিবে এবং সকল বিলি-ব্যবস্থা হইয়া যাইলে যাহারা নিজ নিজ কর্ম্মসর্ত্ত যথাযথরূপে সম্পূর্ণ করিয়াছে তাহারা সামরিক কাজ ছাড়িয়া দিতে পারিবে। কেহ কেহ ছুটি পাইলেও পুনর্ব্বার ডাকিলে আসিতে বাধ্য থাকিবে ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবস্থা অনুসারে ছাড়পত্র পাইতে থাকিল।

অজয়, অরুণ ও চিম্‌নি, কলিকাতায় নিজেদের গৃহ থাকায় জিনিসপত্র লইয়া যে যাহার গৃহে চলিয়া গেল। গৃহে

পৌছিয়া চিমনি দেখিল, খাঁদু দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে দেখিয়া চিনিতেই পারিল না। কিন্তু তাহার নিকটে আসিতে বিশেষ আপত্তি করিল না।

পিসিমা বলিলেন, "ওমা, ওমা, তোর মুখখানা কিরকম শুকিয়ে গিয়েছে বাবা সন্তু! বড় কষ্ট দিত ওরা, না?"

সন্তোষ বলিল, "না, কষ্ট আবার কি? খুব হাঁটাচলা আর ক্রমাগত মারপিট আর ধস্তাধস্তি। কিছুদিন খেয়ে-শুয়ে থাকলেই দেখো না কি রকম মোটা হয়ে যাই।"

পিতা বলিলেন, "অতঃপর কি অন্য কাজ করবে, না ঐ সৈন্যদলেই থেকে যাবে?"

সন্তোষ বলিল, "সে কথা ত এখনও ঠিক হয় নি। সৈন্যদল থেকে নাম কেটে দিলে অন্য কাজ করতে পারি। এখন ত রোজ হাজিরা দিতে হবে।"

হাজিরা দেওয়া চলিতে লাগিল। সৈন্যগণ সকলেই প্রায় ছুটি পাইলেই চলিয়া যায় এই রকম ইচ্ছা। কারণ সকলেই বুঝিত যে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ভারতবর্ষে। ব্রিটিশ নাকি ভারতের কাছে এত টাকা ধার করিয়া এশিয়ার যুদ্ধ চালাইয়াছে যে তা শোধ করিতে হইলে তাহাদিগকে দেউলিয়া হইতে হইবে। কেহ বলিল, নেতাজী সুভাষ ঠিক কোথায় নামিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগকে ব্রিটিশ জানিতে দেয় নাই; নয়ত আমরা সকলেই তাঁহার দিকে চলিয়া যাইতাম। অপরে বলিল, যুদ্ধ করিতাম আমরা, আর ভাল ভাল খাবার খাইয়া আরাম করিত ব্রিটিশ সৈন্যরা।

চিম্‌নি বলিল, "নারে, সেগুলো আমেরিকান। রোজ এক বোমা ভর্ত্তি আইসক্রীম খেত এক একটা।"

অজয় ও অরুণ সমস্বরে বলিল, "কিন্তু আমাদের যদি বলে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব রাখবার জন্যে লড়তে তাহলে আমরা সৈন্য থাকতে চাই না। জাপানী, জার্ম্মান কি ইটালিয়ান হ'লে আপত্তি নেই, কিন্তু নিজেদের দেশের লোকের উপর গুলী চালান ঠিক হবে না।"

এক রাজপুত বলিল, "নিজ দেস ভি কিধার আছে কোন্ জানতা।"

"আরে ভাই তুমি বাংলা বোলো না।"

"হামি বাংলা ত ঠিক বলছে। হামি কলকাতা পাঁচসাল থা। হামি সুনিয়েছে কি একঠো মুসলমান রাজ বন্‌বে। তাহলে ত লড়াই জরুর হোবে; ক্যা নহি?"

এই সকল আলোচনা করিয়া সকলে স্থির বুঝিয়া লইল যে অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটিশ রাজত্ব আর থাকিবে না। একটা মুসলমান রাজত্বও হইতে পারে ভারতের কোথাও। কিন্তু তাহার কোন স্থিরতা নাই। শুধু এই কথাটিই ঠিক বুঝা যাইতেছিল যে, শীঘ্রই কোন সময় ভারত হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উঠিয়া যাইবে এবং সম্ভবত সেজন্য বিশেষ কঠিন সংগ্রাম করিতে হইবে না, কারণ ব্রিটিশ জাতি নিজেদের তথাকথিত অতি-মানবতার আস্থা হারাইয়া অপরাপর জাতির উপর প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা আর পোষণ করিতেছে না বলিয়াই মনে হইতেছিল।

নেতাজী সুভাষ যখন ভারতের সকল যোদ্ধাজাতির সৈন্যগণকে নিজের নেতৃত্বের অধীনে আনিয়া ব্রিটিশের উপর যুদ্ধ চালাইলেন; তাহা যতটুকুই হইয়াছিল তাহাতে একথা প্রমাণ হইয়া গিয়াছিল যে ভারতীয় যোদ্ধাগণ ব্রিটিশের দাসত্ব স্বীকার করিতে আর অধিক কাল রাজী থাকিবে না। এই মনোভাব সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল এবং যে সকল নেতাজীর সৈন্যদলের যোদ্ধাগণ ব্রিটিশের হস্তে ধরা পড়িয়া কঠিন শাস্তি পাইবে বলিয়া সকলে শুনিল, তাহারাও ক্রমশঃ ব্রিটিশের আত্মনির্ভরশীলতা হৃত হওয়াতে মুক্তি লাভ করিয়া জনসাধারণের নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়া নিজেদের প্রাপ্য যাহা তাহা পাইতে আরম্ভ করিলেন।

ভারতীয় সেনাদলের বহুলোকই সামরিক চাকুরি ত্যাগ করিয়া সরিয়া যাইতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে অজয়,

অরুণ ও সন্তোষও দেখিল তাহারাও শীঘ্রই সামরিক কার্য্য হইতে অবসর লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে কর্ম্ম সন্ধান করিতে পারিবে এবং তাহারা সকলেই কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া এদিকে-ওদিকে দেখাশুনা করিতে লাগিল। কয়েকদিন পরে তাহাদিগের সামরিক কার্য্যে ইস্তফা দিবার হুকুম আসিয়া গেল ও সকলে অসংখ্য কাগজপত্রে সহি করিয়া ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ লাগাইয়া বন্দুক প্রভৃতি জমা দিয়া ও টাকা-কড়িগুণিয়া লইয়া গৃহের পথে চলিল। যাহা অর্থলাভ হইল তাহা তাহাদিগের চক্ষে প্রভূত বলিয়া মনে হইতে লাগিল; কারণ অর্থের কারবার তাহাদিগের বিশেষ ছিল না। চিম্‌নি গৃহে ফিরিয়া টাকাগুলি পিতার হস্তে দিয়া বলিল, "এই দিয়েছে হিসেব করে।"

পিতা এতগুলি টাকা দেখিয়া বলিলেন, "তা তুমি নিজে রেখে দাও।"

"আমি কোথায় রাখব? আমার কোন তালা লাগান যায় এমন বাক্স-টাক্স নেই।"

চিম্‌নি খবর পাইল ধানবাদের নিকটে একটা কয়লার খাদে মজুর খাটাইবার কাজ খালি আছে। সে যথাস্থানে একটা দরখাস্ত করিয়া দিল ও কয়েক দিনের মধ্যে একটা চিঠি আসিল একটা অফিসে গিয়া দেখা করিবার জন্য। চিম্‌নি সেই আফিসে গিয়া দেখিল একজন গুজরাটি ভদ্রলোক আবেদকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন। তিনি চিম্‌নিকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন! বলিলেন, "আপনি কোন্ ভাষায় কথা বলেন?"

চিম্‌নি বলিল, "বাংলা, ইংরেজী ও কিছু কিছু হিন্দুস্থানী কথাও বলি।"

সে ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনি কি লোক খাটাইতে পারিবেন?"

"আমি যা হুকুম হ'বে তাই করতে পারব।"

"বেশ, বেশ, আপনার শরীরে ত শক্তি আছে মনে হয়।"

"হ্যাঁ, গায়ে জোর আছে। আর আমি ত এখনই মিলিটারী থেকে আসছি, কাজ করা অভ্যেস আছে।"

"আপনাকে জুনিয়র অফিসারস্ মেসে থাকতে হবে, আর খাওয়া-দাওয়া থাকা সরকারী খরচায় হয়ে, একশ টাকা মাসে পাবেন।"

চিম্‌নি বলিল, "খাওয়া-দাওয়া পুরো হবে, না কম কম? পুরো খাবার দিলে আমি যেতে রাজী আছি।"

"আপনি কত খেতে পারেন?"

"তা সকালে চারটে ডিম, আট স্লাইস রুটি মাখন আর চা। দুপুরে ভাত ডাল তরকারি মাছ কি মাংস যতটা খাবার দরকার হবে। বিকেলে চা আর একটা পাউরুটি, আর রাত্রে ত্রিশ-চল্লিশ খানা চাপাটি আর ডাল কি শাকের সঙ্গে রান্না-করা মাংস। পান তামাক মদ গাঁজা আমি খাই না।"

"বাহবা, বেশ, সাবাস! মরদ বাচ্চা'র মত খাওয়া। আমি সব ব্যবস্থা করিয়ে দেব। আপনি কবে যেতে পারবেন?"

চিম্‌নি বলিল, "এখনি যেতে পারি। এক ঘণ্টার মধ্যে। নয়ত যখন বলবেন।"

গুজরাটি ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনি কাল বেলা দুইটার সময় আসবেন; নিজের কাপড় বিছানা ইত্যাদি নিয়ে। সন্ধ্যেবেলা আমার একজন লোক আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে সেখানে। বেতন কাল থেকেই চলবে। খাওয়া-খরচ সব আমরা দেব।"

পরদিন খাঁদুকে কাঁধে করিয়া সকালে চিড়িয়াখানা দেখাইয়া আনিয়া দুপুরের খাওয়া সারিয়া চিম্‌নি বেলা দুইটার সময় কর্ম্মস্থলে গিয়া উপস্থিত হইল। গুজরাটি ভদ্রলোক তাহাকে দেখিয়া খুব খুসী হইয়া বলিলেন, "এই যে এসেছেন আপনি। ঠিক আছে, বিটলভাই আপনার সঙ্গে যাবেন।"

বিটলভাই ও চিম্‌নি কোম্পানীর গাড়িতে ষ্টেশনে গিয়া বিটলভাই টিকেট কিনিয়া লইলেন। যাত্রা আরম্ভ হইল

ও গভীর রাত্রে ধানবাদে গাড়ি পৌছাইল। সেখানে কোম্পানীর গাড়ি ছিল। ড্রাইভার চিম্‌নিকে দেখিয়া একটা বড় সেলাম করিয়া বলিল, "কি সৌভাগ্য, আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল।"

চিম্‌নি বলিল, "কেন সৌভাগ্য কেন? আমার সঙ্গে দেখা হ'লে কি হয়?"

ড্রাইভার বলিল, "আমার কুষ্ঠিতে আছে আমি এই সময় এক মহাপুরুষের দর্শন পাব। আর আমার কপাল ফিরে যাবে।"

চিমনি বলিল, "আরে দ্যুৎ! আমি আবার মহাপুরুষ কবে হ'লাম। মোটে ত একশ টাকা মাইনে।"

"আরে হুজুর, আপনি কি আর স্বীকার পাবেন যে আপনি কে? আপনি পরশুরাম, আপনি বলরাম, আপনি কে নয়।"

বিটলভাই বলিলেন, "আরে চল, রাত হয়ে গেছে; সকালবেলা পূজো দিও এখন পরশুরামজিকে।"

জুনিয়ার অফিসারস্‌ মেসটা দেখিতে ভালই ছিল; কিন্তু তাহার খাট-চারপায়াগুলির কোনটিই ছয় ফুট আট ইঞ্চি একটি মানুষকে আরামে শোয়াইবার জন্য নির্ম্মিত হয় নাই। চিমনি পা দুটি গুটাইয়া শুইল এবং সকালে উঠিয়াই বিটলভাইকে বলিল, "একটা সাত ফুট তক্তপোষ আনিয়ে দেবেন। এই ছোট খাটে শুতে পারি না।"

বিটলভাই হাস্য করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। এখনি অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি।"

ড্রাইভার আসিয়া উপস্থিত হইল দশ-বার জন লোক সঙ্গে। তাহারা সকলে চিমনিকে প্রণাম করিতে চাহিল! চিম্‌নি বলিল, "আরে, আরে, এ আবার কি? আমায় আবার প্রণাম কেন? আমি কি সাধুবাবা, না মা কালী!"

"আপনি একটি মহাপুরুষ। প্রণাম না হয় দূর থেকেই করছি আমরা কিন্তু দয়া রাখবেন আমাদের উপর।"

চিম্‌নি বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ অনেক দয়া, তোমরা এখন যাও।"

তাহারা সকলে দূর হইতে প্রণাম করিয়া ভক্তি-গদ্‌গদ নয়নে চিম্‌নির দিকে চাহিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। রাত্রে চিম্‌নি বিটলভাইকে বলিল, "এই সব লোকগুলোর কি মাথা খারাপ? সবাই এসে পেন্নাম করতে চায়! মহা মুস্কিল!"

"আরে, ওসব জংলি লোক; আপনার লম্বা চেহারা দেখে মজে গেছে। পাটা বাড়িয়ে দেবেন না রোজ সকালে। সবাই পেন্নাম করে চলে যাবে।"

চিম্‌নি পা বাড়িয়ে না দিলেও দর্শন দিতে বাধ্য হইত। কারণ দর্শন না দিলে তার পক্ষে কোন কাজকর্ম্ম করা সম্ভব হইত না। লোকগুলো মূর্চ্ছা যাইবার পূর্ব্বক্ষণে আহত গো-বৎসগণ যেরূপ বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া থাকে সেইরূপ ভঙ্গিতে চিম্‌নিকে দেখিত। চিম্‌নি হাসিয়া বলিত, "এই যে, সব এসেছ? আজ আমি কি ভীষ্মদেব না অশ্বত্থামা?"

তাহারা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিত, "প্রভু আপনিই সব। শুধু দয়া রাখবেন।"

চিম্‌নি বলিত, "নিশ্চয় রাখব দয়া, নিশ্চয় রাখব!" সে অজয় ও অরুণকে একটা চিঠিতে এই সব ভক্তি-বিহ্বল কয়লাখাদের ধর্ম্মপ্রাণদিগের বিষয় লিখিয়া পাঠাইল। এক শনিবার দুই বন্ধু আসিয়া উপস্থিত। গভীর রাত্রে তাহারা ষ্টেশনেই থাকিয়া গেল। পরদিন ভোরবেলা চিম্‌নির কয়লাখাদে গিয়া হাজির। সকল লোককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ঐ মানস সরোবরের দেড়া বাবাজি এখানে এসেছেন নাকি?" "ওঁর নাম দেড়া বাবাজি?" "হ্যাঁ হ্যাঁ, দেড়া বাবাজিই ওঁর নাম। সব মানুষের দেড়া কি না লম্বায়। আর ভোজনে আড়াইয়া বাবা নামও চলে। আড়াই গুণ খান উনি।" সকলে বলিল "হ্যাঁ, গুণী লোক দেখলেই বোঝা যায়। রাগ নেই, হিংসে নেই, অহংকার নেই। সকলকে আশীর্ব্বাদ করছেন সব সময়।" এমন সময় চিম্‌নি বাহিরে আসিতেই সকলে চিৎকার করিয়া বলিল, "জয় বাবা দেড়া বাবাজিকি জয়।" চিম্‌নির হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল। দেখিল অজয় ও অরুণ তাহার পায়ের উপর দুই ছড়া কলা

রাখিয়া তাহাকে প্রণাম করিতেছে। পিছনের লোকেরা পরাজয় স্বীকার করিতে রাজি ছিল না। তাহারাও সিকি, আটআনি পায়ের উপর রাখিয়া প্রণাম সুরু করিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় পাঁচ দশ টাকার রেজকি জমা হইয়া গেল। চিম্‌নি বলিল, "এই, তোরা কি আরম্ভ করে দিলি এখানে এসে? আমায় শেষে এখান ছেড়ে পালাতে হবে দেখছি।" সকলে হাউমাউ করিয়া উঠিল। "না বাবা, সে হবে না! আপনার যাওয়া চলবে না কিছুতেই। এঁরা বড় দরজার ভক্ত আছেন, তাতে আমরাও সমান সমান সেবা লাগাব আপনার। দোহাই বাবা, যেও না।"

চিমনি স্মিতহাস্য করিয়া বলিল, "ইচ্ছে থাকলেই কি আর যাওয়া যায়। তা তোমরা এখন সকলে বাড়ী যাও। এদের আমি দেখছি।" অজয় ও অরুণ চিমনির সহিত ভিতরে চলিল। তাড়াতাড়ি খাবার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগের আরামের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। অজয় ও অরুণ দেড়াবাবাজির পরম ভক্ত ও পুরাতন চেলা হিসাবে ঐ অঞ্চলে সকল গৃহে আমন্ত্রিত হইতে লাগিল। তাহারা সর্ব্বত্র দেড়াবাবাজির অদ্ভুত ক্ষমতার কথা রাষ্ট্র করিয়া দিল। দেড়াবাবাজী বাল্যকালে মাঠে শুইয়া থাকিলে গাভীগণ তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইয়া যাইত। কিশোর দেড়াবাবাজি গাছের নিচে হাত পাতিলেই আম জাম কলা তাঁহার হস্তে নিজে নিজেই আসিয়া পড়িত। যৌবনে দেড়াবাবাজির স্পর্শে রুগীরা ব্যাধিমুক্ত হইত। এবং তিনি হাত তুলিয়া দেখাইলে মত্ত হস্তী পর্য্যন্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া যাইত···ইত্যাদি, ইত্যাদি। দেড়াবাবাজির খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মজুর খাটান তাঁহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে হইতে লাগিল। কেননা দৈবশক্তির সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে সাহস পায় না। তাহাকে মেসে একটা পুরা কামরা ছাড়িয়া দেওয়া হইল ও রোজ তাহার দর্শন লাভ করিতে বহু লোক আসিত। চিম্‌নি যাহা প্রণামী পাইত তাহা দিয়া ঔষধ, বস্ত্র, পুস্তক প্রভৃতি ক্রয় করিয়া রাখিত এবং সেই সকল দিয়া অভাবগ্রস্ত লোকেদের সাহায্য করিত। জীবনযাত্রা সহজ ও সরল পথে চলিতে লাগিল। চিম্‌নি মাঝে মাঝে বলিত, "এখানকার লোকগুলো বেজায় বোকা। কিছুই বোঝে না, খালি পাগলের মত আশীর্ব্বাদ, পেন্নাম, নয়ত আর কিছু নিয়ে মুখ্যুমি করতে থাকবে।"

॥ ১২ ॥

চিম্‌নি কয়লার খাদে মজুর খাটায়। অজয় একটা বড় স্কুলে ড্রিল শেখায়, তা ছাড়া নিচের ক্লাশে পড়ায়। অরুণ ভ্রাম্যমান মাল বিক্রয়ের দালাল, এক ঔষধের কারবারের। চলিতেছিল ভালই, এমন সময় বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার একটা বন্যা বহিতে সুরু করিল। পূর্ব্ব বাংলায় হিন্দুদিগের বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল এবং দলে দলে হিন্দুগণ দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কলিকাতা ও আশপাশের সকল স্থানেই মারপিট লাগিয়া গেল অল্পবিস্তর। কেহ নিশ্চিন্ত মনে কোথাও বাস করিতে পারে না এইরূপ অবস্থা। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া হিন্দু ও মুসলমানদিগের দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্যের সৃষ্টি করা হইবে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইতে লাগিল। চিমনির পিতা তাহাকে লিখিলেন, "তুমি যদি তোমার চাকুরি হইতে ছুটি লইয়া এখন কিছুকাল কলিকাতায় বাস কর তাহা হইলে আমরা শান্তিতে থাকিতে পারি। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। তোমার পিসিমা খুঁদুকে সর্ব্বদা সামলাইতে ব্যস্ত। অপর সকলে কখন কখন এই গৃহে আসেন ও অধিকাংশ সময়েই কেহ আইসেন না। সুতরাং তোমার মত একজন সবলকায় যুবক থাকিলে আমরা সকল দিক দিয়া নিরাপদে থাকিতে পারি।"

চিমনি ছুটি লইয়া দশ দিনের জন্য কলিকাতায় আসিল। আসিয়া সকল বন্ধুবান্ধবের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিল উত্তমরূপ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া রাখিলে কলিকাতার হিন্দু সাধারণের উপর পুলিশ ও সশস্ত্র গুণ্ডার উৎপাত ক্রমশঃ এত বাড়িয়া যাইবে যে সহরের শতকরা ৮০ জন লোক হিন্দু হইলেও তাহাদিগকে গৃহ ছাড়িয়া পলাইতে হইবে। পাড়ায় পাড়ায় যাহারা যাহাকে চিনিত ও সাহসী বলিয়া জানিত সকলে ধীরে ধীরে একত্র হইতে লাগিল। চিমনি একবার

ধানবাদে ফিরিয়া গিয়া আবার লম্বা ছুটি লইয়া ফিরিয়া আসিল। এখন ধীরে ধীরে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ কার্য্য চলিতে লাগিল। আগ্নেয়াস্ত্রের অভাবে, তীরধনুক, বল্লম, টাঙ্গি, অ্যাসিড, পেট্রোল, আলকাতরা, ঘরে তৈয়ারী বোমা, বারুদ ইত্যাদি এদিকে-ওদিকে প্রচুর সংগৃহীত হইয়া লুকান রহিল। কিন্তু যখন সেই আক্রমণ আরম্ভ হইল তখন দেখা যাইল যে তাহার পশ্চাতে যুদ্ধের আয়োজনের মতই ব্যবস্থা রহিয়াছে। দূর দূর দেশ হইতে ভাড়াটিয়া গুণ্ডার দল পুলিশের উর্দ্দি পরিয়া পাড়ায় পাড়ায় যাহারা বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছিল তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দলে দলে পাঞ্জাবী ও পাঠান মুসলমানের দল কলিকাতার পথে পথে জয়ধ্বনি করিয়া গৃহদাহ, লুঠ, খুন, জখম ও সকল প্রকার বীভৎস অত্যাচার নগরের নরনারী শিশুদিগের উপর আরম্ভ করিল। পাঠান পুলিশ নামধারী হত্যাকারীগণ পথে পথে লরী চড়িয়া ঘুরিতে লাগিল ও গুলী এবং বোমা নিক্ষেপে সকল লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিতে লাগিল।

প্রথম দুই-তিন দিন সহরবাসী শুধু মার খাইতে লাগিল। যে সকল স্থান হিন্দুপ্রধান ছিল, সাহসী যুবকেরা গাড়ি করিয়া সদলে মুসলমান-প্রধান এলাকায় গিয়া অসহায় হিন্দুদিগকে উদ্ধার করিয়া আনিতে লাগিল। প্রায় দশ হাজারের অধিক নরনারী শিশুদিগের এই কদর্য্য ও নির্ম্মম রাষ্ট্রীয় সংঘাতে প্রাণহানি হইল। ঘৃণ্য নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত হইল। কিন্তু ধীরে ধীরে সহরবাসী ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। লরী চড়িয়া পাঠান পুলিশ পথে বাহির হইলেই সরুগলি হইতে তাহাদিগের উপর বোমা মারা হইত। তাহারা সেই সকল সঙ্কীর্ণ পথে লরী ঢুকাইয়া তৎস্থানের লোকেদের শাস্তি দিতে যাইলে লরীর উপর পেট্রোল-মিশ্রিত আলকাতরার পিপা জ্বলন্ত অবস্থায় বাড়ীর ছাদ হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ হইল। ইহাতে অনেক লরী জ্বলিয়া গিয়া পলায়নপর পাঠান পুলিশ সাধারণের নিকট বিভিন্ন অস্ত্রে আহত ও নিহত হইতে লাগিল। তাহার পরে হিন্দুদিগের দল বাহির হইতে আরম্ভ হইল। তাহারা সকল মুসলমানকে বিভিন্ন এলাকা হইতে তাড়াইয়া দুই-চারিটি কেন্দ্রে আবদ্ধ করিতে লাগিল। এবং ক্রমশঃ সেই সকল কেন্দ্রের উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল। চতুর্থ দিনের পর হইতেই বুঝা গেল যে কলিকাতায় মুসলমান-রাজ হওয়া সম্ভব হইবে না। তাহার পর ক্রমশঃ মুসলমান নেতাগণ উল্টা সুর গাহিয়া হিন্দুদিগকে কঠোর নীতি ত্যাগ করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বাস করার উন্নততর আদর্শ ও পন্থা শিখাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কলিকাতা হইতে সকল মুসলমান বিতাড়িত না হইলেও বহু এলাকা হইতে মুসলমানগণ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

চিম্‌নিদের গৃহের সহিত সংযুক্ত অনেকগুলি গৃহ আশেপাশে ছিল যাহার ছাদে অপর গৃহের ছাদ হইতে সহজেই যাওয়া যাইত। ইহার মধ্যে একটি বাড়ীতে একটি মুসলমান পরিবার থাকিত। পাড়ার ছেলেরা ঠিক করিল সেই মুসলমান পরিবারের উপর আক্রমণ করিবে। চিম্‌নি শুনিয়া বলিল, "ওদের বাড়ীতে ত তিন বুড়ী, এক বুড়ো আর দু-চারটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে আছে। তাদের মারবি কেন?" ছেলেরা বলিল, "না সন্তোষদা, সাপ যে বয়সেরই হোক তার বিষ থাকে। সাফ করে দিলেই ভাল।" চিম্‌নি কিছু বলিল না। রাত্রি দুটোর সময় ছাদ হইতে ছাদে গিয়া তাহাদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিল, "রাজা সাহেব, আপনাদের পাড়ার ছেলেরা মেরে ফেলবে। আপনারা জিনিসপত্র কিছু কিছু নিয়ে পালিয়ে যান।" রাজা সাহেব বলিলেন, "আমাদের বেরবার পথ নেই। নিচে কতকগুলি লোক থাকে, কদিন থেকে, তারা আমাদের কিছুতেই বেরতে দেবে না। তা না হলে আমরা তিন-চারদিন থেকে তৈরী হয়ে রয়েছি, চলে যাবার জন্যে।" চিম্‌নি রাজা সাহেবকে লইয়া গৃহের ছাদে গিয়া দেখাইয়া দিল কেমন করিয়া তিন-চারখানা বাড়ীর ছাদ পার হইয়া অপর দিকের রাস্তার উপরের একটা বাড়ীতে যাওয়া যায়। এবং সেই বাড়ীটাতে কেহ থাকে না। এই সময় সকলে সেখানে চলিয়া লুকাইয়া থাকিলে কল্য দুপুরবেলা যখন মারপিটওয়ালারা ভোজনে নিযুক্ত থাকিবে সেই সময় একটি ট্যাক্‌সি ঐ বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। তাহাতে উঠিয়া পড়িয়া চলিয়া যাওয়া খুবই সহজ হইবে। ট্যাক্‌সিওয়ালা তাঁহাদিগকে এমন স্থানে নামাইয়া দিবে যেখান হইতে একদিকে মুসলমান-প্রধান পল্লী ও অপর দিকে

হিন্দু-পল্লী। ধুতি, কুর্ত্তা ও শাড়ী পরিয়া থাকিলে কেহ সন্দেহ করিবে না যে রাজা সাহেবরা মুসলমান। চিম্‌নির নির্দ্দেশ মত আধ ঘণ্টা পরে সকলে তাঁহারা ছাদের উপর দিয়া অপর ছাদে এবং আরো দুই-তিনটা গৃহের ছাদ ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া সেই খালি বাড়ীটার উপর তলায় গিয়া আশ্রয় লইলেন। পরদিন দুপুর বেলা সেই পরিবার ট্যাক্‌সিতে চড়িয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া গেল। বৈকালে ঐ গৃহের সামনে পাঠান পুলিশ আসিয়া হানা দিল। নিচে যাহারা ছিল তাহারা উপরে পলায়ন করিতে যাইয়া দেখিল উপর হইতে সব দরজা বন্ধ। তাহাদিগের অবস্থা বিশেষ খারাপই হইত কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল নিচের তলায় একটা বস্তিতে আগুন লাগিয়া ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক বাষ্প বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে। লঙ্কা পোড়া, টিয়ার গ্যাস ও অ্যামোনিয়ার মিশ্রণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পাঠান পুলিশ শীঘ্র সেই স্থান ত্যাগ করিয়া পলাইল। রাত্রে সেই রাস্তায় একটি বিরাট মিছিল বাহির হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল। অনেকগুলি দীর্ঘকায় পাঠান ধরনের লোক। হাতে বল্লম ও লাঠি। তাহাদের দেখিয়া চারিদিকে দরজা বন্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা এক স্থানে আসিয়া একটি যুবককে বল্লম দিয়া মারিল। চিম্‌নি ব্যাপার দেখিতেছিল কিন্তু তাহার মনে কোন যুদ্ধ-স্পৃহা জাগে নাই। সে যুবকটিকে বল্লম মারিল দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "দেখলে, দেখলে, মারল শুধু শুধু"। বলিয়াই সে একখণ্ড পনের ফুট লম্বা বাঁশ পড়িয়াছিল সেইটি তুলিয়া লইয়া বল্লমধারী সেই পাঠান কয়জনকে বাঁশের আঘাতে ধরাশায়ী করিয়া দিল। তাহার দীর্ঘ সবল দেহ দেখিয়া ও সেই ঘূর্ণায়মান দশ হাত লম্বা বংশখণ্ড দেখিয়া সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। চিম্‌নি বাঁশখানা রাখিয়া দিয়া পুনরায় ঘরে আসিয়া বসিয়া রহিল। কিছু পরে পুলিশ আসিল ও চারিদিক ঘুরিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল।

সেই পাঠান কয়জনকে বাঁশের আঘাতে ধরাশায়ী করিয়া দিল

সেইদিন রাত্রে সেই অঞ্চলের সকল লড়িয়ে ছেলেদের খবর দেওয়া হইল যে পর দিন প্রত্যেক এলাকা হইতে পাঠান পুলিশ ও গুণ্ডাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিতে হইবে। সকল রাস্তা শত্রুহীন করিয়া দিতে হইবে। কোথায় কোথায় গুণ্ডাদিগের ঘাঁটি আছে তাহা ঠিক করিয়া দেখিয়া লওয়া হইল ও কোনটির উপরে কাহারা কি ভাবে আক্রমণ করিবে তাহাও নির্দ্ধারিত হইল। রাত্রি ৩টার সময় হইতে শত শত যুবকগণ নিঃশব্দে ঐসকল ঘাঁটির চারিপাশের রাস্তায় ছোট ছোট পুঁটুলি রাখিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। এক ঘন্টার মধ্যে সকল ঘাঁটির আশপাশ ছোট ছোট পুঁটুলিতে স্তূপাকার হইয়া উঠিল। ৪টার অল্পক্ষণ পরেই সাইকেল্ চড়িয়া কয়েকটি যুবক সেই সকল স্তূপের উপর ছোট ছোট মশাল জ্বালিয়া নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। প্রায় পঞ্চাশখানা গৃহের সম্মুখে ঐ প্রকার স্তূপ ছিল। সেগুলি এখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং দেখা যাইল সেই সকল গৃহ হইতে কেহ আর বাহিরে আসিতে পারিতেছে না।

ভীষণ একটা সোরগোলের সৃষ্টি হইল। কোথাও কোথাও গৃহের ভিতর হইতে জল ঢালিয়া আগুন নিভাইবার চেষ্টা হইল কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। অতঃপর কাহারা নানান স্থান হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া আলকাতরার পিপা ঐ সকল স্থানে রাস্তার উপরে ঠেলিয়া দিল ও সেইগুলিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল। এখন আর সে রাস্তা দিয়া কাহারও যাইবার উপায় রহিল না।

একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইল। লম্বা লম্বা রাস্তার মোড়ে মোড়ে এইরূপ আগুন জলিয়া উঠিয়াছে! সেই অঞ্চলের বাসিন্দারা তাহাতে বিশেষ ভীত উদ্ব্যস্ত বলিয়া মনে হইতেছে না। কোথাও কোথাও বালি আর মাটি দিয়া আগুন ঠেকাইয়া রাখা হইতেছে। যেখানে খুবই জোরে আগুন জলিতেছে সেখানে এক একটা বাড়ীর ভিতর হইতে খুবই কাতর আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে। এই সময় পুলিশের লরী আসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সকলে দেখিল কোন কোন বাড়ীর ছাদে তক্তা বাহির করিয়া তাহার উপর বড় বড় পিপা পর পর ভাবে রাখা রহিয়াছে। পুলিশের লরী সেই স্থানে আসিতেই পিপাগুলি অদৃশ্য হস্তের সঙ্কেতে গড়াইয়া লরীর উপর পড়িয়া ফাটিয়া জলিয়া উঠিতে লাগিল। পাঠান পুলিশ তখন ইতঃস্তত দৌড়াইয়া আশ্রয় লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু আশ্রয় ত পাইলই না, বরঞ্চ তাহাদিগের মস্তকে ইষ্টক-বৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হইল। শেষ দৃশ্যে দেখা যাইল যে একজন দীর্ঘকায় যুবক ক্ষীপ্র হস্তে তাহাদিগের বাহিরের পোশাক খুলিয়া লইয়া অগ্নিসাৎ করিয়া দিতেছে। ইহার পরে আর বুঝা যাইল না পুলিশ আর কে গুণ্ডা। কোন কোন বাড়ীতে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। সে আগুন পাড়ার ছেলেরা নিভাইতে আরম্ভ করিল এবং গৃহবাসী গুণ্ডা ও পুলিশের চরদিগকে বিশেষভাবে উত্তম-মধ্যম দিয়া আহত অবস্থায় রাস্তা হইতে পাঠান পুলিশদিগকে স্কন্ধে তুলিয়া এলাকা ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইল। যাহারা চলিতে পারে না বা ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিল তাহারা রাস্তার বড় বড় মোড়ের নিকট জলন্ত লরীর নিকটে নিক্ষিপ্ত হইল।

এই ঘটনার পরে ইংরেজ সরকার হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া শান্তিরক্ষা করিতে লাগিয়া গেলেন। ব্রিটিশসৈন্য আমদানী করিয়া রাস্তায় যুবান হইতে লাগিল। মুসলমান পাড়ার বস্তিগুলি বিশেষ করিয়া পাহারা দেওয়া হইতে লাগিল। হিন্দু-পাড়া হইতে সকল পাহারা পুলিশ গুণ্ডা প্রভৃতি সরাইয়া লওয়া হইল। লোকের যাতায়াত পুনরায় সম্ভব হইল। সকল বিষয়ের মীমাংসা লণ্ডনে ও দিল্লীতে হইতে লাগিল। সাধারণ কলিকাতাবাসী সেই নারকীয় অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে হয়ত ভারতে শান্তি ও সুখের পুনরাবির্ভাব ঘটিবে। তাঁহারা জানিতেন না যে রাষ্ট্রীয় অধিকারের দুরাকাঙ্ক্ষা মানুষকে কতটা অমানুষ করিয়া দিতে পারে। ইহাও জানিতেন না যে কলিকাতার হত্যাকাণ্ডের শতগুণ নির্ম্মম হত্যা, অত্যাচার ও লুণ্ঠনের বিভীষিকা বাংলা ও পাঞ্জাবের বক্ষে রক্তবন্যায় বহিতে থাকিবে।

চিম্‌নি খাঁদুকে স্কন্ধে তুলিয়া পথে বিচরণ করিত। তাহাকে বলিত, "খাঁদু ভাল ছেলে হবি। কাউকে মারবি না।" খাঁদু বলিত, "নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও। আমি ত জোরে জোরে হাঁটতে পারি।" চিম্‌নি তাহাকে নামাইয়া দিলে একটা ইট তুলিয়া লইয়া একটা রাস্তার কুকুরকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। চিম্‌নি বলিল, "আরে, তোকে বললাম না, কাউকে মারবি না? কেন ইট ছুঁড়লি?" খাঁদু হাস্য করিয়া বলিল, "কুকুর পালিয়ে গেল।" চিম্‌নি বুঝিল খাঁদুর মতে কোন কোন জন্তু মানবতার আগ্রহে নড়ে চড়ে না। ইষ্টক বা লগুড় লাগিলেই এই সকল জন্তুর আদর্শবাদ জাগ্রত হইয়া উঠে। বাংলায় একটা প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, "যেমন কুকুর তেমন মুগুর" এবং সংস্কৃতে বলে "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি।" অর্থাৎ সর্ব্বক্ষেত্রেই অপর পক্ষের মানসিক পরিস্থিতির উপরে পারস্পরিক সম্বন্ধ রক্ষার পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হওয়া সমীচীন। এই সকল কথা উপেক্ষা করিয়া জীবজগতে চলা যায় না। চিম্‌নি খাঁদুকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পিসিমাকে বলিল, "ছেলেটা খুব দুষ্টু হয়েছে। কুকুর দেখলে ইট ছুঁড়ে মারে।" পিসিমা বলিলেন, "তা বাবা, কুকুরকে না মারলে কামড়ে দিতে পারে।" চিম্‌নি বুঝিল পিসিমাও ঐ বিষয়ে একমত। জীবন-পথ একটা যুদ্ধক্ষেত্রের ভিতর দিয়া চলিয়া

যায়। কোথাও কোথাও কখন কখন যুদ্ধ স্থগিত থাকে। আবার কোথাও বা গভীর কলরোলের সহিত যুদ্ধের ঝঞ্ঝা জাগ্রত হইয়া দেখা দেয়। প্রেম ভালবাসা সখ্য প্রীতি সেই বজ্রকঠোর পরিবেশের মধ্যেই হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে প্রস্ফুটিত কুসুমের মত কোথাও কোথাও শোভা পায়। কিন্তু উচ্চাঙ্গের রসানুভূতির ভাবাবেশে কুসুমের অন্তরালে উদ্যত-ফণা সর্প থাকিতে পারে সে কথা ভুলিলে চলিবে না।

অজয়, অরুণ, চিম্‌নি ও অপরাপর সৈন্যদলের বন্ধুরা কখন কখন ফুটবলের মাঠে কিংবা লেকের ধারে মিলিত হইত। তাহারা বলিত, "জীবন যত সহজ সরলভাবে চলে মানুষ ততই ক্রমশঃ অসহায় হইয়া পড়ে। দুঃখ কষ্ট বিপদ আপদ ও মৃত্যুর করাল ছায়া মানবজীবনকে জাগ্রত ও গতিশীল করিয়া রাখে।" চিম্‌নি বলিত,"যেমন বেশ কিছু খিদে না পেলে কেউ কেউ উঠেও বসে না।" অজয় ও অরুণ বলিত, "তোর ঐ খিদের মাপকাটিতে সব কিছু মেপে নেওয়া যায়। সাম্রাজ্য রাজত্ব সব উঠছে পড়ছে শুধু ঐ খিদের জন্য। রেল ইঞ্জিনের কয়লার খিদে, মোটরগাড়ির পেট্রোলের খিদে, ধার্ম্মিকের ধর্ম্মের খিদে, পাপীর অধর্ম্মের খিদে, যতদিকে যাওয়া যায় ততরকম খিদে। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক খিদে চিম্‌নির পেটের খিদে।"

সকলে হাস্য করিয়া উঠিল।

চিম্‌নি বলিল, "ধেৎ!"

—)০(—

প্রাচীন পোলিশ নৃত্য—

কাঠুরিয়ার নৃত্য

গাল্লের প্লট

বিমল মিত্র

ব্যাপারটা আমার সামনেই ঘটল। আর ঘটল বলেই এই গল্প লিখতে পারছি। একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি যে গল্প আগেকার মতন আর আমার সামনে এসে ধরা দেয় না। আমাকেই গল্পের পেছনে ধাওয়া করতে হয়।

এটা বয়েসের দোষ। বেশি বয়েস হওয়ায় আগেকার মতন আর ঘুরে বেড়াতে পারি না। আগেকার মতন আর সারা রাত আড্ডা দিতে পারি না। স্বাস্থ্যের জন্যে আজকাল সাবধান হয়ে থাকতে হয়। আগে রাত জাগবার ওষুধ খেতে হত, এখন ঘুম আসবার ওষুধ খেতে হয়।

বয়েস যতই বাড়ে ততই অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার ফুরোতে থাকে, মূলধন কমে আসে। তখন স্বল্প মূলধনটাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বার-বার নাড়া-চাড়া করতে হয়। কিন্তু তাতে পাঠক অখুশী হয়। যারা একদিন আমার গলায় ফুলের মালা দিয়েছিল, তারাই আবার তখন মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এই-ই হচ্ছে চিরকালের নিয়ম : এই নিয়মেই বরাবর সংসার চলে আসছে।

ঠিক এই কারণেই পীতাম্বর চৌধুরীর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। পীতাম্বর চৌধুরীর বয়েস আশি বছর। অতি বৃদ্ধ মানুষ। ঘুরতে ঘুরতে তাঁর কাছেই গেলাম। জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন, অনেক ভুগেছেন। অনেক শিখেছেনও।

আমাকে দেখে পীতাম্বরবাবু অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন।

বললেন—তুমি ? কি দরকার বাবা ?

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম—দরকার না থাকলে কি আপনার কাছে আসতে নেই ?

পীতাম্বররাবু বললেন—সে কি কথা বাবা ! তবে দরকার না থাকলে ত বুড়ো মানুষের কাছে কেউ বড় একটা আসে না। আর বাবা, আমারও এমন স্বাস্থ্য নেই যে সকলের কাছে গিয়ে গল্প করি—

বললাম, অনেক দিন পরে হঠাৎ মনে হল আপনাকে আর রাস্তায় দেখি না; তাই এলাম—

আসল উদ্দেশ্যটা গোপন করে রাখলাম। সোজা-সুজি যদি বলি যে তাঁর কাছে একটা গল্প খুঁজতে এসেছি তা হলে পীতাম্বরবাবু আড়ষ্ট হয়ে যাবেন, আর গল্প বেরবে না।

জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বাবা কেমন আছেন ?

বললাম। তারপর আত্মীয়-স্বজন যতজনকে চিনতেন সকলে কেমন আছে সমস্ত খবর নিলেন। তারপর বললেন—পৃথিবীটা একেবারে বদলে গেল বাবা, মনে হয় যেন সে পৃথিবী আর নেই। সেদিন ভদু বলছিল···ভদুকে তুমি চেন ত ? আমার নাতি···

রললাম, খুব চিনি, আপনি বলুন না—

—ভদু বলছিল, বেগুনের সের নাকি দেড় টাকা···

বললাম, সে ত সবাই জানে !

—কিন্তু আমি জানতাম না বাবা। আমরা ত দেখছি এক পয়সা সের বেগুন হত, তবু বেগুন আমরা খেতাম না। শুনছি নাকি সেই বেগুন নিয়েই এখন কাড়াকাড়ি পড়ে যায় বাজারে—

বুঝলাম পীতাম্বরবাবু পুরণো কথা শোনাতে চাইছেন। আরো বুঝলাম, আমার মত উৎসুক শ্রোতা তাঁর কপালে সাধারণতঃ জোটে না। আমি আর বাধা দিলাম না।

বললাম, আপনারা ত ভাগ্যবান মানুষ, জ্যাঠামশাই—

—হ্যাঁ বাবা, তা যা বলেছ, তোমরা এখন যে-পৃথিবীতে আছ এ আমাকে আর বেশি দিন দেখতে হবে না, এইটেই সৌভাগ্য। এখন যত শিগ্‌গির যেতে পারি ততই মঙ্গল। সেদিন তোমার জ্যাঠাইমা বললেন···

কোন্ জিনিষের কি দাম বেড়েছে এবং আগে কি দাম ছিল, তারই পুরণো সব প্রসঙ্গ তুলতে লাগলেন পীতাম্বরবাবু। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। চাকর এসে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। তাঁর কথার আর শেষ নেই তখন। তাঁর যৌবনে তিনি কি করেছেন, তখন কি রকম দিনকাল ছিল সেই গল্পই গড়-গড় করে বলে চলেছেন।

এক ফাঁকে বললাম—আরও বলুন জ্যাঠামশাই, শুনতে খুব ভাল লাগছে—

—শুনতে তোমার ভাল লাগছে! বল কি?

বললাম, হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, পুরণো দিনের কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।

—পুরণো দিনের কথা তোমার শুনতে খুব ভাল লাগে? কিন্তু কই, তোমার আগে আর কেউ ত আমার কাছে পুরণো দিনের কথা শুনতে চায় নি? পুরণো কথা ত আমার অনেক মনে আছে।

বললাম, বলুন না জ্যাঠামশাই।

পীতাম্বরবাবু বললেন, কিন্তু সে-সব কথা তোমাদের ভাল লাগবে কেন? তোমাদের কম বয়েস—

বললাম, না জ্যাঠামশাই, আমার অনেক বয়েস হয়েছে।

—কত, তোমার বয়েস হল কত?

—চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছি।

—ফুঃ—

একটা ফুঁ দিয়ে তিনি চল্লিশ বছর বয়েসটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিত করলেন।

বললেন, চল্লিশ আবার একটা বয়েস? চল্লিশ বছর বয়েসে আমি এক দমে চল্লিশ মাইল রাস্তা হেঁটে কাবার করেছি, তা জান? আমার বাড়ী থেকে রেল-ষ্টেশন ছিল আটত্রিশ মাইল রাস্তা। আমি একটা পাকা কাঁঠাল কাঁধে নিয়ে ওই আটত্রিশ মাইল রাস্তা হেঁটে ট্রেণ ধরেছি, তা জান?

তাই ত আমার ভদ্রুকে বলি, বাপু, তোমাদের ত এক-পা চলতে গেলে গাড়ি লাগে, আর আমি? আমাদের কালে গাড়িই ছিল না তা গাড়ি চড়ব কি?

পীতাম্বরবাবুর কথা যেন আর শেষ হতে চায় না।

বুঝতে পারলাম অনেক দিন পরে কথা বলবার মত একটা লোক পেয়েছেন। বৃদ্ধ মানুষ। নড়ে বেড়াবার সামর্থ্য নেই, অথচ কথা শোনাবার স্পৃহা আছে।

কিন্তু বলি-বলি করেও নিজের মনের কথাটা তখনও বলতে পারছি না।

একবার ভাবলাম বলে ফেলি—আচ্ছা জ্যাঠামশাই, আপনি এতদিন বেঁচে আছেন, তাতে বলবার মত কোনও গল্প নেই?

কিন্তু বলতে গিয়েও কথাটা মুখে আটকে গেল।

কেমন করে কথাটা বলি কেবল সেই কথাটাই ভাবতে লাগলাম।

পীতাম্বরবাবু হঠাৎ বললেন, তুমি বিয়ে করেছ বাবা?

কথাটা হঠাৎ কেন জিজ্ঞেস করলেন বুঝতে পারলাম না। আমি তখনও বিয়ে করি নি। কিন্তু এত কথা থাকতে বিয়ের কথাই বা তাঁর মনে কেন উদয় হল তা বুঝতে পারলাম না।

বললাম, না, এখনও বিয়ে হয় নি।

পীতাম্বরবাবু বললেন, তা তোমার দাদার ত বিয়ে হয়ে গেছে।

বললাম, দাদা ত আমার চেয়ে বার বছরের বড়। তার বিয়ে অনেক দিন হয়ে গেছে।

—আর তোমার বোন ক'টি? দু'টি না?

বললাম, হ্যাঁ, তাদেরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দু'জনেরই ছেলে-মেয়ে হয়েছে। একজন থাকে এলাহাবাদে, আর একজন দিল্লীতে।

পীতাম্বরবাবু শুনে বললেন, খুব ভাল বাবা। তা এখন ত আর তোমার ওপর নির্ভরশীল কেউ নেই?

বললাম, আজকালকার ব্যাপার ত জানেন জ্যাঠামশাই, আপনাদের সে-সব দিন আর নেই। এখন বিয়ে করা মানে ভীষণ দায়িত্ব। সে-দায়িত্ব কি বইতে পারব?

পীতাম্বরবাবু বললেন, ওই তোমাদের একটা কথা! বিয়েটা কি শুধু বোঝা? এই যে আমি, আমি কত বছর বয়েসে বিয়ে করেছিলাম, জান?

আমি চুপ করে রইলাম।

পীতাম্বরবাবু বললেন, সতের। সতের বছর বয়েস যখন আমার, তখন আমি বিয়ে করেছিলাম।

বললাম, তখন আপনাদের দিন-কাল অন্য রকম ছিল।

পীতাম্বরবাবু বললেন, না হে না, তখন তিন টাকা মণ চালের দাম ছিল, সেই সে-যুগেও আমরা ভেবেছি দিনকাল যেমন পড়েছে তাতে চালাব কি করে। আমার বাবা আমার ছোটবেলায় বলতেন মনে আছে, দিনকাল বড় খারাপ, চালের দাম তিন টাকা মণ। তারপর আমি যখন আবার বাবা হলাম তখন আমিও আমার ছেলেকে বলতাম, দিনকাল বড় খারাপ, চালের দাম বার টাকা মণ। এখন আমার ছেলে আবার বাপ হয়েছে। সে আবার আমার নাতিকে বলে, এখন দিনকাল বড় খারাপ, চালের দাম তিরিশ টাকা মণ।

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, তা দিনকাল চিরকালই খারাপ থাকবে বাবা, তা বলে কি কারও বিয়ে করা আটকাচ্ছে, না আটকাবে?

পীতাম্বরবাবু নিজের মনেই কথা বলে যাচ্ছিলেন। ভাবলাম, এখানে কোনও আশা নেই। শুধু শুধুই পণ্ডশ্রম। কিন্তু উঠি কি করে? হঠাৎ উঠলে যদি কিছু মনে করেন?

শেষকালে আর কোনও উপায় না পেয়ে বললাম, তা হলে এখন উঠি জ্যাঠামশাই।

পীতাম্বরবাবু বলল, না না, উঠবে কেন বাবা? কোনও কাজ আছে নাকি?

বললাম, না, কাজ তেমন কিছু নেই, তবে আপনার সময় নষ্ট করছি।

পীতাম্বরবাবু বললেন, আমার আবার কাজই বা কি যে সময় নষ্ট হবে, তুমি চা খাও।

তারপর গলা ছেড়ে ডাকলেন, ওরে শশী, শশী।

অনেক ডাকাডাকির পর শশী এল।

পীতাম্বরবাবু বললেন, তোকে কতক্ষণ ধরে ডাকছি, তুই কোথায় থাকিস! দে, বাবুকে এক কাপ চা করে এনে দে। ঠাকুরকে বল্ যেন দেরি না করে।

বললাম, কেন মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া ওদের?

পীতাম্বরবাবু বললেন, কষ্ট আবার কিসের। উনুন ত জ্বলছেই দিনরাত, এক কাপ চা করে দিতে আর কত সময় লাগবে।

তারপর বললেন, তা শোন, কি কথা বলছিলাম এতক্ষণ ?

আমি মনে করিয়ে দিলাম। বললাম, বলছিলেন আপনি সতের বছর বয়েসে বিয়ে করেছিলেন।

পীতাম্বরবাবু বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, এই যে দেখছ আমি এই বাড়ী-গাড়ি সব করেছি, এতে আমার কিছু বাহাদুরি নেই বাবা। আমার এক কণা বাহাদুরি নেই, সব তোমার জ্যাঠাইমার জন্যে। তোমার জ্যাঠাইমা না থাকলে এ সব কিছুই হত না। আমি নিজে পয়সা-কড়ি যা-কিছু উপায় করেছি, সব তোমার জ্যাঠাইমার হাতে এনে তুলে দিয়েছি, আমার নিজের কিছু বাহাদুরি নেই।

ততক্ষণে চা এসে গিয়েছিল।

পীতাম্বরবাবু বলতে লাগলেন, নাও, চা খেয়ে নাও, তা স্ত্রীকে সেই জন্যেই ত শাস্ত্রে সহধর্মিণী বলেছে। অর্থাৎ যার সঙ্গে ধর্মাচরণের সম্পর্ক! তুমি ত তোমার জ্যাঠাইমাকে দেখেছ? উনি সেই টাকা জমাচ্ছেন না খরচ করছেন তা নিয়ে কখনও ওঁর কাছে আমি জবাবদিহি চাই নি, আর উনিও তেমনি সহধর্মিণী···

হঠাৎ জ্যাঠাইমা ঘরে ঢুকলেন।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম।

বললাম, কেমন আছেন জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা পীতাম্বরবাবুর দিকে চেয়ে বললে, কি কথা হচ্ছিল আমাকে নিয়ে ?

পীতাম্বরবাবু বললেন, এই তোমার কথাই বলছিলাম। আমি ওকে বিয়ে করতে বলছিলাম। ও বললে কি না যে বিয়ে করে, সংসার চালাবার ক্ষমতা নেই ওর। তা আমি বলছিলাম, আমারই কি ক্ষমতা ছিল? তাইতে তোমার কথা উঠল।

তারপর আমার দিকে চাইলেন পীতাম্বরবাবু।

বললেন, জান হে, স্ত্রী হল সহধর্মিণী। হাজার তোমার টাকা থাকুক, হাজার তোমার খ্যাতি-প্রতিপত্তি থাকুক, ঘরে সহধর্মিণী না-থাকলে কিছুই কিছু নয়।

জ্যাঠাইমা আর দাঁড়ালেন না।

বললেন, আমার এ-সব বাজে কথা শোনবার সময় নেই বাপু, আমি যাই।

পীতাম্বরবাবু বললেন, ওগো, চলে যাচ্ছ কেন, শোন না।

জ্যাঠাইমা ততক্ষণে বাইরে চলে গেছেন।

যেতে যেতেই বললেন, পিন্টুটার জ্বর হয়েছে জান না, তাকে আবার ধরে-বেঁধে সাবু খাওয়াতে হবে।

বলে জ্যাঠাইমা চলে গেলেন।

পীতাম্বরবাবু বললেন, আজকাল আবার তোমরা নিজেরা দেখে-শুনে পছন্দ করে বিয়ে কর, আমাদের সময়ে ত ও-সব বালাই ছিল না। তোমার জ্যাঠাইমার সঙ্গে যখন বিয়ে হল আমার, তার আগে ওর মুখই দেখি নি আমি। কিন্তু কই, কোনও অসুবিধে ত বাপু হয় নি আমার। আমি ওঁকে যেমন ভালবাসা উচিত তেমনি ভালবেসেছি, উনিও আমাকে দেবতা বলে ভক্তি করেছেন। লোকে যেমন ঠাকুরকে ভালবাসে, খাওয়ায়, ভোগ দেয়, তেমনি ভালবেসে এসেছেন।

—আর একটা কথা।

বলে একটু থামলেন পীতাম্বরবাবু। বললেন, আর একটা কথা, স্বভাব-চরিত্রটি ঠিক রাখতে হবে বাপু। এটা সে-যুগেও যেমন সত্যি, এযুগেও তেমনি। ওর আর দু'যুগে দু'রকম হতে নেই। এই ত আমি। আমার কথাই ধর না। তোমার জ্যাঠাইমাকে ত দেখলে। যেদিন থেকে উনি আমার বাড়ীতে এসেছেন সেইদিন থেকেই আমি পরস্ত্রীমাত্রকেই মাতৃবৎ জ্ঞান করেছি। আজ না হয় বুড়ো থুথ্‌ড়ো হয়ে গিয়েছি। কিন্তু চিরকাল ত আর···

আমি উঠি-উঠি করতে লাগলাম। বুড়ো মানুষের কাছে আমি এসেছি গল্পের প্লটের আশায়, আর উনি শোনাতে লাগলেন উপদেশ!

আবার বললাম, তা হলে এবার উঠি জ্যাঠামশাই।

পীতাম্বরবাবু বললেন, ওই ত তোমাদের দোষ বাবা, ভাল কথা বললেই তোমরা মনে কর উপদেশ দিচ্ছি। না বাবা, তা নয়, কথাগুলো উপদেশের মত শোনালেও এগুলো চিরকালের কথা, চিরসত্য কথা। চন্দ্র-সূর্য তবু একদিন মিথ্যে হয়ে যেতে পারে বাবা, কিন্তু এসব কথা আর জীবনে মিথ্যে হবে না, তা জেনে রেখ।

বললাম, না, তা বলছি না, আমার এক জায়গায় যাবার কথা এখন, আমি উঠি, নইলে দেরি হয়ে যাবে।

আমি তাড়াতাড়ি সরে পড়তে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ বাড়ীর একজন চাকর একটা চিঠি নিয়ে এল।

—এটা কার চিঠি দেখ ত বাবা?

আবার দাঁড়াতে হল, দেখি এক্সপ্রেস চিঠি একখানা। জ্যাঠামশাইএর নামে। পিওনের কাগজে সইও দিয়ে দিলাম।

জ্যাঠামশাই বললেন, আমার নামে আবার কে এক্সপ্রেস চিঠি দেবে বাবা, তা ত বুঝতে পারছি না। অন্য কারু নয় ত?

বললাম, না, খামের ওপরে ত আপনারই নাম লেখা রয়েছে।

—তা হলে পড়ে শোনাও ত বাবা, কি লিখেছে?

আমি খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেললাম।

জ্যাঠামশাই উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন। তাঁর যেন আর তর্ সইছিল না।

বললেন, কে লিখেছে?

আমি চিঠির নীচেয় লেখা নামটা পড়লাম, দ্বিজকান্ত ত্রিবেদী।

—দ্বিজকান্ত ত্রিবেদী, সে আবার কে রে বাবা, আচ্ছা ত পড়ো, পড়ো—পড়ো কি লিখেছে আমাকে।

আমি পড়তে লাগলাম:

"মান্যবরেষু,

আপনি আমাকে চিনিতে পারিবেন না। আমি হৃষিকেশ নামক স্থানের একটি আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা। এই আশ্রম লইয়াই আমার দিন কাটে। সম্প্রতি একটি বিশেষ কারণে আমি আপনাকে এই পত্রটি লিখিতেছি। শ্রীমতী বসনবালা দেবী আপনার বিবাহিতা স্ত্রী। শ্রীমতীর মুখেই শুনিয়াছি আপনি তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন আপনার পিতা-মাতার বিনা অনুমতিতেই। তাহাতে আপনার পিতা-মাতা আপনার উপর ক্রুদ্ধ হন। উক্ত কারণেই আপনি পিতৃ-মাতৃ আজ্ঞায় আপন ধর্মপত্নীকে পরিত্যাগ করেন। শ্রীমতী সেই অবস্থায় বহুকাল মৃত-কল্প জীবন যাপন করিয়া অবশেষে আমার আশ্রমে আশ্রয় লন। গতকল্য সতীসাধ্বী রমণী ঈশ্বরোচিত ধামে গমন

করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আপনাকে এই সংবাদ দিতে বলিয়া আপনার ঠিকানাও জানাইয়া গিয়াছেন। তিনি আরো জানাইয়াছেন যে, তাঁহার যাহা কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি সমস্তরই তিনি আপনাকে উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন। আপনার সুযোগ-সুবিধামত এখানে আসিয়া একদিন দলিল-পত্র লইয়া যাইবেন বা পুত্র-কলত্র কাহাকেও পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার সম্পত্তির মূল্য প্রায় তিন লক্ষাধিক। ইতি—

সাং—হৃষিকেশ

ভবদীয়

দ্বিজকান্ত ত্রিবেদী।

আমার হাতটা তখন থর-থর করে কাঁপছিল। আমি চিঠিটা তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে রেখেই চলে এলাম। জ্যাঠামশাই-এর দিকে আমার চেয়ে দেখতেও ভয় হচ্ছিল। কোথা দিয়ে কখন পীতাম্বরবাবুর বাড়ীর সদর গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসেছিলাম তা আজ আর মনে নেই।

পরে শুনেছি ডাক্তার এসেছিল। ভাল করে হার্ট পরীক্ষাও করেছিল। কিন্তু না, পীতাম্বরবাবু সেইদিন রাত এগারটার সময় শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

আমরা তাঁর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছি।

অনেকে তাঁর নাতিদের জিজ্ঞেস করেছিল, শেষ সময়ে কি হয়েছিল তোমার দাদুর?

ভদু বলেছিল, কি জানি, কিছুই বুঝতে পারা যায় নি। দাদু খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ দিদিমার নজরে পড়ে তিনি আর নেই।

লোকে শুনে বলেছিল, আহা, পুণ্যাত্মা লোক ত, তাই মৃত্যু-যন্ত্রণাটাও তাঁকে পেতে হল না।

পীতাম্বরবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আর নাতিরা বিরাট বাড়ী তৈরি করেছেন। আরো সম্পদ বেড়েছে, আরো সম্পত্তি, আরো সম্পত্তি। লোকে বলে, এ সমস্তই পীতাম্বরবাবুর আশীর্বাদের ফল। তাঁদের সেই নতুন বাড়ীর নাম দেওয়া হয়েছে—পীতাম্বর ভবন।

আমি আজও মাঝে মাঝে ভাবি—ভাগ্যিস সেদিন কেউ জানতে পারে নি। জানতে পারে নি যে আমি এক্সপ্রেস-চিঠিটা পড়েছিলাম!

—৩—

রাতে-ওড়া পাখী

শ্রীকৃষ্ণধন দে

রাতে-ওড়া পাখী,
খুঁজে ফের তুমি কারে ?
ঘুমের নেশা কি
নামেনি তোমার চোখে ?
লঘু মেঘে-ঢাকা
চাঁদ ডাকে বারে বারে,
চলেছ কি তাই
সেই অভিসারলোকে ?
ডানার ঝাপটে
আকাশ চমকি ওঠে,
ঊষা এল ভাবি'
ভুল ক'রে ফুল ফোটে !

রাতে-ওড়া পাখী,
কার লিপি বাও বহি ?
আকাশ-সাগরে
কালো বুদ্বুদ জাগে,
কোন্ পলাতকা
তোমারি আড়ালে রহি'
নিশীথ-বাসরে
প্রিয়-চুম্বন মাগে !
কোথা তুমি যাও
কারো নেই কিছু জানা,
চোখে ভেসে ওঠে
শুধু দু'টি কালো ডানা !

রাতে-ওড়া পাখী,
কেন চোখে নেই ঘুম ?
দূরের বনানী
তোমারে কি ডাকে কাছে ?
পূরব আকাশ
হয়নি ত কুম্‌কুম্‌,
শুকতারা কোথা
আঁধারে লুকায়ে আছে !
যারে তুমি চাও—
দিনে কি পাওনি দেখা ?
হারানো সাথীরে
খুঁজে ফের একা-একা ?

রাতে-ওড়া পাখী,
তুমি যাও কার পাশে ?
তুমি কি বিদেহী
কামনা-ব্যাকুল মন ?
প্রিয়ারে খুঁজিছ
ক্ষণিক দেখার আশে,
ছায়া-কায়া ধরি
সারা নিশি অনু'খন ?
দিনের আলোকে
কোথায় লুকায়ে রও,
রাতের আঁধারে
ভুলে-যাওয়া কথা কও !

রাতে-ওড়া পাখী,
শঙ্কিতা বিভাবরী
চলেছে তাহার
রহস্যজাল বুনি' !
অনাদি অতল
মহাকাল-পথ ধরি'
নিবিড় আঁধারে
প্রতিমুহূর্ত গুণি !
ডানার ঝাপটে
সে গণনা কৌতুকে
তুমি কি লিখিছ
আকাশ-পাতার বুকে ?

রাতে-ওড়া পাখী,
তুমি কি প্রেমিক কবি,
পাখার ছন্দে
লিখে যাও লিপিগুলি ?
তন্দ্রাকাতরা
বিবশা ধরার ছবি
চুরি ক'রে দেখে
মনোপটে লও তুলি ?
তুমি কি দেখিছ
কার লাগি পথ চেয়ে,
কাঁদে মালঞ্চে
রজনীগন্ধা মেয়ে ?

রাতে-ওড়া পাখী,
সাথী করে নেবে মোরে ?
—ছুটিব মথিয়া
মহাকাল-পারাবার ;
ছায়াপথ মোরে
বাঁধিবে স্নেহের ডোরে,
ধ্রুবতারা মোরে
জানাবে কাহিনী তা'র !
কালপুরুষের
দুলিয়া উঠিবে অসি,
মুক্তা গড়িবে
স্বাতীর অশ্রু খসি !

রাতে-ওড়া পাখী,
রূপময়ী ধরণীরে
ছেড়ে যেতে চাও ?
মুছে দেবে ভালবাসা ?
যেতে চাও উড়ে
শত বন্ধন ছিঁড়ে
ফেলে রেখে পিছে
জীবনের কাঁদা-হাসা ?
মাটির পৃথিবী
তবু-যে আপন ক'রে
স্নেহনীড়ে চায়
তোমায় রাখিতে ধরে !

স্বপ্ন সাগর

শ্রীশান্তিময় গুহ

একটা দুঃসাহসী অভিযান কর
আমি সাথী হব ;
ঘরের মাটি মেখেছে অন্ধকার মৃত্যুরশ্মি

মৃত-পিতা প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তমান দিন
ফেরায়নি কাহাকে
মৃত্যুকে করেনি প্রতিবাদ ;
চৈত্রের ঘাসে দেনাদার মাটি
খবর দেয়নি
কবেকার ইতিহাস।

সাহসী
টুকরো খবর
বন্দী একমুঠো জমি
বহন করে আছে
কত-কার বহ্নি,
দলবদ্ধ হাতে সবিতার ছবি।

যুদ্ধের প্রহরে দাঁড়িয়ে আছে
আমার অবশেষ,
দাও এবার আদেশ ;
তাপকণ্ঠে আলোড়িত
উৎসবের সর্বশেষ—
শিশুমুখ অশেষ।

তখন ফুল ফোটে

শ্যামসুন্দর দে

ফুলদানীতে ফুলেরা রাখা
কুঁড়িগুলো নতমুখে
বাতাসে সুরভি ঢেলে তুমি যখন দাঁড়ালে
যত্নে প্রসাধন চিহ্ন এঁকে
তখন দেখি আমার কুঁড়িগুলো
প্রস্ফুটনে কৃপণতা করে।
তুমি যখন দুয়ারে এলে
মায়াবী স্বপ্নকাজল চোখে নিয়ে
অনেক স্বপ্নের দেশ ঘুরে ক্লান্ত হয়ে
বলেছিলে একটুকু বসি
কুঁড়িগুলো নীরবতা ভাঙেনি তখনো।
তারপরে চলে গেলে
দু'হাতে বিছিয়ে দিলে ঘরের দরজা
অচিন হাওয়া এসে ভিড় করে ঘরে
তখন দুয়ারে দেখি তুমি এলে ফিরে
অনেক মানুষে ভরা পথ থেকে
জীবনকে খুঁজেপেতে নেই আর প্রসাধন
দুপুরের রোদে মুছে গিয়েছে কাজল
ধীর পায়ে এলে তুমি ঘরে
তখন বিস্ময়ে দেখি কুঁড়িগুলো প্রস্ফুটিত
সুরভি বাতাসে ঘর ভরা
কুঁড়িগুলো ফুটে ফুল—ভালবাসা।

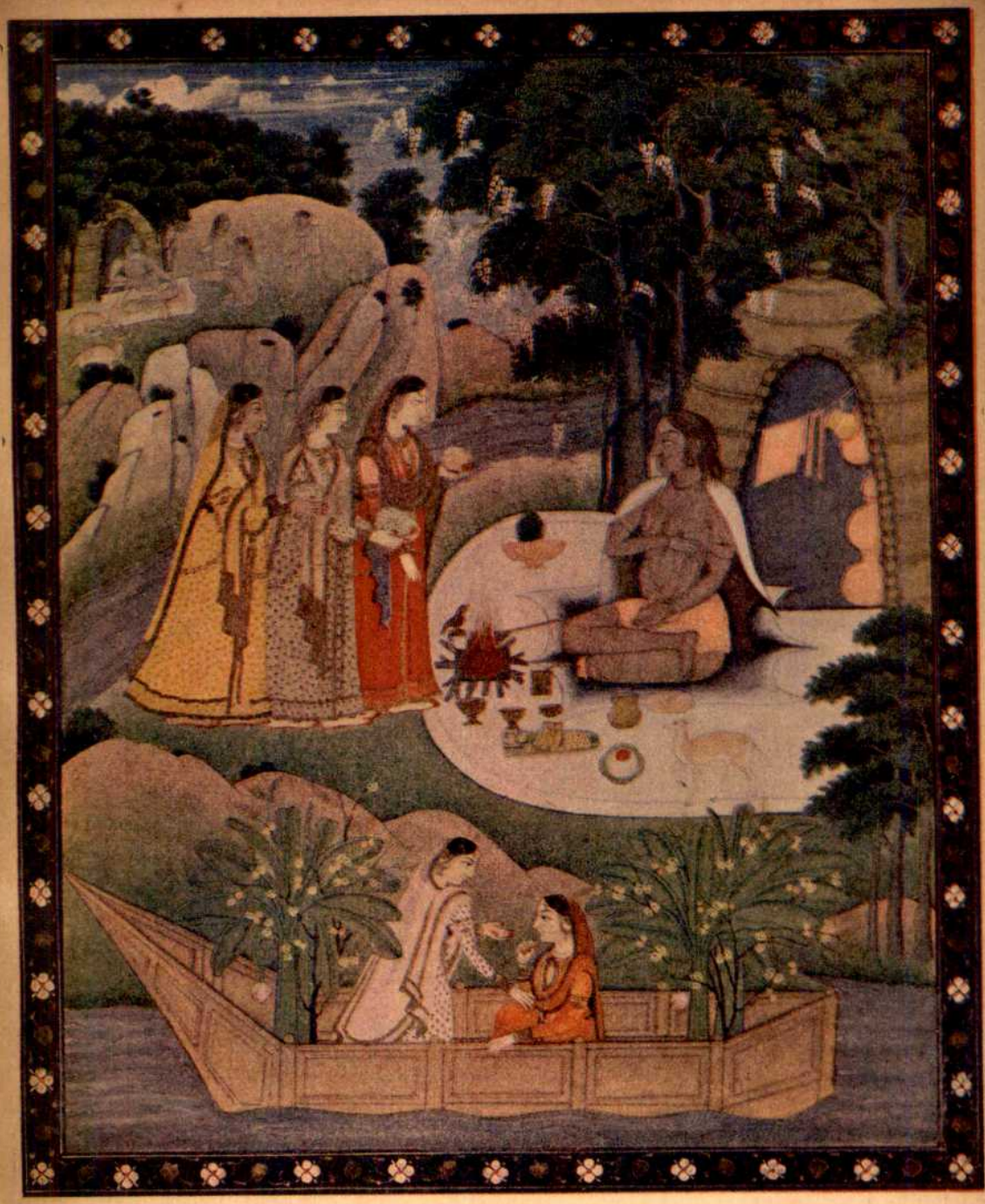

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সাধু সন্দর্শনে

(প্রাচীন কাংড়া চিত্র)

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

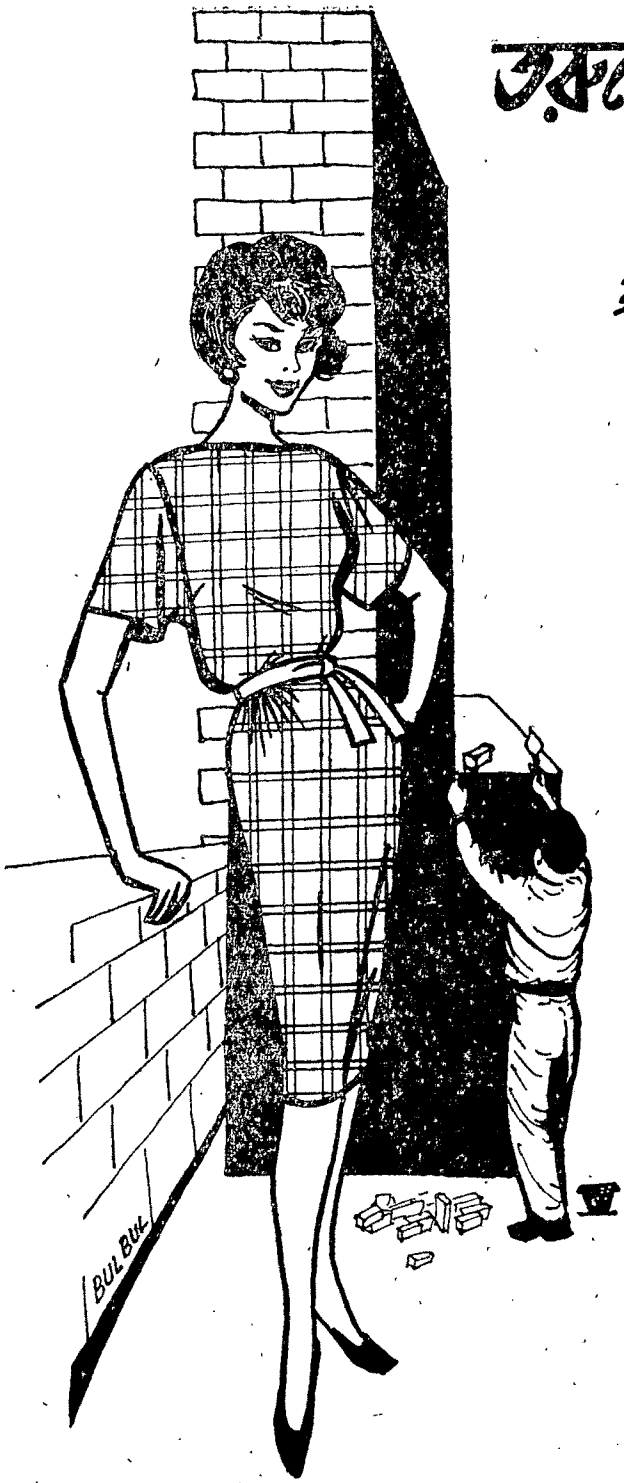

তরুণের দিনপঞ্জী

(উইলি ব্রেডেল)

অনুবাদিকা

গীতা মুখোপাধ্যায়

[উইলি ব্রেডেলের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি বিপ্লবী নায়ক। মানুষের মুক্তি সংগ্রামের সহায়তায় তাঁর লেখনী এবং তরবারি দুই-ই ক্ষুরধার। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মান স্পার্টাকুস লীগের সদস্য হিসাবে তিনি হামবুর্গের ধাতুশ্রমিকদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেছিলেন, আবার স্পেনের গৃহযুদ্ধে তিনি ছিলেন থেলমান ব্রিগেডের রাজনীতিক উপদেষ্টা। ষ্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে হিটলারবাহিনীর বিপক্ষে লড়ে তিনি পেয়েছিলেন স্বর্ণপদক। নিরবচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক সংগ্রামে বার বার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে। কি কারাকক্ষে, কি রণক্ষেত্রে লেখনী তাঁর সদাই সচল থেকেছে। গণতান্ত্রিক জার্মানীতে তাঁর উপন্যাস বারে বারে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। "তরুণের দিনপঞ্জী"—"ক্রনিকল অব ইয়ুথ" নতুন জার্মানীর যুবজীবনের প্রতিচ্ছবি-সমন্বিত ব্রেডেলেন একটি ছোট গল্প।

—অনুবাদিকা]

তখন প্রায় রাত ৯টা। মাঠ থেকে ঘরে ফিরেছে গরুর পাল। চাষীরা শেষবারের মত চক্কর দিচ্ছে। আণ্টন ক্রাউজিক অনেক দেরি পর্যন্ত মাঠে ছিল। পাথর-বাঁধান গ্রামের পথ দিয়ে ঘোড়া দুটোকে টানতে টানতে সে ঘরে ফিরছে। ঘোড়ার গলা থেকে আলগা শিকলগুলো পাথরের উপর ঠং ঠং আওয়াজ তুলছে। পাহাড়ের উপর আকাশ ছেয়ে জলভরা কালো মেঘের ঘনঘটা। কেউই কিন্তু সন্দেহ করে নি কি আসছে, কারণ থুরিঙ্গিয়ার পাহাড় এবং হারৎস পর্বতের মাঝখানের এই উপত্যকায় বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় প্রায় লেগেই থাকে। প্রথম পশলা বৃষ্টির পর শিল পড়তে সুরু করল, বিরাট বিরাট আকার—দেখে ভয় লাগে, একেবারে রক্ত বরফের চাঙড়া। চালের উপর দিয়ে খড়খড়িয়ে নেবে এসে জানলার কাচে খটাং খটাং করে পড়তে লাগল শিলগুলো। তবে মে মাসে শিলাবৃষ্টিতে উন্নষ্ট উপত্যকার চাষীরা অভ্যস্ত, কাজেই অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হল না কেউ। তারপর হঠাৎ উপর আকাশের দুইপুঞ্জ মেঘের মাঝখান দিয়ে বিপুল জলধারা নেবে এল। প্রচণ্ড বেগে ফুলে ফেঁপে উঠল বন্যার জল, খরস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল গাছ আর বেড়া। গ্রামে ঢুকে প্রথম বাড়ীগুলোর কুটির, সদর ঘর, আঙ্গিনা সব ভাসিয়ে ছুটতে লাগল গ্রামের ঢালু দিকে। পথে পড়ল যত মাটির ঘর আর চালা এবং সময় মত স্থানান্তরিত হ'তে না পারা যত পশু ও মানুষ—তাদেরও মুছে নিয়ে চলল বন্যাস্রোত।

অবিশ্রাম বর্ষণ আর শিলাবৃষ্টি চলল প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত। সারা গ্রাম ভয়ঙ্কর আর্তনাদে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। মানুষ এবং পশুর ছিন্নভিন্ন দেহ ধ্বসে যাওয়া বাড়ীর বেরিয়ে-পড়া কড়িকাঠে আটকে রইল, এর কেউ হয়ত ডুবে মরেছে কেউবা ধাক্কা খেয়ে। বন্যার জলে ধুয়ে নিয়ে ফেলছে যে বিরাট কাদার স্তূপ তার গভীর থেকে মরা জন্তুর থোঁচা থোঁচা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা যেতে লাগল। ছাদের উপরে কিংবা এখনও দাঁড়িয়ে-থাকা বাড়ীগুলোর চিলেকোঠায় ভয়ঙ্কর শীতল অন্ধকারের মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে কাঁপতে লাগল গ্রামবাসীরা।

প্রতিবেশীর কি হ'ল কেউ জানে না। বিপর্যয় এমন হঠাৎ এসে পড়ল যে কেবল নিজেকে বাঁচান এবং যতটুক পারা যায় সম্পত্তি বাঁচানর কথাটাই ভাবতে পেরেছে মানুষ। বরফের মত ঠাণ্ডা জলস্রোতের ভিতর দাঁড়িয়ে গরু-বাছুর বাঁচানর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছে কেউ কেউ। যেগুলো বেঁচেছে তারাও এখন মালিকের পাশাপাশি ছাদের তলায় জড়োসড়ো হয়ে আছে, ভয়ে কাঁপছে আর গোঙাচ্ছে।

সকাল যখন হল এবং সবচেয়ে সাহসিকেরা যখন কাদার পাহাড় ঘেঁটে পথে বেরোল তখন অবস্থা দেখে তারা একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। উন্মত্ত বন্যাস্রোত শিকড়শুদ্ধ উপড়ে নিয়েছে গাছগুলোকে, মানুষ এবং পশুর উপর গদাবৃষ্টি করেছে গাছ আর পাথর। উঠোনভর্তি কাদার পাহাড়ের ভিতর থেকে আটটা মৃতদেহ উদ্ধার হ'ল। সেগুলো নিয়ে রাখা হ'ল গ্রামের বাইরে উৎরাইয়ের উপর। প্রতিবেশীদের বেদনার মুখোমুখি হ'তে কিংবা নিজেদের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করতে সাহস করল না চাষীরা। সকলের মনের কথা টেনে একজন শুধু বলে উঠল: "আমাদের চেয়ে মরারাই ভাল আছে।"

রাত্রে আশেপাশের সহরগুলো থেকে পুলিশ এবং দমকল ডাকান হয়েছিল। সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারে বরফের মত ঠাণ্ডা পুরু কাদার স্তর ঠেলে, চারিদিকে ছড়ানো কড়িবরগা, গাছপালা, পাথরের বাধা ডিঙ্গিয়ে তারা বিপর্যস্ত গ্রামটাতে এসে ঢুকেছিল। ছাদের উপর অপেক্ষমান কিছু মানুষকে পায়ের তলা থেকে বাড়ীটা ভেসে যাওয়ার

আগে বাঁচানো সম্ভবপর হয়েছিল। উদ্ধারকারীরা ভোরের আগে গ্রামের ঢালু দিকটায় ঢুকতে পারে নি। কারণ মাঝখানে পড়ে ছিল এক বিরাট কাদার পাঁচিল। আরও কিছুর সাহায্য ছাড়া তাকে সরানো অসম্ভব। মৃত ও জীবিত সকলেই বন্দী হয়ে ছিল সেই পাঁচিলের মধ্যে।

সারারাত্রি ধরে ভারী কালো মেঘের দল পরস্পরের পিছনে ধাওয়া করেছে। কিন্তু ভোরের আলো ফুটতে এবং পাহাড়ের পিছন দিয়ে সূর্য উঠতে দেখা গেল নির্মেঘ আকাশ, উজ্জ্বল সূর্যরশ্মি সেই ধ্বংসস্তূপে ও কাদার মরুতে পথ খুঁজে নিচ্ছে। সহায়কদল এতক্ষণে এই বিপর্যয়ের ভয়াবহতা পুরোপুরি দেখতে পেল। বাড়ীগুলোর ধ্বংসাবশেষের উপর লাভার মত ছড়িয়ে পড়েছে কাদার রাশি, পাথরে, কড়িবরগায়, বেড়ায় কণ্টকিত হয়ে ধীরে ধীরে ঢালের দিকে নাবছে সেই কাদার পাহাড়। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত জমিটুকুতে কাল পর্যন্ত পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিয়ে চাষ করছিল যে শত শত চাষী তারা একরাত্রে নিঃস্ব হয়ে গেছে। এদের মধ্যে কারও কারও অবস্থা ভালই ছিল, চমৎকার বারবাড়ী, গোলা, গরুবাছুর, উঠতি ফসল—সবই ছিল তাদের। কিন্তু আজ আর মাথার উপর একখানা ছাদ নেই, একটি গরু বেঁচে নেই।

গোড়ার দিককার জবুথবুকদের ভয় কেটে দেখা দিল সম্পত্তি উদ্ধারের জন্যে মরিয়া চেষ্টা। কর্দমাক্ত পোষাকে, জটপাকানো চুল ঝুলিয়ে, বিকৃতমুখে মেয়েরা গুঁড়ি মারছে পাথর আর কড়িবরগার মাঝখানে; কম্পমান ওষ্ঠাধরে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে সেদিকে, যেখানে কাল রাত্রেও দাঁড়িয়ে ছিল তাদের ঘরগুলো। শবদেহের সারির পাশে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে পড়ছিল তারা। কয়েক ঘণ্টা আগেও এদেরই সঙ্গে তারা কাজ করেছে, ঝগড়া করেছে, হাসিঠাট্টা করেছে। বিদেশীদের দিকে ওরা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। পুলিশ এবং দমকলের লোকেরা কাদা থেকে টেনে তুলছে গরু এবং শূয়োরের আড়ষ্ট শবগুলোকে। মেয়েরা ভাবছে এসবে আর কিই বা লাভ। গ্রামটা তাদের আর গ্রামই নেই, শুধু একটা বিরাট কবরখানা পড়ে রয়েছে। এখন আর কোনও সাহায্যই বাঁচাতে পারবে না তাদের ··

কিন্তু তা ঠিক নয়। সমস্ত ব্রুখ্‌স্টেড গ্রামটা দেখতে দেখতে এক বিরাট নির্মাণস্থলে পরিণত হ'ল। গ্রামটাকে ফের গ'ড়ে তোলবার জন্য নানা রকমের লোক এসে জড়ো হ'ল। দূরদূরান্ত থেকে এসে পড়ল মিস্ত্রির কাজ-জানা লোকেরা। অন্যান্য কারখানার শ্রমিকেরা তাদের ছুটি বাতিল ক'রে এসে হাজির হ'ল সাহায্য করার জন্য। এদের মধ্যে তিরিশ জন এল জেলার ক্রেতাসমবায় থেকে, সকলেই বয়স্ক লোক। তাদের কাজ হ'ল নতুন তৈরী রাস্তার দু'ধারে চাষীদের কুটির গড়ে তোলা। এককালে তারা রাজমিস্ত্রির কাজ করত, ছুতোর ছিল কিংবা জলকলের মিস্তিরি ছিল। দশ বিশ বছর ধরে অন্য কাজ করছে, কেউ অফিসে, কেউ খাজাঞ্চি হিসাবে, কেউ গুদামে। কিন্তু এ বছরে তারা ঠিক করেছে যে ব্রুখ্‌স্টেড গ্রামটিকে গড়ে তোলার কাজেই ছুটিটা ব্যয় করবে।

হাতা গুটিয়ে কাজের লোকের মত তারা বাড়ী তৈরীর জায়গায় ঘোরাঘুরি করছে। তবে এক সময়ে যেমন ক্ষিপ্র ছিল এখন আর ততটা নেই, কারণ অনেকেই মোটা হয়েছে। নতুন করে সুরু করার পক্ষে এ ধরনের কাজ বেশ কঠিন, কিন্তু তারা ছাড়বার পাত্র নয়। কয়েক বছর ধরে ভাটা পড়লেও অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আগেকার কর্মক্ষমতাকে ফিরিয়ে এনে পুরাণো লয়ে কাজ সুরু করল। তার মধ্যে দু'জনকে তৃতীয় দিনে কাজ ছেড়ে দিতে হ'ল। তারা কাজের বোঝাটাকে পুরো বোঝে নি, নিজেদের শক্তিকে বেশী ক'রে দেখেছিল।

তাদের বিদায় দিতে গিয়ে সহকর্মীরা বিদ্রূপ করে: "ওঃ, মনটা বটে চাইছিল, কিন্তু শরীরটা যে বইল না!"

সমবায়ের কর্মী এমিল কুন্‌ৎস্ হ'ল লাঙ্গেনজালৎসার ভাণ্ডাররক্ষক। যৌবনে সে রাজমিস্ত্রির কাজ শিখেছিল। তাকে করা হ'ল "মুক্ত জার্মাণ তরুণ" ব্রিগেডের প্রধান। তাদের উপর ভার পড়েছিল স্কুল বাড়ীটি তৈরী করার। ব্রিগেডের তরুণ উৎসাহীদের কাজ শেখাতে বেশ ভাল লাগছিল কুন্‌ৎস্‌এর। ওদের সঙ্গে থাকতে থাকতে নিজেও যেন আবার যৌবন ফিরে পাচ্ছিল। এত দিনের অনভ্যস্ত কাজও দিনে দিনে সহজ হয়ে আসছিল। পুরাণো বিদ্যা ভোলে নি দেখে স্ফূর্তি হচ্ছিল।

বয়স তার বেশ কিছুদিন হ'ল পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। বেশ একটি নেয়াপাতি ভুঁড়িও হয়েছে। কিন্তু ইট গাঁথায় তার বাস্তবিকই দক্ষতা আছে। যে ভাবে সে কাজ করছে যেন ইটগুলো তার কত বশম্বদ। ছেলেরা ত দেখে অবাক। যেখানে সে যেমনটি চাইছে—সে থান হোক, আধলা হোক—ইটেরা গিয়ে যেন ঠিক তেমনিই বসে পড়ছে। শিকারী বিড়ালের মত চোখ বের করে ওর কাজ দেখে ছেলেরা। ওদের কেউ যখন ওর মত করতে গিয়ে উল্টো মাপের ইট বসিয়ে ফেলে তখন কুন্‌ৎস্ হেসেই খুন হয়।

খোসমেজাজে বলে, "আচ্ছা, এবার দেখ, একেবারে চোখ মারার মত সোজা!" দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিস দেয় তার পর।

"এই যে এসেছ", এমনভাবে কুন্‌ৎস্ বলে যেন তার শিসের জবাবে ছুটে এসেছে ইটখানা, তারপরে হ্যাঁচকা টানে সেটাকে ফুটোর মধ্যে বসিয়ে দেয়। সব বারেই খাপে খাপে বসে যায় ইটগুলো।

জেনা থেকে এসেছে চালাক-চতুর ছোট্ট জেনা। সে বলে, "এ বাপু ম্যাজিক, এর মধ্যে কিছু গূঢ় ব্যাপার আছে।"

"বাঃ, ম্যাজিকে বিশ্বাস কর! তুমি ত দেখছি বেশ রগড়ের 'মুক্ত জার্মাণ তরুণ'!" আবার শিস দিয়ে ডেকে ওঠে কুন্‌ৎস্

"এই যে তুমি, তোমাকেই খুঁজছিলাম!" "আর একটা ইট নিয়ে বাঁকাচোরা কোনটাতে বসিয়ে দেয় সে।

রুডলফ্-এর ক্ষুরধার বুদ্ধি, কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে শিস দিয়েও বাঁকাচোরা কোণটার জন্য ঠিক ইটখানাকে খুঁজে সে পায় না।

ব্রুখস্টেডের অন্য অনেক স্বেচ্ছাসেবকের মত কুন্‌ৎস্‌ও সন্ধ্যার ট্রেণে রোজ বাড়ী ফিরে যেত। একদিন স্টেশনে যাবার পথে পেট্রা তাকে ধরে ফেলল। পেট্রা যখন বলল যে চিরকাল এই ফাইফরমাশ খাটার কাজে থাকতে চায় না তখন বেশ একটু অবাক হয়ে গেল কুন্‌ৎস্। সেও ছেলেদের মত ইট গাঁথতে চায়। কুন্‌ৎস্-এর দলে ভর্তি হয়ে ইট গাঁথা শিখতে দেওয়ার জন্য সে অনুরোধ-উপরোধ করতে থাকে।

কুন্‌ৎস্ প্রায় তিরিশ বছর হ'ল তার ইউনিয়নের সভ্য এবং সমবায় সমিতিতেও বেশ কয়েক বছর কাজ করেছে, কাজেই নিজেকে সে বেশ আধুনিক বলেই মনে করত, মনে করত নতুন ভাবধারা সে সব সময়েই গ্রহণ করতে প্রস্তুত, অবশ্যই মেয়েদের সমান অধিকারকে সে ভাল জিনিস বলেই মনে করেছে, এর বিরুদ্ধে বিতর্ক তোলার কথা কখনও ভাবে নি। কিন্তু তা বলে সব জিনিসের ত একটা সীমা আছে, মেয়ে রাজমিস্তিরির কথা কে কবে শুনেছে? মন্দ তামাসা নয় যা হোক! মেয়েরা প্রায় যা চায় তাই হ'তে পারে, তারা ডাক্তার,

উকীল, কূটনীতিবিদ, শিক্ষক এমনকি মেয়ে পুলিশও হতে পারে—আর স্টেনোটাইপিস্ট, সেক্রেটারি, দোকান কর্মচারী ইত্যাদির ত কথাই নেই—কিন্তু ইটের মিস্তিরি? না, না, এ বড় বাড়াবাড়ির কথা—কুন্‌ৎস্ মনে মনে ভাবে।

"দেখ মালক্ষী, ও কথাটা তুমি ভুলে যাও।" স্বাভাবিক খোসমেজাজ ছেড়ে গর্জন করে ওঠে কুন্‌ৎস্। "ইট গাঁথা? বিলকুল ভুলে যাও, তা হ'লে আমাদের তোমায় রাজমিস্তিরিণী বলে ডাকতে হবে? বা, বা, রগড়ের কথা বটে!"

পেট্রার বাকরোধ হ'ল। তার পক্ষে নির্বাক হওয়া গুরুতর ব্যাপার, কারণ কথার কখনও অভাব হ'ত না তার। কুন্‌ৎস্‌কে হেসে খুন হ'তে দেখে নিতান্ত অবাক হয়ে পেট্রা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। কথার জন্য হাতড়াতে হাতড়াতে সে ঢোক গেলে তার পর যখন কথা খুঁজে পায় তখন এমন তোড় বইয়ে দেয় যে এবার কুন্‌ৎস্-এর নির্বাক হবার পালা আসে।

"ও, তা হলে এই রকমের লোক কুন্‌ৎস্। এই নিয়ে সে সমবায় সমিতিতে কাজ করে এবং সমাজতন্ত্রী হবার ভান করে। আসলে কেবল একটা প্রতিক্রিয়াশীল বুড়োহাবড়া সে। এই পুরুষত্বের অহঙ্কার নিতান্ত হাস্যকর, এই ধরনের সনাতনপন্থী কথাবার্তা বলার জন্য তার লজ্জা পাওয়া উচিত। আর মিস্তিরিণী বলতে কি বুঝতে চায় সে? মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সকলেই কি তারা পরস্পরের কমরেড নয়? কুন্‌ৎস্ চাক বা না চাক ইট সে গাঁথবেই, কুন্‌ৎস্ তার আপত্তি নিয়ে ধুয়ে খেতে পারে"—এই বলে শেষ করে পেট্রা। তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় সে।

হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোয় এমিল কুন্‌ৎস্—ভাবে, জিভে ধার আছে বটে মেয়েটার! হঠাৎ আবার সে হাসিতে ফেটে পড়ে। হাসির দমকে ভুঁড়িটা তার ওঠানামা করতে থাকে। এত হাসির কারণ হল তার মাথায় একটা মতলব এসেছে—মতলবটা হয়ত তেমন ভাল নয়, কিন্তু বাচ্চাটাকে একটা শিক্ষা দিয়ে দেওয়া দরকার। ও যা করতে চায় তাই করতে দেওয়া হবে। দেখুক ইটগাঁথনির কাজ কি ব্যাপার। যতক্ষণ না মাথা ঘুরে পড়ে ততক্ষণ ওকে ইট গাঁথতে আর কর্নিক ঘোরাতে হবে। হাঁ, হবেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না ও নিজে থেকে এসে ছাড়ের জন্যে কাকুতি-মিনতি করে!

পেট্রা নিজের তাঁবুতে ফিরে গিয়ে তার তিন বান্ধবীকে ঘটনাটার কথা বলে। আশ্চর্যের কথা, বান্ধবীরাও সবাই ওর বিপক্ষে—ইট গাঁথা মেয়েদের কাজ নয়! অনেক রাত পর্যন্ত সবাই মিলে ওরা এই নিয়ে তর্কবিতর্ক করে। ইরমা বলে, পেট্রা পাগল, এরিকা এবং আডাও সায় দেয়। তিনজনেই বলে যে পেট্রা অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা করছে এবং সে যে অন্যদের চেয়ে ভাল এই সে প্রমাণ করতে ও জাহির করতে চাইছে।

পেট্রা কিন্তু নিজের মতই আঁকড়ে থাকে। ওদের তিনজনকে সে ঠাট্টা করে ভীরু বলে আর আদ্যিকালের ধারণা পুষে রেখেছে বলে। ওকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলে অভিযোগ করা নিতান্ত ছেলেমানুষের মত কথা, হাস্যকর! এ কথা তারা বলতে পারত যদি ধর সে মাদাম কুরীর মত একজন বৈজ্ঞানিক হ'তে চাইত। কিন্তু সে ত চাইছে মাত্র ইট গাঁথা শিখতে। এমনিতেই ত বাড়ী তৈরীর জায়গায় কাজ করছে, তা হ'লে ভাল করে শিখবে না কেন? এর সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা জাহির করার কি যে আছে তা সে বুঝে উঠতে পারে না। বান্ধবীরা কিন্তু তাদের প্রতিবাদ বজায়ই রাখে—ইট গাঁথনি মেয়ের কাজ নয়। বেজায় পরিশ্রমের কাজ। এ কাজ আসলে পুরুষের।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে পেট্রা। বান্ধবীদের আপত্তি তাকে বিচলিত করে, সে ভাবতে থাকে, সত্যিই কি এ তার একটা সাময়িক খেয়াল নাকি?···অবশ্য সারা জীবন ধরে ইট গাঁথবার কথা সে ভাবছে না। কিন্তু এই ক্রথস্টেডে থাকতে থাকতে সত্যিই সে কাজটা শিখতে চায়। এমন একটা কাজ সে করতে চায় যা করেও আনন্দ আছে, আবার যাতে উপকারও হয়। তার মনে হয় আপন হাতে মানুষের ঘর গড়ার কাজে সাহায্য করতে পারলে চমৎকার লাগবে। ঘরের লোকেরা সেই ঘরকে ভালবাসবে, সেখানে আরাম পাবে···

দোকানে কাজ সুরু করার আগে সে বরাবর অফিসে কাজ করেছে। অফিসে সে চিঠি টাইপ করেছে, অন্যলোকের চিঠির উত্তর দিয়েছে—সে সব চিঠির বিষয়বস্তুর মধ্যে তার আগ্রহ জাগাবার মত কিছুই থাকত না। সে পরিসংখ্যান সঙ্কলন করেছে কিন্তু জানে নি সেগুলো কি উপকারে লাগবে। এখানে এই ক্রথস্টেডে জীবনে প্রথম বাস্তবে কিছু গড়ে তোলার কাজে সে সাহায্য করতে এসেছে। এখানে যা গড়ছে তা ধরাছোঁয়ার মধ্যে, চোখের উপর দেখা যায়। চারাগাছের মত দিনে দিনে বাড়তে দেখা যায়। আগের যে কোনও কাজের চেয়ে এতে সে বেশী আনন্দ পাচ্ছে।

যাই হোক, সকালে যখন তার ঘুম ভাঙ্গল তখন ইট গাঁথার মিস্তিরি হবার পরিকল্পনা বাতিল করার সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। তাকে সেই ফাইফরমাশ খাটার কাজই করতে হবে। অবশ্য সেটারও দরকার আছে—এই বলে সে নিজেকে বোঝায়।

ইতিমধ্যে এমিল কুন্‌ৎস্ ব্রিগেডের নেতা মার্টিনকে এবং যুবদলের সংগঠক হান্স-অটোকে পেট্রা হারম্‌স্‌এর প্রস্তাবের কথা বলেছে এবং এ বিষয়ে কি করা উচিত সে সম্বন্ধে তার নিজের মতও জানিয়েছে।

মার্টিন একগাল হেসে তৎক্ষণাৎ সায় দিয়েছে, কিন্তু হান্স-অটো সন্দেহ প্রকাশ করেছে। তার নিশ্চিত ধারণা পেট্রা এ কাজ পারবে না।

"অবশ্যই পারবে না", কুনৎস্ জবাব দেয়—"সেই জন্যেই ত আমি অপেক্ষা করে আছি। ওর একটা শিক্ষা হয়ে যাবে।"

"কিন্তু যদি ওর পক্ষে অত্যধিক পরিশ্রম পড়ে যায়, যদি ও অসুস্থ হয়ে পড়ে?" হান্স-অটো আপত্তি করে "জান ত তা হ'লে আমাদের সকলেরই দোষ হবে।"

"না, না, তা হতে দেব না আমি", কথা দেয় কুন্‌ৎস্।

"বেশ, ঠিক আছে, দেখা যাক পরীক্ষা করে—" শেষ পর্যন্ত সম্মতি দেয় হান্স-অটো। তার পর সে পেট্রাকে খবর দেবার জন্য রওনা দেয়।

আগের দিনের অত কাণ্ডের পর এখন যখন হান্স-অটো এসে বলল যে ওরা পেট্রাকে ইট গাঁথার দলে নিতে রাজি হয়েছে তখন পেট্রা বেশ খানিকটা আশ্চর্য হ'ল। কথাটা সে বাস্তবিক চুপচাপই শুনল, কারণ তার মনে হচ্ছিল এর মধ্যে একটা ফাঁদ আছে কোথাও। বাদামী চোখ দুটিতে পরীক্ষকের দৃষ্টি নিয়ে হান্স-অটোকে ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কারণ হান্স-অটো যেন বড্ড বেশী কিছুই হয় নি ভাবে খবরটা দিল।

"এ কার মাথায় খেলল?" জিজ্ঞাসা করল পেট্রা। এদিকে তার বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করছে, নিঃশ্বাস পড়ছে না। হান্স-অটো অবাক হবার ভঙ্গি করে।

"কিন্তু তুমি নিজেই ত কাল রাত্তিরে কুনৎসকে বলেছিলে, তাই না?

"হাঁ, কিন্তু সে ত আমাকে কেবল হেসেই উড়িয়ে দিল।"

"সে যাই হোক, মার্টিনের এবং আমার ধারণা যে প্রস্তাবটা ভাল। কি ভাবে করতে হয় কুন্‌ৎস্‌ তোমায় দেখিয়ে দেবে। ব্যাপার কি? আমি ত ভেবেছিলাম তুমি খুশী হবে।"—হান্স-অটো আবার বলে।

"বটেই ত, খুব খুশী হয়েছি আমি"—তাড়াতাড়ি বলে ওঠে পেট্রা। আর সত্যিই তার খুব আনন্দ হয়েছিল।

তিন দিন ধরে ইট গাঁথার দলে কাজ করছে পেট্রা। সাংঘাতিক কঠিন পরিশ্রম হয়েছে। তবু প্রতিটি দিনই তার বিজয় দিবস।

প্রথম সিফটএর পর তার মনে হ'ল যেন হামাগুড়ি দিয়েও আর তাঁবুতে পৌঁছতে পারবে না এমন অসহ্য ব্যথা হয়েছে শরীরে। ছেলেরা কাজের গতি সাংঘাতিক বাড়িয়ে দিয়েছিল। পেট্রা তবু টিঁকে থেকেছে। কোনও মতে সে তাঁবুতে পৌঁছে যায়। বান্ধবীরা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে প্রথম দিনের ইট গাঁথা কেমন লাগল, তখন সে যথাযথ উৎসাহের ভাব দেখানটা পর্যন্ত উৎরে দেয়।

"কেন, চমৎকার লাগল!"

কিন্তু মনে মনে গজরাতে গজরাতে যখন সে খড়ের গদিতে গা এলিয়ে দেয় তখন তার ব্যথায় চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়।

দ্বিতীয় দিনে সে ভাবতে থাকে লোক না হাসিয়ে ব্যাপারটা থেকে বেরিয়ে পড়া যায় কি করে। অনেকগুলো ভাল ভাল অজুহাত সে ভেবে বের করে। এই দিনের সিফট্‌এর পর তার এমন অবস্থা হ'ল যে ঠাট্টাতামাসা সহ্য করেও ছেড়ে দিতে সে প্রস্তুত। যা হোক, বিশ্রামের পর তার একটু ভাল লাগতে সুরু করল। সে ঠিক মনস্থির করে উঠতে পারল না। পিঠে এবং গায়ে এমন ব্যথা যে একলা তাঁবুতে থাকলে ব্যথার জ্বালায় কাঁদতে ইচ্ছে হয়। তার ওপর হাত দুটোও আছে। হাত যদি তার মোটা দস্তানা পরা না থাকত তা হ'লে বোধ হয় চেটোতে চামড়া বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু হাঁটুতে যে মারাত্মক খিল ধরছে তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ত কোনও উপায় নেই।

"কাল আর আমি যেতে পারব না, কিছুতেই পারব না"—মনে মনে ভাবে পেট্রা—"ওরা হাসবে তা হাসুক, আমার আর সম্ভব নয়, এই হ'ল কথা।"

এইভাবে মনস্থির করে তার অনেকটা ভাল লাগে, তার পর সে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু পরদিন সকালে আবার বাক্যব্যয় না করে সে অন্যদের সঙ্গে কাজে যায়, চামড়ার এপ্রন লাগিয়ে কর্নিক হাতে নেয়।

এমিল কুন্‌ৎস্‌ সপ্রশংস কটাক্ষে তাকে লক্ষ্য করে। প্রথম দু'দিনে তাকে কড়া কাজ দিয়েছে। যদিও চাপতে চেষ্টা করেছে তবু তার কাতরানিও কানে গেছে ওর। কিন্তু যখনই ও পেট্রাকে জিজ্ঞাসা করেছে কি হ'ল, তখনই সে ডাঁটের সঙ্গে বলেছে, "কি আবার হবার আছে? কিছুই হয় নি, একেবারেই কিছু নয়, শুধু সে কাজটা এখনও পুরো বাগে আনতে পারে নি, অনেক বেশী হাত-পা নাড়াচ্ছে এই পর্যন্ত।"

"তা শুধু যদি এই হয় তবে শীগগিরই বাগে এনে ফেলতে পারবে—চেষ্টা করে যাও। একটা কৌশল শিখতে সময় লাগে, অভ্যাসের মধ্যে দিয়েই ভাল করে শেখা যায়, বুঝতেই পার।"—পিতৃসুলভ ভঙ্গি করে কুন্‌ৎস্‌।

সে আবার পেট্রাকে দেখিয়ে দেয় কেমন করে সিমেণ্ট পালিশ করতে হয়, কেমন করে কর্ণিক ধরতে হয় এবং কি ভঙ্গিতে খালি হাতটা দিয়ে পরের ইটখানা তুলে যথাস্থানে বসাতে হয়।

"কিন্তু ঠিক ইটখানা খুঁজে ঠিক জায়গায় বসাতে হলে চোখ ব্যবহার করতে হবে তোমাকে। এইখানেই অভ্যাসের দরকার হয়। আসল কথা হল কর্মশক্তির অপব্যয় না করা। কাজটা খেলার মত সহজ হওয়া চাই"—বলে কুন্‌ৎস্‌।

তার এই সব সদুপদেশ শুনে পেট্রা কখনও কখনও বেজায় চটে ওঠে। সে বোঝে যে কুন্‌ৎস্‌ তার সঙ্গে তামাসা করছে। তামাসা আর সহ্য হচ্ছে না তার। কুন্‌ৎস্‌ যত বড় দিব্যি করেই বলুক না কেন সে যে ওকে জ্বালাতন করার জন্য বলছে না, শেখানোর জন্য বলছে, পেট্রা তার একটা কথাও বিশ্বাস করে না। ওর দিকে পিছন ফিরে থাকে, একটা কথাও বলে না। কিন্তু কাজ সে করে চলে।

সে পর্যন্ত সে কাজটাকে বাগে আনে। ব্যথা এবং হতাশা কাটিয়ে ওঠে সে। ষষ্ঠ দিনে সে ছেলেদের সমান কাজ করে। পিঠ, পেশী এবং হাতের কথা সে ভুলেই যায়। শক্ত করে পা ফেলে কোনও মতে সে এগিয়ে যায়, ছেলেরা যখন বিরক্ত করে তখন কনুইএর এক খোঁচায় তাদের সরিয়ে দেয় কিংবা দুই ঘুষি মারার ভান করে। বরাবরই নিজের উপর তার ভরসা ছিল, কিন্তু এখনকার মত এত নিশ্চয়তা কখনও বোধ করে নি। এতটা নিশ্চিন্ত বোধ করে যে সে দলের মধ্যে সেরা ইট-গাঁথিয়ে বিরাটকায় আলফ্রেড এগার্‌স্‌বারগার্‌কে চ্যালেঞ্জ করে বসে। ওর হামবড়াইয়ে বিরক্তি ধরে গিছল তার। ভাল করে না ভেবেচিন্তে পেট্রা বলে বসে যে সপ্তাহের শেষে সেও এগার্‌স্‌বারগার্‌এর সমান কাজ করবে।

সবাই ব্যাপারটাকে একটা মস্ত তামাসা বলে মনে করে আর এগার্‌স্‌বারগার্‌ত সকলের চেয়ে জোরে হেসে ওঠে।

পেট্রা চেঁচিয়ে বলে, "আচ্ছা দেখা যাবে, শনিবারের দিন তুমি হেস, যদি অবশ্য তখনও পর্যন্ত তোমার হাসির অবস্থা থাকে!"

রবিবার ছুটির দিন, সমস্ত তরুণ-তরুণীই সেদিন প্রসাধনে মন দিয়েছে। অবশ্য শিক্ষানবিশ নাপিত এরভিন ছাড়া, সে মেয়েদের সুন্দর করাতে ব্যস্ত। শনিবার সন্ধ্যা ছিল তার ছেলেদের চুল কাটার সময়। সেদিন সে এমিল কুন্‌ৎস্‌এর দাড়ির গোছাও কমিয়ে দিয়েছে—কারণ এমিল কেবল রবিবারেই চাঁচাছোলা থাকত, বুধবারের মধ্যে আবার দাড়ির গোছায় সমস্ত গলাটা ঢেকে যেত তার।

রবিবার সকালটা থাকত মেয়েদের জন্যে। দিনের পর দিন তারা এরভিনকে বিরক্ত করে মারত, তার কৌশলের তারিফ করত। যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত তাদের দিকে নজর দেবার প্রতিজ্ঞা আদায় করত ততক্ষণ ছাড়ত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তারা চুলকাটার চেয়ারে বসত এবং কাঁচি ও চিরুণী নিয়ে এরভিন তাদের সামনে হাজির হ'ত তখন কিন্তু তারা এরভিনকে কোনও সুযোগই দিত না তার কৌশল দেখাবার বা তার নিজের খুশী মত করবার। কে কি রকম চায় সে সম্পর্কে প্রত্যেক মেয়েরই নিজস্ব ধারণা ছিল এবং কাঁচির প্রতিটি ছাঁট, চিরুণীর প্রতিটি টান হুকুমমাফিক দিতে হ'ত। এরভিন যখন চতুর্থ জনের চুল নিয়ে কাজ করত তখন আর তিনজন তার তদারক করত। কথায়, হাসিতে, আশাভঙ্গের আর্তনাদে চারিদিক মুখর হয়ে থাকত।

রবিবারের দিনটায় সবাইকে নতুন রকম দেখাত। মার্টিন পরত নিখুঁত ভাঁজওয়ালা কালো প্যাণ্ট। সারা সপ্তাহটা ধরে সে প্যাণ্টটাকে ভাঁজ করে গদির নীচে রেখে দিত। আর নীল সার্ট ও হাল্কাধূসর রঙের স্যুট পরে হান্স-অটোকে সত্যিই সুসজ্জিত দেখাত। শুধু স্যুটটার জন্যেই তাকে মার্জিত দেখাত না, যে রকম মর্যাদার সঙ্গে সে পরত তার জন্যও। যদিচ স্যুটটার হাতার দৈর্ঘ্য থেকে মনে হ'ত তার নামকরণ উৎসব এই স্যুটটা পরেই হয়েছিল কিন্তু তাতে কিছু অবস্থার পরিবর্তন হ'ত না। তাকে দেখে গুরুগম্ভীর বৈষয়িক মানুষ ব'লেই মনে হ'ত—বিশেষ ক'রে যে ভাবে সে তার নীল-ধূসর চওড়া টুপীটা চূড়োর মত পরত এবং আশেপাশের সমস্ত হাসিঠাট্টা এবং কানাকানি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাত।

সত্যিই রবিবারটা ছিল অন্যরকম দেখানর দিন। জলের রেশন সেদিন দুগুণ ক'রে দেওয়া হ'ত। ফলে পরনের ঝকঝকে সার্টের মতই ছেলেদের নিজেদের চেহারাও ধোপদুরস্ত দেখাত। তা ছাড়া ছেলেরাও সেদিন রবিবারের বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে মেয়েদের দিকে চাইত।

পেট্রার তরুণ রাজমিস্তিরি বন্ধুরাও রবিবারে তাকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করল। কর্ণ ফ্লাওয়ার-নীল রঙের ব্লাউসে, গাঢ় রঙের খাটো স্কার্টে, কালো মোজায় এবং রিবনে বাঁধা ঘনচুলের গোছায় তাকে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে। এই প্রথম তাদের লক্ষ্যে পড়ল ছোটখাটো মেয়েটি বেশ সুন্দরী, তার কালোচোখে হাসিভরা কটাক্ষের চমক, দস্তরুচি কৌমুদীশুভ্র।

আলফ্রেড এগারস্‌বারগার্‌কে অবশ্য পেট্রা ধরে উঠতে পারে নি, কিন্তু সে বেশ খোসমেজাজে আছে, কারণ বেশ ভালভাবেই কাজ করতে পেরেছে সে। নিজের মনে সে গুনগুন করে সুর ভাঁজছিল, হাসছিল, ঠাট্টাতামাসা করছিল বন্ধুদের সঙ্গে। সেদিন সে প্রসাধনে অনেক সময় নিল এবং বন্ধুদের সপ্রশংস দৃষ্টির জন্যে তৈরী হয়েই এল।

মেয়ে চারটি তাদের কর্মহীন সকালটাকে খেদহীন অলসতায় কাটিয়ে দিচ্ছিল। এক সপ্তাহের কঠোর পরিশ্রমের পর রবিবারই যে সবচাইতে ভাল দিন, এ বিষয়ে তারা সবাই একমত। হাতে হাত ধরে তারা গ্রামটার মধ্যে ঘুরছিল, ছেলেদের সপ্রশংস দৃষ্টিকে উপভোগ করছিল, রসভরে হেসে গড়াচ্ছিল এবং লক্ষ্য করছিল বিগত এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রামের কতখানি নতুন হয়ে উঠল, পুলিশের স্বেচ্ছাসেবকরা কতটা করল, সমবায় সমিতির স্বেচ্ছা-সেবকরা কতটা করল। তাদের স্কুল বাড়ীখানায় আগামী বুধবারের মধ্যে চালের আড়া উঠে যাবে।

নতুন গোলাঘর এবং বা'রবাড়ী শুদ্ধ নতুন খামারবাড়ীগুলোকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। হাল্কা লাল ইটগুলো সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছিল। অন্যান্য নির্মাণস্থলগুলো দেখে মনে হচ্ছিল কে যেন খেলনা ইটের একটা বিশাল বাক্স অসাবধানে উল্টে ফেলেছে

তারপর মেয়েরা চলল অস্থায়ী আশ্রয়বাসী কয়েকটি চাষীপরিবারের খোঁজ-খবর নিতে। খামারমালিক ডিয়েজেলস্টাইনের ওখানে ছিল চারজন। বাচ্চাদের খেলাধূলোর সোরগোলে আঙ্গিনা সরগরম। ডিয়েজেল-স্টাইনের খামারবাড়ীটা ছিল বৃহৎ, গ্র্যাণাইট ভিত্তির উপর তৈরী, ছোটখাট একটা দুর্গের মত। বন্যা তাকে কবলিত করতে পারে নি আর গোলাঘরের গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি ডিয়েজেলস্টাইন নিজেই মেরামত করে নিয়েছিল।

সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে ডিয়েজেলস্টাইন এবং তার দুই ছেলে তাদের বারোটা শূয়োরের মধ্যে চারটে, পাঁচটা গরুর মধ্যে দুটো এবং চারটে ঘোড়াই বাঁচাতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু ডিয়েজেলষ্টাইন একটা স্মৃতিচিহ্নও লাভ করেছিল—সে হ'ল চোয়াল থেকে কপাল পর্যন্ত বিস্তৃত একটি লম্বা কাটা দাগ। জলের দারুণ টান এবং কঠোর শিলাবৃষ্টিতে ভয় পেয়ে গরুটা মাথা দিয়ে গুঁতোতে সুরু করেছিল এবং শিংয়ের ঘায়ে ডিয়েজেলষ্টাইনের খুলিটাই

প্রায় কাটিয়ে ফেলেছিল। যদি তার বড় ছেলে এই সময় এসে পড়ে তাকে জল থেকে টেনে না তুলত তা হ'লে গরুর সঙ্গে সেও ডুবে মরত।

কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলো সম্বন্ধে ডিয়েজেলস্টাইনের ভাণ্ডারে অনেক আশ্চর্য গল্পও জমা ছিল। তার শূয়োরগুলোর মধ্যে একটা জলে ভেসে গিয়েছিল। সে দেখতে পাচ্ছিল জানোয়ারটা বন্যাস্রোতের বিরুদ্ধে মরিয়া হ'য়ে পা ছুঁড়ছে। পরের দিন যখন তারা জলে ডুবে-মরা জন্তুগুলোকে জড়ো করল তখন তার শূয়োরটার খোঁজ পাওয়া গেল না। পরের দিনও যখন সেটা ফিরল না, তখন ওরা তাকে হারিয়ে গিয়েছে ব'লেই ধরে নিল। চারদিন পরে কিন্তু আবার সে আঙ্গিনায় এসে উপস্থিত হ'ল খোসমেজাজে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে। চারদিন যে ওটা কোথায় ছিল তা ডিয়েজেলষ্টাইন আজও জানতে পারে নি।

আর একটা গল্প সে বলে তার প্রতিবেশীর ষাঁড় সিজার সম্পর্কে। চালার মধ্যে যখন জল ঢুকে পড়ল তখন বাঁধন ছিড়ে সহজাত প্রবৃত্তিবশে গ্রামের বাইরে পাহাড়ের দিকে দৌড়ল সিজার। সেখানে সারারাত্রি ধরে গর্জাতে লাগল সে। মানুষ, পশু সবাইকে ডাকতে লাগল পাহাড়ের উপর আসার জন্য। ডিয়েজেলষ্টাইন গম্ভীরভাবে বলে—বেশ চালাকচতুর ষাঁড়টা!

তার বউ মেয়েদেরকে বলে কি রকমভাবে ছেলেমেয়ে নিয়ে সে হাঁচোড়পাঁচড় করে ছাদে উঠেছিল আর সে জল কি বরফের মত ঠাণ্ডা। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে এটাওটা খুঁটিনাটি মনে করিয়ে দিচ্ছিল, সব যেন এখনও তাদের মনের মধ্যে জলজল করছে।

যত সাহায্য পেয়েছে সে সবের কথাও বলে তারা। তার বউ বলে, এত সাহায্যের আশা করতে পর্যন্ত সাহস করত না তারা। রাস্তার উপর বাড়ী যার সেই বাট বোহেমে প্রায় সমস্ত কিছু হারিয়েছিল। পরের দিন সে বলেছিল এই ক্ষয়ক্ষতি পুরণ করতে তার পঞ্চাশ বছর লাগবে। তার ছেলেমেয়ে নাতিনাতনীকে পর্যন্ত ভুগতে হবে।

"পঞ্চাশ বছর?" হেসে ওঠে পেট্রা। "সবুর কর না, পঞ্চাশ দিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখে নিও।"

এপ্রনের কোণ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চাষী-বউ বলে "হাঁ, হাঁ, এ যেন রূপকথার মত। ঠিক রূপকথার মত।" সে দুবার করে বলে যেন যত সাহায্য তারা পেয়েছে তার বর্ণনার জন্য এইটিই সবচেয়ে উপযুক্ত কথা।

এই উপত্যকায় বৃষ্টি কিছু অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এ রবিবারে ভ্রাম্যমাণ মেঘ এবং ঝুলে-থাকা বর্ষার মাঝখানে সূর্য সাহসের সঙ্গে আলো ছড়ায়। পাহাড় থেকে ছুটে আসে বাতাস, শস্যক্ষেত্র মর্মরিয়ে ওঠে। উপত্যকাটা যেন আশ্চর্যরকম শান্ত, ছুটির দিনের নীরবতা সর্বত্র বিরাজ করে। কোনও করাত ঘসঘস করে না, কোনও ট্রেণের বাঁশি নেই, রেলপথের উপর কোনও গাড়ির ঝকঝকানি নেই, রাস্তায় নেই ট্রাক্টর কিংবা লরির ঘর্ঘর।

হান্স-অটো এবং মার্টিন গ্রামের প্রান্ত ঘেরা পাহাড়টার সর্বোচ্চ চুড়োয় গিয়ে ওঠে। ২৩শে মে এইখান থেকে জলস্রোত ছুটে গিয়েছিল গ্রামটাকে ভাসিয়ে নিতে। জল যেখানে জড়ো হয়েছিল তার চওড়া দাগটা ওরা দেখতে পায়, দেখতে পায় কাদার দাগ এবং যে সব পাথরে জল আছড়ে পড়েছিল সেগুলোকে। তবে ক্ষেতের উপর জড়ো-হওয়া পাথরগুলোকে চাষীরা প্রায় সব সরিয়ে ফেলেছে। উপরের পরতে তারা নতুন মাটি ফেলেছে, আবার বীজ বুনেছে ক্ষেতে।

নীচের ফেরনেবাখ উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ঢেউ খেলানর ভূদৃশ্যকে চমৎকার দেখতে পায় তারা। দূরে বার টেন্‌ষ্টেড-এর ঘরবাড়ীগুলো স্পষ্ট দেখতে পায়, আর ক্রুখ্‌ষ্টেড পড়ে রয়েছে তাদের পায়ের তলায়। পুরাতনের ধ্বংসাবশেষের উপর যেখানে নতুন বাড়ীঘর উঠছে। ধ্বংসস্তূপের ধূসর এবং কালোর সঙ্গে নতুন বাড়ীর উজ্জ্বল রং চমৎকার বৈপরিত্য সৃষ্টি করেছে···পুরাণোর থেকে যা বাঁচল তা নয়, নতুন ঘরবাড়ী—চাষীদের নতুন ঘর, ক্লাব, স্কুল, ফেরনেবাখের উপর নতুন পাথরের সেতু—এইগুলোই হবে ভবিষ্যতে গ্রামের প্রধান জিনিষ।

যেখানে যেখানে নতুন গাছ বসানো হবে সে জায়গাগুলোও বেছে ফেলে ছেলেরা। গাছ বলতে চারাগাছ নয়, রীতিমত বিরাট ছায়াকরা গাছ। প্রকৃতির আদিম শক্তি শক্ত গাছগুলোকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে, কিন্তু মানুষ তার জায়গায় আবার গাছ বসানোর পক্ষে যথেষ্ট শক্তি ও বুদ্ধি ধরে। মানুষ ভয়ঙ্কর ধ্বংস আনতে পারে, কিন্তু তাদের সৃজনীশক্তি বিরাটতর। তাছাড়া একদিন আসবে যখন মানুষ শুধু সৃষ্টিই করবে।

এই সব বিষয়েই তারা আলোচনা করে। ক্রুখষ্টেডে এসে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। লম্বা দোহারা চেহারা হান্স-অটোর, তার চোখ সদাই সামনের দিকে, সব সময়ে তার নতুনের প্রত্যাশা। মার্টিন একটু ধীর এবং শান্ত, সে নতুন ভাবনাকে আত্মস্থ করে ও রূপায়িত করে।

পুনর্নির্মাণের পর গ্রামটার নাম কি দেওয়া উচিত এ নিয়ে চারদিন ধরে ভাবছে হান্স-অটো। অবশ্যই নতুন একটা নাম চাই। ক্রুখ্‌ষ্টেড মানে ভাঙা সহর—এ নাম হয়ত পুরাণো গ্রামের পক্ষে চলতে পারত। কিন্তু একটা নতুন গ্রামের উপর ত আর এই পুরাণো নামের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

"আহা কি ভাবনা!" হেসে গড়িয়ে পড়ে মার্টিন। অবশ্য সে স্বীকার করে যে নতুন একটা গ্রামের পক্ষে ক্রুখষ্টেড উপযুক্ত নাম নয়। ব্যাপারটা ভাববার মতই বটে।

"কিন্তু সকলেরই এ নিয়ে ভাবা উচিত, কেবল আমরা দুজন ভাবলে হবে না",—হান্স অটো বলে, "আমাদের এমন একটা নাম বের করতে হবে যা এর বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলবে, আবার শুনতেও ভাল।"

"শোয়েনষ্টেড কি রকম (সুন্দর সহর) হয়?"

সুন্দর সহর—খারাপ নয়। কিন্তু হয়ত আরও ভালো কিছু তারা ভেবে বের করতে পারে। এমন কিছু যার মধ্যে দিয়ে নতুন গ্রামটা কি ভাবে আবার গড়ে উঠল তারও আভাস থাকবে।

নীচের বাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তারা নতুন নতুন নাম করে, আবার সেগুলোকে বাতিল করে দেয়। তারা যে শুধু একটা গ্রাম গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে তাই নয় তার উপর আবার পাহাড়ের উপর বসে তার একটা নাম ঠিক করার চেষ্টাও করছে—এ বেশ মজার ব্যাপার। ভাবটা যেন কোনটা কি রকম দেখাবে, কার কি নাম হবে এ সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে তারা।···অবশ্য সিদ্ধান্ত নেওয়াতে তারা আজকাল সাহায্য করে থাকে, আর সে শুধু ক্রুখষ্টেডেই নয়। এতেই ত নতুন জীবন এমন চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

গ্রামে ফেরার পথে হান্স-অটো মার্টিনকে জিজ্ঞাসা করে সে পড়তে ভালবাসে কি না।

মার্টিন দ্বিধা করে। যে ভাবে তার বিলম্বিত "হাঁ" কথাটা উচ্চারিত হয় তাতে খুব বিশ্বাসযোগ্য শোনায় না।

হান্স-অটো মন্তব্য করে, "তোমাকে ত কোনও দিন আমি বই হাতে দেখি নি!"

ক্ষুব্ধ হয়ে মার্টিন বলে, "তা আমার আরও নানা কথা ভাবতে হয়। সারাদিনের কাজের পর চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকতেই আমি ভালবাসি।"

"আমারও সেইরকমই ইচ্ছে হয়"—স্বীকার করে হান্স-অটো। "কিন্তু এরকম ত চলা যায় না, এ নিতান্ত বোকার মত, তাই নয়? আমাদের একটু পড়াশুনো সুরু করা নিতান্ত দরকার।"

"পড়াশুনো!" মার্টিনের স্বরে আতঙ্ক।

"হাঁ, পড়াশুনো বলতে আমি রাজনৈতিক বইপত্রের কথা বলছি।"

"এই দেখ, কি দরকার মাথা ঘামাবার? যা কিছু জানার দরকার বাস্তব জীবনই শিখিয়ে দেবে আমাদের। চোখ-কানটা কেবল খোলা রাখলেই হ'ল।

"না, আমার ধারণা তা যথেষ্ট নয়।" হান্স অটো জবাব দেয়। "অনেক জিনিষ আছে যা তোমার মাথায়ই আসবে না। অনেক উত্তর তোমার খুঁজে বের করতে হবে, তাছাড়া যা দেখবে তাকেও ঠিকমত বুঝতে হলে পড়াশুনো দরকার। আমি এ নিয়ে ভাবছিলাম। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে আমাদের এখানে সত্যিকারের পড়াশুনো সুরু করা দরকার—তার মানে ধর মার্ক্স ও লেনিনের বইপত্র পড়া দরকার।"

মার্টিন চুপ করে থাকে। তার বন্ধু যে কি করে অত উৎসাহের সঙ্গে মার্ক্স আর লেনিনের বই পড়ার কথা বলছে তা সে ভেবেই পায় না।

"প্রায়ই আমরা শুনছি 'একচেটিয়া ধনতন্ত্র', 'সাম্রাজ্যবাদ', আরও সব নানা ধরনের কথা। খবরের কাগজেও এসব কথা পড়ছি।" হান্স-অটো বলতে থাকে। "কিন্তু এ সব যে কি ব্যাপার সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও সূত্র সঠিক জানা নেই। আমি এ নিয়ে চিন্তিত। যাই হোক, লেনিনের লেখা 'সাম্রাজ্যবাদ' বইখানা আমি পড়ব ঠিক করেছি।"

"তা, হঠাৎ কোথা থেকে জোগাড় করবে এ বই?" জানতে চায় মার্টিন।

"আমি এরফুর্টএ অর্ডার দিয়েছিলাম, গতকাল বইটা এসেছে" জবাব দেয় হান্স-অটো। মুহূর্তের জন্যে সে থেমে যায়, মার্টিনও থামে।

"দেখ, আমি কেবল কয়েকটা পাদটীকা দেখছিলাম।"

"পাদটীকা! আর ওই বই তুমি পড়তে চাও?"

"নয় কেন, তুমি পড়বে?"

"হয়ত ঠিক জানি নে", একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করে মার্টিন", কিন্তু কখন? সন্ধ্যায়, সন্ধ্যায়?"

"সন্ধ্যায় বড় ক্লান্ত থাকি আমরা, দুপুরের বিশ্রামের সময়ে হয়ত আমরা পড়তে পারি। কিংবা যেদিন তোমার দেরীর সিফট থাকবে সেদিন হয়ত বিকেলে পড়া যেতে পারে। যাই হোক, সে আমি ঠিক করে নেব। আমি এমন ভাবে ব্যবস্থা করে নেব যাতে দৈনিক এক ঘণ্টা আমরা ফাঁকা পেতে পারি। এটুকু আমাদের করতে পারা উচিত।"

"বেশ কথা", মার্টিন বলে।

"কাল দুপুরে করলে কেমন হয়।"

* * * *

"কমরেডশিপ (বন্ধুত্ব) হ'ল ভিটামিন-এ" বলত লেফটেনাণ্ট (নাৎসী বাহিনীর একজন লেফটেনাণ্ট) ড্রোগেস্টাইন। "যতক্ষণ তোমার কমরেডরা আছে ততক্ষণ তোমার প্রাণ আছে, উন্নতি ও সমৃদ্ধি আছে।"

আর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাটাকে সে এই উপদেশ দিয়ে শেষ করত যে এই ভিটামিনের পর্যাপ্ত সরবরাহের জন্য সবাই যেন যত্নবান থাকে।

গোড়ায় গোড়ায় হান্স-অটো লেফটেনাণ্টের কথায় সায় দিত: সৈনিকদের মধ্যেই আসল কমরেডশিপ। কিন্তু সে ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে যে এ কমরেডশিপ গোড়া থেকেই বিষময়, এ কমরেডশিপের উদ্দেশ্য হল মৃত্যু এবং ধ্বংস, সমৃদ্ধ মঞ্জরিত জীবন নয়। এখানে সবচাইতে বড় গুণ হ'ল জোর করে বাধ্যতা কায়েম করা, সর্বাঙ্গীন বশ্যতা স্বীকার করা। সৈনিকের সবচেয়ে বড় আদর্শ হল যুদ্ধ করা এবং সৈনিক হিসাবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করা। এই কমরেডশিপের কি মূল্য পরাজয়ের সময়ে তা সে টের পেয়েছে। অফিসাররা পালিয়ে গেল সৈন্যদের বিপদের মুখে ফেলে! তথাকথিত কমরেডরা অপরের ক্ষতি করে নিজের জীবন বাঁচাল। অল্পদিন আগেও যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মার্চ করছিল তার মধ্যে অনেকে হঠাৎ পরস্পরকে ঘৃণা করতে সুরু করল।

এই সব অভিজ্ঞতা থেকে হান্স-অটো শূন্য হৃদয়াবেগপ্রসূত অনেক ধারণা থেকে মুক্তি পেয়েছে। যখন সে ঘরে ফিরে এল তখন তার অবস্থা সামনে প্রসারিত ঘরবাড়ীর ধ্বংসস্তূপে পড়ে-থাকা শূন্য গোলাগুলোর মতই। তখন যদি তার বাবা ডাকতেন তা হ'লে হয়ত আগেকার যে ঝগড়া তাদের তফাৎ করেছিল সে সব সত্ত্বেও সে বাড়ী ফিরে যেত। কারণ যুদ্ধোত্তর সেই গোড়ার দিনগুলোতে তার মনটা হয়ে গিয়েছিল দুর্বল, আর সামনে কোনও সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না। নিজেকে তার সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় মনে হ'ত।

সেই সময়ে সে তার বাবার সম্পর্কে অনেক ভেবেছে।

ডক্টর বোহেলার ছিলেন অতিরিক্ত নিয়মনিষ্ঠ, কঠোর ও প্রভুত্বপরায়ণ পিতা। তাঁর অহঙ্কার এবং ঔদ্ধত্য হান্স-অটোর কাছে অসহ্য মনে হ'ত। ষোল বছর বয়স হবার পর থেকে ছেলে আর বাপকে চাবুক মারতে দেয় নি। সে প্রত্যাঘাত করে পালিয়ে গিয়েছিল। এক কাকার সাহায্যে স্কুলের লেখা পড়া চালিয়েছিল।

যুদ্ধোত্তরকালের সবচাইতে আত্মিক শূন্যতার ও হতাশার দিনগুলোতে হান্স-অটোর মনে পড়ত সেই তিক্ত স্মৃতি যে তার বাবা মানুষকে কেবল সংখ্যা হিসাবে গণ্য করতেন, বিচার করতেন কেবল একটা দঙ্গল হিসাবে বা ভিড় হিসাবে। কে জানে হয়ত তাঁর খুব বেশী ভুল হয় নি…"ভিড়ের সঙ্গে যদি নিজেকে এক স্তরে নাবাও তা হ'লে তারা তোমায় ঘৃণা করবে, ভিড়ের ঊর্ধ্বে যদি নিজেকে তুলতে পার তবেই তারা তোমাকে শ্রদ্ধা করবে" —হান্স-অটোর বাবা প্রায়ই বলতেন।

হান্স-অটোর মনে পড়ল ফ্রায়েঙ্কেল বলে একজন উকিলের কথা, যিনি ছোটবেলায় ওরা যে বাড়ীতে থাকত সেই বাড়ীতেই থাকতেন। ভদ্রলোক ছিলেন মধুর স্বভাবের মানুষ। পিয়ন, আর্দালী সকলের সঙ্গেই তাঁর সদ্ভাব ছিল এবং তাদের সঙ্গে তিনি হাসিঠাট্টা করতেন, এমন কি কখনও কখনও তাঁর বাড়ীতে এক চুমুক পান করে যেতেও ডাকতেন। দ্বারোয়ান বলত, ফ্রায়েঙ্কেল কোনও কাজের নয়, নিজের মর্যাদা রাখতে জানে না, মুচি হেলবিগ তাকে নিয়ে নোংরা হাসিঠাট্টা করে। কিন্তু ফ্রায়েঙ্কেল ছিলেন চমৎকার উকিল, সমস্ত অপছন্দ সত্ত্বেও হান্স-অটোর বাবাও এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হতেন।

দ্বারোয়ান এবং মুচি, পিয়ন এবং অন্যরা হান্স-অটোর বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম ব্যবহার করত। প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডক্টর বোহেলার চাকরবাকরদের সঙ্গে (এই শ্রেণীর লোকদের তিনি ওই বলেই অভিহিত

করতেন) যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতেন। তারা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর দিকে চাইত এবং তিনি যখন অনুগ্রহ করে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন তখন তারা মাথা নোয়াত। তাঁর সম্পর্কে একটা অসম্মানজনক কথা বলতে তারা কেউ সাহস করত না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তার বাবা মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ হয়ে পড়লেন। নাৎসীরা যখন প্রথম ক্ষমতা দখল করেছিল তখন তিনি তাদের "নীচু স্তরের কতকগুলো উচ্ছৃঙ্খল লোক" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন আর ফুয়েরারকে (হিটলার) বলেছিলেন "হাস্যকর"। কিন্তু বেশীদিন না যেতেই তিনি গিয়ে নাৎসী পার্টিতে ঢুকলেন। নিজের নাৎসী পার্টির সভ্যকার্ডের দিকে তার বাবা কি তাচ্ছিল্যভরে তাকাতেন সে কথাও স্পষ্ট মনে পড়ে হান্স-অটোর। তাঁর সদস্য-সংখ্যাটা ছিল দশ লক্ষ কত যেন। হান্স-অটো মনে মনে ভাবত তা হ'লে উচ্চতর ব্যক্তিটিও শেষ পর্যন্ত ভিড়ের মধ্যেকার একজন হয়ে গেলেন—অন্ততঃ পার্টিবইতে ত বটে···

বাড়ীতে ডক্টর বোহেলার তাঁর মতে যাকে বলে 'কঠোর কিন্তু ন্যায্য শৃঙ্খলা' তাই বজায় রাখতেন। তিনি যাতে অনুমতি দেবেন না এমন কিছু করা হ'ত না। একটা টু-শব্দ না করে সব মেনে নিতেন হান্স-অটোর মা, এমন কি তাঁর সম্পর্কে যখন সুস্পষ্ট অন্যায় হচ্ছে, তখনও। তাঁর বিশ্বাস ছিল স্বামী কর্তা এবং স্ত্রী আজ্ঞাবহ এ বিধান ঈশ্বরের এবং প্রকৃতির সৃষ্টি। এমন কি খুব বাল্যকালেও হান্স-অটোর মনে কখনও কখনও প্রশ্ন জেগেছে তার বাবা তার মাকে ও তাকে সত্যিকারের ভালবাসেন কি না। বাবার কাছ থেকে বালক কেবল নিরস শৃঙ্খলার উৎপীড়নই পায় নি, তাঁর হৃদয়হীন ব্যবহারও তাকে উৎপীড়ন করেছে। পরে সে বুঝেছে যে তার বাবা তার মাকে ও তাকে সেই রকমই ভালবাসতেন যেমন ভালবাসতেন তিনি নিজের সম্পত্তিকে—নিজের বাড়ী, চিত্রশালা, গাড়ি ইত্যাদিকে। তিনি শুধু এই একটি ধরনেই ভালবাসতে জানতেন।

যুদ্ধের শেষ বছরে, হান্স-অটোকে যখন স্কুল ছেড়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হ'ল, তখনও তার বাবা সেই অপরিহার্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। পূর্বরণাঙ্গনের দিকে রওনা হবার আগে বাবা ছেলেকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে ছিল: "নিজের সম্বন্ধে সাবধান থেক, শত্রু সম্পর্কে যত নির্মম হতে পারবে ততই তোমার পক্ষে ভাল"···সে চিঠির জবাব দেয় নি হান্স-অটো।

* * *

গাছের তলায় তাঁবুর ভিতরে এখন সে তার ডেস্কে বসে কাগজপত্র এবং সংখ্যার মধ্যে ডুবে আছে। তার বন্ধুরা নীরবে আশেপাশে ঘুরছে। কয়েক বছরের মধ্যে সমগ্র দুনিয়াটা, সমস্ত জীবনটা বদলে গেছে। কিন্তু তার মনটা মাঝে মাঝে কাজ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, কারণ অতীত এসে অধিকার করছে তার চিন্তাকে। পিছনের দিকে চেয়ে তার মনে হচ্ছে বাল্যকালটা তার সমস্তটাই বেঠিকভাবে কেটেছে। সমস্তটাই তখন মিথ্যা ও প্রতারণায় বিষাক্ত হয়ে ছিল···সহজে সে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছয় নি। মানুষ হয়ে ওঠাটা সহজ হয় নি।

যুদ্ধের পর সে কাজ পেয়েছিল কাঠের কারখানায়, গোড়ায় করাতকলে, পরে অফিসে। কিছু লোক আছে যারা নিরানব্বই জন ভাল লোক এবং একজন খারাপ লোকের মধ্যে থাকলে সেই একজন খারাপ লোকেরই প্রভাবে পড়ে যায়। আবার কিছু লোক আছে যারা নিরানব্বই জন মন্দ লোক এবং একজন ভাল লোকের সংস্পর্শে এলে ওই একজন ভাল লোকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারে। হান্স-অটোর ভাগ্য ভাল—সে একজন বন্ধু পেয়েছিল। সেই সময়ে অল্প জায়গাতেই ভাল লোকের সন্ধান পাওয়া যেত। কাঠের কারখানায় একজন ভাল

লোক ছিল। সময়টা তখন লোককে ভাল হতে উৎসাহিত করত না। কোনও জিনিস তখন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যেত না। কখনও কখনও, এমন কি শুকনো রুটি পর্যন্ত জোটান যেত না। লোকেরা ছোট-বড় সব ব্যাপারেই চোরাচালান করত, ঠকাত। নৈতিক মানে একেবারে ভাটা পড়ে গিছল।

একদিন বিকেলে একজন বহিরাগত ও কাঠ কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে এক রাজনৈতিক আলোচনা হান্স-অটোর কানে এল। সে আলোচনায় যোগ দিল এবং বহিরাগতর সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাটাল।

তার নবপরিচিত আলবার্ট নাউমানের জাতব্যবসা ছিল ধাতুশ্রমিকের কাজ, সে ছিল টার্ণার। যুদ্ধের শেষ তিন বছর সে বুখেনভাল্ড কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পে (হিটলারের কুখ্যাত বন্দীশিবির) কাটিয়েছিল। হান্স-অটো শুনেছিল কি করে দীর্ঘ এবং একগুঁয়ে প্রতিরোধের পর নাউমান শেষ পর্যন্ত কমিউনিষ্ট হয়েছিল। আলবার্টের বাবা ছিলেন কমিউনিষ্ট। এস-এসরা (হিটলারের ঝটিকা বাহিনী) তাঁকে রাস্তায় পিটিয়ে মেরেছিল। সে ১৯৩৩ সালের হেমন্তকালের কথা। পিতৃহত্যাকারীদের নাউমান ঘৃণা করত, কিন্তু বাবার পার্টিতে সে যোগ দেয় নি। প্রকৃতপক্ষে, কয়েক বছর পরে সে তার বাবার পুরাণো কমরেডদের নাৎসী-বিরোধী গোপন কার্যকলাপে যোগ দিতে অস্বীকারই করেছিল।

তার পরে এল যুদ্ধ, সৈন্যবাহিনীতে ডাক পড়ল আলবার্টের। টর্গোড়ায় সে ফরাসী রণাঙ্গনে ছিল, তার পর হুকুম হ'ল পূর্বরণাঙ্গনে যেতে। সে যেতে অস্বীকার করল কারণ তার বাবা সোভিয়েত ইউনিয়নকে কি সুগভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তা সে ভুলতে পারে নি। সে সৈন্যবাহিনী থেকে পালিয়ে গেল এবং মিলিটারী পুলিশের কাছ থেকে আত্মগোপন করে লাইপজিগে কয়েক সপ্তাহ ধরে পালিয়ে বেড়াল। সে দুয়ার-গোড়ায়, চিলেকোঠায় শুয়ে থাকত, কোনও মতে জীবন ধারণের জন্য যা প্রয়োজন চুরি করে সংগ্রহ করত। ওরা যখন তাকে ধরল তখন সে চিৎকার করে উঠেছিল এই বলে যে তাকে বরং এক্ষুনি মেরে ফেলা হোক, কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ওরা তাকে কোনও মতেই নিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু ওরা তাকে গুলী করল না। পাঠিয়ে দিল বুখেনভাল্ড ক্যাম্পে ওদের যুদ্ধের জন্যে কাজ করতে। এই মৃত্যুশিবিরেই সে তার বাবার মত কমিউনিষ্ট হয়ে উঠল। তাকে যারা সাহায্য করেছিল তারা একজনের পর একজন প্রাণ হারাল। কিন্তু যখনই একজনকে টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ত তখনই আর একজন পুরাণো কমিউনিষ্ট তার স্থান নিত। এই ভাবে আলবার্ট শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম এবং তার আদর্শের কথা বুঝল। এই ভাবেই সে একজন রাজনৈতিক ভাবে সচেতন ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হল।

হান্স-অটো আলবার্টের ছাত্র ও বন্ধু হয়ে উঠল। শহরের শ্রমজীবী মানুষ তখন অনাহারে রয়েছে এবং শীতে জমে যাচ্ছে। অনেকে সুদিনের আশা ছেড়েই দিয়েছে। তবু হান্স-অটোর পক্ষে সেই সময়ের কঠোর শ্রম এবং অধ্যয়ন চমৎকার লাগত। আলবার্ট ছিল "মুক্ত জার্মান তরুণ" সংস্থার একজন সংগঠক। সে হান্স-অটোকে যুবসংস্থার সহরের অফিসে একটা কাজ জোগাড় করে দিয়েছিল। কখনও কখনও তারা থিয়েটারে যেত, ভাল নাটক দেখার জন্য তারা ভাইমার, জেরা পর্যন্তও ছুটত। আলবার্টকে অনেক সময়েই থুরিঙ্গিয়ার গ্রামে ও সহরে বক্তৃতা করতে যেতে হ'ত। যখন পারত হান্স-অটো তার সঙ্গে যেত। তারা মার্ক্সবাদী পাঠচক্রে যোগ দিত, একসঙ্গে লেনিন পড়ত, ইতিহাস পড়ত। এই ভাবে হান্স-অটো নতুন চোখে সব দেখতে সুরু করল, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বুঝতে সুরু করল। সে বুঝল আজ যাকে ইতিহাস বলা হচ্ছে তাই ছিল এক সময়ে সমসাময়িক

রাজনীতি, আবার তার জীবনকালের রাজনীতিই আগামী দিনে ইতিহাস আখ্যা পাবে। কেন এবং কি ভাবে অতীতে এতগুলো ভুল হ'ল সে কথা বোঝার জন্য সে অধীর হ'ত। তার মনে হত ভুল এড়াবার একটা পথ কি বের করা যায় না?

অধ্যয়ন এবং কাজ এই ছিল হান্স-অটোর জীবন, এতে তার ভালই লাগত। প্রায়ই শুকনো রুটি হ'ত তার একমাত্র খাদ্য, তবু সে কাজ করে এবং শিখে চলত। এর সার্থকতা সম্বন্ধে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল। সে বুঝত প্রশ্নটা যা ধ্বংস হয়ে গেছে তাই গড়ে তোলার নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শ নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে একেবারে নতুন কিছু গড়ে তোলার প্রশ্ন। জমি এখন চাষীর সম্পত্তি। বড় বড় কারখানাকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা শ্রমিকের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং শ্রমিকই এখন দেশ-পরিচালনায় চূড়ান্ত কথা বলার মালিক।

দু'টি তরুণের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সাথিত্ব বজায় ছিল আলবার্ট একটি সরকারী চাকরি নিয়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত। হান্স-অটো বন্ধুর অভাব খুব তীব্রভাবে অনুভব করত বটে, কিন্তু তার পড়াশুনো ও কাজকর্ম সে চালিয়ে গিয়েছিল। সব কিছু যে বিনা গোলযোগে এবং সহজভাবে চলেছিল তা নয়। এরফুর্টএ যুবনেতা হবার পর এক সময়ে সে অনুভব করল তার বিরুদ্ধে যেন একটা বিরূপতা সৃষ্টি হয়েছে, প্রায় একটা অবিশ্বাসের মত। গোড়ায় সে এসবকে গুরুত্ব দেয় নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একটা সন্দেহের আবহাওয়া হ'ল যে দম বন্ধ হবার যোগাড়, কাজকর্মও আর চালিয়ে যাওয়া যায় না।

তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আছে অন্যদের একদিন পার্টি সভায় সে তা জানতে চাইল, দাবি করল একটা স্পষ্টাস্পষ্টি আলোচনা হোক। দেখা গেল সন্দেহের কারণটা হ'ল এক অত্যুৎসাহী, উদ্বেগ এবং বিপথগামী সতর্কতা ও প্রহরা।

একজন ইঞ্জিনিয়ার রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে হান্স-অটো বোহেলারএর বাবা ছিলেন এক উগ্র নাৎসীপন্থী। যুদ্ধের সময়ে তাঁর অধীনে যে সমস্ত শ্রমিককে কাজ করাতে বাধ্য করা হয়েছিল তাদের সঙ্গে তিনি মারাত্মক দুর্ব্যবহার করেছিলেন, এমন কি তাদের কিছুকে গেষ্টাপোর (নাৎসী গোয়েন্দা পুলিশ) হাতে পর্যন্ত তুলে দিয়েছিলেন। হান্স-অটো এ সবই বিশ্বাস করত। কিন্তু তাকে শাস্তি দেওয়া কেন? বহু বছর আগে ত বাবার সঙ্গে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

সে মঞ্চে উঠে নিজের বাল্যকালের বিবরণ দিল, তার বাড়ীর কথা বলল, বাবার কথা বলল। ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলা বা কম করে দেখান দুই সে এড়াতে চেষ্টা করল। সে ওদের দেখাতে চেষ্টা করল কি ভাবে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রীতিময়, আরামদায়ক স্বাচ্ছন্দ্যের তলায় এক দিকে লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অপর দিকে ভয় ও বশ্যতার অন্তঃসলিল স্রোত বইতে পারে। তার পর সে দেখাল কি ভাবে তার ধারণা পরিবর্তিত ও পরিণত হ'ল, কি ভাবে আলবার্ট নাউমান তাকে সাহায্য করেছিল।

"কাজেই দেখ, আমার বাবার মত লোকের ছেলের পক্ষেও সাধারণ মানুষকে ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে শেখা সম্ভব।"

চেরীগাছের তলায় ডেস্কে বসে এই সমস্ত পুরাণো কথা ভাবছিল হান্স-অটো ওই দলেরই মধ্যে থেকে কিছুকাল

পরে তার বন্ধুলাভ হয়েছিল। আর এখন এখানে সে মার্টিনের সঙ্গে একসঙ্গে পড়াশুনো করছে, এর মধ্যে দিয়েই আবার তাদের বন্ধুত্বও নিবিড়তর হবে।

কথাটা ভাবতে বেশ ভাল লাগল। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে সামনের কাগজপত্র ও সংখ্যাগুলোর মধ্যে আবার সে মনোনিবেশ করল।

সেদিন আবার এক বিরাট বর্ষণ হ'ল ক্রথস্টেডে। জলভরা মেঘের একটা প্রাচীর হাইলিঃ পাহাড়ের উপর যেন কালো পর্দার মত ঠেলে উঠল। অবিশ্বাস্যরকম জল ঝরতে লাগল।

অতি সামান্যক্ষণের মধ্যে গ্রামের ঢালু দিকটায় এক কোমর জল দাঁড়িয়ে গেল। সমস্ত নতুন ভিতগুলো জলে ডুবে গেল এবং বিরাট পরিমাণ চুণ ও সিমেণ্ট ধুয়ে চলে গেল। গ্রামের ভিতর দিয়ে ঢালুর দিকে ছুটে চলল জলের ধারা, নেবে পড়ল উপত্যকায়, শীর্ণ ফেরনেবাখ আবার এক দুর্দান্ত স্রোতে পরিণত হয়ে বন্যায় ভাসিয়ে দিল উপত্যকাটাকে, সামনের সব কিছুকে মুছে নিয়ে গেল।

রাজমিস্তিরিরা সেই চোখ-ধাঁধানো বৃষ্টির মধ্যে অভিশাপ দিতে দিতে ছুটল যন্ত্রপাতি উদ্ধার করার জন্য। সমস্ত তরুণরা গ্রামের ঢালুর দিকে দৌড়ল, জায়গায় জায়গায় বুক-জল ঠেলে এ বাড়ী থেকে ও বাড়ি গেল নারী ও শিশুদের নিরাপদ জায়গায় সরানোতে সাহায্য করার জন্য এবং একটা বন্যার পর যে ক'টা গরু ঘোড়া শুয়োর ইত্যাদি বেঁচে আছে তাকে রক্ষা করার জন্য। রাগে তাদের চোখে জল এসে গেল, কারণ মনে হ'ল যে তাদের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেল এবং সব পরিকল্পনা মাটি হয়ে গেল। এখন তাদের আবার গোড়া থেকে সুরু করতে হবে এবং প্রতিশ্রুত পঞ্চাশ দিনের মধ্যে কোনও মতে শেষ করে উঠতে পারবে না। কোথায় বাড়ী তৈরী করবে তা না এক সপ্তাহ ধরে তাদের এখন জল পাম্প করতে হবে এবং নতুন ভিত খুঁড়তে হবে।

প্রথম আগত পুলিশদল পুরো পোশাক-আশাক পরেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলের ঢেউএ ভাসা জিনিসপত্র উদ্ধার করার জন্য এবং জন্তুগুলোকে পাহাড়ে নিয়ে যাবার জন্য। অবশ্য আগের ক'দিনের সব কাজই বৃথা হয় নি। নতুন জল-নিকাশী ব্যবস্থায় সাহায্য হয়েছিল, তা ছাড়া ফেরনেবাখ নদীর বুক খানিকটা চওড়া হয়ে যাবার দরুন তার জল বয় নিয়ে যাবার ক্ষমতা বেড়েছে। এবারে বন্যাকে ফুলিয়ে, ফাঁপিয়ে দেবার জন্য কোনও বাড়ীর বাধা ছিল না, জল ত্বরিতগতিতে এবং সমভাবে বয়ে যেতে পেরেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রামের ঢালু অংশ থেকে জল বেরিয়ে উপত্যকায় নেবে গেল। কেবল মাটির নীচের কুটুরিগুলো এবং নতুন ভিতগুলোই জলের নীচে রইল।

দমকলের লোকেরা যতক্ষণ পাতালকুটুরির জল পাম্প করে বাইরে ফেলতে ব্যস্ত রইল, ততক্ষণে রাজমিস্তিরির দল যা কিছু পাত্র পেল তাই নিয়ে ভিতগুলো থেকে জল ছেঁচে বের করতে লাগল।

উপত্যকার নীচের দিকে পুলিশ ও দমকলের লোকেরা বিকেল থেকে সারারাত্রি পর্যন্ত, ষোল ঘণ্টা ধরে এক-টানা কাজ করে চলল। পরের দিনের মধ্যেই সব পাতালকুটির জলশূন্য হয়ে গেল, সমস্ত নির্মাণস্থল থেকে জল বের করে দেওয়া হল এবং যন্ত্রপাতি জিনিসপত্র যথাস্থানে ফিরে এল। এবার তরুণদের মনে হল হয়ত তাদের পঞ্চাশ দিনের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত সফল হবে।

সঙ্গে সঙ্গে কাজ সুরু করা হল। মাইক্রোফোনের চোঙা থেকে নিয়মিত রিপোর্ট পেশ হতে থাকল যাতে

প্রত্যেকে জানতে পারে অন্যরা কতটুকু এগোল। নউহাউজেন থেকে আসা রাজমিস্তিরিরা সবচেয়ে আগে ক্ষয়-ক্ষতিপূরণ করে ফের ইট গাঁথা সুরু করল।

চেরীগাছের তলাকার তাঁবুতে সন্ধ্যাবেলায় রোজই নানা কথা হত।

সমবায় সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরা পুলিশকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছিল, কিন্তু বাড়ী তোলার কাজে তারা অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে এখনও। প্রস্তাব উঠল যে এই পিছিয়ে পড়াটা পুষিয়ে নেবার জন্য তারা দৈনিক সাড়ে ন ঘণ্টা কাজ করুক। এই নিয়ে জোর তর্ক লেগে গেল। মার্টিন একে অত্যধিক লম্বা কাজের সময় বলে মনে করল। সে বলল, এ বে-আইনী কথা, লোকে দৈনিক কাজের সময় আট ঘণ্টা করার জন্য বহু বছর ধরে লড়াই করেছে। অন্যরা জোর করতে থাকল এই বলে যে পরিস্থিতি দাবি করে এ কাজে বাড়তি সময় দেবার জন্য।

হান্স-অটো মধ্যস্থ হ'ল।

"মার্টিন ঠিকই বলছে, দৈনিক কাজের সময় আট ঘণ্টা হওয়া চমৎকার জিনিস, আমাদের সংবিধানেও একথা লেখা হয়েছে। আমরা এমন কি সাত ঘণ্টা রোজের পক্ষে, আর যখন আমরা কমিউনিজম পর্যন্ত পৌঁছব তখন ত নিশ্চয়ই আমাদের দৈনিক কাজের সময় মাত্র পাঁচ ঘণ্টা হয়ে যাবে। অবশ্যই যদি কেউ রাজি না হয় তাকে দৈনিক আট ঘণ্টার বেশী কাজ কিছুতেই করান যেতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি সত্যি প্রয়োজন মনে করে তা হ'লে স্বেচ্ছায় নয় বা দশ ঘণ্টা কাজ করতে পারে। প্রথম বন্যায় পুলিশ ও দমকলের লোকেরা আটচল্লিশ ঘণ্টা, এমন কি ষাট ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করেছিল যথাযথ বিশ্রাম ছাড়া, কারণ তখন ছিল বাঁচামরা প্রশ্ন।"

"কিন্তু পশ্চিমেও ত ওরা তাইই বলে, 'বেশী করে কাজ কর ভাল থাকবে।' আর তারা আমাদের দিকে দেখাবে, বলবে আমরাও তাইই করি।"

"দুজন লোক এক কাজ করলে সব সময়ে তার একই মানে হয় না," পেট্রা বলে ওঠে।

"ঠিক কথা," হান্স-অটো বলে, "পুঁজিপতি মালিকদের জন্য বাড়তি কাজ করা কখনও শ্রমিককে সাহায্য করে নি।"

হাইন্‌ৎস্ হাত তোলে, তার স্বভাবসিদ্ধ ধীর এবং ইচ্ছাকৃত ভঙ্গিতে বলে:

'যখন আমি নিজের জন্যে বাড়ী তৈরী করতে সুরু করব তখন নিশ্চয়ই নিজেকে বলব না যে আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে। আমার, দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আমার সমস্ত বাড়তি সময়টাই তখন সে কাজে লাগাব।"

হাইন্‌ৎস্ তাড়াতাড়ি বসে পড়ে। তার স্কুলমাস্টারি ঢঙ দেখে কেউ কেউ ঠাট্টা করে। কিন্তু সেদিকে সে নজর দেয় না।

পেট্রা লাফিয়ে ওঠে।

"যুদ্ধের সময়ে কি আমাদের আট ঘণ্টা কাজের রোজ থাকে? না। আমরা কি এখন যুদ্ধ করছি? হাঁ। আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছি, মাতৃভূমিকে গড়ে তোলার জন্য আমরা লড়ছি। আর যত তাড়াতাড়ি সে কাজ আমরা করতে পারি ততই ভাল, আমার এই মত।"

নউহাউজেনএর লোকেরা পরের দিন তাদের বাড়ীর আড়ায় মালা ঝুলিয়ে দেয়, কারণ তারা সবার আগে দেওয়াল তোলার কাজ শেষ করেছে, শীগগিরই তাদের ছাদ উঠে যাবে। জয়লব্ধ পতাকার সঙ্গে একই দণ্ডে তারা তাদের মালা ঝুলিয়ে রাখে। এক বোঝা তক্তার উপর সারি সারি বীয়ারের বোতল সাজান রয়েছে। এগুলো বার্ণহার্ড বোহেমের উপহার, ওই নতুন বাড়ী শেষ হ'লে সেখানে তার যাবার কথা।

ভোর থেকে বোহেমে এবং তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা জায়গাটার তদারক করতে এসেছে। তার স্ত্রী আর একবার রান্নাঘর, পাতালকুটুরি ও পাতালকুটুরিতে ঢোকার সিঁড়িটা দেখে। দুহাত জড়ো করে সে উজ্জ্বল ফাঁকা ঘরখানার মধ্যে এসে দাঁড়ায়, বিরাট চুল্লি, হাওয়া-চলা বাসনকোসন রাখার ঘর এবং পাশের কাপড়-কাচার ঘরের দিকে দেখতে থাকে। বাসনরাখার ঘরে শীগগিরই তাক বসবে।

কল্পনা কর, আমার নিজের একটা কাপড় কাচার ঘর থাকবে—সে মনে মনে ভাবে। সমস্তক্ষণ পুরুষের চলাফেরার সামনে না থেকে আমি কাপড়চোপড় কাচতে পারব। এ কথা কে কবে ভেবেছিল?

বোহেমের ছেলে গটফ্রিয়েড গ্রামের তরুণ কর্মীদলের নেতা ছিল। তারা সব ক্ষেত থেকে কাদা সরিয়েছে এবং ক্ষেতে আবার বীজ বুনেছে। বাপ-ছেলেতে মিলে গোলা এবং পিছনের বারবাড়ীটা ভাল করে দেখে। পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তারা যেন স্বপ্ন দেখছে না এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়।

বাবা বলে, "আমাদের গরু-শুয়োরগুলো এবার চমৎকার জায়গায় থাকবে তাই নয়?"

ছেলে সায় দেয় এবং গরাদ-লাগানো জানলা, গাঁথনি-করা খাবার দেওয়ার জায়গা ও সিমেণ্ট-বাঁধানো ড্রেন এবং শক্ত ঝাঁঝরিসহ জন্তুজানোয়ারদের থাকার ঘরটা ভাল করে দেখে। ঘোড়ার চালায় ঘোড়া চমৎকার থাকবে, আর এক পাশে তারা খাবার নাদাটা রাখতে পারবে, আর অন্য দিকে আড়ার উপর জোয়াল ঝুলিয়ে দেবে—মনে মনে সে হিসেব করে।

বাড়ীটার ভিতর ফিরে আসে তারা এবং বসবার ঘর ও শোবার ঘরগুলোর মধ্যে ধীর পায়ে ঘুরে বেড়ায়।

"এবার তোমার একটা নিজস্ব ঘর হবে", একটা ছোট্ট ঘরের সামনে এসে বাবা বলে।

ছেলে বলে, "হাঁ, আমার মতে এবার আমরা চমৎকার আরামে থাকতে পাব।"

গ্রামের নীচের অংশ থেকে চাষীরা উপরে উঠে আসে নতুন খামারবাড়ী দেখতে এবং বোহেমেদের অভিনন্দন জানাতে। শেষ হ'লে তাদের বাড়ীগুলো বা কি রকম দাঁড়াবে তার একটা আভাস পাওয়ার জন্যও এসেছিল ওরা। তাদেরগুলো যদি এই রকম হয় তা হলে চমৎকার হবে—এই ভাবতে ভাবতে তারা ফিরে যায়।

দুপুর বেলায় এমিল কুন্‌ৎস্‌ গেল নউহাউজেনের লোকেদের সঙ্গে গল্প করতে, কারণ ওরা তাকে এক গ্লাস বীয়ার খেতে ডেকেছিল। সে গিয়ে দেখল ওরা চাষীদের সঙ্গে বসে বীয়ার খাচ্ছে এবং গল্প বলছে। রাহ্‌লার থেকে আসা ছুতোর বোয়েহ্‌নহাজে কথা বলছিল। সে তাদের মধ্যে একজন যারা গল্প করার জন্য সদাই তৈরী। বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য সে প্রায়ই হাত নাড়তে থাকে এবং উত্তেজিত হলে তার চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসে।

"হাঁ, সে এখন অনেক দিনের কথাই মনে হয়", বলছিল বোয়েহ্‌নহাজে—" কল্‌রএর দোকানে যদি খেতে হ'ত তা হলে সাতটা আলু সঙ্গে আনতে হ'ত। কাজেই লোকে সাতটা করে আলু নিয়ে আসত, অবশ্য বড় আলু নয়, সেগুলো ঘরের জন্য রেখে দিত। তার উপর আবার কল্‌রএর ওখানে ঝগড়া লেগেই থাকত।"

"এই যে ওয়েটার, আমি যে আলু এনেছিলাম সেগুলো এর চেয়ে বড় ছিল"—এক কোণ থেকে হাঁক দিত

একজন, আর এক কোণ থেকে আর একজনের চিৎকার শুনতে পাওয়া যেত 'এই যে ওয়েটার, আমার আলুগুলোকে নিয়ে কি করেছ? নিশ্চয়ই বলবে না যে সিদ্ধ করলে আলুগুলো গুঁটকে যায়।" গোলমালের ঠ্যালায় খিদেই প্রায় মরে যেত। সামান্য কটা আলুর জন্যে মানুষ সত্যিকারের শত্রু বানাত এবং সত্যিকারের মারামারিতে জড়িয়ে পড়ত।"

ইট মিস্তিরি রাইজলার বলে "ওহ্, তুমি কেবল তখন কি হ'ত তাই নিয়ে ব্যস্ত। এখন কি পরিবর্তন হচ্ছে সেদিকে একবার নজর দাও না। অবশ্য যা ছিল তা ভয়াবহ, কিন্তু এখন ত উন্নতি হতে সুরু করেছে, ক্রমেই ত ভালর দিকে যাচ্ছে!"

"রাইজলার, ভুলে যেও না কি হয়েছিল—" জবাব দেয় বোয়েহ্ নহাজে। "ভুলে যাওয়া কাজের কথা নয়! আমরা চাইনে সে জিনিসের একটাও আবার হোক। তবে সামনের দিকে চোখ রাখার জন্য তোমার প্রস্তাব ভাল। পুরোদমে সামনের দিকে চাও, তাতে আমি তোমার সঙ্গে আছি!"

"বেশ, এস তবে এ নিয়ে এক গেলাস বীয়ার খাওয়া যাক" কুন্‌ৎস্ বলে। তার পর সে গ্লাসটা তুলে ধরে বলে, বিজয়ীদের উদ্দেশ্যে, "সবাই বিজয়ী হোক!"

হাইনৎস আর পেট্রার মধ্যে ঝগড়া লেগে গেছে। কে যেন মেয়েদের দলের নেত্রী হবার জন্য পেট্রার নাম প্রস্তাব করেছিল, হাইনৎস তাতে আপত্তি করেছে। শোনা গেছে সে নাকি বলেছে যে তাতে পেট্রার মাথা গরম হয়ে যাবে। এমনিতেই নাকি ইট গাঁথার দরুন তার বেজায় অহঙ্কার।

পেট্রা এই মন্তব্যের কথা শুনে প্রতিবাদ করার জন্য ছুটে এসেছে। সে দেখে হাইনৎস বেসিনে চুল ধুচ্ছে। ওর ভিজে মাথাটাই চেপে ধরে পেট্রা।

"আমার সম্পর্কে কি বলেছ তুমি?"

"আশা করি আমি কি বলেছি তা তোমাকে ওরা ঠিক ঠিক বলেছে।" বিড় বিড় করে হাইনৎস।

"কিসে আমার মাথা গরম হয়েছে?" ওর চুলে টান দিয়ে জিজ্ঞাসা করে পেট্রা।

চটে গিয়ে মাথাটা টেনে নেয় হাইনৎস।

"তোমার ইট গাঁথা—এতেই তোমার মাথা গরম হয়েছে।"

ব্যস এই শেষ। হাইনৎসএর গালে দুই চড় পড়ে। হাত তুলে সে ঠেকায় এবং দাঁড়িয়ে থাকে। চশমার অভাবে সে অসহায়, যেন কেঁদে ফেলবে এমন ভাবে মুখটা বিকৃত হয়ে যায় তার।

পেট্রা দৌড় দিতে দিতে একবার শেষ কথার জন্য দরজা থেকে ফিরে চায়ঃ

"তুমি কি ধরনের লোক হে? মানুষ নয়, একটা যন্ত্র-বিশেষ। সকাল বেলায় কি তুমি পোশাক পর না কি হাওয়া ভর্তি করে নাও শরীরে? হৃদয়হীন যন্ত্র কোথাকার! কোনও কিছু উপভোগ করতে পার না তুমি। তুমি একবার ভাল করে হাসতেও পার না। এমন কি ভাল করে কাঁদতেও পার না। ওহ্, না তুমি কাঁদতে পার দেখছি। তা হলে হয়ত তুমি মনুষ্যপদবাচ্য···কাঠের গুঁড়ি কোথাকার একটা!"

এই বলেই চম্পট দেয়।

হাইনৎস সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, তার মাথা নীচু হয়ে যায়। তার পর শেষ পর্যন্ত চুল ও মুখ মুছে, চশমা পরে সে তাঁবুর দিকে যায়।

ঝগড়ার ফলে সারা ক্যাম্পে সোরগোল পড়ে যায়। হান্স-অটো ত শুনে হেসেই ফেলে। যা হোক তবু সে মনে করে এ বিষয়ে কিছু একটা করা দরকার।

"না, না, এরকম ব্যাপার করতে দেওয়া যায় না ওকে। ওর সঙ্গে আমাদের কথা বলা দরকার"—হান্স-অটো বলে।

কয়েক ঘণ্টা পরে দেরীর সিফট সুরু হবার ঠিক আগে ওরা তাঁবুর সামনের মাঠে জড় হয়। হাইনৎসএর পরনে গাঢ় নীল রঙের স্যুট। সে আড়ষ্ট ভাবে হান্স-অটোর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। পেট্রা ঘাসের উপর গড়ায়। থেকে থেকে সে হান্স-অটো থেকে মার্টিন এবং মার্টিন থেকে হাইনৎসএর দিকে চায়। মেয়েরা তাকে ঘিরে বসে, যেন ওকে রক্ষা করতে চায়।

হান্স-অটো বলতে সুরু করে, "তোমরা জান, কেন আমরা এখানে জড়ো হয়েছি। এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খল কাজের প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। শারীরিক হিংসা নিষিদ্ধ। যে কেউ এতদূর আত্মবিস্মৃত হয়ে যেতে পারে তাকেই বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হবে, ত তার কাজ যতই ভাল হোক না কেন। তার জন্যই..."

"কিন্তু ও বলেছিল পেট্রা অহঙ্কারী", বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে ইরমা বলে।

"মিথ্যে কথা," প্রতিবাদ করে হাইনৎস, "আমি বলেছিলাম ওর কাজের জন্য ওর মাথা গরম হয়ে গিয়েছে।"

"বেশ, পেট্রার যদি একটু গর্ব হয়ে থাকে তাতে কি হল, নিজের সম্বন্ধে গর্ববোধ করার অধিকার সে অর্জন করেছে।"—মন্তব্য করে হান্স-অটো।

প্রায় সকলেই সশব্দে করতালি দিয়ে ওঠে, মেয়েরা ত সবচাইতে জোরে।

"কিন্তু তাই বলে হাইনৎসকে মারার কোনও অধিকার জন্মায় নি পেট্রার। এর জন্যে তার কঠোর সমালোচনা হওয়া উচিত। হাইনৎসএর কাছে মাফ চাইতে হবে ওকে। কি বল তোমরা?"

হাঁ, তাদের মতে পেট্রার মাফ চাওয়া উচিত এবং ব্যাপারটা এখানেই চুকিয়ে দেওয়া উচিত। হাজার হলেও হাইনৎসও এমন কিছু ভাল ব্যবহার করে নি।

কিন্তু পেট্রা কোনও কারণ খুঁজে পায় না মাফ চাওয়ার। হাইনৎসএর দিকে বিশ্রী করে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে সে সভা ছেড়ে চলে যায়।

হান্স-অটো ডাক দিয়ে বলে যে সকাল পর্যন্ত ভাববার সময় রইল তার।

পেট্রার বন্ধুরা তাকে খোঁচায়, "মাফ চেও না, অত লুটিয়ে পড়ার দরকার নেই।"

আড়া ভঙ্গি করে বলে, "আমি বরং একটা ব্যাং ছোঁব তবু ওই হাইনৎসকে নয়।"

"হান্স-অটো কি করে আশা করল যে তুমি মাফ চাইবে?" উষ্মার সঙ্গে ইরমা বলে।

পেট্রা কোনও কথা বলে না। তার মনে পড়ে হাইনৎসকে কি রকম করুণ দেখাচ্ছিল। চোখ দুটো তার কি রকম শূন্য এবং বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল।

"কেন, সবাই ত তোমার পক্ষে ছিল। সকলেই হাততালি দিয়েছিল," ইরমা বলে।

"আর মার্টিন মুখ বন্ধ করেছিল, যদিও ও আমাদের সকলের চেয়ে ভাল করে চেনে হাইনৎসকে।"

"চল আমরা গিয়ে কুনৎসএর সঙ্গে কথা বলি, সে যা হোক একটা উপায় বাৎলে দেবে।"

পেট্রা চিন্তিতভাবে বন্ধুদের দিকে চায়।

"তোমাদের কি মনে হয় হাইনৎসএর সঙ্গে সব সময়ে আমরা ন্যায্য ব্যবহার করেছি?"—হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে সে।

"যাই হোক, তাকে একটা ভাল রকম চড় মেরে তুমি সৎকাজই করেছ," বলে ইরমা।

"না, আমি শুধু সে কথা বলছিনে। আমি বলতে চাই ওর সঙ্গে কি আমরা সব সময়ে সঠিকভাবে ব্যবহার করি?" পেট্রা প্রশ্ন করে।

কেউ উত্তর দেয় না।

"কেউ আমরা ওকে নিয়ে মাথা ঘামাই নে। ও সব সময়ে নিজে নিজেই থাকে, সব সময়েই একলা।"

"এ আর আশ্চর্য কি? যা একটা অদ্ভুত জীব ও।"

"হাঁ, সেই হ'ল কথা," জবাব দেয় পেট্রা—"কিন্তু তোমরা কি মনে কর, ওকে অবজ্ঞা করা ভাল? ও ত আমাদেরই একজন···ও যে এরকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছে হয়ত তার জন্যে দোষ আমাদেরই।"

"কি হল তোমার, পেট্রা?"

"আমার সত্যিই মনে হয় ওর বিষয়ে একটা কিছু আমাদের করা উচিত।" পেট্রা জোর দিয়ে বলে।

"তা হলে সত্যি তুমি মাফ চাইতে চাও?"

"মাফ চাওয়াটা প্রধান কথা নয়, কিন্তু ওর সঙ্গে আমাদের আর একটু ভাল ব্যবহার করা দরকার। কে যেন লিখেছিলেন—আমার ঠিক মনে নেই কে—যে, বন্ধুত্ব চমৎকার ওষুধ। হয়ত হাইনৎসএর সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করে আমরা তাকে সাহায্য করতে পারি। ওর হয়ত এই ওষুধেরই দরকার। হাঁ, আমার মনে হয়, আমাদের সেই চেষ্টাই করা উচিত।"

লাফিয়ে উঠে বাইরে যায় ও।

"চললে কোথায়?" জিজ্ঞাসা করে অন্যরা।

"মাফ চাইতে যাচ্ছি।"

বড় বড় নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের আসল বিশেষজ্ঞদের—ইট গাঁথিয়ে, ছুতোর, কলমিস্ত্রি, শান পালিশকারক ইত্যাদি সবাই-এর—ক্রুখস্টেড গ্রামটা সম্পূর্ণ পুনর্নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত কাজ করার যথাযথ চুক্তি ছিল। অন্যান্য সাহায্যকারীরা, যারা সপ্তাহান্তে আসত বা ছুটিতে দু এক সপ্তাহ ছিল, তারা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করছিল। রবিবারে রবিবারে আশেপাশের সহরগুলো থেকে শয়ে শয়ে লোক আসত ট্রেণে, বাসে, লরিতে ও সাইকেলে। তাদের দিনের মত কাজ দেওয়া হত, আট ঘণ্টা কি দশ ঘণ্টা কাজ করে তারা আবার বাড়ী ফিরে যেত।

'মুক্ত জার্মান তরুণ' সংস্থার ছেলেমেয়েরাও ছিল অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবক। তাদের কেউ কেউ কয়েক দিন মাত্র ছিল, অথবা ছুটির একাংশ একাজে ব্যয় করেছিল অথবা দু-এক সপ্তাহ ক্রুখস্টেডে সাহায্য করার জন্য তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে অনুমতি পেয়েছিল।

আর হান্স-অটোর উপরে ছিল তাদের সকলের দেখাশুনোর ভার। তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা, শোবার জায়গা ঠিক করে দেওয়া এবং বাড়ী ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা তাকে দেখতে হ'ত। কারখানাগুলোতে ওদের ছুটি বাড়ানোর কথা লিখতে হত তাকে। প্রশ্নের জবাব দিতে হ'ত, নালিশ শুনতে হ'ত, ঝগড়া মেটাতে হ'ত, এবং কোথাও কিছু গোলযোগ হ'লে তদন্ত করতে হ'ত। কাজটা সহজ ছিল না। অনেক কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে হ'ত,

এদিকে ধন্যবাদ জুটত সামান্যই। কিন্তু তার নিজস্ব ভঙ্গিতে সে কাজগুলোকে বেশ রাগে এনে ফেলেছিল। সমস্যার পাহাড় যতই জমুক সে তার দখল হারিয়ে ফেলত না বা কিংবা উচ্ছ্বাসবিহীন রসবোধ হারাত না।

ব্রুখষ্টেডে থাকার জন্য মার্টিনকে কারও কাছে অনুমতি নিতে হয় নি। তার বাড়ী ছিল ডুসেলডর্ফএ, (পশ্চিম জার্মানীতে), কিন্তু সেখানে তার কাজ ছিল না। সে বার্লিনের হুইটসান (ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব) সমাবেশে এসেছে এবং সেখান থেকে ব্রুখষ্টেডে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে গিয়েছে এ কথা প্রকাশ হ'লে তার বেকারভাতা আর পাওয়া যাবে কি না তাও সে জানত না।

হাইনৎস্-এর কথা ছিল ৫ই জুলাই উকিলের অফিসে ফিরে যাবার, কিন্তু তার আরও ছুটি মঞ্জুর হয়েছিল।

পেট্রা হারুম্স্-এর দোকানের ম্যানেজার তাকে যতদিন তার প্রয়োজন ততদিন থাকার অনুমতি দিয়েছেন, তিনি লিখেছেন, 'যতদিন না গ্রামটা পুনর্নির্মিত হয়'। দোকান থেকে ওঁরা তাকে একজোড়া শক্ত প্যাণ্ট এবং বিরাট এক বাক্স মিষ্টি পাঠিয়েছেন।

কিন্তু অনেককেই ফিরে যেতে হয়েছিল তাদের নিয়মিত কর্মক্ষেত্রে। তারা দুঃখের সঙ্গে বন্ধুদের ছেড়ে গেল এবং কথা দিয়ে গেল ১৬ই জুলাই রবিবারের বড় উৎসবের দিন ফিরে আসবে।

এদিকে কাজ দ্রুত এগোচ্ছিল। সংস্কৃতি ভবন অনেকখানি উঠে গিয়েছিল। এ বাড়ীটি পাহাড়ের উপর ছোট্ট একটি দুর্গর মত হবে—এটি হবে গ্রামের ভিতর নতুন দিনের প্রতীক। স্কুলের কাজটা অবশ্য আস্তে চলছিল, যে সমস্ত ইটের মিস্তিরিরা লাংগেনজালৎসা কিংবা মুয়েলহাউজেনে তাদের বাড়ীতে ফিরে যায় নি, তারা দেরীর সিফট-এর কর্মীদের সাহায্য দেবার জন্য রাত্রে প্রায়ই দু'এক ঘণ্টা বাড়তি কাজ করে দিত।

"আচ্ছা এমিল, তোমার কি মনে হয় তোমরা যথাসময়ে শেষ করতে পারবে?"

"হাঁ, হাঁ, আমরা ঠিক চালিয়ে নেব। ছেলেরা ভালই কাজ করছে। আর মেয়েটা কিরকম ইট বসাচ্ছে একবার দেখ!"

কাজের সময়ের নীল রঙের প্যাণ্ট, কোমরে ধূসর রঙের চট জড়ানো, কনুই পর্যন্ত হাতা-গোটান অবস্থায় পেট্রা আশ্চর্য দ্রুতগতিতে ইটের পর ইট বসিয়ে যাচ্ছিল, ছেলেদের তাড়া দিচ্ছিল তাড়াতাড়ি কাদা-বালি-সিমেণ্ট গোলা লেপে দেওয়ার জন্য।

"আর ওই দুটো ছেলের দিকে একবার দেখ।" কুনৎস্ তার সমবায়ের বন্ধুদের বলে—"ওরা দুই বন্ধু, দলের সর্বকনিষ্ঠ—ফ্রেডি আর ফ্রানৎস্। একেবারে গোড়া থেকে ওরা এই তালে কাজ করে যাচ্ছে। ওরা কাদা-বালি-সিমেণ্ট গোলা জোগায়। সমস্ত চুণ ওরা নাবিয়েছে। রাত্রে ওই কাদা-বালি-সিমেণ্ট নাবানো চারটিখানি কথা নয়, বুঝলে? আমাকে নজর রাখতে হয় যাতে ওরা অতিরিক্ত কাজ না করে। জুটিটি চমৎকার।"

এমিল কুনৎস তার নির্মাণকারী দলটির সম্পর্কে গর্ব বোধ করে। এই ছেলেগুলো তাকে ছুটিয়ে মেরেছে! তার ওজন কতটা কমে গিয়েছে বড়োদের তা দেখাতে গিয়ে হাসতে থাকে কুনৎস। ভুঁড়ি অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে বলে, যুবকদের দলের পাল্লায় পড়ে সেও আবার দোহারা চেহারার যুবক হয়ে যাবে আর কি!

স্কুল-বাড়ী তোলার মালমশলাগুলো বেশ ভাল। বাইরেটা পালিশ-করা নতুন ইট আর ভিতরটায় ফাঁপা ইট। টালিগুলোও ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে, যদিও এগুলো লাগানোর আগে আরও অনেক কিছু করতে হবে।

কাজকে বেশ বাগ মানিয়ে নিয়েছে পেট্রা। কাদা-বালি-সিমেণ্ট গোলা ইটগুলোকে বেশ শক্ত করে এঁটে

দিচ্ছিল। পেট্রা খুঁতখুঁত করে—যদি তার হাত দুটো আর একটু তাড়াতাড়ি চলত! যাই হোক সে তার যথাসাধ্য করছে। যখন সে তার অংশে বেশ কয়েক সারি ইট সাজিয়ে ফেলে এবং রলফ ও আর্থারকে ভারাটা উঁচু করে দেওয়ার জন্য ডাকতে পারে তখন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে তার। দেওয়ালগুলো ক্রমশই উঁচু হয়ে উঠছে, এবার তারা ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

কুনৎস হিসেব করে দেখেছে যে সংস্কৃতি ভবনের জন্য যত কড়ি-বরগা লাগবে তা পর পর সাজালে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দুই কিলোমিটার হ'ত। বাড়ীটাকে প্রকৃত সুন্দর ছাঁদে তৈরী করা হবে, যাতে গ্রামের লোক সেখানে সত্যি আনন্দ পায়। এ গ্রামেও কিছু চমৎকার ছেলেমেয়ে ছিল। বোহেমে যে "মুক্ত জার্মাণ তরুণ" দল সংগঠিত করেছিল তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে ক্ষেতগুলো থেকে কাদা তুলে ফেলেছিল। সন্ধ্যায় যদিও বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়ত তারা, তবুও তাদের পড়াশুনো ঠিক বজায় ছিল। ট্রাক্টরচালক এরিথ নাদানা লোকটা চমৎকার। যতক্ষণ গ্রাম থেকে শেষ কাদার স্তূপটা অদৃশ্য না হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ট্রাক্টর থেকে নামে নি। কুনৎস ভাবে চমৎকার লোক সর্বত্র আছে, ক্ষুদ্রতম গ্রামটিতে পর্যন্ত। এদের সঙ্গে থাকতে পেরে খুব খুশী হয় সে।

যত সময় যায় তরুণদের কাজ তত ভাল হ'তে থাকে। স্কুল-বাড়ীর দেওয়াল ঠিক সমভাবে উঁচু হয়ে ওঠে। রাত্রে বিরাট বিজলী বাতি জালিয়ে যারা কাজ করছিল এমিল কুনৎস মুখ তুলে তাদের দিকে চায়, তাদের এত তাড়াতাড়ি কাজ করতে সে আগে কখনও দেখে নি।

পেট্রা তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ে। সে যে কুনৎসকে গালি দেবার জন্য দুঃখিত এ কথা চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয় তার। তার মনে হয় কুনৎস এখন ওদেরই একজন হয়ে গেছে এবং সত্যিই ভাল লোক সে।

সময় যত যায় কাজ তত বাড়ে। সান্ধ্য আলোচনা, গ্রামের মধ্যে সাক্ষাৎকার, অন্যান্য নির্মাণস্থলে আলোচনা, পার্টিকর্মীদের বিশেষ সভা এবং শান্তি কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজ চলতে থাকে। হান্স-অটো ও মার্টিন আর দৈনিক পড়াশুনোর সময় করে উঠতে পারে না। যেটুকু কর্মহীন মুহূর্ত পাওয়া যায় তাই তারা এর জন্যে ব্যবহার করে নেয়।

লেনিনের বইটা পড়া ততটা সহজ হ'ল না, যতটা হান্স-অটো আশা করেছিল। সমস্যাগুলো ঠাসা বাক্যের মধ্যে দিয়ে উপস্থিত করা হয়েছে এবং যথেষ্ট পূর্বার্জিত জ্ঞান আছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কখনও কখনও ওদের একটা বাক্য তিনচারবার করে পড়তে হ'ত মানে বুঝতে পারার আগে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন মানেটা বুঝতে পারত তখন মনে হ'ত সত্যিই কিছু শেখা হয়েছে। আস্তে আস্তে তারা বুঝতে সুরু করল কিভাবে পৃথিবী চলছে এবং এর উন্নতি করতে হলে কি বিরাট কর্মকাণ্ড দরকার।

একদিন সন্ধ্যায় একটা রেডিও গাড়ি এল ক্রুখষ্টেডে। রিপোর্টাররা মিশে গেল ছোট ছোট দলগুলোর সঙ্গে যেখানে তারা বসে গল্পসল্প করছিল। তারা চাষীদের ও চাষীবৌদের জিজ্ঞাসা করল তাদের গ্রামে যে সাহায্য পেয়েছে সে সম্বন্ধে তারা কি মনে করে। নতুন করে চষা ক্ষেতে ট্রাক্টরচালকরা আবার বীজ বুনবার জন্য তৈরী হচ্ছে, সেখানেও পৌঁছল রিপোর্টারদের গাড়ি। তারপর তারা ছেলেমেয়েদের তাঁবুর ক্যাম্পে এল।

মার্টিন প্রথম বলল মাইক্রোফোনে। সে রাইনের তীরে তার জীবনযাত্রার কথা বলল, শ্রমজীবী জনসাধারণের পক্ষে কত কঠিন তার বিবরণ দিল। পশ্চিম জার্মানীর খবরের কাগজে ও রেডিওতে যে তীব্র

সোভিয়েত-বিরোধী প্রচার চলে সে কথাও সে উল্লেখ করল। কিন্তু সাধারণ লোক প্রকৃত শান্তির জন্য কি রকম আগ্রহশীল এবং বৃহৎ ব্যবসায়ের পুনরস্ত্রসজ্জার ও ঔপনিবেশিক দেশগুলিকে শোষণ করার সমস্ত পরিকল্পনায় তাদের যে কোনও উৎসাহ নেই সে কথাও বলল মার্টিন।

হান্স-অটো বর্ণনা দিল কিভাবে বন্যার পর ব্রুখষ্টেডে পুনর্নির্মাণের জন্য হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক এসেছে। এ বিপর্যয়টা প্রাকৃতিক, কোনও মানুষই ওই অস্বাভাবিক বর্ষণ ঠেকাতে পারত না, কিন্তু মানুষ পারে যুদ্ধ ও বোমাবর্ষণ ঠেকাতে—যুদ্ধ প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, মানুষেরই সৃষ্টি। আর শান্তি বজায় রাখাও মানবজাতির কাজ। এখানে এই ব্রুখষ্টেডে তারা এই রকমের কাজই করছে এবং এমনি কাজই তারা করতে চায়—এখানে এবং সর্বত্র।

তিনটি তরুণের দিকে চেয়ে পেট্রা দিলখোলা হাসি হাসে।

"মহিলাদের তাঁবুতে আজ রাত নয়টায় একটি ছোট্ট সান্ধ্যভোজের আসরে হান্স-অটো, মার্টিন ও হাইনৎস্‌কে নিমন্ত্রণ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের। সান্ধ্য পোশাক পরলেও চলে, না পারলেও চলে। কিন্তু অনুগ্রহ করে স্নাত-ধৌত অবস্থায় উপস্থিত হবেন।"

হান্স-অটো এবং মার্টিন সবিনয়ে নমস্কার করে, নিমন্ত্রণের জন্য মহিলাদের ধন্যবাদ দেয় এবং যথাসময়ে স্নাত ও ধূলিমুক্ত অবস্থায় উপস্থিত হবার প্রতিশ্রুতি দেয়। হাইনৎস্‌ মুখ বিকৃতি করে, যেন তার সন্দেহ হয় তাকে বোকা বানান হচ্ছে বলে।

"আমাকে?" সংশয়ভাবে সে জিজ্ঞাসা করে, "আমাকে কেন?"

ভাইমারের দোকানের বন্ধুদের কাছ থেকে একটা উপহারের বাণ্ডিল এসেছে পেট্রার জন্যে। তাতে ভর্তি নানা ভাল ভাল জিনিস—হ্যাম (শুয়োরের মাংস) জিভ ও সসেজ, টিন ভর্তি মাছ, আধ পাউণ্ড মাখন ও রাই বিস্কুট, মিষ্টি এবং দু বোতল হাঙ্গেরীয় মদ।

চিঠিটায় চুমা দিয়ে পেট্রা বলে, "অনেক ধন্যবাদ বন্ধুরা, তোমরা অনেক করেছ! এবার আমাদের একটা নৈতিকারের ভোজ হ'তে পারে।"

তারপর তিন বন্ধু আলোচনা করতে বসল কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করবে।

"যদি ইরমা শোনে তা হ'লে থাকতে পারল না বলে সে খুব দুঃখ করবে।" আডা বলে।

ইরমা ছিল গোলগাল এবং খেতে ভালবাসত। কয়েকদিন আগে তাকে ইয়েনায় ফিরে যেতে হয়েছিল কারণ তার ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তার কারখানা আর ছুটি বাড়াতে রাজি হয় নি।

"সে কথা ঠিক", হেসে ওঠে এরিকা, "ভাল ভাল পুরাণো জিনিস তার খুব ভাল লাগত, তাই না?"

"তিনজন ছেলেকে আমাদের নিমন্ত্রণ করতে হবে অবশ্য, কিন্তু কোন্ তিনজন সেই হল কথা।"

"হান্স-অটো"।

"বেশ একমত, আর কে?"

"মার্টিন?"

"বেশ, ফের একমত হওয়া গেল। একজন পূর্ব জার্মানীর লোক, আর একজন পশ্চিম জার্মানীর। উপযুক্ত সংমিশ্রণ। কিন্তু এবার আমার পছন্দ করার পালা, তাই ত?"

"আমার মনে হয় আমি বলব—হাইনৎস্‌কে।"

অন্য মেয়ে দুটি জবাব দেয় না। যদি কারও কথা তারা সবার শেষে ভাবত সে হ'ল হাইনৎস্‌। "হাইনৎস্‌ আবার কেন? সে কিছুতেই অন্যদের সঙ্গে খাপ খায় না।" মুখ বিকৃতি করে এরিকা।

"ওই, তোমার সব উদ্ভট চিন্তার আর একটা!" সে গজর গজর করতে থাকে, "ওই শুকনো হাড়ের বস্তা নিয়ে কি হবে? একটা রসিকতা বুঝতে পারে না, একটা গান পর্যন্ত গাইতে পারে না।"

আড়া মাথা নেড়ে বলে, "ও ব্যাং-মুখ দেখলে আমার ক্ষিদেই মাটি হয়ে যাবে। থেকে থেকে যত উদ্ভট ধারণা জোটে বটে তোমার মাথায়, পেট্রা!"

"আমরা যদি একটু সহৃদয় ব্যবহার করি তা হ'লে ও কিছু মাটি করবে না", জোর করে পেট্রা। "তা হ'লে কি হ'ল? আমরা ওকে নেমন্তন্ন করছি ত?"

"আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি, যখন নিতান্তই করতে চাও!"

কাঁটায় কাঁটায় নটার সময় খাবার তৈরী হয়ে গেল। প্যাকিং বাক্সের উপর একটা পরিষ্কার চাদর বিছিয়ে নিয়েছিল ওরা, তার উপর সত্যিই লোভনীয় খাদ্যসামগ্রী সাজিয়েছিল। প্যাকিং বাক্স ঘিরে ওরা কম্বল এবং বালিশ সাজিয়ে দিয়েছিল। একটা মাত্র যে চেয়ার জোগাড় হয়েছিল তার উপর সাজানো ছিল মদের বোতল দুটো এবং আড়ার জোগাড় করা ছটা ছোট পানপাত্র।

অতিথিরা এল স্নাত এবং বিদায়-সম্বর্ধনার জন্য সুসজ্জিত হয়ে। রবিবারের নীল স্যুটে যথাযথ ভাবে সজ্জিত হয়ে এসেছিল হাইনৎস্‌, কিন্তু ব্যাপারটা সম্বন্ধে তখনও তার সন্দেহ ছিল বলে মনে হয়। হান্স-অটোর কাছাকাছি থেকে মোটা চশমার ফাঁক দিয়ে সাবধানে ভাল করে দেখছিল সে।

"মদ?" ঠোঁট চেটে হান্স-অটো বলে, "এই, একেই বলি আসল ভোজের আসর!"

"আর হ্যাম?" মার্টিন বলে, "আমি ত মনে করতে পারছিনে শেষবার কখন এরকম হ্যাম চোখে দেখেছি।"

তারা বেদুইনদের মত হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল পেট্রার নির্দেশিত জায়গায়। সেই গৃহস্বামিনীর ভূমিকা নিয়েছিল। সে আবার ব্যাখ্যা করল কি ভাবে কেবল গতকাল উপহারের বাণ্ডিল পৌঁছেছে।

"এবার তোমরা সবাই বসে যত পার খাও", পেট্রা বলে, "নইলে কিন্তু আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হব। দাঁড়াও, গোড়ায় একটু মদ।"

মার্টিন বোতল খুলে দিল এবং পেট্রা গ্লাস ভর্তি করল। সে ছোটখাট একটা বক্তৃতাও করে ফেলল:

"প্রিয় বন্ধুগণ," গ্লাসটা তুলে ধ'রে বলল সে, "তোমরা ভাবতে পারবে না আমাদের এই তাঁবুতে, আমাদের টেবিলে তোমাদের পেয়ে আমি কতখানি খুশী হয়েছি। গ্রামটা ফের গড়ে তোলার কাজ প্রায় আমাদের শেষ হয়ে এসেছে, স্কুল এবং সংস্কৃতি ভবনও যথাসময়ে শেষ হয়ে যাবে। তারপর আমরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ব, আবার হয়ত অনেকদিন পর্যন্ত দেখা হবে না, হয়ত বা মোটেই দেখা হবে না, কে বলতে পারে? এখানে এই রুখশুখে কাটানো সময়টার কথা প্রায়ই আমরা ভাবব, মনে পড়বে এক একবার কি রকম কঠিন সময় গেছে। তোমাদের কাছে বলতে বাধা নেই গোড়ায় আমার খুব শক্তি লেগেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চমৎকার লাগল। একটা পুরো গ্রাম ফের গড়ে তোলায় সাহায্য করা, মানুষকে আবার সুখী হতে সাহায্য করা চমৎকার

জিনিস। আমি জানি তোমাদেরও এই অনুভূতি, আমাদের অন্য বন্ধুদেরও তাই। কিন্তু তোমরা যারা এখানে এসেছ তারা আমার সত্যিকারের বন্ধু। কাজেই এস বন্ধুত্বের উদ্দেশ্যে আমরা পান করি।"

"বন্ধুত্ব! বন্ধুত্ব"—গ্লাসে গ্লাস ঠেকায় ওরা।

"পেট্রা, তুমি একটি চমৎকার মেয়ে"—হান্স-অটো বলে

সকলে হৈ হৈ করে ওঠে, "এই চুপ, এখানে প্রেম নিবেদন চলবে না।"

সশব্দে তারিফ করে পান করতে থাকে ওরা। মদটা সত্যিই ভাল। তারপর সুরু হয় খাওয়া।

১৫ই জুলাই হ'ল কাজ সুরু হওয়ার থেকে পঞ্চাশতম দিবস। দিনটা ছিল শনিবার। সকালটা অন্ধকার হয়েছিল বটে, কিন্তু তারপর থেকে উজ্জ্বল সৌরকর দেখা দিল। থুরিঙ্গিয়ার স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী একটি বক্তৃতা দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বন্যাপ্লুত গ্রামটি প্রতিশ্রুত পঞ্চাশ দিনের মধ্যেই পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কি কি তৈরী করা হয়েছে তার একটি বিস্তৃত বিবরণ তিনি পেশ করলেন: দশটা নতুন খামারবাড়ী, আঠারটা গোশালা, গ্রামের সাতটা বসতবাড়ী, একটি সংস্কৃতি ভবন, একটি স্কুল, একটি নার্সারী স্কুল, একটি লণ্ড্রি ও একটি ভোজনশালা। হাজার হাজার লোক সাহায্য করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন কিভাবে এঁরা সারা দেশের কলকারখানা, দোকানপাট, সরকারী অফিস, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্রীড়াসংস্থা থেকে এসেছেন। বিরাট পরিমাণ অর্থ—দশ লক্ষ মার্কেরও বেশী—সংগৃহীত হয়েছে এই সাহায্যের কাজের জন্য। তারপর তিনি সাংবাদিকদের নিমন্ত্রণ জানালেন পরদিন ব্রুখষ্টেডে উপস্থিত থেকে কৃষকদের নবগৃহ-প্রবেশ প্রত্যক্ষ করতে।

রবিবারে রৌদ্র ও বর্ষা পরস্পরকে ধাওয়া করল সারা আকাশ জুড়ে। কালো-লাল-সোনালী খচিত পতাকায় এবং লাল ও নীল পতাকায় গ্রামটা পুলকিত হয়ে উঠল। সতেজ সবুজ বৃক্ষশাখায় তোরণ ও বেড়াগুলো সুসজ্জিত হ'ল। গ্রামপথের এধার থেকে ওধারে পতাকা, ফুলের মালা ও পোষ্টারের মালা ঝুলতে লাগল।

গ্রামবাসীরা তাদের সব চাইতে ভাল পোশাক বের করল। চওড়া কালো কর্ডুরয় ভেলভেটের প্যাণ্ট এবং সাদা সার্ট পরে ছুতোররা গ্রামের পানশালার সামনে দাঁড়িয়ে রবিবারের পোশাকে সজ্জিত চাষীদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। বন্যা থেকে যা-কিছু ভাল কাপড়-চোপড় বাঁচাতে পেরেছে তাই পরল চাষীবউয়েরা। হাতে এমব্রয়ডারী করা মোটা গাঢ় রঙের স্কার্ট, বিরাট ঘটি-হাতা সাদা ব্লাউজ তাদের পরণে। কোনও কোনও চাষী প্রপিতামহের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কৃষকের বহুকালপ্রচলিত পোশাক পরল। আটসাঁট প্যাণ্ট, তলার দিকে সুঁচোলো জ্যাকেট এবং ভেলভেটের ওয়েষ্টকোট পরা তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন আর এক শতাব্দী থেকে নেবে এসেছে।

পাহাড়ের উপর তরুণদের ক্যাম্পে বিপুল কর্মচাঞ্চল্য! সূর্য যখন বেরিয়ে এল তখন চেরীগাছের তলায় প্রজাপতির মত নীল সার্টগুলোর উপর উজ্জ্বল আলো পড়ল। ছেলেমেয়েরা সেদিন খুব খোসমেজাজে, কারণ সেদিন তাদের অনেক প্রশংসালাভ হয়েছে। আর স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সরকার যে পরিমাণ বোনাস বিতরণ করেছেন তা অনেকেরই আশার অতীত। এ টাকা কিভাবে খরচ করা হবে তার পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে। কেউ কেউ ঠিক করেছে থুরিঙ্গিয়ার পাহাড় অঞ্চলে পদযাত্রায় বেরোবে। কেউ ভাবছে একটা সাইকেল কিনবে।

পেট্রা শঙ্কাতুরভাবে বাতাসের গন্ধ শোঁকে। কয়েকদিন ধরে মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে। সে ভাবে, জায়গাটা সত্যিই একটা স্যাঁতসেঁতে গর্ত, দুই পাহাড়ের মাঝখানে গোঁজা। কিন্তু সেদিন আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না। শেষ মেঘখানাও অদৃশ্য হয়ে গেল বিস্তৃত নীল দিগন্তকে মুক্ত রেখে।

মেয়েদের তাঁবু থেকে সোজা দৃষ্টি যায় উপত্যকা পার হয়ে সংস্কৃতি ভবন ও স্কুলটির দিকে। স্কুলপ্রাঙ্গণে পতাকাদণ্ডের উপর একটি নীল পতাকা (মুক্ত জার্মাণ তরুণদলের পতাকা) সানন্দে উড়ছে। মেয়েদের দলের অধিনায়িকা হিসাবে এটি পেট্রাকে উপহার দেওয়া হয়েছে। সে প্রতিবাদ করে বলেছে বাচ্চা ফ্রেডি এবং ফ্রানৎস্ না থাকলে তারা কখনও এত ভাল করে কাজ করতে পারত না। ওরা দুটি প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত কাজে লেগে থেকেছে এবং সবসময়ে শ্রেষ্ঠ কর্মী বলে গণ্য হয়েছে। তারা অবশ্য মোটা বোনাসও পেয়েছে। পেট্রা এবং তার দল ওদের প্রত্যেককে একটি করে নীল সার্ট, রুমাল, মোজা এবং ম্যাক্সিম গোর্কীর তিনখানি করে বই উপহার দিয়েছে। বাচ্চা দুটো বরাবরকার মতই লাজুক রয়ে গেছে—তারা সবসময়ে পিছনে থাকতেই চেয়েছে এবং নিজেদের কা নিয়ে হৈহল্লা করেনি। এখনও তারা খুবই কম কথা বলে, কিন্তু এই উপহার পেয়ে তারা যে কত খুশী হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে।

স্কুলবাড়ীর বাইরেটা তৈরী হয়েছে। ভিতরকার গৃহসজ্জা এখনও হয় নি। তার জন্য বিশেষজ্ঞ লাগবে কারণ স্কুলের দেওয়ালে কাঠ লাগানো হবে, জানলায় ফুলের বাক্স বসানো হবে এবং মাছ রাখার জন্য গাঁথনি করা জলাধার তৈরী হবে।

এই পঞ্চাশ দিনে এমন কি চাষীরাও তাদের কোণ থেকে বেরিয়ে এসেছে। হয়ত তাদের জীবনে এই সর্বপ্রথম এ অনুভূতি হয়েছে যে দেশের জীবনে তাদেরও কিছু গুরুত্ব আছে। তাদের গ্রামের বাইরে কি হচ্ছে সে বিষয়েও তারা অনেকটা আগ্রহ দেখাতে সুরু করেছে। সহর থেকে আসা লোকেদের এবং তরুণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের সংসর্গের একটা ফল ফলেছে।

তরুণেরা গান গাইতে গাইতে মার্চ করছে। তাদের তাঁবুর ক্যাম্প থেকে তারা নীচের গ্রামের ভিতর চলেছে। সংস্কৃতি ভবনে উৎসবে যোগ দেবার জন্য তারা সোজা পথ না ধরে ঘুরে যাচ্ছে, যাতে সমস্ত নতুন বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে পারে। তাই একবার গ্রামের ঢালুদিকটায় নেবে আবার উপরে উঠবে। উজ্জ্বল সূর্যালোক ঝকঝক করছে, সবাই হাসিঠাট্টা করছে, ছুটে আসছে ওদের মিছিল দেখতে এবং উৎসবের জন্য ক্রুখষ্টেডে সমাগত দর্শকদের দেখতে।

পানশালার সামনে বিরাট এক পাল গরু-বাছুর, শুয়োর ও ছাগল জড়ো করা হয়েছে, আগের দিন রাত্রে লরীতে ক'রে বাক্স বাক্স তাজা হাঁস এসেছে। আবার আরও লরী এসেছে প্রায় পুরো একটা মুরগীর ভাণ্ডার বয়ে। প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র থেকে ক্রুখষ্টেডের জন্য সাহায্য এসেছে। গ্রামের বুড়ো রাখাল লুকাশ যে পঞ্চাশ দিন আগে বলেছিল সবই গেল, এবং আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, সে আজ উত্তেজনায় আত্মহারা।

সংস্কৃতি ভবনের সামনে একটা সাময়িক কঠোর মঞ্চ খাড়া করা হয়েছে এবং গ্রামের মেয়র সেখানে কিছু ধন্যবাদজ্ঞাপক কথা বললেন। তিনি কিছু বক্তা নয়, তবু তাঁর অনুভূতি সম্বন্ধে ভুল বোঝবার কোনও উপায় নেই। তারপর পরে পরে অনেকে বলতে উঠলেন, যা কিছু বলা হ'ল তার মধ্যে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সাহায্যের একটা সত্যিকারের অনুভূতি ফুটে উঠল।

যারা এই বিপুল সাহায্য করেছেন মন্ত্রীমশাই তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন। একের পর এক শ্রেষ্ঠ কর্মীদের মঞ্চে ডাকা হ'ল: এমিল কুনৎস্ তার তরুণ বন্ধুদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে জোরগলায় তারিফ করল। ফ্রেডি ও ফ্রানৎস্ একটাও কথা উচ্চারণ করতে পারল না, লজ্জায় লাল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মার্টিন ডেন্‌গেলমান্, যে কখনই লাজুক বলে পরিচিত ছিল না, সে কিছু বলতে গেল কিন্তু ভাষা খুঁজে পেল না।

তারপর এল পেট্রার পালা। সেও ক্যাকাশে হয়ে গেল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়ে হাসল; কারণ সে এই বিশেষ সম্মানটার জন্য সত্যি, মনে মনে আগ্রহান্বিত ছিল।

আডাকে সে কানে কানে বলে: "ভাইমারে ওদের চোখ গোল গোল হয়ে যাবে না?"

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে যেতে যেতে যখন সে মৃদুস্বরে বলে, 'এ কাজ ইট গাঁথার চেয়ে শক্ত, তখন সবাই হেসে ফেলে। যখন সে শেষ পর্যন্ত মঞ্চের কাছে পৌঁছল তখন মন্ত্রীমশাই তাকে তুলে নিলেন।

তিনি হেসে বললেন "একে ভাল ক'রে দেখে রাখুন, এ মেয়ে ইটগাঁথিয়ে দলের অধিনায়িকা।"

যখন উনি তাকে তার আসল পেশা কি জিজ্ঞাসা করলেন তখন উত্তেজনায় জবাব দিয়ে উঠতে পারলনা পেট্রা। তার দল তার প্রিয় গানের সুর ধরল। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তার যোগ দিতে কিন্তু গলাটা গেল বন্ধ হয়ে এবং দুই গণ্ড বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল···

সন্ধ্যাবেলায় পানশালায় নাচের আয়োজন হ'ল। পুলিশ দল ব্যাণ্ড বাজাল। ইটগাঁথিয়ে এবং ছুতোররা হ'ল পয়লা নম্বরের নাচিয়ে। গ্রামের ছেলেরা তাদের কাছে দাঁড়াতে পারল না।

ছেলেমেয়েরা শেষবারের মত পাহাড়ের উপর চেরীগাছের তলায় জড়ো হ'ল। পঞ্চাশ দিন আগে তারা পরস্পরকে প্রায় চিনতই না। একসঙ্গে তারা বার্লিনের পথে হুইটসান সমাবেশের দিন মার্চ করেছে, তারপর একসঙ্গে তারা ব্রুখ্‌ষ্টেডে একটা ভাল কাজ করেছে। মনে হচ্ছিল এত তাড়াতাড়ি বিদায় নেওয়া বড় দুঃখের কথা। তারা পরস্পরের ঠিকানা নেয়, প্রতিশ্রুতি দেয় চিঠি লেখার এবং কাজ ও বন্ধুত্বের মধ্যে অতিবাহিত এই দিনগুলোকে কখনও না ভোলার। জার্মানীর সর্বত্র তাদের মত এই একই চিন্তা নিয়ে আরও বহু তরুণ তরুণী কাজ করে যাচ্ছে একথা ভেবে ভরসা পায় তারা।

মার্টিন শেষ পর্যন্ত ডুসেলডর্ফ-এই ফিরে যাচ্ছে। সে অনুভব করে যে তার সেখানকার বন্ধুদের সে ছেড়ে দিতে পারে না, তাদের দরকার রয়েছে ওকে।

আর এক ঘণ্টার মধ্যে ভাইমার থেকে মোটর আসবে পেট্রা, আডা আর এরিকাকে নিতে, পরদিন সকালে বাড়ী পৌঁছবে ওরা।

হাইনৎস্‌ই বোধহয় সবচেয়ে বেশী ক'রে অনুভব করে এই বিদায়মুহূর্তকে। সে কি এরকম চমৎকার বন্ধু আবার পাবে? তার আবার উকিলের অফিসে ফিরে যেতে এবং জীবনের অন্ধকার দিকটার সঙ্গে অবিরত সংযোগে আসতে ইচ্ছে করছিল না। কাজেই হান্স-অটো যখন তাকে কাজকর্ম গোটানর জন্য তাঁবু ইত্যাদি প্যাক করার জন্য থাকতে বলল তখন সে খুশী হ'ল।

ওরা চেরী গাছের নীচে বসল, শেষ সন্ধ্যা অপ্রত্যাশিত বিমর্ষতা নিয়ে এসেছে।

"আকাশের দিকে চাও, দেখ পাহাড় আর উপত্যকার দিকে। দেশটা আমাদের সুন্দর নয় কি?" শেষ পর্যন্ত পেট্রা বলে।

কেউ কথা বলে না। ওরা ভাবে—হাঁ থুরিঙ্গিয়া সত্যিই সুন্দর। তেমনিই সুন্দর তাদের অসুখী বিভক্ত মাতৃভূমি জার্মানী। মনে মনে তারা সঙ্কল্প করে যে মাতৃভূমিকে সুন্দর, স্বাধীন, সুখী ও আবার এক করতে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

আডা গান ধরে :

"ঝড় হ'ল অবসান,
নিভে গেল শেষ বিদ্যুৎজ্বালা,
এবার শুধু উজ্জ্বল নীল দিগন্ত, তোমার
সোহাগে আনত
আমার মাতৃভূমি!

পেট্রা এবং এরিকার তরুণ কণ্ঠ যোগ হয়, চেরীশাখার উপর দিয়ে ভেসে যায় তাদের সম্মিলিত সানন্দ সঙ্গীতের রেশ।

—)০(—

প্রাচীন পোলিশ নৃত্য—

বৃদ্ধ বৃদ্ধার নৃত্য

(উপন্যাস)

আমি পুনর্জন্ম দেখেছিলাম

রামপদ মুখোপাধ্যায়

বিচারক বললেন, আশ্চর্য্য, তুমি নিজেকে ডিফেণ্ড করতে চাইছ না কেন? যত বড় অপরাধীই হোক আইন প্রত্যেককে তার নির্দোষিত্ব প্রমাণ করার অধিকার দিয়েছে। সে সুযোগ কেন নিচ্ছ না তুমি?

মেয়েটি মাথা তুলে নির্ভীক কণ্ঠে বলল, কি হবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে! আমি নির্দোষী প্রমাণিত হলে কি সমাজ থেকে অন্যায় অত্যাচার দুষ্কৃতি দূর হয়ে যাবে?

বিচারক বললেন, অন্যায় অত্যাচার দুষ্কৃতির চেহারা এক রকমের নয়। একজন মানুষ বিশেষ একটি অপরাধের দায় থেকে মুক্ত হলে—সেই রকম অন্যায় যে আর ঘটবে না এ নয়। কিন্তু সেই অন্যায়ের চেহারাটা সাধারণে জানতে পারে, এবং তার শাস্তির কথাটাও তাদের মনে থাকে।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, না, শাস্তির চেহারাটা মনে থাকে না। থাকলে একই রকমের অন্যায় বার বার কেন ঘটে? খুন করলে চরম দণ্ড সব মানুষই জানে—অথচ আজ পর্য্যন্ত হাজার হাজার মানুষ ফাঁসীকাঠে ঝুলেও এই অপরাধের ভয়াবহ পরিণতিকে মানুষের মনে স্থায়ী করতে পারল না!

তা হ'লে তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছ বিনা প্রতিবাদে?

আমার প্রতিবাদের কি মূল্য! নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টায় সাধারণের কৌতুক আনন্দকে বাড়াতে আমি চাই না।

তোমার বয়স অল্প—সামনে দীর্ঘ জীবন পড়ে রয়েছে। চেষ্টা করলে দোষ স্খালন করে তোমার ভবিষ্যতকে ভালভাবেই তৈরী করে নিতে পারবে। আইন তোমাকে সেই সুযোগ দিচ্ছে।

অল্প হেসে মেয়েটি আবার মাথা নাড়ল। আইন আমাকে কতটুকু সুযোগ দিতে পারবে! কোর্ট থেকে ছাড়া পেলেই কি আমার আর্থিক সচ্ছলতা আসবে? পুরণো ঘরে যে জায়গাটিতে ছিলাম সেইখানেই থাকতে পারব? আত্মীয়স্বজন বন্ধু প্রতিবেশীরা আমাকে সহজভাবেই গ্রহণ করবেন?

বিচারক বললেন, এ সমস্তই তোমার সদ্‌গুণের উপর, উন্নত চরিত্রের উপর নির্ভর করছে। চেষ্টা করলে ভালভাবেই জীবন যাপন করতে পারবে।

মেয়েটি বলল, আপনি কেতাবের কথা বলছেন। আমাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ সংসারের ব্যবস্থার সঙ্গে মেলে না। চরিত্র হ'ল কাচের পাত্র। একটু চিড় ধরলে ব্যবহারযোগ্য থাকে না।

বিচারক বললেন, এমন বহু দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে—যারা কঠিন অপরাধের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে জীবনকে নতুন করে গড়ে তুলেছেন।

তাঁরা ভাগ্যবান। ধনবলে জনবলে সৌভাগ্যবান তাঁরা। আমার মত সাধারণ ঘরের মেয়েরা, দরিদ্র মেয়েরা, যাদের চরিত্রে দাগ ধরার আগেও জীবন দুঃসহ বোধ হয়, তারা কোন্ মন্ত্রবলে সেই নিরাশা দুর্দ্দশার স্তর থেকে উপরে উঠবে—ভাবতেও পারি না। আপনি জানেন কি, কি ভীষণ অভাব, অনটন, বঞ্চনার রাজ্যে আমরা বাস করি? আগে সেই রাজত্বের শেষ হোক—তার পর নতুন করে জীবন যাপনের কথা ভাবতে পারব।

বলতে বলতে মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে উঠল। দু'হাত উপরে তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল আমাকে আপনি শাস্তি দিন, যা চরম দণ্ড তাই দিন—

তোমাকে আরও এক সপ্তাহ সময় দিচ্ছি ভাল করে ভেবে দেখ। জীবন ঈশ্বরের দান—তা অন্যায় ভাবে নষ্ট করার অধিকার কারও নাই। তোমার বয়স অল্প, ভেবে দেখ—

হঠাৎ মেয়েটি দু'হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠল।

বিচারক আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। ওঁর উপদেশ মেয়েটির মর্ম্মস্পর্শ করেছে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন।

আমরাও আশ্বস্ত হলাম ঘটনাটি ওঁর সহৃদয়তাকে, ওঁর ভিতরের মমত্বময় মানুষটিকে জাগাতে পেরেছে বলে।

এই ঘটনায় আমিও ছিলাম একজন প্রধান সাক্ষী। আমাকেও আদালতে শপথ নিয়ে বলতে হয়েছিল—আমার জ্ঞানবুদ্ধি মত ঘটনার যে অংশটুকুর সঙ্গে আমি জড়িত। আরও অনেক অবান্তর প্রশ্ন করেছিলেন আইনজ্ঞেরা। স্বীকার করছি—সবটা খোলাখুলি বলতে পারি নি। সেই স্বীকৃতি কোন এক পক্ষের বিরুদ্ধে যাবে বলে আমার ধারণা হয়েছিল। চেয়েছিলাম দু পক্ষই সসম্মানে বার হয়ে আসুক এই জঘন্য জটিল চক্রান্ত জালের ভিতর থেকে।

এটা আমাদেরই পাড়ার ঘটনা। এই ঘটনার নায়ক আনন্দ আমার বন্ধু। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বলতে গেলে ছাত্র জীবনের সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত একই স্কুল কলেজ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমরা এগিয়েছি। ডিগ্রী কোর্স শেষ হবার বছরখানিক আগে আনন্দ একদিন কলেজ থেকে উধাও হয়ে গেল। কলেজের শুকনো বিদ্যায় ওর নাকি মন বসত না—এ কথা ইদানীং ওর মুখে প্রায়ই শুনতাম। ও আক্ষেপ করত, বৃথায় কেটে যাচ্ছে দিন—জীবনকে পুষ্ট ও তুষ্ট করার আহার্য্য সংগ্রহ করতে পারছি না।

ওগুলো ভাবালুতার খেয়াল বলে আমরা হেসে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু, ও চলে যাওয়ার পর আমি নতুন করে ভেবেছিলাম। কার্য্যকারণের সূত্রগুলি এক করে যা সিদ্ধান্ত করেছিলাম তা এই :—

একদা ইস্কুলের পারিতোষিক বিতরণী সভায় ও একটি উদ্বোধন সঙ্গীত গেয়েছিল। সভাপতি ছিলেন একজন পদমর্য্যাদায় ভারি রাজপুরুষ। তিনি ওর গানের প্রশংসা করে বলেছিলেন, এ বিষয়ে চর্চ্চা রাখবে—বুঝলে, ভবিষ্যতে নাম করতে পারবে।

সত্যিই ওর গানের গলাটি চমৎকার। মিষ্ট, ভরাট, দরদী কণ্ঠস্বর। যেন অনেক দিনের সাধনায় এই জিনিসটি ও আয়ত্ত করেছে। সেই সাধনার মূল উৎস একদিন ওর বাড়ীতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম।

ওদের বৈঠকখানা-ঘরে সঙ্গীত সাধনার যন্ত্রগুলি দেখে আমি সবিস্ময়ে বলেছিলাম, তাই বল! আমাদের অনুমান ঠিক। রীতিমত চর্চ্চা না করলে এমন জিনিস কি সম্ভব!

আনন্দ বলেছিল, বিশ্বাস কর—ও সব যন্ত্রে হাত দেবার যোগ্যতা আমার নেই। ও সব বড় তরফের সম্পত্তি। বাবা আর জ্যেঠামণি ওঁর মালিক। ওঁরা এক সময়ে নাকি ওস্তাদ রেখে গানের চর্চা করতেন। এখন মাঝে মাঝে ছুটিছাটার দিনে আসর বসান। কোন বড় গাইয়ে বাজিয়ে শহরে এলে আমাদের বৈঠকখানা না ছুঁয়ে যেতে পারেন না। আমরা কিন্তু ঐ মহলে সদাসর্ব্বদা ঢুকতে পারি না। তবে একেবারে অস্পৃশ্য করেও রাখেন নি। সকাল-সন্ধ্যায় ওঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রার্থনা সঙ্গীত ভজন গান কীর্ত্তন কখনও কখনও—প্রতিদিনই গাইতে হয়। মানে আমাদের ফ্যামিলি ট্রাডিশন—ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসছে।

পড়ায় ক্ষতি হবে বলে ওঁরা মনে করেন না!

না, ওঁরা বরঞ্চ উৎসাহই দেন। জ্যেঠামণি বলেন, আমার গলা নাকি মার্গ সঙ্গীতের উপযোগী। ওঁর একান্ত ইচ্ছা, এদিককার ডিগ্রী কোর্স শেষ হলে ওদিককার ডিগ্রী কোর্সে ঠেলে দেবেন।

তোর কি ইচ্ছে? জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

আমার গান গাইতে বেশ ভাল লাগে। কলেজের পড়া সময়ে সময়ে শুকনো মনে হয়। ভাবি, কতদিনে এ কোর্স টা শেষ হবে!

শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য রাখতে পারে নি আনন্দ—এদিকের কোর্স শেষ না করেই উত্তর প্রদেশের রাজধানীতে পাড়ি জমিয়েছিল। তিনটি বছর ওর কাছ থেকে কোন পত্র পাই নি। ওদের বাড়ীতে গিয়ে মাঝে মাঝে খবর নিয়ে আসতাম। ওর বাবা বলতেন, ভালই আছে। লক্ষ্ণৌর ভাতখণ্ডে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে। বেশ প্রোগ্রেস করছে।

একদিন বলেছিলাম, আপনাদের কি মনে হয় না—এদিকের কোর্স টা শেষ করে গেলেই ভাল হত?

উনি বলেছিলেন, দাদা বলেন, ওটাও একটা বড় বিদ্যা। বিদ্যার ছোট বড় নাই—যে যেটা সহজভাবে নিতে পারে—নিয়ে আনন্দ পায়—তাতেই তার লাভ। দাদা আবার আইডিয়ালিস্ট কি না—টাকা-কড়ির দিকটা তেমন বুঝতে চান না।

আপনি? প্রশ্নটা করে জিভ কেটেছিলাম। মনে হয়েছিল, ধৃষ্ট প্রশ্ন। উনি হয়ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন।

আশ্চর্য্য প্রশ্ন! উনি হেসে বলেছিলেন, আমি আর কি বলব। কোন রকমে চলে যাচ্ছে সংসার। অভাব নেই, কষ্ট নেই, কিসের অভিযোগ করব!

সেই থেকে পরিবারটির উপরে শ্রদ্ধা পোষণ করে আসছি।

তিন বছর পরে লক্ষ্ণৌ থেকে চিঠি লিখেছিল আনন্দ, সুব্রত, শুনে খুসি হবে—এবার ভাতখণ্ডে কলেজ থেকে 'মধ্যমা' পাশ করেছি ভালভাবে। একেবারে প্রথম হয়েছি। এইবার 'সঙ্গীত বিশারদের' ক্লাস নেব। দুটি বছর। তার পর আরও দুটো বছর গেলে 'সঙ্গীত নিপুণ' হয়ে কলকাতায় ফিরব।

সাত বছর পরে ও ফিরে এসেছিল কলকাতায়। আমরা তখন যে যার কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে পড়েছি।

ভাতখণ্ডে কলেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসে মোটামুটি একটা লাভ হয়েছিল আনন্দর। কলকাতার দুটি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করত—তাছাড়া অনেকগুলি ছাত্রছাত্রীও পেয়েছিল। ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা ত ছিলই, সব রকম গানের উপযোগী গলাও ওর তৈরী হয়েছিল। এতে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, এখন কি মনে হয় জানিস—আমরা এতদিন ভূতের ব্যাগার খেটে মরেছি—জীবন-ধারণের রসদ জোগাড় করতেই প্রাণান্ত। আর তোর হাতে কত সহজে রস ও রসদের চাবিকাটি তুলে দিয়েছেন বিদ্যাদেবী!

আনন্দ হেসে বলত, এমনিই ধরন জগতের—

যা চাই তা ভুল করে চাই,

যা পাই তা চাই না!

ওরে সব জিনিষই ওপর ওপর দেখতে বেশ—কিন্তু ভেতরের চেহারা আলাদা। ডিগ্রী পেয়েছি, উপার্জ্জন করছি ভাল, তবু সুর-সরস্বতী ধরা দিচ্ছেন না।

ইদানীং উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ও উঠে-পড়ে লেগেছিল। কিন্তু তারই মধ্যে এই বিপর্য্যয়।

প্রতিমাকেও জানি ছেলেবেলা থেকে। ওদের সঙ্গে দূর আত্মীয়তার একটি সূত্রও যেন এক সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছিল। ওর বাবা যতীশবাবুকে আমরা শ্রদ্ধা করতাম সেকালের গ্র্যাজুয়েট বলে নয়, এককালে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন বলেও না, (ও সব বৃত্তান্ত পরে জেনেছিলাম।) কেমন একটা নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব সর্ব্বাঙ্গে বহন

করে চলতেন ভদ্রলোক—তারই মাধুর্য্যটুকু আমাদের আকর্ষণ করত। উনি কোনদিন পাড়ার ধনাঢ্যদের বৈঠকখানায় গিয়ে বসতেন না, বাজারের থলে হাতে পথে দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে গল্প জমাতেন না, কিংবা কোন দিন ওঁকে চায়ের দোকানেও দেখি নি। বাজারে যাবার পথে দশ মিনিটের জন্য আমাদের অবৈতনিক পাঠাগারে একবার চুঁ মারতেন। ওটা আমাদের বাইরের ঘরেই ছিল, আমরা পাড়ার ছেলেরা মিলে এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে বাইরের চাঁদা তুলে একটা আলমারি ভর্ত্তি করেছিলাম। তিন-চার খানা খবরের কাগজ, সেও এ বাড়ী ও বাড়ীর সম্পত্তি। কর্ত্তারা সকালে একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রাক্-আপিস কর্ম্মে মন দিতেন —তার পর আহারাদি সেরে কর্ম্মস্থলে ছুটতেন। আমরা সেগুলি সংগ্রহ করে আমাদের পাঠাগারের টেবিলে রাখতাম। সকাল বেলাকার নিয়মিত পাঠক বড় একটা ছিল না—পাঠাগার জমত সন্ধ্যার একটু আগে থেকে। রাত আটটার পরে কর্ত্তাদের যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ পড়ার উৎসাহ জাগাত, তার মধ্যেই ওগুলি যথাস্থানে পৌঁছে দিতাম আমরা। শুধু আমাদের বাড়ীর কাগজখানা সব সময়েই টেবিলে থাকত। সেই কাগজখানা থেকে প্রায় সবটুকু সংবাদই দশ মিনিটের মধ্যে সংগ্রহ করে নিতেন জ্যেঠাবাবু।

আমি ওঁকে বলতাম, জ্যেঠাবাবু, চেয়ারে বসে ভাল করে পড়ুন না।

উনি হেসে বলতেন, না বাবা—তা হলে শিকড় গজাবে—বাজার টাজার হবে না। কেমন অভ্যাস সকাল বেলায় দুনিয়ার সংবাদটুকু না জানা পর্য্যন্ত মনটা ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। ও সম্পাদকীয় মন্তব্য-টন্তব্য আপিসে গিয়ে পড়তে পারব—টিফিনের অনেকখানি সময় থাকে ত।

কাগজ পড়ার সূত্রে প্রথম আলাপ পরে ওঁদের সকলের সঙ্গেই হৃদ্যতা জন্মেছিল। একটা খুব দূরের আত্মীয়তা সূত্রও যেন টেনে বার করেছিলেন—জ্যেঠাইমা। তবে সেই সূত্র ধরে আমার পাতানো সম্পর্কটি আমি বদল করি নি সেটাকে মনে হত আরও নিকটের।

প্রতিমার বাল্যকৈশোরের ইতিহাস কিছু কিছু জানতাম—কিন্তু কোর্টের সওয়ালে তা বিস্তৃত করার প্রয়োজন বোধ করি নি। কোর্ট ত এই সব বিষয়ে 'ব্রণমিচ্ছন্তি'দের দলে। প্রতিমার কলেজ-জীবনের কিছু অংশ আমাকে বলতে হয়েছিল—বিশেষ করে সেই অংশগুলি, যাতে ওর সঙ্গীতানুরাগের আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। আসলে এটা ওর প্রফেশান ছিল কি না, সেই অর্থ সাংসারিক সাহায্যে প্রয়োজন হত, না নিজের পড়া-শোনার জন্য খরচ করত ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের উত্তর আমি সতর্ক হয়ে দিয়েছিলাম! তার পর আনন্দর সঙ্গে ওর আলাপ পরিচয়ের বৃত্তান্ত আমাকে দিতে হয়েছিল। কোর্ট সেই অংশটি বিস্তৃত করতে চেয়েছিল, আমি চেষ্টা করেছিলাম সংক্ষেপে সারতে। আর আর যেসব ঘটনা নেপথ্যে ঘটেছিল—তারও আভাস আমি পেয়েছিলাম কি না জানতে চেয়েছিলেন আইন-জীবীরা। কিন্তু আভাস ত প্রমাণ নয়। তবু পাছে ওগুলি প্রমাণের স্বপক্ষে ব্যবহৃত হতে পারে সন্দেহ করে ও বিষয়ে আমরা অজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলাম। তবে হাঁ, সেই রাত্রির কথা আমাকে বলতে হয়েছিল সবিস্তারে।

রাত তখন শেষ হয়-হয়। পথের দিকের ঘরটিতে শুয়ে আমি তার আভাস পেয়েছিলাম। ঘরটায় যখন পাঠাগার ছিল—তখনও আমরা ওখানে শুতাম। এখন পাঠাগার অন্যত্র চলে যাওয়াতে আমার সব সময়ের জন্যই ব্যবহার করছি। খুব ভোরে একদল প্রাতঃস্নানার্থী রামপ্রসাদী সুর ভাঁজতে ভাঁজতে পথ দিয়ে যান। এঁদের সময়টি একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় মিল করা। সেদিনও চারটে বেজে দশ মিনিটে ওঁরা সামনের পথটুকু পার হয়েছিলেন। ঘুমের ঘোরে দূর-শ্রুত গানের সুরটা ভারি মিষ্টি হয়ে কানে বাজে, তন্দ্রাটুকু গভীর হয়। সেদিন রেশটুকু কাটতে-না-কাটতে দরজায় একটা চাপা ধাক্কার আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম-জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কে—কে?

আমি প্রতিমা। দুয়োর খুলুন। কেমন কান্না-ভেজা চাপা গলায় ও বলেছিল।

দুয়োর খুলে দেখেছিলাম—বিপর্য্যস্ত বিহ্বল বেপথুমতী প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। কিন্তু

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দুয়োর বন্ধ করে দিয়েছিল।

আমাকে বিস্মিত হবার সময়টুকু ও দেয় নি, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দুয়োর বন্ধ করে দিয়েছিল। আলোটা জ্বালতে গিয়েছিলাম—বাধা দিয়ে বলেছিল, থাক।

আমি ত আরও স্তম্ভিত! কি চায় প্রতিমা? এত রাত্রিতে এ ভাবে একলা এসেছে কেন?

প্রতিমা বলেছিল, কাগজ-কলমটা দিন, একটা ষ্টেটমেণ্ট দেব।

কিসের ষ্টেটমেণ্ট? বিহ্বলভাবে বলেছিলাম।

আঃ—আনুন না কাগজ কলম। মৃদু ধমক দিয়েছিল প্রতিমা।

কাগজ-কলম নিয়ে টেবিলের সামনে বসেছিল। বলেছিল, আলোটা জ্বালুন।

আলো জ্বালতেই ভীষণ ভাবে চমকে উঠেছিল। নিবিয়ে দিন—নিবিয়ে দিন। ভয়ার্ত্ত চাপা গলায় বলেছিল।

এবার আলো নিবিয়ে না দিয়ে ওর মুখের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, দেখছি খুবই উত্তেজিত হয়েছ! বল আমাকে, কি হয়েছে? জ্যেঠামশাই, জ্যেঠিমা ভাল আছেন ত?

আমি বাড়ী থেকে আসছি না। বলে দু'হাতে মুখ ঢেকেছিল।

বাড়ী থেকে আসছ না! তবে এত রাত্তিরে—

বলছি—বলছি। অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিল ও। এক গ্লাস জল দিন, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

জল খেয়ে বলেছিল, আলোটা কি জ্বলবেই? নিবিয়ে দিন না।

দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলাম, না—আলো জ্বলবে। বল, কি বলবে তুমি?

ও দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠেছিল হু হু করে। এবার আমার বিস্ময় বিরক্তিতে পরিণত হয়েছিল। শেষরাত্রিতে ঘুম ভাঙিয়ে এ কি অভিনয় আরম্ভ করলে প্রতিমা। ও কি প্রকৃতিস্থ নয়? প্রকৃতিস্থ হলে এমন উদ্‌ভ্রান্ত—অসংলগ্ন আচরণ করবে কেন! এ ত স্পষ্টই মানসিক বিকারের লক্ষণ। কি আশ্চর্য্য—এই ত আজ অপরাহ্ণেই ওকে দেখেছি সম্পূর্ণ সুস্থ, হাস্যময়ী মেয়ে। তখন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশ দিয়ে বউবাজারের দিকে চলেছিলাম, বিপরীত দিক থেকে একখানা মোটর আমার পাশ দিয়ে শ্লথগতিতে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের দিকে বেঁকে গিয়েছিল। একটি সুসজ্জিতা তরুণী তার হাত উঠিয়ে আমাকে সহাস্যে আপ্যায়িত করেছিল। হাঁ- প্রতিমার পাশে বসেছিল আনন্দ; সুবেশ আনন্দ। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকায় আনন্দ আমাকে দেখতে পায় নি। প্রতিমার আনন্দ জানানর হেতু ছিল। বহুদিন পরে ওকে আনন্দের পাশে দেখলাম। অবশ্য এক সময়ে আনন্দের সঙ্গ ছাড়া ওকে কল্পনা করতেই পারতাম না। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, ও আনন্দের বাগ্‌দত্তা বধূ। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা চলত। দুটি সুর-শিল্পীর মিলন সুখের হবে এই ধারণা আমাদের দৃঢ় ছিল। আনন্দকে কথাটা স্পষ্ট করেই বলতাম—পরিহাস করতাম। আনন্দ প্রতিবাদ করত না, হাসিমুখে চুপ করে থাকতো। আমারা শুভদিনের প্রতীক্ষা করছিলাম।

হঠাৎ একদিন সুর কেটে গেল।

আমার পরিহাসের উত্তরে আনন্দ মুখ গম্ভীর করে বসেছিল, সুব্রত—তোমার অভ্যাসটা বদলাও।

তবু পরিহাস করেছিলাম, তোমাদের সম্পর্কটা আগে তাড়াতাড়ি বদলে নাও, তবে ত—

আনন্দ বলেছিল, ওই কথাটাই আমি বলছি, দুজন তরুণ-তরুণী এক সঙ্গে মেলামেশা করলেই—তোমাদের মনে অন্য সম্পর্কের কথা ওঠে না কেন, আশ্চর্য্য!

ওর কণ্ঠে বিরক্তির আভাস পেয়ে আমি একটুকাল অবাক হয়েছিলাম। তার পর পরিস্থিতিটা সুস্থ করে নেয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আজ তোমার মুখে নতুন কথা শুনছি! আমরা এতদিন যা বলে আসছি, কই, তুমি, ত তা নিয়ে কখনো প্রতিবাদ কর নি। তুমি হেসেছ শুধু।

আনন্দ বলেছিল, তোমাদের কথার মূল্য ছিল না বলেই হেসেছি। কিন্তু ইদানীং তোমরা যা বাড়াবাড়ি করছ, এটা বন্ধ হওয়াই উচিত।

আমাকে অবাক হতে দেখে ও বলেছিল, আচ্ছা, এটা যে কেউ সহ্য করতে পারে—তাকে যদি সর্ব্বদাই চোখে চোখে রাখা যায়!

কথাটা খুলে বল।

খুলে বলা যায় না। মানুষ যে অন্যের ইচ্ছায় চলতে ভালবাসে না, এটা প্রত্যেকের জানা উচিত। গম্ভীর মুখে বলেছিল আনন্দ।

আমি চুপ করে ভাবছিলাম—এই চিন্তা হঠাৎ ওর মনে উঠল কেন! ও কি প্রতিমার সঙ্গ আর সহ্য করতে পারছে না? কেন?

একটুকাল চুপ করে থেকে আনন্দ বলেছিল, কোনটারই অতি ভাল নয়, বেশি মিষ্টিও তাই তেতো লাগে। ছেলেবেলায় মায়ের আদর ভাল লাগে একটু আধটু, বেশি আদর পেলে ছেলের স্বভাব ঘ্যান্‌ঘেনে হয় কি না? অর্থাৎ সে পছন্দ করে না। ···আমি যাদের শিক্ষাদান করি—আশা করি তারা নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া আমার কাছে আসবে না। এলে সেটা অত্যাচার ছাড়া কি ভাবতে পারি!

আমি বলেছিলাম, বুঝলাম—যে কোন কারণেই হোক প্রতিমাকে তোমার ভাল লাগছে না।

এই তো ভুল বুঝলে! এটা ভাল লাগা মন্দ লাগার কথা নয়—ব্যক্তিগত মর্জ্জির কথা। শিক্ষক কোন ছাত্রছাত্রীর উপর পক্ষপাত করবে না—এই হল তার নীতি। তবে মেধাবী ছাত্রের উপর স্বাভাবিক একটি প্রীতি থাকবেই। সেখানে শিক্ষকের পরিশ্রম বাঁচে।

এ-নিয়ে ত সেদিন আরও অনেক কথা বলেছিল আনন্দ। যার মোটামুটি অর্থ বুঝেছিলাম—সম্প্রতি ওদের মনোমালিন্য চলছে। হতে পারে এটা সাময়িক, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের কোন মন্তব্য না করাই উচিত।

ওদের পরিবর্ত্তন বন্ধুমহল গুরুতর বলে নেয় নি। ভালবাসার ক্ষেত্রে সাময়িক একটা বৈচিত্র্য, তার বেশী আমরা ভাবি নি। কিন্তু সময়টা যেন বড় বলে মনে হয়েছিল। সুদীর্ঘ আটটা মাস এমনি বিরস বিবর্ণ অসংখ্য মুহূর্ত্তে ভরে উঠবে এ কল্পনা আমরা করতে পারি নি। আমরা, বিশেষ করে আমি, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলাম ওদের উপরে।

পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটা নূতন জিনিষ একদিন লক্ষ্য করলাম। আমাদের পাড়ার সবচেয়ে বিখ্যাত একটা বাড়ীর সঙ্গে আনন্দের ইদানীং কালের যোগাযোগটা লক্ষ্যণীয় বলে মনে হল। অবশ্য তারও কোন অযুক্তি ছিল না। সঙ্গীত শিক্ষাদানই আনন্দের বৃত্তি। তার খুসিমত ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করবে—সে আর বেশী কথা কি! যেখানে পরিশ্রম কম, পারিশ্রমিক লোভনীয়—শিক্ষকের স্বাভাবিক আকর্ষণ ত সেইখানেই। আনন্দ এর ব্যতিক্রম হবে কেন!

আজকাল তারকবাবুর বাড়ী থেকে ওকে বা'র হতে দেখলে আমরা আশ্চর্য্য হই না।

একদিন প্রণব বলেছিল, বি. এম. এর বাড়ী ধরেছ দেখছি। তা ক্লায়েন্ট ওরা ভাল।

আনন্দ বলেছিল, বি. এমরাই ত এ বাজারে কলা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। আমাকে দেখিয়ে বলেছিল, তাছাড়া সংযোগ-কর্ত্তা ত ইনিই।

বি. এম. কথাটার অর্থ আনন্দ জানত। কোডটা আমাদের ক্লাব থেকেই চালু হয় প্রথম।

প্রথম যখন ভদ্রলোক আমাদের নগরে আসেন—দেখে মনে হ'ত নিরীহ গোবেচারি মানুষ। সদা বিনীতভাব মুখে বশম্বদ হাসি, হাত দুটি জুড়েই থাকে, আর কথা বলেন মাথাটি নামিয়ে। বলেছিলেন, পরিচয় আর কি দেব বলুন—ছোটমত একটা গোলদারি দোকান আছে, আপনাদের পাঁচজনের দয়ায় আর শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে কোন রকমে করে খাচ্ছি। ফ্যামিলি মশায় বিরাট, দুবেলায় চল্লিশখানা পাতা পড়ে। এখন আপনাদের আশ্রয়ে এসে উঠলাম—চরণে রাখবেন।

কথাগুলি অবশ্য আমাদের বলেন নি—তখন আমরা আধন্যাংটা হয়ে পথে ডাংগুলি মার্ব্বেল খেলতাম, ছাদে ঘুড়ি ওড়াতাম—বাবা-জ্যেঠার বকুনি কানমলা খেয়ে বিদ্যাভ্যাসের মহলা দিতাম। তারপর যখন আমরা ইস্কুলের শেষ ধাপে, সেই সময়ে বাবা জ্যেঠাদের বলতে শুনেছি—একে বলে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ! যুদ্ধের হিড়িকে একদফা ত কামালে, আর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখছ কাণ্ড-কারখানা। যে বাড়ীটায় ভাড়া ছিল সেটি ত আত্মসাৎ করলই, তারও আশপাশের তিনখানা বাড়ীকে গর্ভে ঢুকিয়ে কি পেল্লায় বিল্ডিং হাঁকিয়েছে দেখলে মাথা ঘুরে যায়! এখন দুখানা মোটর ওদের গ্যারাজে সর্ব্বক্ষণ মোতায়েন। ভাগ্য বলে একেই!

ভাগ্য ঠিক নয়—কৌশল। দেশ স্বাধীন হয়ে ভাল ভাল বনেদি ঘরগুলো ত নষ্ট হয়ে গেল—বাড়বাড়ন্ত হলো ওদেরই—ওই বি. এম. দের।

শব্দটা ওঁদের মুখেই আমরা প্রথম শুনি। এখন শুনি লক্ষ লক্ষ লোকের মুখে। বি. এম.—মানে ব্ল্যাক মার্কেট। কথাটা অভিধানে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে নিশ্চয়।

এ হেন তারকবাবুর বাড়ীতে গানের শিক্ষকতা করতে আসত আনন্দ। সপ্তাহে তিনদিন।

তারকবাবুর পরিবার, শুনেছি বিরাট। বাবার মুখে যে সংখ্যাটি শুনেছি দশ বছর আগে, এখন তা দুনো হয়েছে। দুই ভায়ের সংসার—ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনীরা চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। সামনের তিনটি বৈঠকখানায় ওদের বিদ্যাশিক্ষার মহলা চলে। মাষ্টারও মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে চারজন। শ্রেণী ধরে এবং পুরুষ মহিলা ভাগ করে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা। এ ছাড়া ভিতরকার একটি দোতলা ঘরে বসে সঙ্গীত শিক্ষার আসর। ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত না হয়—এমনি ব্যবধানে, ঘরটা একটু দূরে। তবে কলকাতার বাড়ীতে এই সতর্কতা হাস্যকর ছাড়া কি! গায়ে গায়ে লাগানো বাড়ী—একেবারে পাশাপাশি ঘর—যার একখনিতে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষার পড়া তৈরী করছে শিক্ষার্থী—অন্য খানিতে রেডিওর চাবি খুলে লারে লাপ্পা সঙ্গীত শুনছে বকাটে ছেলে! বিপরীত মনোবৃত্তির প্রতিবেশীরা এমনি বিচিত্র সহাবস্থানের মহিমায় শহরের চরিত্রকে রক্ষা করে চলেছে।

তারকবাবুর বাড়ীটা বড়—অনেকগুলি ঘর আছে তিনটি তলা মিলিয়ে। সুতরাং ওঁরা বিভিন্ন শিক্ষার ক্ষেত্রটিকে অবিশুদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করলেন সাধ্যমত। আরও একটি ব্যবস্থা করেছেন—সঙ্গীত-শিক্ষার ক্ষেত্রে। এখানেও দুটি ভাগ করে দিয়েছেন—উচ্চ ও নিম্ন মান অনুযায়ী। একটি ঘরে আনন্দ তার দুটি ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা দেয়—তার বিপরীত দিকে দশবারোটা ঘর পেরিয়ে—গুটি দশেক কিশোর-কিশোরী সার্ব্বজনীন সঙ্গীতচর্চ্চা করে এক বয়স্ক শিক্ষকের আদর্শানুযায়ী, সঙ্গীতের দুই মার্গের তফাৎ আকাশ-পাতাল। কিন্তু কোনটার সঙ্গে কোনটার সংঘর্ষ বাধে না—তারিখ, সময় নির্দ্ধারণের সুব্যবস্থায়। এত কথা বলার আবশ্যকতা ছিল না—কিন্তু সার্ব্বজনীন সঙ্গীত-শিক্ষাকালে পাড়ার তাবৎ অধিবাসীকেই মন্তব্য করতে শুনেছি—উঃ, এ যে ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগালে হে! রবি আর বৃহস্পতি দুটো বারকে আইন করে শান্তিপূর্ণ দিন ঘোষণা করা উচিত। লাউড-স্পীকারের আইন এর বেলায় কেন প্রযোজ্য হবে না!

যাক সে কথা—আনন্দর ছাত্রের নাম অনুময়, ছাত্রীর নাম দীপা। ওরা এখনও কলেজের সীমানায়। ও বাড়ীর ছেলেমেয়েদের এমনি প্রগতিবাহী বাছা-বাছা নামের ধাক্কায় সে-কালের মানুষেরা মাঝে মাঝে চমকে ওঠেন। বলেন, বাজারে গোলদারির গোল সামলাতে ওরা কি প্রচণ্ড বেগেই না দৌড় লাগিয়েছে! এখন মুখ থুবড়ে না পড়লে বাঁচি!

আনন্দ বলেছিল, ছাত্রটি চাল-সর্ব্বস্ব। শিখতে আসে না ত যেন সম্পদের বিজ্ঞাপন দেয়। বাজারের সবচেয়ে সেরা এস্রাজ ওর হাতে—সোনা দিয়ে বাঁধানো যন্ত্র মখমলের খণ্ড দিয়ে আস্তে আস্তে মুছে কোলের ওপর তোলে, ছড় টানে সন্তর্পণে যেন যন্ত্রটির গায়ে আঘাত না লাগে। প্রায়ই বলে—মাষ্টার মশায়, এর চেয়ে ভাল এস্রাজ কোথায় পাওয়া যায় বলুন ত—আনিয়ে নিই। যন্ত্র ভাল হলে বাজিয়ে আরাম কি বলেন। বলে হেসেছিল। তা আমি বলেছি—ভাল যন্ত্রের সঙ্গে ভাল মনটিকেও যোগ করে ফেল। অর্থাৎ শিক্ষায় দাও মনোযোগ। তবে শিখবে তাড়াতাড়ি—খুশি হবে বাজিয়ে।

সে আমি চট করে শিখে নেব—দেখুন না।

দীপা একটু লাজুক প্রকৃতির। কলেজের শিক্ষায় কিছু জ্ঞান লাভ করেছে। আনন্দর মতে কিছু বস্তু আছে। যদিও বেশবাসের বৈচিত্র্য প্রতি সপ্তাহেই লক্ষ্যণীয়, তবু শিক্ষায় আগ্রহ আছে। শিক্ষকের নির্দ্দেশ সাধ্যমত অনুসরণ

করে চলে। একটি খাতায় লিখে রাখে খুঁটিনাটি উপদেশগুলি। রাগরাগিণীর মতিগতি—তত্ত্ব-তল্লাসে ওর কৌতূহল দেখা যায়। কিন্তু একটি বিষয়ে ওর প্রবণতা লক্ষ্য করেছে আনন্দ। ভালমত শিক্ষালাভ না করেই কোন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে বসে সঙ্গীত পরিবেশন করার সাধ ওর বলবতী।

আনন্দ কতবার বলেছে—আরও দিন কতক যাক—যন্ত্র আয়ত্ত হোক—সুর কণ্ঠে বসুক—মোটামুটি পরিচয় হোক তান কর্তবের সঙ্গে, অন্তত লয়টা ঠিক করে নাও—তারপর আসরে বসো।

কিন্তু দীপা তা শোনে নি। আনন্দকে লুকিয়ে দুই-একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে—ছেলেদের রবীন্দ্রজয়ন্তীতে সঙ্গীত পরিবেশন করে সাধ মিটিয়েছে। আরও আশ্চর্য্যের কথা তাতে নাকি সফলও হয়েছে। শ্রোতারা হাত-তালি দিয়ে ওকে আরও দু'একখানি গান গাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। ও সোৎসাহে গানের খাতাটি খুলে হারমোনিয়মের ডালার উপর রেখে গানের পর গান গেয়েছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আর একদল শ্রোতা উচ্চৈস্বরে হল্লা তুলেছে, নো মোর প্লীজ।

দৈবক্রমে একটা বড় আসরে আনন্দ উপস্থিত থেকে ওর ছাত্রীর কৃতিত্ব লক্ষ্য করেছিল। পরে ওকে বলেছিল, আর কেন বৃথা পরিশ্রম করছ—মোটামুটি ত ভালই শিখেছ দেখলাম। ছোট-বড় ফাংশনগুলিতে এবার অবাধে বিচরণ করতে পারবে।

বাক্যের অন্তর্নিহিত শ্লেষটুকু ধরতে পারে নি দীপা। মুখ নামিয়ে বলেছিল, কি যে বলেন?

দীপার অন্তর্নিহিত ইচ্ছাটুকু যে অকারণ জন্মায় নি এটা পরে বুঝেছি। এমন একটা ঘটনা না হলে হয়ত এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যেত না।

সাক্ষীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে এসব কথা আমি বলি নি। বাড়ী এসে সেইদিন রাত্রিতে খানিকক্ষণ চিন্তা করেছিলাম। তারই সূত্র ধরে—আন্তঃ-কলেজ সঙ্গীত-সম্মিলনের একটা দৃশ্য স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মনে আছে অনুষ্ঠানটি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা বলে বিজ্ঞাপিত হয় নি, কিন্তু চরিত্রে ছিল তারই আভাস। এক একটি কলেজের ছেলেমেয়েরা যখন মঞ্চে এসে উঠছিল—তখন কি বিপুল উত্তেজনা হর্ষোচ্ছ্বাস! গানটা ভাল হলে ত কথাই নাই।

সম্মিলন শেষ হলে অধ্যাপকদের মধ্যে আলোচনা চলছিল। আমরা, মানে ছাত্ররাও সে আলোচনায় যোগ দিয়েছিলোম। ...শ্রেষ্ঠ গায়ককে পুরস্কার দেয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে সেই মেয়েটি পুরস্কার লাভের চেয়েও অধিকতর আনন্দিত হয়েছিল। আনন্দ এগিয়ে এসে বলেছিল, চমৎকার গলা মেয়েটির। ও যার কাছে গান শিখবে—তার মুখোজ্জ্বল করবে।

আমি বলেছিলাম, তুমিও শিক্ষা দাও,—নেবে ওকে ছাত্রী করে?

আনন্দ বলেছিল, তোমার কথা শুনে বোধ হচ্ছে মেয়েটি তোমার আত্মীয়া।

বলেছিলাম, সত্যিই ও আমাদের আত্মীয়া, তবে তোমার শিষ্য হওয়ার সৌভাগ্য হয়ত ওর নেই।

কেন?

শুনেছি তোমার দক্ষিণার হার উচ্চ।

আনন্দ হেসে উঠেছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে তুচ্ছও। যেমন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব—

উৎসাহিত হয়ে বলেছিলাম, সিরিয়াসলি বলছ?

নিশ্চয়! অমন একটি ছাত্রী পেলে বিনামূল্যে কত বড় বিজ্ঞাপনটা দিতে পারব ভাবদেখি!

প্রতিমাকে বলেছিলাম—ভাল শিক্ষক আছে, শিখবে?

প্রতিমা বলেছিল, বাবাকে বলুন। আর বিনা দক্ষিণায় শিখব না। তাতে কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

ও হয়ত দক্ষিণা নিতে চাইবে না—

তা হলে ওঁকে আর কিছু বলবেন না।

আচ্ছা ওর সঙ্গে কথা কয়ে তোমাকে জানাব।

যতীশবাবুকে কথাটা বলতে উনি বলেছিলেন, হাঁ—আজকালকার দিনে সঙ্গীত শিক্ষা না হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ওর মত থাকলে ক্লাস করতে পারে। কিন্তু কোথায় শিখবে? অনেক দূরে পাঠান ইচ্ছা নয় আমার।

আনন্দকে কথাটা বলতেই ও বলেছিল, দূরে নয়, গোলদীঘির পাড়েই একটা ইস্কুলে আমি শিক্ষা দিতে আসি কিন্তু সেখানে সুবিধা হবে না। ওকে স্পেশ্যাল কেয়ার নিয়ে না শেখাতে পারলে উন্নতি করতে পারবে না।

একটু ভেবে বলেছিল, একটা বন্দোবস্ত করতে পারা যায়, সেটা আর একজনের অনুমোদন সাপেক্ষ। তা হলে একেবারে পাড়ার মধ্যে বসেই শিখতে পারবে।

কোথায়?

তোমাদের গলিটার একেবারে শেষে, ব্রজনিবাসে।

বুঝেছি—ত্রিগুণা বসুর বাড়িতে। তা তাঁদের অবস্থা ত—

আনন্দ হেসে বলেছিল ত্রিগুণা বসু আমার মেসোমশায়। সামান্য চাকরি করেন মার্চ্চেণ্ট আপিসে। তাঁর একটি মেয়ে আমার মাসতুত বোনকে আমি গান শেখাই। সপ্তাহে এক দিন। আমার বোনটি সেলাই জানে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ। মাস্টারি করে একটা ইস্কুলে আর একটা ইস্কুলে সেলাই শেখায়। সংসারে ওর উপার্জ্জন অনেকখানি হেল্প করে। ও বলে, সেলাই শেখানোর পরিশ্রম বেশী—আয় কম। এর চেয়ে গানের ক্লাস নিতে পারলে সুবিধা হয়। ওখানে বন্দোবস্ত করতে পার মেসোমশায়কে বলে।

যতীশবাবু বললেন, আমার আপত্তি নেই।

জ্যেঠিমা বললেন, গান শিখে কি হবে বাবা। পড়বে ত আমাদের মত ঘরে, হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতেই দিন কাবার!

বললাম, তাই যদি—তবে কলেজে দিয়েছেন কেন? আশা করেন না কি ও ভাল ঘরেই পড়বে—সেখানে গান শেখার কদর নিশ্চয় হবে।

যা ভাল বোঝ, কর বাবা। আমি সেকেলে মানুষ, আমার মত বললাম, এখন তোমরা তোমাদের মত ব্যবস্থা কর।

ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। আনন্দর কাছে গান শিখছিল প্রতিমা।

এ ত গেল প্রতিমার কথা। দীপার কথাও ঐ আন্তঃকলেজীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়ানো। দীপা তখন সঙ্গীত শিক্ষার আসরে নামে নি—শুধু রেকর্ড আর রেডিওর গান গলায় তুলে খুশি ছিল। ঐ সঙ্গীত সম্মেলনে এসে ওর মন ঘুরে গেল মঞ্চের দিকে। শিল্পীদের যশ খ্যাতি সম্বর্দ্ধনার মাদকতা ওকেও কিঞ্চিৎ বিহ্বল করল। এবং প্রতিমার খাতিরটাও লক্ষ্য করল। প্রতিমার উপরই ওর মুগ্ধ দৃষ্টি পড়ল। এবং একটু অনুসন্ধানে জানতে পারল মেয়েটিকে কাছে পাওয়ায় অসুবিধা নেই। একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে। কথাটা বলেছিল ওর খুড়তুতো দাদা অনুময়কে। অনুময় আমাদের পাঠাগারের বিশিষ্ট সভ্য ছিল। সুতরাং ওর মাধ্যমে প্রস্তাব পৌঁছল আমার কানে। আমি সেটা বয়ে নিয়ে গেলাম প্রতিমার কাছে।

বললাম, দেখ, একটা ভাল প্রস্তাব এনেছি। কিছু উপার্জ্জন করতে চাও ত রাজী হয়ে যাও।

উপার্জ্জন। আমার কি বিদ্যে আছে যে—

যে বিদ্যার চেয়ে সেরা বিদ্যা দুনিয়ায় নেই—তুমি তাতে পারঙ্গমা হয়েছ। একটি মেয়ে তোমার ছাত্রী হতে চায়।

প্রতিমা হেসে বলেছিল, এ যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!

আজকালকার তাই নিয়ম। কেমন, রাজি? প্রতিমা বলেছিল, রাজি হতাম না, তবে আমারও টাকার দরকার। সঙ্গীত শিক্ষার দক্ষিণা না দিয়ে শিক্ষা নেব না। আমার বাবার আয়ের উপর ভাগ বসাতে চাই না। তা কতদূর যেতে হবে। কলেজের পড়া, নিজের শিক্ষা, তার ওপর ওস্তাদি সামলাতে পারব ত?

এ ত আরামের চাকরি, সপ্তাহে বড় জোর তিনটি দিন। আর ঘণ্টা দেড় দুই।

রাজী। তার আগে কিন্তু বাবার অনুমতি চাই।

আচ্ছা—সেটা আদায় করার ভার আমার।

আমার প্রস্তাব শুনে যতীশবাবু হাসেন নি। গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, সুব্রত, আমি জানি কাউকে ঘৃণা করা পাপ—অন্যায়; কিন্তু তার চেয়েও শক্ত, মনের সংস্কারকে নষ্ট করা। ওই ভুঁইফোঁড় বড় মানুষদের উপর আমার আস্থা কম।

ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে যাচ্ছে না ত প্রতিমা—সপ্তাহে দুটি কি তিনটি দিন—খানিকটা মাত্র সময়—

আমাকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন, আমি বাধা দিতে পারতাম, কিন্তু বাধা দেব না। সব সময়ে নিজের মনের আদর্শ বা নীতিবোধ দিয়ে অন্যের মন মাপতে যাওয়া ভুল। এমন ভুল জীবনে কয়েকটি করেছি, এবং তার ফল-ভাগী হয়েছে সংসার। না, সংসারের উপর কোন চাপ আমি রাখতে চাই না। প্রতিমা যদি ভাল বোধ করে—নিক কাজটা। তবে একটি কথা ওকে জানিয়ে রাখা ভাল—অন্যায় আপোষ করে যেন কোনদিন চাকরি বজায় না রাখে।

চাকরি নেওয়ার কিছুদিন পরে বলেছিলাম, ছাত্রীটি কেমন শিখছে?

প্রতিমা বলেছিল, আগ্রহ আছে। চেষ্টা করলে শিখতে পারবে। কিন্তু দাদা—ওর সঙ্গে ফাউটিকে ত সহ্য করতে পারছি নে।

ফাউ! সে আবার কি?

একটি ফাউ—প্রায়ই উৎপাত করছে। ওরই খুড়তুতো ভাই—অনুময় না কি যেন নাম। যত না জানে তার বেশী আড়ম্বর। কলকাতায় যতগুলি জলসা বসে কোনটি বাদ দেয় না। সবগুলি যন্ত্রেই ওর অনুরাগ।

যাকে বলে জ্যাক অব অল ট্রেড? হেসেছিলাম।

অবিকল। কিন্তু আলোচনার নামে ওঁর ধৃষ্টতা ক্রমশঃই বাড়ছে। আমি একদিন ভীষণ কড়া ধমক দেব, বলে রাখছি।

তার আগে তোমার ছাত্রীকে এ সম্বন্ধে জানাবে।

ছাত্রী ত সবই জানে—তার সামনেই ওর অভদ্রতা চলছে। তা ছাড়া ছাত্রী আর একটা মজার বায়না ধরেছে। বলছে, একখানা ভাল দেখে রবীন্দ্র সঙ্গীত আমাকে শিখিয়ে দিন—কোন ফাংশনে ষ্টেজে যেন গাইতে পারি।

তাতে তোমার কি লাভ হবে!

বাঃ—হাততালি পেলে মনটা কেমন করে বুঝতে সাধ হয় না বুঝি ?

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ওখানে টিঁকতে পারে নি প্রতিমা। ওর স্বল্পায়ু চাকরিটা চলে গেলে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। বলেছিলাম, গুরু-দক্ষিণা এবার কি করে যোগাড় করবে ?

আর একটা টিউশানি নেব ঠিক করেছি।

এদিকে গুরুর কাছে শিক্ষা ওর ভালই চলছিল। ছ'মাসের মধ্যে মোটামুটি ভাবে কাঠামোটা তৈরী করে দিয়েছিল আনন্দ। এখন যে-কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও দু-একটি জলসাতে বসবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছিল। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে মোটামুটি ও নাম করেছিল।

ক্রমে গানের আসরে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রোগ্রামে প্রতিমা অপরিহার্য্য হয়ে উঠল। এটা অবশ্য ঘটেছিল আনন্দের চেষ্টা ও উৎসাহে।

আমি একদিন আনন্দকে বলেছিলাম, সবাই বলাবলি করে এই নতুন ছাত্রীটির উপর তোমার পক্ষপাত বেশী।

আনন্দ বলেছিল, যে যোগ্য তাকে যোগ্যতর করাই শিল্পীর কাজ। তাতেই আনন্দ।

বলেছিলাম, জলসাতে ও নাকি কিছু কিছু দক্ষিণাও পাচ্ছে।

হাঁ—ওটা শিল্পীর সম্মান। এক পক্ষ যখন দিতে সক্ষম—অন্য পক্ষ কেন তা গ্রহণ করবে না। তা ছাড়া অর্থের প্রয়োজন এ বাজারে কার নাই !

শেষ পর্য্যন্ত আনন্দ হয়ে উঠেছিল—প্রতিমার সবচেয়ে বড় সহায়।

এমনি করে দু'টি বছর কাটল। প্রতিমা ও আনন্দকে নিয়ে একটি মধুর কল্পনার জাল শুধু আমরাই বুনতে লাগলাম না—শিল্পীগোষ্ঠীতেও এমনি একটি প্রত্যাশা জাগল।

তারপর আনন্দের আহ্বান এলো তারকবাবুর বাড়ী থেকে। তারকবাবু আমাকে একদিন পথের মাঝখানে ধরলেন মোটর থামিয়ে।

বাবা, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল। এস না গাড়ির মধ্যে—যেতে যেতে বলি।

আমি গাড়িতে উঠে বসতেই বললেন, দীপার ইচ্ছা একজন ভাল গানের মাষ্টার রেখে গান শেখে। তা তোমার ত অনেক বন্ধু-বান্ধব আছেন, দাও না ঠিক করে।

বললাম, গান শেখানোর মাষ্টারের অভাব কি শহরে। কি রকম মাষ্টার চাই বলুন ! ক্লাসিক্যাল মিউজিক—

আমরা বাবা গোলা লোক—ওসবের মর্ম্ম বুঝি না। মোট কথা যে গান গাইলে সবাই ধন্যি ধন্যি করবে—

আচ্ছা—চেষ্টা করব।

চেষ্টা করব নয়—দিতেই হবে ঠিক করে। তোমারই ত একজন বন্ধু আছে—বেশ চৌকস ছেলে। শুনি ত জগৎ-জোড়া নাম। তাকেই ঠিক করে দাও না।

শুনে গম্ভীর হয়েছিলাম। আনন্দ কিছুদিন আগেও এই বাড়ীতে মাষ্টারী করে গেছে, উনি কি জানেন না ? সন্দেহ ভঞ্জন মানসে বললাম, ছেলেটি ত আপনার অজানা নয়। বছর দুই আগে আপনার মেয়ে আর ভাইপোকে—

ওহো—সেই আনন্দ ছেলেটি ! উনি যেন চিনতে পারলেন। তা উনি কি আবার আসবেন ? সেবার কি যেন একটা হয়েছিল। তা যাই হোক, তুমি বাবা তাঁকেই ঠিক করে দাও।

বললাম, তার ত অনেক ছাত্র। দুটো ইস্কুল। তার সময় নেই।

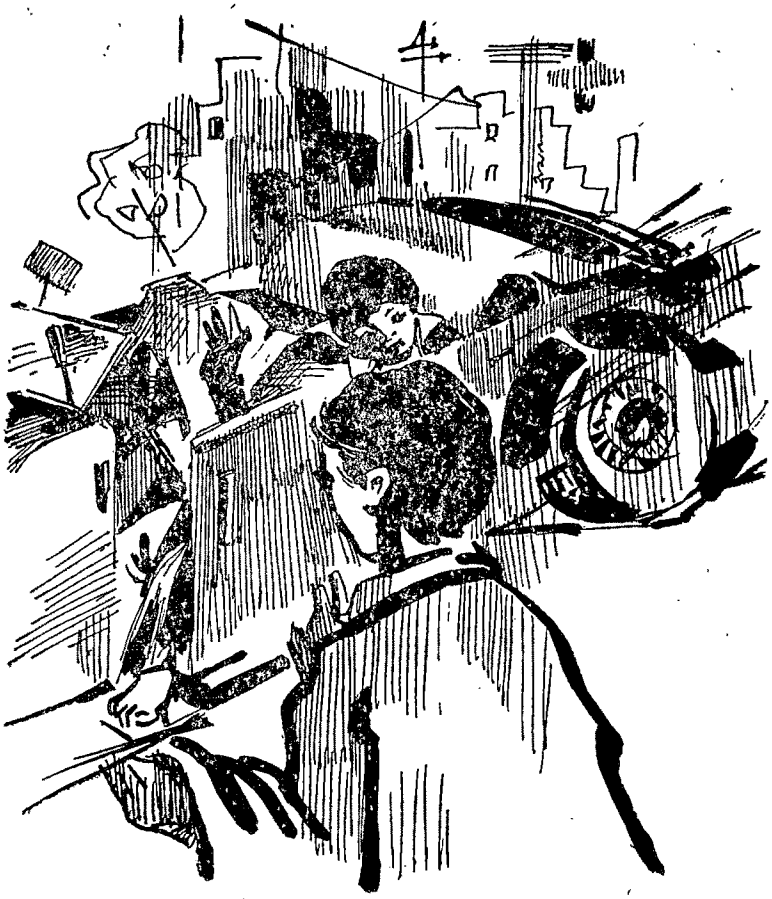

তারকবাবু আমাকে একদিন পথের মাঝখানে ধরলেন মোটর থামিয়ে

না বাবা—ওই মাষ্টারকেই ঠিক করে দাও, উনি যা চান—তাই দেব মাইনে।

ভাবলাম, মন্দ প্রস্তাব নয়—এই সুযোগে আনন্দ যদি কিছু পেয়ে যায় তা যাক না। ও ত বহুদিন ধরে একটি আশা পোষণ করছে, মনের মত একটি সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান তৈরী করবে। ঠিক গতানুগতিক প্রথায় নয়। সেখানে সর্ব্বভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির রীতি ও রূপগুলি মূর্ত্ত হয়ে উঠবে—সব ঘরাণার গায়কী এসে আসন পাতবেন। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রাগ-রাগিণীর বিচার-বিশ্লেষণ করবেন—সঙ্গীত শাস্ত্রবেত্তারা। প্রতি মাসে বসবে এমন আসর। প্রকৃত গুণী শিল্পীরা প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবেন। নূতন প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এমনি অনেক কল্পনা আনন্দর ছিল। সুতরাং অনেক অর্থের প্রয়োজন ওর। অতীতের কথা মনে না রেখে এই সুযোগ গ্রহণ করা ওর উচিত।

সে কথা স্বীকার করেছিল আনন্দ। বলেছিল, আমি যা চাইব—পারবেন উনি দিতে?

তুমি নিশ্চয় অর্দ্ধেক রাজত্ব চাইবে না? হেসে বলেছিলাম।

সেই সঙ্গে রাজকন্যাও না। এই যুগ ওর কোনটাকেই স্বীকার করে না। আমার আটশ'টাকা পারিশ্রমিক চাই। সপ্তাহে দু'দিন এক ঘণ্টা করে শিক্ষা দেব।

বলেছিলাম, বুঝেছি—চাকরি না নেবার ইচ্ছা।

তবে আর কিসের বি. এম. তিনি! বলে হো হো করে হেসেছিল ও।

আটশ টাকাই স্বীকার করেছিলেন তারকবাবু। গাঁই-গুঁই করেন নি—দরদস্তুর করেন নি। আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। পরে দেখেছিলাম—ওঁর ইচ্ছার পিছনে আর একটি বলবতী ইচ্ছা সক্রিয় ছিল।

দীপা প্রতিজ্ঞা করেছিল—আনন্দকে আমি গানের মাষ্টার রাখবই—যে কোন উপায়ে। কেন প্রতিজ্ঞা করেছিল—সে বৃত্তান্ত আর একজনের জবানবন্দীতে পরে জানতে পেরেছি। সে অন্যের কথা—আমি বলব না।

কিন্তু একটা বিষয় আমি ভাল করে লক্ষ্য করেছিলাম—বিশেষ ওই সময় থেকে—অর্থাৎ দীপার শিক্ষার ভার নেওয়ার পর থেকে, প্রতিমার সঙ্গে একটি ব্যবধান যেন ধীরে ধীরে তৈরী হয়ে উঠছিল। সেটা চরম আকার নিতে আরও কয়েক মাস সময় নিয়েছিল।

আমরা বন্ধুমহলে বলাবলি করেছি, এ কেমন হ'ল! এ যে সেটল্‌ড ফ্যাক্‌ট আনসেট্‌ল্‌ড হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত আনন্দও বি-এম-এর খপ্পরে পড়ল!

এমনি যখন সঙ্কটসঙ্কুল মুহূর্ত্ত—সেই সময়ে প্রতিমাকে দেখলাম—ট্যাক্সিতে আনন্দর পাশে বসে রয়েছে। সুখ-সোহাগে ঝলমলে বেশবাসে—সর্ব্বাঙ্গে সুখের ঢেউ তুলে ট্যাক্সিটা আস্তে আস্তে আমার সামনে থেকে সরে গিয়েছিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টা কেটেছে তারপর, একটি রাতও পুরো নয়। সেই পলাতক সুখকে সন্ধান করতে করতে ক্লান্ত অবসন্ন প্রতিমা আমার ঘরে এসে পৌঁছল এই অস্বাভাবিক উন্মাদিনী মূর্ত্তি নিয়ে! আমি স্তম্ভিত হয়ে ওর পানে চেয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলে নি প্রতিমা। ও দু' হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। নিঃশব্দ কান্নায় ওর দেহটা এক একবার কেঁপে উঠছিল। বুঝছিলাম—অতিশয় বেদনা ওকে খণ্ড খণ্ড করতে চাইছে। ও চেষ্টা করছে সেই ভাবটিকে রুদ্ধ করতে, পারছে না। প্রথমটা অভিনয় মনে হয়েছিল—অবশেষে আমিও অভিভূত হয়ে পড়লাম। নিকটে সরে এসে ওর পিঠের উপর একখানা হাত রেখে শান্ত কণ্ঠে বললাম, কি হয়েছে—বল। আমার দ্বারা যদি কোন প্রতিকার হয়—

এই কথায় ও হাতের মধ্যে থেকে মুখ তুলে সজোরে মাথা নেড়ে বলল, কি আর করবেন—এতক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে।

কি শেষ হয়েছে? কার কথা বলছ?

প্রতিমার দুই চোখ বেয়ে দরদর ধারে অশ্রুর ধারা নেমে এল। রুদ্ধকণ্ঠে বলল, আপনার বন্ধুর কথা বলছি। এতক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে।

কি বলছ! রুদ্ধ শ্বাসে আমি ওর কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিলাম।

ও কাঁদতে কাঁদতে বলল, হাঁ—ওঁর কথাই বলছি। আমি নিজের হাতে—বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

চুপ কর—স্থির হয়ে সব গুছিয়ে বল। কোথায় কি ঘটল—খুলে বল।

হঠাৎ ও সোজা হয়ে বসল। আঁচলে চোখের জল মুছে বলল, বলছি। আপনি কি জানেন—ঘুমের পুরিয়া খেয়ে মানুষ অজ্ঞান হয়ে গেলে আর জাগে না?

অবাক হয়ে বললাম, এ তোমার অদ্ভুত প্রশ্ন। নারকোটিক ড্রাগ মাত্রা ছাড়ালে কি অনর্থ ঘটায় কাগজে পড় নি? এই সেদিন আমেরিকার একজন ফিল্ম-ষ্টার—

ও মাথা নেড়ে বলল, জানি—সে ঘটনা পড়েছি। আর সেই জ্ঞানই আমার সর্ব্বনাশের হেতু। ওঃ—কাগজে কেন যে এই সব প্রলোভনের কথা ফলাও করে বা'র করে!

প্রলোভন কিসে! ও একটা আশ্চর্য্য রকমের আত্মহত্যা। আশ্চর্য্য সংবাদই ত সংবাদপত্রের আকর্ষণ।

না—ওটা প্রলোভন। যাদের দুঃখ অনেক, মন দুর্ব্বল, তাদের সহজ একটা পরিত্রাণের কথা জানিয়ে দেওয়া। যাক সে কথা—; ঘুমের পুরিয়া দেবার সময় ওই ঘটনাটা আমার মনে পড়েছিল—আমি প্রলোভনে পড়েছিলাম।

ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললাম, বড্ড বিলম্ব করছ প্রতিমা—সব খুলে বল। হয়ত এখনও কিছু উপায় হতে পারবে, কিন্তু দেরি করলে আর পথ থাকবে না।

প্রতিমা আত্মসংবরণ করে বলল, আপনার বন্ধু ঘুমের ওষুধ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। হয়ত আর জাগবেন না।

সর্ব্বনাশ! কোথায় অজ্ঞান হয়ে পড়ল?

শ্যামবাজারের সেই ফ্ল্যাটে—যেখানে গানের ছোট মত একটা ক্লাস করেছিলেন। আপনি ত জানেন সেই ফ্ল্যাট।

সে ফ্ল্যাটে আর কে ছিল?

আর কেউ না। উনি আর আমি।

বুঝেছি। সন্ধ্যাবেলায় যখন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ধার দিয়ে মোটরে করে চলেছিলে—তখন কি ওইখানেই—

মাথা নেড়ে বলল প্রতিমা, না। তখন একটা গানের জলসায় যাচ্ছিলাম—চোরবাগানে। অনেক দিন বাদে উনি আমায় একটা প্রোগ্রাম দিয়েছিলেন। আমায় পথ থেকে তুলে নিয়েছিলেন গাড়িতে···কিন্তু সে ত সাতকাণ্ড রামায়ণ—শুনতে সময় লাগবে।

আচ্ছা—সে না হয় পরে শুনব। কিন্তু ঘটনাটা কি ভাবে ঘটল আমায় সংক্ষেপে বল।

প্রতিমা বলল, চোরবাগানের জলসা শেষ হ'ল রাত বারটায়। উনি বললেন, আরও একটা আসরে বায়না নিয়েছি—রাত চারটেয় প্রোগ্রাম। কিন্তু এত আলিস্যি লাগছে, দুই-এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হয় না।

বললাম, আসরটা কোথায় বসবে?

এই শ্যামবাজারেই—মোহনবাগান রোয়ে। তা ওইখানেই কাছ বরাবর আমার একটা আস্তানা আছে—জানই ত, সেইখানে খানিক রেষ্ট নিয়ে যাব মনে করছি। তার আগে তোমাকে কি পৌঁছে দেব বাড়ীতে?

বললাম, তার দরকার নেই। ওই আসরে আমি কি যেতে পারি না?

উনি বললেন, অবশ্যই যেতে পার, কিন্তু তার প্রয়োজন নাই। তুমি ত এ শহরে, গানের আসরের অজানা মানুষ নও—বিনা আমন্ত্রণে কেন যাবে! তোমাকে বাড়ী রেখে আসি।

আমি বললাম, একটু পরে বাড়ী গেলে ক্ষতি হবে না—আপনার আস্তানা বরং ঘুরে আসি।

বললেন, এত রাত্রিতে না যাওয়াই ভাল।

বললাম, আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধের কথা শহরের সবাই জানে—আমার ভয় কি!

বললেন, ভয় কি শুধু লোকের কথায়—ভয় ত আমাদের মনে! তোমার যদি সাহস থাকে চল। তবে এ নিয়ে পরে আমাকে দোষ দিও না।

আমি তখন মরিয়া হয়েছি—যাবই। ওই জলসার সমস্ত বৃত্তান্ত তার আগে জেনে নিয়েছি। কার চেষ্টায় জলসার আয়োজন—শেষ রাত্রিতেই বা কেন ওঁর প্রোগ্রাম এবং তারপরের ঘটনা কি ঘটতে পারে সমস্তই আমার

নখদর্পণে এসে গেছে তখন। অবশ্য শেষ দৃশ্যটা আমারই অনুমানের উপর নির্ভর করে সাজিয়ে নিয়েছি। এবং স্থিরনিশ্চয় হয়েছি—ওটা ওই ভাবেই ঘটবে। সন্ধ্যাবেলায় ওই যে ট্যাক্সির যোগাযোগ ওটাও বলতে পারেন আমার প্ল্যান অনুযায়ী তৈরী করা। আমি জানতাম আনন্দ ওই পথ দিয়েই যাবেন।

কিন্তু কেন এত সব—

সে সব পরে বলব। এখন শুনুন। ফ্ল্যাটে এসে আনন্দ বললেন, একটা বদ অভ্যাস আমার আছে জানই ত। অত্যধিক পরিশ্রমের ভার লাঘবের ব্যবস্থা ডাক্তাররাই করেছেন—ঔষধ হিসাবে সেটা প্রতিদিনই গ্রহণ করি। আর সারা দিনরাত্রির পরিশ্রমে স্নায়ুগুলো ভীষণ উত্তেজিত হয়ে থাকে বলে, কোন কোন দিন—যেদিন এমনি জলসা-টলসা থাকে—ওরই সঙ্গে অল্প ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে নিই। আজ আরও একটা প্রোগ্রাম রয়েছে—অন্তত ঘণ্টা দুই আড়াই বিশ্রাম আমার প্রয়োজন। বড্ড স্ট্রেইন হয়েছে—ওষুধটা আমায় নিতেই হবে।

বললাম, বেশ, আমি না হয় ততক্ষণ এখানে বসব। আপনাকে জলসায় নামিয়ে দিয়ে সেই ট্যাক্সিতে বাড়ী চলে যাব।

উনি আলমারি খুলে ব্র্যাণ্ডি, গ্লাস, ওষুধের পুরিয়া বার করে টেবিলের উপরে রাখলেন। মেজার গ্লাসে করে ব্র্যাণ্ডি মেপে নিয়ে গ্লাসে ঢাললেন—একটা ঘুমের পুরিয়া মেশালেন তার সঙ্গে।

চামচ দিয়ে দিয়ে ওষুধটা নাড়ছেন—হঠাৎ পাশের ঘরে ঝন্ ঝন্ করে শব্দ হ'ল। যেন কোন তারের বাদ্যযন্ত্র মেঝেতে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

আমি তখন উত্তেজনায় কাঁপছি। দারুণ প্রলোভন আমার সামনে। ঘুমের পুরিয়াগুলো তখন খোলা কৌটার মধ্যে—আমার হাতের নাগালে রয়েছে। হাতের নাগালে গ্লাস-ভর্ত্তি ঔষধ, অন্য অর্থে সুরা। আমি ভীষণ ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। সকাল বেলাকার একটি সঙ্কল্প অতিশয় স্পষ্ট হয়ে আমার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কান দুটো চিন্ চিন্ করতে লাগল—চোখ দিয়ে আগুনের হল্কা ছুটতে লাগল। সম্মোহিতের মত হাত বাড়ালাম পুরিয়া কৌটোর দিকে। মাত্র মিনিট দুই সময়—তারই মধ্যে ফিরে এলেন আনন্দ। আমাকে গ্লাসে চামচ নাড়তে দেখে বললেন, বাঃ, কাজটা সহজ করে দিয়েছ দেখছি। ধন্যবাদ।

শুকনো গলায় বললাম, কি দেখলেন? কিছু কি ভাঙ্গল?

না—বরাত জোর। একটা মস্ত বড় ইঁদুর ছুটে পালাল, দেয়াল-ঠেসানো এস্রাজটা মেঝেয় গড়াচ্ছে। বড় অসাবধান ছাত্ররা, একটু যত্ন নিয়ে ওটাকে হুকে টাঙিয়ে রেখে গেলে আর ভাঙবার ভয় থাকে না।

গ্লাসটা তুলে নিয়ে বললেন, তুমি ত রইলে—ঘড়িটায় আর এ্যালার্ম দিলাম না। আমাকে ঠিক ঘণ্টা দুই পরে উঠিয়ে দেবে। এখন ইচ্ছে করলে বই পড়তে পার। ওই 'রাগ দীপিকা'টা কাল আনিয়েছি।

উনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। আমি বসে রইলাম। বই পড়ব কি—তখন আমাতে কি আমি ছিলাম! টেবিলের উপরে টিক্ টিক্ করছিল টাইমপিসটা, সেই দিকে চেয়ে পাথরের মূর্ত্তির মত বসে রইলাম।

তখন ভোর হয়ে এসেছিল, আকাশের কোথাও রাত্রির ঘোর লেগে ছিল না। স্যাভেঞ্জার গাড়ির ঘড়ঘড়ানি আর কাকের ডাক শহরের সকালকে সমাদর জানাচ্ছিল। পথে লোক-চলাচলও সুরু হয়েছিল। প্রতিমাকে ওদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আমি শ্যামবাজারের দিকে ছুটলাম।

ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে দেখি—ইতিমধ্যেই সেখানে বহু লোক জড়ো হয়েছে—একখানা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি

বই পড়ব কি—তখন আমাতে কি আমি ছিলাম !

দাঁড়িয়ে আছে, আর পুলিশের একখানা জীপও। আমি ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলাম। দুয়োরে দাঁড়ানো শান্ত্রী বলল, একটু অপেক্ষা করুন—এন্‌কোয়ারী শেষ হলে ঢুকতে পাবেন।

ভিতর থেকে একটি মহিলা কণ্ঠ শুনলাম, ওঁকে আসতে দিন ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু—উনি ওঁর বন্ধু।

ভিতরের সেই ঘরটিতে—যেখানে সঙ্গীত-শিক্ষার্থীরা পাঠ নিতে আসে—ঢুকবার মুখে গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল ভয়ে। জানি না—এই মুহূর্ত্তে কি দেখব !

স্টেথস্‌কোপ গলায় ঝুলিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। মুখখানা খুব গম্ভীর। বললেন, হাসপাতালে এখনই পাঠিয়ে দিন—পুলিশ যখন কেস টেক্‌আপ করেছে—পরের ব্যবস্থা ওরাই করবে।

কান্নায় ভেঙ্গে-পড়া একটি মেয়ে এগিয়ে এসে বলল, কেমন বুঝলেন ডাক্তারবাবু ? জ্ঞান হবে ত ?

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। হাঁ-কি-না বোঝা গেল না। মেয়েটি আরও কি বলতে চাইছিল ডাক্তার শুনলেন না, নেমে গেলেন।

ষ্ট্রেচারে করে আনন্দকে ওরা নীচেয় নামিয়ে নিয়ে গেল। আমিও যাচ্ছিলাম—পুলিশ অফিসার বললেন, দাঁড়ান, আপনার একটা ষ্টেটমেণ্ট চাই।

মেয়েটি তার ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছিল। ও-ই প্রথম আবিষ্কার করে ফ্ল্যাটের দুয়োর খোলা, ঘরে আলো জ্বলছে অথচ কোথাও মানুষের সাড়াশব্দ নাই। ভোর রাতে ওর এই ফ্ল্যাটে আসার কি প্রয়োজন ছিল ? ছিল বই কি প্রয়োজন। ওদের একটা জলসায় আনন্দের একটা প্রোগ্রাম ছিল, শেষ রাতের প্রোগ্রাম। একে একে অন্য আর্টিষ্টদের প্রোগ্রাম শেষ হ'ল, তখনও আনন্দ আসছে না। কি ব্যাপার ? এমনটা ত কখনও হয় নি। কোন

একটা মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে
তাড়াতাড়ি বার হয়ে গেল।

কোন জনপ্রিয় আর্টিষ্টের সম্বন্ধে এমন দুর্নাম আছে বটে—প্রোগ্রাম নিয়ে, টাকা নিয়ে তাঁরা বেমালুম ভুলে যান। কারণ তার একাধিক, কিন্তু এ যাবৎ আনন্দর সম্বন্ধে এমন অপবাদ কেউ রটনা করতে পারে নি। ওর সময় একেবারে ঘড়ি ধরে ঠিক করা। ষ্টেজে আসা, গান গাওয়া—চলে যাওয়া ঘণ্টা মিনিট ধরে কলের মতই নিঃশব্দে চলে। কেউ ফিরে গাইতে বললে, আনন্দ মাথা নামিয়ে হাসে। অর্থাৎ সময় আমার বাঁধা—মাপ করবেন। এই ফাংশনটার শেষ আকর্ষণ ছিল আনন্দর গান। শেষ দুটি ঘণ্টা আনন্দ আর তার এক ছাত্রীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

মেয়েটি বলেছিল, হাঁ—আমিই সেই ছাত্রী—আমার নাম দীপা। গুরুদেব আসছেন না দেখে আমি খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। পাঁচ মিনিট পরেই আমাদের প্রোগ্রামটা আরম্ভ হবে, দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। উনি না এলে কি যে ঘটবে ভাবতে গিয়ে আমার ভয়ে হাত-পা হিম হয়ে আসতে লাগল। আমি আর

অপেক্ষা করতে পারলাম না। একটা গাড়ি নিয়ে একাই চলে এলাম এখানে। হাঁ—কথা ছিল, এই ফ্ল্যাট থেকেই উনি যাবেন খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে। ইদানীং যত যত ফাংশনে যেতেন—এইখান থেকেই যেতেন। ফিরেও আসতেন এখানে—রাতটুকু কাটিয়ে সকালে বাড়ী ফিরতেন।

কোর্টের জেরায় আরও অনেক তথ্য বার হয়েছিল। তবে তার মধ্যে নোংরা জিনিস কিছু ছিল না। যেমন অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। দীপা যে শুধু ছাত্রীই নয়—শুধু সঙ্গীত শিক্ষার আগ্রহ নিয়ে আনন্দর সঙ্গে যুক্ত হয় নি—এটাও আবিষ্কার করেছিল কোর্ট। সে তথ্য অন্যের বিবৃতিতে জেরার মুখে বার হয়েছিল।

এখন দীপা বলছিল, আমি এই ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছে দেখলাম, একটি মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তাড়াতাড়ি বার হয়ে গেল।

ফ্ল্যাটের অন্য বাসিন্দারা তখন উঠেছিলেন নিশ্চয়?

রাত চারটের সময় চারিদিক নিশুতি, কোথাও সাড়াশব্দ ছিল না। কমন প্যাসেজ এই সিঁড়ির আলোটা শুধু জ্বলছিল। তিনতলা পর্য্যন্ত সব ফ্ল্যাট নিস্তব্ধ।

আপনি ঠিক বলছেন, সেই মেয়েটি এই ব্লকের কোন ফ্ল্যাটেই থাকত না।

না—মেয়েটিকে আমি চিনতে পেরেছিলাম। ওরা থাকে পটলডাঙ্গার দিকে।

আপনি ত বলছেন, ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছে ওকে দেখলেন—রাস্তা থেকে দেখলেন কি?

না-না—এই ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে ওকে নামতে দেখেছি। সিঁড়িতে যে আলো জ্বলছিল তার আলোয় ওকে চিনতে পারলাম।

তা হলে ওর ঠিকানাটা নিশ্চয় জানেন?

জানি। কিন্তু ওকে আপনাদের কি দরকার?

দেখা যাক—উনি কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করেন! বলে অফিসার ঈষৎ হাসলেন।

আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। এই ঘটনার মধ্যে একটি ষড়যন্ত্রের সূত্র যেন আবিষ্কার করলাম। হয়ত ওটা কাকতালীয়বৎ। তবু মন বলল, আকস্মিক ঘটনার সঙ্গে এই যোগটি নিরর্থক নয়। ধোঁয়ার তলায় আগুন থাকে, এটি প্রাচীন মহাজন বাক্য।

একটু পরে বড় মোটর হাঁকিয়ে তারকবাবু এলেন। ইন্‌স্‌পেক্টর ওঁকে খাতির জানালেন। চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন। দেখুন কি কাণ্ড! কলকাতার বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পীর কি শোচনীয় পরিণাম দেখুন।

ছেলেটি বাঁচবে না? তারকবাবু শুধোলেন।

ডাক্তার ত কোন ভরসাই দিলেন না—এখন হাসপাতাল কি করে দেখুন। দীপা দত্ত ত আপনারই কন্যা? ওঁর ষ্টেটমেণ্ট অনুযায়ী ঠিকানা নিয়ে আপনাকে ফোন করেছিলাম। আপনি ত আর্টিষ্ট আনন্দকে ভাল করেই জানেন—

জানব না! উনি আমার কন্যার সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন। শুধু তাই নয়, আমার পরম স্নেহভাজনও বটে। আপনারা যদি অনুমতি করেন—শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে কল দিই।

তা কেন দিতে পারবেন না। তবে সেটা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে করুন।

নিশ্চয়। অমন মহামূল্যবান জীবন—যেমন করে হোক রক্ষা করতেই হবে। এই যে বাবা সুব্রত, তুমিও এসেছ! দেখ ত কি দুর্দ্দৈব! আমি কোথায় ভাবছি আর ক'টা দিন বাদে শুভ কাজ—

দীপা তাড়াতাড়ি বলল, বাবা, আগে ডাক্তারকে ফোন করে এন্‌গেজ করুন, এখন এক একটি মিনিটের দাম অনেক।

হাঁ—এই যে যাই। নমস্কার ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু, একবার দয়া করে আসবেন অধীনের বাড়ীতে।

যাব বই কি—হয়ত একটু পরেই যেতে হবে। এই দিকের কুইরিটা সেরে নিই। হাঁ—ভাল কথা, আপনাদের পাড়ায় একটি মেয়ে থাকে, বলে এগিয়ে গিয়ে ওঁর কানে কানে সেই নামটি হয়ত উচ্চারণ করলেন। চেনেন কি ওর বাড়ীটা?

বিলক্ষণ! ওদের বলে জন্মকাল থেকে দেখছি—চিনব না! হাসলেন তারকবাবু।

মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র কেমন?

তারকবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, স্বভাব-চরিত্র! মনে হয় খুবই ভাল। এ যাবৎ কোন—

দীপা আবার অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল, বাবা—বড্ড দেরি করছেন কিন্তু! ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট পরে দিলেও চলবে—এখন একটা প্রাণ যাতে রক্ষা হয়—

হাঁ—এই যাচ্ছি। বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন তারকবাবু।

আমার ষ্টেটমেণ্ট নিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন, আপনিও দেখছি ওই পাড়ার বাসিন্দা! ঘটনাটা যদিও এত দূরে ঘটেছে—মনে হচ্ছে সবটাই প্রি-মেডিটেটেড! আপনি এর থেকে কি অনুমান করেন? রোমান্স কিছু আছে—কি বলেন?

কি জানি, বুঝতে পারছি না। তবে আমরা সবাই জানতাম—

দীপা বলল, ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু, আমি কি যেতে পারি?

নিশ্চয়। তবে আপনাদের বাড়ীতেও একবার যেতে হবে। হয়ত আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে—

আসবেন—নিশ্চয় আসবেন। যত খুসি প্রশ্ন করবেন—আমি অকপটে সব বলব। দোষী যাতে শাস্তি পায় তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করব না।

দীপা চলে গেলে ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন, এইবার ফ্ল্যাটটায় তালা লাগিয়ে পুলিস পাহারা বসিয়ে আমরাও উঠব। আসুন না আমার জীপে।

আপনি চলুন—একটা কাজ সেরে নিয়ে আমি যাচ্ছি।

ইচ্ছে করে ওঁদের সঙ্গ এড়িয়ে গেলাম। ওঁদের সঙ্গে জীপ থেকে নামতে দেখলে আমার অবস্থা কেমন হবে কল্পনা করতে পারছিলাম না। যতীশবাবু—প্রতিমা—জ্যেঠাইমা—দিলীপ—দ্বিজ—ওরা নিশ্চয় ভাববে···যাই ভাবুন আমি আপাতত নির্জ্জনে বসে ব্যাপারটা আর একবার আগাগোড়া ভেবে নিতে পারব। এর পর বিপর্য্যয় যা ঘটবে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

খুনী আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো প্রতিমাকে কোন মতেই কল্পনা করতে পারছি না।

বিহারে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের কথা মা-ঠাকুরমাদের মুখে শুনেছিলাম। ভূমিকম্পের পর এক একটা শহরকে নাকি সনাক্ত করাই যায় নি। যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই দৃশ্য—তাঁরা একটিমাত্র উপমা প্রয়োগ করে ধ্বংসের ভয়ঙ্করত্বকে ফোটাতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, শহর নয়—শ্মশানভূমি। বেশ খানিকটা বেলা করেই ঢুকেছিলাম আমাদের পাড়াতে। ঢুকেই মনে পড়েছিল ওই উপমাটি। সত্যই শ্মশানভূমির মত থম থম করছিল পাড়াটা। অবশ্য দুপুর বেলাটা শহরের গলিগুলি এমনিতেই জনবিরল থাকে। কর্ত্তারা আহারাদি সেরে যে যার কর্ম্মক্ষেত্রে চলে যান, ছেলেমেয়েরা ছোটে স্কুল-কলেজে। বৃদ্ধেরা এবং বাড়ীর মেয়েরা করেন নিদ্রার সাধনা।

কেউ কেউ অবশ্য বসে বসে সেলাই করেন, কেউ বা বই পড়েন—ক্বচিৎ কোথাও রেডিওর চাবি খুলে মেয়েরা দুপুরের আসরে যোগ দেন। এ সবই চলে খুব সন্তর্পণে। শহরের দুপুর রাতের ভূমিকাটা সেরে রাখে আগেভাগে। তা হোক—নিস্তব্ধতার মধ্যেই একটি ক্ষীণ জীবন-স্রোত ধীরে ধীরে বয়ে যায়। কোনমতেই মনে হয় না—সমাধিভূমিতে এসে পৌঁছলাম।

আজকের মধ্যাহ্নটা এই পাড়াতে একটু আগেই এসে গেছে। সকাল থেকে উত্তেজনার প্রখর স্রোতে পা রেখে হাঁপিয়ে উঠেছে বাসিন্দারা—এখন কাজ সেরে তারা বিশ্রামের আলস্যে গা এলিয়ে দিয়েছে। আমাদের বাড়ীতে মা শুধু আমার ভাত ঢাকা দিয়ে বসেছিলেন।

আমায় দেখে মা অনুযোগ করলেন না, এতক্ষণে এলি? আমি বলে সেই কখন থেকে বসে রয়েছি। তার বদলে বললেন, শীগ্‌গির নেয়ে নে—ভাত কড়কড়ে হয়ে গেল!

চুপচাপ স্নান করলাম—আহার করলাম। নিজের মনে অনেকগুলি কথা ঠেলাঠেলি করছিল—মায়ের মনেরও সেই অবস্থা। অথচ কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারছি না—তার পর কি হ'ল? আমাদের বাড়ীতে প্রতিমার আসনটি ছিল স্নেহ-ভালবাসার। আহার শেষ করে আঁচিয়ে নিলাম। মা-ও খেয়ে নিলেন। মায়ের খাওয়া হলে বললাম, খুব একটা কাণ্ড হয়ে গেল ত পাড়ায়?

মা ভারি গলায় বললেন, পাড়ার লোক, ভিন পাড়ার লোক ভেঙ্গে পড়েছিল গলিটায়। আহা, মেয়েটার মুখখানির পানে আমি চাইতে পারি নি।

তুমি কি ওঁদের বাড়ী গিয়েছিলে?

এই ত একটু আগে ফিরছি। দিদিকে জল খাইয়ে ফিরছি। কিছুতেই ভাত খেলেন না।

একটু চুপ করে থেকে মা বললেন, তুই একবার যাস খোকা—তোর কথা ওঁরা কতবারই যে বলছিলেন।

জ্যেঠামশায় নিশ্চয় আপিস যান নি?

না। বাড়ীতেই আছেন। গলা নামিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন মা, হাঁরে কথাটা কি সত্যি? আকুচা-আকুচির ব্যাপার?

কে বললে?

সবাই ত বলছে—এ ওই বাড়ীর কাজ। ওদের মেয়েটাই নাকি মিথ্যে বলে ধরিয়ে দিয়েছে প্রতিমাকে।

বললাম, প্রতিমাকে ধরিয়ে দিয়ে ওর লাভ?

মা টপ করে কোন জবাব দিলেন না। ছেলের সামনে মনের সন্দেহ ব্যক্ত করতে হয়ত সঙ্কুচিত হলেন। কিন্তু ওঁর মনের ভাবটা আমি বুঝে নিলাম। এই সব গোপন বার্ত্তা সন্দেহের অন্ধকারেই ডালপালা মেলে। ভালবাসা হ'ল সুগন্ধ ফুল—চাঁপা ফুল। যত দূরেই ফুটুক, গন্ধটি তার পৌঁছে দেবেই যথাস্থানে।

একটু চুপ করে থেকে মা বললেন, শুনছি—আনন্দকে নাকি ওরা ঘরজামাই করতে চেয়েছিল! রাগ ত ওদের হবেই।

জ্যেঠামশাই কি বললেন?

বটঠাকুর ত এমনিতেই কথা বলেন কম। প্রতিভা চলে যাওয়ার পর গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। আবার প্রতিমা—

প্রতিমার কথাটা ইচ্ছা করেই চেপে গেলেন মা। আমিও সে প্রসঙ্গ তুললাম না। পুরাতন স্মৃতি দুঃখই বাড়ায়—আমাদের চারিদিকে এখন দুঃখের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, সে স্রোতের বেগ বাড়িয়ে কি ফল!

মা আর একবার বললেন, তুই একবার যা খোকা—ওঁরা তোকেই খুঁজছিলেন।

কেউ জামিন হয় নি।

জামিনের ব্যবস্থা ত আদালত থেকে হবে—এখন ত ও রইল পুলিসের হেপাজতে। শুনছি, এ সব কেসে জামিন দেয় না, সত্যি?

কি জানি!

হাঁরে—আনন্দর নাকি এখনও জ্ঞান হয় নি?

কে বললে?

ওর মাসীমার মুখে শুনলাম। ওরাও কলেজে গিয়েছিল দেখতে। ঢুকতে দেয় নি ঘরে।

বললাম না আমিও এতক্ষণ কলেজে ছিলাম, আমিও ওকে দেখতে পাই নি।

জামাটা গায়ে দিয়ে বললাম, ওদের বাড়ীতে যাচ্ছি মা।

কথার পর কথা সাজিয়ে দুঃখের ছবি আঁকা বৃথা। বেদনার বাসা হল অন্তরে। চোখের জল দীর্ঘনিঃশ্বাস বিলাপ-অস্থিরতা এসব দিয়ে তার কতটুকু বাইরে আনা যায়! তার কতটুকু বা আর একটি মনে সঞ্চারিত করা যায়! হৃদয়ের একটু সংযোগ না থাকলে হৃদয়কে কি নরম করা যায়? বৃষ্টির ফোঁটা যেমন প্রখর সূর্য্যালোক পার হয়ে সহজে মাটিতে পৌঁছতে পারে না—তেমনি এক হৃদয়ের দুঃখ বেদনা অন্য হৃদয়ে অনায়াসে সঞ্চারিত হয় না। মমতার মেঘের ছায়া না পেলে তারা আসে না—তারা ফসল ফলায় না।

যতীশবাবু ঠাণ্ডা গলায় বললেন, বোস বাবা। সবই শুনেছ জানি। আনন্দ কি এখনও বেঁচে আছে?

ডাক্তাররা এখনও আশা ছাড়েন নি।

ভগবান করুন ও সুস্থ হয়ে উঠুক।

আপনি ভাববেন না—প্রতিমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ—

আমি সে কথা ভাবছি না বাবা। আমার সান্ত্বনা—ত্বয়া হৃষীকেশ—যেমন দেবেন—তেমনি নিতে হবে। তোমার জ্যেঠিমা তোমায় খুঁজছিলেন।

ভাঁড়ার ঘরে পা ছড়িয়ে বসে কুলোয় রাখা চাল থেকে ধান ও কাঁকর বাছছিলেন জ্যেঠাইমা। আমায় দেখে ডান হাত দিয়ে পিঁড়িটা ঠেলে এগিয়ে দিলেন, বোস বাবা।

কুলোর উপরে চোখ রেখে আরও যেন কি বলতে গেলেন, পারলেন না। ওঁর দু চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

কুলোটা রেখে আঁচল দিয়ে, চোখ মুছে নিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, কিছুতেই ভুলতে পারছি নে বাবা, হতভাগী না খেয়ে চলে গেল! তোমার মা এসেছিলেন আমাকে খাওয়াতে, কিন্তু উপোসী মেয়ের কথা ভেবে, তাঁর কথা রাখতে পারি নি বাবা।

সেখানে খাবার ভাল ব্যবস্থাই আছে জ্যেঠিমা। বাড়ীর চেয়েও ভাল খাবার ওরা দেয়।

তা দিক, যত্ন করে খাওয়াবে কে! যে ঝড়টা ওর উপর দিয়ে গেল—ভাত কি ওর গলা দিয়ে উলবে!

না খেয়ে কে কতদিন থাকতে পারে বলুন! আপনি কাঁদবেন না।

উনি হাসবার মত মুখ করে বললেন, কাঁদছি আর কই! সে শক্তি কই—সাহস কই! যে কলঙ্কটা চাপল মাথায়—তাতে কাঁদার যো কি! হায়, হায়, হতভাগীর কেন মরণ হলো না!

আমি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম না। ওঁকে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবার সুযোগ দিলাম। চোখের জলই ওঁর একমাত্র সান্ত্বনা—যত জল পড়বে—মনের ভার তত নেমে যাবে।

অনেকক্ষণ কেঁদে উনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হলেন। কুলোটা এক পাশে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, একটুখানিক বস বাবা। একটা জিনিস তোমায় দেখাব।

তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন হাতে একখানা একুসারসাইজ বুক নিয়ে। খাতাটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা পড়ে দেখ ত বাবা, হতভাগী কি সব লিখে রেখেছে। রোজ রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া সেরে বসে বসে লিখত। আমি বাসন মেজে রান্না ঘরের পাট চুকিয়ে শুতে যাবার সময়ও দেখতাম লিখছে।

কতদিন আগে থেকে লিখছিল?

কতদিন আর! বড় জোর আট দশ দিন হবে। কর্ত্তাকে দেখাই নি—ছেলেদেরও দেখাই নি। একটুখানিক পড়ে মনে হয়েছিল—তোমাকে দেখালেই ঠিক হবে। তুমি ত শুনেছি বইটই লেখ—সেই সবই হবে বোধ করি? গল্প? কি বল বাবা।

পাতাগুলো উল্টে চোখ বুলিয়ে নিলাম। গল্পের মতই মনে হ'ল। আশ্চর্য্য বোধ হ'ল। সঙ্গীত-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সাধনাও করছিল প্রতিমা! আশ্চর্য্য ভাবপ্রবণ মেয়ে। না হলে শেষ রাত্রিতে অমন একটা কাণ্ড করে বসল কেন।

কৌতূহলী হয়ে বললাম, এটা আমার কাছে রাখব জ্যাঠাইমা।

তোমাকে দেব বলেই ত সরিয়ে রেখেছি। ভাগ্যি সরিয়ে রেখেছিলাম—তার একটু পরেই পুলিশ এসে ওর ঘর তল্লাসী করে কি সব কাগজপত্র নিয়ে গেল।

বললাম, এটা আমার কাছেই থাক। কি জানি হয়ত এর মধ্যে এমন জিনিস পেয়ে যাব—যাতে ওর কেসটা হাল্কা হয়ে যাবে।

কিন্তু বাবা, আমাকে জানিও কি লিখেছে।

বললাম, জানাব।

ভারি কৌতূহল হ'ল। বাড়ীতে ফিরে বাইরের ঘরের দুয়োর বন্ধ করে খাতা নিয়ে বসলাম।

প্রথমটা মনে হল একটা গল্পই লিখেছে প্রতিমা। একটু এগিয়ে আত্মচরিতের মত লাগল। ওই ত বয়স প্রতিমার—আত্মচরিত লেখার মত উপাদান এরই মধ্যে সংগ্রহ করতে পারল! এক একটা জীবন সুদীর্ঘ বয়সের ভার জমিয়েও বৈচিত্র্য ও বর্ণসঞ্চিত থাকে—সে শুধুই একটানা ক্লান্তিকর ধূসর পথযাত্রার বিবরণ। কোন কোন জীবনে ভাবালুতার ঘটা অত্যন্ত বেশি; তরুণ বয়সীদের কাছে সে কাহিনী মন-রোচক হলেও বস্তুভারশূন্য। কোন জীবনকে বা যুক্তি বিশ্লেষণ দিয়ে মননশীল করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই ভঙ্গিমাও সুখপাঠ্য নয়। প্রতিমার লেখাটি কিন্তু এই সবের গোত্রে মিলবে না। একটানা সহজ ভাবে পড়তে লাগলাম।

হয়ত পরিচিত লোকের প্রচ্ছন্ন চিন্তাধারা সম্বন্ধে আমাদের একটু দুর্ব্বলতা থাকে। যে লোকটাকে একরূপে সামনে দেখছি—অন্তরালে সে আর এক ব্যক্তি—এটা ভাবতে কেমন আশ্চর্য্য লাগে! তার চিন্তাধারা অনুসরণ করতে করতে তাকে নতুন করে আবিষ্কার করার আনন্দ পাওয়া যায়। তরুণ মনের এলোমেলো ভাবনা—ভাবালুতা-আবেগ-উচ্ছ্বাস ছেলেমানুষি মনে হলেও কৌতূহল জাগায়। কৌতূহল নিয়েই লেখাটা পড়তে লাগলাম।

প্রতিমা লিখেছে :—

আমার নাম প্রতিমা। আমার বয়স যখন আট কি নয়—ঠিক মনে পড়ছে না—তখন প্রথম বুঝতে পারি—আমি নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে—আমরা খুব গরীব। যে বাড়ীতে বাস করছি ওটা নিজেদের বাড়ী নয়, ভাড়া বাড়ী। আমার মায়ের গায়ে যে দু'একখানা গহনা আছে তা ব্রোঞ্জে-সোনায় মেশানো, এবং দিদির ঘরেতে যে ইলেকট্রিক পাখাখানা ঘোরে ওটা মাসিক ভাড়ায় বন্দোবস্ত করা। হাঁ, পাখাখানা দিদির ঘরেতেই থাকে। এই বাড়ীর একমাত্র দোতলা ওই ছোট্ট সিঁড়ির ঘরখানাতে দিদি একলা থাকে। আগে নাকি ওটা ভাঁড়ার-কম-ঠাকুর ঘর ছিল। নীচে তলায় মাত্র দুখানা ঘর। নোনাধরা দেওয়াল, স্যাঁতসেতে মেঝে, আলোহাওয়ার সঙ্গে অসহযোগ-করা ঘর। হবে নাই বা কেন! এটা ত সম্পূর্ণ একটা বাড়ী নয়। একটা বড় বাড়ীকে টুকরো টুকরো করে টিন ঘিরে পাঁচিল তুলে যে অংশটুকু বার করে নেওয়া হয়েছে—তারই গায়ে আলাদা একটা নম্বর বসিয়ে স্বতন্ত্র বাড়ীর মর্য্যাদা দিয়েছে পৌর-প্রতিষ্ঠান। ফলে নীচের দেড়খানা ঘর (একখানা পুরো, আর একখানির মাঝ বরাবর দেওয়াল তুলে আলাদা করা) এই সিঁড়িটুকু আর কলতলার একটু ফালি অংশ (কলের গা থেকেই একটা টিনের পার্টিশন উঠেছে।) আমাদের ধারে। ছাদের দু'পাশেও টিনের ঘেরা। এ-বাড়ীর ছাদে উঠে ও-বাড়ীর মানুষকে ত নয়ই—ছাদকেও দেখা যায় না। তা না যাক—একফালি নিজস্ব ছাদ আমাদের আছে। কলকাতায় ভাড়া বাড়ীতে এ বড় কম সম্পদ নয়। সেই ছাদে দাদারা ঘুড়ি ওড়ায়, আমরা দু বোন (আমি আর ছোট বোন প্রমীলা) স্কিপিং করি, মা কাপড়-জামা শুকুতে দেন—বড়ি, আচার রোদে দেন; শীতের সকালে রোদ পোয়াবার নাম করে ছাদে উঠে খানিক হুটোপুটি করি আমরা। আবার খুব গরমের সময় হাতে তালপাখা আর বগলদাবায় মাদুর-বালিশ নিয়ে বাবা উঠে আসেন সেখানে। সেখানে রোদ খুব বেশীক্ষণ থাকে না, তবু মাথার উপরে এক টুকরো খোলা আকাশ আমাদের মনকে কল্পনা-প্রবণ করে তোলে। আমরা গল্পের আসর জমাই পরিপাটি ভাবে। আবার প্রকৃতি পাঠের সুযোগও লাভ করি। ওই আকাশের দিকে আঙুল উঠিয়ে বাবা আমাদের সপ্তর্ষি চিনিয়ে দিয়েছিলেন—যদিও ধ্রুবতারাকে আমরা দেখতে পাই নি।

বাবা বলেছিলেন, সপ্তর্ষি যেখানে বেঁকে জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত হয়েছে—ওর শেষ তারাটি থেকে সোজাসুজি একটা লাইন টেনে নিয়ে উত্তর সীমায় অনেকখানি নেমে গেলে ধ্রুবতারাকে দেখতে পাবে। খুব উজ্জ্বল তারা নয়, কিন্তু না-চেনার মতও নয়। একবার চিনে নিতে পারলে রাত্রিকালে বিজন মাঠে কি জলের পথে পথ ভুল হবে না। কিন্তু সেই অনেক নীচের উত্তর সীমা ওদিকের একটা বড় বাড়ীর আড়ালে পরায় আমরা ধ্রুবতারাকে দেখতে পেলাম না। বাবা বলেছিলেন, একদিন গড়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে আমাদের ধ্রুবতারা চিনিয়ে দেবেন। কিন্তু আরও অনেক কথার মত বাবা এ কথাটিও রাখতে পারেন নি।

আরও বড় হয়ে আমরা বুঝতে পারতাম, এই গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষরা ভারি অসহায়। তাঁরা জীবনে অনেক কিছুই আশা করেন—অনেক রঙীন কল্পনার জাল বুনতে চান, অনেক কথাই দৃঢ় বিশ্বাসে বলে যান, কিন্তু বাস্তব তাঁদের বার বার আঘাত দেয়। বাবা আর কি করতে পারেন! উনিও উত্তরাধিকারসূত্রে এই মধ্যবিত্ত ঘর ও মধ্যবিত্ত মন পেয়েছিলেন। জীবন-সংগ্রামের পর্ব্বে পর্ব্বে ওঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা—বীর্য্য বিশ্বাস—সুখ আনন্দ রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে পড়েছে চলন পথের দু-ধারে। বার বার চেষ্টা করেছেন—বার বার নিষ্ফল হয়েছেন। প্রথম যৌবনে খুব উৎসাহ নিয়ে কলেজের পড়া শেষ করেছিলেন। ভেবেছিলেন এর পর বিরল শিক্ষিতদের সঙ্গে একটি মর্য্যাদার আসনে বসতে পারবেন। কিন্তু স্কুল-কলেজের কথা দূরে থাক, ভালমত একটা সরকারী চাকরিও ওর ভাগ্যে জোটে নি। ভাল চাকরির ক্ষেত্রে যেটি অত্যাবশ্যকীয় বস্তু—সুপারিশ, তা ওঁর ছিল না। হয়ত পাড়ার কোন প্রতিষ্ঠাবানকে ধরলে তা সহজেই জোগাড় করতে পারতেন—উনি তা করেন নি। উনি প্রায়ই বলতেন, ওই

সহজটাই আমার খুব কঠিন মনে হ'ত। যাঁদের কাছ থেকে সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট নেব, তাঁদের চরিত্রে আমাদের বিশ্বাস ছিল না, আমরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সুরেন বাঁড়ুজ্যের লেকচার শুনেছিলাম—অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম' আর ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা'র একনিষ্ঠ পাঠক ছিলাম—পার্কে-ময়দানে স্বদেশী সভা বসলে ছুটে যেতাম বক্তৃতা শুনতে। রাখীবন্ধনের দিন দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে কলকাতার রাস্তায় ঘুরবার সুযোগ পাই নি বটে, টাউন হলে গিয়েছিলাম। আমাদের সবচেয়ে প্রিয় গান ছিল, 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্।' কেমন নরম মিষ্টি সুরের গান—যা কানে এলেই মনে হ'ত, হিমাদ্রি পাষাণ যদি গলে যায় ত ওদের মন কেন গলবে না? ওদের মন কি পাথরের চেয়েও শক্ত? কি জানি তখন স্কুল-কলেজের ছেলেদের উপর পুলিসের দৃষ্টি থাকত কি না—আমার চরিত্রে ওরা কোন কালো দাগ দিয়েছিল কি না জানি না—তবে ভাল একটা সরকারী চাকরি পেয়েও পাই নি। হয়ত পুলিস রিপোর্টেই গোল ছিল। সেই কারণেও সুপারিশ সংগ্রহের চেষ্টা আর করিনি। পাড়াতে যাঁরা সম্পদে প্রভুত্বে অনেক উপরে, তাঁদের খেতাব রায় সাহেব—রায় বাহাদুর। ওঁরা সরকারের বশংবদ ভৃত্য। ওঁদের কাছ থেকে চরিত্রের সার্টিফিকেট নিতে গা ঘিনঘিন করত।

বাবা ভাল চাকরি পান নি। তবে ভাগ্য ভাল আলাদা একখানা বাড়ী পেয়েছিলেন বাস করবার জন্য। হোক ভাড়াবাড়ী, ভাঙ্গাচোরা বাড়ী, আলাদা একখানা বাড়ী ত। প্রতিদণ্ডে কল-জল শৌচাগার আরও অনেক তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনা জড়িয়ে নিজেদের নীচেয় নামবার, সঙ্কীর্ণ হবার সুযোগ আমরা পাই নি।

কিন্তু প্রতিদণ্ডে না হোক, প্রতিদিন আমরা এই সব ঘটনাকে এড়াতে পারি না। প্রতিবেশীদের সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা যায় না। আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে, শিক্ষালয়ে, খেলার আসরে এমন সুযোগ প্রচুর রয়েছে। আমাদের সঙ্গীসাথী, আত্মীয়বন্ধু, আমাদের আচার-প্রথা, ধর্ম্ম সমাজ—এমন কি ঈশ্বর বিশ্বাস পর্য্যন্ত সৎজীবন যাপনের সম্পূর্ণ অনুকূল নয়। যাক্, এসব কথা পরে বলব, সুযোগ হ'লে।

এখন বাড়ীটার কথা শেষ করি।

দিদির ঘর আলাদা—ওর ঘরে আলাদা একখানা পাখা আছে—এতে মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়—ওর একটি স্বতন্ত্র মর্য্যাদা এ বাড়ীতে আছে। ও এখন সংসারের একটি স্তম্ভ, প্রধান অবলম্বন। বাবার অবসর নেবার বয়স এগিয়ে আসছে, ভায়েরা এখনও বেকার। একজন ত সামান্য পড়েই ইস্কুল ছাড়লে। স্কুল ফাইন্যালটা অন্তত দিয়ে রাখলে বাবা তাঁর আপিসে চেষ্টা করতে পারতেন। আগেকার কাল হলে হয়ে যেত—এখন কমপক্ষে একটা ছাপ পিছনে থাকা চাই। মেজদা পড়ছে বটে, পড়ায় ওরও তেমন মতি নেই। থাকবে কি করে। যে সব হাঙ্গামা-হুজুগের মাঝখান দিয়ে আমরা চলাফেরা করছি। একে ত ইস্কুল-কলেজের ছুটো লম্বা ছুটি তার উপরে নিত্যনূতন হাঙ্গামা—ছাত্রবেতন বৃদ্ধি—মাষ্টারদের মাইনে ও মাগ্‌গী ভাতা আন্দোলন, সাধারণ ধর্ম্মঘট, হরতাল, বয়কট··· ক'টা দিন আর সুস্থ ভাবে ক্লাস বসে! এর উপরে আছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আর কালোবাজারের প্রতাপ। আমরা মধ্যবিত্তরা ত ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছি। আমাদের হয়ে বলতে কেউ নেই, আমাদের অবস্থা বুঝতে কেউ নেই—চারিদিকে সামনে-পিছনে ধূ ধূ মরুভূমি। লোভীদের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করবেন—তেমন বীরপুরুষ কোথায়? ভারতবর্ষ কি বীরশূন্য হয়ে গেছে?

যাক, মেজদা ইস্কুলে যায় বটে, পড়ার চেয়ে হুজুগেই ওর মন বেশী। বাবা বোঝেন সব, কি আর করবেন, চুপ করে থাকেন। এক একবার বলেন, আমরা স্বাধীন হলাম কিন্তু ঘর আমাদের রইল না। সমাজ নেই, চরিত্রও নেই। আমরা এখন স্রোতের শ্যাওলা। এমন করে ক'দিনই বা বাঁচব।

আক্ষেপটা কেন করেন—সেটা আরও পরে বুঝেছিলাম। সেইদিন বুঝেছিলাম আমরা খুবই গরীব। অর্থে এবং চরিত্রে দরিদ্র। এবং অসহায়।

দিদি ইস্কুল ছেড়ে কলেজে উঠেছিল। ইতিমধ্যে ছাত্রী পড়িয়ে ইস্কুলের ফী—খাতা পেন্‌সিল বইও কিছু···এবং প্রসাধনীয় টুকিটাকি—সেলাই'এর ছিট ইত্যাদি জিনিস নিজেই যোগাড় করে নিত। এই ভাবে ও সংসারে চাপ পড়তে দেয় নি—সুতরাং ওর মর্য্যাদা তাতে বাড়ছিল। আর আলাদা একখানা ঘর পাওয়ার অধিকারও এই উপায়ে অর্জ্জন করেছিল বলা যায়। ওই ঘরে একপাশে ছিল ভাঁড়ার, আর একপাশের জলচৌকিতে ছিল ঠাকুরের পট। এখন পটখানিকে একটা তাকের উপরে তুলে দিয়ে জলচৌকির নীচেয় উপরে দিদি বইগুলি গুছিয়ে রাখল। এবার কলেজের পড়া—বইয়ের সংখ্যা বেড়েছে। বাবার ইচ্ছা—মায়েরও ইচ্ছা—ও উচ্চ শিক্ষা পাক। ছেলেদের পানে চাইলে ত সে ভরসা হয় না, এখন মেয়েই পূর্ণ করুক সাধ। তা ছাড়া বিয়ের বাজারেও এর দাম আছে—ঠিক চাকরির বাজারের মত। একটা পাশ দেওয়ার পর দিদির একটি সম্বন্ধ এসেছিল। আমাদের মত গৃহস্থ ঘরের পক্ষে সেটা অকল্পনীয়। দু'পক্ষের দেখাশোনা ঠিকুজী কোষ্ঠী ইত্যাদি মিল হয়ে গেছে—বলা যায় দুটি ধাপ পার হয়েছে। এখন তৃতীয় ধাপটি পার হলেই আমাদের মনের ইচ্ছাটি পূর্ণ হবে। সেইটি কিন্তু সবচেয়ে কঠিনতম ধাপ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে সাংসারিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসেন না বাবা। সুতরাং সেই সম্বন্ধে আমরা অন্ধকারে রয়েছি।

বাবা পাত্রপক্ষের বাড়ী থেকে ফিরে আসা পর্য্যন্ত একটু বেশী গম্ভীর হয়ে গেছেন। তাই দেখে মা-ও বেশী কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। সব বৃত্তান্ত জানবার জন্য উস্‌খুস্ করছেন।

বাবা বলেছেন, বলব, বলব! আগে হাতে কাজকর্ম্ম সেরে নাও—তার পর নিশ্চিন্ত হয়ে শুনো।

মায়ের কাজকর্ম্ম সারতে রাত বারোটা। বাবা জানেন, সেই সময়ে আমরা কেউ জেগে থাকব না। সেই সময়েই সাংসারিক বিষয় নিয়ে আলোচনার উত্তম সুযোগ।

ভাগ্যক্রমে আমি সেদিন জেগে ছিলাম। একটা উৎকট স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছিলাম। ওঁদের ফিস্ ফিস্ আলোচনা কানে যাওয়াতে আর টুঁ শব্দটি করি নি। ওঁরা দিদির বিয়ের কথা আলোচনা করছিলেন। বিয়ের কথা শুনে আমারও ভারি কৌতূহল হয়েছিল। জানেন, মেয়েরা—তা সে যে বয়সের মেয়েই হোক—পাঁচ থেকে পঁচাশী বিয়ের কথা শুনলে আগ্রহে কৌতূহলে দম বন্ধ হয়ে যায়। দেখেন নি পথ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে বরকনে গেলে সব বয়সী মেয়েরা ছুটে এসে ছাদে জানালায় সদর দরজায় জড়ো হয়—পথের মাঝখানে থমকে দাঁড়ায়। পুরুষদের এমন উগ্র কৌতূহল দেখেছেন কি? বয়স অল্প হলেও আমিও ত জাতি-ধর্ম্মের অধীন। কান খাড়া করে ওঁদের কথা শুনছিলাম।

মা বলছিলেন, মেয়ে পছন্দ হল—ঠিকুজী কুষ্ঠি মিলল, আমাদের অবস্থাও শুনেছেন, স্বচক্ষে দেখেও গেছেন, তবু টাকার কথা তুলছেন!

বাবা বললেন, মেয়ে পক্ষের কথা সহজে কেউ কি বিশ্বাস করে। ভাবে কম দেবার তালে গরীবিয়ানা দেখাচ্ছে।

তুমি নিশ্চয় সব খুলে বল নি! তোমার আবার মানের জ্ঞান টনটনে ত!

বাবা বললেন, মান-ইজ্জৎ ত চাকরির সঙ্গে সঙ্গেই বিসর্জ্জন দিয়েছি। তদুপরি কন্যাদায়। আর কি ভাবে বলতে পারি! বললাম—এত টাকা মাইনে পাই, ভাড়া বাড়ীতে থাকি। পাঁচটি ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ—খাওয়া-পড়ার খরচ—এই দিনকাল—আমার একার রোজগার। অন্য কোথাও জমিজমা নেই—বাড়তি কোন আয়

নেই। আপিসে কো-অপারেটিভে ধার, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে এ্যাডভান্স নেওয়া আছে, প্রত্যেক মাসে এর-ওর-তার কাছে হাত পাতছি—মুদিরও কিছু পাওনা বাকী—আবার পরিবারের গায়েও একখানিও খাঁটি সোনার গহনা নেই। এর চেয়ে আর কি চমৎকার গরীবিয়ানার নমুনা দিতে পারতাম বল ?

মা নিঃশ্বাস ফেললেন কি না—শুনতে পাই নি, ধরা গলায় বললেন, আর একবার বেয়ে চেয়ে দেখ—

কসুর করি নি। ওঁদের এক কথা—নগদ কিছু না হলে এই বাজারে ঘর থেকে খরচ-পত্র করে ছেলের বিয়ে দিতে পারব না। পাঁচজন সম্ভ্রান্ত আত্মীয় বন্ধু আসবেন—তাঁদের সামনে আপনার মেয়েকে বরণ করে তুললে আমাদের মান ইজ্জত থাকবে !

মা এবার কেঁদে ফেললেন, হায়রে কপাল, আমার গায়ে যদি দু'খানা ভাল সোনার গহনাও থাকত ! এই ব্রোঞ্জের চুড়ি বাঁধা দিয়ে কেউ এক পয়সাও দেবে না।

বাবা বললেন, কাঁদছ কেন—চেষ্টা ত করা গেল—হল না—কি হবে ! এই কপাল তোমার ত একার নয়, লক্ষ লক্ষ লোক এই নিয়ে ঘর-সংসার করছে। বইয়ে একটা শ্লোক পড়েছিলাম—দরিদ্রানাং মনোরথ উথায় হৃদিলীয়ন্তে। দরিদ্রের সাধ মনেতে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে যায়।

মা বললেন, তবু একদিন-না-একদিন সুখের মুখ দেখে মানুষ—আমার কপালে সব উল্টো ছিরি।

বাবা বললেন, তাই ত বলছি—প্রতিমা পড়ে যাক। ওর খরচ ও যখন নিজেই চালিয়ে নিচ্ছে—আমরা কেন ভাবি ! একদিন ও নিজের উপার্জ্জনে দাঁড়াতে পারবে—তখন কোন দুঃখ থাকবে না।

মা বললেন, কপালে দুঃখ থাকলে কে খণ্ডাবে ! তুমিও ত কম বিদ্বান নও—তিনটে পাস ! কিন্তু কি হল ! আর সামনের ওই দত্ত-বাড়ীর পানে চেয়ে দেখ—একটা গোলদারি দোকান থেকে কি হয়েছে। কর্ত্তারা আকাট মুখ্যু, ছেলেরাও কলেজের মুখ দেখে নি অথচ ঠাকুর চাকর দারোয়ান মোটর···মা লক্ষ্মী দু'হাতে ঢেলে দিচ্ছেন।

বাবা কিছু বললেন না।

মা অনেকক্ষণ ধরে আক্ষেপ করতে লাগলেন। আমি কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সকালে ঘুম ভাঙ্গলে মনে হল—আমরা সত্যিই কি এত গরীব, না কাল রাত্তিরে বাবা আর মা যা বলছিলেন তা স্বপ্ন ? নিশ্চয় ওগুলো স্বপ্নে শোনা কথা। তারই একটু আগে আর একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলাম কিন্তু। হাঁ, স্পষ্ট মনে আছে স্বপ্নটা। এমন স্বপ্ন পরেও কয়েকবার দেখেছি। ঠিক ওই গরীব হওয়ার কথা শুনে চমকে যাওয়ার পর থেকে স্বপ্নটা আরও বার কয়েক দেখলাম। ওটা ভুলি নি।

যেন সকাল বেলায় পুকুরের ধারে এসেছি বকুল ফুল কুড়োতে। আমি একা নয়, সঙ্গে আরও চার-পাঁচটি মেয়ে। তাদের আগে কখনও দেখি নি, অথচ চেনা-চেনা মেয়ে। তাদের পরণে সস্তা-দামের ছিটের ফ্রক, হাতে চার গাছা করে সোনারঙের কাঁচের চুড়ি, কানে কাঁচ-বসানো দুল, আর মাথার চুল লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। বেশ ফরসা রঙ, গোলগাল চেহারা, যেন এক একটি আহ্লাদী পুতুল। আমি ফুল কুড়োচ্ছিলাম, ফ্রক গুটিয়ে কোঁচড়ের মত করে তাতে ফুল রাখছিলাম ; ওরাও তাই করছিল। হঠাৎ মনে হল—আচ্ছা, আমি বেশী সুন্দর, না ওরা ? কেমন মিলিয়ে নেবার ইচ্ছা হল। কোথাও আরসি ছিল না, খানিক নীচের কাঁচের চেয়ে পরিষ্কার জল টল টল করছিল। একছুটে পইঠে ভেঙ্গে নেমে গিয়ে দাঁড়ালাম জলের কিনারায়। নিজের মুখ দেখলাম, বেশবাস দেখলাম। মিলিয়ে দেখি আমি অবিকল ওরা হয়ে গেছি। অবিকল ওই পাঁচটা মেয়ে যেন জলের বুকে ঝুঁকে পড়েছে। আবার ছুটে উঠে গেলাম উপরে, ওদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে আমাকে। উঠে দেখি, ওরা নেই। আমি একলা দাঁড়িয়ে

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, চারিদিকে রূপো-গলানো জ্যোৎস্না-নদীর জলে [redacted]চোনো ভাঙ্গা ঢেউ ঝিক্ ঝিক্ করছে, ঢেউয়ে অল্প অল্প দুলছে নৌকা। ভাল করে চেয়ে দেখি—সে কন্যা আ[redacted]আমিই রাজকন্যা। এত রূপ, এত ঐশ্বর্য্য, এত আলো, এত সুর, এত সুখ দেহ যেন ধরতে পারছে না। অ[redacted]গলে যাচ্ছি। ভীষণ দোলা লেগে শব্দ করে গলে যাচ্ছি। হুড়মুড় শব্দ করে জলের স্রোত হয়ে নেমে যাচ্ছি। কোথায়? কি জানি, বুঝতে পারছি না কোথায়? মনে হচ্ছে অনেক, অনেক নীচেয় বিরাট অন্ধকারের হাঁ-করা মুখের দিকে নেমে আসছি। নামতে চাইছি না তবু নামতে হচ্ছে। থামতে চাইছি, প্রাণপণ শক্তিতে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছি, পারছি না। হুড়হুড় করে স্রোত হয়ে নামছি। এ কি প্রাণান্তকর চেষ্টা! সর্ব্বাঙ্গে দরদর করে ঘাম ঝরছে, হাত-পা ছুঁড়ছি, হাঁপাচ্ছি, চীৎকার করতে চাইছি···এমনি সময়ে সত্যি সত্যি ঘুম ভেঙ্গে গেল।

জেগে জেগে সেই স্বপ্ন স্মরণ করতে চাইলাম, কিন্তু আর একটা দুঃস্বপ্ন তখন আমার সামনে এসেছে। বাবা মা দুজনে মিলে সংসারের কুৎসিত দারিদ্র্যকে অবারিত করছিলেন। জেগে উঠেও অন্ধকারের হাঁ-করা মুখের কাছ থেকে পালাতে পারলাম না।

সকালবেলাতে ঘুম ভেঙ্গে রাতের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত মনে পড়েছিল। আর ওঁদের আলোচনাও। কিন্তু সত্য বলে কোনটাকেই মনে স্থান দিতে পারি নি। ওই অদ্ভুত সুখের মধ্যে যদি থাকতে পারব না—সেই দমবন্ধকরা অন্ধকারেই বা কেন থাকব? ছোট মেয়েদের কাছে দুটোই অবাস্তব, দুইই স্বপ্ন।

সেই আট বছর বয়সটা একছুটে পার হয়ে গেলাম একদিন। তখন অনেক বুঝতে শিখলাম—যাকে বলে জ্ঞানলাভ, তাই ঘটলো। সে কিন্তু আনন্দময় অভিজ্ঞতা নয়।

ক্রমে বুঝলাম এই গলিতে আমাদের আশেপাশে যাঁরা রয়েছেন—তাঁদের প্রায় সকলের সঙ্গে আমাদের সংসারের তফাৎ খুব বেশী নয়। ওঁরা বেশীর ভাগই চাকরি করেন আপিসে। স্কুল মাষ্টার আছেন কয়েক জন আর আছেন ব্যবসায়ী। বৃদ্ধেরা কেউ বলেন—আমার মুদিখানার দোকান আছে, কেউ বলেন, মনিহারী দোকান, ষ্টীলট্রাঙ্ক সুটকেসের দোকান, ঘড়ির দোকান, চশমার দোকান, চায়ের দোকান, ময়রার দোকান, বইয়ের দোকান, পানবিড়ি সিগারেটের দোকান—ওঁদের ভাষায় সবই দোকান। অবশ্য দোকান বলেন প্রাচীন লোকেরা, যুবকরা কিন্তু দোকান বলে না। কিসের দোকান নাম করে না—বলে বিজনেস।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা মনে পড়ছে। ভাবছেন—এত দুঃখের মধ্যে হাসি আসে! কিন্তু সেটা নিছক কৌতুক নয়। ঘটনাটা বলি।

একবার কিছুদিন আগে দিদির জন্য পাত্র দেখতে কোন এক মফঃস্বল শহরে গিয়েছিলেন বাবা। পাত্রের বাড়ীঘর দেখার পর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ছেলেটি কি কাজ করে? পাত্রের অভিভাবক উত্তর দিয়েছিলেন, বিজ্‌নেস। কিসের বিজ্‌নেস? তার উত্তরে বলেছিলেন, এই ত স্টেশনের গায়েই, দেখেন নি?

বাবাকে ট্রেণে তুলে দিতে এসে বলেছিলেন, ওই দেখুন।

স্টেশন এলাকার বাইরে ছোট মত একটা খাপড়ার চালায় পাত্রের বিজ্‌নেসের বহর দেখে বাবার ত চোখ [redacted]ল উঠবার যোগাড়। পাত্রের অভিভাবক ওঁকে সুস্থ করার জন্য বলেছিলেন, আসুন, আসুন, এক কাপ চা [redacted]ন। ওর স্পেশ্যাল চায়ের নাম আছে এ মুলুকে।

[redacted]বা অবশ্য সেই চা-কম-পানবিড়ির দোকানে বসে চা খান নি কিংবা বিজ্‌নেসের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করেন [redacted]র মুখে গল্প শুনে আমরা ত হেসে অস্থির। দাদা বেশ কিছুদিন ধরে দিদিকে ক্ষেপিয়েছিল—ইস্, কি ভুলটাই [redacted]বা, একজন বিজ্‌নেস ম্যাগনেট হাতছাড়া হয়ে গেল!

যেন সকাল বেলায় পুকুরের ধারে
এসেছি বকুল ফুল কুড়োতে।

আছি, পুকুর-ধারে বকুলগাছ তলায়। দেখতে দেখতে কুয়াশা ঝেঁপে এল। পুকুরঘাট মিলিয়ে গেল, বকুলগাছ রইল না—আমার কোঁচড়-ভর্ত্তি ফুলও উধাও! আশ্চর্য্য হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি প্রকাণ্ড একটা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। গল্পে শোনা সেই খাঁ-খাঁ-করা তেপান্তরের মাঠ। কোথাও গাছপালা নাই, মানুষজন নাই, জীবজন্তু নাই। আমিও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই—চলছি—শুধু চলছি। চলতে চলতে পা টনটনিয়ে উঠছে, তবু চলছি। মাঠ তখনও কূলকিনারাহীন। পায়ের দিকে চেয়ে দেখি—মাটি কই, খালি বালি। লাল লাল বালি। পড়ন্ত রোদ্দুরে চক চক করছে বালি। অমনি ছড়াটা মনে হল, যা ছোটবেলায় ঘুম পাড়াবার সময় আস্তে আস্তে মাথায় চাপড় মারতে মারতে গুন গুন করতেন মা।

তিরপুনীর মাঠেতে ভাই রাঙা রাঙা বালি,
চাঁদমুখে রোদ লেগেছে তুলে ধর ডালি।

বালির চড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে কেমন ঘুম-ঘুম আসছিল। আলিস্যি ভেঙ্গে এক জায়গায় শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল। এক সময়ে চোখও যেন বুজলাম। ওমা, সঙ্গে সঙ্গে সে কি মিষ্টি বাঁশীর সুর, ফুলের গন্ধ, আলোর রোশনাই আমার গায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল! কি আরাম! কি অসহ্য সুখ! আমি যেন গলে গলে মিলিয়ে যেতে লাগলাম। ইচ্ছে করছিল না চোখ চাই—তবু জোর করে চাইলাম। এমন মুখকে চোখে দেখব না! দেখলাম। আকাশ-এক রাজপুরী, তার মধ্যে একখানি ঘরেতে সোনার পালঙ্ক পাতা। হীরে, মোতি, চুনী-পান্নার কাজ করা ঝকঝক্ করে জ্বলছে। তারি আলোয় আলোভরা ঘর। সেই পালঙ্কে শুয়ে সুখের উত্তাপে আমি যেন গ ঝরে পড়ছি। মেঝেতে একটা ঝর্ণা; দেখতে দেখতে একটা নদী হল। নদীতে নৌকা দেখলাম—ম নৌকা। নৌকার ছাদে নরম মখমলের বিছানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে বীণা বাজাচ্ছে এক পরমাসুন্দর

এই ত ষ্টেশনের গায়েই, দেখেন নি ?

তা প্রতিবেশীরা সব রকম মেজাজেরই ছিলেন। যাঁরা চাকরি করতেন তাঁদের একটু ভড়ং ছিল। চাকরির শ্রেণীভেদ তাঁরা পাড়াতেও বজায় রাখতে চাইতেন। বিশেষ করে সেই বাড়ীর মেয়েদের পোশাকে গহনায় আসবাব-পত্রে এবং কথাবার্ত্তায় সেটা ফুটে উঠত। ছোট ও মাঝারি দোকানীদের এসব বালাই ছিল না। তাদের চালচলন সাদাসিদা ছিল। কিন্তু ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তাদের বাড়ীতে ভারি চেঁচামেচি, গোলমাল হ'ত।

চাকুরেরা বলতেন, মুখ্যু, অসভ্য হবেই ত!

কিন্তু আমার ম'নে হত—কথাগুলো কারও কারও অমার্জ্জিত হলেও তার মধ্যে ঘোর-প্যাঁচ থাকত কম। পালিশ-করা কথার মধ্যে মানুষগুলো সব সময়েই আত্মগোপন করতে চায়। ওরা তেমন নয়—।

যাক, এঁদের সকলের কথা বলার প্রয়োজন নাই। যে দু'একজন আমার জীবনের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন —তাঁদের একটু পরিচয় দিয়ে রাখি। না রাখলে আমাকে ভুল বুঝতে পারেন। মানুষের সঙ্গে চরিত্র কর্ম্ম-ধর্ম্ম চিন্তা যে মানুষকে প্রভাবিত করে এ সত্য কম-বেশী আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। আমরা পাঠ্য পুস্তকে সেই সেই মনীষীর জীবন-কথা কর্ম্ম-বৃত্তান্ত চারিত্রিক নিষ্ঠা ও ধর্ম্ম-প্রবণতা লিপিবদ্ধ করে থাকি যা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এখানে যাঁদের কথা বলব, তাঁরা মনীষী নন—সাধারণ মানুষ। দোষেগুণে জড়ানো মানুষ। হয়ত গুণের চেয়ে দোষ ভাগই বেশী। তবু তাদের কথা বলতে হবে, যেহেতু আমার জীবনের সুখ দুঃখ আশা দুরাশায় তাদের কিছু দান আছে।

প্রথমেই মনে পড়ছে অমলাকে। আমাদের পার্টিশান করা বাড়ীর আর একটা অংশে থাকে। ভাড়াটে নয়, নিজেদেরই বাড়ী। টুকরো টুকরো সাততালি মারা বাড়ী হলে কি হবে, তা নিয়ে অমলার কি লাভ। এগারো-বারো বছরের মেয়ের মুখে কথাগুলো পাকা শোনায় কিন্তু এ হেন গিন্নী-গিন্নী মেয়ে আজকাল আখচার দেখা যায়।

অমলা বলে, গলিটা ত আমার ঠাকুরদার-ঠাকুরদার নামে। জানিস—আমরা কলকাতার আদি বাসিন্দে—যখন বন কেটে বসত হয়েছিল—সেই সময়কার লোক। আমাদের ঘরে একখানা অয়েল পেন্টিং আছে—ঠাকুরদার বাবার—উনি নিমকি দেওয়ান ছিলেন। তখনকার সায়েব-সুবোরা ত মিত্তির বলতে অজ্ঞান। শুনেছি উনি মারা গেলে—অনেক সায়েব মেম এসেছিল—কাতারে কাতারে—এত বড় বাড়ী ত—উঠোনে তিল ধারণের জায়গা ছিল না।

এ হেন স্বনামধন্য ওর পূর্ব্বপুরুষের দাবিটা আমি অনেকবার দেখেছি। বুঝতে পারি নি সেটা মানুষের চেহারা, না অমাবস্যার আকাশ। কালির একটা পোঁচড়া টানা।

অমলার বাবার মুখেও ওদের পূর্ব্বপুরুষের অনেক বাহাদুরির গল্প শুনেছি। ধন মান পেরিয়ে সঞ্চয়ের সেই গল্পগুলো আমাদের মন ভরাতে পারত না, ওর চেয়ে "রূপকথার রাজপুত্র কোটালপুত্ররা" বেশী জীবন্ত মনে হয়। যাক সে কথা—অমলার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়তাম। লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছিল না অমলা, কিন্তু একটু বেশী সাজগোজ করে ক্লাসে আসত। সবাই বলত, ভাবুনে মেয়ে। প্রতিদিনই ক্রীম মাখত পাউডার ঘষত, কখনও বা ঠোঁটে লাল রঙ। বিশেষ একটা তেলের গন্ধ নাকে এলেই বুঝতাম—অমলা আসছে। ইস্কুলের বইগুলো পুঁথির কাজ-করা একটা স্যাচেলে ভরে অমলা এসে ডাকত—পিতি বলে টু।

অমলাদের বাড়ীতে গেলেই আমার গালে স্নো ঘষে দিত—পাউডার পাফ্‌টা বুলিয়ে দিত তার উপরে। এমন মিষ্টি গন্ধের সুড়সুড়ি লাগাত মুখে—! মনে মনে বলতাম—আর একটু, আর একটুখানি।

অমলা বলত, তোর স্নো মাখতে ইচ্ছে হয়, না পাউডার?

বলতাম, আমাদের বাড়ীতে ও সব পাট নেই।

মিথ্যুক কোথাকার। তোর দিদি মাখে না?

দিদি বড় হয়েছে—মাখবে না কেন।

আর ছোটদের মাখতেই যত দোষ! নারে, বড়রা ভারি সেয়ানা। তাই বলে বলে ছোটদের ভুলিয়ে রাখে। বলে মাখতে নেই দোষ হয়। কি দোষ বলুক ত? তা আর বলতে হয় না। মিথ্যুক।

তোদের বাড়ীতে ত বলে না কিছু।

বলবার মুখ আছে। নিজেরা মাখে না? সিনেমায় যাওয়ার সময়, পাড়ায় বেড়াতে যাওয়ার সময়, ঠাকুর বিজয়া দেখবার সময়, আবার কালীঘাটে কি বাগবাজারে ঠাকুর দেখতে গেলে—বাদ ত দেয় না কোন সময়ে। ওদের কথা শুনলেই চিত্তির! আর কোন জন্মে ও সব অঙ্গে উঠবে না—মুখটি চিরকাল বেগুনপোড়া হয়ে থাকবে।

আমরা ওর পাকা পাকা কথা শুনে হাসতাম খুব। হাসতে হাসতে বলতাম, ওঁদের হাতে পয়সা আছে, ওঁরা মাখতে পারেন—আমরা পয়সা পাব কোথায়!

আঃ, বোকা—পয়সাতেই যেন জিনিস মেলে। ওরা যেমন উপার্জ্জন করে—আমিও তেমনি উপার্জ্জন করি। একটু বুদ্ধি খরচ করলে নিত্যি স্নো পাউডার মাখার ভাবনা? তুই যাস ত আমার সঙ্গে—কত স্নো পাউডার তোর চাই?

অবাক হয়ে ওর কথা শুনতাম। একদিন ওর উপার্জ্জনের কৌশল লক্ষ্য করলাম। লক্ষ্য করে আমার বুকের কাঁপুনি আর থামে না।

অমলা মনিহারী দোকানে গিয়ে বলল, একটা ছুঁচ আর একটা গুলি সুতো দিন ত? দোকানী গুলি সুতো

ছুঁচ দিলে। পাশে দাঁড়িয়ে আরও ক'জন মেয়ে সাবান আর পাউডার কিনছিল তাদের সামনে হরেক রকমের কৌটা সাজানো। অমলা সেগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে দাম শুধোতে লাগল।

একটু পরে দোকানী বলল, খুকি, নেবে ত পছন্দ করে নাও—মেলা ঘাঁটাঘাঁটি কর না।

অমলা ঠকাঠক করে তিন-চারটি কৌটো কাউন্টারের উপর রেখে দিয়ে বলল, এই রইল আপনার জিনিস—এই নিন ছুঁচ সুতোর দাম।

বলে একখানা পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিলে অমলা।

দোকানী বিরক্ত হয়ে বলল, খুচরো নেই।

থাকলে নোট দেব কেন?

জ্বালালে। আপন মনে গজগজ করতে করতে দোকানী নোটের ভাঙ্গানি হিসাব করতে লাগল।

ভাঙ্গানি বুঝে নিয়ে অমলা বাইরে এসে হাসতে লাগল।

বাড়ীর দুয়োরে এসে ওর হাসির কারণটা বুঝলাম। ও ফ্রকের ভিতর থেকে একটা ক্রীমের কৌটো বার করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, নে—রোজ মাখবি।

আমি হতভম্বের মত বললাম, কোথায় পেলি এটা?

হাসতে হাসতে বলল, উপার্জ্জন করলাম।

অমনি আমার বুকের কাঁপুনি বেড়ে গেল। শুকনো মুখে বললাম, চুরি করলি?

চুরি মনে করলেই চুরি—না মনে করলে নয়। ব্যবসাদাররা চুরি করছে না? এক টাকার জিনিসটা দু টাকা নিচ্ছে না? নে-নে, আর সাধুগিরি ফলাস নে!

রাগ হল ওর কথায়। কৌটোটা ওর হাতে দিয়ে বললাম, না, নেব না। এ অন্যায়!

খিলখিল করে হেসে উঠল অমলা। ওরে আমার সাধু শিরোমণি রে! তোর গুণের বালাই নিয়ে মরি রে!

আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর মধ্যে চলে এলাম।

মনে আছে, বেশ কিছু দিন ওর সঙ্গে কথা কই নি। শেষে ওই একদিন ডেকে কথা কইলে—ভাব করলে। ওর সঙ্গে মিশতে লাগলাম। তবে আর কোন দিন ওর দেওয়া স্নো পাউডার মাখি নি। কিংবা ওর সঙ্গে মনিহারী দোকানে যাই নি।

পরে শুনেছি অমলা একদিন পাউডারের কৌটো সমেত ধরা পড়েছিল—আর লাঞ্ছিতও হয়েছিল যৎপরোনাস্তি। ইরা আমাকে খবরটা শুনিয়েছিল, জানিস ভাই—এততেও লজ্জা নেই। বলে বেশ করেছি, তোদের জিনিস ত নিতে যাই নি। এখন শুনছি পাড়ার সব দোকানীরা ওকে চিনে ফেলেছে—দোকানের কাছে পিঠেও ঘেঁষতে দেয় না!

অমলার কিন্তু স্নো পাউডার মাখার কামাই নেই। আমরা অবাক হয়ে ভাবতাম কত জিনিস ও এমনি করে জমিয়েছে যা দুটো বছরেও শেষ হচ্ছে না।

একদিন কে যেন ওকে বলেছিল কথাটা, তোর স্টক ত দেখছি দীনবন্ধু দাদার দইয়ের ভাঁড়! খরচ করেও অঢেল।

অমলা জবাব দিয়েছিল, কুবেরের ধন—শত্রুর ভাণ্ডার ক্ষয় হোক। যারা নির্ব্বোধ তাদের ভাণ্ডার ক্ষয় হোক। বুদ্ধি থাকলে জিনিসের ভাবনা!

তখন আমাদের বয়স চোদ্দ পেরিয়েছে—ক্লাস নাইন ছেড়ে ক্লাস টেনে উঠেছি। তবু বুঝতে পারলাম না চুরি ছাড়া আর কোন্ উপায়ে বুদ্ধির কৌশল দেখাচ্ছে অমলা।

সে কৌশলের কথা ইরা একদিন আমাকে চুপি চুপি বলেছিল। শুনে সারা শরীর লজ্জায় ঘৃণায় শিউরে উঠেছিল। সে কথা লেখা যায় না।

দিদির কথাটাও না লিখলে পারতাম, কিন্তু লিখতে হবে। না হলে ওকে সবাই ভুল বুঝবে। এই সংসারেরই মেয়ে ও—এই বংশের খ্যাতি-অখ্যাতিতে ওরও অংশ আছে। ও যেদিন বুঝেছিল—বাবার আয়ে যা করে সংসার চলছে, তার পরিণাম মোটেই শুভ নয়—সেই দিন থেকে ওর চিন্তা হয়েছিল—কিসে এই পরিণাম ঠেকানো যাবে। ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারে নি। চারিদিকে তখন অকূল পাথার। না আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতিগোষ্ঠী, না বাড়তি কোন আয়। সহায়-সম্বল কোন দিকেই ছিল না। একটা শক্ত অসুখ হলে—"বল মা তারা দাঁড়াই কোথা" গোছ অবস্থা। ছোটখাটো বিপত্তি এসেছিল কিছু; বাবা আপিসের কো-অপারেটিভ আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকায় সামলে নিয়েছিলেন। কিন্তু আসলে সেটাও ধার, মাস মাস যা কিস্তিবন্দীতে দিতে হচ্ছিল তাতে মাস মাইনেয় হাত পড়ছিল। মা প্রাণপণে সামলাবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমে ধোপার খরচ কমালেন, যাবতীয় কাপড় জামা বিছানার চাদর লেপের ওয়াড় সমস্তই ঘরে কাচা হতে লাগল। তার পর হাত দিলেন গোয়ালার হিসাবে। বাড়ীতে এখন কচিকাচা কেউ নেই, এক সের করে দুধ নেওয়ার কি প্রয়োজন। দুধ কিছু দরকার হয় চায়ের জন্য, তা সেটা ত সরকারী টোন্‌ড মিল্কেও সারা যেতে পারে। তাই করলেন। গোয়ালাকে জবাব দিলেন। এবার ওঁর দৃষ্টি পড়ল চায়ের দিকে। এত চা লাগছে কেন? দিনে তিন-চারবার করে প্রতিজনের, তা ছাড়া অতিথি-অভ্যাগত লোকজনের কামাই নেই। মা একটা নিয়ম বেঁধে দিলেন। বললেন, যখন তখন চা খাওয়াটা অসভ্যতা। শুনেছি বিলেতে কি অন্য অন্য দেশে এর একটা নিয়ম আছে। প্রতিভাই যেন একদিন বলছিল, রবিঠাকুর ওই যিনি খুব বড় কবি—তোরা ত বলিস বিশ্বকবি—উনি একদিন কোথায় নাকি বেশি রাত্তিরে নেমন্তন্নে গিয়ে নাকালের একশেষ! তখন নাকি সবাইএর খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ওদের নিয়ম খাওয়ার পর যে কেউ আসুক না কেন তাকে আর খাবার দেওয়া হবে না—তা ঘরে খাবার যতই থাকুক না কেন। সেই রাত্তিরে উনি উপোস করে রইলেন। আহা! তা চায়ের বেলাতেও এই নিয়ম। সময়ে এস খাও, না হলে পাবে না। আমরাও তাই করব। সকালে একবার, সন্ধ্যেয় একবার, আর নয়।

তাই করলেন মা।

জলখাবারেও কিছু বাঁচালেন। ইলেক্‌ট্রিকে—কয়লায়, আনাজ-পাতিতে বলতে গেলে প্রতিটি বিষয়ে কাঁচি চালিয়ে সংসারের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করলেন মা। আমরাও সাবধান হলাম, দিদি আরও একটু এগিয়ে গেল—একটা টিউশানি নিলে।

মা এইবার ধমক দিলেন ওকে, এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে খুকি।

দিদি জবাব দিল, খানিকটা সময় পাচ্ছি যখন নিজের খরচটা ত কিছু কিছু সুবিধা করতে পারব।

মা বুঝলেন। কিছু বললেন না ওর সামনে। আমাকে ও দাদাদের বললেন, দেখ—দেখে শেখ। কত গুণের মেয়ে। এই বয়েস থেকে কত ভাবে সংসারের জন্যে।

ক্রমে আরও টিউশানি নিলে দিদি। এক কথায় বলতে গেলে স্বাবলম্বী হ'ল। মাই ব্যবস্থা করে দিলেন আলাদা ঘরের। ভাঁড়ার সরালেন একপাশে, ঠাকুরের পট তুললেন তাকের উপরে, উপায়ী মেয়ের আসন পড়ল সকলের উপরে।

সেই উনিই একদিন দিদির জন্য কম চোখের জল ফেলেন নি—কম অভিশাপ বাণী বর্ষণ করেন নি।

আমার এক একবার মনে হয়—সংসারটা কি। শুধু কি দেওয়া-নেওয়ার তারতম্যেই মানুষ কাছে আসে—দূরে সরে যায়? স্নেহ ভালবাসাও কি গিণি সোনার তুল্য? একটু খাদ না মিশোলে গহনা উৎরায় না যেমন—তেমনি একটু স্বার্থ না থাকলে স্নেহ ভালাবাসাও বিস্বাদ।

হাঁ—দিদির কথা আরও একটু বলতে হবে। দিদির কাছে কম সাহায্য ত পাই নি। ও না থাকলে কলেজের পড়ায় ইতি হয়ে যেত। না ছিল অর্থ, না ছিল মাষ্টার। এই যুগে ও দুটি না হলে উচ্চশিক্ষা ত দুরাশা। নোটের বই দেখে পরীক্ষায় উত্তরে যাচ্ছে বটে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী—কিন্তু সেটা কোন রকমে সাঁতরে পার হওয়া, থার্ড ডিভিসনে পাস করার চেয়ে পাস না করা ভাল। ও পাসের দাম কলেজ দেয় না—কর্মক্ষেত্র দেয় না। কারও কাছে বলতে মাথা কাটা যায় লজ্জায়। তার চেয়ে বলা সহজ ইস্কুল ফাইন্যাল পর্য্যন্ত পড়েছি।

দিদি আমাকে কোচ করেছিল বলে সম্মানের সঙ্গে পাস করেছি, কলেজে নাম করেছি। চমৎকার আবৃত্তি করতে পারত দিদি। ওই আমাকে আবৃত্তি করতে শেখায়। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'টা চমৎকার আবৃত্তি করতে পারতাম। ওই আবৃত্তির নেশাই আমাকে গানের পথে টেনে নিয়ে এসেছে। আমি আনন্দলাভ করেছি, আমি দুঃখ পেয়েছি। হৃদয়-দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি হয়ত বা এই কারণে। তবু স্বীকার করব এই জীবনযন্ত্রণা আমাকে শুধু যন্ত্রণাই দেয় না জীবনের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করায়।

দিদির কাছে ট্রেনিং নিয়ে ইস্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলাম। সভাপতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন—আবৃত্তির জন্য একটা বিশেষ পুরস্কার থাকা সত্ত্বেও উনি আমাকে মোটরে করে একটা বইয়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে চয়নিকা আর সঞ্চয়িতা কিনে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমার গলায় চমৎকার একটি সুর আছে—যা আবৃত্তির সবচেয়ে বড় সম্পদ। এ অভ্যাস ছেড়ো না।

দিদি বলেছিল, উনি নতুন কিছু বলেন নি। এ আমি আগেই টের পেয়েছি। ভগবান এক একজনকে এক এক রকম সম্পদ দেন। এরই দ্বারা তুই হয়ত একদিন স্বনির্ভর হতে পারবি।

কেমন করে তা হব বুঝতে পারি নি। পরে একদিন বুঝলাম। আরও কয়েকবার আবৃত্তি করার সুযোগ হল। সরস্বতী পুজোয় পাড়াতে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানেই নাচ, গান, আবৃত্তি। সাধ্য হলে অভিনয়। আমরা অভিনয় করি নি। স্টেজ বাঁধার পরিসর জায়গা ছিল না—অর্থ ছিল না—আর ছিল না অভিভাবকদের ঐক্যমত।

আমার আবৃত্তি নাকি সবচেয়ে ভাল লেগেছিল শ্রোতাদের। পর পর তিনটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলাম।

এর তিন মাস পরে রবীন্দ্রজয়ন্তীর সমারোহ। বলা বাহুল্য এটা এখন সরস্বতী পুজোর মতই সার্বজনীন উৎসব। এর আকর্ষণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক।

একে একে তিনটি ক্লাব এসে হাজির হয়েছিল আমাকে আবৃত্তিতে নেবার জন্য।

দিদি বলল, দাঁড়া—ভেবে দেখি কি করা যায়।

ভেবে যে উপায় বার করল দিদি—তাতে বাবা সায় দিলেন না। বললেন, এটা ঠিক হবে কি? সম্মানের হানি হবে।

দিদি বলল, কেন? বড় বড় আর্টিষ্টরা দক্ষিণা নিচ্ছেন না। এ ত সম্মান-মূল্য। আজকালকার বাজারে এ্যামেচার কথাটা মূল্যহীন—আমরা প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি জীবন-সংগ্রামে।

বাবা বললেন, খুকি, কথাগুলো খুবই সত্যি, বাস্তব ক্ষেত্রে মূল্যবান। কিন্তু আমরা যে সেই আদ্যিকালের মানুষ স্বদেশীযুগের আদর্শ ভুলতে পারি নি।

দিদি বলল, সেই যুগের আদর্শ কোথায় দেখছেন? গীতা ছুঁয়ে শপথ করা, ব্রহ্মচর্য্য পালন করা, সত্য কথা বলা, সৎ পথে চলা, সর্ব্বভূতে নারায়ণ জ্ঞান, সেবা, দয়া—এক কথায় হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ কোথায় পাচ্ছি আমরা? আমাদের হল সেকুলার স্টেট।

বাবা তর্ক করলেন না। একটু যেন শঙ্কিত হয়ে ওর পানে চাইলেন।

দিদি বলল, ওরা অর্থ-সম্মান দিতে চাইছে। আমরা কেন নেব না? এই টাকায় ওর শিক্ষার সুবিধা হবে না কি!

বাবার মুখখানা কেমন শুকিয়ে গেল। শুকনো গলায় বললেন, যা ভাল বুঝিস কর। সংসার চালনার দায়িত্ব নিয়েছিলাম বটে—ভালভাবে সে কাজ করতে পারছি কই।

দিদি বলল, আপনি দুঃখ করছেন কেন? সে দোষ সমাজের—রাষ্ট্রের। যারা গুণীর মর্য্যাদা দিতে পারে না। যাদের দৃষ্টি সরকারী ষ্টিল ফ্রেমেতেই আটকে থাকে—

বাবা আর প্রতিবাদ করেন নি। তিনটি অনুষ্ঠান থেকেই কিছু কিছু দক্ষিণা পেয়েছিলাম। দিদি আমার সঙ্গে গিয়েছিল। আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল—দক্ষিণাটি বাবার পায়ের কাছে রেখে ওঁকে প্রণাম করবি—মাকে প্রণাম করবি।

তাই করেছিলাম। বাবা খুব খুসি হন নি। ম্লান হেসে বলেছিলেন, থাক, থাক।

মা হেসে বলেছিলেন, টাকাটা প্রতিমাকে দে—তোর ত কোথাও যাওয়া-আসার ভাল পোশাক নেই। ও যেন তৈরী করিয়ে দেয়।

বাবা একদিন বলেছিলেন মাকে, মেয়েটার নেশা লেগে গেছে—ফাংশন হচ্ছে শুনলে কেমন যেন ছট্‌ফট্ করতে থাকে।

কলতলায় মুখে সাবান ঘষতে ঘষতে কথাটা কানে গিয়েছিল। সত্যিই আজ একটা ফাংশন ছিল। একটা সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মহাজাতি সদনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। সময় ছিল সন্ধ্যা সাতটা। আমি উদ্যোগ পর্ব্বে নেমেছিলাম পাঁচটা থেকে। একটু আগে থেকে গুছিয়ে না নিলে প্রসাধনে খুঁত থেকে যায়। সেটাও অবশ্য ঠিক নয়। একথা ঠিকই, অনুষ্ঠানের আগে কেমন যেন উন্মাদনা অনুভব করতে থাকি। কড়া আলো সাজানো মঞ্চ, সামনে আগ্রহ উৎসুক দর্শক, মাইকের সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্র মনে হয়—আমিই এই সবের নিয়ন্ত্রী। আমার হাতে যে দশ পনেরো মিনিট সময় ওরা ছেড়ে দিয়েছে, তা আমার খুসিমত ব্যবহার করতে পারব। ওদের হাসাতে পারব—কাঁদাতে পারব—উল্লাসে উন্মাদনায় অধীর করে তুলতে পারব। আমিই ওদের নিয়ন্ত্রী। উচ্চ করতালি ধ্বনি ও সাধুবাদে ওরা আমায় সম্বর্দ্ধিত করবে—আমার স্তুতি করবে। সংসারে এত সুখের তুলনা আর কিসে আছে।

বাবার কথাটা কেমন খট্ করে কানে লাগল। নেশা! নেশা কি অর্থে বললেন বাবা। নেশা বলতে সাধারণত আমরা খারাপ অর্থেই ধরে নিই। যেমন চায়ের নেশা, মদের নেশা, গানবাজনা যাত্রা শোনার নেশা, থিয়েটার দেখার নেশা। বদ সঙ্গের নেশা—এই সবই বুঝি। নেশা অর্থে বুঝি না, পড়ার নেশা, ছবি আঁকার নেশা—গঙ্গাস্নানের নেশা, তীর্থ ভ্রমণ কি দেব দর্শনের নেশা। শুনেছি আরও বড় নেশা আছে, যা হিন্দুমাত্রেরই কাম্য—অধ্যাত্ম জীবন যাপনের নেশা। এ নিয়ে বাবার সঙ্গে একদিন আলোচনা হয়েছিল সামান্যক্ষণ। বাবা বলেছিলেন,

পরমার্থ লাভের নেশা—ঠিক নেশা নারে, ওকে বলে সাধনা। বলেছিলাম তা হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই বা সাধনা নয় কেন? পণ্ডিতরা বলেন, গানের চেয়ে পবিত্র কিছু নেই। বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী হলেন বাক্‌দেবী সরস্বতী। সুর হল ব্রহ্ম। সুর সাধনা তাহলে নেশা হবে কেন?

বাবা বলেছিলেন, নেশা আমরা তাকেই বলি যা আমাদের সাংসারিক কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। পরমার্থ লাভকে তাঁরাই নেশা বলেন—যাঁদের ইহলৌকিক কর্ম্মে তা বাধাস্বরূপ হয়। বড় শক্ত শক্ত কথা। বুঝতে চাই নি। শুধু বলেছিলাম, এটা ভাল না মন্দ, তাই বলুন?

বাবা বলেছিলেন, এক কথায় বলা যায় না। যে সংসারের কাজ নিয়ে মেতে আছে তার কাছে সেইটাই আসল কাজ, নেশা নয়। পরমার্থকামী বলবে ওটা ওর নেশা কি না মোহ। ওর ঘোর না কাটলে আসল জিনিস লাভ হবে না।

আমাদের এই আবৃত্তি গান—এও নেশা?

বাবা হেসে বলেছিলেন, নেশা ততক্ষণ নয়—যতক্ষণ সংসারকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে সুস্থ রাখতে পারছে। যতক্ষণ তোমার লেখাপড়ায় ব্যাঘাত না জন্মাচ্ছে। যখনই সংসার এই লাভটুকু থেকে বঞ্চিত হবে—তখনই এটা নেশা। নেশার খারাপ অর্থ তখনই ধরা পড়বে।

এ আলোচনা পরে হয়েছিল—আজ বাবার মন্তব্যটি কানে বেসুরো ঠেকলো। মা এ নিয়ে অনুযোগ করেন না—বরং ওঁর পরোক্ষ উৎসাহই লক্ষ্য করি। টাকাটা ওঁর হাতে এলে খুসি—ভাল একটা পোষাক তৈরী করিয়ে নেবার কথা বলেন কিংবা একটা তারের যন্ত্র কিনতে।

তবে এ যে নেশা এ আমিও সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়ে অনুভব করি। যেদিন কোন অনুষ্ঠান থাকে সেই দিনের সকালটিকে মনে হয় অন্য দিনের থেকে আলাদা। সেই দিন কাজগুলিকে হাল্কা লাগে, হাসিটা অকারণে বেড়ে যায়, কেউ ধমক দিলে গায়ে মাখি না। সেদিন ভুল-ত্রুটি একটু বেশীই হয়ত হয়, তা নিয়ে অনুতাপ করি না। সে যেন সুখেরই একটা অংশ। তার পর সন্ধ্যা আসে। মনে হয় এই সন্ধ্যা আমার জন্যই এসেছে। আলোকোজ্জ্বল মঞ্চ, প্রতীক্ষোন্মুখ নরনারী, মোহসঞ্চারী আবহ সঙ্গীত—আমাকে ঘিরে বর্ণগন্ধ আলোর সমাবেশ। প্রশংসার সুধা আকণ্ঠ পান করে নিজেকে হারিয়ে ফিরে আসি ঘরে। ঘর তখন আর ঘর নয়—আনন্দলোক।

দিদিও আমার সুরের নেশাটা লক্ষ্য করেছিল। একদিন বলল, তোর গলায় সুর আছে, শুধু আবৃত্তি করে তা সার্থক হবে না। গান শিখবি?

বললাম, কার কাছে শিখব?

দাঁড়া, আমি ব্যবস্থা করছি। অজয়কে বলে দেখি কি হয়। এক মুহূর্ত্ত কি ভাবল দিদি। তার পর বলল, তোর টাকাটা এবার আজে-বাজে খরচ করলে হবে না, একটা হারমোনিয়ম কিনব ওই দিয়ে।

কিছু টাকা জমে ছিল, দিদিও কিছু দিলে আরও কিছু টাকা হাতে এলে একটা হারমোনিয়ম কেনা হল।

সেদিন কি আনন্দ সকলের। প্রমীলা ত সবচেয়ে খুসি। ও বার বার হারমোনিয়মের ঢাকনা তুলে বেলো ঠেলতে ঠেলতে রীডগুলো টিপে টিপে সুর বার করতে লাগল। দিলীপ বলল—আমি শিখব। দ্বিজ বললে, আমিও। দিদি বলল, কেউ না, যার জন্যে এসেছে ফার্স্ট প্রেফারেন্স তার। তার পর তোমরাও অবশ্য শিখবে। কিন্তু তার আগে তোমাদের মেরিট টেস্ট করা হবে।

বেশ নাও। ওরা এগিয়ে এলো।

উহুঁ বেলো টেপার মেরিট নয়—তোমাদের ক্লাসের পড়ায় কে কতদূর এগিয়েছ—

দিলীপ বলল, তুই দেখছি মাস্টারি সুরু করলি দিদি।—চাই নে শিখতে। ওর চেয়ে মোহনবাগানে ফুটবল টিমে প্র্যাকৃটিস করলে কাজ হবে।

দ্বিজ বলল, আগে গলিতে লেবুর বল থেকে সুরু কর—তবে ত!

দেখিস তোর চেয়ে শতগুণে ভাল খেলব।

দিদি ধমক দিল, এখানে গোলমাল করবে না, গলিতে যাও।

অজয় বসু এলেন আমাকে গান শেখাতে।

দিদির থেকে দু'বছরের সিনিয়র। এই বারেই ডিগ্রী কোর্সের ফাইন্যাল দেবেন। লেখাপড়ায় যেমন তেমনি, গান-বাজনাতেও ভাল। স্বাস্থ্যটিও চমৎকার। রীতিমত ব্যায়াম চর্চ্চা করা দেহ। মেজাজটিও ঠাণ্ডা।

আমায় দেখে বললেন, বড্ড ডেলিকেট হেল্‌থ। তা দু সপ্তাহেই ফলাফল বুঝতে পারবেন!

দিদি হেসে উঠল, আপনাকে আর সম্ভ্রম করে কথা কইতে হবে না, ও আমার ছোট বোন।

তাতে কি—লেডীর প্রাপ্য সম্মান—

জ্বালাবেন না; এখন বলুন কতটা সময় আপনি দিতে পারবেন এবং কোন্ সময়ে।

তার জন্যে আটকাবে না, একটা চার্ট আমি তৈরী করে দেব, তাই দেখে সকাল-বিকাল—

দিদি হাসতে হাসতে বললে, চার্ট নয়, হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে হবে। আর শক্তি-চর্চ্চা নয়—সুকুমার সঙ্গীতকলা।

অজয় বসু একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বললেন, কিন্তু সঙ্গীতের চেয়ে ওঁর পক্ষে এসেন্‌সিয়াল হচ্ছে—

সে পরে হবে, আপাতত সঙ্গীত থেকে সুরু হোক, পরে ভীমভবানী বানালে আপত্তি করব না। দেখুন দেখি এই হারমোনিয়মটা গ্রিপ ডাম্বলের কাজ করবে কি না।

হারমোনিয়মটা কোলের কাছে টেনে অজয় বসু বললেন, ওরে বাপরে—এ কি যন্ত্র কিনেছেন! ভাল করে টিউন করিয়ে নেন নি।

টিউন কাকে বলে তাই কি জানি। কিনতে হয় একটা কিনেছি, এখন যা কিছু গড়বড় হবে আপনি আছেন, শুধরে নেবেন।

তাই হবে। আসুন ত এগিয়ে—

আবার! দিদি ভ্রুকুটি করল।

অজয় বসু বললেন, ধমকাবেন না—এক দিনেই পার্ট মুখস্থ হয় না।

আমি অজয় বসুর কাছে গান শিখতে লাগলাম। দিলীপ দ্বিজও ওঁর ভক্ত হয়ে উঠল। ওরা কোথা থেকে চেষ্ট একস্‌প্যাণ্ডার, গ্রিপ ডাম্বল ইত্যাদি যোগাড় করে নিয়ে এল। ওয়েট-লিফ্‌টের-এর মহড়াও সুরু হয়ে গেল। মা একদিন বললেন, এই বার দেখছি ঘরখানা কোনদিন হুড়-মুড় করে মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়বে। জরাজীর্ণ ছাদে অত দাপাদাপি সইবে কেন!

কথাটা অজয় বসুর কানে উঠল। বললেন, ঠিক বলেছেন মা—তোমরা আমাদের আখড়ায় যাবে ঠিক ছটার সময়। তার পর চার্ট দেখে প্র্যাকৃটিস করবে। আর, আমার পানে চেয়ে বললেন, তোমারও একটা আলাদা ব্যবস্থা হলে ভাল হয়। এই পাড়াতেই আমাদের ক্লাবের একজন মেম্বার আছেন তাঁর বাড়ীতেই বন্দোবস্ত হতে পারবে। কিংবা আরও একটা জায়গায়—আচ্ছা, সব ঠিক করে দেব, ভাবড়ো না।

অজয় বসুর দিব্যজ্ঞান আছে বুঝলাম। মা যে এই সব পছন্দ করছেন না বুঝতে পারলেন।

সত্যিই মা পছন্দ করছিলেন না। অথচ দিদির কাজে বাধা দেবার সাহস মায়ের ছিল না। দিদি সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করছে। একটু নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ দিয়েছে এইতেই উনি খুসি ছিলেন। কিছু একটা অপ্রীতির ব্যাপার এই নিয়ে হয়, এ উনি চাইছিলেন না।

বাবাও এ সব যে সমর্থন করছেন তা নয়, ওঁর মুখের ভাবে মনের কথা বড় একটা প্রকাশ পায় না। তবে একটু যে চঞ্চল হয়েছেন বুঝতে পারলাম, কিছুদিন পরে।

বাবা সেদিন দিদিকে বলছিলেন, অজয়কে পরও দেখলাম মিছিলের সঙ্গে চলেছে ড্যালহৌসী স্কোয়ারের দিকে। ওই দিকটায় ১৪৪ ধারা জারী আছে।

দিদি বলল, হাঁ—ওঁরা ভুখা মিছিল পরিচালনা করছিলেন।

ওরা কোন্ পার্টি? বাবা শুধোলেন।

দিদি বলল, সংযুক্ত বামপন্থী দল। বিধান সভার কয়েকজন সদস্যও আছেন।

বাবা বললেন, বুঝেছি। তা এভাবে কি আন্দোলন সফল হবে?

দিদি বলল, তাই ত হচ্ছে সব দেশে।

হঠাৎ বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, এই আন্দোলন তুই সমর্থন করিস?

দিদি কেমন থতমত খেয়ে গেল। বাবা যে হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করে এমন প্রশ্ন করবেন ও ভাবতে পারে নি। একটু কাল চুপ করে থেকে বলল, খাদ্য আন্দোলন এ ত কোন দলের গ্রিভান্স নয়, এ দেশশুদ্ধ সবাইকার কথা।

বাবা বললেন, দেশের সব লোক মূঢ় এমন কথা বলব না, তবে সব লোক সব কথা বোঝে না, এই দুঃখ।

দিদি বলল, সত্যিই দুঃখের কথা। তাই মিছিল করে তাদের চোখ ফুটিয়ে দিতে হয়।

বাবা বললেন, সে কথা আমি বলছি না। মিছিল আর কতটুকু জ্ঞান দিতে পারে। অনেকে এটা হুজুক বলেই ধরে নেয়। বিধান সভার যে সদস্যরা এতে যোগ দেন তাঁরাও এর বেশি ভাবেন না। একটা অপোজিশন দেওয়া দরকার, তাই দেন, পপুলারিটি গেন করার চেষ্টাও এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু এই সব বিষয় আমার আলোচনা করতে ভাল লাগে না, খুকি। দেশের সব জায়গাতেই যে কালো হাতের ছায়াটা ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। এ দূর করার উপায় কি?

দিদি সরে গেল বাবার সামনে থেকে—আমিও সরে এলাম।

দোতলার ঘরে এসে দিদি বলল, এই যে কালো হাতের কথা বাবা বললেন ওটা এদের সম্বন্ধে খাটে না। এরা কিসের লোভে সেদিকে যাবে? বরং ওটা দূর করার ব্রতই নিয়েছে বলা যায়। জানিস—অজয় বসুকে আমি কেন শ্রদ্ধা করি! এমন ছেলে লাখে একটা হয় না।

একটু চুপ করে থেকে দিদি বলল, শোন তবে। বেশী দিনের কথা নয়, আসছিলাম একটা গলি দিয়ে—জায়গাটার নাম করব না, তোরা হয়ত ভয় পাবি শুনলে—রোয়াকে বসে ছিল কতকগুলো ছেলে, আমাকে একলা দেখে অভদ্র ঠাট্টা ও ইঙ্গিত করতে লাগল। এর আগেও ওদের অভদ্র মন্তব্য কানে গেছে—যখন আর আর সহ-পাঠীদের সঙ্গে এসেছি। সে ছিল ইন্‌ডাইরেক্ট। এখন আমাকে একলা পেয়ে ওদের সাহস বেড়েছে—তাই কথা বলছিল আমাকে লক্ষ্য করে।

কি করি অসহ্য হয়ে উঠতে ঘুরে দাঁড়ালাম। তীব্র কণ্ঠে বললাম, ব্রুট—জানোয়ার।

যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ল। দুটো ছেলে রোয়াক থেকে লাফিয়ে পড়ে আমার দিকে ছুটে এল। বলতে লাগল, তবে রে—জানোয়ারের খেলাটা তবে দেখে নাও—

কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই ওরা দুজন 'ওরে বাবা!' বলে চীৎকার করে উঠল। বাকি দল তখন রোয়াক থেকে উধাও।

দু'হাতে দু'জনের ঘাড় ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অজয়বাবু বললেন, খেলা দেখাবার আগে জানোয়ারকে একটু ট্রেনিং নিতে হয়। না হলে জানোয়ারই ত কি কাণ্ড করে বসবে তার ঠিক কি।

আমার পায়ে ধরিয়ে মাপ চাইয়ে সেদিন ট্রেনিং দিয়েছিলেন অজয়বাবু, না হলে ও পাড়াটা কোন মেয়ের পক্ষেই নিরাপদ ছিল না।

আমি মনে মনে অজয়বাবুকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম। মুখে বলেছিলাম, আচ্ছা দিদি, অজয়বাবুরা যা করছেন তাতে পুলিশে ধরতে পারে ত?

ধরবে, তাতে কি। ওঁরা ত সে ভয় করেন না। ওঁরা বলেন, যা অন্যায় তা আমরা সহ্য করব না।

কি অন্যায় সে জ্ঞান আমার ছিল না, সে প্রশ্নও করি নি। আমার চোখের সামনে থেকে একটা কালো পর্দ্দা শুধু সরে গিয়েছিল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম দিদি অজয়বাবুদের দিকে। অজয়বাবুকে দিদি খুব খুবই শ্রদ্ধা করে। ওর কথা উঠলে দিদির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দিদির মুখ-চোখ সমস্ত ভঙ্গি সমস্বরে প্রচার করে একটা মানুষের মত মানুষ।

মাত্র তিনটি মাস আমি অজয়বাবুর কাছে শিক্ষা করেছিলাম। উনি আগ্রহ করে শিক্ষা দিয়েছিলেন।··· দেহচর্চ্চার কথাও তুলেছিলেন। প্রায়ই বলতেন, এ শুধু পুরুষদের কাজ নয় তোমাদেরও কর্ত্তব্য। তোমার দিদি ঠেকে শিখেছেন তবু জ্ঞান হয় নি। পশুরা পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র রয়েছে, গায়ে একটু শক্তি থাকা ভাল। ভাবছ এতে চেহারায় পুরুষালি ভাব আসবে! আসুক না। জয়দেবের কাল এখন নেই। ও ছন্দে কেউ তোমাদের বন্দনা গান গাইবে না।

আমি কিন্তু সঙ্কোচবশেই দেহচর্চ্চা করতে পারি নি। গানই আমার সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ করে রেখেছিল।

একদিন বললেন, আমার বিদ্যে খুব বেশী নয়। স্টক গোটা বিশ ত্রিশ গান, রবীন্দ্র নজরুল কান্ত কবি রামপ্রসাদ আর কীর্ত্তন মিলিয়ে। তা তোমাকে তুলে দিয়েছি, এবার নতুন গুরুর কাছে শিখবে, আমি ঠিক করে দেব। তা ছাড়া হেসে বলেছিলেন, আমারও ত বন্দরের কাল শেষ হয়ে এল!

ওঁর হেঁয়ালির অর্থ তখন বুঝি নি।

এর দিন কতক পরে বাবা একখানা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বাড়ী ঢুকেছিলেন। প্রতিভা, প্রতিমা শোন। দিদি বাড়ী ছিল না। আমাকে কাগজখানা দেখিয়ে বলেছিলেন বাবা, এই দেখ—অজয়বাবুর খবর। ১৪৪ ধারা অমান্য করে হাজতে গিয়েছেন। প্রতিভা কোথায় গেল?

বাবাকে চিন্তান্বিত দেখাল।

সন্ধ্যার পর দরজার কড়া নেড়ে একটি অপরিচিত ছেলে বাবাকে ডাকল। বাবা বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে ফিরে এলেন গম্ভীর মুখে। একখানা চিরকুট ওঁর হাতে। আমার হাতে সেটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, পড়।

পড়লাম,

বাবা, আজ ডালহৌসীর দিকে আমাদের মিছিলের সঙ্গে যাচ্ছি। গতকালের সংবাদ আশা করি পড়েছেন

আজও যদি সেই ঘটনা ঘটে বিচলিত হবেন না। দেশের ডাকে এ আমার কর্ত্তব্য বলে মনে করি। প্রণাম রইল। ইতি প্রভিভা।

পরের দিন সেই অপরিচিত ছেলেটিকে দেখলাম। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলছে। আমি তখন কলেজ থেকে ফিরছিলাম। আজ দেখলাম বাবা সকাল সকাল আপিস থেকে ফিরেছেন।

আমাকে দেখে বাবা বললেন, এই এরই কথা বলছিলাম, গান শেখার ভারি ঝোঁক।

অপরিচিত ছেলেটি আমার সঙ্গে অপরিচিতের মত ব্যবহার করল না—হাত তুলে ভদ্রতা জানাল না। খুবই পরিচিতের মত বলল, ওর কথা অজয়দা আমাকে বলে গেছেন। আমি মাস্টার ঠিক করে রেখেছি। এই গলিতেই তিনি থাকেন। নিজেদের বাদ্যযন্ত্রের দোকান আছে ধর্ম্মতলায়।

বাবা বললেন, একে প্রণাম কর প্রতিমা—তোর দাদা হয়। এস বাবা, বাড়ীর মধ্যে এস।

ঘণ্টা দুই'এর মধ্যে সুব্রতদা আমাদের আপন হয়ে গেলেন। পরিচয় দেওয়া, নেওয়া করতে করতে বহু দূরের জ্ঞাতিত্ব বন্ধনের চিহ্নটুকু আবিষ্কার করে দু'পক্ষই খুসি হল।

আমার নূতন শিক্ষাগুরুর নাম রাধাচরণ আঢ্য। নামটা বড় একটা কেউ ধরে না, পদবীর প্রতাপটাই প্রবল। আধুনিক গানে বৃদ্ধের রুচি কম, সংগ্রহও তেমন নাই। পুরাতন দিনের বহু গান এবং কিছু খেয়াল আমায় শিক্ষা দিলেন। তার মধ্যে অতুল সেন ও কান্ত কবির গান আমায় মুগ্ধ করল। পরে নানা ধরনের আসরে দেখেছি ভাবুক শ্রোতার মনে এই সব গানের প্রভাব অসীম।

এবার আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, মা আমার গান শেখাটা পছন্দ করছেন না। আবৃত্তির দক্ষিণা উনি খুসি মনে নিয়েছেন সংসারে সাশ্রয় হবে বলে, গানে উপার্জ্জন বেশী হবে, এ জেনেও উনি প্রসন্ন হলেন না। প্রতিবেশিনী কেউ বেড়াতে এলে আক্ষেপ করেন, কালের হাওয়া, কে ঠেকাবে বল। পুরানো লোকেরা আবার মানুষ, তাদের আবার কথা। তুমিও যেমন দিদি—এখন সবাই স্ব স্ব প্রধান। কর্ত্তা বলেন—স্বাধীন রাজ্য, সবাই ভোট দিতে পারে। হচ্ছেও তার ফল! চাল নেই আটা নেই ডাল নেই তেল নেই—! খালি নেই নেই রব। এখন ভালয় ভালয় চোখ বুজতে পারলে বাঁচি।

আসলে দিদির কাছে উনি অনেকখানি আশা করেছিলেন!

দিদি ফিরে এসেছিল দিন কয়েক পরে। কিন্তু মা ওকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি। দিদি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল—উনি আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন। ওর চিবুকে হাত ছুঁইয়ে চুমু খেয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন না।

দিদি ঘরে এসে বলল, হাঁরে, মা'র কি হয়েছে রে?

বললাম, কিছুই ত হয় নি। তুমি চলে যাবার পর অমনি দেখছি।

আমার কথা খুব বলতেন বুঝি?

কৈ—না ত, একদিন মাস্তর কেঁদেছিলেন—তার পর থেকে গুম মেরে আছেন।

কথা শুনে দিদি গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, বুঝেছি।

কি বুঝেছে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। তবে মনে হল আমিও কিছু বুঝেছি, দিদির হাজত বাসের সঙ্গে আর একটা নাম বড় বেশী করেই মনে পড়েছে আমাদের। দিলীপ দ্বিজ কতবার সে নাম উচ্চারণ করেছে—এমন কি প্রমীলাও বলেছে—দিদি—অজয়দা আসবেন না?

না।

কেন—তোমরা ত এক জায়গাতেই ছিলে!

না—ছিলাম না।

তবে যে মা বলছিলেন—হঠাৎ চুপ করে গেল প্রমীলা।

কি বলছিলেন মা? বল না কি বলছিলেন?

দিদির গম্ভীর মুখ দেখে প্রমীলা ভড়কে গেল। কোন রকমে ঢোক গিলে চোখ বুজে বলে ফেলল, তোমরা নাকি এক সঙ্গেই আসবে।

দিদি আরও গম্ভীর হয়ে আমার পানে ফিরে বলল, এই সব কচি মাথায় মা অমনি করে বিষ ঢুকিয়ে দেন বুঝি?

আমার মুখ শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বললাম, মা'র মাথার ঠিক ছিল! পাড়ার অনেকে আসছিলেন—

দিদি বলল, আমি এখানে থাকলে মাথার ঠিক থাকবে না। আচ্ছা, ভেবে দেখছি কি করতে পারি!

গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখীর ঝড় উঠবার আগে যেমন অসহ্য গুমোট নামে পৃথিবীতে—তেমনি মনে হচ্ছিল সংসারটাকে। খালি ভয় হচ্ছিল—এই বুঝি ঝড় উঠল, এই বুঝি প্রচণ্ড দাপটে খড়-কুটো লতাপাতা ধুলো জঞ্জাল উড়িয়ে বৃষ্টি এল ঝেঁপে। তার সঙ্গে শিলাপাত-বজ্রাঘাত!

আর একদিন শুনলাম—অজয়দাদাও ছাড়া পেয়েছেন। কিন্তু অজয়দা আমাদের বাড়ীতে এলেন না।

দিদিকে শুধোলাম, অজয়দা কি এখানে নেই?

কেন, দিদি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল।

কই, একদিনও এলেন না!

উনি এ বাড়ীতে আর আসবেন না। আমি বারণ করে দিয়েছি।

তুমি বারণ করেছ! কেন? বোকার মত জিজ্ঞাসা করলাম।

দিদি বলল, কেন বুঝতে পার না? এত কচি তুমি নও। মা পছন্দ করছেন না। পরশু টিউশানির টাকা মায়ের হাতে দিতে গেলাম—মা নিলেন না। বললেন, ও টাকা তুমিই রাখ।

বললাম, আগে আগে তুমিই ত রাখতে।

বললেন, একবার ভুল করেছি—জন্ম জন্মকাল ভুল করব? যে যার স্বাধীন উপার্জ্জনের টাকা খরচ করুক—তাতেই তার শান্তি।

প্রতিমা, আমিও শান্তি চাই—দিদি মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। ওর গলার স্বরটা ভিজে ভিজে, ভারীও।

তার পর একদিন দিদি যা কাণ্ড করল—

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। এখন সঙ্গীত-শিক্ষার কথায় আসি।

আদ্য মশাই-এর পুঁজিও ফুরিয়ে গেল এক সময়ে। আবার সুব্রতদাকে ধরলাম। সুব্রতদা বললেন, আছে একজন ভাল শিক্ষক। আমারই বন্ধু। তবে সেও এখন শিক্ষার্থী। রাজী হবে কি!

বললাম, কি নাম তাঁর?

নাম করলে কি চিনতে পারবে? আনন্দময় মিত্র।

বললাম, ওঁকে না চেনে কে! শহরের যত ভাল ভাল অনুষ্ঠানে উনি ত থাকেনই। আমি ওঁর গান শুনেছি। ওঁকেই ঠিক করে দাও সুব্রতদা।

সুব্রতদা একটু ভেবে বললেন, ওর আবার কতকগুলি নিয়ম আছে। না মিললে রাজী হবে না।

কি নিয়ম ?

সুব্রতদা বললেন, সে কথা পরে বলব। উপস্থিত একটা পরীক্ষা দিতে হবে। কাছেপিঠে কোন ফাংশান আছে তোমাদের ?

আছে। আসছে শনিবারে মহাজাতি সদনে কলেজের একটা সম্মিলনী আছে—তাতে আমার প্রোগ্রাম আছে।

ঠিক আছে। সেই প্রোগ্রামে ওর নামটাও ঢুকিয়ে দাও। আরে মুখ শুকিয়ে গেল যে। চেষ্টা কর—চেষ্টা কর। চেষ্টয়া যদি ন সিধ্যতে—

বললাম, চেষ্টা করব।

আমার চেষ্টা সফল হয়েছিল। আমি আনন্দবাবুর সঙ্গে একই মঞ্চে গান গেয়েছিলাম। উনি আমার গলার তারিফ করেছিলেন। বলেছিলেন—প্রতিভা।

সুব্রতদা সুযোগটুকু নষ্ট করেন নি। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, বেশ ত, প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দাও।

উনি বলেছিলেন, আমিই যোগ্য লোক বটে। এখনও বলে শিক্ষার সাগরে সাঁতার কাটছি—

সুব্রতদা বলেছিলেন, তবু ত সাঁতার কাটছ, হাবুডুবু খাচ্ছ না। তা এটারও একটা গতিগঙ্গা করে দাও। এদের কথা পরে তোমাকে খুলে বলব। শিক্ষার অনুরাগ আছে, সুযোগ নেই। সুযোগের অভাবে এমন কত প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বলেছিলেন, ভেবে দেখি। কি ভাবে ওঁকে সাহায্য করা যেতে পারে।

সুব্রতদা বললেন, বেশীক্ষণ ভাবতে দেব না আমি—কালই তোমার বাড়ীতে যাচ্ছি।

সুব্রতদা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ওঁর কাছে আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।

বাবার অনুমতি নিতে গেলে বললেন, কাল সুব্রতর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে—আমি মত দিয়েছি। ব্রজনিবাসে—ওই যে গলির মোড়ের বাড়ীটা—তোমায় শিখতে যেতে হবে।

বললাম, আমি কিন্তু এমনিতে শিখব না—

বাবা হাসলেন, তা কেন শিখবে। আমাদের শাস্ত্র বলে, বিনা দক্ষিণায় কার্য্যসিদ্ধি হয় না। আঢ্য মশায়কেও ত দক্ষিণা দিয়েছ—

তার চেয়ে বেশী দিতে হবে—ওঁর সময়ের অনেক দাম।

বাবা আবার হাসলেন। বললেন, কমদামী সময় কোন্‌টা রে ? ও কি কারও জন্য অপেক্ষা করে ?

মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ওইদিন আনন্দকে শিক্ষকরূপে পাওয়ার সুযোগ ঘটল। আর ওঁকে যৎসামান্য সম্মান-মূল্য দেওয়ার যে বাসনা করেছিলাম তারও আনুকূল্য হল।

বাবার সঙ্গে আলোচনা হওয়ার দিন বিকেলেই দত্তবাড়ী থেকে একজন লোক এলেন।

বাবা বাইরে বেরিয়ে ওঁকে দেখে খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন। আমরা জানালা দিয়ে লোকটিকে দেখছিলাম।

উনি বললেন, অধীনের নাম তারকনাথ দত্ত। আপনারই প্রতিবেশী। ব্যস্ত হবেন না—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দু'টি কথা বলে নিচ্ছি। আমার কন্যা শ্রীমতী দীপার একটি আবেদন নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, অনুমতি করেন—

ওঁর কথা বলার ধরনে আমাদের হাসি আসছিল—বাবা কিন্তু গম্ভীরভাবে শুনে যাচ্ছিলেন। জানি বাবা ওঁদের উপর প্রসন্ন নন। ওঁর সামান্য গোলদারি দোকান থেকে এই অতুল সম্পদ আহরণের ইতিহাস বাবাকে মুগ্ধ

ভিতরে এসে আমাকে ও মা-কে ডেকে বললেন

করে নি কোনদিন। উনি কতদিন ওঁদের কার্য্যকলাপ নিয়ে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন—ওঁদের সংশ্রব সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন। এখন কিন্তু ওঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।

ভিতরে এসে আমাকে ও মা-কে ডেকে বললেন, দত্ত মশায় এসেছিলেন—একটা প্রস্তাব নিয়ে, এখন তোমাদের মতামতের উপর সেটা নির্ভর করছে। বিশেষ করে প্রতিমার মতটাই এখানে আসল। ওঁর মেয়ে দীপার ইচ্ছা প্রতিমার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। মহাজাতি সদনে ওর গান শুনে দীপা এই ইচ্ছাটি প্রকাশ করেছেন।

মা বললেন, মেয়েদের উপার্জ্জন সম্বন্ধে আমি কিছু বলব না। ওদের পয়সা আমি নেব না।

বুঝলাম দিদির উপর অভিমানের জের এখনও চলছে।

বাবাকে বললাম, আপনি কি বলেন?

বাবা বললেন, যদিও আমি ওদের নীতি-ধর্ম্মকে সমর্থন করি না, তবু ইচ্ছা করলে তুমি সম্মতি দিতে পার। দক্ষিণা ত তোমাকেও দিতে হবে। আর আমাদের শাস্ত্রেও আছে মূল্য দিলে সবই শুদ্ধ হয়। বলে হেসেছিলেন।

কাজটা নিয়েছিলাম।

নিয়ে বুঝেছিলাম, প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষানুরাগ থেকে এই ইচ্ছাটি জন্মায় নি। মহাজাতি সদনের সুসজ্জিত মঞ্চ—সম্ভ্রান্ত শ্রোতার সমাবেশ—শিল্পীর বিপুল সম্বর্দ্ধনা দীপাকে যশখ্যাতি লালসায় পাগল করেছিল। ইতিপূর্ব্বে পাদ-প্রদীপের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সৌভাগ্য ওর যে হয় নি, তা নয়। কিন্তু সেই সমাবেশগুলি এত জাঁকজমক ও সম্ভ্রমপূর্ণ ছিল না। ঘরোয়া মজলিসে, বারোয়ারিতলার কোন পাল-টাঙানো অস্থায়ী আসরে কিংবা রবীন্দ্র-জয়ন্তীর কোন নিষ্প্রভ অনুষ্ঠানে মাইকের সামনে বসে সঙ্গীত পরিবেশন করার সুযোগ ওর ঘটেছিল, কিন্তু সেই সব আসরের স্মৃতি খুব সুখকর ছিল না। ও চেয়েছিল এমনি একটি সম্ভ্রান্ত আসর থেকে যশোমাল্য আহরণ করতে।

প্রথম দিনেই আমার ছাত্রী যে ভাবে সামনে এসে বসল, দেখে ত আমি অবাক। ও সঙ্গীত শিক্ষা করবে, না ফ্যান্সি ড্রেসের পরীক্ষা দেবে বুঝতে পারলাম না। যথারীতি নমস্কার করে বলল, আপনি যে গানটা পরশু মহাজাতি সদনে গেয়েছিলেন, ওটি আগে শিখিয়ে দিন।

বললাম, গোড়া থেকে সুরু করলে—

নেহাৎ আনাড়ী নই, দু-একটা ফাংশনে গান গেয়েওছি। কিন্তু আমার ডিফিকাল্‌টি কি জানেন, স্কেল ঠিক রাখতে পারি নে। ডি-মার্গে গলা তুলতে পারি।

এমন ছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়া কঠিনই। আমাদের বাড়ীতে একটি প্রবাদ বাক্য মা প্রায়ই ব্যবহার করেন। যারা উপদেশ শোনে না, এবং কাজে বিফল হয়, তাদের উদ্দেশ করে মা বলেন, ওর যে কাঁটি উঠেছে শুনবে কেন? উপমাটা টিয়াপাখী সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বয়স হয়ে গেলে টিয়াপাখীর নাকি কাঁটি ওঠে। একটা গাঢ় লাল দাগ গলার দু-পাশে গোল হয়ে ফুটে ওঠাকে বলে কাঁটি ওঠা। ওই দাগ উঠলে পাখী আর বুলি শেখে না—খালি ক্যাঁ-ক্যাঁ করে।

বুঝলাম, ছাত্রীরও কাঁটি উঠেছে। শিক্ষা গ্রহণের চেয়ে লোকসমাজে দর্শনীয় হবার দিকেই ওর ঝোঁক। স্বভাবতঃই আমারও তেমন আগ্রহ রইল না। যে ছাত্র শুধু ডিগ্রী নেবার জন্য মাস্টার রাখে, জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে নয়, তার মাস্টারের মনোভাব কেমন হয় জানি না। যদি আর্থিক আনুকূল্যই কাম্য হয় তা হ'লে ক্ষোভের কথা আসে না, কিন্তু শিক্ষাদানের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা? তার সঙ্গে সূক্ষ্ম অবহেলাবোধের জ্বালা? বড় বাড়ীর ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরের মাঝখানে এসে বসলেই ওইটিই অস্বস্তি জাগায়।

কিন্তু এ-ও হয়ত সয়ে যেত—আর একটি উৎপাত এসে জুটল দু-চারদিন যেতে-না-যেতে।

একটি সু-বেশ তরুণের আবির্ভাব হ'ল শিক্ষা-গৃহে।

উনি এসে বসতেই চমৎকার পুষ্পসার গন্ধে বায়ুস্তর আমোদিত হয়ে উঠল। ওঁর পিছন-ঠেলা চুল লাইমজুস গ্লিসারিণের কল্যাণে চকচক করছিল, হাতের আংটি কটিতেও হীরা-চুনি বৈদূর্য্যমণির সমাবেশ। সেই হাত যুক্ত করে কপালের কাছটিতে এনে সুষ্ঠু ভঙ্গিতে একটি নমস্কার জানালেন। বললেন, আমি দীপার দাদা—এইবার কলেজ থেকে বেরিয়েছি। এখন কোন্ লাইনে যাব ভেবে ঠিক করতে পারছি না। আচ্ছা, মেডিকেল কিংবা ইঞ্জিনীয়ারিং কোন্ লাইনটা আপনি প্রেফার করেন?

ওর প্রচ্ছন্ন গর্ব্বে আঘাত দিতে কেমন ইচ্ছা জাগল। বললাম, ওর কোনটাই আমার ভাল লাগে না। মনে হয় ভারি স্থূল।

বলেন কি! ও যেন আকাশ থেকে পড়ল। দীপাও আশ্চর্য্য হ'ল এবং সেই সঙ্গে ঈষৎ খুশীও।

দীপা হাসিমুখে বলল, ছোড়দার ধারণা ওই দুটি লাইন হ'ল মানব জীবনের পরম কাম্য জিনিস!

তরুণটি চঞ্চল হয়ে উঠল। ঈষৎ ধমকের সুরে বলল, তুমি থাম—এখনও পার্ট ওয়ান শেষ করতে পারলে না, তোমার ওপিনিয়নের কি মূল্য!

আমি বললাম, আমার ওপিনিয়নের মূল্যও খুব বেশী মনে করবেন না। আমিও—

তরুণ বিগলিত হাস্যে বিনীত হয়ে বলল, আপনি আর ও—হেভেন এ্যাণ্ড হেল! সেদিন মহাজাতি সদনের ফাংশনে আমিও উপস্থিত ছিলাম। আপনি যখন গাইছিলেন না—মনে হচ্ছিল স্বর্গে বসে আছি!

দীপা বলল, পাকাপাকি ভাবে যে যাও নি, রক্ষে! বলে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

আমিও হাসলাম। তরুণ কিন্তু ক্রুদ্ধ হ'ল না, সবচেয়ে হাসির মাত্রাটা চড়িয়ে দিয়ে বলল, কথাটা বলেছিস ভাল। তখন খালি মনে হচ্ছিল, ডি. এল. রায়ের সেই গানের কলিটা:

এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সে-ও ভাল
সে মরণ স্বরগ সমান।

ওর হাসিতে ও গানের কলিতে অতি প্রচ্ছন্ন অভদ্র ইঙ্গিতটুকু ধরতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গে সংযত হয়ে চললাম, অনেকখানি সময় নষ্ট হ'ল—এইবার পড়া সুরু কর।

তরুণ বলল, আমি কিন্তু উঠছি না—আপনার শিক্ষা-প্রণালী থেকে কিছু লেসন নেবার চেষ্টা করব।

মানে? দীপা প্রশ্ন করল।

মানে—কালই একটা এস্রাজ কিনে নেব। অবশ্য আপনাকে বিরক্ত করব না। আপনি ওকে যা শিখিয়ে দেবেন, সেইটি ফলো করবার চেষ্টা করব। একলব্যের মত শিক্ষা আর কি।

কেমন ফস্ করে মুখ দিয়ে বার হয়ে গেল—একলব্য যে গুরু-দক্ষিণা দিয়েছিলেন আশা করি তা মনে আছে।

ও পরম উৎসাহিত হয়ে উঠল, নিশ্চয়—নিশ্চয়। হাতের বুড়ো আঙুল এমন কিছু অমূল্য জিনিস নয়, তার চেয়ে মহামূল্য জিনিস মানুষের আছে বলে ঝকঝকে আংটি-ভরা ডান হাতখানা বুকের উপরে রেখে হাসল।

অত্যন্ত স্পষ্ট ইঙ্গিত। আমার কর্ণমূল সমেত সারা মুখখানা যেন আগুনের ঝাঁজে ঝলসে গেল—দীপার হাসির মাত্রাটা আর একটু বেড়ে গেল—আর অতি উৎসুক দুটি চোখের ব্যগ্র দৃষ্টি আমার মুখের উপর একাগ্র করে নির্লজ্জ তরুণ বসে রইল।

সম্বিৎ ফিরলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

দীপা বলল, চললেন নাকি!

হাঁ—শরীরটা ভাল লাগছে না। কাল আসব। বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

সন্ধ্যের পর ওদের বেয়ারার হাতে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েদিল দীপা। লিখেছিল:

অত্যন্ত দুঃখিত। আশা করি এমন অবাঞ্ছিত ঘটনা আর ঘটবে না। আগামী কাল যথাসময়ে আসবেন। না এলে বুঝবো ক্ষমা করেন নি। দীপা।

যাবই না ঠিক করেছিলাম। গুরুদক্ষিণার কথা স্মরণ করে মত বদল করলাম। যাওয়া-না-যাওয়া ত আমার ইচ্ছার উপরই রইল, দেখি না আর একটা চান্স দিয়ে। আবার যদি উৎপাত করতে আসে সহ্য করব না। উপযুক্ত জবাব দিয়ে চলে আসব।

এদিকে আমার গানের শিক্ষাও চলছিল। শিক্ষার এই ধারাটা আমার কাছে নতুন লাগছিল। আরোহ অবরোহে সুর বিস্তারে কসরত কৌশলের প্রয়োগটি এমন স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিতে ঘরে যেতে পারবে এমনটি ভাবতে পারি নি। এই সব গানে মীড় গমক মূর্চ্ছনার খেলা তেমন ছিল না—রাগ বিস্তারের বাহুল্যও নয়।

আনন্দ বলতেন, শুধু কথা—আর কথা। বাণীকে শুদ্ধ ভাবে, অবিকৃত ভাবে সুরের স্রোতে ভাসিয়ে এনে মনের মন্দিরে পৌঁছে দাও। সুরের মধ্যে দিয়ে আর একটি সত্তাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা কর। শুনেছি গানের মাধ্যমে এই সত্তাকে জাগিয়ে সাধকরা ভগবৎ সত্তায় নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে আনন্দ লাভ করেন। প্রতিটি মানুষের মনে ঘুমিয়ে থাকে এই সত্তা—আনন্দময় সত্তা এটি, লাভ করতে পারলে পরম লাভ।

ঠিক তাই। আনন্দ যখন তন্ময় হয়ে গাইতেন:

তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী—
আমি অবাক হয়ে শুনি—শুধু অবাক হয়ে শুনি।

অমনি আমার সারা অন্তর সুরের সঙ্গে শ্রবণময় হয়ে উঠত।

কিংবা—তুমি যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে কোন্‌খানে।

কিংবা—আমার এ দেহখানি তুলে ধর
দেবালয়ের প্রদীপ কর।

আমি জ্বলে উঠতাম—কখনও ধূপ হয়ে—কখনও প্রদীপ হয়ে। কখনও শুভ্র শতদল গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠতাম, কখনও সজল-কাজল মেঘের চন্দ্রাতপ-তলে নীলতরু শাখায় ঝুলনা বাঁধতাম—কখনও কালো কালিন্দী পুলিনে ফুলশেজ বিছিয়ে শয়ন করতাম। সুরে সুরে আচ্ছন্ন হয়ে সৃষ্টি হ'ত আমার সুরলোক। আমি হারিয়ে যেতাম···

আনন্দ বলতেন, গাও—তুমিও কণ্ঠ মেলাও, ভাবতরঙ্গ যখনই উঠবে অলস হয়ে থেকো না— ভাসিয়ে দিয়ো তোমার গানের ভেলা। ঋতুদের রূপে রূপে বেঁধে দিয়ো তোমার আনন্দের সুর। এরা ক্ষণস্থায়ী, তুমিও স্বল্পায়ু; কিন্তু এদের নিরবচ্ছিন্ন আসা-যাওয়ার মধ্যে দিয়ে এই সুর নিত্যকালের আস্বাদ এনে দেয়। এ তোমার দ্বিতীয় সত্তা—সঙ্গীতের সাধনায় এর উদ্বোধন কর।

আনন্দের সেই মূর্ত্তিটিকেই ধরতে চাইলাম সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। আনন্দরূপে এলেন না আমার মনে, এলেন রূপাতীত হয়ে। সে কেমন? সে জিনিস বুঝাতে পারব না। সে অনুভববেদ্য বস্তু। মেঘ দেখে ময়ূর কেন পেখম মেলে, বর্ষার জলধারা স্পর্শে কদম্ব কেন কণ্টকিত হয়, পূর্ণিমায় সমুদ্র কেন পরিস্ফীত, সূর্য্যের কিরণে কমলিনী আর চন্দ্রের সোহাগে কুমুদিনী কেন ঘোমটা খোলে—ইত্যাদি অজস্র প্রশ্ন, উপমা আর দৃষ্টান্ত দিয়ে সেই রূপাতীত, স্পর্শাতীত বস্তুকে উপলব্ধ করাতে চেষ্টা করেছেন কবি মহাজনেরা। পেরেছেন কি তাকে স্পষ্ট করতে? সে কখনও রূপের নেশায়, কখনও গুণের গরিমায়, কখনও সুরে, কখনও শ্রদ্ধায়, কখনও বীরত্বে, বেদনায় বিপরীত বৃত্তিকে আশ্রয় করে, কখনও বা করুণায়, শোকেও কোন কোন ক্ষেত্রে আসা-যাওয়া করে। তার অসংখ্য ছদ্মবেশ। সুরের ছদ্মবেশে তিনি কি আমার মনকে স্পর্শ করতে চাইছেন? জানি না—। আমি সুর-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম।

আনন্দ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন, আমি ঠিকই ধরেছিলাম। সঙ্গীত তোমার অন্তরের জিনিস—এ তোমার দ্বিতীয় সত্তা। এই অন্তরের রূপটিকে বাইরে প্রকাশ কর—প্রকাশ কর। তুমি সার্থক হবে।

উনি আমাকে প্রতিটি সঙ্গীত-সম্মিলনে সঙ্গী করতে লাগলেন, প্রতিটি ঘরোয়া আসরে গাইবার সুযোগ দিলেন, প্রত্যেকের কাছে আমাকে পরিচিত করলেন শিষ্যা বলে।

আমার আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না।

সেই আনন্দ-স্পর্শই নিয়ে আসতাম দীপার ঘরে। দীপা এক একদিন আশ্চর্য্য হয়ে বলত, প্রতিমাদি তোমাকে দেখলে মনে হয় সর্ব্বদাই যেন একটা আলো নিয়ে ঘোরাফেরা করছ! কিসের আলো?

রহস্য করে বলতাম, হ্যারিকেনের নয়।

দীপা বলত, হ্যারিকেনের নয়—বিদ্যুতেরও নয় বুঝি, কিন্তু এত আনন্দ পাও কোথা থেকে?

মনে মনে বলতাম, আমার আনন্দ যে সর্ব্বময়। তিনি আছেন বলেই ত আমি আছি।

দীপা বলত, তাই তোমার গান এত উতরায়। তোমার গুরু শুনেছি—

আমার গুরুকে তুমি জান?

কে না জানে! শহরের হেন নামকরা জায়গা নেই যেখানে উনি নেই। অথচ ওঁকে পেয়েও আমি কিছু করতে পারলাম না।

তুমি ওঁর কাছে শিক্ষা পেয়েছিলে?

পেয়েছিলাম। কিন্তু উনি বিরক্ত হয়ে আমায় ত্যাগ করে গেলেন। তাই ত তোমাকে ধরেছি তোমার মত গান গেয়ে ওঁকে ধরব বলে।

আমি হেসে বললাম, আমার মত গান গাইতে পারলেই উনি আসবেন ?

নিশ্চয় আসবেন। দোহাই তোমার, প্রতিমাদি—আমাকে তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দাও।

ওর আগ্রহ দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। স্বীকার করছি—ঈষৎ সন্দিগ্ধও হয়েছিলাম। গানের ফাঁদ পেতে ও মানুষ ধরতে চায়—ভেবে বেদনাবোধও করেছিলাম। সেই প্রথম বেদনাবোধ। কেন ?

বললাম, দীপা, সঙ্গীত হ'ল সাধনার জিনিস। মন দিয়ে শেখ, নিশ্চয়ই ভাল ভাবে উতরে যাবে।

না প্রতিমাদি, আমাকে শুধু সেই গানগুলি শিখিয়ে দাও—যা তোমার গুরুর সঙ্গে এক আসরে বসে গাও।

সে ত একটা গান নয়—অনেক গান। আরম্ভ কর একে একে।

আমি জানি দীপার ধৈর্য্য কম। সাধনার শ্রম ওর সইবে না। চিরকাল অত্যধিক প্রশ্রয়ে ওর বৃত্তিগুলির ভার-সহিষ্ণুতা নষ্ট হয়ে গেছে। আদুরে মেয়ের মত সব জিনিসই ও চাইবা মাত্র হাতের মুঠোয় পেতে চায়।

বিদ্যা তেমন জিনিস নয়—সঙ্গীত ত নয়ই। বিদ্যার ক্ষেত্রে অন্যের বিদ্যাকে ধার করে স্মৃতিতে বন্দী করে—তবু ডিগ্রীর গায়ে একটা দাগ কাটা যায়, কিন্তু সুরের ক্ষেত্রে সে সুযোগ কই! সুর ত শুধু স্মৃতিলোকে বাস করে না—সে যে অন্তরলোকেরও বাসিন্দা। সুরকে আয়ত্ত করার ব্যাকরণ পণ্ডিতেরা মুখস্থ করিয়ে দিতে পারেন হয়ত কিন্তু রূপ সৃষ্টির রহস্য সে যে একান্ত ভাবে স্রষ্টারই সম্পত্তি। এক এক ওস্তাদের হাতে এক এক যন্ত্রের সুর নূতন সৃষ্টির উন্মাদনায় মেতে ওঠে—সহস্রের হাতে সে অনুসরণ। এক একটি কণ্ঠে, এক একটি সঙ্গীত অর্থবহ জীবন্ত, সহস্রের কণ্ঠে শুধু ধ্বনি-তরঙ্গের সমারোহ। সাধনা ত সকলেই করে—জীবন প্রতিষ্ঠার সাধ্য দু-একজন দুর্লভের।

ক্রমশঃ অধীর হয়ে উঠতে লাগল দীপা। আমি বুঝলাম, এ ভাবে বেশীদিন চলবে না। যে হৃদ্য সম্পর্কটি গড়ে উঠতে চাইছিল তা শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে। ভাল লাগছিল না।

আর একদিন একটা ঘটনা ঘটল। দীপাকে সঙ্গীত-শিক্ষা দিচ্ছি—হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল উঠল, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি বাড়ীর সামনে খানকয়েক সরকারী ট্রাক আর অসংখ্য পুলিশ বাড়ীখানাকে ঘিরে ফেলেছে।

শুকনো মুখে বললাম, এ কি ব্যাপার—এত পুলিশ কেন ?

দীপা বিচলিত হ'ল না। বলল, মাঝে মাঝে ওরা আসে—এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চের লোক। ভাবে, বাবা ব্ল্যাকমার্কেট করছে। ব্ল্যাকমনিতে ভর্ত্তি আমাদের বাড়ীটা।

কিছু হয় না ?

কিছু না! কি করবে ওরা—জামাইবাবু এসে সব ঠিক করে দেন। বলেন, ঘাবড়ো না, করুক না সার্চ্চ। কিছু না পেলে তোমাদের সুনাম বাড়বে।

জামাইবাবু কি—

হাঁ—ওঁর অসীম ক্ষমতা। যাক গে এ সব কথা। আজ আর কিছু হবে না—ওরা এখন খানিকটা হৈ চৈ করবে। তারপর চলে যাবে।

এটাও ভাল লাগে নি আমার। বাড়ী থেকে বা'র হবার সময় মনে হয়েছিল রাস্তার দু' ধারের লোকগুলি আমার দিকে চেয়ে দেখছে। ভাবছে—ইনিও দেখছি এই বাড়ীতে আসা-যাওয়া করেন!

একজন যেন মন্তব্যও করেছিল—বার্ডস অব দি সেম ফেদার।

তৃতীয় একটি কারণ—দীপার সেই দাদাটি, অনুময়, আবার একদিন দেখা দিলেন। হাতে একটি বেহালা।

বললেন, বিস্তর দোকান খুঁজেপেতে এটা যোগাড় করলাম—সেই ওস্তাদ ইহুদী ব্যায়লা-বাজিয়ে একদিন এটা বাজিয়ে গেছে। তাই দামটা বেশ চড়া। একটু বাজাব ?

ওকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেবার জন্য সায় দিলায়।

ও কিন্তু বেহালা শোনাতে আসে নি। পর মুহূর্তেই ওর উদ্দেশ্য ধরা পড়ল। বলল, মনে করবেন না এটা নিজে বাজাবার জন্যে কিনলাম!

দীপা বলল, তবে কিনলে কেন?

কিনলাম—এটা একজনকে প্রেজেণ্ট করব। মানে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে যিনি শ্রেষ্ঠ হবেন আসছে সঙ্গীত-সম্মিলনে। তাঁকে বড় জোর এক সেট গীতিমাল্য, গীতালি, গীতবিতান কিনে দিতে পার, বেহালা কিনে দেওয়ার কি অর্থ!

যাঁকে উপহার দেব—অর্থ তিনি বুঝলেই আমি খুশী হব। বলে হাসতে লাগল অনুময়। আচ্ছা, কে উপহারটি পাবেন বলে তোমার মনে হয়?

দীপা অকারণে হেসে উঠল। যে-ই পান—তুমি কিন্তু তাঁর নাগাল পাবে না ছোড়দা।

হো হো করে হেসে উঠল অনুময়। আমার পানে চেয়ে বলল, আপনি কি বলেন মিস বসু—পাব না?

ক্রোধে জ্বলে উঠে বললাম, মিছে সময় নষ্ট করছ দীপা। শিক্ষা না নাও—উঠলাম।

অনুময় আমার সামনে এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, যাবার আগে আমার কথার জবাব দিয়ে যান।

এ সব অবান্তর কথার জবাব নেই। বললাম।

অনুময় আমার ভ্রূকুটি গ্রাহ্য করল না। বলল, সত্যি বলছি, এটা কিনবার সময় আপনার কথাই বার বার মনে হয়েছিল।

আমাকে কি কখনও বেহালা বাজাতে দেখেছেন?

শিখুন না, আপনার মিষ্টি হাতে ও একটা নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠবে। চমৎকার লাগবে।

অসহ্য ক্রোধে ফেটে পড়লাম, ইতরামি করবেন না—সরুন।

উঠে দাঁড়াল অনুময়। শুকনো গলায় বলল, আপনি অন্যায় রাগ করছেন। আমি আপনার অসংখ্য গুণ-মুগ্ধের একজন।

ওর কথার জবাব দিলাম না। দুয়োর গোড়ায় এসে দীপাকে বললাম, আর আসব না।

দীপা বিশেষ ক্ষুব্ধ হ'ল বলে মনে হ'ল না। পথে এসে ভাবলাম, ব্যাপারটা সাজানো নয় ত?

কয়েক দিন পরে সুব্রতদা এলেন। আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, কি ব্যাপার প্রতিমা, তুমি কি ওদের বাড়ীতে আর যাচ্ছ না?

না।

কেন—অ্যামাউণ্ট ত নিন্দের নয়, পেমেণ্টও রেগুলার।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, তবু সইলো না। আমার অদৃষ্ট।

উঁহু। মাথা নাড়লেন সুব্রতদা। কেমন কেমন বেসুরো লাগছে।

সে কথা চাপা দেবার জন্য বললাম, এটা ত খুব জরুরি সংবাদ নয়, কাগজেও ছাপা হয় নি—আপনি কেমন করে জানলেন?

জানলাম—পাড়াতেও রয়টার আছে যে! সব বাড়ীর রিপোর্টই অল্প-বিস্তর এধার-ওধার ছড়ায়। আরও একটা সূত্র থেকে ব্যাপারটা ধরা পড়ল। পরশু তারকবাবু ধরেছিলেন আমায়, ওঁর মেয়ের জন্য আনন্দকে ঠিক করে দেবার জন্য।

আমাকে কৌতূহলী দেখে সুব্রতদা বললেন, আনন্দও এমনি একটা সুযোগ খুঁজছিল কিছুদিন ধরে। ওর কিছু টাকার দরকার।

বললাম, জানি। নতুন ভাবে একটা শিক্ষালয় তৈরী করতে চান। কিন্তু ও বাড়ীতে ত উনি যাবেন না।

সুব্রতদা একটু আশ্চর্য্য হলেন। বললেন, যাবেই না? কে বললে, তোমাকে?

আমি শুনেছি—ওদেরই বাড়ীতে। আগে ত উনি দীপাকে গান শেখাতেন।

দীপাকে গান শেখাতেন। অথচ আমরা কেউ জানলাম না। আমি নয়, প্রণব নয়, সলিল, সুকুমার, মুকুন্দ, অখিল, এমন কি অনুময় পর্য্যন্ত নয়!

এবার আশ্চর্য্য হবার পালা আমার। বললাম, কখনোই কি উনি সামান্য দিনের জন্যও ওদের মাষ্টারী করেন নি? হয়ত আপনারা তা জানেন না।

অসম্ভব। এ হতেই পারে না। জোরে মাথা নাড়লেন সুব্রতদা। অসম্ভব। খুব সম্ভব তুমি ভুল শুনেছ, কিংবা কেউ তোমাকে নিয়ে রহস্য করেছে।

আমি প্রতিবাদ করলাম না। সেই মুহূর্ত্তে আমার অনেক কথা মনে হ'ল। ইদানীং দীপার আচার-আচরণটা অদ্ভুত ঠেকছিল। প্রথম যখন ওদের বাড়ীতে যাই—দেখেছিলাম একটি প্রসাধন-নিপুণা গর্ব্বিতা মেয়েকে। সে মেয়ে কোনদিনই আমার সঙ্গে একই মাটিতে দাঁড়িয়ে কথা কইত না, আমার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করত না। হাবে-ভাবে আচারে-ব্যবহারে এই আভাসই দিত, যেন আমারই উপকারার্থে আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে। ইচ্ছা করলে আরও বড় ওস্তাদকে শিক্ষক রাখা ওর পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

কিন্তু ইদানীং আমার সঙ্গে কয়েকটি বড় জলসায় যাওয়ার ফলে ওর পরিবর্ত্তন সুরু হয়। সেই সব অনুষ্ঠানে আনন্দেরও অংশ থাকত। কখনও একক—কখনও বা আমাকে নিয়ে যুগ্ম ভাবে। আমাদের যুগ্ম অনুষ্ঠানটির বৈচিত্র্য ছিল এবং সেটি কলকাতার সুধী সমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের একটি নাতিদীর্ঘ কবিতাংশে যাকে লিরিক বলাই সঙ্গত—আমরা সুরারোপ করেছিলাম। তার একটি চরণ আমি গ্রহণ করতাম অপর চরণটি পূরণ করতেন আনন্দ। অনেকটা দ্বৈত-সঙ্গীতের ধরনে উত্তর-প্রত্যুত্তরের ভঙ্গীতে একটি প্রেম বা মৈত্রী ভাবনাকে সুরে ছন্দে সঞ্চারিত করে দেওয়া। এটা আমাদের মৌলিক আবিষ্কার নয়, বৈষ্ণব-কবিরা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে বিরহ মিলনের নানা দশার মধ্য দিয়ে এমনি চমৎকার নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্ত করে গেছেন। কীর্ত্তনে এই জিনিসটি অলভ্য নয়। শুক-সারির দ্বন্দ্বে এর খানিকটা আভাস আছে। আমাদের মৌলিকত্ব ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা চয়নে—যা বিশ্বভাবনায় অথবা প্রেমপরিক্রমায় বিশিষ্ট একটি ধারাকে বহন করে চলে। রবীন্দ্রনাথের বাণী ভাব ও ভঙ্গিকে অবিকৃত রেখেই আমরা সুরে রসসৃষ্টি করতাম। বিদগ্ধ-সমাজ আমাদের সাধুবাদ দিতেন।

কয়েকটি অনুষ্ঠানে আমার এই বিপুল সম্মান দেখে দীপার ভাবান্তর হ'ল। আনন্দকে প্রতিটি অনুষ্ঠানে আমার পাশে দেখে চমৎকৃত হ'ল। এটা আমার অনুমান নয়, পরে আমার সঙ্গে হৃদ্য একটি সম্বন্ধ পাতিয়ে আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে চলার চেষ্টাও যেন করেছিল। আগেকার মত উগ্র মহার্ঘ্য বেশ-বাসে আমার সামনে হাজির হয় নি কোন দিন।

কিন্তু এই সহৃদয় ব্যবহারের অন্তরালে আর একটি বিপরীত স্রোত যে ফল্গুর মত নিয়ত প্রবহমান ছিল সে আমি জানব কেমন করে! সেটা প্রকাশ পেয়েছিল সেই চরম মুহূর্ত্তে, অনুময় যেদিন আমাকে অভদ্র ভাবে সম্বোধন করল, আর দীপা তার প্রতিবাদ মাত্র করল না। আমি আর আসব না শুনেও দীপার ভাবান্তর হ'ল না। তখনই আমার মনে হয়েছিল ঘটনাটা সাজানো নয় ত?

সুব্রতদার কথায় সেই সংশয় দৃঢ় হ'ল। বুঝলাম—রহস্য নয়, ষড়যন্ত্রই এটা। অনেক ভেবে-চিন্তে বুদ্ধি খাটিয়ে এটা বা'র করেছে দীপা। আমাকে কোন কৌশলে সরিয়ে দিয়ে আনন্দকে নিকটে আনার উদ্দেশ্যই ও মনে মনে পোষণ করছিল এতদিন।

এ কি শুধু সঙ্গীত-শিক্ষার আগ্রহ?

সন্দেহটা বিদ্যুতের স্পর্শ দিয়ে মিলিয়ে গেল। আমি সচেতন হলাম। সূক্ষ্ম যন্ত্রণায় বুকের ভিতরটা আনচান করে উঠল—কেমন যেন খালি খালি বোধ হতে লাগল।

অতি কষ্টে সেই ভাব দমন করে হাসবার চেষ্টা করলাম। তাই হবে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

সুব্রতদা বললেন, কথাটা কালই পেড়েছিলাম। প্রথমটা রাজী হয় নি—তর্ক করতে চেয়েছিল। আমি যুক্তি দিলাম, টাকার যখন প্রয়োজন তোমার—কি ক্ষতি এটা স্বীকার করতে, তুমি ত অন্যায় উপায়ে উপার্জ্জন করবে না?

তবু ও কৌশলে এড়াতে চেয়েছিল। এমন একটা অ্যামাউণ্ট ক্লেম করে বসল যা কোন ধনীই দিতে পারতেন না। তারকবাবু তাইতেই রাজী হয়ে গেলেন।

অর্থের পরিমাণ জানবার আগ্রহ অনুভব করলাম না। এই তথ্যে আরও বেদনা বোধ করলাম। এখন এই যুগে অর্থই সমস্ত কার্য্যকারণের মূলে। মিছে আমরা কালোবাজার কালোবাজার করে গলা ফাটাচ্ছি! যার অর্থ আছে, তার ক্ষমতাও আছে। কালোবাজারকে ধিক্কার দিয়ে কালো করতে পারছে কি কেউ? আনন্দ যে এই ফাঁদে ধরা দেবেন সে আর আশ্চর্য্য কি!

আমি মনে মনে খুবই অসহিষ্ণু হয়েছিলাম। বললাম, আনন্দ কিন্তু ঠিক করলেন না। এই ফাঁদে ধরা না দিলেই ভাল করতেন।

সুব্রতদা অবাক হয়ে বললেন, ফাঁদ। ফাঁদ বলছ কেন? তুমিও ত কিছুদিন আগে ওখানে—

লজ্জিত হয়ে বললাম, ফাঁদ বলছি এই কারণে, ওঁর সাধনায় ক্ষতি হবে।

না—তা হবে না। টাকাটা মোটা বটে—মেয়াদ ওই এক ঘণ্টার—সপ্তাহে দু'টি দিন। ভদ্রলোক তাইতেই রাজী।

হেসে বললেন, সুব্রতদা, তুমিও ত ওই ছাত্রী নিয়ে কিছুদিন কাটালে, ও কি সত্যিই প্রতিভাময়ী? মানে আনন্দের সাহায্য পেলে সঙ্গীত-গগনে একটি জ্যোতিষ্ক হয়ে উঠবে? যেমন তুমি—

ছি-ছি, কি যে বলেন। আপনারা সাবধান হয়ে উপমা প্রয়োগ করেন না। কতটুকু শিক্ষা আমাদের, কি বা সাধ্য।

সুব্রতদা হাসতে লাগলেন। যাক, এতদিনে একটি যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী তোমার জুটে গেল। এবার আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারবে।

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের মাঝখানটায়। যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী! এ কি শুধু সঙ্গীতকেই আশ্রয় করে? শুধু কি কলা-সাধনারই ক্ষেত্রে?

কিছুতেই ব্যথাটাকে দূর করতে পারলাম না।

সুব্রতদা বললেন, তোমাকে আরও একটা গানের টিউশানি যোগাড় করতে হবে ত? চেষ্টা দেখব নাকি?

বললাম, দেখা যাক, কি করতে পারি। আর ত গুরুদক্ষিণা দেবার দায় রইল না—

কেন—পাঠ কি তোমার শেষ হয়ে গেল?

বললাম, ঠিক শেষ হয় নি—এ পাঠ জীবন ভোরই চলবে। তবে মনে করছি অনুষ্ঠানগুলো কিছু বাদসাদ দিয়ে নেব। পার্ট টু ত শিয়রে।

সেই ভাল—এ দিকটা সেরে নাও।

সুব্রতদা সোজা উপায়টি বাতলে দিয়ে চলে গেলেন। সেটা কিন্তু আমার পক্ষে সহজ ছিল না। দু'টি বৎসরের অভ্যাস—ছেড়ে দেব বললেই দেওয়া যায়? নিত্য শয্যা ত্যাগের মত এ অভ্যাস। সন্ধ্যার আগেই মনের মধ্যে প্রবল টান অনুভব করি—যথারীতি প্রসাধন সেরে শিক্ষার আসরে গিয়ে কখন বসব? কখন সুরের তরঙ্গে করব আত্মনিমজ্জন? সংসারের কাজকর্ম দায়-অদায় ভালমন্দের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। আমার যারা শ্রদ্ধার পাত্র, স্নেহের পাত্র, তাদের দিকে সম্পূর্ণ ভাবে ফিরিয়ে নিয়েছি মুখ, তাদের সুখ-সুবিধা আমার মনকে উৎসুক করে না—প্রফুল্ল করে না।

মেয়েরা কি এমনই আত্মসুখ-প্রত্যাশী? ছেলেরাও ব্যতিক্রম নয়। দিদিকে দেখছি বড় দুটি ভাইকে দেখছি, নিজেকে অনুভব করছি, যাঁরা আমাদের সংসারের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য শ্রম যত্ন চেষ্টার ত্রুটি করছেন না—বিনিময়ে কতটুকু দিতে পারছি আমরা! ওঁদের কি শুধু দেওয়ারই কথা—আমরা শুধু নিতে থাকব?

মা'র দুঃখ এই মুহূর্তে যেন বুঝলাম। আমাদের কাছে অনেক প্রত্যাশা ওঁর ছিল। না পেয়ে মুখ ফিরিয়েছেন অভিমানে। দিদি ত সংসারের সম্পর্ক ক্ষীণ করে আনছে—বাইরেই ওর কাজ বেশী। ও এখন মাষ্টারী করছে, কিন্তু সংসারে সাহায্য করে অল্পই। বলে, ওদের সমিতিকে শক্ত করে গড়তে হবে—না হলে দেশের দুঃখ মোচন হবে না।

আমি দেশের দুঃখ মোচন কথাটা ব্যাপক অর্থে ধরতে পারি না। আমি ভাবি, আমরা প্রত্যেকে যদি নিজের নিজের দুঃখ মোচন করতে পারি তা হলে দেশের দুঃখ রইল কোথায়। আমরা যদি সংসারকে ভারি না করি সংসার তা হলে বিপর্য্যস্ত হবে কেন? দিলীপ উপার্জ্জন করবে, দ্বিজ করবে, প্রমীলাও বসে থাকবে না। আমরা ত নিজের নিজের ভার নিয়েইছি, সংসার আমাদের ভারি হবে কোন্ বোঝা নিয়ে। বৃদ্ধ বয়সে মা বাবা ত অনায়াসে আমাদের উপার্জ্জনের অংশে সুস্থ থাকতে পারবেন।

কিন্তু এ চিন্তা বেশীক্ষণ আমাকে পীড়ন করতে পারল না। আমার সুরলোকে অসুরের উৎপাত সুরু হয়েছে। আমাকে স্বস্থানচ্যুত করার ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তৃত হচ্ছে। আমাকে তার থেকে নিষ্কৃতি পেতে হবে—আমাকে বাঁচতে হবে। না—কিছুতেই স্বীকার করব না পরাজয়।

লক্ষ্য রাখলাম আনন্দের উপরে। উনি কখন আসেন—কখন চলে যান। লক্ষ্য রাখলাম, শহরের সাংস্কৃতিক আলয়ে কি উপলক্ষ্যে কোনদিন অনুষ্ঠান হয়, তাতে আনন্দের কি ভূমিকা থাকে? আমাকে ছাড়াও অনুষ্ঠান-সূচীতে আনন্দ থাকেন কি না?

এসবের আগে একদিন আনন্দের সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম, আপনি ত বড়-বাড়ীতে মাষ্টারী করছেন, অসুবিধা বোধ করেন না?

না—ওঁরা চমৎকার লোক, ভারি ভদ্র। একটু হেসে বললেন, আর বলছিই বা কাকে—তুমিও ত ওদের জান।

দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, জানি বলেই জিজ্ঞাসা করছি, অসুবিধা বোধ করেন না?

আনন্দ আমার পানে চেয়ে বললেন, ভাবে বোধ হচ্ছে, আমি ওখানে যাই, এ তোমার ইচ্ছা নয়।

বললাম, আমার ইচ্ছার কি মূল্য!

উনি বললেন, দূর থেকে ওদের সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছিলাম, এখন মনে হচ্ছে সেগুলো জনরবের চেয়ে বেশী নয়। যাই হোক, ওদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সপ্তাহে দু'টি দিন—দু'টি ঘণ্টা মাত্র। ওখানে আমি আদার ব্যাপারী মাত্র।

তা হোক, ওখানে টিউশানি না করাই ভাল।

তুমি বলছ—ও কথা!

হাঁ—কেন বলব না! আমি ওদের যতটুকু জেনেছি আপনি তা কিছুতেই জানতে পারবেন না। আপনি ওটা ছেড়ে দিন।

খুবই আশ্চর্য্য হলেন আনন্দ। মিনিট দুই আমার মুখের পানে অভিনিবেশ সহকারে চেয়ে থেকে বললেন, অথচ তুমি জান আমার জীবনের স্বপ্ন কি। আমার অর্থের প্রয়োজন খুবই—

আপনার যা প্রতিভা অন্য উপায়ে যথেষ্ট উপার্জ্জন করতে পারবেন। বললাম।

উনি হাসলেন। বললেন, সে অভিজ্ঞতা এরই মধ্যে প্রচুর লাভ করেছি। অল্প পরিসর পাদ-প্রদীপের আলোয় যাঁরা হাততালি দেন, উৎসাহ যোগায়, দেশের বিস্তীর্ণ পরিসরে তাঁদের আমি খুঁজে পাই না।

মাথা নেড়ে বললেন, শিল্পীর স্বপ্ন—শিল্পীর মনে, অন্য মন তা স্পর্শ করতে পারে না।

কেন পারবে না! শিল্পী যদি অন্য মনকে তাঁর শিল্প-সৌন্দর্য্য দিয়ে তুষ্ট করতে পারেন—

আমি ডিবেট করতে বসি নি প্রতিমা—যা রূঢ় সত্য, যা নিজে অনুভব করেছি—তারই কথা বলছি। ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না রেখে যদি কিছু উপার্জ্জন করতে পারি তাতে তোমার আপত্তি কেন?

ওঁর কথার সুরটা ভিন্ন অর্থে মনে আঘাত করল। আনন্দ যেন বলতে চাইলেন, কোন্ অধিকারেই বা তুমি আপত্তি করছ! গানের আসরে—ঝলমলে আলোর বৃত্তে বসে যন্ত্র ও কণ্ঠে সুর মিলিয়ে কি তুমি এই অধিকার অর্জ্জন করেছ! তুমি জনশ্রুতিতে নির্ভর করে কি স্বপ্নজাল বুনছ? ওঁর গলার স্বরটাও লাগল কৈফিয়ৎ দাবীর মত।

চোখে আমার জল এসে গেল—মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

আনন্দ আমার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন না। বললেন, বাঁধা মাইনে ছাড়াও উপার্জ্জনের আরও একটা উপায় বা'র করেছি। শহরের কয়েকটি নামী প্রতিষ্ঠানে ঘরোয়া আসরের ব্যবস্থা করব, সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের জন্য। সেখানে গানের সঙ্গে বক্তৃতা থাকবে। জিনিসটা সহজে বোঝানো যাবে। এতে দক্ষিণাও মিলবে নগদ।

বললাম, এইটিই ত ভাল। কারও সাহায্য না নিয়ে—

বললেন, সাহায্য নিতেই হবে। বাজারই এমন, ভাল জিনিসের গুণ প্রচার না করে তাকে ভাল বলে জাতে তোলা ভারি কঠিন কাজ। শুধু কেশ-বর্দ্ধক বলে বিজ্ঞাপন দিলে কেশ তৈলের বিজ্ঞাপন খরচই উঠবে না, তার সঙ্গে অনেকগুলি বিশেষণ যোগ করতেই হবে। এ হ'ল প্রচার যুগ।

না হয় সেই ভাবেই কাজ করুন।

তাই ত করব। এতে অর্থ চাই—উঁচু তলার মানুষ চাই। চাই এখন পেট্রন, যিনি দু-চারটি অনুষ্ঠানের খরচ যুগিয়ে আমার জয়ঢাকটার জোর আওয়াজ তুলতে পারবেন। আমি স্থান ও পাত্র নির্ব্বাচনে ভুল করি নি।

আমি আর কি বলব। আমি এতে দুঃখ পাচ্ছি আনন্দ। আমায়, তুমি দুঃখ দিয়ো না। আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি, সেই শ্রদ্ধা নষ্ট করো না। তুমি খাঁটি সোনা—বিজ্ঞাপন তোমার জন্য নয়। ও সব করুক গে ক্যারেট-গোল্ডের শিল্পীরা। যারা লঘু-গুরু সম্ভ্রম-অসম্ভ্রম বাছ-বিচার করে না—যারা মঞ্চ পেলেই, যন্ত্র ও কণ্ঠের কসরৎ দেখায়। যাদের আবেদন লক্ষ লক্ষ অরসিকের করতালি ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। তুমি সাধারণ জনের নও, তুমি সস্তা নও, চটকদার নও।

আমাকে নতমুখী বিষণ্ণ দেখে আনন্দ এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত রাখলেন। কোমল স্বরে বললেন, মন খারাপ ক'রো না। একদিন বুঝতে পারবে, ভুল করি নি। কেমন—মন খারাপ ক'রো না। আচ্ছা—কাল থেকে রেগুলার আসবে।

মাথা নাড়লাম।

ও—পরীক্ষা আসছে বুঝি?

আবার মাথা নাড়লাম।

তাও না? তা হ'লে বুঝি সময় পাচ্ছ না?

চুপ করে রইলাম। যে বুঝেও বুঝবে না, তাকে কি বলব!

আনন্দ বুঝতে চাইলেন না। হাত উঠিয়ে বললেন, আচ্ছা, ভেবে দেখ—আসা যদি অসুবিধা না হয়, আসবে। মনে রেখো রেওয়াজ হচ্ছে সঙ্গীতের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

আমি যাই নি। ইচ্ছে করেই যাই নি। আনন্দকে শ্রদ্ধা করি বলেই যাই নি। শ্রদ্ধার মানুষ চিরদিন উপরে থাকবেন, এই আশা গুণমুগ্ধদের পক্ষে স্বাভাবিক। আনন্দ তা বুঝলেন না। শ্রদ্ধার ভিন্ন অর্থ করলেন। হাঁ—সে কথাও কানে এসেছে বৈ কি! প্রকারান্তরে নাকি বলেছেন—এ ঈর্ষ্যা। এ নাকি মেয়েদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম! হায়, শ্রদ্ধার এই ভুল অর্থটিই উনি ধরলেন! শ্রদ্ধার আর একটি অর্থ ওঁর স্মরণ হ'ল না। উনি বুঝলেন না, শ্রদ্ধার অর্থ এমন পাত্রেই রাখা যায়, যার মধ্যে মিশ্রণ নেই—বিকৃতি নেই। যা খাদ নিষ্কাশিত সুবর্ণের মতই কলঙ্কলেশহীন। সেই হিরণ্ময় পাত্রই শ্রদ্ধা বহনের উপযুক্ত আধার। সেই পাত্রের কথা কোন গল্প-উপন্যাসে কাব্যে নাটকে কিংবা রবীন্দ্রনাথের লিরিক কবিতায় উনি পড়েন নি কি? আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে বসে সঙ্গীত-রস পরিবেশনের মাধ্যমে যে সুরটি সহস্রবার দর্শক-মনে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন, সে কি শুধু দর্শক-মনেরই আহার্য্য? সেই মহা ভাবরসে উদ্বেল না হয়ে, কেমন করে তা পারলেন? সঙ্গীত কি শুধু ব্যাকরণ-সিদ্ধ, ভাবসমৃদ্ধ নয়? অন্তরে উপলব্ধ না হলে, সে রসের স্বরূপ কি শুধু শুকনো ব্যাখ্যায় আস্বাদ করা সম্ভব? কই—আমি ত তা পারি নি? আসরে বসে যন্ত্রে সুর বেঁধে, আমার হৃদয়কে ত তার সঙ্গে না মিলিয়ে নিয়ে পারি নি। সুরের মধ্যে সেই ছবি সর্ব্বক্ষণই আমাকে উদ্দীপিত করেছে। সেই রসবিন্দু হৃদয় থেকে তুলে নিয়ে কণ্ঠে অর্পণ করেছি, তারই উত্তাপে আমার অন্তরসত্তা গানে গানে গলে পড়েছে। এই মন্ত্র-উজ্জীবনে আমার যশ-খ্যাতির প্রতিষ্ঠা। একই আসরে পাশাপাশি বসে সুরে-সুরে আত্মনিবেদনের আরতি চলেছে, আনন্দ ধরতে পারেন নি? অথবা—না, অন্য চিন্তা আমি করব না। আমি ঈর্ষ্যান্বিতা নই, আমি নীচের তলায় বাস করছি না। গানের মাধ্যমে যা সহস্র দর্শকের মনে পৌঁছে গেছে, তা আনন্দকে অন্য অর্থে বিভ্রান্ত করেছে, ও আমি মানব না। আমি বেশ বুঝছি, আনন্দ তাঁর বাসনার নাগপাশে বন্দী হয়েছেন। একটি প্রতিষ্ঠানই ওঁর যশোখ্যাতি অম্লান রাখবে এই আশায় প্রলুব্ধ হয়েছেন। যক্ষপুরীর রাজকন্যা ওঁকে স্বর্গবাসের প্রলোভন দেখাচ্ছেন। সেই মোহপাশ ছিন্ন করা কঠিন।

সেদিন গোলদীঘির ধার দিয়ে আসছি, হঠাৎ একখানা চকচকে মোটর আমার সামনে এসে থামল। রজনীগন্ধার গন্ধে জায়গাটা ভরে উঠল।

মোটরের গর্ভ থেকে একটি মিহি কণ্ঠ ভেসে এল, নমস্কার। ভাল আছেন, প্রতিমাদি।

মাথা নেড়ে স্বীকার করলাম।

কাল আসছেন ত—নিউ এম্পায়ারে? কার্ড পেয়েছেন কি?

একখানা সোনালী বর্ডার দেওয়া কার্ড এগিয়ে দিয়ে বলল, নিশ্চয় করে আসবেন। আমার গাড়িতে যান যদি তুলে নিতে পারি।

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করে গাড়িটা চলে গেল।

পথের আলোয় কার্ডের সোনালী বর্ডার সদ্য পালিশ-করা ছুরির মত ঝক্ ঝক্ করে উঠল। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম হতবুদ্ধির মত।

সুব্রতদা ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

আমাকে দেখতে পেয়ে সুব্রতদা দাঁড়ালেন। কি ব্যাপার, এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ? এই যে, তুমিও দেখছি কার্ড পেয়েছ। যাচ্ছ ত?

চলতে চলতে বললাম, দেখি, যদি সময় করতে পারি—

বল কি, সময় করতে পারি! এমন বিপুল আয়োজন—শহরের সেরা মানুষরা সব নিমন্ত্রিত হয়েছেন—শিল্প-রসিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সম্ভ্রান্ত বণিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর রাজনীতি মঞ্চের নায়করা—কে না আসছেন। এমন সম্ভ্রান্ত ও বিদগ্ধ জনসমাবেশ ইতিপূর্ব্বে খুব কমই হয়েছে শহরে।

ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ সমিতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে—

ও হরি, কার্ডটা এখনও ওল্টান নি? এ একটা নতুন প্রতিষ্ঠান—যা এখনও বাস্তবে জন্মগ্রহণ করে নি, কিন্তু কল্পনায় কায়া লাভ করেছে। তারই প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান। পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকগুলি নাম পাবে, কিন্তু একটি নামই গুরুতর। উনিই যাবতীয় ভার বহন করছেন। তোমারই ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী শ্রীমতী দীপান্বিতা দত্ত।

বলা বাহুল্য—আমি যাই নি।

পরের দিন, সুব্রতদা আবার এসেছিলেন। প্রতিমা, কাল গেলে না কেন? আমরা কিন্তু আশা করেছিলাম তোমাকে।

ফাংশন কেমন হ'ল? কথাটা ঘুরিয়ে নিতে চাইলাম।

চমৎকার। ইউনিক! তবে তোমার নামটাও ওই প্রসঙ্গে তুলেছিলেন কেউ কেউ। আমরাও অভাববোধ করেছিলাম।

আর কেউ গান করেন নি?

হাঁ—আনন্দের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নিয়েছিল। তবু তোমার অভাব ওরা পূরণ করতে পারে নি। শ্রীমতী দত্তও আসরে নেমেছিলেন। আহা—বেচারী!

সুব্রতদা অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলেন। শেষে বললেন, একটা কথা বলে রাখি—গুরুর সঙ্গে মনান্তর ক'রো না—

চমকে উঠলাম, একথা বলছেন কেন সুব্রতদা?

বলছি, কারণ, একটা ঢোক গিলে, ইতস্ততঃ করে সুব্রতদা বললেন, কারণ আনন্দকে কাল বিশেষ খুসি দেখলাম না। ও একবার তোমার নাম করে বললে, তুমি থাকলে প্রোগ্রামটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হত।

কিন্তু উনি ত অনুষ্ঠানের কথা আমাকে জানান নি।

আনন্দ এ অনুষ্ঠানে কোন ভারই গ্রহণ করে নি।

ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীমতী দত্ত। ষ্টেজ ভাড়া থেকে নিমন্ত্রণপত্র বিলি, প্রোগ্রাম তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় ভার ছিল ওঁর উপরে। উনি নিশ্চয় তোমাকে অনুরোধ করেছিলেন? তোমাকে পৌঁছে দেবার কথাও বলেছিলেন!

অভিযোগ করতে পারতাম, প্রবৃত্তি হ'ল না। মনে হ'ল, এতে নিজেকেই খাটো করা হবে। মান-সম্মান নিয়ে যারা অভিযোগ তোলে, তাদের কাঙালপনা আমার ভাল লাগে না। তাদের প্রবৃত্তিকে কটাক্ষ করে একটা প্রবচনই চলিত আছে বাংলায়, কেঁদে মান আর যেচে সোহাগ।

সুব্রতদা বললেন, তোমার হাতে চিঠিও ত দেখেছিলাম। আর বলেছিলাম, হয়ত কাজে কোথাও আটকে গেছ। আনন্দ বলেছিল, আমি জানি।

মৃদুস্বরে বললাম, কিন্তু ওঁর সঙ্গে আজ এক সপ্তাহ আমার দেখা হয় নি।

তবু ত বলল, আমি জানি। কি জানি কি বৃত্তান্ত! তবে একটা কথা বলে রাখি—ওর সঙ্গে প্রোগ্রাম থাকলে অবহেলা ক'রো না, এতে দু' পক্ষের ক্ষতি!

শুকনো গলায় বললাম, কেন ক্ষতি?

জান না কেন? তোমাদের জুটিই এখন···সঙ্গীত-আসরের প্রধান আকর্ষণ। এ জিনিস নষ্ট হলে তোমরাও হারিয়ে যাবে।

তাই কি হয়।

সুব্রতদা বললেন, অত্যন্ত স্বাভাবিক এটা। কত বড় বড় শিল্পী এর জন্য মার খেয়েছেন। যাত্রা থিয়েটারে সিনেমায়, গানের আসরে—কোথায় নয়?

আমি কাতর কণ্ঠে বললাম, এর জন্য কি সব সময়েই শিল্পী দায়ী?

দায়-অদায়ের কথা হচ্ছে না—এটা হয়। আনন্দকে বলেছি একথা। ও প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছে।

প্রকারান্তরে বলছেন কেন?

ও তোমাকে নিয়ে শীগ্‌গিরই আর একটা প্রোগ্রাম করবে। দীপাও বললেন, সেই ভাল হবে।

আবার মন বিমুখ হয়ে উঠল। আমার উপর এত দয়া কেন! আমি তা চাই না। এতে যদি শিল্পী আমির মৃত্যু হয়, হোক। আমার চেয়ে শিল্পীকে কোনক্রমেই বড় হতে দেব না।

পরের সপ্তাহেই আর একটি প্রতিষ্ঠান থেকে নিমন্ত্রণ এল। আনন্দর সঙ্গে সেই পুরণো প্রোগ্রাম। আমার সম্মতি নিতে লোক পাঠিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

মঞ্চে উঠবার মুখে দীপার সঙ্গে দেখা। ও হাসি মুখে বলল, ভাবলাম হয়ত কাজে আটকে পড়বেন! তা যাক, শেষ পর্য্যন্ত এসেছেন, খুব ভালই হ'ল।

তুমিও ত এসেছ।

বাঃ রে, আসব না! আনন্দদা বার বার বলে দিয়েছিলেন, না এলে দুঃখু পাব। আসা চাই। সেদিনের ক্ষোভটা আজ সুদে-আসলে পুষিয়ে দেব। আমাকে ত ভরসা দিয়েছেন ষোল আনার ওপর দু-আনা পাইয়ে দেবেন, অর্থাৎ সুদে-আসলে; এখন দেখা যাক আমার কপাল! বলে হাসতে লাগল।

মনে হতে লাগল—ও ভারি নির্লজ্জ, ভারি কৌশলী। আমাকে আঘাত করার চেষ্টা করছে বারে বারে। এ আসরে কেনই বা এলাম! আজকাল একটি বৃহৎ ছায়া ঘিরে রয়েছে আনন্দকে, সুর-আলাপে স্বচ্ছন্দচারী আনন্দকে আমি কোথায় পাব!

বিস্বাদ মন নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম। সে মন সুরের সুরধুনীতে অবগাহন করতে পারল না। অন্তরের রূপ মূর্ত্তি-সুরে সঙ্গতে ধরা দিল না। সঙ্গীত শেষে দর্শকরা করতালি দিলেন, শুকনো কর্ত্তব্য-সারা করতালি।

আনন্দ বললেন, এমন হ'ল কেন? তাল লয় সুর কোথাও ছন্দপতন হ'ল না—তবু গান জমল না।

আজ কি গানের মেজাজ হারিয়েছ ?

মনে মনে বললাম, সবই ত হারাতে বসেছি।

আচ্ছা, আর একবার চেষ্টা করা যাক। আবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু হলে হবে কি, সেই ছায়াটাকে কিছুতেই সরাতে পারলাম না মন থেকে। এই আসরে আমি নিমন্ত্রিত শিল্পী মাত্র—! আর আসরের কর্তৃত্বভার সমিতির নামে দীপাই চালাচ্ছে। ও আর একটি সমিতি—কিছুতেই স্বীকার করলাম না।

এমনি পর পর আর দুটি আসর হ'ল। আনন্দ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেন আমাকে। শেষ আসরে ব্যর্থ হয়ে আনন্দ বললেন, এখন কিছুদিন আমাদের এক সঙ্গে প্রোগ্রাম না নেওয়াই উচিত দেখছি। কেন এমন হচ্ছে, ভেবে দেখেছ কি ?

আমি মাথা নামিয়ে বললাম, আমি পারছি না! বুঝতে পারছি—আমি ফুরিয়ে আসছি।

আনন্দ বললেন, কিন্তু কেন—আত্মানুসন্ধান করেছ কি ? এক-আধটা আসরে নয়, প্রতিটি আসরে এমন হচ্ছে। এ কেন হবে ?

আমি চুপ করে রইলাম। মনে মনে বললাম, এ হবে না—যদি আপনি ওই বড়-বাড়ীর সংশ্রব ত্যাগ করেন।

জানি না—আমার মনের কথা মুখে-চোখে স্পষ্ট হয়েছিল কি না, আনন্দ কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি অনুমান করছি বিষয়টা। কিন্তু তাই যদি হয়—এ ভারি অন্যায়।

কি অন্যায় ? ভীরু কণ্ঠে বললাম।

এই চিন্তা। আমাদের মধ্যে একটা আণ্ডারস্টাণ্ডিং নিশ্চয় আছে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এটি না থাকলে চলে না। তা ছাড়া, একটু ইতস্তত: করে বললেন আনন্দ, তোমার মনের ভাব খানিকটা বুঝতেও পারি। আমি জানি, আমাদের ভবিষ্যৎ, তা যে ক্ষেত্রেই হোক—কি ভাবে গড়ে উঠবে এটা দু' পক্ষেরই স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। ধারণা থাকা উচিত, আবারও একটু কাল থেমে কি ভাবলেন আনন্দ, পরে বললেন, যে ইচ্ছা মনকে অন্ধভাবে চালায় তা জীবনকে কখনই সার্থক করে না।

মুখ তুলেই নামিয়ে নিলাম, আনন্দ পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে আমায় পরীক্ষা করছেন মনে হ'ল। কেঁপে উঠলাম, এ কি মর্ম্মসন্ধানী দৃষ্টি !

কথাটা পরিষ্কার করলেন না—তবু মনে হ'ল না কোথাও অস্পষ্ট রইল। ভঙ্গি-ভাষণে এইটিই স্পষ্ট হয়ে উঠল, আমার বলবতী ইচ্ছাকে সংযত করতে হবে। এই যে কাছে না থাকার সংশয়, সর্ব্বদা হারাই-হারাই ভাব, এই যে অহেতুক ঈর্ষ্যা—এ বর্জ্জন করতে হবে। ভালবাসাকে এমন অপরিসর ক্ষেত্রে রাখা চলবে না। সোজা কথায় এটা ভৎর্সনা।

মুখ ফিরিয়েই ছিলাম—এবার আঁচলটা উঠিয়ে মুখ মুছতে চাইলাম। একটা প্রচণ্ড বাষ্প-বেগ আমাকে আলোড়িত করে বিদীর্ণ করতে চাইছিল। আমি মৃত্যুকামনা করছিলাম।

মঞ্চ থেকে নেমে আসবার সময় কিছুতেই নিজেকে সম্বরণ করতে পারলাম না। পা টলে গেল। নিজেকে সামলাতে গিয়ে এক হাত দিয়ে সাপটে ধরলাম মঞ্চের একটা অংশ, অন্য হাত থেকে খসে পড়ল এস্রাজটা। ঝন্ ঝন্ শব্দে তারের ধাতব আর্ত্তনাদ করে উঠল। আমি তখন মঞ্চের সিঁড়িতে বসে কাঁপছি।

আশ্চর্য্য যোগাযোগ বাড়ীতে এসেও শান্তি পেলাম না। রাত অবশ্য বেশীই হয়েছিল, চারিদিক ইতিমধ্যে নিশুতি হয়ে আসার কথা। তবু কলকাতায় রাতের বয়স যেন বাড়ে না। অন্য অন্য দিন লক্ষ্য করি, তত রাতেও

দু-একজনের পায়ের শব্দ ওঠে, আলোটা আরও সতেজ দেখায়, ক্রন্দন-ক্লান্ত টানা একটি সুরের রেশ বাতাসে ভাসে, কর্কশ কণ্ঠের কোলাহলও কিন্তু শোনা যায়। মা আমার খাবার ঢেকে রেখে শুয়ে পড়েন, খুট্‌খাট্‌ শব্দ হয়—ইঁদুরেরা খাদ্যের গন্ধ শুঁকে শুঁকে এ ঘর ও ঘর উঠোনময় ছুটোছুটি করে। শুধু বারান্দায় কম-জোরী আলোটা জ্বলে—তাতে যে, রাতের বয়সটা ঠাহর করা যায়।

আজ মা জেগে ছিলেন, বাবাও ঘরে পায়চারি করছিলেন। দ্বিজ দিলীপ ওরাও চৌকির উপর চুপচাপ বসেছিল, শুধু প্রমীলাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

দুয়োরটাও ছিল ভেজানো হাত লাগাতেই খুলে গেল। বারান্দায় পা দিতেই বাড়ীর অস্বাভাবিক চেহারাটা চোখে পড়ল। আমায় দেখে মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। শব্দ করে কাঁদতে পারলেই বুঝি আরাম পেতেন, পারলেন না। বাবা এগিয়ে এলেন আমার কাছে।

আমার নিজেরই মন ভাল ছিল না। ওঁদের এই অবস্থা দেখে ভাবলাম, পৃথিবীটাই কি আজ মনের ধোঁয়ায় এমনি করে রঙ হারাল!

বাবা কাছে এসে প্রায় অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, প্রতিভা এই মাত্র চলে গেল।

চলে গেল! কোথায়?

কোথায় জানি না। তবে আর আসবে না।

এ কি কথা! আসবে না! হতবুদ্ধির মত ওঁর পানে চেয়েই রইলাম।

বাবা চুপি চুপি বললেন, অজয় এসেছিল অনেক দিন পরে। পথে গাড়িতে বসেছিল। তোমার মা জানালা দিয়ে ওকে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ হারালেন। ফিরে এসে দোতলায় উঠলেন। দেখলেন, প্রতিভা টিনের সুটকেসটায় কাপড়-জামা গুছিয়ে রাখছে। বললেন, রাত দুপুরে এসব কি কাণ্ড! এত রাতে অজয়ই-বা কিসের

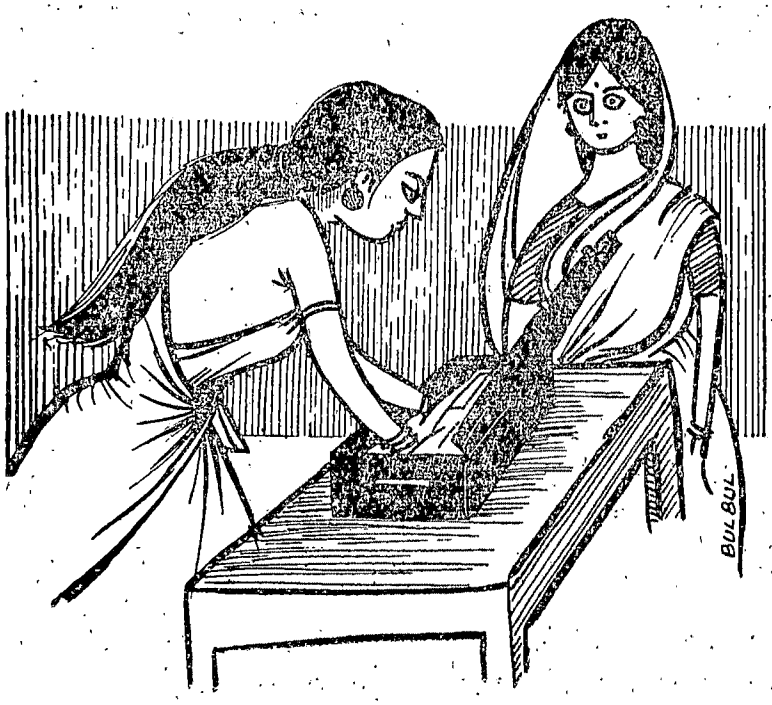

রাত দুপুরে এসব কি কাণ্ড

জন্য এসেছে? প্রতিভার মেজাজটাও ভাল ছিল না। বলল, ও আমাকে ডাকতে এসেছে। আর কিছু জানতে চাও? তোমার মা-ও চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার সংসারে এ সব অনাচার চলবে না।

আমরা নীচের ঘরে ছিলাম, তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখি, সুটকেস হাতে প্রতিভা তর তর করে নেমে আসছে। আমার কোন কথা বলবার সুযোগ দিল না। তাড়াতাড়ি প্রণাম করে চলে গেল, বাবা—আমি চললাম। বেশ বুঝলাম, ওর গলার স্বর ভিজে ভিজে।

সেই রাত কেমন করে কাটল, সে অন্তর্য্যামীই জানেন। মা চাপা গলায় মাঝে মাঝে ফিস্ ফিস্ করছিলেন, ওরা স্বার্থপর—ওরা স্বার্থপর। বাবা অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করেছিলেন। দ্বিজ দিলীপও এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি আস্তে আস্তে উঠে এসেছিলাম দিদির ঘরে।

পরিপাটি করে সাজানো ঘর। ছোট্ট ষ্টীলের র‍্যাকে বইগুলি বর্ণানুক্রমিক করে গোছানো, চিঠিগুলি এক একটি আলাদা লেফাফায় মোড়া—সাল-তারিখ লেখা। একখানা লেফাফায় খান পঞ্চাশেক ছবি, খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া ছবি। যে সব মণীষী মানবহিতের জন্য চিন্তা করেছেন। নূতন সমাজ-ব্যবস্থার কথা বলেছেন, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের ছবি একটা খামে পোরা। আবার শিল্প ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান জন-স্বীকৃতি লাভ করেছে তাঁরাও স্থান পেয়েছেন আর একখানি পত্র-সম্পুটে। ছোট্ট টাইমপিস্‌টা টেবিলের উপরে টিক্ টিক্ করছে, মাটির নক্‌সা-কাটা ফুলদানিতে বাসি রজনীগন্ধার ডাঁটিগুলি, এখনও সতেজ। তিন-চারদিন অন্তর এক এক গোছা ডাঁটি নিয়ে আসত দিদি। কাঁচি দিয়ে গোড়াগুলো কিছু ছেঁটে বসিয়ে দিত ফুলদানিতে—তিন-চারদিন চমৎকার ভাবে ফুটে যেত কুঁড়েগুলি। দিনের বেলায় গন্ধ পাওয়া যেত না, সন্ধ্যার পর ঘরখানিতে এসে বসলে মনটা খুশী হয়ে উঠত। এখন এই গভীর রাতেও গন্ধে ভরে গেছে ঘরখানি। আমার চোখ ছাপিয়ে জলের ধারা নামল।

এই সংসারে কতটুকু মূল্য আমাদের। আমাদের মানে মেয়েদের। একটি নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত এই সংসার আমাদের। তারপর আমরা একটু একটু করে অধিকারচ্যুত হতে থাকি। আইন আজ পিতৃবিত্তে আমাদের অধিকার দিয়েছে, অলিখিত বিধানে আমরা অস্বীকৃত। এই মাত্র মা সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমার সংসারে আমার ইচ্ছাই চলবে, তোমার অনাহূত, অবাঞ্ছিত। তবে এতদিন যে উপার্জ্জন করে সংসারকে ভারমুক্ত করতে চেয়েছ, সে তোমাদের কর্ত্তব্য বলেই করেছ। কর্ত্তব্য না হলেও এতদিন তোমরা আমাদের সুখ-দুঃখে তোমাদের সুখ-দুঃখ মিশিয়েছিলে। অন্য ঘরের চিন্তা ছায়া ফেলে নি তোমাদের মনে। তোমরা এই পরিবারের ইষ্টানিষ্টে একাত্ম ছিলে। আজ আর একজন আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। জানি তোমাদের ডানায় গতিবেগ সঞ্চারিত হচ্ছে—তোমাদের কানে আকাশের ডাক পৌঁছে গেছে, নির্দ্দিষ্ট বয়োসীমা লঙ্ঘন করার দুঃসাহসে তোমরা অনির্দ্দিষ্ট পথের যাত্রী। তোমরা অধিকারচ্যুত হয়েছ।

হাঁ, আমরা অধিকারচ্যুত হয়েছি। দিদির শূন্য শয্যাটা তেমনি পরিপাটি করে পাতা রয়েছে। টান-টান করে চাদর পাতা—বালিশের উপরে ফুলকাটা ঢাকনা, তার নিজের হাতে তোলা ফুল, দু'টি সবুজ পাতার মাঝখানে একটি লাল গোলাপ। রাত জেগে এই গোলাপ ফুলটি কত যত্নে ও তুলেছিল। নিজের সংসারে বসে তুলছে না সে চিন্তা কি একবারও ওর মনে উঠেছিল? তা হলে টকটকে লাল রঙে এত সুন্দর হয়ে কখনোই ফুটত না গোলাপ। ও যে হৃদয়ের রঙে রাঙানো গোলাপ।

কিছুদিন থেকে দিদি ভাবতে শিখেছিল—উপার্জ্জন আমার—সংসার আমার নয়। মা মুখে কিছু বলতেন না বটে, হাব-ভাব চাল-চলনে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তোমার হালচাল পছন্দ করছি না আমি। ওই ছেলেটির সঙ্গে

কিসের এত অন্তরঙ্গতা। মা-ও ত মেয়ে—তবু মেয়ের মন বুঝতে চান নি। মন পুরণো হলে অনুভূতি হারায়, গতি হারায়, ব্যাপ্তি হারায়। মনের এই সংঘাত বাইরে কখনও-সখনও প্রকাশ পায় দুই-একটি কথায়, কখনও তুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। কিন্তু সেগুলি যে অন্তরালে এমন বিস্তৃত বিচ্ছেদের ভূমিকা তৈরী করছিল—সে কে ভাবতে পেরেছে!

দিদি আর ফিরবে না, আমাদের কথা ভাববে না। বলবে না প্রতিমা, কেমন প্রগ্রেস করছ? গানে তোমার নাম হয়েছে, লেখাপড়াতেও যেন পিছিয়ে থেকো না। একটি শিক্ষা আর একটিকে বাদ দিয়ে নয়—দুই মিলিয়ে একটি অঙ্গ সম্পূর্ণ। দুটি পা আছে বলেই চলার ছন্দ—দুটি পায়ে ভর দিয়েই দেহের লাবণ্য। দিদি আর বলবে না—প্রতিমা তোর জন্য আমি ভাবছি—তোরই জন্য—

বিছানায় শুয়ে পড়ে হু হু করে কেঁদে উঠলাম।

প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির পর প্রকৃতির চেহারা যেমন থম থম করে—এ ক'দিন তেমনি লাগছিল সংসারকে। দুর্ঘটনার ছাপটা প্রতিটি মনেই লেগে ছিল, তবু কাজের রথটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। বাবা আহার সেরে যথাসময়ে কাজে যাচ্ছেন, ভায়েরা বাড়ীর বার হচ্ছে। প্রমীলা যাচ্ছে ইস্কুলে। এমনি করে চলছে এই ক'টা দিন। সেদিন মা আপন মনে টুকিটাকি কাজগুলো সারছিলেন, আমি দিদির ঘরে এটা-ওটা গুছিয়ে রাখছি—এমন সময় নীচের কড়া ধরে কে যেন বার দুই-তিন আস্তে আস্তে নাড়া দিল। আমি নেমে এসে সদর খুলে দাঁড়ালাম। কিন্তু এক মুহূর্ত্তকাল আগন্তুকের পানে চেয়ে আমার মন কঠিন হয়ে উঠল। দরজাটা বন্ধ করার জন্য পাল্লায় হাত দিয়েছি—আগন্তুক আহত কণ্ঠে বলে উঠল, দরজা বন্ধ করবেন না, বিশ্বাস করুন, আপনাকে অপমান করার জন্য আসি নি।

কঠিন কণ্ঠে বললাম কি চান?

তেমনি আহত গলায় আগন্তুক বলল, মাত্র তিন-চারটি মিনিট—তাও কি স্পেয়ার করতে পারবেন না? আপনি ত আপনারই এলাকায় রয়েছেন—

আমি আপনাকে ভয় করি না। বললাম।

মৃদু গলায় বলল, জানি। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি।

তাই জানাতে এসেছেন বুঝি? না। ভিতরের জিনিস বাইরে এনে কি লাভ! আমার একটা কথা রাখেন যদি ত বলি।

কথাটা না শুনেই বলতে হবে—

শুনেই মত দেবেন। সেদিন আপনার শরীরটা সুস্থ ছিল না, এস্রাজটা ভেঙ্গে ফেললেন।

তাই কি?

আর একটা এস্রাজ নিশ্চয় কিনবেন।

কিনতে পারি, না-ও পারি।

কেনেনই যদি—আমার সন্ধানে একটি ভাল জিনিস আছে, নেবেন?

ভারি রাগ হ'ল, এমন অযাচিত প্রস্তাব দেবার উনি কে! বললাম, না—নেব না।

আপনি রাগ করছেন। এস্রাজ আপনাকে কিনতেই হবে—যখন—

সুবিধা হলে কিনব, এখন আমার হাতে টাকা নেই।

টাকার জন্য আসবে যাবে না, দাম আপনার সুবিধামত দেবেন।

আপনি যান। আপনার প্রস্তাবটা আমি নিতে পারলাম না। আমি দুঃখিত।

সজোরে দুয়ারটা বন্ধ করে দিলাম।

বাড়ীর মধ্যে আসতেই মা বললেন, ছেলেটি কে রে?

তুমি চিনবে না।

আমি চিনব না! ওঁর গলার স্বরে বিস্ময় আর বিরক্তি ফুটে উঠল।

তুমি বাইরে কখনও যাও না—চিনবে কি করে।

আমি ওকে চিনি। ও দত্ত-বাড়ীর ছেলে—ওকে মোটরে করে যেতে দেখেছি কতবার। কি বলছিল? এস্রাজ দিতে চাইছিল কেন?

রাগ হ'ল মায়ের কথায়। মনে হ'ল, উনি ভিতরে দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনেছেন—আরও জানতে চাইছেন ভিতরের কথা। দিদিকে এমনি সন্দেহ করে করে অশান্তির সৃষ্টি করেছিলেন—আবারও—

বললাম, জানই যদি সব—জিজ্ঞাসা করছ কেন?

ও। মা গুম হয়ে গেলেন। হয়ত আর একটি রাত্রির দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল, সামলে নিলেন। বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে কাজে মন দিলেন—আর উচ্চবাচ্য করলেন না।

এটা আরও বেসুরো লাগল। এ যেন আরও দূরে ঠেলে দেওয়া হ'ল!

সারা দুপুরটা ছটফট করে কাটল। কিছুই ভাল লাগছে না। সকলের উপর খালি খালি রাগ হতে লাগল। খালি মনে হচ্ছে—সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে—সবাই চাইছে ঠেলে দিতে এক কোণে।

সুব্রতদা এলেন সন্ধ্যাবেলায়। বাবার সঙ্গে খানিক কথা বলে, উপরে এলেন। আমি তখন নূতন স্বরলিপির পাতা উল্টাচ্ছিলাম।

চেয়ারে বসে সুব্রতদা বললেন, শুনলাম, সেদিন জলসাতে নাকি এস্রাজটি ভেঙ্গে এসেছ।

হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল।

সুব্রতদা বললেন, ঠিক ত!

কেন? অঠিক হবার কি আছে!

আছে। সবাই বলছে—মানে গুজব, এস্রাজটা নাকি স্ব-ইচ্ছায় ভেঙ্গেছে, যাতে আর জলসায় যোগ দিতে না হয়।

এই অপবাদ মাথা পেতে নেব না। কিন্তু যন্ত্র না ভাঙ্গলেও গানের আসরে বসার যোগ্যতা আমি হারাচ্ছি—এটা বুঝেছেন ত?

সুব্রতদা হাসলেন, আমি ত নয়ই—আর কোন সঙ্গীত-রসিকও এ কথা স্বীকার করবেন না। হয় তোমার ভবিষ্যৎ আচ্ছা নেই, কিংবা মনোযোগ দিচ্ছ না! যাক সে কথা, চোররাগানের মিত্র বাড়ীতে একটা বড় সম্মেলন বসছে—সেখানে তোমাকে পূর্ব্ব গৌরবে ফিরে পেতে চাই আমরা।

মাথা নেড়ে বললাম, পারব না সুব্রতদা—আর কোন আসরেই আমি নামব না।

এটা শুধু আমার প্রস্তাব নয়—আনন্দই বলে পাঠিয়েছে, তোমায় থাকতেই হবে।

ধক্ করে উঠল বুকের মাঝখানটা। আনন্দ অনুরোধ করেছেন? পর পর কয়েকটি আসরে আমার ব্যর্থতার পরিচয় পেয়েও আহ্বান জানিয়েছেন।

নতমুখে বললাম, আমার এস্রাজটা ভেঙ্গে গেছে।

জানি—একটা নতুন এস্রাজের সন্ধান পেয়েছি—দু'একদিন বাজিয়ে ঠিক করে নাও।

আশ্চর্য্য কথা ত! এস্রাজটা যেমন ভেঙ্গে যাওয়ার খবর পেলেন—সঙ্গে সঙ্গে নতুন এস্রাজের হদিশও মিলে গেল! আশ্চর্য্য যোগাযোগ ত!

আমার গলায় প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরটি হয়ত ধরা পড়ল। উনি বললেন, টন্ট কর আর নাই কর—নতুনটা নিয়েই পুরনো নামকে নতুন করে জাগাতে হবে। আচ্ছা এই চিঠিখানা ধর, কাল এস্রাজ পৌঁছে দেব।

কিন্তু হাতে টাকা নেই আমার।

আমি এমন মহাজন ঠিক করে দেব না যে—টাকার জন্য কাবলি-তাগাদা লাগাবে। বলে হাসতে হাসতে নেমে গেলেন সুব্রতদা।

লেফাফা খুলে চিঠিখানা পড়তে লাগলাম।

সুচরিতাসু,

সব প্রথমেই অনুরোধ করে রাখছি—চিঠির সবটা পড়ে নেবেন দয়া করে। উত্তর আমি চাইছি না অবিলম্বে এবং এ-ও বলছি না আমার প্রস্তাবটি নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করুন। তবে গ্রহণ করেন যদি সেটা আশাতীত সৌভাগ্য বলেই গণ্য করব।

আপনাকে শ্রদ্ধা করি এ কথাটা বার বার জানিয়ে লাভ নেই, সব কিছুই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। এবং আমিও আশা রাখি এই সত্য একদিন-না-একদিন প্রকাশ পাবেই। সেদিন হয়ত সামনে থাকব না, কথাটা স্মরণ রাখবেন।

সেই পুরাতন ধৃষ্ট প্রস্তাবটিই আর একবার সামনে রাখছি। এস্রাজটা দয়া করে গ্রহণ করুন। মূল্য দিয়েই নিন। অন্য আশা আমার পক্ষে বাতুলতা। সামনের সঙ্গীত-সম্মিলনে আপনাকে পূর্ব্বের মহিমায় দেখতে চাই। বাংলা দেশের সঙ্গীত-রসিকদের চিত্তে আপনি কতখানি আশা-আনন্দ জাগিয়েছেন সে যদি জানতেন—ত কিছুতেই এই অনীহা আপনার থাকত না। আপনি নিশ্চয় জানতেন—শিল্পী যখন বহু চিত্তে আনন্দ জাগাতে সক্ষম হন—তখন বহু মানুষের শ্রদ্ধায় দাবি তাঁকে সঙ্গত কারণেই রক্ষা করতে হয়। এটি শিল্পীর সামাজিক কর্ত্তব্য। আপনি কেন কর্ত্তব্যচ্যুত হবেন! এ ভাবলেও মন খারাপ হয়।

এটা উপদেশ কি তত্ত্বকথার মত লাগে যদি ক্ষমা করবেন—মনের বেদনা আর কি বলেই বা প্রকাশ করতে পারি? শ্রদ্ধান্তে…

জনৈক গুণমুগ্ধ।

…চিঠিখানা একপাশে রেখে গুণমুগ্ধ মানুষটির চেহারা একবার মিলিয়ে নিলাম। না, পরিচয় অস্পষ্ট নয়—কোথাও ছায়াভাস নাই! আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ওর! অদ্ভুত নির্লজ্জ ও ধৃষ্ট। বারে বারে কুগ্রহের মত কেন ও আমাদের কক্ষপথে উদয় হচ্ছে? সমস্ত জেনেশুনেও আমার সম্ভ্রম শালীনতার উপর রূঢ় হস্তক্ষেপ করতে চাইছে! ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে আমাকে প্রলুব্ধ করতে চাইছে। আমি গৌরব লাভ করি না করি ওর কি ক্ষতিবৃদ্ধি! এটা নিশ্চয় ওর কথা নয়—পিছনে আর একটি কণ্ঠস্বর, তারই প্রতিধ্বনি। ওরা আমায় ধূলোয় নামাবার ষড়যন্ত্র করেছে।

ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। চিঠিখানা তুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিলাম। ভারি রাগ হ'ল সুব্রতদার উপর। উনিও এই অশিষ্ট মানুষটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? এই চক্রান্তের জালে উনিও ধরা পড়েছেন! এই সংসারের পরমহিতকামী সুব্রতদাও—

আর ভাবতে পারলাম না, উত্তেজিত ভাবেই বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী থেকে।

এখনই, এই দণ্ডে, সুব্রতদার সঙ্গে আলোচনা করে নিয়ে এই ঘটনার ইতি করব। না, আর নয়।

বাইরের ঘরেই ছিলেন সুব্রতদা। আমি হাঁপাচ্ছি দেখে বললেন, কি ব্যাপার—হঠাৎ ছুটতে ছুটতে কেন? কারও কি অসুখ-বিসুখ—

না। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

কি আশ্চর্য্য! এই ত আধ ঘণ্টাও হয় নি—ওখান থেকে আসছি—তখনও কি কথাটা মনে পড়ল না!

আপনার দেওয়া চিঠিখানা পড়ে এটা মনে হল।···আচ্ছা সুব্রতদা, আপনি কেন ওই লোকটার চিঠি আমাকে দিয়ে এলেন?

বস, বস স্থির হয়ে। সুব্রতদা পাখার রেগুলেটার বাড়িয়ে দিয়ে আমার সামনে এসে বসলেন। বললেন, ওটা তোমারই চিঠি···

আমি তা বলছি না—ওর চিঠি।

বুঝেছি, লোকটার সম্বন্ধেই তোমার আপত্তি! কিন্তু তুমি হয়ত জান না—অসময় আমাদের লাইব্রেরীর একজন উৎসাহী সভ্য এবং পৃষ্ঠপোষক। নতুন যে ঘরটিতে আমাদের পাঠাগারটি এখন চলছে—ওরই ব্যবস্থায় সেটা সম্ভব হয়েছে।

এমন লোককে আপনারা কেন যে—

কথা শেষ হবার আগে সুব্রতদা হেসে উঠলেন। বললেন, স্থির হও, সব বলছি। ওকে যতটা মন্দ মনে করছ—আসলে ততটা মন্দ ও নয়। আমরা ত ওকে দীর্ঘকাল ধরে জানি—

না, জানেন না। বাইরের পোশাকেই আপনারা ওকে দেখছেন—বাইরের পরিচয়টাই জানেন শুধু।

সুব্রতদা বললেন, একটু খুলে বল। তোমার সঙ্গে ও কি দুর্ব্যবহার করেছে?

সে কথা বলা যায় না। তবে ওরই জন্যে আমি দত্ত-বাড়ীর চাকরিটা ছেড়ে দিলাম—সে হয়ত আপনি জানেন না।

এই কথায় সুব্রতদার কপালে কয়েকটি রেখা ফুটে উঠল—উনি অল্পক্ষণের মধ্যে গভীর ভাবে কি যেন চিন্তা করে নিলেন। দু-একটি মিনিট মাত্র। পরে ধীরে ধীরে রেখাগুলো মিলিয়ে গেল। অল্প হাসির রেখা ফুটল ওর মুখে। বললেন, প্রতিমা, তোমার অভিযোগের গতি-প্রকৃতি যেন খানিকটা ধরতে পারছি। ও নিশ্চয় এমন নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করেছে, যার জন্য—

আমি ক্রুদ্ধ হয়ে বললাম, হাসবেন না, আপনাদের প্রশ্রয় পেয়েই হয়ত—

সুব্রতদা বললেন, প্রশ্রয়? হাঁ, তা প্রশ্রয়ও বলতে পারি। কলেজে থেকেই আমরা ওকে নিয়ে পরিহাস করছি—ও প্রশ্রয় লাভ করছে। কেন জান? ও একবার হঠাৎ কবিতা লিখতে সুরু করল। আমাদের ডিবেটিং ক্লাবে নিজেদের লেখা নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম, কখনও বা বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কীর্ত্তি নিয়ে; ও একদিন হঠাৎ বলে বসল, আমাকে নিয়েও তোমরা একদিন আলোচনা করবে। আমরা এক সঙ্গে হেসে উঠলাম, সে ত অনেকদিন থেকেই করছি—তুমি কলেজে ঢোকা ইস্তক।

কেন হাসলাম জান? ও ভারি সেন্টিমেণ্টাল, ক্লাসে কোন ছেলের সঙ্গে হঠাৎ ভাব জমিয়ে নিতেও যতক্ষণ—আবার তুচ্ছ কারণে তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হতেও ততক্ষণ। যখন ভাব জমালে, সে একেবারে যেন ভাবের বন্যা।

মোটরে চেপে কলেজে আসা, লেক সিনেমা ঘোরান, সেরা সেরা রেস্তোরাঁয় নিয়ে টিফিন নেওয়া আর সঙ্গীত সম্মিলনে সবচেয়ে দামি টিকিটি কেনা সব দিক দিয়ে নাকানি-চোপানি খাওয়ানোর চেষ্টা। আমিও একবার ওর পাল্লায় পড়েছিলাম। আর সেই থেকে গানের আসরের নেশাটা আমাকে পেয়ে বসেছে। তবে এখনও নিজের পয়সা খরচ করে আনন্দ লাভ করতে হয় নি—ওরই কৃপায় এটা জোর আছে। একেবারে টিকিট কিনে এনে ও টান দেয় কি না!

আরও অনেক মজার মজার ঘটনা ওকে নিয়ে হয়েছে—সে বৃত্তান্ত থাক। ওর আরও একটা হবি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ? আড়ম্বর-প্রিয়তা। বেশবাসে সর্ব্বদা নিখুঁত থাকার চেষ্টা—এবং সবার চেয়ে উৎকৃষ্ট জিনিস ব্যবহার করার প্রবণতার জন্যে আমরা ওর নামের আগে পাঁচটি শ্রী ব্যবহার করে প্রায়ই চিঠি লিখি। এবং সম্বোধন করি পঞ্চশ্রী বলে। ও তাতে খুসি বই অখুসি নয়। এটা এখনও চলছে।

ক্লাসে ওর চেয়ে দামী পোশাক কেউ পরতে পারে না। ঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন, চশমা সবেতেই ও শ্রেষ্ঠ। ও বিশেষ ধরনের একটা সেণ্ট ব্যবহার করে—যা না কি প্যারিসের তৈরি। আমরা বহু চেষ্টা করেও সেই সেণ্টের নাম জানতে পারি নি।

আমি অধৈর্য্য হয়ে বললাম, বড্ড বাড়িয়ে বলছেন সুব্রতদা।

মোটেই না। ওর বাড়াবাড়ির বৃত্তান্ত আরও বহু আছে, অন্তত তার সিকি ভাগ না বললে মানুষটাকে চেনানো যাবে না। যেহেতু তোমার অভিযোগ গুরুতর—আমার ভূমিকাও সেই হেতু দীর্ঘতর করতে হচ্ছে। হাঁ, ওর নোট-বইয়ের ও পাঠ্য-পুস্তকের অঙ্গসজ্জাও কম লোভনীয় ছিল না। মোট কথা, বাহ্যিক যা কিছু বস্তু ও রূপসজ্জা—সব দিক থেকেই ও অনতিক্রম্য। এ হেন পঞ্চশ্রী একদিন ডিবেটিং ক্লাব থেকে বা'র হয়েই ঘোষণা করল, আমি কবিতা লিখব। শুধু লিখবই না—তার জন্য তোমরা আমাকে স্মরণ করবে—সেই লেখা নিয়ে আলোচনা করবে। যে কথা, সেই কাজ। মরক্কো চামড়া-বাঁধানো দামী খাতাটা দেখে আমরা পরস্পরের পানে চেয়ে হেসেছিলাম। পঞ্চশ্রী আমাদের নূতন একটি কৌতুকের রসদ যোগাবেন ভেবে উৎফুল্ল হয়েছিলাম। দিন কয়েক এ নিয়ে কাটল ভাল। তার পর পঞ্চশ্রীর অভিলাষ হল—কণ্ঠসঙ্গীত আয়ত্ত করবেন। কিন্তু কণ্ঠ ত ঈশ্বর দত্ত বস্তু—হাজার প্রসাধনেও তায় কর্কশত্ব ঘোচান সম্ভব হয় না। হতাশ হয়ে পঞ্চশ্রী ধরলেন যন্ত্র-সঙ্গীতের পথ। সে পথও সুপথ ছিল না ওঁর পক্ষে। হারমোনিয়ম থেকে আরম্ভ করে কয়েকটি যন্ত্র এ যাবৎ কিনেছেন—বেহালা, পিকলু আর গীটার। সম্প্রতি এসেছে এস্রাজ। এখন বোধ করি শেষেরটাই ওর হেফাজতে আছে, বাকী ক'টি সুরে ধরা দেয় নি বলে পঞ্চশ্রীও ধরে রাখেন নি। হারমোনিয়মটা সমিতিজাত হয়েছে, বেহালাটি এসেছে আমার অধিকারে। ওই দেখ দেয়ালে, ভেলভেট ঢাকনিতে দোদুল্যমান। পিকলু গেছে আমাদেরই এক সতীর্থের ঘরে। হাঁ, হিসাবে ভুল হচ্ছে, গীটারটাও কাছে আছে। ওটা নাকি সবচেয়ে সহজে শেখা যায় এবং পঞ্চশ্রী কিছুটা আয়ত্তও করেছেন। আর আছে এস্রাজ। তা সেটিও হস্তান্তরিত হবার উপক্রম করছে। শিক্ষালাভ কষ্টসাধ্য বলে নয়—

বললাম, আপনার পঞ্চশ্রীর গুণ-ব্যাখ্যান যথেষ্ট করেছেন—আর নয়।

সুব্রতদা বললেন, যথেষ্ট করি নি—ওঁর কীর্ত্তিকলাপের ক্ষণস্থায়ী চিহ্নগুলির পরিচয় খানিকটা দিয়েছি মাত্র। কিন্তু এর থেকে কি বুঝতে পার নি, নিজেকে উনি কি পরিমাণে বস্তু থেকে আসক্তিহীন রেখেছেন, ওঁর ভালবাসার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা চিরকালই সন্দেহ পোষণ করে আসছি এবং তোমাকেও আশ্বস্ত করতে পারি এ প্রীতি রবে না চিরদিন।

আপনি তা হলে সমস্ত জেনে-শুনেই ওঁর চিঠিখানা আমায় দিয়েছিলেন আর এস্রাজ কেনার কথাও তুলেছিলেন ?

সুব্রতদা বললেন, সম্পূর্ণ চার্জ্জটা আমি মেনে নিচ্ছি না। পত্রের বিষয়বস্তু আমার অজানা, তবে এস্রাজ-রহস্য আমার অজ্ঞাত নয়। আর সেটা এমন দোষেরই বা কি ?

আপনাদের কাছে কৌতুকের বস্তু কিন্তু আমি মনে করি, অপরাধ।

অপরাধ-! কিসে ? একটু কাল চিন্তা করে নিয়ে বললেন, বুঝেছি। কিন্তু এটা ওর নির্দ্দোষ অনুরাগ বলে নিতে পারছ না কেন ?

পারছি না, যেহেতু আমি মেয়ে। যেহেতু আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ নয়।

সুব্রতদা বললেন, ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় কি ভাবে হয় জানি না! সে কি শুধু বাক্যের দৌলতে, না সর্ব্বদা মেলামেশার দাক্ষিণ্যে ? আমি ত মনে করি—ঘনিষ্ঠতা কাছে এলেই হয় না, দূরে থেকেও লাভ করা যায়। ও হয়ত সেই অধিকারে—

ধোঁয়াটে কথা বলবেন না সুব্রতদা, উনি মোটেই শিষ্ট নন।

সুব্রতদা বললেন, তা হলে চোরবাগানের নিমন্ত্রণটা নেবে না ?

না।

পরের কাছে এস্রাজ ধার করে গানের মজলিসে বসবে না ? কিংবা একটা সুযোগ পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করবে না ?

কিসের সুযোগ ! আমি যদি না যাই···

সুব্রতদা গম্ভীর হয়ে গেলেন হঠাৎ। বললেন, প্রতিমা, জানতাম তুমি বুদ্ধিমতী। ভেবেছিলাম হাওয়া কোন্ দিকে বইছে এটা অন্তত অনুমান করে নিয়েছ !

ওঁর এই কথায় বুকের মধ্যেটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কেমন যেন শূন্য-শূন্য ভাব। কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন সুব্রতদা ?

সুব্রতদা বললেন, শুনেছি মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে একটা ইন্দ্রিয় আছে—যার দ্বারা ভাবী ঘটনার আভাস ধরা যায়। যাদের উপর আসক্তি অনুরাগ মায়া যাই বল খুবই প্রবল, তাদেরই সম্বন্ধে এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব সজাগ। এবং সম্বন্ধেও যেখানে ইষ্টানিষ্ট-বোধের তীব্রতা বেশী, যে ঘটনার দ্বারা জীবন-গতিই যায় বদলে, সেখানেও এর ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অথচ তোমার জীবনের যে সন্ধিক্ষণ উপস্থিত তার সম্বন্ধে তুমি কিছুমাত্র সচেতন নও ! আশ্চর্য্য !

ওঁর এই কথায় বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। কি জানি, তবে কি আমি সব হারাতে বসেছি ? আমার সর্ব্বস্ব—

আমার চোখ দিয়ে হয়ত জল পড়ছিল, হয়ত খুবই অস্থির হয়েছিলাম। আমার পানে চেয়ে শান্ত গলায় বললেন সুব্রতদা, স্থির হও, যা বলছি স্থির হয়ে শোন।

একখানা চিঠি প্যাডের তলা থেকে টেনে নিলেন সুব্রতদা। সেখানা আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, তার আগে এখানা পড়ে নাও। ওই পঞ্চশ্রীর লেখা। ওর বিষয়বস্তু মোটামুটি আমি জানি। আমাকে এই একটু আগে বলে গেছে। ও যে এমন ভাবপ্রবণ, আমাদের ভাষায় নির্ব্বোধ, কিন্তু ওরও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এত সজাগ হবে কল্পনা করি নি। ওর কথা শুনে ওকে নির্ব্বোধ ভাবতে পারছি না।

আমার হাত কাঁপছিল, চিঠিখানা তুলে নিতে ইচ্ছা হচ্ছিল, অথচ পারছিলাম না। একজন তৃতীয় ব্যক্তির সামনে ও চিঠি স্পর্শ করতে বাধছিল। আমার দুর্ব্বল বাসনাকে উন্মোচন করতে লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম।

সুব্রতদা বললেন, পড় কিংবা নাই পড়, ওর মোটামুটি তাৎপর্য্য ওই এস্রাজটা গ্রহণ করার জন্য শেষ অনুরোধ। সেটা নাকি তোমার জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। যাই হোক, পড়ে নাও চিঠি, আমার বক্তব্য তা হলে সরল হবে।

লেফাফা খুলে চিঠিটা পড়ে নিলাম :

সচরিতাসু,

আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি আমার চিঠিখানা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত পড়েন নি। কিংবা পড়েও কুচি কুচি করে ফেলে দিয়েছেন। তাই আবার এই পত্র লিখছি। আমার সরলতা, সততা আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয় জানি। বিসদৃশ আচরণের জন্য মনে আপনার বিরূপতা জন্মিয়েছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার স্বভাবটাই ওই রকম। একটি নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে বাস করতে না পারলে তৃপ্তি পাই না। সব বিষয়ে একটা চমক দিতে না পারলে নিজেকে নিষ্ফল মনে হয়। এর জন্য অনেক অপবাদ কুড়িয়েছি, উপহাসাস্পদ হয়েছি, কিন্তু স্বভাবকে অতিক্রম করা সহজ না কি। আমি পারলাম না, তাই আর একবার, শেষ বার আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি এস্রাজটি গ্রহণ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন গুণী-সমাজে। আমাদের প্রতিভা নেই, সাধনা নেই, নিষ্ঠা নেই, আমরা কোনদিনই লাইম লাইটের সামনে দাঁড়াতে পারব না। আপনি সামনে এসেছেন, আবার কেন অন্তরালে চলে যাবেন? অন্তরাল মানেই ত অন্ধকার। অন্ধকারই ত অগৌরব। এবং মৃত্যু। দোহাই আপনার, আমার প্রতি ক্রোধান্ধ হয়ে নিজেকে বিলুপ্ত করবেন না। ইতি

গুণমুগ্ধ অনুময়।

খোলা চিঠি হাতে করে স্থাণুর মত বসে রইলাম।

সুব্রতদা বললেন, এইবার আমার কথাটা শোন। ও যা বলতে চায় তার অর্থ তোমার খ্যাতি-গৌরবে ঈর্ষ্যান্বিত একটি দল চাইছে যাতে তুমি গানের আসরে হাস্যাস্পদ হও। কিছুদিন থেকেই এটা চলছে। আর তুমি সেই দলের কোন কোন প্রধানকে জান। কয়েকটি সঙ্গীতের-আসরে পর পর ব্যর্থতার পর তারা উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। তোমার ব্যর্থতার কারণটিও ওরা মোটামুটি ধরতে পেরেছে—আর সেই পথেই চালাতে চাইছে আক্রমণ। আমরা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়ে। অঢেল অর্থ আমাদের নেই যে এক জায়গায় ঘা খেয়ে অন্য একটা উপায়ে সংসারে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারব। সামান্য চাকরি করে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না—কোন রকমে জীবনধারণ হয়। সেই জীবনে হাজার হাজার মানুষ রয়েওছে, তবু সে জীবন তোমার নয়। তোমার প্রতিষ্ঠা হরণের ষড়যন্ত্র, তার অর্থ বোঝ নিশ্চয়। অগৌরব—মৃত্যু। সেই অগৌরবের মৃত্যু কি চাও?

দলটা মতলব করে একটি নিখিল ভারত সঙ্গীত-সম্মিলনের মতই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। সেটা শ্যাম পার্কে কিংবা মহাজাতি সদনে কিংবা আর কোথাও হবে। শীঘ্রই হবে। সেখানে ভারতের প্রায় সব বড় গাইয়ে-বাজিয়েরা আসবেন—তাঁরা শুধু গাইবেন না—বিচার সভায় বসবেন। তাঁদের রায়ে বাংলার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পীর মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন গ্রুপে বিভিন্ন শিল্পী নির্বাচিত হবে। তুমি যাতে নির্ব্বাচিত না হও—তারই চেষ্টা হচ্ছে। আনন্দর সঙ্গে তোমার বিভেদ সৃষ্টি না করলে ওদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, ওরা সেই সুযোগ নিতে চাইছে।

সুব্রতদা চুপ করলেন। আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ওঁর শেষ কথাটা নিয়ে মনে মনে তোলা-পাড়া করতে লাগলাম।

আমাকে চিন্তান্বিত দেখে সুব্রতদা বললেন, আনন্দর সঙ্গে তোমার যে প্রীতির সম্বন্ধ সেটা ওরা সমূলে নষ্ট

করতে চায়। এ ক্ষেত্রেও কালোবাজারী-কেরামতি, গানের কালোবাজার হয়, শুনেছ কখনও?

গানের কালোবাজার!

হাঁ, যা সোজা পথ দিয়ে হাঁটে না, তাই কালোবাজারে ভিড় জমায়। টেপ রেকর্ডার বসিয়ে সাদাকে কালো করা খুবই ত সহজ। তোমার সঙ্গে কণ্ঠ দিয়ে আনন্দ কিছু দ্বৈত-সঙ্গীত রেকর্ড করিয়েছেন—সেগুলো এখন কালো-বাজারে চালু করার চেষ্টা চলছে অন্য নামে। সঙ্গীত-শিক্ষালয়ের আর্থিক উন্নতির জন্য আনন্দর কিছু টাকার প্রয়োজন। যে কোন উপায়ে আনন্দ তা সংগ্রহ করবেই।

এই সুযোগ নিয়ে তোমার বিরুদ্ধ-পার্টি আনন্দকে কাছে টানতে চায়, টাকার প্রলোভন দেখিয়ে। সেই সম্মিলনের শেষে ওরা একটি মূল্যবান ঘোষণা দেবে স্থির করেছে। তাতে এক ঢিলে দুই পাখী জখম হবে।

আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনতে লাগলাম।

সুব্রতদা বললেন, আসলে চোরবাগানের সম্মিলন আমরাই আহ্বান করছি। বলতে পার তোমাদের গুণমুগ্ধের দল। এর প্রধান উদ্যোগী কে যথাসময়ে জানতে পারবে। যে সব শিল্পী বাইরে থেকে আসছেন নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁরা এই আসরে গাইবেন না। অবশ্য কেউ কেউ সঙ্গত করতে পারেন। আমাদের আসরের স্থায়িত্বকাল মাত্র তিন-চার ঘণ্টা। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত। প্রোগ্রাম: একজনমাত্র বিখ্যাত স্থানীয় শিল্পীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর আনন্দ ও তোমার গান। অতিথি-শিল্পীরা বসবেন শ্রোতার আসনে। তোমার সম্বন্ধে একটি উচ্চ ধারণা যাতে ওঁদের জন্মায়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা প্রোগ্রাম তৈরি করব। এখন ভাল করে ভেবে দেখ এই চ্যালেঞ্জ তুমি গ্রহণ করবে কি না? না যদি গ্রহণ কর—

আমি বললাম, চ্যালেঞ্জ হিসাবে এটা গ্রহণযোগ্য কি না জানি না, কিন্তু সুব্রতদা, বাঁচবার অধিকার আমারও আছে। আমি বাঁচতে চাই।

সুব্রতদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, এই ত চাই। এখন নিশ্চয় এস্রাজটা নিতে কোন আপত্তি করবে না?

বললাম, না। আপত্তি আমার এই কারণে নূতন কোন কৌশল এর মধ্যে আছে কি না—

তুমি নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে পার। আমাকে বিশ্বাস কর যদি—

আপনাকে বিশ্বাস করব না! লজ্জায় মাথা আমার নুয়ে পড়ল।

সুব্রতদা বললেন, আর একটা কথা—অনুষ্ঠানের দিন, তোমাকেই আগু বাড়িয়ে আহ্বান জানাতে হবে আনন্দকে।

আমি বিপন্ন মুখে বললাম, ওঁকে কোথায় পাব আমি?

যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করব আমরা, না হয় ওর সঙ্গে একদিন দেখাই কর।

মাথা নামিয়ে বললাম, উনি পছন্দ করেন না।

কি পছন্দ করেন না? একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আচ্ছা, তবে সুবিধামত কোন উপায় খুঁজে নাও। মোট কথা পিছু হটলে হবে না—এ তোমার জীবন-মরণের সমস্যা।

আমারই চিন্তার প্রতিধ্বনি তুললেন সুব্রতদা।

আমি চলে আসছিলাম—সুব্রতদা বললেন, কাল আমাকে ফাইন্যাল কথা দিয়ে যাবে, কেমন?

বললাম, কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব না। দিন, এস্রাজটা দিন।

হাসলেন সুব্রতদা। বললেন, সন্ধ্যেবেলায় পাঠিয়ে দেব।

বাড়ী ঢুকবার মুখে একটা কোলাহল কানে গেল। বাড়ীর ভিতর থেকেই উঠছে গোলমালটা। মায়ের কণ্ঠস্বরই প্রবল—দিলীপের গলাও শোনা যাচ্ছে এক একবার।

দিলীপ বলছে, স্পষ্ট করে বল না কেন—বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

কথাটা বলতে তোর বাধলো না?

মায়ের গলা শুনলাম, কথাটা বলতে তোর বাধলো না? উপযুক্ত ছেলে, বসে বসে দিন কাটাবি, আর একটা মানুষ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মুখে রক্ত তুলে খেটে মরবে! আর সংসারের ভাবনা-চিন্তা নিয়ে আমারও হয়েছে হাড়ীর হাল।

দিলীপের গলা শুনলাম। কাজের চেষ্টা করছি না বুঝি? হাঁটতে হাঁটতে জুতোর শুকতলা পর্য্যন্ত ক্ষয় হয়ে গেল, তবু শালার চাকরি—

সদর ঠেলে বাড়ীতে ঢুকে দিলীপকে ধমক দিলাম, ছি—কি হচ্ছে? বেকার আছ বলে মুখের ভাষাটাও কি রকের ভাষা হবে?

দিলীপ নালিশ করলে, মা ত শুধু বকেই খালাস, চাকরির বাজার যে কি টাইট।

আবার! যাও, খেয়ে নিয়ে খানিক বই খুলে বস গে—

লিখে-পড়ে ত সবই হবে! দিলীপ ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল।

অন্তত শিক্ষিত-সমাজে বসবার যোগ্যতা লাভ করবে। একটা কাজ কর না কেন? সেলাইএর কাজটা শিখে ফেল না তাড়াতাড়ি।

শেলাই! মেয়েদের কাজ! ওর মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটল।

বললাম, মেয়েরা যেশিক্ষার ক্ষেত্রে, চাকরির ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে বুঝি লজ্জা হয় না? বেকার পুরুষ সব দেশেই লজ্জার বস্তু।

মা বললেন, যাক, এখন তর্কাতর্কি, কথা কাটাকাটি না করে খেয়ে-দেয়ে নাও। আমাকে হেঁসেল থেকে রেহাই দাও। বকছি সাধ করে—ঘরে এক দানা চাল নেই, চিনি নেই, ডাল নেই। ছোটবাবু বললেন, কাল সকালে বলো এনে দেব। বললাম এখন কি রাজকার্য্যে ব্যস্ত আছ? বললেন, বুঝবে না। কাল এনে দিলেই ত হল। বড়বাবুও মুখ করছেন, পারব না। যত চোর-দায়ে যেন ধরা পড়েছি আমরা, দুই বুড়ো-বুড়ী।

দিলীপকে বললাম, দোকানের কাজটা মিটিয়ে যেখানে খুসি যাও না ভাই।

দিলীপ মুখ গোঁজ করে বলল, কেন, ছোটবাবু পারল না? ওর ঘুড়ি ওড়ানোটাই বড় হ'ল? আমার বলে আজ মোহনবাগানের ম্যাচ রয়েছে, কোন্ স কাল থেকে মাঠে লাইন লাগিয়েছে নীরু বক্সু ছুটকু। খেয়েই না ছুটলে ইটখানা ওরা রাখতে পারবে? ইটখানা গেলেই ত খেলা দেখার বারোটা বাজিয়ে দেবে!

ছি! আবার ওকে মৃদু ধমক দিলাম। এই উঠতি বয়সের ছেলেগুলো কি! এরা বিদ্যা-শিক্ষার ক্ষেত্রে যত না পিছু হটছে, শিক্ষা সহবতের পরীক্ষায় একেবারে দেউলে হবার উপক্রম! এদের যত না কর্ম্মোৎসাহ, তর্কে পরাক্রম তার শতগুণ বেশী। এরা কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করে নিজেদের বুদ্ধি জাহির করে উৎফুল্ল। কিন্তু শেষ মারটা কোথায় এসে পড়ছে সে কি একবারও ভাবছে না!

দিলীপ কথা শুনল না, গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। এঁটো বাসন উঠিয়ে নিয়ে কলতলার দিকে যাবার উপক্রম করতেই মা বললেন, থাক, থালাখানা আমিই মাজতে পারব।

মায়ের কণ্ঠের প্রচ্ছন্ন শ্লেষটুকু ধরতে পারলাম। কিন্তু তাতেই বা কি ফল। আমরা ত কোনদিনই ওঁকে সাহায্য করতে পারি না। সাহায্য করতে দেন না উনি। উনি বলেন, থাক, থাক। নিজের সংসার হলে খাটতে খাটতে হাড়-মাসের বাঁধন ঢিলে হয়ে যাবে—এখন বরং একটু আরাম করে নাও। অর্থের জোর নেই—তেমন বরাতও কর নি, তা হলে এমন ঘরেই বা আসবে কেন! দুটো দিন তবু জিরিয়ে নাও।

ছেলেবেলা থেকে দেখছি সংসারকে। শতছিদ্রময় সংসারে শত তালি দেওয়ার চেষ্টা চলছে অহরহ। ছেলেবেলা থেকে শুনছি, অভাব-অনটন দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা। না স্বাস্থ্যে, না বিদ্যায়, না বা উন্নত মানসিকতায় আমরা পৃথিবীর উন্নত মানুষগুলির পাশে বসবার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারছি! অথচ আমরা স্বাধীন। প্রাচীন কালে সাংস্কৃতিক অবদানে আমরা পৃথিবীর বহু অংশকে নাকি আলোকিত করেছি! আমাদের বিদ্যার, সমাজ ব্যবস্থার, আধ্যাত্মিকতার গৌরব-কথা দেশে দেশে বিঘোষিত। স্বাধীন হয়ে সেই গৌরবভূমি থেকে আমরা এত তাড়াতাড়ি নেমে পড়ছি কেন? দেশ জুড়ে খাদ্যাভাব—বস্ত্রাভাব—হাহাকার! দুর্নীতির কালোবাজারে ছাওয়া দেশ, চরিত্রহারা, ব্যবসায়ী, মাংস-গৃধ্নু, শকুনির মত লোলুপ দৃষ্টি ফেলে রেখেছে অর্থ সঞ্চয়ের দিকে। আমরা তলিয়ে যাচ্ছি সর্ব্বনাশের অতল গহ্বরে। কেন? কেন? কে দায়ী এর জন্য?

খুব বেশিক্ষণ এই চিন্তা রইল না। দোতলার ঘরটিতে পৌঁছতে যতটুকু সময় গেল, ততটুকুই সংসার, চলল আমার পিছু পিছু। তার পর সংসার সরে গেল, রইলাম আমি। আমরা সবাই মিলে, মা-বাবা ভাই-বোন, সবাই মিলে সংসার, অথচ তারই মধ্যে সবচেয়ে প্রবল আমি। এই সংসারে আমি আছি, এই সংসারের হয়ে কোন-না-কোন সময়ে চিন্তাও করছি আমি—কিন্তু পুরোপুরি আমি এখানকার নই। সংসারের মধ্যে আমার ঘরখানি আলাদা, চিন্তার ক্ষেত্রটি আলাদা। সেইখানেই বুঝি আরও একটি সংসার রচনার কাজ চলছে আমাকে নিয়ে। এই ইঙ্গিতই মাঝে মাঝে মা দিয়ে থাকেন। বড় নিষ্ঠুর সত্য এটি। আমরা জোর গলায় প্রায়ই এটা অস্বীকার করি! আমার স্বার্থ নিয়ে, সততা নিয়ে, কর্ত্তব্যপরায়ণতা নিয়ে, নিষ্ঠা নিয়ে যখনই চ্যালেঞ্জ আসে তখনই অস্বীকার করি

এই সত্যকে। আমরা যা নই, তা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করি, যে আসনে বসতে পারব না—সেই আসন নিয়ে টানাটানি লাগাই, যে সম্ভ্রম আত্মমর্য্যাদাবোধ সাধনার বস্তু, তাকেও সুলভ করে নিতে পারলেই উৎফুল্ল হই। দিলীপ দ্বিজ তাই করছে—দিদিও তাই করেছে, আমিও—

আমার কথাটাই এই দণ্ডে বিশেষ করে ভাবতে লাগলাম, সংসারে নিজের মূল্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে সামনে থাকবে একটিই পথ—পরিণাম নিরাশাময় একটি অন্ধকার-গহ্বরে পৌঁছবার পথ। মা বাবা যতদিন আছেন একটি নির্ভরযোগ্য, যদিও সম্মানযোগ্য নয়, স্থান আমার আছে। আমরা ভাই,বোনেরা পরস্পর গ্রন্থি-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্নেহ প্রীতি ভালবাসার আস্বাদ লাভ করছি। এটা ত চিরদিনের স্থান নয়। এই বন্ধন চিরকাল থাকবে না, এই সংসার এক একটা মনের অনুযায়ী স্বতন্ত্র হয়ে যাবে। স্নেহ প্রীতি ভালবাসা তারাও পাত্র বদল করবে। তখন কোথায় থাকব আমি। আমার এই আনন্দ সঞ্চয় অভিলাষ কি এমনভাবেই জাগ্রত থাকবে?

না, এসব কিছুই থাকবে না। কালস্রোত প্রতি দণ্ডেই পায়ের তলা থেকে নির্ভরযোগ্য মাটিকে সরিয়ে নিচ্ছে, সমাজ আর সংসার যুগের সঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে, আজ যা ঘটনা—পরের দিন তা ইতিহাস। এক কালে সত্য আর এক কালে তত্ত্বকথা ছাড়া কি? এই আমিরই ত এত অল্পকালের মধ্যে কত রূপান্তর ঘটলো! এরই মধ্যে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে! বাইরে জানবে সংসারের প্রয়োজনে, আমি জানি সে আমারই প্রয়োজন। মান অভিমান দুর্ব্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে, আমাকে শক্ত হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে হবে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি। না হলে আমি হেরে যাব আমি মুছে যাব—

সন্ধ্যাবেলায় একটি ছেলে এসে নূতন এস্রাজ দিয়ে গেল। দোতলার ঘরে এসে এস্রাজের চমৎকার ঢাকনাটি খুলতেই একখানা লেফাফা টুপ করে খসে পড়লো তক্তপোষের উপরে। সেই একই হাতের লেখা। বুঝলাম উপহার দাতা আরও কিছু হৃদয়-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন—হয়ত অন্তরঙ্গতার আমেজ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন লিপির মাধ্যমে। আমি ত নিরুপায়। এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করেছি সমস্ত বিরূপতাকে তুচ্ছ করে, সাধনার পথে চলতে যে কাঁটা পায়ে বিঁধবে তা রক্ত ঝরালেও বেদনায় অধীর হব না। এটুকু ক্ষতি আমাকে সহ্য করতেই হবে—বৃহৎ একটি ক্ষতিকে প্রতিরোধ করার জন্য।

চিঠিখানা তুলে নিলাম। পড়ে দেখলাম, আশ্চর্য্য সংযমের সঙ্গে লেখা। অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তও।

সুচরিতাসু,

এস্রাজটি গ্রহণ করেছেন—ধন্যবাদ। আর একটি কথা জানিয়ে রাখছি, আশা করি তা গ্রহণ করবেন। চোরবাগানের সঙ্গীত-আসর শেষ হলে দ্বিতীয় আসরে কদাচ আসবেন না। শেষের আসরটিতে এলে হয়ত প্রচণ্ড ভাবে আঘাত পেতে পারেন। ওই আসরে তারকবাবু নূতন একটি সঙ্গীত-শিক্ষালয়ের জন্ম তারিখ ঘোষণা করবেন। যার জীবন এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করবে ওঁর এককালীন দানের উপরে। আর সেই সঙ্গে আরও একটি ঘোষণায় থাকবে—ওঁর বিপুল সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী শ্রীমতী দীপান্বিতার সঙ্গে ওই দিনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীমান আনন্দময়ের শুভ পরিণয়ের সম্ভাব্য একটি তারিখ।

ঘোষণাটি সেইদিনকার আসরে নিশ্চয় একটি চমকপ্রদ সংবাদ। গুণীজন সভায় অকুণ্ঠিত করতালি ধ্বনিতে সমর্থিত ও সম্বর্দ্ধিত হবে। কিন্তু অনুরোধ, আপনি কদাচ ওই আসরে আসবেন না। ইতি—

জনৈক শুভার্থী।

সামনে থেকে একটা কালো ভারী পর্দ্দা উঠে গেল। যবনিকার অন্তরালে এতক্ষণ যারা সাজপোশাক বদল

করছিল তারা পাদপ্রদীপের পুরোভাগে এসে দাঁড়াল। প্রথমটা বিস্মিত, পরে মর্ম্মাহত, অবশেষে বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠল। দুটি হাত আপনা আপনি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল—আমি মনে মনে উচ্চারণ করলাম, না না কিছুতেই তা হবে না। আমি হতে দেব না।

উত্তেজিত সেই অবস্থায় এস্রাজটি তুলে নিলাম কোলের উপরে। এস্রাজের কান মুচড়ে টান-টান তার-গুলিকে সুর-বর্ষণের উপযোগী করে নিলাম···তারপর আঘাত হানলাম ছড় দিয়ে। তখন দ্রুত সঞ্চরমান আঙুলের ডগায় কাঁপতে লাগল সুরের তরঙ্গ—উদারা মুদারা তারায় ঢেউ ভাঙ্গতে লাগল অনায়াস দ্রুতগতিতে। আমি উন্মত্তের মত বাজিয়ে চললাম।

তারপর? তারপর কি ঘটেছিল মনে নেই। শুধু একটি নিদারুণ সঙ্কল্প ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—আর সেটি পূরণের আগে একটি গল্প লেখার ইচ্ছা প্রবল হয়েছিল। তারই তাড়নায় ক'টা রাত জেগে এটা লিখে ফেললাম। গল্প হ'ল কি না জানি না, আমি ভারি স্বস্তি বোধ করছি।

খাতাখানা বন্ধ করে ভাবছিলাম। এই উত্তেজনার অংশভাগী তো আমরাও। আমি আর অনুময়। বলতে গেলে আমরাই যুগিয়েছি ইন্ধন। আমরাই ঘটনাকে এমন এক ভরপুর বাসনা-বহ্নির পুরোভাগে দাঁড় করিয়েছিলাম যা ধ্রুব পরিণামের দিকেই এগিয়ে নিয়ে গেছে।

আনন্দ দীর্ঘকাল অচেতন হয়ে পড়েছিল হাসপাতালে। ওখান থেকে ফিরে এসেও পূর্ব্বস্মৃতি ফিরে পায় নি। ···ওর জবানবন্দীতে মামলার ফলাফল নির্ভর করছিল, একথা আমরা জানতাম। আমরা হাসপাতালে গিয়েছিলাম কয়েকবার—ওর বাড়ীতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের পরিচিত আনন্দকে খুঁজে পাই নি। আমরা বিধিমতে চেষ্টা করেছিলাম ওকে পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করতে—ওকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনতে, ও নিজের স্থানটি খুঁজে পায় নি।

চেষ্টা করেছিলেন তারকবাবুও। শহরের সেরা চিকিৎসকদের জড়ো করেছিলেন। তবু আনন্দ সীমাহারা মরুভূমিতে ঘুরছিল। চিকিৎসকরা আশা ছাড়েন নি। ওকে পূর্ব্বস্মৃতির স্থানগুলিতে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন—পূর্ব্ব পরিচিত পাত্র-পাত্রীদের ওর সামনে হাজির করছিলেন, মাঝে মাঝে জলসার মঞ্চেও নিয়ে গিয়ে বসাচ্ছিলেন। ক্রমে মনে হচ্ছিল—ওর চৈতন্য-প্রবাহে অনুকূল গতি সঞ্চার হচ্ছে। কিন্তু সেই ধারা অতিশয় ক্ষীণ—গতি শ্লথ ও পূর্ণ চৈতন্যে ফিরবার আগেই এদিকের মামলা ফয়শালা হয়ে যাবে। আমরা ক্রমশঃই অস্থির হয়ে উঠছিলাম।

অনুময়কে বললাম তুমিও এটা পড়ে নাও, ভেবে দেখ, কি উপায় হতে পারে।

অনুময় বলল, এটা কোর্টে একজিবিট করালে কোন ফল হবে না কি?

সেটা ল'ইয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। আর কিছু না হোক, মামলার তারিখ যতটা সম্ভব পিছিয়ে দিতে হবে।

অনুময় বলল, সে ত করতেই হবে। আমিও একটা ষ্টেটমেন্ট দিতে পারব।

কি করে?

খাতার পাতা উল্টাতে উল্টাতে অনুময় বলল, এই ত আমার নাম রয়েছে কয়েকবার। এটা পড়া হলে আমাকেও সাক্ষীর কাঠগড়ায় নিশ্চয় তুলবে।

বললাম, হাঁ—তোমাকেও সাক্ষী দিতে হবে। তবে তার ফল তোমার পক্ষে সুখকর হবে কি?

কেন? ভ্রু কুঁচকে অনুময় জানতে চাইল। পরক্ষণেই জবাব দিল, বুঝেছি—যা বলবে। কিন্তু তার জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

ভিতরের কথাটা আর কেউ জানত না। ওই বড়-বাড়ীটায় অনুময়ের স্বত্ব সাব্যস্ত করতে হলে কি পরিমাণ পরিশ্রমের প্রয়োজন একটি সামান্য ঘটনায় সেটা দুজনেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলাম। সেই সামান্য ঘটনাটা এতদিন পরে মনে পড়ল।

বছর কয়েক আগেকার কথা যেন। ও তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। ওদের বাড়ীতে একদিন অতর্কিতে পুলিশ হানা দিয়েছিল। ব্যাপকভাবে খানাতল্লাসী হয়েছিল। ওর নাট্য পুস্তকগুলিও বাদ পড়ে নি। অনুময়ের এক জোড়া সখের ফুলদানি ছিল। মোরাদাবাদ থেকে কেনা চমৎকার মিনার কাজ-করা ফুলদানি। প্রতিদিন তার একটিতে রজনীগন্ধার ডাঁটি, অন্যটিতে গোলাপ-গুচ্ছ সাজিয়ে রাখত। দুটি ফুলের মিশ্র গন্ধে ঘরটা সুরভিত হয়ে উঠত। অনুময় বলত, ফুলের গন্ধ না থাকলে পড়ায় মন বসে না।

ওর ঘরের সামনের ছাদে সারি সারি ফুলের টব বসানো ছিল। বেল, যুঁই, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা। সব সময়ে সব ফুল ফুটত না, আর ফুটলেও বাতাসের দাক্ষিণ্য না পেলে সেই গন্ধ ঘরে ঢুকত না। তাই ফুলদানিতে টাটকা ফুল রাখার ব্যবস্থা করেছিল অনুময়।

ঘর তল্লাসীর সময় পুলিশরা ওর বই খাতা কাগজপত্রের সঙ্গে ফুলদানি দুটোকে আছড়ে ফেলেছিল ঘরের মেঝেতে। যার ফলে মিনে চটে—পিতল তুবড়ে গিয়ে ও দুটো দেখতে বিশ্রী হয়েছিল। রাগে দুঃখে কেঁদে ফেলেছিল অনুময়। এক-ঘর লোকের সামনে তারকবাবুকে বলেছিল—আপনি এমন কাজ করেন কেন জ্যাঠামশায়, যাতে পুলিশের আস্পর্দ্ধা বাড়ে।

তারকবাবুর মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল। একটা ধমক দিয়ে বলেছিলেন, থাম, ডেঁপোমি করতে হবে না।

থামে নি অনুময়। তেমনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিল, এতে বুঝি অপমান হয় না?

এত লোকের সামনে কথা বাড়ান নি তারকবাবু। একটি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হেনে চুপ করে গিয়েছিলেন। তল্লাসী শেষ হলে পুলিশ চলে গেলে বলেছিলেন, ভারি বেয়াদপ হয়েছিস ত! জানিস, কান ধরে তোকে রাস্তায় বা'র করে দিতে পারি?

অনুময় আমাকে এসে ঘটনাটা সবিস্তারে বলেছিল। বলেছিল, জানিস—জ্যাঠামশায় মিথ্যে করে শাসান নি—সত্যিই ওই বাড়ীতে আমার কোন দাবি নেই—ওঁদের সম্পত্তিতেও নয়। আমি জন্মাবার দু'বছর পরে বাবা-মা দু'জনেই মারা যান। জ্যেঠিমা আমাকে মানুষ করেন। তারও অনেক পরে এই সম্পত্তি করেছেন জ্যাঠামশায়। সবই ওঁর স্বকৃত—নিজের নামে।

সুতরাং অনুময় যদি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ঘটনার যথাযথ বিবরণ পেশ করে যায়—ওর পক্ষে তা সুখকর হবে কি?

অনুময় বলল, তার জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু সে বিষয়েও কতখানি এগিয়েছিল—তা তখন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারি নি।

আমাদের হাতে মাত্র আর ছ'টা দিন আছে—এরই মধ্যে যা কিছু করণীয় সারতে হবে।

মা আজও গিয়েছিলেন ওদের বাড়ীতে। ফিরে এসে বললেন, হাঁ রে, মেয়েটার সঙ্গে দেখা করা যায় না? দিদি ভারি উতলা হয়ে পড়েছেন।

বললাম, চেষ্টা করব। কাল কথাটা তুলেছিলাম প্রতিমার বাবার কাছে—উনি বললেন, সামান্যক্ষণ চোখের দেখায় সান্ত্বনা ত পাব না, জ্বালাই বাড়বে। তার চেয়ে থাক। মেয়ে কলঙ্কমুক্ত হয়ে ফিরে আসবে—সেই আশার আনন্দই ত ভাল বাবা।

মা বললেন, আহা, ভারি কষ্ট হয় ওঁকে দেখে! কোথায় চাকরি থেকে ছুটি হয়ে দুটো দিন স্বস্তিতে কাটাবেন, তা নয়···তুই বাপু দিলীপের জন্যে যা হোক একটা কাজটাজ ঠিক করে দে—ছোঁড়াটা দিন-রাত টো-টো করে ঘুরছে।

চেষ্টা করছি।

অনুময় এল পরের দিন সন্ধ্যাবেলায়। বলল, দরখাস্ত দিয়ে এলাম, মঞ্জুরও হয়ে যাবে ঠিক। কিন্তু আমার এই পরহিতৈষিণী জ্যাঠামশাই পছন্দ করছেন না। কি জানি কি করে ওঁর কানে কথাটা কে তুলে দিয়েছে! আমাকে একটু ভয় দেখিয়ে বললেন, বাবা, শুধু শুধু মাথাব্যথা হওয়াটা ভাল নয়, ওতে কপাল ফাটবার চান্স ষোল আনা!

অর্থাৎ?

অনুময় হেসে বলল, অর্থাৎ সেই পুরণো কাসুন্দি আর একবার চটকে দিলেন। ওঁর সম্পত্তিতে আমার যে স্বত্ব নেই একবিন্দু, সেটাই জানালেন ইঙ্গিতে।

বললাম, তবে থাক।

অনুময় বলল, কি থাকবে?

বললাম, তুমি যেমন নেপথ্যে আছ, তেমনি থাক। এতেই অনেক সাহায্য হচ্ছে। হয়ত সুরাহা একটা হবেই।

অনুময় মাথা নেড়ে বলল, না, তা হবে না। সাক্ষীর কাঠগড়ায় আমাকে দাঁড়াতেই হবে—আমি শিখণ্ডীকে সামনে রেখে যুদ্ধ করব না।

হেসে বললাম, জানি, তুমি চিরকালের বীরপুরুষ! এ যাবৎ তুমি কাউকেই টপকাতে দাও নি। কিন্তু এটা ত সব সৌখিনতার বস্তু নয়—এ রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ান!

হাসতে হাসতে বলল অনুময়, দেখি না, পারি কিংবা হারি। টিনের তলোয়ার ঘুরিয়ে ত এতকাল লড়াই করলাম—এইবার ইস্পাতের তলোয়ারের ধার পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

এতে তোমার লাভ? হয়ত সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে।

অনুময় বলল, সর্ব্বস্বান্ত হওয়ারও নিশ্চয় আনন্দ আছে। এই আনন্দ-দেনেওয়ালা নিশ্চয় একজন আছেন—যিনি আমাদের লাভ-ক্ষতিকে সমান করে অনুভব করাতে শেখান।

বলে ক্ষণকাল চোখ বুজে কি যেন চিন্তা করল। সেই অবস্থাতেই অস্ফুট কণ্ঠে বার দুই বলল, কে সে? কে সে?

পরক্ষণে গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করল:

কে সে?
জানি না—কে! চিনি নাই তারে
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।

ওর নির্ভীক কণ্ঠস্বর আমাকে হতবাক্ করল—আশ্চর্য্য হয়ে ওর মুখের পানে চেয়ে রইলাম। এই মুহূর্ত্তে

আমাদের কৌতুক পরিহাসের পঞ্চশ্রী যেন পঞ্চ-প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেই আলোয় ওকে নতুন করে চিনলাম।

বলতে গেলে অনুময়ের চেষ্টায় মামলার তারিখটা আরও পিছিয়ে গেল—প্রতিমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতিও মিলল। কি করে কি হ'ল আমি জানি না।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা যাত্রার আয়োজন করছি—একটি কিশোর ছেলে আমার হাতে একখানা কার্ড দিয়ে বলল, আমাদের সেক্রেটারি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মূল্যবান আর্টপেপারে ছাপা রূপালী বর্ডার দেওয়া সুদৃশ্য কার্ড। কার্ডটা উল্টেপাল্টে দেখলাম, লেখাটি পড়লাম।

আগামী ১৫ই ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে আনন্দ-সঙ্গীত সমিতির সভ্যবৃন্দ মিলে একটি সান্ধ্যসঙ্গীত আসরের আয়োজন করেছেন। খ্যাতনামা দিল্লী শ্রীআনন্দময় এই আসরে উপস্থিত থাকবেন এবং সম্ভব হলে তাঁর অনুপম কণ্ঠসঙ্গীতের দ্বারা আসরের গৌরববর্দ্ধন করবেন। আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করল, কিসের নেমন্তন্ন চিঠি, সুব্রতদা।

খুসিভরা কণ্ঠে বললাম, একটা গানের আসর বসবে—আসছে সপ্তাহে। আনন্দ সেই আসরে থাকবে।

দিলীপও খুসি হয়ে উঠল। বলল, আনন্দদা তা হলে সেরে উঠেছেন?

তাই ত দেখছি। লিখেছে গানও গাইতে পারে।

কার্ডখানা দিলীপের হাতে দিলাম।

লেখা পড়তে পড়তে ওর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমরা তিনজনে এসেছিলাম দেখা করতে। জ্যাঠাইমা, দিলীপ আর আমি। জ্যাঠামশাই আসেন নি। ছোট বলে প্রমীলাকে আনা হয় নি। দ্বিজর এখন ঘুড়ির সীজন গিয়ে লাট্টুর সীজন আরম্ভ হয়েছে। দিলীপকেও হয়ত পাওয়া যেত না—ভাগ্যিস লীগ, শীল্ড আর ট্রেডস কুচবিহার প্রভৃতি নাম-করা কাপের খেলাগুলো শেষ হয়েছে—ক্রিকেটের আসর এখনও তেমন জমে নি। তা ছাড়া হালছাড়া সংসারের গতিপ্রকৃতি ইদানীং ও কিছু কিছু বুঝতে পারছে। ইতিমধ্যে একদিন আমার কাছে এসে বলেছিল, কোন একটা টেক্‌নিক্যাল লাইন ধরিয়ে দিন না, সুব্রতদা।

বলেছিলাম, ইউনিভার্সিটির দু'একটা সার্টিফিকেট থাকলে সুবিধা হ'ত—এ যে নেহাৎই মিস্ত্রি-মজুরের কাজ!

ও বলেছিল, তা হোক—মিস্ত্রি-মজুরের কাজ আমি পারব। দেখুন না, মোটর মেকানিক্স কিংবা ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রির কাজ। নিদেনপক্ষে সেলাইটাও ত শিখতে পারি।

বলেছিলাম, তা চেষ্টা করলে একটা ডিগ্রিও ত নিতে পার, ওতে কাজের সুবিধা হবে, উন্নতি করতে পারবে।

না—পারব না। ও লাইনটা এখন অনভ্যাসের লাইন। কিছুতেই মন লাগাতে পারি না। আপনি যা হয় কিছু একটা ধরিয়ে দিন।

আচ্ছা—চেষ্টা করব। প্রথমটা হয়ত আনপেড অ্যাপ্রেন্টিসগিরি অর্থাৎ ব্যাগার দিতে হবে বিনা বেতনে। ভাল লাগবে ত?

লাগবে। না হলে করব কি!

চাকরির বয়স হয়েছে দিলীপের। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, সংসারের আসল চেহারাটা ধরা পড়েছে ওর

চোখে। ওরা পারবে। যতই আড্ডা ইয়ার্কি দিয়ে রোয়াকে বসে দুনিয়ার হালচাল নিয়ে চালিয়াতি করুক ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি ওরা ধরতে পারে। যতদিন বাপ দাদার উপার্জ্জনে ভাঁটা না পড়ে ততদিন পর্য্যন্ত ওরা সংসারের কোন ধার ধারে না। ওরা বেপরোয়া হলেও বাস্তবসচেতন। সূর্য্য পাটে বসবার উপক্রম করলে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখে আত্মহারা হয় না। তার পরেই যে দিগন্ত জুড়ে অন্ধকার নামবে আর সেই অন্ধকারে দৃষ্টিহারা দিশাহারা হওয়ার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত, এ ওরা অনুমান করে নিতে পারে। দিলীপও এই জাতের ছেলে। এখন আমার সঙ্গে দেখা হলেই কাজের কথা তোলে, আমার কথা মন দিয়ে শোনে। আমাকে খুসি করার চেষ্টাতেই আমাদের সঙ্গে এসেছে দিলীপ।

জেলের গেটে ঢুকবার আগে খাবারের কৌটো দিলীপের হাতে দিলেন জ্যাঠাইমা। বললেন, তুই ধর বাবা, আমার হাত-পা কাঁপছে।

বললাম, আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আনন্দ যখন সুস্থ হয়ে উঠছে—ওর কোন শাস্তিই হবে না। আনন্দ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে এজেহার দিতে পারবে, কেস তখন অন্যদিকে ঘুরে যাবে।

জ্যাঠাইমা বললেন, তাই হোক বাবা, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল প্রতিমা। কৃশ ম্লানমুখী উদ্‌ভ্রান্ত একটি মেয়ে। জ্যাঠাইমা আর সহ্য করতে পারলেন না, প্রণাম করবার আগেই ওকে বুকে চেপে ধরতে চাইলেন। পারলেন না। সামনের বাধা রেলিঙটায় মাথা রেখে উনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। প্রতিমাও মুখ ঘুরিয়ে নিল—কাঁদল কি না বুঝা গেল না। দেহটা ঈষৎ কেঁপে উঠল মনে হল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য!

প্রথম দর্শনের আবেগ মন্দীভূত হলে প্রতিমা বলল,

মা, খাবারগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও—নয়ত কাউকে দিয়ে দাও। ও আমি খেতে পারব না।

জ্যাঠাইমা বললেন, কেন, আমি নিজের হাতে তৈরী করেছি—

তাই ত খেতে পারব না। আমি নিরপরাধ নই।

জ্যাঠাইমা বললেন, কে বলেছে এ কথা? আমি জানি, ওরা শত্রুতা করে তোর ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে—

না মা, আমি—

তুই থাম। আমি তোর চেয়ে বয়সে বড়, জ্ঞানে বড়, সত্যি-মিথ্যে বুঝবার শক্তি আমার ঢের বেশি। ওকে এক রকম ধমক দিয়েই থামিয়ে দিতে চাইলেন উনি।

না। মাথা নেড়ে প্রতিমা বলল, সবই স্বীকার করছি, তবু তুমি মা। তুমি দুর্ব্বল। বুঝতে পেরেও তুমি স্বীকার করতে পারছ না।

আমার পানে চেয়ে জ্যাঠাইমা বললেন, আমার কথা বিশ্বাস না হয়—সুব্রত কি বলে শোন। বল বাবা, তুমিই বল।

আমি বললাম, প্রতিমা, আনন্দ ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছে। এই দেখ কার্ড, মহাজতি সদনে একটা সম্মেলনের আয়োজন হচ্ছে, তাতে ও অংশ নিচ্ছে।

কার্ডখানা প্রতিমার সামনে এগিয়ে দিলাম।

এই কথায় প্রতিমার বিষণ্ণতা দূর হল না, ও আগ্রহ প্রকাশ করে কার্ডখানা নিতে হাত বাড়াল না। মাথা নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, যে যাই বলুন, মনের অগোচর ত পাপ নেই।

আমরা বোঝাতে চাইলাম, কিছুতেই বুঝল না প্রতিমা। আনন্দ সুস্থ হয়ে উঠছে জেনেও কিংবা এই অগৌরবময় অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস পাওয়ার সম্ভাবনার কথা ভেবেও ওর মুখ উজ্জ্বল হল না। ও মাথা নামিয়ে চুপ করে রইল।

ওকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করলাম। বললাম, খাবারটা নাও—না হলে মা কষ্ট পাবেন।

আচ্ছা, নিচ্ছি।

হাত বাড়িয়ে কৌটোটা নিয়ে বলল, মা, তুমি আর এখানে এস না।

জ্যাঠাইমা বললেন, ভগবান করুন যেন আসতে না হয়।

বিদায় নেবার সময় দিলীপ ওর কাছে সরে গেল। প্রতিমা ধরা গলায় বলল, তুমি চেষ্টা কর ভাই, যাতে বাবা-মা সুখী হতে পারেন। আমরা কেউই ত পারলাম না।

এবার মুখ ফিরিয়ে নিলেও ওর কান্নাটি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। বিদায়-মুহূর্তে একটি করুণ পরিবেশ সৃষ্টি হল।

চোখ মুছতে মুছতে আগে বেরিয়ে এলেন জ্যাঠাইমা, তাঁর পিছনে দিলীপ. সবশেষে আমি।

আমাকে মৃদুস্বরে ডাকল প্রতিমা, শুনুন সুব্রতদা। ওঁর খবর কি? মানে আপনার বন্ধুর কথা জিজ্ঞাসা করছি।

মুখ ফিরিয়ে বললাম, বললাম ত ভালই আছে। আমরা আশা করছি সঙ্গীত-সম্মেলনের আগেই ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

প্রতিমা মাথা নেড়ে বলল, আমি ওঁর কথা জিজ্ঞাসা করছি না। আমি জানতে চাইছি 'দত্তভিলার' সেই ছেলেটি—

অসময়! ও ত আর দত্তভিলায় থাকে না।

থাকেন না!

না। ও কিছুদিন হল একটা মেসে উঠেছে। এখন মার্চেন্ট আপিসে চাকরি পেয়েছে একটা।

খুবই বিস্মিত হল প্রতিমা। দুই চোখ বড় করে বলল, চাকরি করছেন! ওই বাড়ীর ছেলে—

বললাম ত, এখন দত্তভিলার সঙ্গে ওর কোন সম্বন্ধই নেই—ও আমাদের মতই সাধারণ ঘরের ছেলে।

একটুকাল চুপ করে থেকে প্রতিমা কি যেন ভেবে নিলে। পরে আস্তে আস্তে বলল, ওঁকে একদিন নিয়ে আসুন না।

আজই আনতে চেয়েছিলাম। ও এল না।

কেন? প্রতিমা যেন আকাশ থেকে পড়ল! কেন? অবাক কণ্ঠে আর একবার শুধোল।

বললাম, ও বলল পশুরা কখনও মানুষের সামনে যেতে পারে?

না, না! আর্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল প্রতিমা।

এমন সময়ে প্রহরী ঘোষণা করল, সাক্ষাতকারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এবার ফটক বন্ধ হবে।

ঝন্ ঝন্ শব্দে ফটকটা বন্ধ হয়ে আসছিল—শববাহের মত ফিরে চাইলাম।

দেখলাম চোখ দুটি বন্ধ করে দুটি করের যুক্ত আশ্রয়ে মাথাটিকে নামিয়ে এনেছে প্রতিমা।

—০—

শ্রমণা শিউলি
আশোক সেন
BULBUL

চরিত্রলিপি—গগন মিটার
নিবারণ বোস
বনলতা মিটার
অমিতাভ বাসু
মালিনী

প্রথম অঙ্ক

[আলিপুরে গগন মিটারের বাড়ীর ড্রয়িং রুম। আপ ষ্টেজের ডাইনে ও বাঁয়ে জানলা। ঘরে কাউচ, সোফা, চেয়ার, রাইটিং টেবল, বুক সেলফ্ ইত্যাদি সাজান। কার্টেন ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেগে ঘরে এসে ঢুকবে বনলতা। বয়স ৩৫, গায়ের রং ফিকে প্রাশিয়ান ব্রাউন—পোশাক দেখলেই বোঝা যায় বাইরে কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলেন। শাড়ী ক্রোম অরেঞ্জ এবং ব্লাউজ স্কারলেট লেক্ রং-এর। চোখ দু'টিতে বাদামী রং-এর আভাস। সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন স্বাস্থ্য উপচে পড়ছে। দেহে যৌবনের উগ্রতা নেই, কিন্তু আছে একটা মাদকতা। বনলতার হাতে একটা চিঠি দেখা যাবে—সে এগিয়ে যাবে রাইটিং টেবিলের দিকে, ড্রয়ার খুলে চিঠিটা রেখে লক করতে থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেজে ঢুকবে নিবারণ বোস। নিবারণ বনেদী পরিবারের ছেলে—নামে পেশা ব্যারিষ্টারি—অর্থাৎ প্রাকটিস জমে নি—তবে বাবুগিরি করবার মত সঞ্চিত অর্থ যথেষ্ট আছে। সুতরাং সেই কারণেই সমানে কিছুটা প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে। বয়সে বনলতার থেকে অন্ততঃ চার বছরের ছোট। চেহারা দোহারা, গায়ের রং মাজা মাজা। অন্তরে একটু ভাবাবেগের আধিক্য। বনলতার একটু পরেই সে ঘরে ঢুকবে। তাকে দেখলেই বোঝা যায় যে সে অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করছে। পরণে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী ও ধুতি।]

নিবারণ—চিঠিটা দাও বলছি।

বনলতা—না।

নিবারণ—টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে চিঠিটা আমাকে দাও। কি, আমার কথা কানে যাচ্ছে না ?

বনলতা—দেব না ত বলেছি।

নিবারণ—দেবে না ?

বনলতা—কেন দেব ?

[কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর]

নিবারণ—আজ বিকেলে কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?

বনলতা—আবার একটি প্রশ্ন !

নিবারণ—সোজাসুজি উত্তর দাও—কোথায় গিয়েছিলে বিকেলে ?

বনলতা—সেই কথাই একটু আগে তোমাকে বলতে যচ্ছিলাম···(হেসে উঠে) কিন্তু নিজের মুখের চেহারাটা এখন একবার যদি আয়নায় দেখতে পেতে—ঠিক যেন প্যাঁচার মত থমথমে।

নিবারণ—কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল—বিকেলে কোথায় গিয়েছিলে ?

বনলতা—আচ্ছা, আমাকে কেউ চিঠি লিখলেই কি তোমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়।

নিবারণ—রাইটিং টেবিলটা খুলে চিঠিটা আমাকে একবার দেখতে দেও, লতা···

বনলতা—চিঠিটা আমি তোমাকেই দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তোমারও বোঝা উচিত যে এইভাবে আমাদের মধ্যে মন কষাকষি সুরু হলে তার পরিণতিটা খুব সুখকর হবে না। আমি বাড়ীর বাইরে গেলে যদি তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়—

নিবারণ—আজ বিকেলে কোথায় গিয়েছিলে সেই কথাটাই ত জিজ্ঞেস করছি।

বনলতা—প্রশ্ন করার আগে একটু চিন্তা করে দেখলেও ত পার—ধর, যার বাড়ীতে বিকেলে গিয়েছিলাম সে নিশ্চয়ই বাড়ী ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই লোক মারফৎ চিঠি পাঠাবে না।

নিবারণ—ড্রয়ারটা খোল—চিঠিটা আমাকে দেও।

বনলতা—এবার আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা সুরু করেছ।

নিবারণ—সেক্ষেত্রে তোমার খুবই ভুল মনে হচ্ছে।

বনলতা—তা হলে সত্যিই তুমি বলতে চাও যে তুমি আমাকে সন্দেহ করছ।

নিবারণ—সন্দেহ করবার মত কারণ দেখা দিয়েছে বৈকি। যাক্‌গে, ড্রয়ারটা খুলবে?

বনলতা—তুমি তা হলে সত্যিই চাও আমি ড্রয়ারটা খুলি? এই ত তোমার ইচ্ছে? এটাই ত তুমি চাও? অর্থাৎ এটাকেই একরকম তোমার আদেশ হিসাবে ধরতে পারি? বেশ। [হ্যাণ্ডব্যাগটা খুলে উল্টো করে টেবিলের উপর ধরবে—ভেতরের জিনিষপত্র টেবিলের উপর পড়বে—সেইসঙ্গে চাবির রিংটাও নিজেই ড্রয়ারটা খোল—ঐ চাবির রিং—চাবি দিয়ে ড্রয়ারটা খুলে চিঠিটা বের করে নেও। [নিবারণ একবার টেবিলের দিকে, একবার বনলতার দিকে তাকাতে থাকবে]

বনলতা—যখন কোন মেয়ের উপর তন্বিতম্বা সুরু করবে, তখন হঠাৎ পেছিয়ে পড়লে চলবে কেন? পুরুষ কি ধাতু দিয়ে গড়া সেটা তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে (নিবারণ ডেস্কের দিকে এগিয়ে যাবে) থাম! কোথায় যাচ্ছ? শোন! চাবির রিংটা যদি শুধুমাত্র আঙুল দিয়েও স্পর্শ কর—তা হলে পরে এর জন্য অনেক কষ্ট পেতে হবে। আবার বলছি, চাবিটা যদি একবার ছোঁও, তবে তার জন্য পরে কিন্তু ভয়ানক অনুতাপ করতে হবে।

[নিবারণ ইতস্ততঃ করে চাবিটা তুলে নেবে এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সেটা বনলতার হাতে দেবে]

নিবারণ—নেও তোমার চাবি।

[বনলতা তার মুখের দিকে তাকাবে—চাবিটা নেবে সেটা একপাশে রেখে দিয়ে]

বনলতা—তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ না যে আমাদের ভেতরকার এই অসন্তোষের ভাবটা ক্রমশঃ আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে—

নিবারণ—কোন অসন্তোষের কথা বলছ?

বনলতা—তোমাকে আগে থেকেই সাবধান করে দেওয়া উচিত বলে বলছি।

নিবারণ—তুমি ঠিক কি বলতে চাও?

বনলতা—কছুদিন ধরেই দেখছি তুমি আমার গতিবিধির উপর নজর রাখছ। আরও স্পষ্ট করে বলব? তুমিও আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করছ। প্রথমটায় আমার হাসি পেত—মনে হ'ত মিছিমিছি—আজেবাজে চিন্তা করে অকারণে কষ্ট পাচ্ছ। এমন কি, কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত এ ব্যাপারটায় আমি ammused-ই হচ্ছিলাম।

নিবারণ—তাই নাকি?

বনলতা। এ ধরনের petty jealousy দেখলে মেয়েরা মনে মনে খুশীই হয় এবং খানিকটা গর্ব্বও অনুভব করে। আমাকে সন্দেহ করে সব সময় আমার পেছনে পেছনে ঘুরলে নিজেও অন্য মেয়েদের থেকে দূরে থাকবে, এই ছিল আমার সান্ত্বনা। কিন্তু এখন দেখছি তোমার হিংসাটা অন্য জাতের—বোকা পাশবিক, হিংস্র ধরনের—এ হিংসায় মেয়েদের সর্ব্বনাশ হয়—একে ক্ষমা করা যায় না।

নিবারণ—বনলতা!

বনলতা—এবারের মত আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি।

নিবারণ—বনলতা!

বনলতা—তুমি কি চাও আমরা আবার ঝগড়া সুরু করি?

নিবারণ—(নিজেকে সামলে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর) না।

বনলতা—যাক্‌, শুনে সুখী হলাম।

নিবারণ—আমাকে শুধু একটা কথা বল, লতা—আমাদের এই দু'জনের এই সম্পর্কটা তোমার আজও আগের মত মধুর মনে হয় কি না।

বনলতা—এ সম্বন্ধে সন্দেহ হতে পারে এমন কোন কারণ ঘটেছে কি?

নিবারণ—তবে বনলতা যে আজও তুমি আমাকে আগের মত ভালবাস?

বনলতা—উঁহু—মিথ্যা বলব না—আজকে অন্যদিনের চেয়ে একটু কমই ভালবাসছি।

নিবারণ—কিন্তু তুমি নিজেও ত চাও যে আমি সুখী হই?

বনলতা—সেই জন্যই ত জিজ্ঞেস করছিলাম সন্দেহটা আসছে কোথা থেকে।

নিবারণ—না—না—এমন কোন কারণই নেই যার জন্য তোমার উপর সন্দেহ হতে পারে। তবে কি জান—তোমার পুরুষ-বন্ধুর দল ত কম নয়—কারোর কারোর বয়স আমার থেকেও কম—এই জন্যই ভয় হয়, কেউ আমাদের মাঝে এসে···

বনলতা—বেচারী! আমার সম্বন্ধে মিছিমিছি কেন

উদ্বিগ্ন হও? আমি অস্বীকার করি না, I make myself agreeable to young men—তাদের সঙ্গে অনর্গল কথাবার্ত্তা বলি, কিন্তু যেই তারা একবার এ বাড়ীর দরজার ওপারে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাদের নামগুলো পর্য্যন্ত ভুলে যেতে আমার একটুও কষ্ট হয় না।

নিবারণ—তা হ'লে তুমি বলছ যে আজকের এই বিশেষ মুহূর্ত্তে এমন কেউ নেই যে আমাদের এই দু'জনের মাঝখানে এসে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করছে?

বনলতা—যত সব উদ্ভট চিন্তা।

নিবারণ—এমন কেউ নেই যাকে তুমি হয়ত unintentionally encourage করে থাকতে পার? যে হয়ত মনে করতে পারে তাকে তুমি চিঠি লেখবার অধিকার দিয়েছ?

বনলতা—আমার ত এমন কারোর কথা মনে পড়ছে না।

নিবারণ—(অনুনয়ের সুরে) লতা, রাইটিং টেবিলটা খুলে চিঠিটা আমাকে দেও।

বনলতা—তুমি কথা দিয়েছিলে আবার এ প্রসঙ্গ সুরু করবে না—

নিবারণ—আমাকে শুধু বল কে চিঠিটা লিখেছে।

বনলতা—এবার দেখছি আসল জেরা সুরু হল। তবে শোন, চিঠিটা লিখেছে আমার এক বন্ধু, নাম প্রিয়ম্বদা সারখেল—আমি ডাকি প্রিয়দর্শিনী বলে—

[নিবারণ বেশ চঞ্চলভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকবে]

তাই ত? তুমিও ত প্রিয়দর্শিনীকে অল্পস্বল্প চেন। আমি আঁচ করতে পারছি—প্রিয়া চিঠিতে কি লিখেছে। তুমি এ বিষয়ে যেই আমাকে জেরা করা বন্ধ করবে, অমনি আমি তোমাকে চিঠির বক্তব্যটা খুলে বলব।

(কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর)

নিবারণ—লতা, একটা কথা তোমাকে আমার বলতেই হবে। আমি তোমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি—আমার কথায় যদি যুক্তি থাকে তবে শুনবে ত—

বনলতা—নিশ্চয় শুনব—

নিবারণ—সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবে শুনতে হবে—

বনলতা—(অভিনয়ের সুরে) আমার দেহ এবং মন থেকে সমস্ত উত্তেজনা এই মুহূর্ত্তে ঝেড়ে ফেললাম—

নিবারণ—তা হলে আমি অনুরোধ করছি লতা, একবার আমার কথা ভেবে দেখ—নিজের বিষয় ভেবে দেখ—

বনলতা—(অভিনয়ের ভঙ্গিতে) বেশ, তাই ভাবতে সুরু করলাম—

নিবারণ—একটা কথা শুধু স্মরণ রাখবে, শুধু একটা কথা—জীবনে একবার ভুল করলে তা আর শোধরান যায় না—Don't allow yourself to be led into adventures। আমাকে ঠকিও না, তা হলেই নিজের সততা এবং আত্মসম্মান বজায় রাখতে পারবে—কিন্তু যদি আমার প্রতি অবিশ্বাসিনী হও—

[বাইরে দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া যাবে]

বনলতা—এবার একটু সাবধানে কথা বল—আমার স্বামীর পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি।

(গগন মিটার ঘরে ঢুকবে হাতে কিছু কাগজ-পত্র। চেহারা মোটাসোটা এককথায় যাকে বলে ঘাড়ে গর্দ্দানে রং কালো বয়স চল্লিশ।)

গগন—বাইরে থেকেই গলার আওয়াজে বুঝেছিলাম নিবারণ এসেছে? কতক্ষণ?

(নিবারণ উঠে পেছনের জানালার দিকে যেতে থাকবে—বনলতা স্বামীর দিকে এগিয়ে যাবে।)

নিবারণ—(যেতে যেতে) এই মিনিট পনের আগে এলাম গগনদা।

গগন—বেশ, বেশ, তোমরা গল্প কর। (হাসতে হাসতে) দুজনে একসঙ্গে হলে তোমরা বোধ হয় সারাটা দিন কাটিয়ে দিতে পার, তোমরা কথাবার্ত্তা বল—আমি একটু বাইরের ঘরে গিয়ে কয়েকটা চিঠি লেখা শেষ করে আসি—

বনলতা—তুমি এত তাড়াতাড়ি ওখান থেকে ফিরে এলে?

গগন—(ইতস্ততঃ করে) বড় কাকা বাড়ী ছিলেন না—বোধ হয় বিশেষ জরুরী কাজে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল?

বনলতা—ওর সঙ্গে দেখা হওয়াটাই দেখছি একটা অসম্ভব ব্যাপার?

গগন—আরে না না—আমাকে কি আর বড় কাকা avoid করবার চেষ্টা করবেন? Message রেখে গেছেন—কাল যেন আবার যাই।

বনলতা—সে message ত গতকালও রেখে গিয়েছিলেন। চল, বরং কাল আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

গগন—সে কি! এসব ব্যাপারে তুমি গিয়ে কি করবে? তাতে করে উল্টো ফল হতে পারে।

বনলতা—তা যদি মনে কর তবে যাব না। (রাইটিং টেবিলের কাছে গিয়ে বসবে এবং ড্রয়ার খুলে প্যাড বের করে বসে বসে কি লিখতে থাকবে।)

গগন—তারপর নিবারণ! কয়েকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি—কেমন আছ?

নিবারণ—(এগিয়ে এসে) মোটামুটি একইভাবে কাটছে গগনদা। আপনি কেমন আছেন?

গগন—বর্ত্তমানে মোটেই ভাল নেই ভায়া।

নিবারণ—কেন, কি হয়েছে বলুন ত?

গগন—তুমি ত জান আমি সর্ব্বক্ষণই কাজ নিয়ে পড়ে আছি—এত খাটুনির ফলে শরীরটাও আজকাল সুস্থ থাকছে না।

নিবারণ—কিছুদিন ছুটি নিয়ে বাইরে বেড়িয়ে এলে ত পারেন।

গগন—তা পারি বৈ কি। তবে তার জন্য দরকার ছুটির অনুমতি এবং ছুটি কাটাবার জন্য অপর্য্যাপ্ত ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স।

নিবারণ—এবার বাজে কথা বলছেন গগনদা। আপনি ত চাকরি করে কম রোজগার করেন না।

গগন—কিন্তু এটাও শুনে রাখ ভায়া—যা রোজগার করি তার সবটাই খরচ হয়ে যায়, এক পয়সাও বাঁচে না।

নিবারণ—সেই ত ভাল—এক পকেট দিয়ে যা ঢুকল, আর এক পকেট দিয়ে তা বেরিয়ে গেল।

গগন—হ্যাঁ, তোমাদের মত ব্যাচিলারদের পক্ষে কথাটা খুবই প্রযোজ্য।

(বনলতা এদিকে উঠে আসবে)

বনলতা—তুমি কি সবসময় কেবল টাকা আর চাকরি, চাকরি আর টাকা করে সবার লাইফ অতিষ্ঠ করে তুলবে? তুমি কি ভাবছ তোমার এই সব আর্থিক সমস্যার কথা শুনতে মিঃ বোসের খুব ভাল লাগছে? (একটু থেমে) আসল গোলমাল কোথায় জান? তুমি সব বিষয়ে নিজেকে নিয়ে বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়। অথচ এদিকে তোমার স্বাস্থ্য ভাল, খিদে হয় চমৎকার, কুম্ভকর্ণের মত গাঢ় ঘুম—বাড়ীতে যখন যা দরকার হচ্ছে, তখুনি তা পাচ্ছ। এক অভিযোগ কাজ নিয়ে—পুরুষমানুষ, সুতরাং কাজ না করে চুপচাপ বসে থাকলে ত চলবে না—আমি যদি তোমার মত হতাম ত তোমার ডবল কাজ করতাম এবং তোমার থেকে অনেক কম কথা বলতাম।

গগন—শুনে রাখ হে নিবারণ—শুনে রাখ। তোমাদের ব্যাচিলারদের আইডিয়াই নেই যে এমনও বাড়ী আছে যেখানে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সংসার খরচা কেবল বেড়েই চলেছে।

বনলতা—তুমি কি একঘেয়ে ভাবে এই একই কথা বলে চলবে?

গগন—ভাই নিবারণ, এখনও পর্য্যন্ত তুমি বিয়ের ফাঁস গলায় পর নি, আমার উপদেশ যদি শোন ত বলি চিরকালই ব্যাচিলার হয়ে থেক—তাইতেই জীবনে সুখী হবে।

নিবারণ—আপনারও কি ঐ একই মত না কি মিসেস মিটার?

বনলতা—বিয়ের ব্যাপারে যার যার নিজস্ব মতটাই সব থেকে বড় কথা। আচ্ছা, আমি একটু ভেতর থেকে আসছি। (প্রস্থান)

গগন—চাকরির ব্যাপারে আমার স্ত্রীর সঙ্গে যে কোন পরামর্শ করব তার ত কোন সুযোগই পাই না। তুমি যদি একটু ধৈর্য্য ধরে শোন…

নিবারণ—নিশ্চয় শুনব গগনদা, আপনি বলুন।

গগন—সরকারের উপর মহলে একটা চাকরির জন্য আমার তরফ থেকে খুব চেষ্টা করা হচ্ছে—এটাকে একটা বিশেষ প্রচেষ্টাও বলতে পার।…

নিবারণ—আর একটু খুলে বলুন।

গগন—তুমি নিশ্চয় আমার বড় কাকার নাম শুনেছ?

নিবারণ—আপনার বড় কাকা?

গগন—প্রকাশ মিত্তির—ব্রিটিশ আমলের I. C. S. এখন retired হলেও সরকারী মহলে দারুণ প্রতিপত্তি। আমার ঠাকুর্দ্দা আর বড় কাকার বাবা ছিলেন মামাত-পিসতুত ভাই।

নিবারণ—ওঃ—হ্যাঁ, এবার বুঝেছি।

গগন—যা বলছিলাম। সরকারী মহলে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, সেনট্রাল গভর্ণমেণ্টের খোদ কর্ত্তারা পর্য্যন্ত প্রকাশ মিত্তিরকে ডেকে পাঠায় শলা-পরামর্শের জন্য।

নিবারণ—তিনি যদি ব্যাক করেন তাহলে ত কথাই নেই।

গগন—বড় কাকা আমার বর্ত্তমান চাকরি সম্বন্ধে মোটেই খুশী নন। আমার যাতে ট্রেজারীতে একটা ভাল চাকরি হয় এই তাঁর ইচ্ছা, ওখানে তাঁর পরিচিত ওপরওয়ালাও কয়েকজন আছেন। তাঁরা কাকাকে

কথা দিয়েছেন সুযোগ-সুবিধামত একটা ভাল মাহিনার চাকরি তারা আমাকে জোগাড় করে দেবেন।

নিবারণ—সেই হবে সব দিক দিয়ে আপনার পক্ষে ভাল।

গগন—আমার এখনকার চাকরিতে যে খুব খারাপ আছি তা বলছি না—মাইনে অবশ্য কম, কিন্তু কাজটার অন্যরকম মূল্য আছে—সরকারের নিজস্ব কাগজ Agricultural Monitor-এ আমাকে যে সব প্রবন্ধ লিখতে হয়, বৈজ্ঞানিক মহলে পর্য্যন্ত তা নিয়ে সাড়া পড়ে গেছে। এমন কি Agricultural Experts-রা পর্য্যন্ত বলেছেন যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে আমার উপদেশ মত কাজ করাতেই দেশে কোন খাদ্যসমস্যা দেখা দেয় নি এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে আমার উপদেশ ignore করাতেই সর্ব্বত্র হা অন্ন, হা অন্ন রব উঠেছিল।

নিবারণ—আগেও আপনার কাছে এ কথা শুনেছি।

গগন—বড় কাকা কিন্তু এসব প্রশংসায় কান দিতে চান না। বলেন, ওসব প্রশংসা ধুয়ে কি খাবে। ওখানে তোমার চাকরির আর কোন উন্নতির আশা নেই—বিয়ে করেছ, ভবিষ্যতে ছেলেমেয়ে হবে—এখন থেকে চেষ্টা করতে হবে একটা বড়মাইনের Secure Position-এর।

নিবারণ—তিনি অবশ্য ঠিক কথাই বলেছেন।

গগন—তা হয়ত হবে। কিন্তু ব্যাপার কি জান ভায়া? আমি বিজ্ঞান বিভাগের লোকও নই, অর্থনীতিবিদও নই—এ দুয়ের থেকে আলাদা।

নিবারণ—তা ত ঠিকই।

গগন—তোমার কাছে বলেই বলছি—সম্প্রতি আমার লেখা একটি ছোট পুস্তিকা—এক বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের জন্যই অবশ্য লেখা—অবশ্য এ জাতের বই ত আর নভেলের মত বিক্রী হতে পারে না? আমার বইটি বিক্রী হয়েছিল ১১৯ কপি, না, আসলে বোধ হয় ১১৮ কপি বিক্রী হয়—একটা কপির কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। আমার কলমের যা জোর, তাতে লেখক হিসাবেও আমি একটা নতুন Career আরম্ভ করতে পারি।

নিবারণ—তবুও গগনদা আপনার কাকার উপদেশ মতই চলা উচিত। দেখবেন কাজের চাপ অনেক কম হবে—অবসরটা নিজের ইচ্ছামত কাটাতে পারবেন।

গগন—আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

নিবারণ—আমি ত শুনেছি ট্রেজারীতে একবার কাজ নিতে পারলে আর সারা জীবন ভাবতে হবে না।

গগন—খুবই খাঁটি কথা।

নিবারণ—গগনদা, আপনি যদি ভাল মনে করেন তবে এ নিয়ে আমি আরও দু'এক জায়গায় বলে দেখতে পারি।

গগন—না—সেটা ঠিক হবে না।

নিবারণ—হবে না?

গগন—না, একেবারেই ঠিক হবে না। বুঝতেই পারছ, আমার বড় কাকার মত একজন প্রতিপত্তিশালী লোক যখন কারও হয়ে চাকরির উমেদারী করেন—বিশেষতঃ সে-ব্যক্তি যদি নিজের সুযোগ্য ভাইপো হয়, সেক্ষেত্রে আর কারোর কি কিছু বলবার থাকে?

নিবারণ—তা যা বলেছেন, (একটু থেমে) আচ্ছা, চাকরিটা কলকাতাতেই ত হবে—সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের চাকরি হলে আবার অন্য যে কোন ষ্টেটে পোষ্টিং হতে পারে।

গগন—না হে না। ট্রেজারীর চাকরি কলকাতাতেই পোষ্টিং। আমার স্ত্রী কলকাতার বাইরে যেতে রাজী নয়—তা না হলে কবে বড় কাকা আমায় দিল্লীতে ভাল চাকরি করে দিতে পারতেন।

[বনলতা ঢুকবে এবং রাইটিং টেবিলের ড্রয়ার খুলতে খুলতে]

বনলতা—এই চিঠিটা একটু পড়ে দেখ ত। (চিঠি নিয়ে এগিয়ে এসে গগনকে দেবে) এই একটু আগে এসেছে—আমার খুলে দেখবার সময় হয় নি।

গগন—কার চিঠি?

বনলতা—হাতের লেখা দেখে বুঝতে পারছ না? প্রিয়ম্বদার—আমার বন্ধু প্রিয়দর্শিনীর গো।

গগন—তাই বল (চিঠি খুলে পড়তে থাকবে) ডারলিং লতা, দু'একদিনের ভেতরেই লেডী নীলিমা বাসুর কাছ থেকে ডিনারের নিমন্ত্রণ পত্র পাবি—তারিখটা এ মাসের ২৫শে। আমার কাছে তোর কথা শুনেই লেডী বাসু কি বললেন জানিস? She jumped at the notion of having you, saying that of course everybody knew how charming and pretty you are, and how delighted she would be to have you at any of her evenings. আমার মনে হয় হোষ্টেস অর্থাৎ আমার

বান্ধবী লেডী বাসুকে তোর ভাল লাগবে। আগে তোদের দু'জনের দেখা হোক—ওর বয়স তোর কত মনে হয় তখন তোর কাছে শুনব এবং তার পর ওর আসল বয়স বলে দিয়ে তোকে চমকে দেব। অবশ্য এখনও নীলিমাকে ex-beauty-র দলে ফেললে অন্যায় করা হবে। হাতের গড়ন, চোখের মাদকতা দেখলে এখনও বহু youngman চমকিয়ে ওঠে—আর এমন একটা বিশেষ ভঙ্গিতে হাসে, ভারি মিষ্টি লাগে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে নীলিমা অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল। কার কোথায় দুর্বলতা, কাকে দিয়ে কি কাজ হয়—এসব বেশ বোঝে। সত্যিকার বিদুষী মেয়ে।

[চিঠি পড়ার পর সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবে। গগন একবার নিবারণের দিকে হতাশার ভঙ্গিতে চাইবে। নিবারণ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মরিয়া ভঙ্গিতে বলে ফেলবে]

নিবারণ—এ মহিলা সম্বন্ধে এমন অনেক কথা শুনেছি, যা ঠিক প্রশংসনীয় নয়।

বনলতা—প্রিয়ম্বদার সম্বন্ধে ?

নিবারণ—না, লেডী বাসুর কথা বলছি।

গগন—তা হলেই দেখছ এই নেমন্তন্ন তোমার accept করা উচিত নয়।

নিবারণ—আমি আপনাকে বলছি মিসেস মিটার, নীলিমা বাসুর circle-এর সঙ্গে মেশা আপনার পক্ষে উচিত হবে না।

গগন—আমিও নিবারণের সঙ্গে একমত।

বনলতা—এ আমি আগেই জানতাম। বেশ, তোমারই হুকুমমাফিক এখন থেকে চলব।

গগন—তার মানে ?

বনলতা—নীলিমা বাসুর নেমন্তন্ন গ্রহণ না করলেও অন্য জায়গায় যাওয়া যেতে পারে। তবে একটা অনুরোধ করছি—বাইরের লোকের সামনে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করাটা আমি পছন্দ করি না। এসব কথা আমাদের দু'জনের মধ্যে হওয়াটাই ভাল না কি ?

গগন—কি বলছ বল দেখি। নিবারণ কি আমাদের কাছে বাইরের লোক হল নাকি ? কি হে ভায়া, দু'জনে বুঝি ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে ? (হেসে উঠবে)

[নিবারণ একটু বোকা হাসি হেসে, বুক-সেল্ফ থেকে একটা বই টেনে নিয়ে দেখতে থাকবে। বনলতা এগিয়ে আসবে]

বনলতা—যাক, তুমি আর নিবারণবাবু যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত, এটা শুনেও আমার বেশ ভাল লাগছে।

গগন—তার মানে ?

বনলতা—তার মানে কোন ভদ্রমহিলার নামে কুৎসা করবার একটা সুযোগ পেলে তোমাদের পুরুষদের একটা পাশবিক উৎসাহ দেখা যায়—

গগন—তুমি কি এই নেমন্তন্ন যাবার জন্য এতই উৎসুক ?

বনলতা—ওকথা আমি ভুলেই গিয়েছি। আমার শুধু খারাপ লাগে তোমাদের এই বিশ্রী ধরনের চিন্তাধারা দেখে।

গগন—এত Seriously আমাদের কথাটাকে নিচ্ছ কেন লতা। (হাসির সঙ্গে) তাছাড়া তুমি কোন কিছু ঠিক করলে কেউ বাধা দিতে পেরেছে। এ বাড়ীতে আসল কর্ত্তা কে—কার কথায় সব চলে, সে কি তোমার অজানা ? আর আজ এই ট্রেজারীর চাকরিটার বিষয় ভাবতে ভাবতে অন্য কোন কথা আমার মাথায় ঢুকছে না।

বনলতা—তা বেশ বুঝতে পারছি।

গগন—আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় এ চাকরিটা পাবার আমার চান্স আছে ?

বনলতা—আমাকে তুমি এবিষয়ে কিছু জানাতে চাইছ না। অথচ অনেক দিক থেকেই আমি তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারতাম।

গগন—কি রকম ?

বনলতা—সরকারী মহলে প্রিয়ম্বদার কতটা হাত আছে জান ? আর সে যে কি চোখে তোমাকে দেখে কি বলব। কত সময় বলে, লতা, তোর স্বামীর মত যদি আমার স্বামীটি হত—

গগন—বলে নাকি ?

বনলতা—ওর স্বামীকে ত জান ?

গগন—অদ্ভুত ধরনের। প্রিয়ম্বদাকে ত তা হলে এতদিন misjudge করে এসেছি।

বনলতা—প্রিয়ম্বদা লেডী বাসুর বাড়ীতে নেমন্তন্ন arrange করল, আর তুমি চাইছ আমি refuse করি—শুনে আমার হাসি পেল। তাতে ক্ষতি হবে কার ? জান, ওঁর ওখানে ক্যাবিনেট মিনিষ্টাররা

পর্য্যন্ত নেমন্তন্ন রাখতে যান, তাছাড়া সহরের যত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ওখানে দেখবে।

গগন—মন্ত্রীরা পর্য্যন্ত যান ?

বনলতা—ওখানে কোন-না-কোন মন্ত্রীর সঙ্গে সুযোগ-সুবিধামত আলাপ হবেই। চাকরির কথাও সুবিধামত তাদের বলে রাখতে পারবে এবং পেয়েও যাবে। তোমার বড় কাকা আর তাঁর বন্ধুরা ত এই চাকরির ব্যাপারে কম ঘোরালেন না···

গগন—হয়ত তোমার কথাই ঠিক। আরও কিছুদিন দেখি—তারপরে তোমার বুদ্ধি মতই অন্যদের সাহায্য নিতে হবে। যাই, আর একবার বড় কাকার বাড়ী ঘুরে আসি, দেখি হয়ত দেখা হয়ে যেতেও পারে। (নিম্নস্বরে) আমি কি নিবারণকে সঙ্গে নিয়ে যাব না; তোমরা দু'জনে গল্প করবে ?

বনলতা—(নিম্নস্বরে) থাকুক, একটু গল্প করা যাবে, He can be tiresome, but our can always laugh at him.

গগন—এ কিন্তু বেচারী নিবারণের প্রতি তোমার অবিচার! আমাদের সম্বন্ধে ও কি রকম good natured আর obliging বল ত ?

বনলতা—(স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে) এ ধরনের মেয়েলি পুরুষকে মেয়েরা কখনও বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না, বুঝলে ?

গগন—(হেসে উঠে) Naughty girl! (নিবারণের দিকে তাকিয়ে স্বরগ্রাম উঠিয়ে) নিবারণ, বইটা রেখে এখানে এসে লতার সঙ্গে বসে গল্প কর। আমাকে একটু বেরোতে হবে। (প্রস্থান)

(নিবারণ বই হাতে এদিকে উঠে আসবে)

বনলতা—এখন দেখছ নিবারণ, আমাদের কত সাবধানে চলতে হবে। আর একটু আগে যদি আমার স্বামী ঘরে ঢুকত, আর তোমার কথাগুলো শুনতে পেত, আমার জীবনটা সম্পূর্ণ ruined হয়ে যেত না কি ? এখন বুঝতে পারছ বোধহয় ?

নিবারণ—এটা ভালভাবেই বুঝছি আমাকে কিভাবে এতক্ষণ ধরে বোকা বানিয়েছ।

বনলতা—কি বিষয়ে ?

নিবারণ—চিঠিটার ব্যাপারে।

বনলতা—ওঃ, চিঠিটা!

নিবারণ—আমাকে প্রথমেই ওটা দেখালে পারতে—

বনলতা—আমি বুঝতে পেরেছিলাম চিঠিটা পড়ে তুমি বিরক্ত হবে, শেষ পর্য্যন্ত হলেও তাই। তা ছাড়া ওটা ছিল আমার একটা trap। কতদূর তুমি যেতে পার পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। (একটু থেমে) এখন বুঝতে পারছ, কত আজেবাজে চিন্তা তোমার মাথায় আসে ?

নিবারণ—কিন্তু গগনদাকে ত চিঠিটা দেখালে।

বনলতা—আমার স্বামীকে আমি আমার সমস্ত চিঠিপত্র খুলবার এবং পড়বার অবাধ অধিকার দিয়েছি। আমি জানি এতে করে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। (একটু থেমে) আচ্ছা, এবার বল দেখি তুমি হঠাৎ কিছুদিন থেকে এতটা jealous হয়ে উঠেছ কেন ? আমি মনে মনে হিসাব করে দেখেছি এটা সুরু হয়েছে গত তিন সপ্তাহ আগে থেকে বোধ হয় ১৫ই ডিসেম্বর থেকেই এটা আমার নজরে আসে।

নিবারণ—তারিখটা পর্য্যন্ত মনে আছে ?

বনলতা—তা আছে, কিন্তু ও নিয়ে আমি তর্ক বাড়াতে চাই না। অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে, এখন একটু ভালভাবে কথাবার্ত্তা বললে কারো কোন ক্ষতি হবে না।

নিবারণ—(একটু ইতস্ততঃ করে) আজ বিকেলে কোথায় গিয়েছিলে লতা ?

বনলতা—আজ অনেকবারই এ প্রশ্নটা করেছ আর আমি উত্তর দিতে ভুলে গেছি। আজ—আমাকে যেতে হয়েছিল···(একটু থেমে) আমার দর্জির ওখানে। আশা করি এতে তোমার কোন আপত্তি হবে না ? এখন বল দেখি এতে কি অপরাধ হয়েছে—? আমার সম্বন্ধে তোমার আসল অভিযোগটা কি ?

নিবারণ—তোমাকে আজকাল আমি কাছে পাই না একেবারে—

বনলতা—এখন কি আমি এখানে তোমার কাছে—বসে নেই ?

নিবারণ—বেশীর ভাগ সময়েই তুমি আজকাল বাইরে বাইরে থাক।

বনলতা—দেখা আমাদের হয়ই, কিন্তু যখন দেখা হয় বেশীর ভাগ সময়েই তুমি সুরু কর অনুযোগ এবং অভিযোগ, তার ফলে সব ব্যাপারটা হয়ে ওঠে অত্যন্ত

তিক্ত। অথচ ইচ্ছে করলে অত্যন্ত সুন্দরভাবেই আমরা আমাদের সময়টা কাটাতে পারি।

নিবারণ—তোমার জন্য প্রতীক্ষা করে করে গত সপ্তাহ, তার আগের সপ্তাহ এবং তারও আগের সপ্তাগুলো আমার কেটেছে।

বনলতা—অতএব স্থির সিদ্ধান্তে এসেছ যে আমি তোমাকে ignore করছি। তোমাকে অবহেলা দেখাচ্ছি। তুমি কি মনে কর আমি নিজের ইচ্ছামত সবকিছু করতে পারি। বিকেলবেলাগুলো তোমাকে meet করা ছাড়া—

বনলতা—আমার অন্য কাজ থাকতে পারে না? আমার কি কোন responsibilities নেই মনে কর? একটা সংসারের সবকিছু আমাকে চালাতে হচ্ছে—সবকিছু দেখতে হচ্ছে—নিজের positions পুরোমাত্রায় বজায় রাখতে হচ্ছে। মনে রেখ, এই সব দায়িত্ব শেষ করে তবেই আমার ফূর্ত্তি করবার অবসর। তা ছাড়া একটা কথা তুমি ভুলে যাও যে আমি বিবাহিত।

নিবারণ—আমার কিন্তু মনে হয়, লতা, আমার প্রতি আর তোমার কোন interest নেই, হয়ত তুমি নতুন কাউকে খুঁজছ এবং পেয়েও গেছ।

বনলতা—এসব তোমার উদ্ভট কল্পনা। যাক্‌গে, একটু আগে গগন তোমাকে কি বলছিল?

নিবারণ—ট্রেজারীতে কি নতুন চাকরির চেষ্টা করছে, সেই সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল।

বনলতা—তুমি অবশ্য এতে কোন interest পাচ্ছিলে না?

নিবারণ—তার মানে?

বনলতা—আসলে ত তুমি গগনকে পছন্দ কর না।

নিবারণ—গগনদাকে আমি অত্যন্ত বেশী লাইক করি।

বনলতা—অত্যন্ত বেশী মানেই কিছু না।

নিবারণ—বলছ কি? আমার এবং তোমার থেকে বেশী হিতাকাঙ্ক্ষী গগনদার আর কে আছে?

বনলতা—তা হলে ওর চাকরির বিষয়ে তুমি এত উদাসীন কেন?

নিবারণ—উদাসীন মোটেই না—আমি ত গগনদাকে বললাম—যদি আমার দ্বারা কোন সাহায্য হয়…

বনলতা—বলেছিলে নাকি! ধন্যবাদ। তাই জন্যই ত বলে প্রেমিকরা মেয়েদের সবদিক দিয়ে সেরা বন্ধু।

নিবারণ—বন্ধুত্বের কথা যখন তুললে—তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাকে deceive ক'রো না।

বনলতা—আবার সেই আগের ঝগড়াতে ফিরে এলে—আচ্ছা এতে করে তোমার কি লাভ হচ্ছে। আমার সম্বন্ধে কোন কিছু জানতে পেরেছ? জানবে কোথা থেকে—জানবার মত ত কিছু ঘটে নি। মেয়েদের ভালবাসতে গেলে ধৈর্য্যশীল হতে হয়—অসম্ভব কিছু চাইতে নেই। তুমি ভালবাস একথা কেউ অস্বীকার করে না—কিন্তু সেজন্য একজন মেয়ের জীবনটা ত ধ্বংস করে দিতে পার না—তাকে সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে যেতে পার না—একথা বোঝ?

নিবারণ—নিশ্চয় বুঝি।

বনলতা—তা হলে ভবিষ্যতে আর আমার দরজার সামনে এসে আগলে বসে থেক না—আমাকে দেখে লাফালাফি করে হাত থেকে চিঠি ছিনিয়ে নিতে চেও না। Trinca থেকে সবেমাত্র চা খেয়ে ফিরছি—তোমাকে দেখে মনে হল আমাকে প্রায় শেষ করে ফেলবে।

[নিবারণ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠবে]

বনলতা—আবার কি হল?

নিবারণ—কোথা থেকে আসলে বললে?

বনলতা—Trinca থেকে চা খেয়ে?

নিবারণ—আগে না বললে, দর্জ্জির ওখানে গিয়েছিলে?

বনলতা—তা ত গিয়েছিলামই। দর্জ্জির ওখান থেকে ফেরার পথে Trinca-য় চা খেলাম। তাতে আপত্তিটা কিসের। দু'জায়গা একসঙ্গে যাওয়া যায় না? (একটু থেমে) আমার মনে হয় এবার তোমার বাড়ী যাওয়া উচিত।

নিবারণ—কেন, এখন তোমার আবার কি কাজ?

বনলতা—কোনই কাজ নেই, তবে আমার স্বামী ফিরে এসেও যদি তোমাকে এখানে বসে থাকতে দেখে তবে তার পক্ষে বিরক্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক হবে না।

নিবারণ—লতা?

বনলতা—কি বলতে চাও?

নিবারণ—আমি আমার ফ্ল্যাটেই এখন ফিরে যাচ্ছি।

বনলতা—আমি কি তাতে বাধা দিচ্ছি?

নিবারণ—না, বলছিলাম কি, এই সময়টাতেই আগে তুমি আমার ওখানে আসতে।

বনলতা—আচ্ছা, এখন যাও, দেখি কি করতে পারি।

নিবারণ—আমি কিন্তু তোমার আশায় বসে থাকব।

বনলতা—বললাম ত চেষ্টা করব।

নিবারণ—তবে যাই ?

বনলতা—এস। [নিবারণ চলে যাবে]

বনলতা—(জোরে ডাকবে) মালিনী !

[আয়া মালিনী ঢুকবে—যুবতী মালিনী, অসকাওয়াইল্ডের ভাষায় ভদ্র পরিবারে কাজ করবার পক্ষে একটু বেশী সুন্দর]

মালিনী—মেমসাহেব ?

বনলতা—ও ঘরে আমার ড্রেসিংগাউন আর বেডরুম স্লিপার ঠিক করে রাখ, আজ আর কোথাও বেরোব না।

[ধীরে ধীরে কার্টেন]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[একই দৃশ্য—কয়েকদিন বাদে বিকেলবেলায়। বনলতা একটি আয়নার সামনে বসে নিজের মেক-আপের ফিনিশিং টাচ্ দিচ্ছে, এমন সময় আয়া মালিনী এসে পাশে দাঁড়াবে—হাতে একটি স্কার্ফ। বনলতা মালিনীর দিকে না চেয়ে]

বনলতা—আমাকে কেমন দেখাচ্ছে রে মালিনী ?

মালিনী—ভারি সুন্দর মেমসাহেব।

বনলতা—সত্যিই ভাল দেখাচ্ছে ?

মালিনী—সত্যিই ভাল দেখাচ্ছে, মেমসাহেব !

বনলতা—এখন ক'টা বাজে রে ?

মালিনী—তা প্রায় চারটে হবে।

বনলতা—যা যা সঙ্গে নেব বের করে রেখেছিস্ ত ?

মালিনী—যা সব সময় নিয়ে বের হন, সবই রেখেছি।

বনলতা—চাবি, টাকা, পেনসিল, পাউডার···

মালিনী—সন্ধ্যের ভেতর মেমসাহেব আর ফিরছেন না ত ?

বনলতা—বোধ হয় না।

মালিনী—সে আমি আগেই জানতাম।

বনলতা—আগেই জানতিস !

মালিনী—আজ সাহেবের অফিসের ব্যাপারে ডিনার খাবার কথা না বাইরে ?

বনলতা—হ্যাঁ, ওদের এগ্রিকালচারেল সোসাইটির ডিনারটা আজ পড়েছে—

মালিনী—আমি বরাবর দেখেছি সাহেবের অফিসের ব্যাপারে, বাইরে কোন ডিনারে যেতে হলে মেম-সাহেবও চলে যান সেই বান্ধবীর সঙ্গে বাইরে খেতে। আপনার এই বান্ধবীকে কিন্তু একদিনও দেখলাম না মেমসাহেব—একদিন আনুন না এখানে ?

বনলতা—থাক্, আর ফাজলামো করতে হবে না।

মালিনী—মেমসাহেব, আমার যে ভাইয়ের কথা বলেছিলাম···

বনলতা—তোর ভাই ? ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ···

মালিনী—সে আবার একদিনের জন্য কলকাতা এসেছে।

বনলতা—অর্থাৎ সন্ধ্যেটা ছুটি চাই—বেশ, ছুটি মঞ্জুর।

মালিনী—(খুব গদগদ ভাবে) মেমসাহেবের মত ভাল মনিব যদি সবাই পেত—

বনলতা—(হেসে উঠে) যা যা, আর খোসামোদ করতে হবে না।

মালিনী—আর কিছু করতে হবে মেমসাহেব ?

বনলতা—না, তুই যা এখন।

মালিনী—একটা ট্যাক্সি ডেকে দেব ?

বনলতা—না, আমি নিজেই রাস্তার মোড় থেকে নিয়ে নেব।

[মালিনী বেরিয়ে যেতে যাবে এমন সময় দরজার কলিং বেল বেজে উঠবে—সে থেমে যাবে]

বনলতা—আঃ !

মালিনী—কে যেন এসেছে মেমসাহেব।

বনলতা—আমার কান কালা হয়ে যায় নি, আমিও শুনতে পেয়েছি।

মালিনী—(দেখে মনে হবে বেশ ঘাবড়িয়ে গেছে) এখন কি করি মেমসাহেব ?

বনলতা—বাইরে গিয়ে দরজাটা খুলে দেখ কে এসেছে—বলবি, আমি বাড়ী নেই।

মালিনী—কিন্তু যদি নিবারণবাবু এসে থাকেন ?

বনলতা—বললাম না যে বলবি আমি বাড়ী নেই।

মালিনী—বেশ, তাই বলব।

বনলতা—যদি সাহেবের কাছে কেউ এসে থাকেন, তাঁকে ষ্টাডিতে নিয়ে বসাবি।

মালিনী—আচ্ছা মেমসাহেব।

(দ্বিতীয়বার দরজার কলিং বেলের শব্দ হবে। মালিনী বেরিয়ে যাবে)

বনলতা—নিবারণ ঠিক জানে আজকেই এগ্রিকালচারেল সোসাইটির ডিনার। আমারই উচিত ছিল আরও তাড়া করা, তাহলে এতক্ষণে বেরিয়ে যেতে পারতাম। পনের দিন প্রায় দেখা হয় নি—আগেই বোঝা উচিত ছিল আজ এভাবে ও আমাকে ফাঁদে ফেলবে। (বাইরের দরজার কাছে গিয়ে কান পেতে শুনবে।)

হ্যাঁ, ওই এসেছে—মালিনীর সঙ্গে যেন কি সব কথা বলছে। পুরুষগুলো সবই এই ধরনের হয়। ওদের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে, একথা ইঙ্গিতে বার বার বুঝিয়ে দিলেও গ্রেসফুলি কিছুতেই রিটায়ার করবে না। এই জন্যই ওদের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত মুখের উপর অভদ্র ব্যবহার করতে হয়। যাই পাশের ঘরে।

(ভিতর দিকে চলে যাবে। নিবারণ ও মালিনী এসে ঘরে ঢুকবে।)

নিবারণ—ঠিক আছে মালিনী, ঠিক আছে।

মালিনী—আমার কথা বিশ্বাস করছেন না কেন দাদাবাবু, বেশ ত নিজেই খুঁজে দেখুন না বাড়ীতে কেউ আছেন কি না?

নিবারণ—তা হলে আমি এখানে বসে অপেক্ষা করি—

মালিনী—কার জন্য অপেক্ষা করবেন বুঝলাম না—সাহেব, মেমসাহেব দুজনেই বাইরে বের হলেন এইমাত্র।

নিবারণ—একসঙ্গে গেলেন?

মালিনী—না, সাহেব একদিকে গেলেন, মেমসাহেব অন্যদিকে।

নিবারণ—সাহেব কখন ফিরবেন বলে গেছেন?

মালিনী—না আমাকে কিছু বলেন নি।

নিবারণ—আর মেমসাহেব?

মালিনী—মেমসাহেব বাইরে ডিনার খেয়ে আসবেন।

নিবারণ—গগনদার সঙ্গে?

মালিনী—সাহেব ত অফিসের কাদের সঙ্গে বাইরে খাবেন···

নিবারণ—হ্যাঁ, তাই ত, গগনদার আজ এগ্রিকালচারেল সোসাইটির ডিনার।

মালিনী—তা হলে দাদাবাবু?

নিবারণ—তুমি তোমার নিজের কাজ কর গিয়ে—আমি এখানে বসে একটা চিঠি শেষ করি।

মালিনী—বেশ, তাই করুন—কিন্তু ওঁরা এখন কেউ আসবেন না বলে দিচ্ছি—(বেরিয়ে যাবে)

নিবারণ—এভাবে এখানে আসাটা যে কত বোকামি হয়েছে বেশ বুঝতে পারছি। এবার ধীরে-সুস্থে নিজের মনটাকে ঠিক করে নিতে হবে। ওর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে না ফেলতে পারলে আমার নিস্তার নেই, শেষবারের মতএবিষয়ে বনলতার সঙ্গে একবার আলোচনা হওয়া দরকার। যতটা জেনেছি তার থেকে বেশী কিছু জানবার আছে কি? দিনের আলোর মত এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ও শান্তনু সেনের প্রতি অনুরক্ত। একমাত্র সান্ত্বনার কথা এই যে, তাকেও হয়ত ভবিষ্যতে আর ভালবাসবে না। নিজের স্বামীকে ভালবাসতে পারলে না—এমন কি আমাকে পর্য্যন্ত ভালবাসলে না—নাঃ, এই শান্তনু সেনকেও আমাদেরই দলে একদিন নাম লেখাতে হবে। এ সময় গগনদাও যদি বাড়ী থাকত; সন্ধ্যেটা দুজনে গল্প করে কাটানো যেত। কি বোকার মত কথা বলে বনলতা, আমি নাকি গগনদাকে দেখতে পারি না। ওর সঙ্গে যখনই আমার গোলমাল হয়, অন্য যে কোন লোকের থেকে গগনদার সঙ্গেই আমার মেলে ভাল। তাছাড়া এই যে শান্তনু সেনের সঙ্গে এভাবে মিশছে এতে সবচেয়ে অবিচার হচ্ছে গগনদার প্রতি। আমার সম্বন্ধে না হয় কোনও নৈতিক কর্ত্তব্য নেই, কিন্তু বেচারী গগনদা? বিয়ে-করা স্ত্রী, সব কিছুরই ত একটা সীমা আছে, আমি যদি গগনদা হতাম? চুলোয় যাক গে গগনদা! কিছুতেই যে লতাকে ভুলতে পারছি না—আমার এই স্বর্গীয় প্রেম···

(বনলতা হঠাৎ ঘরে ঢুকবে···এবং নিবারণ চমকে উঠে বলবে)

তুমি এখানে···বাড়ীতে?

বনলতা—তাতে এত অবাক হবার কি আছে?

নিবারণ—কিন্তু মালিনীর মুখে যে শুনলাম···

বনলতা—সেই জন্যই ত তোমাকে এখানে দেখে আরও আশ্চর্য্য হচ্ছি। অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও যখন শুনলে যে আমরা এখানে নেই, তোমার চলে যাওয়া উচিত ছিল না কি?

নিবারণ—দু'সপ্তাহ তোমার কোন হদিস পেলাম না—ভাবলাম, অসুখও ত করতে পারে।

বনলতা—অনেক ধন্যবাদ, আমার জন্য ভেবে ভেবে এ ক'দিন ঘুম হয় নি বোধ হয়। যাই হোক এখন ত দেখছ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি, অতএব এবার যেতে পার।

(কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকবে)

নিবারণ—লতা···তুমি, তুমি কি এখন বাইরে বেরোবে?

বনলতা—বাড়ীতে বসে থাকবার জন্য নিশ্চয় এভাবে সাজপোশাক করি নি।

নিবারণ—তোমার কি খুব তাড়া আছে?

বনলতা—এমনিতেই আমার দেরি হয়ে গেছে।

নিবারণ—লতা, আজ গগনদার কৃষিসংস্থার ডিনার, আমরাও ত বাইরে গিয়ে কোথাও খেতে পারি এবং সে সময় নিজেদের সম্বন্ধে আলোচনা করে একটা শেষ মীমাংসায় আসতে পারি।

বনলতা—শেষ মীমাংসা?

নিবারণ—হ্যাঁ, অবশ্য বাড়ীতে বলে যাবে সেই বান্ধবীর কাছে যাবে এবং দুজনে কোন রেস্তোরাঁতে নৈশ আহার সমাধা করবে।

বনলতা—বান্ধবীর ব্যাপারটা এই মুহূর্ত্তেই শেষ করে দিতে চাই। সেই সব পুরানো দিনকে আর টেনে এনে লাভ নেই। আগেও অনেকবারই মনে হয়েছে ওই সব রেস্তোরাঁয় গিয়ে এডভেঞ্চার করাটা অত্যন্ত বোকামি। এখন বুঝছি শুধু বোকামি নয় অত্যন্ত দুঃসাহসিক ব্যাপার।

নিবারণ—তোমার সব কথাই আমি মেনে নিচ্ছি। এস না, অন্ততঃ বন্ধুভাবে খানিকটা আলোচনা করি।

বনলতা—তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে আজ নয়, কাল যদি তোমার সময় হয়···হবে?

নিবারণ—আমার ওখানে?

বনলতা—যেখানে তুমি বলবে?

নিবারণ—বেশ, কাল আমি বাড়ীতে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

বনলতা—As a friend?

নিবারণ—As a friend!

বনলতা—Very good.

নিবারণ—আবার শেষ মুহূর্ত্তে কোন কাজে আটকে যাবে না ত কাল?

বনলতা—তোমার মনে হচ্ছে কাল তা হলে আমি নাও যেতে পারি? বেশ সন্দেহই যখন হচ্ছে, আর একটা দিন ঠিক কর।

নিবারণ—শোন লতা, আমার মনের অবস্থাটা যদি একবার বুঝে দেখবার চেষ্টা করতে। আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তোমাকে কাছে পেতে চাই, আর যে কোন বাজে অজুহাত দেখিয়ে তুমি অন্য দশটা জায়গায় ঘুরে বেড়াও।

বনলতা—আচ্ছা ধরলাম তোমার কথাই সত্যি। তোমার সম্বন্ধে আমার ভেতরকার ওয়ারমথটা একটু কমে গেছে সম্প্রতি, কিন্তু সেটাকে ফিরিয়ে আনবার উপায় কি এভাবে আমাকে যখন-তখন বিরক্ত করা। সর্ব্বক্ষণ তোমার এই নালিশ আর ছিচকাঁদুনেপনা আর আমার সহ্য হয় না। এই সেদিন ঐ চিঠিটা নিয়ে কি বিশ্রী কাণ্ডটাই না করলে, তুমি কল্পনা করেছিলে আমার কোন প্রেমিক আমাকে ওই চিঠিটা লিখেছে।

নিবারণ—চিঠিটা আমাকে প্রথমে দেখালেই ত এত গোলমাল হ'ত না।

বনলতা—কেন দেখাব? আমাদের কি প্রাইভেসী বলেও কিছু থাকতে পারে না। যাকগে—এভাবে চললে সত্যি সত্যিই আমাদের মধ্যে একটা গণ্ডগোল বেধে যাবে। এই অবস্থায় সব দিক দিয়ে ভাল হয় কি জান, আমার মনে হয় তুমি কিছুদিন বাইরে থেকে holiday enjoy করে এস।

নিবারণ—হলিডে?

বনলতা—হ্যাঁ, যাও না, কদিন দার্জ্জিলিং বা সিমলা রা শিলং থেকে বেড়িয়ে এস না। We shall both be better for it.

নিবারণ—এই দারুণ শীতের সময়!

বনলতা—তা হলে চলে যাও বম্বে, ওখানে ত eternal spring! ছমাস ওখানে থেকে এস গিয়ে—

নিবারণ—ছ মাস!

বনলতা—That's not a life time. প্রথমটায় আমার থেকে দূরে থাকতে খারাপ লাগবে—কিন্তু তারপর দেখবে তোমার নার্ভস্‌গুলো soothed হয়ে যাবে। ছমাস বাদে যখন ফিরে আসবে এই চেঞ্জ-এর ফলে আর ঐ ছিচকাঁদুনে স্বভাবটাও থাকবে না।

নিবারণ—এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ, লতা?

বনলতা—এতক্ষণ কথাবার্ত্তার পর এই একটি প্রশ্নই বুঝি তোমার মনে এল?

নিবারণ—লতা, তোমাকে বলতেই হবে বাড়ী থেকে বেরিয়ে তুমি কোথায় যাবে?

বনলতা—কখন এই প্রশ্নটা করবে তাই ভাবছিলাম। আচ্ছা ধর, যাচ্ছি এক জায়গায় আর তোমাকে নাম করলাম আর এক জায়গার। তুমি কি করে জানবে আসলে কোথায় গেছি?

নিবারণ—তোমাকে ফলো করলেই জানতে পারব।

বনলতা—নিজের মুখে কথাটা বলে ফেলেছ, ভাল করেছ। মনে করো না আমি বুঝতে পারি না যে আগেও তুমি বহুবার এভাবে আমাকে ফলো করেছ। অনেক সময়ে ধরেও ফেলেছ যেখানে যাব বলে গেছি,

আসলে গিয়েছি একেবারে অন্য জায়গায়। কিন্তু তার জন্য আমার কিছু করতে পেরেছ? I do as I please with my own life. আর এ কথাও জেনে রাখ, আমার গতিবিধি সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ নেবার একমাত্র অধিকার আমার স্বামীর।

নিবারণ—আমি আগে থেকেই জানতাম।

বনলতা—কি জানতে আগে থেকে?

নিবারণ—You have a lover.

বনলতা—কেন, স্বামীর কাছে ছাড়া অন্য কারোর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে চাই না বলে? (একটু থেমে) আচ্ছা, ধর, তোমার কথাই ঠিক—আমার একজন প্রেমিক আছে। সেক্ষেত্রে তোমার অবস্থায় থাকলে ভদ্রলোক হলে মানুষ কি করে—either he says farewell to her, or he holds his tongue.

নিবারণ—অর্থাৎ বলতে চাও, আমি এ দুয়ের একটাও করছি না।

বনলতা—ঠিক তাই।

নিবারণ—এটা কি তোমার একটা অভিযোগ?

বনলতা—অভিযোগ ত বটেই!

নিবারণ—তা হলে তুমি স্বীকার করছ যে তোমার একজন প্রেমিক আছে—এবং···তুমি আমাকে ঠকিয়ে আসছ কিছুকাল থেকে।

বনলতা—বেশ ত বলেই ফেল না নামটা—তোমার কাছ থেকেই জেনে নিই কে এই ডনজুয়ান। তার পর তার সঙ্গে আলাপ করে সত্যিসত্যিই এবার প্রেম সুরু করব।

নিবারণ—(কাতর ভাবে) বনলতা!

বনলতা—(বেশ গম্ভীর ভাবে) শোন, একটা কথা তোমাকে বলতে চাই, তুমি আঘাত পাবে বলেই কথাটা এতদিন তোমাকে বলি নি। (একটু থেমে) দেখ, আমার স্বামী আছেন, ঘর-সংসার আছে, ছেলেমেয়ে আছে, কিন্তু তবুও আমি আরও কিছুটা বেশী চেয়েছিলাম—একই সঙ্গে চেয়েছিলাম স্বর্গ এবং পৃথিবী। হয়ত সব মেয়েই এটা চায়—স্বপ্ন দেখতাম এমন একজনকে চাই, যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারব এবং তার কাছ থেকেও প্রতিদান আশা করব শুধু ভালবাসার। তুমি আমাকে আমার সেই স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যাবে—স্বর্গকে বাস্তবে এনে দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। কিন্তু আজ তোমার-আমার সম্বন্ধটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? অন্য কোন নারীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত

তা হলে তুমি স্বীকার করছ যে তোমার একজন প্রেমিক আছে

করলে হয়ত তোমাদের জীবন সার্থক হয়ে উঠত, কিন্তু বুঝতে পারছ আমাদের সম্বন্ধটা সেরকম হতে পারে নি—with me you have failed utterly.

নিবারণ—বনলতা!

বনলতা—যাক্‌গে, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আমি স্বীকার করে নিচ্ছি আমারই দোষ হয়েছে প্রথম থেকে···

নিবারণ—তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে লতা?

বনলতা—না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।

নিবারণ—আমারও ভুল হয়ে থাকতে পারে।

বনলতা—ওকথা সত্যি হলেই বা বলে লাভ কি?

নিবারণ—আমি জানি, আমিই ভুল করেছি, লতা।

বনলতা—বোধ হয় তাই করেছ।

নিবারণ—তা হলে আমি উঠি।

বনলতা—সেটাই সব দিক দিয়ে ভাল হবে।

নিবারণ—রাগের মাথায় অনেক আজেবাজে কথা তোমায় বলেছি, আমায় তুমি ক্ষমা কর লতা। আমি জানি ভেতরে ভেতরে তুমি এখনও আমাকে ভালবাস। আজ এখানে আসবার সময় মনে হয়েছিল সন্ধ্যাটা আগের মত আমার ওখানে একসঙ্গে কাটাব। তুমি রাজী হলে না—আর আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। আমাকে ক্ষমা কর, বনলতা।

বনলতা—তুমি এখন ওঠ নিবারণ। নীলিমা বাসুর ওখান থেকে এখুনি গাড়ি আসবে আমাকে নিতে।

নিবারণ—তুমি কি নীলিমা বাসুর সঙ্গেই ডিনারে যাবে?

বনলতা—ও মহিলার ওপর তোমার যতই রাগ থাক, ওঁর সঙ্গেই বাইরে গিয়ে ডিনার খাব।

নিবারণ—বেশ, তোমার কথাটা সত্যি বলেই ধরে নিচ্ছি।

বনলতা—ফের সুরু করলে। একবার অন্ততঃ যাবার আগে ঝগড়া না করে বেশ বন্ধুর মত বিদায় নিয়ে যাও। ভবিষ্যতে যখন দেখা হবে তোমার হলিডের প্রোগ্রামটা ঠিক করা যাবে।

নিবারণ—এই না ঠিক করলে কাল আমার ওখানে যাবে?

বনলতা—তা বলেছিলাম—কিন্তু সত্যিই কি তুমি চাও, আমি যাব?

নিবারণ—আমি সব সময়েই তোমাকে কাছে পেতে চাই।

বনলতা—তা হলে মনে রেখ ওই সন্দেহ-বাতিকটি তোমাকে ছাড়তে হবে। যতক্ষণ এখানে আছ বেশ আছ। আর যেই দরজার বাইরে গেলে অমনি আমার গতিবিধি সম্বন্ধে গোয়েন্দাগিরি সুরু করলে—এ যেন আর না হয়।

নিবারণ—তা হলে কাল দেখা হবে।

বনলতা—বেশ, কালকে যাব।

নিবারণ—ঠিক বিকেল পাঁচটায়—আমি তোমার জন্য বসে থাকব—আচ্ছা, চলি (উঠে চলে যাবে)

বনলতা—যাক, শেষ পর্য্যন্ত ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কি বিপদেই না পড়া গেছিল। ও যখন রেগে যায়, ভেতরে ভেতরে বেশ মজা লাগে। কিন্তু আবার অনেক সময় ভয় হয় যে কাঁদতে সুরু করবে। তা হলেই গেছি আর কি! বাইরে বের হবার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক আশেপাশে কোথাও আছে নাকি। (জানলার ধারে গিয়ে পর্দা টেনে দেবে) না, ঐ ত চলে যাচ্ছে। বেচারীর মাথাটা নুয়ে পড়েছে, একটু একটু মায়া হচ্ছে এখন—কাল ওর ওখানে একবার নিশ্চয় যাব। কিন্তু কি হল আবার? ফিরে আসবে নাকি? সামনের বাড়ীটার কোনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। ব্রুট, শয়তান, মন্‌ষ্টার! আমার ওপর স্পাইইং করার ইচ্ছে। ওকে এবার একটু ভাল করে শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে।

(মাথা নীচু করে গগন বাড়ী ঢুকবে। মুখে একটা থম্‌থমে ভাব। স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে যেতে থাকবে)

বনলতা—কি ব্যাপার গগন? কি হয়েছে? (গগন থেমে যাবে) চুপ করে আছ কেন? বল না কি হয়েছে?

গগন—দোহাই বনলতা? আমি এখন একটু একলা থাকতে চাই।

বনলতা—কিন্তু এমন প্যাঁচার মত মুখ করে রেখেছ কেন? বল না, কি হয়েছে?

গগন—অনেক কিছুই হয়েছে, কিন্তু এখন এ নিয়ে কোন আলোচনা করবার ইচ্ছে আমার নেই।

বনলতা—কিন্তু কি হয়েছে তা ত বললে না।

গগন—একটু বাদেই সব জানতে পারবে।

বনলতা—তা হলে নিশ্চয় গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে?

গগন—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বাইরে যাচ্ছিলে?

বনলতা—হ্যাঁ, মার্কেটে কিছু জিনিষ কিনব—

গগন—তা হলে যাও, সপিং করবারই এটা সময় বটে—

বনলতা—একটু খুলেই বল না কি হয়েছে?

গগন—ওখানে আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

বনলতা—কোথায়?

গগন—ট্রেজারীতে, সেই চাকরিটার কথা বলছি।

বনলতা—এতেই এত ঘাবড়ে গেলে, তুমি পুরুষ মানুষ না?

গগন—আসলে সমস্ত দোষটাই কাকার, তিনি কিছুই করেন নি।

বনলতা—তুমি এজন্য এমন ঘাবড়িয়ে গিয়েছ, আর কেন? না একটা ছোট পরিকল্পনা ভেস্তিয়ে গেছে বলে।

গগন—কিন্তু আমার সমস্ত আশা, ভবিষ্যৎ সবই নির্ভর করছিল এই ছোট্ট প্ল্যানটার ওপর।

বনলতা—পরিকল্পনার নিয়মই হচ্ছে ওই, দশটা ভেস্তে যায় ত একটা সফল হয়ে ওঠে, আর যখনই সাফল্য আসে বাকীগুলোর কথা লোকে ভুলে যায়।

গগন—আমার ক্ষেত্রে আর সাফল্য কখনও আসবে না।

বনলতা—এবার হয়ত আসবে না। কিন্তু পরের বার যে আসবে না কে সেকথা বলতে পারে? যাকগে, এভাবে নিস্তেজ হয়ে গেলে চলবে না—Never accept a failure। ধর, সত্যিই যদি কোন দুর্ভাগ্য ঘটত আমাদের জীবনে।

গগন—কি রকম?

বনলতা—ধর, রাস্তায় বেরিয়ে আমি একটা এ্যাকসিডেন্টে মারা গেলাম—

গগন—কি যে বল!

বনলতা—তোমার ঐ কাকা সম্বন্ধে আমার আগে থেকেই সন্দেহ ছিল। তোমাকে ত পরশুই বলেছিলাম যে আসলে উনি কোন কাজেরই নন। তোমার সম্বন্ধে ওর কোন বিশ্বাস নেই; তোমার কর্ম্মক্ষমতা, তোমার লেখাগুলো, এমন কি তোমার স্ত্রীর বিষয়েও উনি কোন উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না। সুতরাং ঐ জাতীয় লোক তোমার জন্য কিছু করে দেবেন একথা ভাবাই তোমার ভুল হয়েছিল। আর সমাজের উচ্চস্থানীয় লোকেরা ত তোমার কাকাটিকে দেখলে হাসেন।

গগন—কিন্তু নিজে ত বড় চাকরি করতেন।

বনলতা—কি করে যে চাকরিতে এতটা উঠেছিলেন তাই অবাক হয়ে ভাবি। দেখতেও যদি অত কুৎসিত না হতেন বা চিরকুমার হলেও বা বুঝতাম কোন উচ্চস্থানীয়া মহিলার ইনফ্লুয়েন্সে এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যা চেহারা, যৌবনেও যে কোন মহিলা ওঁর দিকে ফিরে তাকিয়েছে, তা আমার মনে হয় না।

গগন—(হা হা করে হেসে উঠে) কি যে বল!

বনলতা—এবার তোমার ঐ চাকরিটার সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে বল দেখি।

গগন—আর বিশেষ বলবার কি আছে বল?

বনলতা—চাকরিতে কাকে নেওয়া হবে তা কি একেবারে ঠিক হয়ে গেছে?

গগন—তা মোটামুটি হয়ে গেছে।

বনলতা—মোটামুটি বলতে কি বোঝ। কারোকে কি নিয়ে নেওয়া হয়েছে পোষ্টটায়—

গগন—এখনও কিছু announced হয় নি। তবে একজনকে একরকম কথা দেওয়া হয়ে গেছে—কাকাকে ওরা জানিয়ে দিয়েছে যে ও চাকরি আমার হবে না।

বনলতা—তবু মন্দের ভাল। অন্তত এটুকু বুঝলাম exact positionটা কি।

গগন—কিন্তু তাতে আমার সুবিধা কি হবে।

বনলতা—কিন্তু কাকে ও চাকরিতে নেওয়া হবে জান?

গগন—একটি অতি সাধারণ লোককে, একেবারে অজ্ঞাত কুলশীল বলতে পার।

বনলতা—লোকটি বিয়ে করেছে কি না জান?

গগন—বিয়ে করার সঙ্গে এই চাকরিটার কি সম্বন্ধ বুঝলাম না।

বনলতা—তোমার বুঝে দরকার নেই, যে প্রশ্ন করেছি তার জবাব দেও।

গগন—হ্যাঁ, লোকটি বিবাহিত।

বনলতা—মেয়েটি ইয়ং?

গগন—হ্যাঁ।

বনলতা—দেখতে সুন্দর?

গগন—তা সুন্দরই বলতে পার, কিন্তু—

বনলতা—বোধ হয় একটু ফ্লার্ট?

গগন—কিন্তু···তাতে—

বনলতা—The hussy! তুমি এসব বুঝবে না···

গগন—কিন্তু সরকারী চাকরিতে তুমি যা সন্দেহ করছ ওসব হতে পারে না।

বনলতা—(শ্লেষের সঙ্গে) তা আমি জানি। যাক, আমি চট করে একটা চিঠি লিখছি—এখন আমাকে disturb ক'রো না (টেবিলের কাছে গিয়ে বসবে এবং ড্রয়ার থেকে লেখবার সরঞ্জাম নিয়ে চিঠি লিখতে সুরু করবে)।

গগন—কাকে চিঠি লিখছ?

বনলতা—আঃ, এখন আমাকে disturb ক'রো না বলছি না?

গগন—কিন্তু আমারও ত জানা দরকার?

বনলতা—লোলাকে (চিঠি লিখতে থাকবে।)

গগন—লোলা আবার কে?

বনলতা—নীলিমা বাসু গো। নীলিমা থেকে নীলা, নীলা থেকে লোলা—বন্ধু-বান্ধবীরা লোলা বলে ডাকলেই খুশী হয় (লিখতে থাকবে)। ওকে

চিঠি লিখে দিচ্ছি এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে, তারপরে দেখা করে সব বলব। এবার তুমি দেখবে তোমার কাকার দৌড় কতটা আর আমাদের লোলার ক্ষমতা কতটা।

গগন—বেশ বেশ, তাই ভাল। কাকা যেখানে ডিগবাজি খেয়ে গেলেন, সেখানে তোমার লোলা যদি সাক্‌সেস-ফুল হন, আমারই ত লাভ।

বনলতা—(চিঠি শেষ করে আটকে দেবে এবং খামের উপর ঠিকানা লিখতে লিখতে) এখন তুমি কি করছ?

গগন—চুপচাপ বাড়ীতেই বসে থাকব।

বনলতা—বসে বসে এই চাকরির ব্যাপারটা নিয়ে mope করবে, সে হবে না। শোন, এই চিঠিটা নিয়ে তোমাকে এখুনি নীলিমা বাসুর বাড়ীতে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে—খামের ওপরেই ওর বাড়ীর ঠিকানা দেওয়া আছে।

গগন—(চিঠিটা নিয়ে খামের ঠিকানা দেখবে।) তোমার লোলা লাউডন ষ্ট্রীটে থাকেন নাকি?

বনলতা—বড়লোক বড়দের পাড়াতেই থেকে থাকে।

গগন—তা ত বটেই।

বনলতা—হেঁটেই চলে যাও। পুরুষদের বিকেলে একটু হেঁটে বেড়ান ভাল—স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ওখান থেকে ফেরবার পথে তোমার কাকার বাড়ী ঘুরে এস।

গগন—কাকার বাড়ী! একটু আগে তুমি নিজেই ত বললে কাকাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না।

বনলতা—কিন্তু এই ধরনের লোককেও দরকার হয় পৃথিবীতে। এই জন্যই এরা সবার ধন্যবাদ দাবি করতে পারে।

গগন—কাকার বাড়ীর ধার-পাশ দিয়েও আমি যাব না, ওঁকে এবার বেশ কড়া একটা চিঠি লিখে দেব—জানিয়ে দেব, আর ওঁর সাহায্য দিয়ে আমার দরকার নেই, ওঁর ইনফ্লুয়েন্সের বহরটা যা দেখলাম!

বনলতা—এসবের কিছুই তোমাকে করতে হবে না গগন। বাইরে প্রত্যেকেই জানে তোমার কাকা তোমার চাকরির উন্নতির জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। সুতরাং আসলে যার সুপারিশেই তোমার চাকরিটা হোক না কেন, বাইরে ব্যাপারটা এইভাবে প্রচার করতে হবে যেন তোমার কাকাই তোমার চাকরি যোগাড় করে দিয়েছেন, বুঝলে?

গগন—কেন?

বনলতা—এটা ত তুমি চাও না যে লোকে জানুক নীলিমা বাসুর পক্ষপুট আশ্রয় করে তুমি চাকরি পেয়েছ।

গগন—তা বটে!

বনলতা—Besides no favour are ever officially due to her or her friends.

গগন—(বনলতার মাথায় টোকা মেরে) লতা, তোমার এই ছোট্ট মাথায় যে কতটা বুদ্ধি আছে, একথা কজন লোকই বা মানে। What should I ever do without you?

বনলতা—What indeed?

গগন—তোমার চিঠিটা নীলিমা বাসুর বাড়ী ফেলে দিয়ে সোজা চলে যাব কাকার বাড়ী। আর সন্ধ্যাবেলায় এগ্রিকালচারেল ডিনার—না থাক, আজ আর যাব না।

বনলতা—না, যাবে বৈকি। ভবিষ্যতের কথা ত এখনও অনিশ্চিত। সুতরাং যেভাবে যা এতদিন করে আসছিলে সবই ঠিক থাকবে। আর তাছাড়া এসব ডিনারে যেতে ত তোমার ভালই লাগে।

গগন—তা ঠিক।

বনলতা—ওখানে ডিনারে তোমারও ভাল লাগবে তোমার এগ্রিকালচারেল ফ্রেণ্ডসদের মিট করতে, আর আমিও অনীতার সঙ্গে বাইরে গিয়ে আমাদের সাদাসিদে ডিনার এবং অনীতার খোস গল্পগুজব প্রাণ ভরে উপভোগ করব। আমি না গেলে বেচারী বড় দুঃখ পাবে।

গগন—অনীতা?

বনলতা—কি আশ্চর্য্য, অনীতার নামটাও ভুলে গিয়েছ? প্রিয়ম্বদার থেকেও যে সে আমার বেশিদিনের বন্ধু।

গগন—(হা হা করে হেসে উঠে) সত্যিই আমার কি ভুলো মন, ইনি হচ্ছেন তোমার সেই বান্ধবী, যাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার কোন দিন হয় নি।

বনলতা—হ্যাঁ, যাঁকে দেখবার সুযোগ তোমার এ পর্য্যন্ত হয় নি।

গগন—আচ্ছা, আমি তা হলে চলি। (চিঠি হাতে বেরিয়ে যাবে)।

বনলতা—(আড়ামোড়া ভেঙ্গে) এরপরেও কি কেউ বলবে আমার ধৈর্য্য নেই। যাক, শেষ পর্য্যন্ত তা হলে বোধ হয় বের হতে পারব, পাঁচটা বাজতে চলল অথচ এখন পর্য্যন্ত ঘরে আটকা। গগন এখন

কোথায় কোথায় থাকবে তাও জানি, আর কাল পর্য্যন্ত নিবারণের তরফ থেকেও ভয় নেই—Just for once the loast is fairly clear.

(উঠে দাঁড়াতেই নিবারণ এসে ঢুকবে)

বনলতা—This is too much !

নিবারণ—তোমার মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পারছি যে আমি ফিরে আসতে তুমি ভীষণ চটে গিয়েছ। আমি এখান থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি একটু দূরে গগনদা, প্রথমটায় ভাবলাম কাছে গিয়ে দেখা করি, তারপর ভাবলাম আমি এখানে এসেছি একথা না হয় নাই জানালাম, উল্টোদিকের রাস্তা দিয়ে সরে গেলাম, দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম যে গগনদা বাড়ীতে এসে ঢুকলেন। তখনই আমার চলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পারলাম না। মনে হল নীলিমা বাসুর গাড়ি ত এতক্ষণে এসে যাওয়া উচিত ছিল। এরপর গগনদা একটা চিঠি হাতে বেরিয়ে এল এবং অন্যদিকে চলে গেল, ভাবলাম এইবার বোধ হয় গাড়ি আসবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখলাম গাড়ি এল না। বনলতা, এই বার আমার মনে হল গাড়ি আর আসবে না, সুতরাং সেক্ষেত্রে আমার সঙ্গে বাইরে গিয়ে ডিনার সেরে আসতে ত আর আপত্তি হতে পারে না? কিন্তু তুমি এমন চুপ করে রয়েছ কেন, লতা? একটা কথা অন্ততঃ বল। বেশ, আমি চললাম (এগিয়ে যেতে গিয়ে ফিরে তাকাবে) বনলতা, তুমি আমার সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করছ কিছুকাল থেকে। তবু কথা বলবে না? বেশ, এখানেই আমাদের সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাক্। (চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে) একটা কথা বলব? নীলিমা বাসুর গাড়ি আসবার কথাটা আমি একটুও বিশ্বাস করি না। আসলে তুমি তোমার নতুন বন্ধুকে মিট করতে যাচ্ছিলে, তার সঙ্গেই গিয়ে ডিনার খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছ, আর এই বন্ধুটি কে তাও আমি জানি, শান্তনু সেনের কথা আর আমার কাছে লুকিয়ে কোন লাভ নেই।

বনলতা—শান্তনু সেন!

নিবারণ—হ্যাঁ, শান্তনু সেন, ঠিকানা S. Block 2507 New Alipore.

বনলতা—নম্বরটাও মুখস্থ?

নিবারণ—মিথ্যা হলেও অন্ততঃ মুখে বল লতা, যে আমার ধারণাটা ভুল, ওখানে তুমি যাচ্ছ না।

বনলতা—তোমার ধারণা সম্পূর্ণ সত্যি, ওখানেই আমি যাচ্ছি।

নিবারণ—এর পরে আর আমাদের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। এবারে আমি সত্যিই চললাম, গুড বাই, লতা। (প্রস্থান)

বনলতা—(হেসে উঠে) সত্যিই অত্যন্ত সরল এবং গোবেচারী। (জানলা দিয়ে দেখে) ঐ গিয়ে ট্যাক্সীতে উঠল। বোধহয় নিউ আলিপুরেই যাবে আমার ওপর নজর রাখতে। ভাগ্যবশতঃ আমার গন্তব্যস্থল একেবারে উল্টো দিকে। (কব্জি-ঘড়ি দেখে) নাঃ, এখন বেরোলেও বিশেষ দেরি হবে না।

(আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাবে)

[কার্টেন]

তৃতীয় অঙ্ক

[একই দৃশ্য। কয়েকমাস বাদে। সময় দুপুরবেলা, বনলতা ও শুভেন্দু বাসু বসে গল্প করছেন। শুভেন্দুর বয়স বছর ছাব্বিশ, মালিনী কফির ট্রে-হাতে ঘরে ঢুকবে]

বনলতা—(মালিনীর প্রতি) কফিটা টেবিলে রেখে যাও মালিনী, তারপর মিস্টার বাসু—

শুভেন্দু—বলুন মিসেস মিটার।

বনলতা—Make yourself quite at home here just as at your mother's···

শুভেন্দু—ঠিক আছে মিসেস্ মিটার। (সিগারেট ধরাবে। মালিনী কফির সরঞ্জাম টেবিলে রাখবে বনলতা এক কাপ কফি করে শুভেন্দুর দিকে এগিয়ে দেবে এবং নিজের জন্য এক কাপ ঢালবে।)

বনলতা—মালিনী, আর কিছু দরকার নেই, তুমি এখন যেতে পার।

(মালিনী ইতস্ততঃ করবে) কিছু বলতে চাও।

মালিনী—বিকেলের দিকে আমাকে দিয়ে কি কোন কাজ আছে মেমসাহেব?

বনলতা—বিকেলের কথা বিকেলে বলব।

মালিনী—(ইতস্ততঃ করে) মেমসাহেবকে ত আগেই বলেছিলাম, আজ আমার ভাই আসছে।

বনলতা—আচ্ছা, ও কথা পরে হবে, এখন যাও।

মালিনী—আচ্ছা, মেমসাহেব। (বেরিয়ে যাবে)

বনলতা—আমার স্বামী লাঞ্চের পর আধঘণ্টা অন্ততঃ না ঘুমিয়ে পারেন না। চিরকালের অভ্যাস, তারপর অফিসে গিয়ে ছটা, সাতটা, আটটা যতক্ষণ দরকার কাজ করবেন।

শুভেন্দু—আমার মনে হয় এ খুব চমৎকার অভ্যাস।

বনলতা—আমার কি সৌভাগ্য যে একজন মিউচুয়াল ফ্রেণ্ডের থ দিয়েই আপনাদের দুজনের আলাপটা হয়েছে।

শুভেন্দু—আজকের এই লাঞ্চের নেমন্তন্নটা আমি খুব আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলাম।

বনলতা—(কণ্ঠস্বর নামিয়ে) তুমি কি তা হলে সত্যিই বম্বে যাচ্ছ?

শুভেন্দু—এ বিষয়ে এখনও কি তোমার সন্দেহ আছে?

বনলতা—আজই রাতের গাড়িতে?

শুভেন্দু—হ্যাঁ, আজই রাতে রওনা হচ্ছি।

বনলতা—সবকিছু গোছান হয়ে গেছে?

শুভেন্দু—ওসব দেখে আমার পুরানো চাকর, বনমালী—আমার ও নিয়ে কখনও মাথা ঘামাতে হয় না।

বনলতা—আমাকে একটু খবর দিলে পারতে, আমি গিয়ে সব সাজিয়ে-গুছিয়ে দিতে পারতাম।

শুভেন্দু—এই সামান্য ব্যাপারে তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করতে ইচ্ছা হয় নি।

বনলতা—হয়ত অন্য কোন ব্যাপারেও তোমার কাজে লাগতাম।

শুভেন্দু—তুমি সত্যিই বড় ভাল বনলতা।

বনলতা—তুমি কি তাই মনে কর? আচ্ছা, তুমি যে হঠাৎ এইভাবে চলে যাচ্ছ, তোমার মা কিছু বলবেন না?

শুভেন্দু—মা শুনে খুশীই হলেন। আমার হঠাৎ আসা এবং হঠাৎ যাওয়া দেখে দেখে তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে। বরং আমাকে আগে থেকে প্ল্যান করে কিছু করতে দেখলেই তিনি অবাক হয়ে যেতেন।

বনলতা—সত্যি, দেখে দেখে সব কিছুই মানুষের অভ্যাস হয়ে যায়।

শুভেন্দু—অবশ্য এখানে এসে মাকে বলেছিলাম বেশ কিছুদিন এবার কলকাতায় থাকব। কিন্তু মা যেমন সবসময় নানা এন্‌গেজমেণ্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, ওকথা বোধহয় তাঁর মনেই নেই।

বনলতা—যত ব্যস্তই থাকুন, তোমার মা'র আসল টান কিন্তু তোমার প্রতিই—

শুভেন্দু—আমিও সব সময়েই মাকে খুশী রাখতে চেষ্টা করি। আর সত্যি কথা বলতে গেলে, মা'র জন্যই আমি তাড়াতাড়ি বম্বে যাচ্ছি।

বনলতা—কি রকম?

শুভেন্দু—আমাদের বম্বের ফ্যাক্টরীতে কি ভাবে কাজ চলছে এ নিয়ে মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

বনলতা—তা হলে আর আমার কিছু বলবার নেই। তোমার মা-ই যদি চান যে তুমি এখন কলকাতা ত্যাগ করবে, সেক্ষেত্রে আমি আর বাধা দেব কেন?

শুভেন্দু—শোন লতা! (থেমে যাবে এবং ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে চেয়ে) কেউ শুনতে পাবে না ত?

বনলতা—গগন ওদিকের ঘরে ঘুমোচ্ছে, আর চাকর-বাকরেরাও এদিকে এখন কেউ আসবে না।

শুভেন্দু—তুমি কলকাতাকে বড্ড বেশী ভালবাস, বনলতা। ভারতবর্ষের অন্য সহরেও যে লোকে থাকতে পারে এবং কলকাতার থেকে ভালভাবে থাকতে পারে এ কথা বোধ হয় বিশ্বাস কর না?

বনলতা—কলকাতায় অনেক কিছুর অভাব স্বীকার করি, তবু কলকাতার নিজস্ব চার্মস্ আছে। সুতরাং আমাদের সবাইকে ছেড়ে তুমি যে এভাবে চলে যাচ্ছ নিশ্চয় তার কোন বিশেষ কারণ আছে?

শুভেন্দু—থেকে যাবার স্বপক্ষেই ত বিশেষ কারণ ছিল, তুমি যখন এখানে!

বনলতা—কিন্তু কেন যাবে?

শুভেন্দু—কলকাতা সত্যিই আমার ভাল লাগে না। আর তাছাড়া মা ভেতরে ভেতরে চান না আমি কলকাতায় বসে সময় নষ্ট করি।

বনলতা—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? সত্যি উত্তর দেবে?

শুভেন্দু—বেশ ত, জিজ্ঞেস কর না।

বনলতা—আমার মনে হয় আমারই দোষে তুমি কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছ।

শুভেন্দু—কি যে বল!

বনলতা—আমার মনে হচ্ছে আমি তোমাকে ঠিকমত সঙ্গ দিতে পারি নি, আনন্দ দিতে পারি নি। তোমার ধাতটা বুঝতে চেষ্টা করি নি, কি কি বিষয়ে তোমার

ইণ্টারেষ্ট, তাও জানতে চাই নি। এরই ফলে দু তিন মাসের ভেতরেই আমার সম্বন্ধে আর তোমার কোন কৌতূহল বা আকর্ষণ নেই। তা না হলে দু'তিন মাসে এরকম মনোভাব তোমার হতে পারে?

শুভেন্দু—আমার মনোভাব ঠিকই আছে, আর ঘনিষ্ঠ আলাপটা আমাদের দু'তিন মাসের নয় (হেসে উঠে) পুরোপুরি চার মাসের।

বনলতা—Can it be so long?

শুভেন্দু—একটু হিসেব করে দেখলেই বুঝতে পারবে। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ আর এখন এপ্রিলের মাঝামাঝি।

বনলতা—ঠিকই বলেছ। নাহয় বরং পাঁচ মাসই বলে এ প্রসঙ্গ বদলানো যাক্।

শুভেন্দু—(কাছে এসে) ডিসেম্বর মাসে বম্বে চলে এস না, মা'র সঙ্গেও অনেকে আসবেন, ওদের থেকে দূরে থেকে দুজনের সঙ্গটাকে উপভোগ করতে পারব।

বনলতা—যেতে পারলে ত ভালই হত, কিন্তু আমার স্বামী নানা ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি করবেন।

শুভেন্দু—ওঁকে এখানে রেখে গেলেই ভাল হবে না?

বনলতা—একলা এখানে থাকতে ও রাজী হবে না।

শুভেন্দু—সেটা তোমাকে এ্যারেঞ্জ করতে হবে। আর যদি আস মিসেস প্রিয়ম্বদা সারখেলকেও সঙ্গে করে আনতে পার। আমি দেখেছি ওঁর অত ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হয় না। নিজে খুশীমত উনি যা ইচ্ছে করেন।

বনলতা—প্রিয়ার সঙ্গে কার তুলনা? নিজের আলাদা ব্যক্তিগত সম্পত্তি রয়েছে প্রচুর। তাছাড়া ওর স্বামী ত সব সময় যা ইচ্ছা করে বেড়াচ্ছে, সুতরাং She has a right take her revenge.

শুভেন্দু—আর সে সুযোগটা উনি প্রায়ই গ্রহণ করে থাকেন।

বনলতা—আমি অত শত জানি না।

শুভেন্দু—এ বিষয়ে আমার কথা তুমি ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিতে পার।

বনলতা—আমার এবং প্রিয়ার বন্ধুত্ব বহুকালের, তা সত্ত্বেও নিজেদের সব কথা আমরা পরস্পরের ভেতর আলোচনা করি না। (চোখে দুষ্টুমি-ভরা হাসি এনে) আর এজন্য তোমাদের মত পুরুষদের আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

শুভেন্দু—আমার একটা ধারণা মিসেস সারখেলই আমার মায়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেন, (হেসে উঠে) আর ঐ সময় আলাপটা হওয়াতে আমাদের দুজনেরই খুব সুবিধা হয়েছিল।

বনলতা—প্রিয়া কিন্তু এখন পর্য্যন্ত জানে না কেন আমি তোমার মা'র সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলাম, আর আশা করি ভবিষ্যতেও এ বিষয়ে কোন কিছু আঁচ করতে পারবে না।

শুভেন্দু—মিসেস সারখেল সম্বন্ধে কসাস্ হয়ে তুমি বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছ।

বনলতা—এসব কথা কেন? প্রিয়ার সম্বন্ধে তোমার কি কিছু অভিযোগ আছে?

শুভেন্দু—আরে, না, না। কিন্তু দরকার কি সবাইকে সব কথা বুঝতে দেবার। একটা মজার কথা বলি, মিসেস সারখেল কিন্তু আমার এক বন্ধুর প্রেমে পাগল!

বনলতা—এই ভাগ্যবানটি কে?

শুভেন্দু—একবাল সিং বেদী, তুমি ত ওকে দেখেছ?

বনলতা—কি বলছ? আমি বিশ্বাস করি না।

শুভেন্দু—তুমিই আশ্চর্য্য হচ্ছ, কিন্তু ব্যাপারটা সবাই জানে।

বনলতা—তুমি বোধ হয় জান না, বহুদিন ধরে আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রিয়ার একটা এ্যাফেয়ার চলছে। এ-লোকটি ওকে এ্যাডোর করে এবং কখনও ওর সঙ্গ ছাড়তে চায় না।

শুভেন্দু—কে বল ত ভদ্রলোকটি?

বনলতা—(হাসির সঙ্গে) শান্তনু সেন।

শুভেন্দু—এটা ত প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী। কিন্তু তারই পাশাপাশি চলছে এই নতুন প্রেমের ব্যাপারটা একবাল বেদীকে ওর হঠাৎ এত পছন্দ হল কেন বুঝি না। তুমি বোধ হয় জান না প্রত্যেক দিনই দুজনে দুজনকে না দেখে থাকতে পারে না।

বনলতা—তুমি এত খবর জানলে কি করে?

শুভেন্দু মিসেস সারখেল আমাকে নিজের মুখেই বলেছেন। She has no false modesty about such confidences.

বনলতা—এটা প্রিয়ার ছেলেমানুষী, নিজের গোপন কথা এভাবে তোমাকে বলে দেওয়াটা ঠিক হয় নি।

শুভেন্দু—আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত।

বনলতা—হয়ত নিজেকে তোমার কাছে এইভাবে

লোভনীয় করে তোলবার উদ্দেশ্য ছিল, জানি না কতটা সাকসেসফুল হয়েছে।

শুভেন্দু—তুমি কি আমাকেও সন্দেহ করতে সুরু করলে নাকি? বিশ্বাস কর—

বনলতা—তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এসব আমাকে টাচ্ই করে না। আর আমাদের সম্বন্ধটা ত সম্পূর্ণ অন্য ধরনের, We both knew well enough what we are doing. দুজনে দেখা হল, দুজনেই বুঝলাম, দুজনের সঙ্গটাকে আমরা বেশ পছন্দ করি, কাছাকাছি হলাম, ক'দিন বেশ আনন্দে কাটল, দুজনেই সবসময় মনে করে রেখেছি যে কিছুকাল বাদেই আবার আমাদের আলাদা হয়ে যেতে হবে, আজ সেই সরে যাবার সময়টা এসেছে সুতরাং বন্ধুভাবেই দুজনে দুজনের কাছ থেকে বিদায় নেব। অনেকক্ষণ দুজনে এখানে বসে আছি, এবার গগনকে ডাকি। পাঁচ ছ'মাস সত্যিই ভারী সুন্দর কাটালাম দুজনে মিলে এই মধুর সময়টার কথা তুমি নিশ্চয় ভুলে যাবে না কখনও? পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনের থেকে এই চুরি করে নেওয়া আমাদের কয়েকটা আনন্দের দিনের কথা নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা ক'রো না, এই আমার তোমার কাছে একমাত্র অনুরোধ। এই ক'টা দিন হয়ে থাক আমাদের দুজনেরই একমাত্র নিজস্ব গোপন সম্পর্ক। তোমার সাহায্য না পেলে গগনের ট্রেজারীর চাকরিটাও এত তাড়াতাড়ি হ'ত না। তুমি বারবার বলেছ বলেই তোমার মা এ বিষয়ে অতটা সাহায্য করেছেন। তোমার কাছে সবাই আমরা কৃতজ্ঞ, যখনই কলকাতায় আসবে এবাড়ী নিজের বাড়ী মনে করে বিনা দ্বিধায় চলে আসবে আমাদের কাছে।

শুভেন্দু—You are charming, charming.

বনলতা—(উঠে দরজার কাছে গিয়ে) গগন! কতক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকবে বল ত? মিষ্টার বাসু এবার উঠবেন। দেখা করবে না?

গগন—(ভেতর থেকে) এই আসছি!

বনলতা—গগন আসছে—

(গগন মিটার ঢুকবেন, হাই তুলে এগিয়ে আসবেন শুভেন্দুর দিকে)

গগন—সত্যিই, আমি যে কি অভদ্র—

শুভেন্দু—কেন বলুন ত?

গগন—এই আপনাদের এখানে একা রেখে গেলাম—অবশ্য (হেসে উঠে) আমার মিসেসের সঙ্গে আলাপ করে নিশ্চয় ভাল লেগেছে? আমার বন্ধুরা প্রায়ই বলেন বনলতার মত কন্‌ভারসেনালিষ্ট আজকাল দেখা যায় না (আবার হো হো করে হেসে উঠবে)।

বনলতা—(কৃত্রিম রাগের ভাব দেখিয়ে) কি যে বল!

শুভেন্দু—আপনার বন্ধুরা খাঁটি কথাই বলেন।

গগন—শুনলে ত?

বনলতা—আসল ব্যাপারটা কি জানেন, মিষ্টার বাসু—আমার স্বামীটি একটি জাত কুম্ভকর্ণ। দুপুরে বাড়ীতে লাঞ্চ খেতে এসে আধঘণ্টা ঘুমিয়ে না নিতে পারলে ওঁর নাকি শরীর খারাপ হয়।

গগন—আরে এ আমার পঁচিশ-তিরিশ বছরের হ্যাবিট।

শুভেন্দু—কিন্তু এবার ত আমাকে উঠতে হবে মিষ্টার মিটার, ভারি সুন্দর কাটল আজকের দুপুরটা আপনাদের এখানে এসে মিসেস মিটার···

গগন—আজ রাত্রের গাড়িতেই ত বম্বে যাচ্ছেন?

শুভেন্দু—হ্যাঁ, সেই জন্যই এখন উঠতে হচ্ছে, মা'র সঙ্গে কিছু কাজের কথাবার্ত্তা আছে যাবার আগে, আচ্ছা নমস্কার···চলি···

(এরাও প্রতি নমস্কার করে শুভেন্দুকে এগিয়ে দিতে যাবেন—ষ্টেজ কিছুক্ষণ খালি থাকবে, পরে গগন এবং বনলতা কথা বলতে বলতে ঢুকবেন।)

গগন—ছেলেটি কিন্তু আমার চাকরির ব্যাপারে যথেষ্ট করেছে, ওর সেই বন্ধুটি, সরকারি মহলে যাঁর খুব প্রতিপত্তি—

বনলতা—আরে তার প্রতিপত্তির মূলে ত আবার শুভেন্দুর মা নীলিমা বাসু। আসলে সবটাই করেছেন মিসেস বাসু, মনে পড়ে এঁর পার্টিতে যাবার ব্যাপারে প্রথম যখন চিঠি আসে তুমি কি রকম আপত্তি করেছিলে?

গগন—আর লজ্জা কেন দেও, লতা। তোমার বুদ্ধিতে না চললে আমার ত এতদিনে সর্ব্বনাশ হয়ে যেত। একটা ভারি মজা লেগেছিল সেদিন, প্রথম নীলিমা দেবী ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, উনি যে ভাবে মেকআপের সাহায্যে নিজের বয়েসটা কমিয়ে রাখেন তাতে শুভেন্দুর বয়সের ওঁর ছেলে থাকতে পারে এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি আগে।

বনলতা—এই জন্যই নীলিমা দেবী ছেলেকে কলকাতায়

বেশীদিন রাখতে চান না। You know what these beauties are, when once their children reach thirty or so.

গগন—তিরিশ বছর? না, না···

বনলতা—তিরিশ না হলেও ছাব্বিশ-সাতাশ ত হবেই, তাও ত কম নয়!

গগন—তা ত বটেই! তবে নীলিমা বাসুর বয়স কত?

বনলতা—সোসাইটি লেডীর বয়স জানতে নেই, শুধু এইটুকু মনে রাখবে যে ওদের বয়স পঁয়ত্রিশ পেরোয় না।

গগন—হাঃ হাঃ হাঃ, বেশ বলেছ। আচ্ছা লতা, আমি এবার অফিসে চলি, আজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরব। (প্রস্থান)

(একটু বাদে বিব্রতভাবে মালিনী ঢুকবে)

মালিনী—মেমসাহেব! কে এসেছে জানেন?

বনলতা—কে এসেছেন।

মালিনী—নিবারণবাবু।

বনলতা—তাতে এত অবাক হবার কি আছে?

মালিনী—না, একমাস ত আসেন নি। আমি ভেবেছিলাম বোধহয় মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে।

বনলতা—দেখ মালিনী, যাদের কাছে চাকরি কর তাদের কথা নিয়ে তোমাদের মাথা না ঘামানোই ভাল।

মালিনী—তা হলে কি নিবারণবাবুকে এখানে নিয়ে আসব?

বনলতা—নিশ্চয় নিয়ে আসবে।

মালিনী—আচ্ছা, মেমসাহেব (দরজার দিকে যেতে থাকবে)।

বনলতা—মালিনী।

মালিনী—(ফিরে দাঁড়িয়ে) মেমসাহেব!

বনলতা—নিবারণবাবুকে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে, তুমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পার। আজ আর তোমাকে আমার দরকার হবে না।

মালিনী—ধন্যবাদ মেমসাহেব (চলে যাবে, কিছুক্ষণবাদে নিবারণ ঘরে ঢুকবে)।

নিবারণ—(আবেগ ভরে) কেমন আছ, বনলতা?

বনলতা—তুমি কেমন আছ, নিবারণ?

নিবারণ—মোটেই ভাল নয়। আমার ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে একমাসে। তোমাকে কোন রকম disturbe করছি না ত, লতা?

বনলতা—না, তা করবে কেন?

নিবারণ—ভাবছিলাম, তুমি হয়ত এখন বাইরে বেরবে।

বনলতা—(ফ্যাকাশে হেসে) আজ-কাল খুব কমই বাইরে যাই। আর যাবই বা কোথায়?

নিবারণ—লতা!

বনলতা—এতদিন বাদে হঠাৎ ও নামে ডাকাটা পরিহাসের মতই শোনাচ্ছে নিবারণ।

নিবারণ—সেদিন ওভাবে বোকার মত scene create করবার জন্য আমি সত্যিই অত্যন্ত অনুতপ্ত, লতা।

বনলতা—হঠাৎ এতটা অনুতাপ হল কেন বল ত?

নিবারণ—আমাকে ক্ষমা কর, লতা। এই দুদিন আগে খুব ভাল সোর্স থেকে জানতে পারলাম যে শান্তনু সেনের সঙ্গে একটা বিশ্রী এ্যাফেয়ার চলেছে প্রিয়ম্বদা সারখেলের···

বনলতা—কিন্তু তুমি ত তাকে আমার প্রেমিক বলে ঠিক করেছিলে।

নিবারণ—আমি স্বীকার করছি, আমার ভুল হয়েছিল। কথাটা জানবামাত্রই তোমার কাছে ছুটে আসবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম।

বনলতা—অনেক ধন্যবাদ। তা হলে দেখছ একটা মিথ্যা কাল্পনিক ব্যাপার নিয়ে একমাস কি বিশ্রী ব্যবহার করলে আমার সঙ্গে?

নিবারণ—আমি ত আমার সব দোষ মেনে নিচ্ছি। গত কয়েক মাসের কথা ভুলে যাও, লতা। ভবিষ্যতে আর কখনও মিথ্যা সন্দেহ করে তোমাকে বিরক্ত করব না।

বনলতা—কথা দিচ্ছ?

নিবারণ—কথা দিচ্ছি আর কখনও ওভাবে তোমাকে বিরক্ত করব না।

বনলতা—বোকা ছেলে বুঝতে পার না, 'একবার যে মেয়ে তোমাকে ভালবেসেছে, সে কি আর কোন পুরুষের সঙ্গে মিশতে পারে? যাক্‌গে, আর বেশী বলব না—তোমার আবার তাতে দেমাক্ বেড়ে যাবে। এবার একটা কাজের কথা শোন—এতদিন যে এখানে আস নি, গগনের কাছে তার একটা কারণ দেখাতে হবে।

নিবারণ—গগনদার কাছে?

বনলতা—আজ্ঞে হ্যাঁ, গগন ত আমায় রোজ জিজ্ঞেস করছে তুমি আসছ না কেন। তোমাকে নিজে কিন্তু

এর উত্তর দিতে হবে, আমার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবে না। [গগন ঘরে ঢুকবে]

গগন—(এগিয়ে এসে) আরে, নিবারণ যে! এতদিন বাদে,কোথা থেকে? ব'লো না যে কলকাতার বাইরে গেছিলে কারণ আমি শুনেছি তুমি এখানেই ছিলে।

নিবারণ—ব্যাপার কি জানেন গগনদা···(আমতা আমতা করতে থাকবে)

বনলতা—ওঁকে এ নিয়ে বিব্রত ক'রো না গগন। কিছুদিন ধরে ওঁর খুব খারাপ সময় যাচ্ছে।

গগন—কেন, কি হয়েছে নিবারণের?

বনলতা—মিষ্টার বোস, গগনকে ব্যাপারটা বলব?

নিবারণ—আপনি যদি চান···

গগন—আমাকে বলতেই হবে—নিবারণের বিপদ—আমাকে বলবে না?

বনলতা—**His trouble was jealousy.**

গগন—(হো হো করে হেসে উঠে) কি যে সব বাজে কথা বল। কার সম্বন্ধে জেলাসী? কাকে নিয়ে জেলাসী? নিশ্চয় এমন একজন মহিলা সম্বন্ধে যার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই।

বনলতা—তোমাদের মত লোকের মতে কোন সম্পর্ক নেই বটে কিন্তু নিবারণ জানে মহিলাটি সম্বন্ধে ওর ষোল আনা মালিকানা সত্ব।

গগন—বটে, বটে! আচ্ছা লতা, নিবারণকে আমার ট্রেজারীর চাকরিটার কথা বলেছ?

বনলতা—তুমি কি ভুলে গেছ চাকরি পাবার পর মিষ্টার বোসই প্রথম তোমাকে কংগ্রাচুলেট করে চিঠি লিখেছিলেন।

গগন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন সবই মনে পড়ছে, আমি তোমাকে চিঠিটা দেখিয়ে বললাম, নিবারণ নিজে না এসে চিঠি দিয়ে কংগ্রাচুলেট করল কেন? বুঝলে হে নিবারণ, কাকাই চাকরিটা করে দিলেন।

বনলতা—অনেক হয়েছে! এখন রাস্তায় গিয়ে গলা বাড়িয়ে কাকার পাবলিসিটি করে বেড়াও।

গগন—আরে নিবারণের কাছে বলায় দোষ কি? কিন্তু নিবারণ, সত্যিই, তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? মেয়েটি কি সত্যিই তোমার প্রতি **unfaithful** হয়েছে? লতাকে সব কথা বলতে না চাও ব'লো না—আমাকে এসে চুপি চুপি সব কথা খুলে বলতে পার।

নিবারণ—এ বিষয়ে আপনার মত কি মিসেস মিটার?

বনলতা—আমার স্বামী আপনাকে একটি প্রশ্ন করেছেন মিষ্টার বোস। আপনি স্বচ্ছন্দে তার উত্তর দিতে পারেন।

নিবারণ—আচ্ছা গগনদা, পৃথিবীতে এমন কোন পুরুষ আছে যে জোর গলায় বলতে পারে কোন মহিলা তার প্রতি কখনও অবিশ্বাসিনী হয় নি?

বনলতা—বটে!

গগন—(হেসে উঠে) ঠিকই বলেছ ভায়া, ঠিকই বলেছ।

নিবারণ—আমি যে মহিলার কথা বলছি গগনদা, তিনি অবশ্য স্বীকার করতে চান না যে তিনি আমার প্রতি **unfaithful** হয়েছেন। ব্যাপারটা এখন আমরা মিটিয়ে নিয়েছি, **which no doubt was what both of us desired.**

গগন—তা ত বটেই!

বনলতা—আমি শুধু ভাবছি, মহিলাটি যদি এখানে উপস্থিত থাকতেন এবং তোমাদের দু'জনের কথা শোনবার সৌভাগ্য যদি তাঁর হত—**Then she wuold know what you think of her and all her sex. But I can tell both of you, there is only one thing that succeeds with us—that is to trust us absolutely**

[তিন জনেই হেসে উঠবে]

ধীরে ধীরে যবনিকা

—০—

চোরাকারবারী

শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

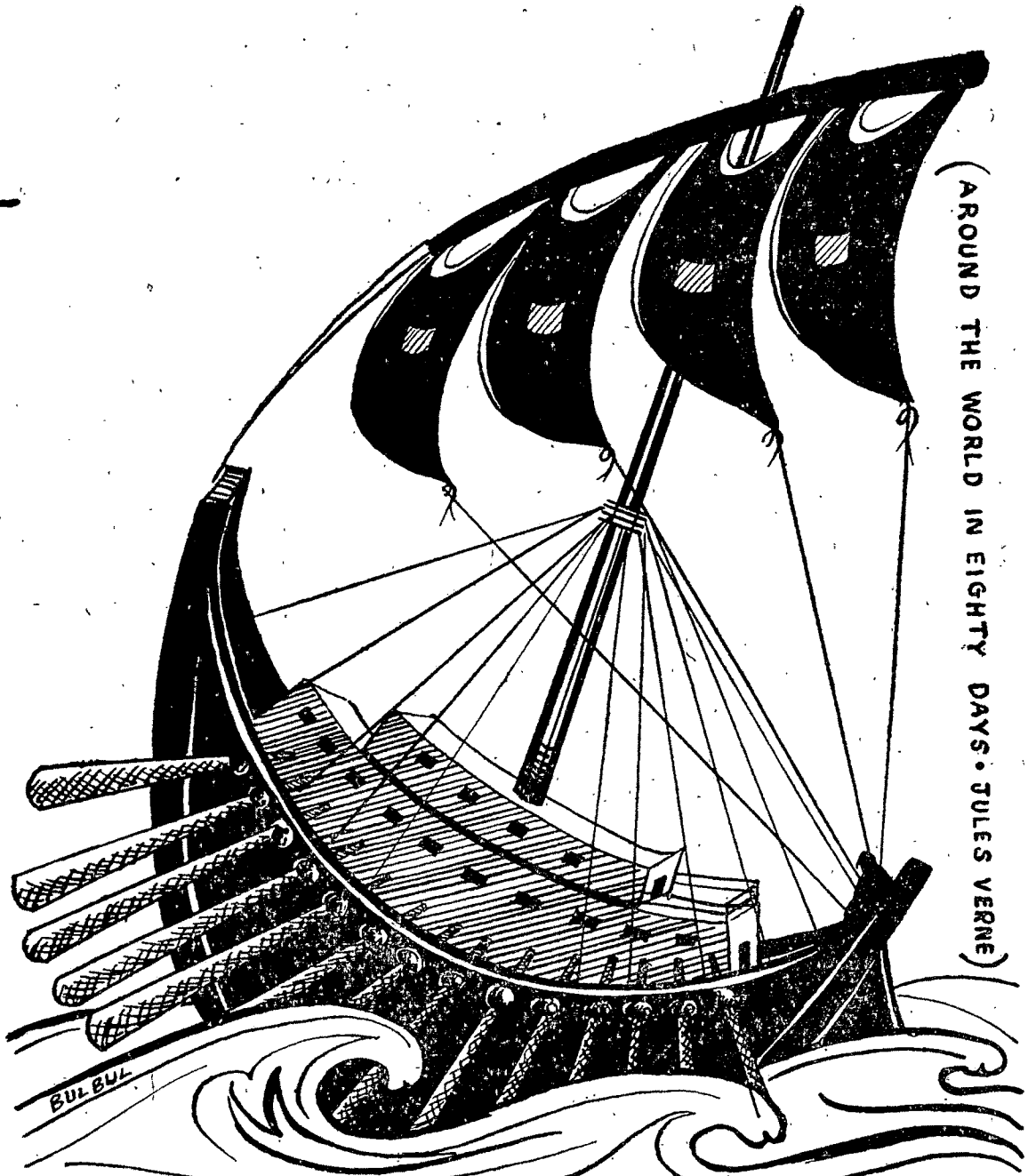

(AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS • JULES VERNE)

অসম্ভবও সম্ভব হয়

অনুবাদক - কৃষ্ণধন দে

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেটি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ। আধুনিক কালের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে তখন সকলের পরিচয় ঘটে নি। আজকালকার দ্রুতগামী যানবাহন তখনকার দিনে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। তখন দেশবিদেশে জাহাজ চলত বটে কিন্তু সে ছিল বাষ্পীয় জাহাজ, ট্রেণও যা চলত সে ছিল বাষ্পীয় ট্রেণ। মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন, ইলেকট্রিক ট্রেণ বা মোটরলঞ্চের কথা তখন লোকে ভাবতেই পারত না। তা ছাড়া শিল্পবিষয়ে পৃথিবীর দেশগুলি আজকালকার মত এত উন্নতিও লাভ করে নি। শুধু শিল্পই বা বলি কেন, সামাজিক আচার ব্যবহার ও সংস্কার এতটা পরিশোধিত হয় নি। পৃথিবীর অনেক স্থানই ছিল অনাবিষ্কৃত ও দুর্গম। পৃথিবীর এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবার রাস্তাঘাটও খুব সহজ ও নিরাপদ ছিল না। এইসব কারণে দেশান্তরে যাবার কল্পনা খুব বেশি লোকের মনে স্থান পেত না, নিশ্চিন্ত আরামে কাজকর্ম ও গৃহস্থালী করাই তখনকার দিনের লোকেরা বেশি পছন্দ করত। দেশবিদেশে ভ্রমণের সুখসুবিধা সম্বন্ধে লোকের জ্ঞানও অধিক ছিল না, তা ছাড়া বৈদেশিক পথঘাটের নির্ভুল নির্দেশও তখন ঠিকমত পাওয়া যেত না।

তাই মনে রাখতে হবে—এই কাহিনীর সময় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ।

লণ্ডনের এক অভিজাত পল্লীতে একাকী একটি সুন্দর অথচ আড়ম্বরহীন গৃহে বাস করতেন ফিলিয়াস্ ফগ্ নামে এক সৌখীন ভদ্রলোক।

সংসারে তাঁর বিশেষ কেউ আছেন কি না জানা যায় নি। শুধু একটি চাকর ছিল তাঁর গৃহকর্ম দেখবার জন্যে। সারাটা দিন তিনি কাটাতেন নানা দেশের ভ্রমণকাহিনী ও ভৌগোলিক তথ্য পড়ে। তবে তিনি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতেন বাড়ীর বাইরে এক অভিজাত হোটেলে। তারপর একটি বিখ্যাত সংস্কৃতি-ক্লাবে যেতেন হুইষ্ট্ তাস খেলতে। সে ক্লাবে শুধু ইংলণ্ডের বিখ্যাত ধনকুবেররাই সভ্য ছিলেন। কোন সাধারণ বা বাজে লোক সে ক্লাবে প্রবেশাধিকার পেত না। তা ছাড়া সে ক্লাবে যে টাকা বাজী রেখে খেলা হ'ত তার পরিমাণও ছিল অসাধারণ। ফিলিয়াস্ ফগ্ যে ধনশালী ছিলেন তাকে দেখে সে কথা সহজে কেউ বুঝতে পারত না।

ফিলিয়াস ফগের আর একটি অসাধারণত্ব ছিল, তিনি সবকিছু ঠিক সময়মত ঘড়ি ধরে আরম্ভ করতেন ও শেষ করতেন। এক মুহূর্ত সময়ও তাঁর কাছে অপব্যয়িত হ'ত না। নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে উঠতেন, নির্দিষ্ট সময়ে আহারে বসতেন, নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাবে যেতেন ও নির্দিষ্ট সময়ে আবার শয়ন করতেন। চাকরকে ডাকবার সময়ও তাঁর নির্দিষ্ট ছিল, কোনদিন সে-সময়ের আগে তিনি চাকরকে ডাকতেন না। তা ছাড়া পোশাকপরিচ্ছদ সম্বন্ধে তিনি এতই সচেতন ছিলেন যে, কোন্ জামাটি কবে কাচিয়েছেন, কতদিন ব্যবহার করেছেন, কোন্ জুতা কবে কোন্ সময়ে পরেছেন, সে সমস্ত নিখুঁতভাবে লিখে রাখতেন তাঁর ডায়েরীতে। তাঁর স্বভাবও ছিল শান্ত-মধুর। হঠাৎ যে কোন কারণেই হোক তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন না, বিশেষ বিবেচনা করে কথা বলতেন ও কোন সময়েই তাঁর মুখে বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পেত না। তাঁকে দেখে মনে হ'ত তিনি খুবই আশাবাদী। কোন কারণেই তার মনে নৈরাশ্য আসত না। বিপদে পড়লেও তিনি ধৈর্যহারা হতেন না, বিশেষ চিন্তা করে সে বিপদ থেকে সত্বর পরিত্রাণলাভের উপায় তিনি নিশ্চয় বার করতেন। বন্ধুদের সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল মধুর ও সহৃদয়। তিনি এককথার মানুষ ছিলেন, মুখে মুখে যা বলতেন কাজে তাই করতেন। তাঁর মুখে এমন একটা অবিচলিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব ছিল যে লোকে সহজেই তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করত।

সংস্কৃতি-ক্লাবে যাঁরা সভ্য ছিলেন, তাঁরা সকলেই ধনকুবের হলেও, ফিলিয়াস্ ফগ যাঁদের সঙ্গে হুইষ্ট তাস খেলতেন তিনি তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুকুটমণি। এনও ষ্টুয়ার্ড, জন্ সলিভান্, স্যামুয়েল ফলেন্টিন, টমাস্ ফ্লানাগেন ও গথিয়ার র‍্যালফ্ ছিলেন তাঁর তাসখেলার সঙ্গী। এঁরা প্রত্যেকেই বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক—প্রত্যেকেই ধনকুবের। তা ছাড়া ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ ছিলেন গথিয়ার র‍্যালফ্।

যেদিনের কথা বলছি, সেদিন ক্লাবে একটা গুরুতর রকমের চুরির সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। ব্যাপারটা এই যে, ইংলণ্ডের এক ব্যাঙ্ক থেকে কৌশলে এক ভদ্রলোক প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা সরিয়ে নিয়ে নিজেও বেমালুম সরে পড়েছেন।

এই নিয়ে সারা ইংলণ্ডে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। ব্যাঙ্কে প্রবেশ করে লোকটি খুব ভদ্রতার সঙ্গে অমায়িকভাবে ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন ও তাঁদের বিশ্বাস উৎপাদন করে শেষে একটা মিথ্যা-নামের ড্রাফ্টের উপর সাড়ে আট লক্ষ টাকা আদায় করে চম্পট দেন। ঘটনাটা এতই তাড়াতাড়ি ও সুচারুভাবে ঘটেছিল যে ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কেউ

কোন প্রকার সন্দেহই করতে পারেন নি সেই ভদ্রলোককে। তারপর যখন ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল তখন পুলিশের দল চারদিকে ছুটল সেই ভদ্রলোকের সন্ধানে ও তখনি খবর পাঠিয়ে ইউরোপের সর্বত্র এমন সাবধানতা অবলম্বন করা হ'ল যাতে লোকটা অন্য কোন দেশে সরে পড়তে না পারে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত লোকটা ধরা পড়ে নি। ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন চোরকে ধরবার জন্যে। তার পরিমাণ তিরিশ হাজার টাকা, তা ছাড়া সেই সাড়ে আট লক্ষ টাকার উপর একটা মোটা কমিশনও আছে। সুতরাং পুলিশের গোয়েন্দার দল তাকে ধরবার জন্যে যে উঠে-পড়ে লাগবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

ক্লাবে এই নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল তখন ফিলিয়াস্ ফগ্ একটি কথাও বলেননি, শুধু শুনে যাচ্ছিলেন সকল কথা। কিন্তু তিনি শেষে বললেন—অত টাকা নিয়ে চোর অন্য কোথাও না গিয়ে হয়ত লণ্ডনেই কোন স্থানে আত্মগোপন করে আছে। লণ্ডনে লুকিয়ে থাকবার মত স্থানের অভাব ত নেই। ষ্টুয়ার্ড বললেন, "যাবে আর কোথায়? লণ্ডনে যদি নাই সে থাকে তবে পৃথিবীর যেখানেই সে যাক না কেন, ধরা পড়বেই। পৃথিবীটা আগের মত আর বড় নেই, এখন ছোট হয়ে গেছে।

সলিভান্ বললেন, "তার মানে কি আমরা এমন একটা পৃথিবীতে বাস করছি যেটা আগের পৃথিবীর তুলনায় আকারে ছোট হয়ে গেছে?"

কলেন্টিন বললেন, "কথাটার মানে ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না। একটু খুলেই বল না হে ষ্টুয়ার্ড।"

ফ্লানাগেন বললেন, "আমার মনে হয় ষ্টুয়ার্ড এই ভেবে কথাটা বলেছে যে পৃথিবীতে সব জিনিষই এখন খুব হাতের কাছে এসে পড়েছে। দরকার মতই পাওয়া যাচ্ছে। তাই বড় করে হাত বাড়াবার আর দরকার নেই।"

র‍্যাল্‌ফ বললেন, "কথাটা অবশ্য দার্শনিকের কথার মতই শোনাচ্ছে। আমার মনে হয়, টাকাকড়ির লেনদেন খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে বলে পৃথিবীতে দেরী বলে কোন জিনিষের অস্তিত্ব নেই। তাই পৃথিবীটা ছোট হয়ে গেছে।"

ষ্টুয়ার্ড এঁদের কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, "আমার কথার সোজা মানে হ'ল, পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে যতটা সময় আগে লাগত, এখন তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে। তাই পৃথিবীটা ছোট হয়েই গেছে। এই ধর না কেন, কেউ যদি সারা পৃথিবীটা ঘুরে আসতে চায়, তবে তার কদ্দিন লাগবে বল ত?"

সলিভান্ বললেন, "আমার মনে হয় অন্ততঃ দেড়শ দিনের কম কেউ কিছুতেই পৃথিবীটা ঘুরে আসতে পারে না। অবশ্য এই ঘুরে আসার অর্থ, এই লণ্ডন থেকে যাত্রা করে পৃথিবীর উপর একটা চক্কর দিয়ে আবার এই লণ্ডনেই ফিরে আসতে হলে সেটা কোনরকমেই দেড়শ-দিনের কম সময়ে ঘটতেই পারে না।"

ফলেন্টিন বললেন, "অবশ্য খুব চেষ্টাচরিত্র করলে হয়ত আরও দশদিন কমতে পারে।"

ফ্লানাগেন বললেন, "আমার মনে হয় যানবাহনের সবকিছু সুবিধা যদি ঠিক সময়ে পাওয়া যায় তবে হয়ত আরও দশদিন কমতে পারে।"

র‍্যাল্‌ফ বললেন, "আমার এ কথা বিশ্বাসই হয় না, যে কোন লোক একশ দশ দিনের কম পৃথিবী ঘুরে আসতে পারে। এ বিষয়ে আমি বাজি রাখতে প্রস্তুত।"

ষ্টুয়ার্ড বললেন, "আচ্ছা, বাজি রইল, তবে বাজিটা হবে এইরকম যে তাকে একশ দিনের দিন ঠিক লণ্ডনে এই ক্লাবে ঠিক এই সময়ে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু কেউ কি এতে রাজী হবে? সময়টা যে বড্ড কম।"

র‍্যাল্‌ফ বললেন, "যদি কেউ ওর কমে পৃথিবী ঘুরে আসতে পারে তবে আমি বাজির পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারি।"

ষ্টুয়ার্ড বললেন, "কত কমে পৃথিবী ঘুরে আসা যায় তুমি আন্দাজ করতে পার?"

র‍্যাল্‌ফ বললেন, "এই ধর তিন মাস, অর্থাৎ নব্বই দিন। কিন্তু এটা একেবারেই অসম্ভব।"

এতক্ষণ ফগ্ মনে মনে কি যেন হিসাব করছিলেন, এবার বললেন, "আমার মনে হয় চেষ্টা করলে আমি নিশ্চয়ই আশীদিনের মধ্যে পৃথিবীটা ঘুরে আসতে পারি।"

ফগের একথা শুনে সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। ষ্টুয়ার্ড একটু চুপ করে থেকে বললেন, "এ যে একেবারেই অসম্ভব।"

ফগ ধীরভাবে বললেন, "অসম্ভবও সম্ভব হয়, জগতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই।"

র‍্যাল্‌ফ বললেন, "সত্যিই তুমি যদি আশীদিনে পৃথিবীটা ঘুরে আসতে পার, তা' হলে আমার বাজির পরিমাণ রইল তিন লক্ষ টাকা। কিন্তু তুমি যদি ঐ আশীদিনের মধ্যে ঠিক সময়ে ফিরে আসতে না পার, তা হলে তোমাকে দিতে হবে তিন লক্ষ টাকা। কেমন, এতে রাজী?"

অকম্পিত স্বরে ফগ বললেন, "হাঁ, আমি এতেই রাজী।"

র‍্যাল্‌ফ্‌ বললেন, "আর একটা কথা, তুমি যে নিজের খেয়ালে যাত্রা করবে অসম্ভবকে সম্ভব করতে, তার জন্যে সমস্ত খরচ তোমার। তোমার পৃথিবী ঘুরে আসার সমস্ত খরচ তুমি নিজে বহন করবে। তুমি যদি সফল হও, তবে আমি সে সব খরচ ত দোবই, তা ছাড়া তোমাকে তিন লক্ষ টাকা বাজিতে জয়লাভের জন্য দোব। কেমন, রাজী?"

ফগ্‌ তেমনি অকম্পিত দৃঢ় স্বরে বললেন, "হাঁ, রাজী। আমি ঠিক আশীদিনেই পৃথিবী পর্যটন করে নির্দিষ্ট সময়ে ফিরব। আশীদিনের এক সেকেণ্ডও বেশী লাগবে না। যদি তা না পারি তবে পৃথিবী ঘোরার খরচ ত আমি বহন করবই, তা ছাড়া আমি আমার নিজের তিন লক্ষ টাকা বাজির খেসারৎ হিসাবে দোব।"

র‍্যাল্‌ফ বললেন, "বেশ, তা হলে এখনি আইনমত একটা চুক্তিপত্র হোক্‌।"

ক্লাবে আরও অনেক ধনকুবের সদস্য ছিলেন, তাঁরাও এ ব্যাপার শুনে সেখানে এসে জড়ো হলেন।

সকলের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। ফিলিয়াস্‌ ফগ্‌ বলেন কি! মাত্র আশীদিনে সারা পৃথিবীটা এক চক্কর দিয়ে আসা যে একেবারেই অসম্ভব!

সকলের সামনে আইনসঙ্গত ভাবে একটা চুক্তিপত্র তখনি প্রস্তুত হ'ল। অনেকেই তাতে স্বাক্ষর করলেন। কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে সারা লণ্ডনে প্রচারিত হয়ে গেল। এমন কি অনেক সংবাদপত্রের সান্ধ্য সংস্করণে ফিলিয়াস ফগের এই অসম্ভব প্রচেষ্টাকে উপহাসও করা হ'ল।

ফগ্‌ কিন্তু নির্বিকারচিত্তে কিছুক্ষণ হুইষ্ট্‌ খেলে প্রায় তিনশত টাকা খেলায় জিতে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "বন্ধুগণ, আমি আজই শুভযাত্রা করছি। আমি চুক্তিপত্রের নির্ধারণ মতে বলছি যে আমি ঠিক আশীদিনের দিন অর্থাৎ আজ ২রা অক্টোবর বুধবার থেকে আরম্ভ করে ২১শে ডিসেম্বর শনিবার ঠিক পৌণে নটার সময় আমাদের এই সভাকক্ষে এসে উপস্থিত হব। এতে আমি যদি অসমর্থ হই, অর্থাৎ এই নির্দিষ্ট সময়ে যদি আপনাদের সামনে এসে উপস্থিত হতে না পারি তবে আমার তিন লক্ষ টাকা—যে টাকা বারিং কোম্পানীর অফিসে জমা আছে ও যার নির্দেশ আমি চুক্তিপত্রে দিয়েছি—সেই টাকা সমস্ত আমি হারাব। আমি আজই যাত্রা করব। আমি আজ ৮—৪৫ মিনিটে ডোভার মেলে চড়ছি, আর আশীদিন পরে ঠিক এই সময়েই এই সংস্কৃতিসভাগৃহে উপস্থিত হব। এখন সময় খুবই অল্প, "বন্ধুগণ, আমি আমার যাত্রাপথে আপনাদের শুভকামনা প্রার্থনা করি।"

ফগ্‌ আর বেশি কথা না বলে তখনি বাড়ী চলে গেলেন।

বাড়ীতে পুরাতন ভৃত্যটির জায়গায় সেইদিনই এক নূতন ফরাসী ভৃত্য রাখা হয়েছিল। পুরাতন ভৃত্যটিকে তাঁর সাংসারিক নিয়মাবলীর মাত্র একটি নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

নূতন ফরাসী ভৃত্যটির ফরাসী নাম জঁ,—ইংরাজিতে জন্‌ বলা যেতে পারে। কথাবার্তায় খুব চট্‌পটে,—কাজেও তাই, তবে একটু সরল প্রকৃতির। তার জীবনও বিচিত্র। ভাল গান গাইতে পারে, খুব ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারে, সার্কাসে কিছুদিন নানা ব্যায়ামের কসরৎ দেখাত, ট্রাপিজের খেলায় খুব নাম করেছিল এক সময়ে। কুস্তিও ভাল জানে, রেলের ইঞ্জিনে কাজও করেছে কিছুদিন, মারপিটেও ওস্তাদ। সুতরাং শরীরটি বেশ মজবুত ও মনটিও উদার। আর সবচেয়ে তার বড় গুণ, অবস্থা বুঝে সে সব কাজ ঠিকমত করতে জানে। যে-সব সার্টিফিকেট এনেছিল সে, তাতে তাকে বিশ্বাসের কাজ দেওয়া যেতে পারে একথা সকলেই একবাক্যে বলেছিলেন।

বাড়ী ফিরে ফগ নূতন চাকর জনকে ডেকে বললেন, "দেখ জন, হঠাৎ আমি আজই—এখনই—লণ্ডন ছেড়ে পৃথিবী ভ্রমণে চলে যাচ্ছি। তুমিও আমার সঙ্গে চল।"

"পৃথিবী ভ্রমণে?" —একটু বিস্মিত হয়েই জন কথাটা বললে। ফগ তখন ধীরে ধীরে লাইব্রেরী ঘরের র‍্যাক্‌ থেকে ব্রাড্‌স-এর "কন্টিনেণ্টাল গাইড"-খানা টেনে এনে টেবিলের উপর রেখে কি সব দেখতে লাগলেন ও ডায়েরীতে টুকে নিতে লাগলেন। তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে জনকে বললেন, "আর মাত্র আধঘণ্টা ট্রেণ ছাড়তে বাকী। এর মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নাও।"

তারপর তিনি জনকে আর একটি ঘড়ি দিয়ে বললেন, "তোমার এই ঘড়ি আমার হাতের ঘড়ি ঠিক একই সময় দেবে। সুতরাং তোমারও সব কাজ আমার নির্দেশমত ঠিক সময়ে করতে হবে, এটা মনে রেখো।"

তিনি এবার একটা মজবুত চামড়ার ব্যাগে জনের সামনেই প্রায় তিন লক্ষ টাকার নোট ভর্তি করে নিলেন। এই টাকা তিনি বাড়ীতেই গোপনে এক লোহার সিন্দুকে রেখেছিলেন হঠাৎ দরকারমত তাসখেলার বাজির টাকা যোগাবার জন্য।

জন তার প্রতি মনিবের এই অগাধ বিশ্বাস দেখে মুগ্ধ হ'ল। ফগের প্রতি তার ভক্তির মাত্রা খুবই বেড়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ফগ্ সমস্ত দরকারী জিনিষপত্র গুছিয়ে নিলেন। জনের প্রতিও সেইরূপ আদেশ দিলেন।

তারপর ঠিক আটটা চল্লিশ মিনিটের সময়ে চেয়ারিং ক্রস্ ষ্টেশনে উপস্থিত হলেন। টিকিট কিনে ট্রেণে চড়বার ঠিক এক মিনিট পরেই ট্রেণ ছেড়ে দিলে।

এদিকে আর এক কাণ্ড ঘটতে চলেছে ফগ্ তা জানতে পারেন নি। যে ব্যাঙ্ক থেকে সাড়ে আট লক্ষ টাকা চুরি গিয়েছিল তার কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্যে চোর ধরবার একটা ব্যাপক চেষ্টা করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ব্যাপারটাতে এতই সোরগোল পড়ে গিয়েছিল যে, চোর নিজেকে যে সুকৌশলে লুকিয়ে রাখবে তাতে কারোরই সন্দেহ ছিল না। তবুও ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ মিঃ ফিক্স্ নামে একজন নিপুণ গোয়েন্দাকে গোপনে এই কাজের ভার দিলেন ও ইংলণ্ডের পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি যাতে সর্বরকমে সাহায্য পান সে ব্যবস্থাও করে রাখলেন।

মিঃ ফিক্স্ যখন খবরের কাগজে পড়লেন যে ফগ্ একটা বাজী রেখে আশী দিনে পৃথিবী ঘুরে আসতে বিদেশে যাত্রা করেছেন তখন তাঁর সন্দেহটা ফগের উপর কিছুটা পড়ল। তারপর যখন তিনি যে ভদ্রবেশী চোর ব্যাঙ্ক থেকে অত টাকা নিয়ে সরে পড়েছে, তার চেহারার সঙ্গে ফগের চেহারার কতকটা মিল আবিষ্কার করলেন, তখন তাঁর সন্দেহ আরো বেড়ে উঠল। তারপর যখন শুনলেন ফগ্ তিন লক্ষ টাকা বাজী রেখে গেছেন তখন তিনি প্রায় নিঃসন্দেহ হলেন যে ফগই সেই ব্যাঙ্ক-চোর।

তিনি তখন আর বিলম্ব না করে ফগ্ যে ট্রেণে যাত্রা করেছিলেন, তার পরের ট্রেণেই তাঁর অনুসরণ করতে সুরু করলেন। তিনি ভাবলেন, ফগ্ একটি পাকা বদমাস, ধুরন্ধর চোর। ব্যাঙ্ক থেকে অত টাকা চুরি করে এদেশ থেকে সরে পড়বার এ রকম সুযোগ কি সে ছাড়তে পারে? তাই পৃথিবী ভ্রমণের বাজী ধরে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। সে এ কথা নিশ্চয় জানে, বাজীতে তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বাজীতে হারলেও টাকা ত সে দেবে না। তার চেয়ে যে টাকা ব্যাঙ্ক থেকে চুরি করে নিয়ে গেল সেই টাকাতেই তার চিরজীবন বিদেশে রাজার হালে কেটে যাবে। সাড়ে আট লক্ষ টাকা ত সহজ টাকা নয়!

সুতরাং ফিক্স্ সন্ধান নিয়ে নিয়ে ফগের অনুসরণ করতে লাগল। ক্যালেতে পৌছে ফগ্ যে হোটেলে গেলেন সেখানে ফিক্স্ও গেল। কিন্তু ফগ্ আর কালবিলম্ব না করে সুয়েজগামী জাহাজের সন্ধানে পোর্ট-অফিসে গেলেন। সেখানে শুনলেন 'মঙ্গোলিয়' নামে একটি বিরাট দ্রুতগামী জাহাজ সুয়েজ ক্যানেলের পথ দিয়ে বোম্বাই যাবে। তখন তিনি আর কালবিলম্ব না করে দু'খানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে সেই জাহাজেই রওনা হলেন। জাহাজ সুয়েজের পথে অগ্রসর হ'ল।

এদিকে সারা ইংলণ্ড তখন ফগের সম্বন্ধে আলোচনা করছে। ইংলণ্ডের সব পত্র-পত্রিকাগুলিই বলছে, আশী দিনে পৃথিবী ভ্রমণ কখনও সম্ভব হতে পারে না। এ যে একেবারেই অসম্ভব। "মর্নিং ক্রনিকেল" ত বলেই বসল, ফগ্ নিশ্চয়ই একটি উন্মাদ। "টাইমস্" বললে, ফগ্ হেরে ত যাবেই, তবে তার বাজীর টাকাটা যাতে কোন লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয় গভর্ণমেণ্ট যেন এরূপ ব্যবস্থা করেন।

"ষ্ট্যাণ্ডার্ড" বললে, নিশ্চয়ই এর পেছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে। ব্যাপারটা কিন্তু একটু অসাধারণ। "ডেলি টেলিগ্রাফ" বললে, ফগ্ বাজী রেখে আশী দিনে পৃথিবী ভ্রমণে গেছেন, এতে ইংরাজের জাতীয় জীবনে একটা গৌরব দেখা দিয়েছে। "লণ্ডন ইলাসট্রেটেড্ নিউজ" বললে, ফগ্ এমন একজন লোক, যাঁর সৎসাহসের প্রশংসা করা যায়। অনেক সভাসমিতিতে এরূপ জনমতও প্রকাশ পেল যে ফগ্ যদি সফলকাম হন তবে তাঁকে সর্বোচ্চ রাজকীয় সম্মান দিতে হবে।

সুয়েজ বন্দর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে এমন এক মিলন-কেন্দ্র গড়ে তুলেছে যে সুয়েজ খাল ছাড়া ভারতবর্ষে আসবার আর সুবিধাজনক জলপথ নেই। এই বন্দরে নানা দেশের বহু লোক নানা কাজে লিপ্ত আছে। হোটেলও আছে কয়েকটি। অবশ্য সর্বোৎকৃষ্ট না হলেও সেগুলিতে যথেষ্ট আরামদায়ক ব্যবস্থা আছে।

মিঃ ফিক্স্ খুব বিচক্ষণ ডিটেকটিভ। তিনি পূর্বেই সুয়েজের ব্রিটিশ কনসালকে সমস্ত কথা জানিয়েছিলেন। ব্যাঙ্ক-চোর যে মঙ্গোলিয় জাহাজে পাড়ি দিচ্ছে ও তাকে ধরা দরকার এ বিষয়ে কন্সালের মনে একটা সিদ্ধান্ত জাগিয়ে তোলাই ছিল ফিক্সের গূঢ় অভিপ্রায়। তাই মঙ্গোলিয় জাহাজ যখন সুয়েজ বন্দরে এসে লাগল, তখন দেখা গেল

সেখানকার ব্রিটিশ কন্‌সাল কয়েকজন চতুর কর্মচারী পাঠিয়েছেন বন্দরের জেটিতে। মিঃ ফিক্‌স্‌ সহজেই তাদের চিনতে পারলেন ও গোপনে তাঁদের জানালেন যে সেই জাহাজেই ব্যাঙ্ক-চোর আছে, এখনি নেমে আসবে।

কিন্তু ফগ্‌ তখনি নিজে নামলেন না, জনকে বন্দরে পাঠালেন দু'চারটে আবশ্যকীয় জিনিষ কেনবার ও তাঁর ছাড়পত্রে কনসালের সই নেবার জন্যে। জন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতেই ফিক্‌স্‌ নিজে এসে তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে বললেন, "মনে হচ্ছে যে আপনি এ বন্দরে নূতন এসেছেন, কোথায় যাবেন এখন?"

জন বললে, "আমি একবার কনসালের অফিসে যেতে চাই, পথটা ত জানি না।"

একটু হেসে ফিক্‌স্‌ বললেন, "এই কথা? তা হলে আসুন আমার সঙ্গে, আপনারই নামে কি এই ছাড়পত্র?"

"না, আমার মনিবের নামে। আমি তাঁরই ছাড়পত্র নিয়ে কনসালের সই করাতে যাচ্ছি।"

ব্রিটিশ কনসালের লোকদের সঙ্গে কথা বলতেই তারা ফগকে নিয়ে কনসাল অফিসে যাবার জন্যে জনকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, তখন জন আবার জাহাজে উঠে গিয়ে ফগকে নিয়ে ওদের সঙ্গে কনসাল অফিসে চলল।

ব্রিটিশ কনসাল নিজে ভাল করে ফগের ছাড়পত্রখানি পরীক্ষা করে ফিক্‌স্‌কে বললেন, "এ ত দেখছি আসল ছাড়পত্র, এতে ত কোন ভুল নেই, আর তা ছাড়া ইংলণ্ডের সহকারী সচিবের স্বাক্ষরও এতে আছে।"

কনসাল তখনি সেটাতে সই করে তারিখ বসিয়ে দিলেন—৯ অক্টোবর, বুধবার, বেলা ১১টা।

ফগ্‌ তখন জনকে সঙ্গে করে আবার জাহাজে ফিরে এলেন।

সুয়েজ ক্যানেল ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারের অপূর্ব কীর্তি। কিছুদিন আগে এই পথ খোলা হয়েছিল ও এখানে একটু ধীর গতিতে মঙ্গোলিয়া জাহাজ চলতে লাগল। ক্যানেলের উভয় পার্শ্বেই মরুভূমি। সর্বদা ঝড়ের সঙ্গে বালুরাশি উড়ে আসছে। সে বালুরাশিতে পাছে ক্যানেল বুজে যায়, তাই কয়েকখানি ড্রেজারও সর্বদা জল থেকে বালু তোলার কাজে নিযুক্ত আছে। মঙ্গোলিয়া জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ফগ্‌ ও জন বাইরের দৃশ্য দেখছিলেন। একদিকে আফ্রিকা, অন্যদিকে এশিয়া। দুটি মহাদেশের মধ্যে অবস্থিত এই সুয়েজ ক্যানেল।

মঙ্গোলিয়া ক্যানেল পার হয়ে যখন লোহিত সাগরে এসে পড়ল তখন তার গতি আরও বেড়ে উঠল। ঘন ঘন বংশীধ্বনি করে জাহাজ দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল এডেন বন্দরের দিকে।

সুয়েজ বন্দর থেকে এডেন বন্দর অনেকটা দূরবর্তী। প্রায় এক হাজার তিন শ' দশ মাইল। এই দীর্ঘ পথের আর কোথাও মঙ্গোলিয়া জাহাজ থামে নি। জাহাজে আমোদ-প্রমোদের সমস্ত ব্যবস্থা ছিল। জাহাজটি বেশ বড় থাকায় বেশি আন্দোলিত হয় নি। যাত্রীরা পরমানন্দে দিন কাটাচ্ছিল। জাহাজের খাওয়া-দাওয়াও উৎকৃষ্ট। সকালে ঘুম থেকে ওঠবার ঠিক আগে কেবিনের শয্যাতেই চা পরিবেশন করা হ'ত। তারপর ঠিক বেলা আটটায় প্রাতর্ভোজন। উৎকৃষ্ট খাবার ছাড়া কোন যাত্রীকে কোন কিছু পরিবেশন করা হ'ত না। তারপর দুপুরে ভাল রকমের জলযোগ, সন্ধ্যায় যে ধরনের উৎকৃষ্ট খাবার দেওয়া হ'ত, তা ইউরোপের যে কোন প্রথম শ্রেণীর হোটেলেই দেওয়া হয়ে থাকে। তারপর আবার নৈশ ভোজ। এই নৈশ ভোজের সমারোহ ছিল অসাধারণ। এই সময়ে নৃত্য ও গানবাজনা হ'ত। যাত্রীরা সকলে এসে আনন্দে সেই নৃত্যগীতে যোগ দিতেন। আনন্দ কলরবে সমগ্র জাহাজ যেন মুখর হয়ে উঠত। তারপর যে-যার কেবিনে ফিরে গিয়ে চমৎকার আরামদায়ক শয্যায় শুয়ে নিদ্রা যেতেন।

সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর মাঝে মাঝে উড়ন্ত মাছ দেখতে পেতেন যাত্রীরা। এখানকার বায়ুমণ্ডল শীতোষ্ণ। সুতরাং ডেকে বসে গল্পগুজব করে দিন কাটাতে যাত্রীদের কোন অসুবিধাই হ'ত না। জাহাজে লাইব্রেরী ছিল চমৎকার। নানা রকমের বই, নানা রকমের মাসিক পত্রিকা, নানা রকমের ছবির এ্যালবাম ছিল লাইব্রেরীতে। তা ছাড়া সংবাদপত্রও পাওয়া যেত নানা দেশের।

জাহাজের মধ্যে একটা অভিনয়-মঞ্চও ছিল। মাঝে মাঝে সেখানে কৌতুকাভিনয় হ'ত যাত্রীদের চিত্তবিনোদনের জন্যে। ইচ্ছা করলে যাত্রীরাও সে অভিনয়ে যোগ দিতে পারতেন। সন্ধ্যার সময়ে মাঝে মাঝে গানের ও আলোচনার আসর বসত ডেকে। উপরে বিস্তৃত নীলাকাশ, নিম্নে নীল জলরাশি, আর তার মধ্য দিয়ে জাহাজ চলেছে দ্রুতগতিতে।

ফগ কিন্তু দিনের বেলায় অধিকাংশ সময় কাটাতেন লাইব্রেরী ঘরে নানা দেশের ভ্রমণকাহিনী পড়ে ও আবশ্যকীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে। অনেক সময় তিনি ম্যাপ নিয়ে গম্ভীরভাবে কি যেন ভাবতেন। তাঁর ডায়েরিতে তিনি বিস্তারিত ভাবে দৈনন্দিন কাজের তালিকা ও সময় লিখে রাখতেন। তাঁর হিসাবে এ পর্যন্ত সব ঠিকমত চলেছে, এক ঘণ্টাও বিলম্ব হয় নি।

একটা প্রবাদ আছে, জহুরীই জহর চেনে। সুতরাং ফগ্ যে একজন পাকা তাস-খেলোয়াড় একথা জাহাজে প্রকাশ হতে দেরি হয় নি। তাই কয়েকজন লোকের সঙ্গে তাসের আড্ডা জমিয়েছিলেন তিনি তাঁর কেবিনেই। তারা তাঁর তাস খেলার আশ্চর্য দক্ষতা দেখে অবাক হয়ে যেত। ফগ্ নিশ্চিন্ত মনে গম্ভীর মুখে তাস খেলে যেতেন। তিনি যে একটা গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে জাহাজের যাত্রী হয়েছেন একথা কোন ক্ষেত্রেই প্রকাশ পেত না।

জনের অবস্থাও অনেকটা তার প্রভুর মতই। তবে সে জাহাজের খালাসীদের সঙ্গে বেশ মিশে গিয়ে নানা গল্প করে সময় কাটাত। জাহাজ সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতাও তাদের সঙ্গে অনেকটা সময় অতিবাহিত করে ক্রমশ বেড়ে উঠেছিল। তবে সে সর্বদা ঘড়ির কাঁটার মতই প্রভুর সেবা করে চলছিল।

কয়েকদিন পরেই জন আবিষ্কার করল যে মিঃ ফিক্স্ও সেই জাহাজে আছেন ও তাঁর কেবিনটি ফগের কেবিনের ঠিক পাশেই। একদিন ডেকের উপর ফিক্সের সঙ্গে জনের দেখা হ'ল। এতদিন ফিক্স্ খুব কমই ডেকে আসতেন, শুধু ফগের কাছাকাছি থেকেই তাঁর উপরে নজর রাখতেন। এখন জনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি বললেন, "আপনার নাম জন নয়? আপনাকে আমি যেন সুয়েজে দেখেছি।"

জন বলল, "ঠিক কথা, আমার মনে পড়েছে আপনি দয়া করে আমাদের কনসাল অফিসের ঠিকানা বলে দিয়েছিলেন।"

"আচ্ছা, এবার এডেনেও আপনার মনিব কনসালের সই নেবেন না কি?"

"বোধ হয় নেবেন। কেন বলুন ত?"

"আমার সঙ্গে এখানকার কনসালের জানাশুনা আছে কি না, তাই কথাটা বললাম। যদি আপনাদের কোন উপকার হয়, সে উপকার আমি সর্বদা করতে প্রস্তুত। এখন চলুন, খাবার ঘরে গিয়ে দুই-এক পাত্র স্যাম্পেন খাওয়া যাক্।"

জন ভাবলে মন্দ কি, এই লোকটার ঘাড় ভেঙ্গে যদি দু'এক পাত্র স্যাম্পেন পেটে পড়ে তবে ত ভালই। মিঃ ফগ্ যাতে টের না পান সে রকমভাবে খেতে হবে। মাতাল হলে তো চলবে না। তবে জাহাজে বেশ স্ফূর্তিতে আছি, একটু গোলাপী নেশা হলেই চলবে।

পরক্ষণেই কিন্তু জনের মনের ভাব বদলে গেল। না, মনিবের অনুমতি ছাড়া মদ খাওয়া উচিত নয়। যে উদ্দেশ্যে অত টাকা সঙ্গে নিয়ে চলেছি, কি জানি মদের ঝোঁকে যদি কোন রকম বেসামাল হয়ে যাই। তাই প্রলোভন দমন করে জন বলল, "ধন্যবাদ, মশাই, আপনার স্যাম্পেন খাওয়ার নিমন্ত্রণের জন্যে। কিন্তু এখন আমার অনেক কাজ বাকী। আমি ত এখন স্যাম্পেন খেতে পারব না।"

"বেশ ত, চলুন না, একসঙ্গে কিছু খাবার খাওয়া যাক্।"

"তাতে আমার আপত্তি নেই, তবে এসময়ে হঠাৎ মনিবের ডাক পড়লে আমার খুবই অসুবিধা ঘটবে।"

"না, না, আপনার মনিব এখন সঙ্গীদের নিয়ে তাস খেলছেন। এখন আর মনিব ডাকবেন কেন?"

মিঃ ফিক্সের বিনীত অনুরোধ জন এড়াতে পারল না, কিছু খাবার খেয়ে ফিক্সকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে ছুটে এল ফগের কাছে।

ফগের খেলা তখন শেষ হয়েছে, তিনি জনকে ডেকে বললেন, "আমরা আজই সন্ধ্যাবেলায় এডেনে পৌছব। কিন্তু আজ ১৪ তারিখ। আমার হিসাব মতে এডেনে ১৫ তারিখে পৌছবার কথা। জাহাজ দেখছি দ্রুত চলে প্রায় ১৫ ঘণ্টা আগেই এসে পড়েছে এডেনে।"

সন্ধ্যার মুখেই মঙ্গোলিয়া এডেনে এসে পৌছিল। ফগ্ আর দেরী না করে সন্ধান করে তখনি কনসালের সঙ্গে দেখা করে তার ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিলেন। মিঃ ফিক্স্ তাঁর অনুসরণ করে কনসালকে সব কথা বললেন কিন্তু কনসাল বললেন, এতে আমার কোন হাত নেই। তা ছাড়া এঁর ছাড়পত্রে এঁর ফটো ও ইংলণ্ডের বড় বড় রাজকর্মচারীর স্বাক্ষর রয়েছে। সুতরাং শুধু আপনার প্রমাণহীন কথার উপরে ত কিছু করতে পারি না।"

মিঃ ফিক্স্ তখন বেগতিক দেখে আর কোন কথা না বলে জাহাজে ফিরে এলেন।

সারারাত্র মিঃ ফিক্সের ভাল ঘুম হ'ল না। এই ফগ্ লোকটি যে আসল ব্যাঙ্ক-চোর তাতে তাঁর সন্দেহমাত্র নেই, অথচ নিশ্চিত প্রমাণও তেমন কিছু হাতে নেই। তবুও ফিক্স্ লণ্ডনের প্রধান পুলিশকর্তাকে টেলিগ্রামে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর সন্দেহের সকল কথা এবং প্রার্থনা করেছেন ফগের নামে একখানি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, যে পরোয়ানা-বলে বোম্বাই সহরে সহজেই ফগকে আট্‌কানো যায়। বোম্বাই সহর ভারতবর্ষে, আর ভারতবর্ষটা হ'ল ইংরাজ রাজত্ব। সুতরাং ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-চোরকে ভারতবর্ষে গ্রেপ্তার করা মোটেই অসুবিধাজনক নয়।

ফিক্‌স্‌ চেষ্টা-চরিত্র করেও জনের কাছ থেকে কোন কথা বার করতে পারেন নি। তার মনে হ'ল হয় জন এ সম্বন্ধে কিছু জানে না, নয়ত সেও এ ব্যাপারে একজন সঙ্গীচোর। কিন্তু প্রমাণও বিশেষ কিছু পাচ্ছেন না তিনি। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে হঠাৎ একটা কিছু করে বসা ত ঠিক হবে না।

তবে তাঁর অনুমানটা যে নির্ভুল, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কারণ,

(১) ঠিক ব্যাঙ্ক-চুরির পরদিনই ফগের পৃথিবী ভ্রমণে যাত্রা।

(২) সঙ্গে টাকাকড়িও যথেষ্ট।

(৩) ফগের কর্মহীন জীবনে অত টাকা এল কোথা থেকে?

(৪) ফগের চেহারার সঙ্গে ব্যাঙ্ক-চোরের চেহারার আশ্চর্য মিল।

(৫) পৃথিবী ভ্রমণের বাজী রেখে বিদেশে যাবার সুযোগ লাভ করা একমাত্র চতুর চোরের পক্ষেই সম্ভব।

(৬) লণ্ডনের বড় বড় রাজকর্মচারীর সই ও অনুমতিলাভ করে বিদেশে গেলে সহজেই বিপদ এড়ানো যেতে পারে এ যুক্তি উর্বরমস্তিষ্কপ্রসূত।

(৭) জাহাজে কোন নৃত্যগীতের মজলিসে যোগ না দিয়ে তাঁর নিজের কেবিনে বসে তাস খেলার মধ্যেও যেন একটা বিশেষ সতর্কতা বর্তমান।

(৮) লাইব্রেরীতে বসে মাঝে মাঝে ফগ্‌ যে ম্যাপ দেখেন ও ভ্রমণ কাহিনী পড়েন, এতে নানা দেশে পালিয়ে যাবার পথ আবিষ্কার তাঁর পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

(৯) ফগই যে সেই ব্যাঙ্ক-চোর তার আর একটি প্রধান কারণ তাঁর গম্ভীর চিন্তাকুল মুখমণ্ডল। ধরা পড়বার ভয়ে বোধ হয় তিনি খুব সাবধানী হয়ে আছেন।

(১০) ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, যেখানে লণ্ডনের মত পুলিশ পাহারার কড়াকড়ি নেই। তা ছাড়া ভারতবর্ষ থেকে প্রাচ্যের সব স্থানেই যাওয়া সহজ। যদি শীঘ্র লণ্ডন পুলিশ থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা না আসে তা হলে ফগের পক্ষে ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য যে কোনও প্রাচ্য দেশে পালানো খুবই সহজ।

মিঃ ফিক্‌স্‌ এই সব নানা চিন্তায় বিব্রত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি খুব কড়া নজর রাখলেন ফগ্‌ ও তাঁর চাকরটির উপর।

জাহাজ ভারত-সমুদ্রে দ্রুতবেগে বোম্বাই অভিমুখে চলছিল। শোনা যায় বটে ভারত-মহাসাগরে প্রায়ই ঝড় ওঠে, কিন্তু মঙ্গোলিয়া জাহাজ কোন রকম ঝড়ের মুখে পড়ল না। যাত্রীরা পরমানন্দে ভারত মহাসাগরের নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে দিন অতিবাহিত করতে লাগল।

ভারত মহাসাগর শান্ত থাকাতে ও মঙ্গোলিয়া অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়াতে বোম্বাই সহরে দু'দিন আগেই ফগ্‌ পৌঁছে গেলেন। তিনি ভাবলেন, ভালই হ'ল, দু' দিন তবু হাতে রইল।

বোম্বাই সহরে ব্রিটিশ কনসালকে খুঁজে বার করতে ফগের দেরী হ'ল না। সেখানেও গোপনে ফিক্‌স্‌ বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারে নি। তার একমাত্র কারণ, ফগের কাগজপত্রে কোন গলদ বা ত্রুটি ছিল না।

এবার মিঃ ফিক্‌স্‌ সোজা চলে গেলেন বোম্বাই পুলিশ কমিশনারের কাছে। ফগের সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলে তাঁকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন যাতে ফগকে ব্যাঙ্ক-চুরির জন্য হাজতে রাখা হয়। কারণ, ফগই যে চোর সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ তিনি পেয়ে তবে পুলিশ কমিশনারের কাছে এসেছেন।

পুলিশ কমিশনার সব কথা শুনে বললেন, "লণ্ডন থেকে কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা না পেলে তিনি ফগের সম্বন্ধে কিছুই করতে পারেন না। ভারতবর্ষে ফগ্‌ এমন কোন অপরাধের কাজ করেন নি, যাতে তাঁকে হাজতে আটকে রাখা যায়।"

তখন মিঃ ফিক্‌স্‌ বললেন, আমি লণ্ডনের পুলিশকর্তাকে সমস্ত বিষয় জানিয়েছিলাম, তিনিও আমাকে ফগের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সত্বর পাঠাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেটা কেন যে এসে পৌঁছল না সেকথাই ভাবছি।"

বোম্বাই পুলিশ কমিশনারের কাছে কোন কিছু সুবিধা না পেয়ে তখন ফিক্‌স্‌ আবার ফগের হোটেলে ফিরে এলেন। ফগ্‌ তখন নিবিষ্ট মনে ব্রাডস্‌ ও অন্যান্য গাইড্‌ বই দেখছিলেন। তাঁর ভৃত্য জন তখন সেখানে ছিল না। ফিক্‌স্‌ গোপনে ফগের সম্বন্ধে এখানে সব সন্ধান নিয়ে তাঁর ওপরে কড়া নজর রাখলেন।

এদিকে জন এক কাণ্ড করে বস্‌ল। সে মনিবের কাছে কিছু সময়ের ছুটি নিয়ে বোম্বাই সহর দেখতে

বেরিয়েছিল। এটা ওটা সেটা দেখতে দেখতে সে ক্রমশঃ তন্ময় হয়ে এগিয়ে চলছিল মালাবার হিল্‌স্‌-এর দিকে। সে দেখল একটি সুন্দর মন্দির রয়েছে সেখানে। সে সেই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করল।

ভারতবর্ষে ইংরাজেরা রাজ্য শাসন করবার সময় এই আইন জারি করেছিল যে, কোন প্রকারে কারোর কোন ধর্মের অবমাননা করা চলবে না। যে অবমাননা করবে বা চেষ্টা করবে তার আইনমতে কঠোর শাস্তি হবে। এ আইনের কথা জন জানত না, বা তার জানবার সম্ভাবনাও ছিল না। সুতরাং সে জুতো পায়ে দিয়েই মন্দিরে গিয়ে ঢুকল।

হিন্দুর কোন দেব-মন্দিরে জুতো পায়ে দিয়ে প্রবেশ করা একটা গুরুতর অপরাধ। সুতরাং জন যখন চারদিকে ঘুরে-ফিরে দেখছে ও মনে মনে হিন্দু স্থাপত্যের প্রশংসা করছে সেই সময়ে সেই মন্দিরের হিন্দু পুরোহিতেরা ক্রুদ্ধ হয়ে এসে তাকে আক্রমণ করে মন্দির থেকে বার করে দিতে চাইলে। হতভম্ব হয়ে জন প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলে না, শুধু অবাক হয়ে পুরোহিতদের দিকে চেয়ে রইল।

পুরোহিতেরা এতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে গেল। তারা তখন সকলে মিলে জনকে প্রহার করতে আরম্ভ করলে। কিল চড় ঘুষি অবিশ্রান্ত জনের ওপর বর্ষিত হতে লাগল। তার টুপিটা ছিট্‌কে দূরে পড়ে গেল আর জন সে প্রহারের চোটে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। কয়েকজন পুরোহিত তখনি তাকে চেপে ধরে রইল আর একজন তার পা থেকে জোর করে জুতো জোড়াটি খুলে নিলে। জন অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে উঠে তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে তাড়াতাড়ি একদিকে দৌড়ে পালাতে গেল। কিন্তু যেদিকে সে গেল সেটা হ'ল দেবতার ভোগের ঘর। একজন বিধর্মীকে ভোগের ঘরে ঢুকতে দেখে পুরোহিতের দল ক্রোধে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে টেনে এনে প্রচণ্ডভাবে মারতে আরম্ভ করল, তখন জনও আত্মরক্ষার জন্যে দু চারটে ঘুষি চালাল। এর ফল আরও সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠল। সকলে মার মার শব্দে এগিয়ে এল তার দিকে। তখন আর উপায়ান্তর না দেখে জন প্রাণপণে দৌড় দিল একেবারে মন্দিরের বাইরে। পুরোহিতের দল ও অন্যান্য সকলে তার পিছনে পিছনে কিছুদূর পর্যন্ত ছুটে গেল। তারপর তারা ফিরে এল মন্দিরে।

এদিকে জনকে রাস্তায় অমনভাবে চোঁচা ছুটতে দেখে পথচারীর দল ভাবলে নিশ্চয় ও চুরি করে পালাচ্ছে, তারাও তখন "পুলিশ! পুলিশ!" বলে চিৎকার করে তার পিছনে ছুটে তাকে তাড়া করলে।

হতবুদ্ধি হলেও জন প্রাণ বাঁচাবার জন্যে দৌড়তে দৌড়তে দেখলে সামনে একটা উঁচু পাঁচিল, আর রাস্তা নেই। তখন সে তার কসরৎ দেখালে। এক সময়ে সে সার্কাসে নানা ব্যায়ামের খেলা দেখাত, তখন অবস্থা বুঝে সে একটা উঁচু লাফ দিয়ে সমারসল্ট্‌ খেয়ে পাঁচিলের উপর উঠে পড়ল। তারপর সেই পাঁচিল থেকে লাফ দিয়ে অপর দিকে পড়ে আবার একটা রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল।

পথ ভুল হয়ে গিয়েছিল তার। অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে অনেকক্ষণ পরে সে তার হোটেলে এসে পৌঁছল। জনকে না দেখতে পেয়ে ফগ্‌ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু এখন জনের মুখে সব কথা শুনে তিনি শান্ত স্বরে বললেন, "এবার এখনি প্রস্তুত হয়ে নাও, আমাদের কলকাতার দিকে যেতে হবে। ট্রেণের বেশি দেরী নেই।"

অবশ্য প্রস্তুত হতে বেশি সময় লাগল না। জন শুধু ছেঁড়া কোট প্যান্টালুন বদ্‌লে একজোড়া নতুন জুতো ও একটা টুপি কিনে এনে পরে ফগের সঙ্গে ষ্টেসনে যাত্রা করল।

কলকাতাগামী বোম্বাই মেল তখন ষ্টেসনে দাঁড়িয়ে। ট্রেণ ছাড়বার মাত্র মিনিট দুই দেরী। ফগ ও জন একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে জিনিষপত্তর গুছিয়ে নিয়ে বসতেই ট্রেণ ছেড়ে দিলে।

বোম্বাই মেল খুব দ্রুতগামী ট্রেণ। ওর ইঞ্জিনটিও বিরাট। প্রচুর ধোঁয়া ছড়িয়ে তীব্র বংশী ধ্বনি করতে করতে সশব্দে ট্রেণ বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলল। জানালার ধারে বসে জন অবাক বিস্ময়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিল। ফগ তখন নিশ্চিন্ত মনে একটা গাইড্‌-বুকের পাতা উল্টাতে লাগলেন। এবার ট্রেণ হু হু শব্দে ছুটছিল পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্য দিয়ে। কি সুন্দর দৃশ্য! বিন্ধ্য পর্বতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে জন মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। পর্বত কোথাও অত্যুচ্চ শৃঙ্গ তুলে রয়েছে, কোথাও শ্যামল উপত্যকা, কোথাও ঘন সন্নিবিষ্ট তরুরাজি। চতুর্দিকে অরণ্য এরকম ভীষণ ও দুর্গম যে, ট্রেণের জানালা দিয়ে তার দিকে চেয়েও যেন হৃদ্‌কম্প হয়। ছোট ছোট পার্বত্য নদীগুলি ক্ষীণ জলধারা বুকে করে এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছে। তার তীরে বালুকার মধ্যে অভ্রকণাগুলি ঝিক্‌মিক্‌ করছে। ছোট ছোট পাহাড়ের সারি যেন প্রকাণ্ড বিন্ধ্য পর্বতের শিশুগুলির মতই চারপাশে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। বড় বড় পাথর ইতস্ততঃ ছড়ানো আর তার চারপাশে ঘন বন্যগুল্মের ঝোপ। ট্রেণের হুঙ্কার শব্দে অনেক হরিণ ও অন্যান্য ছোট ছোট পশু ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে বনের মধ্যে। বিন্ধ্য পর্বতের গুহাগুলি কি চমৎকার! মনে হয় ওগুলি যেন কেউ সযত্নে

খোদাই করে রেখেছে। সেই সব গুহার ভীষণ-মধুর সৌন্দর্য দেখে জন মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল। পর্বতের কোন কোন শৃঙ্গ থেকে অল্প অল্প বাষ্পের কুণ্ডলী উঠতে দেখা গেল। বোধ হয় পাথরের ফাঁকে বৃষ্টির সঞ্চিত জল সূর্যতাপে বাষ্প সৃষ্টি করেছে। নদীর তীরে যেখানে বকের শ্রেণী বসেছিল তার কাছ দিয়ে যাবার সময়ে ট্রেণের শব্দে ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে সেই বকগুলো ডানা মেলে আকাশে উড়ে যেতে লাগল একটা লম্বা সাদা রেখার মত। ট্রেণ এবার বিদ্যুৎবেগে পর্বতের পাশ দিয়ে প্রান্তরের উপর এসে পড়ল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অনেক দূর পর্যন্ত শুধু পাথর ছড়ানো, মাঝে মাঝে কাঁটার ঝোপঝাড়। তার ভিতর থেকে বন্য শৃগালের দল বেরিয়ে ট্রেণের শব্দে ভয়ে একদিকে ছুটে যাচ্ছে দেখা গেল। এতক্ষণ সেই কামরার আর একজন ইংরাজ ভদ্রলোক আপন মনে কি একখানা বই পড়ছিলেন, এবার বই থেকে মুখ তুলে তিনি জন ও ফগকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন, "মিঃ ফগ্ না? আরে আমিও যে মঙ্গোলিয়া জাহাজে আপনার সঙ্গে তাস খেলেছি।"

ফগ্ এবার সহযাত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, "কি আশ্চর্য! স্বয়ং ফ্রান্সিস্ যে! আপনিও কি কলকাতায় যাচ্ছেন?"

সার ফ্রান্সিস্ সেনাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন, এখন পেন্সন নিয়ে কিছুদিন ভারতবর্ষে বাস করে তার পরে ইংলণ্ডে চলে যাবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। তিনিও পেন্সনের প্রাপ্য টাকা সম্বন্ধে কি একটা গোলযোগ মেটাবার জন্যে কলকাতা যাচ্ছেন।

এবার ফগ ও সার ফ্রান্সিস্ নানা বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। ফগ যে বাজী রেখে পৃথিবী ভ্রমণে বার হয়েছেন একথা তিনি জাহাজে থাকতেই শুনেছিলেন, এখন ভারতবর্ষে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি অনেক কথাই ফগকে বললেন। বলা বাহুল্য জনও সে সব কথা আগ্রহের সঙ্গে শুনছিল।

বোম্বাই মেল বেশি ষ্টেসনে থামে না। অনেক দূরে দূরে দু'একটা ষ্টেসনে থামতে লাগল। প্রায় সারারাত্রি বোম্বাই মেল বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে শেষে সকালবেলায় একটা ষ্টেসনে থামল। ষ্টেসনটি নিতান্ত ছোট নয়, দু পাশে চারটি লাইন পাতা। ষ্টেশন মাষ্টারের ঘর ও সহকারী ষ্টেশন মাষ্টারের ঘর পাশাপাশি। তা ছাড়া ইঞ্জিনে জল দেবার জন্যে একটা উঁচু বড় লোহার স্ট্যাণ্ডও আছে। ষ্টেশনের একদিকে কয়লা গাদা করা রয়েছে। আর একদিকে সারি সারি কুলীদের ঘর। ষ্টেশনের প্রায় গায়ে একটা মাঝারি পাহাড়। তার চূড়ায় একটা বড় পাথর এমনভাবে উঁচু হয়ে রয়েছে যেন দূর থেকে তাকে একটা মন্দির বলে মনে হয়। সেই পাহাড়ের অর্ধেকটাতে ঘন জঙ্গল আর বাকি অর্ধেকটা রুক্ষ পাথরে ঢাকা।

ট্রেণ থামতেই গার্ড এসে মিনতিভরা স্বরে বললেন, "এখানে আপনাদের নামতে হবে, এ ট্রেণ আর যাবে না।"

"ট্রেণ যাবে না? কারণটা কি শুনতে পাই?" একটু রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করলেন সার ফ্রান্সিস্।

"কারণ এই যে, সামনের রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অবশ্য সারানোর কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং আশা করি দিন কয়েকের মধ্যেই সমস্ত লাইন ঠিক হয়ে যাবে ও এলাহাবাদ পর্যন্ত ট্রেণ ঠিকমত চলবে আর কোন বাধা থাকবে না।" শান্ত স্বরে বললেন গার্ড।

"এ ট্রেণ তা হলে কি এইখানেই থাকবে নাকি?" ঈষৎ রাগত স্বরে প্রশ্ন করলেন সার ফ্রান্সিস।

"না, এ ট্রেণ আজ দুপুরেই আবার বোম্বাই ফিরে যাবে। কেন, টিকিট কেনার সময়ে সে কথা জানতে পারেন নি?"

"আমাদের বরাবর কলকাতার টিকিট দিয়েছে।"

"তা ত দেবেই। তবে আপনারা ইচ্ছা করলে এই ট্রেণেই বোম্বাই ফিরে যেতে পারেন, অথবা লাইন সারানো পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে পারেন। কাছাকাছি রেল কোম্পানী একটা ভাল হোটেল সাময়িকভাবে খুলেছে যাত্রীদের সুবিধার জন্যে।"

সার ফ্রান্সিস্ সৈনিক বিভাগের লোক। তিনি ত চটেই আগুন। ঝাঁঝালো স্বরে বললেন, "আমরা কি এখানে হোটেলে থাকতে এসেছি? আমি রেল কোম্পানীর এই অব্যবস্থার জন্যে গভর্ণমেণ্টের কৈফিয়ৎ চাইব।"

গার্ড বললেন, "কিন্তু হঠাৎ রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে গভর্ণমেণ্ট আর কি করতে পারেন বলুন? আপনাদের সুবিধার জন্যে যেটুকু করবার, তাঁরা ত সে ব্যবস্থা করেছেন।"

সার ফ্রান্সিস্ ক্রুদ্ধ হয়ে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, গার্ড মৃদু হেসে বললেন, "আপনারা না নামলে ট্রেণ আবার আপনাদের নিয়ে বোম্বাই ফিরে যাবে।"

ফগ্ এ পর্যন্ত একটিও কথা বলেন নি, শুধু নির্বিকার ভাবে কি যেন হিসেব করছিলেন। এবার তিনি বললেন, "এখান থেকে এলাহাবাদ কত দূর?"

গার্ড বললেন, "পঞ্চাশ মাইল।" এবার গার্ড সেখান থেকে চলে গেলেন।

ফগ্ হিসাব করতে লাগলেন, "আজ ২২শে, কাল কলকাতা পৌঁছলে আমরা হংকংগামী জাহাজে উঠব। কিন্তু সে জাহাজ ছাড়বে দুপুরের পর। সুতরাং এখন যা দেখছি সে জাহাজ ধরতে হলে আমাদের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।"

"কি ব্যবস্থা?" সার ফ্রান্সিস বেশ চিন্তিতভাবেই প্রশ্নটা করলেন।

"এখানে ভাড়ার জন্য হাতী পাওয়া যায় কি না দেখতে হবে। ভারতবর্ষে হাতী ও ঘোড়াই ত এখন দ্রুতগামী বাহন।"

"চেষ্টা করে দেখতে হবে।" এই বলে সার ফ্রান্সিস্ ফগের মুখের দিকে চাইলেন।

তখন সকলে ট্রেণ থেকে নেমে ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমের দিকে অগ্রসর হলেন।

অন্যান্য যাত্রী তাদের সুবিধামত দেশীয় যানবাহন সংগ্রহ করে যে-যার গন্তব্যস্থলে চলে গেল। ফগ্ তখন সন্ধান নিয়ে জানলেন সেখানে একটা হাতী আছে এবং সে হাতীটা ভাড়া খাটে।

তিনি অবিলম্বে সেই হাতীর মালিক মাহুতের কছে উপস্থিত হলেন।

ষ্টেশনের কাছেই একটা গাছের নিচে হাতীটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুঁড় দোলাচ্ছিল। হাতীটার সামনে রাশীকৃত গাছের পাতা ও কচি ডাল। হাতী সেই ডালপালাগুলো শুঁড় দিয়ে চেপে ধরে তার মুখের মধ্যে পুরে দিচ্ছিল আর চিবুবার সময় শুঁড় নেড়ে নেড়ে এদিক-ওদিক চাইছিল। মাহুতটা কাছেই একটা উঁচু ঢিপির উপর বসে তামাক খাচ্ছিল। তার মাথায় একটা হলুদ-রঙা কাপড়ের পাগড়ি। আর গায়ে একটি ময়লা ফতুয়া। লোকটার চোখে-মুখে বেশ সপ্রতিভ ভাব।

তিন জন সাহেবকে হাতীর কাছে আসতে দেখে সে হুঁকাটি রেখে তখনি উঠে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম করলে।

সার ফ্রান্সিস্ জিজ্ঞাসা করলেন, "এ হাতীর মালিক কি তুমি?"

"না হুজুর। মালিক ঐ পাশের ছোট টালির বাড়ীতে আছে।"

"এ হাতী ভাড়া খাটাবে?"

"কোথায় যেতে হবে হুজুর?"

"এলাহাবাদ। এখনি আমরা যেতে চাই।"

"আমার হাতীর এখন শরীর ভাল নেই। এখন ত ও অতদূর যেতে পারবে না।"

এবার ফগ্ কথা কইলেন। তিনি মাহুতের দিকে চেয়ে বললেন, "আমাদের হাতীটা চাই যে। তুমি মালিককে এখানে ডেকে আন।"

মাহুত মালিককে ডাকতে গেল। ফগ্ তখন মনে মনে কি যেন হিসাব করছিলেন। সার ফ্রান্সিস্ ও জন দু'জনের মধ্যে ভারতবর্ষীয় হাতী সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল।

মাহুত মালিককে নিয়ে ফিরে এল। মালিকের বয়স বোধ হয় পঞ্চাশ হবে। অল্প সাদা দাড়ি ও বিরাট গোঁফ। মালিক এসে সেলাম করে বললে, "হুজুরদের কি হাতীটা ভাড়া চাই?"

সার ফ্রান্সিস্ বললেন, "হাঁ, আমরা এলাহাবাদ পর্যন্ত হাতীটাকে নিয়ে যেতে চাই।"

"কিন্তু হাতী ত যেতে পারবে না, ওর শরীর ভাল নেই বলেই মাহুতের মুখে শুনছি। আপনারা হাতীর আশা ছেড়ে দিন।"

"আমি পাঁচ শ' টাকা ভাড়া দোব।" ফগ্ বললেন।

মাহুত একটু চমকে উঠল। কিন্তু মালিক লোকটা খুব চালাক। সে বলল, "না হুজুর, ভাড়া দোব না।"

"আচ্ছা, সাতশ টাকা?"

"না হুজুর, ভাড়া দোব না।"

"আচ্ছা, হাজার টাকা?" ফগ গম্ভীর মুখে বললেন।

"না হুজুর ভাড়া দোব না।"

মাহুত উভয়ের কথা শুনছিল। সে অবাক হয়ে একবার ফগের দিকে ও একবার মালিকের দিকে চাইছিল।

"বেশ, তবে হাতীটা আমাকে বিক্রী কর, আমি বিশ হাজার টাকা দোব।" ফগ শান্তস্বরেই কথাটা বললেন।

মালিক এবার একবার ফগের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইলে, তারপর বললে, "বিক্রী করার ইচ্ছে আমার নেই।"

"আচ্ছা, আমি পঁচিশ হাজার দোব", ফগ তেমনি শান্তস্বরে বললেন।

"না হুজুর, হাতী বিক্রী করার ইচ্ছে আমার নেই।"

"তিরিশ হাজার। কেমন, এবার রাজী?"

মালিক ইতস্ততঃ করতে লাগল। সার ফ্রান্সিস্ আশ্চর্য হয়ে ফগের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

মালিক তবুও কিছু বলে না, মাহুতের সঙ্গে কি যেন চোখের ইঙ্গিত চলল তার।

সার্ ফ্রান্সিস্ বললেন, "চলে আসুন মিঃ ফগ্। ভারতীয় লোকেরা ঝোপ বুঝে কোপ মারে। এদের প্রশ্রয় দিতে নেই।"

ফগ মালিককে বললেন, "এতেও রাজী নও তুমি?" ফগের কণ্ঠস্বরে যেন একটু বিদ্রূপের আভাস দেখা দিল।

মালিক তখন কি ভেবে বললে, "আচ্ছা, আপনারা যখন আমার হাতীটাকেই পছন্দ করেছেন, তখন আর 'না' বলি কি করে? আর বেশ বুঝতে পারছি, আপনারা বিপদে পড়েই হাতীটা কিনতে চাচ্ছেন। এ অবস্থায় আপনাদের উপকার না করে আমি থাকি কি করে? বেশ, তিরিশ হাজারেই আমি রাজী। কিন্তু নগদ টাকাটা এখনি চাই। আসুন আমার সঙ্গে।"

যে টালির বাড়ীটাতে নিয়ে গেল মালিক, সেটার বাইরের বারান্দায় একটা দড়ির খাটিয়া পাতা ছিল। মালিক তখনি তার উপরে একটা আধময়লা চাদর পেতে দিয়ে বল্লে "বসুন হুজুরেরা।"

তারপর সে একটু চেঁচিয়ে ডাকল, "লছমন!"

সঙ্গে সঙ্গে বছর তেরো-চোদ্দর একটা ছেলে বাইরে এল। মালিক তাকে বললে, "হুজুরলোগ্‌কো উপর পাংখা চালাও।!"

লছমন তখন ঘরের মধ্য থেকে একটা তালের পাখা এনে খুব জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগ্‌ল।

ফগের ইঙ্গিতে জন চামড়ার ব্যাগ থেকে তিরিশ হাজার টাকার নোট বের করে মালিকের হাতে দিলে ও সে গুণে লাগল।

[illegible]নাপাওনা মিটে গেলে মালিক বললে, "হুজুর। আমার হাতীর নাম 'কুনী'। সে খুব জোরে চলতে পারে। [illegible]র মাহুত ওর সঙ্গে যাবে না, অন্য একজন মাহুত দেখে দিচ্ছি আপনাদের। আপনাদের এলাহাবাদ পর্যন্ত সে [illegible] আসবে। তবে হাতীটাকে আপনারা এলাহাবাদে বিক্রীও করতে পারেন।"

[illegible] সার্ ফ্রান্সিস্, ফগ ও জন তিনজনে ষ্টেশনের কাছে একটা হোটেলে গিয়ে কিছু খেয়ে নিলেন। অবশ্য [illegible] বোম্বাইয়ের হোটেলের সঙ্গে তুলনাই হতে পারে না। তবে মোটামুটি চলনসই গোছের খাবার।

[illegible]য নূতন মাহুত এল, সে জাতে পার্শী। এতদিন বোম্বাইয়ে ছিল, তবে কিছুকাল সে মাহুতের [illegible]ছ। লোকটা চালাক-চতুর। ইংরাজিও কিছু কিছু জানে। মালিক অবশ্য একটা কাঠের হাওদা ও গদী [illegible] দিলে। তারপর সেটারও দাম চাইলে। সার ফ্রান্সিস্ এতে খুব রেগে গেলেন, কিন্তু ফগ্ সে [illegible]র দিলেন। মালিক হাসিমুখে সেলাম করে তাঁদের অভিনন্দন জানালে।

হাত[illegible]পর হাওদায় তিনজনে পাশাপাশি বসে কতক জিনিষপত্তর হাতীর গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে ও কতক হাওদার উপর কাছে [illegible] যাত্রা করলে। হাতীর গলার ঘন্টা বাজতে লাগ্‌ল টুং টুং।

বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্তী অরণ্য অতীব ভীষণ। দুর্গম ত বটেই, তা ছাড়া দস্যুদলও এ অরণ্যে লুকিয়ে থাকে। হিংস্র জন্তু ও বিষধর বড় বড় সাপেরও অভাব নেই। হাতী যেন খুব সাবধানে চলতে লাগল। ফগ বল্লেন, "আরও একটু জোরে হাতী যেতে পারে না?"

"এ গভীর বনে সেটা সম্ভব নয় হুজুর।"

"বেশ, তবে সাবধানে চালিয়ে নিয়ে যাও।"

হাতীর পিঠে হাওদার উপর অনেকক্ষণ বসে থেকে সকলের খুব কষ্ট হচ্ছিল। সার্ ফ্রান্সিস্ বললেন "একটু নেমে চলাফেরা না করলে আর ভাল লাগ্‌ছে না,—একবার নামলে হয় না?

মাহুত বললে, "আর একটু পরেই আমরা একটা পাহাড়ের পাশে নদী পাব। সেখানে হাতীও একটু বিশ্রাম করবে আর আমরাও একটু জিরিয়ে নিতে পারব।"

হাতী চলতে চলতে এবার একটা নদীর তীরে এসে পৌছল। ছোট্ট নদীটি, কিন্তু স্রোত বেশ প্রখর, জলও পরিষ্কার। সেখানে সকলে হাতীর পিঠ থেকে নেমে বেশ একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন।

কাছেই পাহাড়ের পাশে নদীটি। সার্ ফ্রান্সিস্ একজন যোদ্ধা ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক সময় সামান্য আশ্রয়েই

কত রাত্রি কাটিয়েছেন। এখন পাহাড়ের একটি ছোট গুহা দেখে তিনি বললেন, "ঐখানেই আজ রাত্রি কাটানো যাক্।" নির্বিকারচিত্তে ফগ্ সে কথার সমর্থন করলেন। শুধু জন ভাবল, হায় রে! কোথায় হোটেলের সেই আরাম-দায়ক সুখশয্যা আর কোথায় এই বনজঙ্গলে পাহাড়ের অপরিচ্ছন্ন গুহা! কিন্তু মনিবের রাত্রিবাসের কথা ভেবে সে নীরবে সেই গুহাটি পরিষ্কার করতে লেগে গেল।

খাবার যা সঙ্গে ছিল সে সব সকলে মিলে খেয়ে নিলেন। মাহুতকেও খেতে দেওয়া হ'ল। হাতীটার সামনে কতকগুলো গাছের কচিডাল রাখা হ'ল তার রাত্রির খাবারের জন্যে। হাওদাটা খুলে নিয়ে গুহার মধ্যে এক জায়গায় রেখে সকলে রাত্রিটা সেখানে কোনরকমে কাটাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ বনভূমিতে মাঝে মাঝে সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কত অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে। বন্য জন্তুরা হয়ত চলাফেরা করছে, তাদের শঙ্কিত পদধ্বনি শুক্‌নো পাতার উপর একটা অজানা রহস্যের সৃষ্টি করছে। বাতাস কখনো একটু বেগে বইছে, কখনো বা হঠাৎ থেমে যাচ্ছে। একটা বিচিত্র গন্ধ সারা পার্বত্যভূমিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

সার্ ফ্রান্সিস্ বললেন "আজকের রাতটা কি নিবিড় অন্ধকারময় দেখছেন, মিঃ ফগ্। আমরা একবার এইরকম ভয়ানক অন্ধকারে যুদ্ধক্ষেত্রে সারারাত্র জেগে বসে ছিলাম।"

তাঁর গল্প চলল। সার্ ফ্রান্সিসের তখন যুবাবয়স। শত্রুরা তখন গিল্‌গিটের ওধারে আস্তানা গেড়েছে। বিদ্রোহী আফ্রিদিদলের সর্দার লুকিয়ে থেকে গুলি বর্ষণ করে ব্রিটিশ সৈন্যদের খুবই অস্থির করে তুলেছে। আমি তখন আমার সৈন্যদল নিয়ে কয়েকটি আফ্রিদি পল্লীর উপর আক্রমণ চালিয়ে সবেমাত্র ক্যাম্পে ফিরেছি, এমন সময় দেখা গেল আর একটা শত্রুদল অনেক লোক নিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের উপর আক্রমণ চালাতে উদ্যত হয়েছে। সেরাত্রি এমনই ভয়ানক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাতে অজানা পথঘাট। পর্বতের চারপাশে রুক্ষ পাথর ও কাঁটাগুল্ম। আমি যথাসাধ্য অনুমান করে পাহাড়ের উপর আমার সৈন্যদল নিয়ে উঠে যাচ্ছি। প্রভাতের আগেই সেই পাহাড়টা আমাদের দখল করতেই হবে, এইরকম প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে আদেশ এল। উপায় নেই দেখে আমরা অগ্রসর হলাম। কিন্তু সংঘর্ষ হ'ল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে। একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি যে আফ্রিদিদের বন্দুকের লক্ষ্য প্রায়ই অব্যর্থ। অত চমৎকার নিশানা আমি খুব কমই দেখেছি। এর বোধ হয় একমাত্র কারণ ওদের দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা আর দিবারাত্র শুধু বন্দুকের নিশানা করে গুলী ছোড়া। এর জন্যে আফ্রিদি জাতটা অসভ্য বর্বর হলেও বন্দুক ব্যবহারে ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী একরকম নেই বললেই হয়। অনেক রকমের যুদ্ধ-কাহিনী বললেন সার্ ফ্রান্সিস্। ফগ নির্বিকারচিত্তে সে সব শুনতে লাগলেন। জনের অবশ্য আগ্রহ খুবই বেশি। কিন্তু সারাদিনের ক্লান্তিতে সেই পার্বত্যগুহার মধ্যেই সকলের চোখে গাঢ় ঘুম এল।

প্রভাত হতেই ফগ্ প্রথমেই বাইরে গিয়ে হাতীটাকে দেখে এলেন। মাহুত তখন সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। সে হাতীর খুব কাছেই একটা বড় পাথরের উপর শুয়েছিল।

প্রভাতেই আবার যাত্রা সুরু হবে, তাই সকলে সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে আবার হাতীর পিঠের হাওদার উপরে গিয়ে বসলেন। হাতী আবার অরণ্যপথে অগ্রসর হো'ল। তার গলায় ঘন্টা বাজতে লাগ্‌ল—টুং টুং।

ফগ হিসাব করে দেখলেন, তাঁরা যদি ২৩শে তারিখে অন্ততঃ দুপুরের আগে কলকাতায় পৌঁছতে পারেন তা' হলে হংকং-এর জাহাজে যাত্রা করা যেতে পারে। কিন্তু হাতী যদি জোরে চলে তবেই এলাহাবাদ থেকে কলকাতাগামী মেল-ট্রেণ ধরা যাবে। অবশ্য হাতী সেদিন দুপুরেই এলাহাবাদ পৌঁছবে। তারপর তিনি আরও হিসাব করতে লাগলেন, তাঁর লণ্ডন ত্যাগ করার পর থেকে সেদিন পর্যন্ত কত সময় কেটে গেছে। আশী দিনের ক'দিন এখনো বাকী। কিন্তু এখনো যে পৃথিবীভ্রমণের প্রায় সবটাই বাকী।

ফগের মুখ দেখে তাঁর মনের ভাব বোঝবার কোন উপায় নেই। অবিচলিতভাবে তিনি মাহুতকে হাতী ঠিকমত চালিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। জন চারপাশের অপরূপ বনসৌন্দর্য দেখছিল। সেও ভাবছিল যে মিঃ ফগ কি ঠিকমত আশী দিনে পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবেন?

হাতী অরণ্যপথে একটা পার্বত্যনদীর শুষ্ক গর্ভ-পথ পাওয়ায় অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে অগ্রসর হচ্ছিল। ফগ হিসাব করে দেখলেন এলাহাবাদ তখনও প্রায় পঁচিশ মাইলের পথ।

পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলেছেন তাঁরা। হঠাৎ একটা পাহাড়ের বাঁক পার হতেই একটা অদ্ভুত ধরনের বাদ্যধ্বনি ও

বহু লোকের চিৎকার তাঁদের কানে এল। বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে ঢাক বাজছিল। ব্যাপার কি জানবার জন্য তাঁরা সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মাহুত কিন্তু হাতীটাকে একেবারে থামিয়ে ফেললে।

মাহুত বললে, "ব্যাপার কি ভাল বুঝতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে এটা ভাল কিছু নয়।"

"কারণ?" জিজ্ঞাসুকণ্ঠে সার ফ্রান্সিস প্রশ্ন করলেন মাহুতকে।

একটু পরেই তাঁরা ঘন বৃক্ষরাজির মধ্য থেকে দেখতে পেলেন একটা বিরাট শোভাযাত্রা প্রচণ্ডভাবে বাদ্যধ্বনি করতে করতে পাহাড়ের পাশ দিয়ে কোথায় চলেছে। সেই শোভাযাত্রার আগে আগে একদল লোক উন্মত্তের মত লম্ফঝম্ফ করে চিৎকার করে কি যেন বলছে। তারপরেই একদল বাদক বড় বড় ঢাক ভেঁপু ও বড় বড় খঞ্জনী বাজাতে বাজাতে চলেছে। তারপরেই আবার একদল মাথায় পাগড়ি ও আলখেল্লা পরা লোক উচ্চৈস্বরে কি যেন মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে চলেছে। তারপরে আবার একদল বাদ্যকর বাঁশী, ঢোলক, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাজাতে বাজাতে চলেছে। তারপর আবার একদল সুসজ্জিত লোক চলছিল, বোধ হয় তারা গ্রামবাসী বা পাড়াপড়শী বা এক পরিবারের লোকও হতে পারে। এইবার যে দৃশ্য চোখে পড়ল সেটা যেমন ভীষণ ও তেমনি মর্মস্পর্শী! একটা ছাউনি ছাড়া খোলা গাড়িতে একটি পরমাসুন্দরী রমণী আলুলায়িত কেশে পাগলিনীর মত ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে চারদিক চেয়ে দেখছে। তাকে তার দু'পাশে চেপে ধরে আছে কয়েকজন বলবান পুরোহিতের মত লোক। সেই পুরোহিতের বসন রক্তবর্ণ, কপালে দীর্ঘ লাল ফোঁটা। উত্তরীয় রক্তবর্ণ। সেই গাড়িটা দুটো প্রকাণ্ড বলদ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সেই বলদের শৃঙ্গে ছোট ছোট লাল পতাকা উড়ছে। সেই গাড়ীর পিছনে চলেছে একদল সৈন্য বন্দুক ও খোলা তরবারি নিয়ে, তার পিছনে চলেছে আবার একদল লোক করতালি দিয়ে দিয়ে শোকের গান গাইতে গাইতে। ঠিক তাদের পিছনে আর একদল সুসজ্জিত লোক একটি শবদেহ বয়ে নিয়ে চলেছে। যে শয্যায় শবদেহ স্থাপিত, সেটি একটা উৎকৃষ্ট খাট, মখমল ও সোনার ঝালর লাগানো চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত। সেই শবদেহের দু'পাশে ধূপাধার বয়ে নিয়ে চলেছে চারজন লোক। মাঝে মাঝে শবাধারে ও পথে পুষ্পবৃষ্টি করা হচ্ছে। ভীষণ হট্টগোল ও বাদ্যধ্বনিতে পাহাড় ও বন যেন কেঁপে উঠল। সর্বশেষে আর একদল লোক চন্দন কাঠ, গন্ধতৈলের আধার, কিছু বস্ত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গেও কিছু সৈন্য রয়েছে।

হাতীর উপরে সকলে হতভম্ব হয়ে গাছের আড়াল থেকে শোভাযাত্রার দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ মাহুত চাপাস্বরে হাহাকার করে উঠল, "হায়, হায়, এ যে দেখছি রাণী আয়ুধা! নিশ্চয়ই বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হয়েছে, তাই রাণী আয়ুধাকে 'সতী' হবার জন্যে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে!"

সার ফ্রান্সিস্ মাহুতকে বললেন, "তুমি কি রাণীকে চেন?"

মাহুত বললে, "হায়! হায়! আমি কি শুধু চিনি, রাণী আয়ুধা যে আমার একরকম আত্মীয়া। আপনাদের বলেছি, আমি জাতে পার্শী। কাজেই আমি সব কথা জানি। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ধনী সার্ জেমসেট্‌জি জিজিভয়-এর আত্মীয়া এই রাণী আয়ুধা। সার্ জিজিভয় পার্শী সমাজের একজন নেতা। বাল্যকালে রাণী আয়ুধার মাতাপিতা মারা যান। অত্যন্ত রূপবতী বলে ষড়যন্ত্রকারীদের কৌশলে কূটচক্রে পড়ে বুন্দেলখণ্ডের বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে মাত্র দু' মাস আগে তার বিয়ে হয়েছিল। রাণী আয়ুধা খুব ভাল ইংরাজি ও গানবাজনা জানে। দুর্ভাগ্যক্রমে বিয়েটা এমন একটা ষড়যন্ত্রের ভিতর দিয়ে গোপনে সম্পন্ন হয়েছিল যে সার্ জিজিভয় ব্যাপারটার কিছুই জানতে পারেন নি। বুন্দেলখণ্ডের বৃদ্ধ অথর্ব রাজার মৃত্যু হয়েছে বলে আমার মনে হয় রাণী আয়ুধাকে জোর করে 'সতী' করতে নিয়ে যাচ্ছে। এইটেই এ-দেশের নিয়ম।"

ফগ এবার শুধু প্রশ্ন করলেন, "সতী ব্যাপারটা কি?"

সার্ ফ্রান্সিস্ বললেন, "ভারতবর্ষে" হিন্দুদের মধ্যে এই বীভৎস প্রথা প্রচলিত আছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে একই চিতায় জোর করে পুড়িয়ে মারা হয়। অবশ্য বাইরে প্রকাশ থাকে যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীর জলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিলে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়।"

মাহুত বললে, "আমি আয়ুধাকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি। আমিও এক সময় বোম্বাইয়ে সার্ জিজিভয়ের বাড়ীতে চাকরের কাজ করেছি। তারপর হাতী চালাতে শিখে বাইরের কাজ করতে থাকি। হায়! হায়! কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য আজ আমাকে দেখতে হ'ল!"

মাহুতকে খুব কাতর দেখে সার্ ফ্রান্সিস বললেন, "কিন্তু এখন আর উপায় কি? এতে আমরা কি করতে পারি?"

এইবার ফগ্ কথা কইলেন। তিনি বললেন, "আমরা কি রাণী আয়ুধাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে পারি না?"

সার্ ফ্রান্সিস্ বললেন, "সে যে এক্ষেত্রে অসম্ভব ব্যাপার।"

ফগ্ শুধু মৃদু হাসলেন। তাঁর মুখে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব ফুটে উঠ্‌ল। তিনি বললেন, "অসম্ভব হলেও আমাদের পক্ষে একটি অসহায় নারীর জীবন রক্ষা করা উচিত। এতে যদি আমার দেরী হয় ও আমি বাজির টাকা হেরে যাই, তাতেও ক্ষতি নেই।"

সার্ ফ্রান্সিস্ কোন কথা বললেন না, তিনি নীরবে ফগের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

জন ত অবাক্। এত লোকের বিরুদ্ধে তার মনিব কি করতে পারেন? আর তা ছাড়া এই বিদেশে তিনি ত একরকম অসহায়।

সার্ ফ্রান্সিস্ এবার বললেন, "ইংরেজের আইনে সতীদাহ বন্ধ হলেও এই বুন্দেলখণ্ডে সে-সব আইন লোকে মেনে চলছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া এই রাজা প্রতাপশালী ছিল, তার লোকবলও যথেষ্ট। সুতরাং এক্ষেত্রে কি করে যে আয়ুধা রাণীকে উদ্ধার করা যেতে পারে সে কথা ত আমি বুঝতে পারছি না।"

ফগ মাহুতকে জিজ্ঞেস করলেন, "কখন সতীদাহ হবে?"

মাহুত বললে, "বোধ হয় কাল প্রত্যুষে। কারণ, এই রকমই এ দেশের নিয়ম! আমি আরও দু'চারটে সতীদাহের কথা শুনেছি সে-সব ভোর বেলাতেই, সূর্য ওঠবার ঠিক পূর্বক্ষণেই হয়েছিল।"

ফগ্ ঘড়ি দেখে বললেন, "এখন থেকেই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। রাত্রির মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করা চাই।"

মাহুত বললে, "আমি এবার শুধু হাতীর চালক মাত্র নই, আমার স্বজাতীয় একজন পার্শী মহিলাকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি আপনাদের সব কিছুতেই সহযোগিতা করব। আর তা ছাড়া আয়ুধাকে যে জোর করে সতী করা হচ্ছে এর কারণ, রাণী মরে গেলে রাজার কতকগুলি আত্মীয়ের বৈষয়িক সুবিধা হয়। কাজেই এদের ষড়যন্ত্রে রাণীকে যে কোন উপায়েই হোক্ মারবার ফন্দী এদের মাথায় আছে।"

ফগ বললেন, "কাল ভোরের আগে আমরা যদি আয়ুধাকে উদ্ধার করতে পারি, তা হলেও আমাদের হাতে থাকবে এলাহাবাদ থেকে মেল ট্রেণ ধরবার যথেষ্ট সময়! অবশ্য, হাতীটাকে একটু জোরেই চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

এবার ফগ্, সার ফ্রান্সিস্, জন ও মাহুত পরামর্শ করতে লাগলেন, কি উপায়ে রাণীকে উদ্ধার করা যায়।

মাহুত বললে, "এ দেশের নিয়ম-মতে রাত্রে রাণীকে নদীতীরে একটা দেব-মন্দিরে রাখা হবে। সেখানে অবশ্য খুব জোর পাহারা থাকবে। আর মন্দিরের পাঁচিলও খুব উঁচু। সে পাঁচিল সকলের অলক্ষ্যে টপ্‌কে যাওয়া ত সহজ কথা নয়। তা ছাড়া মন্দিরের দ্বার-জানালা নিশ্চয়ই বন্ধ করে রাখা হবে। সে অবস্থায় পাহারাদারদের এড়িয়ে পাঁচিল টপ্‌কে মন্দিরে ঢোকা ত সহজ কথা নয়। তার চেয়ে অন্য কোন উপায় থাকে ত ভেবে দেখা যাক।"

ফগ্ বললেন, "বেশ ত, হাতীটাকে এখানে রেখে চল আমরা বনের ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে যাই, দেখি ওদের কি ব্যবস্থা হয়ে আছে। তারপর সেইমত আমরাও সুযোগের সন্ধান করব।"

সকলে তখন অতি সাবধানে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন। ক্রমশঃ তাঁরা সেই মন্দিরের কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হলেন। বনের আড়ালে থাকায় তাঁদের কেউ দেখতে পায় নি। রাজার মৃতদেহ নদীতীরে মন্দিরের সামনে একটা বেদীর উপর রাশিকৃত চন্দন কাঠ ও সুগন্ধি তেল মাখানো কাপড়ের উপর স্থাপন করা হয়েছিল। তার চারপাশে চারজন লোক দাঁড়িয়ে মৃতদেহটি পাহারা দিচ্ছে। আর রাণী আয়ুধাকে জোর করে ধরে নিয়ে সেই মন্দিরের মধ্যে রাখা হয়েছে।

ফগ্ বললেন, "যদি কোন রকমে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ পাওয়া যায় তবে হয়ত আয়ুধাকে নিয়ে বাইরে আসবার একটা উপায় নির্ধারণ করা যেতে পারে। কিন্তু মন্দিরে ঢোকাই যে শক্ত।"

সার ফ্রান্সিস বললেন, "সময় যদি হাতে থাকত, তা হলে না-হয় গভর্ণমেণ্টকে জানিয়ে মিলিটারীর সাহায্যে এ সতীদাহ জোর করে বন্ধ করা যেতে পারত। কিন্তু এখন আর সে সময় পাব কোথা হতে? আর করেক ঘণ্টা পরেই ভোর বেলাতেই রাণী আয়ুধা তাঁর স্বামীর চিতায় ভস্মীভূত হবে।"

এসব আলোচনায় মাহুত যোগ দিয়ে বললে, "উপায় ত কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে রক্ষীরা ও পুরোহিতেরা এসব ক্ষেত্রে মাদক দ্রব্য খেয়ে থাকে। সিদ্ধি, আফিং, গাঁজা, মদ প্রভৃতি না খেলে ওদের চলে না। এখন যে কোলাহল ক্রমশঃ

কমে আসছে তার মানে এই যে, মাদক দ্রব্যের প্রভাবে প্রত্যেকেই এখন বিহ্বল ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। আমার মনে হয় প্রহরীরাও আর বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারবে না। তখন যা হোক একটা চেষ্টা করা যেতে পারা যাবে।"

সকলেই আলোচনা করছিল খুব চাপাস্বরে। শুধু জন স্থির নিশ্চল হয়ে বসে ওদের সব কথা শুনছিল। হঠাৎ তার মাথায় কি যেন একটা ফন্দী এল। সে বলল, "রাণী আয়ুধাকে কখন চিতায় তোলা হবে?"

মাহুত বললে, "রাজা র মৃতদেহ ত চিতায় শোয়ানই আছে। ঠিক ভোরে রাণী আয়ুধাকে রাজার পাশে রেখে চিতায় অগ্নি-সংযোগ করা হবে।"

জন কি ভাবলে, তারপর বললে, "আচ্ছা, আমি যদি ভয়ানক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে একটা অসাধ্য কাজ করি তা হলে হয়ত মনে হয় আমি রাণী আয়ুধাকে রক্ষা করতে পারব।"

সার ফ্রান্সিস্ বললেন, "তোমার মতলবটা খুলেই বল। আমি ত এক রকম হতাশ হয়ে পড়েছি।"

এবার ফগ মুখ খুললেন, তিনি বললেন, "অবশ্য যদি ভীষণ বিপদে পড় তা হলে তোমাকে বাঁচাবার জন্যে আমি সব কিছু ত্যাগ করতে পারি।"

জন কৃতজ্ঞচিত্তে ফগের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর বললে, "এখন আমাকে বিদায় দেবার জন্যে আপনারা প্রস্তুত হোন। জীবনে হয়ত আর দেখা নাও হতে পারে। এইখানে হয়ত আমার রক্তাক্ত দেহখানা পড়ে থাকবে।"

ফগ্ ধীরে ধীরে বললেন, "তোমাকে বাঁচাবার জন্যে আমার জীবনও দান করতে পারি।"

কিছুক্ষণ সকলে চুপ করে সেই জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারে বসে রইলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু সতর্ক প্রহরীদের পদচারণার ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে। সকলে লক্ষ্য রাখতে লাগ্‌লেন প্রহরীরা এবার বিশ্রাম নেয় কি না।

সার ফ্রান্সিস্ জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মতলবটা কি বা কি উপায় তুমি অবলম্বন করবে কিছুই ত প্রকাশ করলে না।"

জন বললে, "এক সময়ে আমি সার্কাসে ব্যায়ামক্রীড়া দেখিয়েছি, অনেক রকম কসরৎ আমি জানি। নিজের প্রাণ বাঁচাতে হলে সে-সবের হয়ত প্রয়োজন হবে। তবে আমি যে উপায় স্থির করেছি সেটা ছাড়া রাণী আয়ুধাকে বাঁচাবার অন্য কোন উপায় এখন আর নেই।"

ফগ্ আস্তে আস্তে বললেন, "উপায়টা কি এবার বল।"

মনিবের আদেশে জন সকলের কাছে তার সেই আশ্চর্য মতলবটা চুপিচুপি বলে ফেললে।

সকলে জনের উপস্থিত বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেল। ফগ্ বললেন, "কিন্তু কত বড় বিপদের আশঙ্কা এতে রয়েছে, সেটা কি ভেবে দেখেছ? এতে যে তোমার প্রাণ যেতে পারে।"

জন বললে, "একজন অসহায়া নারীর প্রাণ রক্ষার জন্যে যদি নিজের প্রাণ যায়, তবে ক্ষতি কি?"

সার ফ্রান্সিস্ প্রশংসমান দৃষ্টিতে জনের দিকে চাইলেন। অন্ধকারেও তাঁর চোখ দুটো আবেগে যেন জ্বলে উঠল। তিনি বললেন, "এর চেয়ে আর কিছু ভাল উপায় ত দেখতে পাচ্ছি না, তবে আমাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে।"

রাত্রি ক্রমে গভীর হয়ে আসছিল। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অদৃষ্টচক্র কোন্ পথে ঘোরে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাবে। জন শুধু সঙ্গে একখানা বড় ছুরি নিয়ে সেই ঝোপের মধ্য দিয়ে চন্দনকাঠে সজ্জিত চিতার দিকে অগ্রসর হ'ল।

কিন্তু অল্পদূর গিয়েই সে মাটিতে শুয়ে পড়ল আর লক্ষ্য রাখতে লাগল কখন চিতার চারপাশের প্রহরীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বিশ্রাম নেয়। দূর থেকে মন্দিরের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে করুণ কান্নার সুর জেগে উঠছিল। জন বুঝতে পারলে রাণী আয়ুধা সারারাত্র জেগে আছেন তাঁর ভীষণ পরিণামের কথা চিন্তা করে। তখন জনের মনে আরও উত্তেজনা, আরও দৃঢ়তা দেখা দিল। সে অত্যন্ত সাবধানে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে একটু একটু করে চিতার দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

এবার তার আশা ফলবতী হ'ল। অন্যান্য সকলে মাদকদ্রব্য সেবন করে যে-যেখানে-পারে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছিল। শুধু চিতার পার্শ্বের প্রহরীরা সজাগ ছিল। এখন দেখা গেল সারারাত্রে পাহারা দিয়ে তারাও রাত্রিশেষে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এবার তারা বসে বসে পাহারা দিতে লাগল, তারপর হাতিয়ার পাশে রেখে তন্দ্রাঘোরে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

এই উপযুক্ত অবসর। জন অতি সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল রাজার চন্দনকাঠে সাজানো চিতার দিকে। তার বুক এক একবার কেঁপে উঠছিল, কি জানি যদি কেউ সন্দেহবশে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু রাত্রিশেষে সকলেই তন্দ্রামগ্ন। কেউ তাকে লক্ষ্য করলে না।

জন এবার রাজার চিতার ঠিক পাশেই উপস্থিত হ'ল। তখন আকাশে শুকতারা জ্বল্ জ্বল্ করছে। উষার বেশী বিলম্ব নেই। মশালের আলোগুলিও নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। জন ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাবধানে চিতার উপর উঠে স্তূপীকৃত চন্দন কাঠের আড়ালে কোনক্রমে নিজের শরীরটা লুকিয়ে ফেললে। দূর থেকে সার ফ্রান্সিস, ফগ্ ও মাহুত অধীর উৎকণ্ঠায় জনকে লক্ষ্য করছিল।

একটু পরেই মন্দিরের মধ্য থেকে দু'জন পুরোহিত বেরিয়ে এসে তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরীদের জাগিয়ে দিলে। তারপর দামামাধ্বনিতে চারিদিক মুখর হয়ে উঠল। সকলেই জেগে উঠে ভীষণ কোলাহল আরম্ভ করে দিলে। তখনও পূর্ব্বদিকে তত ফরসা হয় নি। মশালের ম্লান আলোকে কয়েকজন রাজার চিতাকে বেষ্টন করে তাণ্ডবনৃত্য সুরু করে দিলে। কয়েকজন তারস্বরে চিৎকার করে গান গাইতে লাগল! বাদ্যযন্ত্রগুলি এবার বেজে উঠল।

কয়েকজন ভীষণমূর্তি পুরোহিত আয়ুধাকে টেনে নিয়ে এল

একটু পরে কয়েকজন ভীষণমূর্তি পুরোহিত রাণী আয়ুধাকে মন্দিরের ভিতর থেকে টান্‌তে টানতে বাইরে নিয়ে এল। রাণীর আলুথালু বেশ ও শিথিল দেহ দেখে বোঝা গেল সারারাত্র তার বিহ্বল অবস্থায় কেটেছে। রাণী আয়ুধা যেন দাঁড়াতে পারছিলেন না, এক একবার মাটির উপর বসে পড়ছিলেন, অমনি পরক্ষণেই পুরোহিত তাঁকে টেনে তুলে একরকম হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে রাজার চিতার দিকে নিয়ে চলল।

চিতার চারধারে তখন ধূপাধার থেকে সুগন্ধি ধূম নির্গত হচ্ছে। সকলে রাণী আয়ুধাকে চিতার দিকে টেনে নিয়ে যেতে দেখে সমবেত কণ্ঠে মৃত রাজার নামে এক দারুণ চিৎকারধ্বনি করে উঠ্‌ল। চারিদিকে দারুণ হৈ চৈ, সঙ্গে সঙ্গে জোরে জোরে বাদ্য বাজতে লাগল। পুরোহিতেরা জোর করে রাণী আয়ুধাকে চিতার উপর তুলে দিয়ে চন্দন কাঠে অগ্নি-সংযোগ করে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে একপাশে অগ্নি জ্বলে উঠ্‌ল। আয়ুধা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে রইলেন।

হঠাৎ দেখা গেল, মৃত রাজা যেন আয়ুধাকে দু'হাতে জড়িয়ে তুলে ধরে উঠে দাঁড়িয়েছেন সেই ধূমাচ্ছন্ন চিতার উপর! এ কি অভাবনীয় কাণ্ড! রাজার প্রেতমূর্তি কি আয়ুধাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে স্বর্গে যাচ্ছেন? সকলে মৃত রাজার নামে ঘন ঘন জয়ধ্বনি করে রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে লাগল। দারুণ ভয়ে সকলেরই তখন হৃদ্‌কম্প।

এই উপযুক্ত অবসর! মৃত রাজা যেন তখুনি আয়ুধাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে চিতা থেকে লাফিয়ে পড়লেন, তারপর সেই ধূমাচ্ছন্ন পথে দ্রুতবেগে কোথায় যেন অদৃশ্য হলেন।

চিতা পরীক্ষা করে চিতার মধ্যে মৃত রাজার দেহ পূর্ব্ববৎ শায়িত দেখে হঠাৎ সেই বিপুল জনতা যেন দারুণ ক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। পুরোহিতেরা তখন মার্ মার্ শব্দে চারদিকে ছুটাছুটি করছে। সকলে তখন বুঝতে পেরেছে একটা ভীষণ প্রতারণায় তাদের ভুলিয়ে কে যেন আয়ুধাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। বন্দুকধারী সৈন্যেরা ঘন ঘন বন্দুক ছুড়তে লাগল। উষার সেই স্বল্পালোকে সেখানে যেন একটা ভয়াবহ কাণ্ড চলতে লাগল।

এদিকে মূর্চ্ছিতা আয়ুধাকে নিয়ে জন দ্রুতবেগে সেই জঙ্গলে প্রবেশ করল। হাতী প্রস্তুত ছিল। তখন সকলে হাতীর উপর উঠে বসে হাওদার উপর আয়ুধাকে এক পার্শ্বে সাবধানে শুইয়ে হাতীকে চালানো হ'ল। হাতী বনের মধ্য দিয়ে এসে পথে পড়ল ও যথাসম্ভব সাবধানে দ্রুতবেগে ছুটতে লাগল এলাহাবাদের দিকে।

পুরোহিতেরা যখন এ প্রতারণা জানতে পারলে তখন তারা অনুমান করে সন্দেহবশতঃ সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দূর থেকে হাতীটাকে পালাতে দেখতে পেলে। তখন তারাও মার্ মার্ শব্দে সকলে মিলে ছুটল হাতীটাকে ধরবার জন্যে।

যে পথে হাতী চলছিল, সেটাই এলাহাবাদের পথ। পিছনে মারমুখা বিপুল জনতা উন্মাদের মত তাড়া করে আসছে, আর মুহূর্তমাত্র দেরী করবার সময় নেই। মাহুত খুব সতর্কভাবে অত্যন্ত দ্রুতবেগে হাতী চালিয়ে যাচ্ছে। হাতীটা বোধ হয় তার স্বাভাবিক পশুবুদ্ধিতে বুঝতে পেরেছিল কি একটা অঘটন ঘটেছে, তাই সেও যথাসম্ভব একরকম দৌড়ে দৌড়েই পথ চলছিল। হাতীর সঙ্গে দৌড়-পাল্লায় পারবে কেন মানুষের দল। তাই ক্রমশঃ সেই বিপুল জনতা অনেক পিছনে পড়ে গেল। শুধু দূর থেকে তাদের একটা ভীষণ কোলাহল ভেসে আসছিল।

সামনে একটা ছোট নদী। হাতী সেই নদীর জলে নেমে হাওদার আরোহীদের কিছুমাত্র না ভিজিয়ে ওপারে নিয়ে উঠল। তারপর আবার দ্রুতবেগে চলতে লাগল। মাহুতের আশ্চর্য হস্তিচালনা কৌশল দেখে সকলে মুগ্ধ হলেন। তা ছাড়া এ মাহুত না থাকলে এত বড় একটা বিপদ থেকে পালানো অসম্ভব হ'ত।

হাওদার উপরেই আয়ুধার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। তিনি আশ্চর্য হয়ে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখে কি যেন ভাবতে লাগলেন। মাহুত সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বললে রাণী আয়ুধা কৃতজ্ঞ চিত্তে সকলের কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

রাণী আয়ুধা ভাল ইংরাজি বলতে পারেন। তিনি এককালে বোম্বাইয়ের একটা নামকরা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। তারপর কি ষড়যন্ত্রে তাঁর সঙ্গে বৃদ্ধ রাজার বিয়ে হয় সেকথাও তিনি অশ্রু-সজল চক্ষে জানালেন।

কথা-প্রসঙ্গে রাণী আয়ুধা জানতে পারলেন যে ফগ্ই এ অভিযানের কর্তা। তাঁর বাজীরাখা পৃথিবী ভ্রমণের কথা শুনে তিনি খুবই উৎসাহিত হলেন। একমাত্র ফগের আগ্রহের ফলেই সতীদাহের বিভীষিকাময় মৃত্যু থেকে তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন শুনে কৃতজ্ঞচিত্তে ফগকে অভিনন্দন জানালেন। আর জনের প্রতি তাঁর স্নেহের মাত্রাও যথেষ্ট বেড়ে উঠল। সার ফ্রান্সিসের সঙ্গে রাণীর আত্মীয় সার জিজিভয়ের এককালে আলাপ ছিল। একথা শুনে তিনি সার ফ্রান্সিসকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলেন। আর মাহুত ত তাঁর স্বজাতি ও একরকম আত্মীয়। মাহুতের সঙ্গে তাঁর অতীত জীবনের অনেক কথাই হ'ল।

দুপুরে এলাহাবাদে যখন তাঁরা পৌছলেন তখন প্লাটফরমে কলকাতাগামী মেল ট্রেণ সবেমাত্র এসে দাঁড়িয়েছে। ফগ্ আর বিলম্ব না করে তখনি প্লাটফরমে সকলকে নিয়ে গেলেন। তাঁদের কলকাতা পর্যন্ত টিকিট ছিল। তিনি গার্ডের সঙ্গে দেখা করে আয়ুধারও একখানি টিকিট লিখিয়ে নিয়ে প্রথম শ্রেণীর কামরায় সকলে উঠলেন।

মাহুত প্ল্যাটফরমে তাঁদের সঙ্গে ছিল। সে বলল, "আপনার হাতীটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কি বন্দোবস্ত করবেন?"

"হাতীটা"—মৃদু হেসে ফগ্ বললেন, "ওটা আমি তোমাকে পুরস্কারস্বরূপ দিলাম। তুমি আমাদের সঙ্গে থেকে মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে যে অসাধ্যসাধন করেছ তার যোগ্য পুরস্কার যদিও হাতীটা নয়, তবু এই হাতীটা তোমাকে আমি উপহার দিলাম। আর এই নাও পাঁচশত মুদ্রা। এটা তোমার দু'দিনের মজুরি।"

মাহুত অবাক হয়ে গেল। এমন কি জনও অবাক্। শুধু সার ফ্রান্সিস মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। আর রাণী আয়ুধা বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল্-ফ্যাল্ দৃষ্টিতে ফগের দিকে চেয়ে রইল। ট্রেণ ছাড়বার দেরী নেই। মাহুত তখন সকলের কাছে অন্তরের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। ট্রেণও ছেড়ে দিলে।

ট্রেণে রাণী আয়ুধার জন্যে সমস্ত আরামদায়ক বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললেন। পরদিন দুপুরের সময় মেল ট্রেণ কলকাতার হাওড়া ষ্টেশনে এসে পৌছল।

ফগ্ হিসাব করে দেখলেন, হংকংগামী জাহাজের ছাড়বার সময় মাত্র একঘণ্টা পরে। তখনই তিনি জেটিতে গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললেন। সার ফ্রান্সিস্ ফগের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর মিলিটারী পেন্সন-অফিসে চলে গেলেন। যাবার আগে তিনি ফগকে তাঁর পৃথিবী ভ্রমণের বাজীতে জয়লাভের জন্য উৎসাহিত করে গেলেন এবং এক সময়ে লণ্ডনে গেলে তাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবে এই আশাও জানালেন।

যে জাহাজে ফগ হংকং যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, তার নাম "রেঙ্গুন"। সেটি প্রাচ্যের সবচেয়ে দ্রুতগামী জাহাজ।

তিনি কিছু আগে সকলকে নিয়ে জেটিতে যাবার জন্য গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, হঠাৎ দু'জন পুলিশ কর্মচারী এসে তাঁর গাড়ি আট্‌কাল।

"ব্যাপার কি?" প্রশ্ন করলেন ফগ্।

"আপনার নাম কি মিঃ ফগ্? জন কি আপনারই ভৃত্য?"

"হাঁ, আমার নাম ফগ্, আর জন আমার ভৃত্য।"

"আপনাদের দু'জনকেই এখনি পুলিশ কোর্টে যেতে হবে। আপনাদের বিরুদ্ধে জরুরী শমন আছে।"

"বেশ, চলুন।" নির্বিকার চিত্তে ফগ পুলিশ কর্মচারী দু'জনের সঙ্গে পুলিশ কোর্টে চললেন।

জন বিব্রতভাবে মনিবের সঙ্গে সঙ্গে গেল। রাণী আয়ুধাও তাঁর পশ্চাৎবর্তিনী হলেন।

কোর্টে হাজির হবার পর অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর ডাক পড়ল, তার সঙ্গে জনেরও।

পেশকার অভিযোগের কারণ শোনাল, "আপনার এই ভৃত্য জন বোম্বাইয়ের মালাবার মন্দিরে জুতো পায়ে দিয়ে প্রবেশ করেছিল ও সেখানকার পুরোহিতগণকে মারপিট করে ভারতীয় হিন্দু ধর্মে আঘাত করেছে। এর জন্য আইন অনুসারে তাকে অভিযুক্ত করা হল, আর আপনিও তাঁর মনিব, তাই আপনারও এতে দায়িত্ব থাকায় আপনি কেন আপনার ভৃত্যকে বশে রাখেন নি এর জন্য আপনিও অভিযুক্ত। এখন এ সম্বন্ধে আপনার কি বক্তব্য আছে বলতে পারেন।"

ফগ্ শুধু বললেন, "মাননীয় বিচারপতি, হঠাৎ আমাকে শমন দেওয়ায় আমি এ বিষয়ের বক্তব্য সম্বন্ধে কোন কিছু স্থির করতে পারি নি। পরবর্তী একটা তারিখের জন্য আপনার কাছে আমরা আবেদন করছি।"

"কিন্তু আপনারা বিদেশী; এখানে নূতন। আপনাদের পক্ষ থেকে উপযুক্ত জামিন না পেলে আপনাদের ত ছাড়তে পারি না।"

"কত জামিন দিতে হবে অনুগ্রহ করে জানালে আমরা তার ব্যবস্থা করতে পারি।"

বিচারপতি বললেন, "আপনাদের এখানে কেউ চেনে না। তাই আপনাদের জামিনের পরিমাণ একটু বেশী হবে। আমার আদেশ, আপনারা প্রত্যেকে পনেরো হাজার টাকার জামিনে পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন। যদি সেই তারিখে আপনারা আদালতে উপস্থিত না হন তা হলে এই তিরিশ হাজার টাকা সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে।"

ফগ্ তখনি ব্যাগ খুলে তিরিশ হাজার টাকার নোট বিচারপতির সম্মুখে দাখিল করলেন। পেশকার টাকা গুণতে লাগল।"

পুলিশ-আদালত থেকে বার হয়ে জন প্রথম কথা বলল, "এ কাণ্ডটা যে এতদূর গড়াবে তা' ত ভাবি নি। হায়! হায়! তিরিশ হাজার টাকা।"

ফগ বললেন, নিশ্চয় এর মধ্যে একটা রহস্যময় কিছু আছে, যার জন্যে আমাদের কলকাতায় এ ভাবে আটকানোর চেষ্টা হ'ল।"

ব্যাপারটা ফগ বা জন বুঝতে না পারলেও ঘটনাটা ঘটেছিল এই রকম—

মালাবার হিলের কাণ্ড লণ্ডনের পুলিশ গোয়েন্দা ফিক্‌সের অগোচর ছিল না। কেননা, তিনি সর্বদা বোম্বাইয়ে এ দের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে লণ্ডন থেকে ব্যাঙ্কচোর ফগের নামে কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তখনও বোম্বাইয়ে এল না, অথচ ফগ কলকাতায় চলে যাচ্ছে, তখন মালাবার হিলস্-এর ঘটনা দ্বারাই কলকাতায় ফগ্ ও জনকে আটকানো চলবে এইটাই তাঁর ধারণা হল। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি অলক্ষিতভাবে কোন রকমে আগেই এলাহাবাদে এসে পৌছেছিলেন ও আগের মেল ট্রেণে কলকাতায় পৌছে অভিযোগের সমস্ত ব্যবস্থা, এমন কি সাক্ষ্যসাবুদও প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, যদি কোনরকমে ফগ্‌কে কলকাতায় কিছুদিন হাজতে রাখা যায়, তবে লণ্ডনের পরোয়ানা এসে পৌছলেই তাঁকে ব্যাঙ্কচোর হিসাবে ধরার আর কোন বাধাই থাকবে না। এই সব কারণেই ফগ্ ও জনকে আসামীরূপে পুলিশ আদালতে উপস্থিত হতে বাধ্য করা হয়েছিল।

অবশ্য এসব কথা ফগ্ বা জন কেউ জানতে পারে নি। কিন্তু যখন মিঃ ফিক্‌স্ দেখলেন যে একেবারে অত টাকার মায়া ছেড়ে দিয়ে ফগ ও জন পালিয়ে যাচ্ছে হংকং-এ, তখন তাঁর আর দুশ্চিন্তার সীমা রইল না। তবে আর একটি চিন্তা তাঁর মনে এল। ফগের সঙ্গিনী এই অপরূপ সুন্দরী ভারতবর্ষীয় মহিলাটি কে? ভেবে কিছুই স্থির করতে পারলেন না মিঃ ফিক্‌স্। তবে ত তাঁকেও ফগের অনুসরণ করে হংকং-এ যেতে হয়, নতুন শিকার হাতছাড়া হয়ে যায়! ব্যাঙ্ক-চোরের গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটা হংকং-এ পেলেও চলবে।

এই ভেবে মিঃ ফিক্‌স্ কলকাতা থেকেই নিজের পরিচয় দিয়ে হংকং পুলিশকে টেলিগ্রাফে জানালেন যে, "লণ্ডনের একজন ব্যাঙ্কচোর হংকং যাচ্ছে। নাম তার ফগ্, তার সঙ্গে জন নামে একজন চাকর ও একটি সুন্দরী তরুণী আছে। ফগ্‌কে যেন হংকং-এর জেটিতেই গ্রেপ্তার করা হয়। কারণ লণ্ডন থেকে তার নামের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা শীঘ্রই এসে পৌঁছবে।"

কিন্তু এতেও মিঃ ফিক্‌স্ নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। ব্যাপারটি যাতে সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনিও একটি হংকং-এর টিকিট কিনে সেই 'রেঙ্গুন' জাহাজের যাত্রী হলেন। হংকং জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ে কলকাতার জেটি পরিত্যাগ করে দ্রুতবেগে এক ঘণ্টার মধ্যেই বঙ্গোপসাগরে পড়ল।

চারিদিকে নীল সমুদ্র। অপূর্ব শোভা। কিন্তু সমুদ্র তত উত্তাল নয়। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে ফগ্ দেখলেন দূর দিগন্তে ক্রমে যেন বাংলা দেশ মিলিয়ে গেল। বাংলা দেশ সম্বন্ধে ফগ আগেই অনেক পুস্তকে পড়েছিলেন এখন চক্ষে দেখে তাঁর জ্ঞান কিছুটা বাড়ল। মাত্র একদিনে কিই বা দেখলেন তিনি! তবু রাজধানী কলকাতার সর্বজাতি সংমিশ্রণের যে একটা সার্বজনীন রূপ ছিল, সেটা ফগ্‌কে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। এখন জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে তিনি বঙ্গোপসাগরের ছোট-বড় দ্বীপের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

জন জাহাজের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আয়ুধা তাঁর কেবিনে বসে একখানা ইংরাজি খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কি মনে হ'ল তিনি ধীরে ধীরে ফগের পার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন। একটু পরে জনও সেখানে এসে উপস্থিত হল।

ফগ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আয়ুধার দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি তোমার অসুস্থ শরীর নিয়ে কেবিন ছেড়ে এলে কেন?"

আয়ুধা বললে, "আমার একলা কেবিনে থাকতে ভাল লাগে নি। তাই আপনার সঙ্গে একটু গল্প করতে এলাম।"

ফগ তখন সমুদ্রের, দ্বীপপুঞ্জের দিকে চেয়ে বললেন, "ঐ দেখ আন্দামান দ্বীপ—ঐ দেখ তার পর্ব্বত স্যাড্‌লপিক, ঐ দেখ আন্দামানের আশেপাশে কত ছোট ছোট দ্বীপ।"

জাহাজ তখন পূর্ণ বেগে ছুটছিল। সমুদ্রের বুকে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কি সুন্দর গরিমাময় দৃশ্য! আয়ুধা মুগ্ধ দৃষ্টিতে সূর্যাস্তের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। একটু পরে ফগ বললেন, "এবার কেবিনে ফিরে চল, অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাটিয়েছ। কিন্তু এতক্ষণ চুপ করে কি ভাবছিলে বল ত।"

আয়ুধা বললে, "হংকং-এ আমার এক আত্মীয় আছেন, সার্ জিজিভয়ের সম্পর্কে ভাগিনেয়। আমি ভাবছি সেইখানে তার কাছেই থাকব।"

ফগ বললে, "বেশ, তাই হবে। ভারতবর্ষ ছাড়া যেখানেই তুমি থাক, তুমি নিরাপদে থাকবে।"

জাহাজ এবার সিঙ্গাপুরের কাছাকাছি এসে পড়ল। দূর থেকে সিঙ্গাপুর সহরটি একখানি ছবির মত দেখাচ্ছিল। এসে জেটিতে জাহাজ লাগল।

ফগ ও জন সিঙ্গাপুরের জেটিতে অবতরণ করবার আবশ্যকতা নেই বুঝে জাহাজেই রইলেন।

পরদিন রেঙ্গুন জাহাজ হংকং-এর পথ ধরল।

ফগ্ হিসাব করে দেখলেন—তিনি যদি সময়মত হংকং থেকে সেইদিনই কর্ণাটিক নামক জাহাজে ইয়োকোহামায় যাত্রা করতে পারেন তা হলে যে কয়ঘণ্টা সময় তিনি হিসাব থেকে পেছিয়ে আছেন সেটা পূরণ হয়ে যায়। তাই কর্ণাটিক জাহাজ কখন ছাড়বে সেটা জানতে-জনকে পাঠালেন জাহাজ অফিসে।

জাহাজ অফিস থেকে ফেরবার পথে মিঃ ফিক্‌স্-এর সঙ্গে জনের দেখা হল। জনের মুখ থেকে যখন তিনি শুনলেন যে কর্ণাটিক জাহাজ সেইদিনই দু'ঘন্টার মধ্যে ছাড়বে তখন যাতে ফগ্ সেই জাহাজে সেইদিনই যেতে না পারেন ও হংকং-এ আটক পড়ে থাকেন, সেই মতলবে তিনি জনকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে একটা হোটেলে কয়েক মিনিটের জন্য কিছু জলযোগের জন্য নিয়ে গেলেন। অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যাতে ফগ্ জাহাজ ছাড়বার ঠিক সময় জনের মুখ থেকে না জানতে পারেন ও হংকং-এ পড়ে থাকতে বাধ্য হন। কারণ, হংকং-এ হয়ত লণ্ডন থেকে ব্যাঙ্কচোরের গ্রেপ্তারী পরোয়ানাখানা পৌঁছতে পারে। এই সব কারণে প্রতিদিনই তিনি লণ্ডন পুলিশ অফিসের সঙ্গে এ সম্বন্ধে যোগাযোগ করে রেখেছিলেন।

যে হোটেলে মিঃ ফিক্‌স্ ও জন কিছু খাবারের চেষ্টায় ঢুকল, সেটি চীনাদের গুলির আড্ডা। প্রথমটা তাঁরা সে কথা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু চণ্ডুর ধোঁয়া আর মাটিতে শোয়ানো প্রায় অচৈতন্য লোকগুলিকে দেখে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে সেটা একটা পুরোদস্তুর গুলির আড্ডা।

সামান্য কিছু খাবার দু'জনে খেয়ে অল্পক্ষণ দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নানা কথাবার্তা হল। মিঃ ফিক্‌সের ইচ্ছা জনকে জাহাজ ছাড়া পর্যন্ত নানারকমে ভুলিয়ে আটকে রাখা। হ'লও তাই। দু'চার গ্লাস কড়া মদ খেয়ে ও চণ্ডুর ধোঁয়ার প্রভাবে জন প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ল। তখন হোটেলের লোকেরা তাকে চেয়ার থেকে নামিয়ে মেঝের উপর শুইয়ে দিলে। মিঃ ফিক্‌স্ কাজ হাসিল হয়েছে ভেবে তখন হোটেল থেকে সরে পড়লেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য রইল ফগের গতিবিধির উপর। এদিকে কর্ণাটিক জাহাজের ঠিক সময় ফগ জানতে পারলেন না। তিনি জনের সন্ধানে জেটিতে গিয়ে শুনলেন আধঘণ্টা আগে কর্ণাটিক জাহাজ ছেড়ে গেছে।

ফগের মুখ নির্বিকার। তিনি জানতেন পৃথিবী ভ্রমণে বার হলে এরূপ ঘটনা ঘটবেই। তিনি তখন সেই সমুদ্রতীরে অন্য কোন নৌকা পাওয়া যায় কি না তার চেষ্টা করতে লাগলেন।

সমুদ্রতীরে পালতোলা অনেক বড় নৌকা ছিল। সেগুলিতে মাল তোলা ও নামানো হচ্ছিল। ফগ্ চেষ্টা করেও ভাড়া খাটার কোন বড় নৌকার সন্ধান পেলেন না। অনেকেই সমুদ্রে দূর পাল্লায় যেতে রাজি হল না।

ফগ্ একটু চিন্তিত মনেই ফিরে আসলেন, হঠাৎ তার সঙ্গে একজন বুড়ো মাঝির দেখা হল। সে প্রশ্ন করে জানল যে ফগের এমন একখানা বড় নৌকা চাই যে নৌকা সাগরে অনেকদূর পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারে।

মাঝির নাম বুন্‌স্‌বি। সে ফগকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রতটে একটা বড় নৌকা দেখিয়ে বললে, "ওখানই আমার নৌকা। আপনি ভিতরে গিয়ে দেখতে চান ত চলুন।"

ফগ্ নৌকাটি দেখে সন্তুষ্ট হলেন। বেশ বড় নৌকা। মাস্তুলের গায়ে অনেকগুনি পাল রয়েছে। সেই নৌকাটি যে সমুদ্রে সহজেই পাড়ি দিতে পারবে এ বিশ্বাস তাঁর হল।

মাঝি বুন্‌স্‌বিকে তিনি বললেন, "দেখ, আমি দৈনিক তোমাকে এক হাজার টাকা ভাড়া দেবো,—আমাকে যদি তুমি কর্ণাটিক জাহাজ কোনরকমে ধরিয়ে দিতে পার, তবে আমি তোমাকে তিন হাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ দেব।"

বুন্‌স্‌বি ত অবাক! এত টাকা ভাড়া কোনদিন সে আশা করতে পারে নি। সে সহজেই রাজি হল। কথা রইল এক ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রা করতে হবে।

ফগ্ ফিরে এসে আয়ুধাকে সব কথা বললেন। আয়ুধা শুধু বললেন, "তাহলে হংকং-এ আমার আত্মীয়ের কাছে আমার আর যাবার সময় কই? তাঁকে ত খুঁজে বার করতে হবে।"

ফগ্ বললেন, "তা হলে আমি না হয় আরও একদিন হংকং-এ থাকি।"

আয়ুধা বললেন, "তা হলে ত আপনার অনর্থক অনেকটা সময় কেটে যাবে। সে আমি সহ্য করব কি করে? আপনি আমার জন্যে এত কাণ্ড করছেন, আর আমি আপনার ক্ষতি করব, এ কেমন কথা?। আমি আপনার সঙ্গেই যাব।" ফগ্ নির্বিকার চিত্তে আয়ুধার সব কথা শুনলেন। তিনি যে জনের জন্য খুবই উৎকণ্ঠিত হয়েছেন, সেটা তাঁর মুখ দেখে বাইরে থেকে বোঝা গেল না।

জেটিতে তিনি আয়ুধাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সেখানে মাঝিকে প্রশ্ন করলেন, ইয়াকোহামায় আমাকে আমেরিকার জাহাজ ধরিয়ে দিতে পারবে ত?"

মাঝি দৃঢ় প্রত্যয়ের হাসি হেসে বললে, "খুব সম্ভব পারব। অবশ্য সমুদ্রে যদি তুফান না ওঠে।"

আরও আটজন নাবিক নিয়ে বুন্‌স্‌বি নৌকা প্রস্তুত করে ফগকে ও আয়ুধাকে নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করল। দ্রুতগামী নৌকা 'টংকোডেরি' পাল তুলে সমুদ্রপথে ছুটল।

অসীম সমুদ্র। অনেকদূর পর্যন্ত গিয়েও কর্ণাটিক জাহাজের দেখা পাওয়া গেল না। এমন কি সুদূর দিগন্তে কোন ধুমের কুণ্ডলী বা মাস্তুলও দেখা গেল না। ফগ্ নৌকার ছাউনির নীচে বসে সমুদ্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখছিলেন। আয়ুধা তাঁর পাশেই বসেছিল।

হঠাৎ বুন্‌স্‌বি বললে, "সাগরের অবস্থা ভাল বুঝছি না। আকাশের এককোণে ঝড়ের মেঘ দেখা দিয়েছে।"

ফগ্ অচঞ্চলভাবে সেই দিকে চেয়ে রইলেন।

মেঘ ক্রমশ বাড়তে লাগল। হু-হু শব্দে ঝড়ো বাতাস বইতে লাগল। 'টংকোডেরি' নৌকা ক্রমশ টলমল করতে লাগল। তীব্র বাতাস লাগাতে সমস্ত পালগুলো ফুলে উঠল। তারপর সে কি গতি! ভয়ঙ্কর সমুদ্রের মাঝখানে নৌকা যেন তীরের মত ছুটে চলল। আটজন মাল্লা আর মাঝি স্বয়ং বুন্‌স্‌বি যেন হিমসিম খেতে লাগল।

ফগ্ এবার নৌকার ভিতরে কেবিনে বসে গম্ভীর ভাবে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন। এত বিপদের মধ্যেও যেন দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঝড়ের বেগে নৌকা এত তীব্রগতিতে দক্ষিণদিকে ছুটছে যে, মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। এইভাবে ঘণ্টা পাঁচেক কাটল। ঝড়ের বেগও যেন কমে এল। বুন্‌সবি তখন ফগ্‌কে বললে, "দূরে যেন একটা জাহাজ দেখতে পাচ্ছি।"

ফগ্‌ তখন সেদিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, "আমার মনে হচ্ছে ঐ জাহাজটাই কর্ণাটিক। তুমি যদি ওটাকে ধরতে পার তবেই আমার এ সমুদ্রযাত্রা সার্থক হয়।"

মাঝি তখন অপর মাল্লাদের খুব সাবধানে দ্রুত নৌকা চালাবার আদেশ দিলে। নৌকা ঢেউয়ের উপর দিয়ে উল্কাবেগে আবার কর্ণাটিকের দিকে ছুটে চলল।

অনেকটা কাছাকাছি গিয়েও কর্ণাটিককে ধরা সহজসাধ্য হল না, কারণ কর্ণাটিকও তখন তীব্রবেগে ছুটছিল। বুন্‌সবি তখন আর এক কাণ্ড করে বসল।

নৌকায় একটা ছোট পিতলের কামান ছিল। বুন্‌সবি কর্ণাটিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে সেই পিতলের কামানে বারুদ ভরে আগুন দিলে। মুহূর্ত মধ্যে কামান গর্জন করে উঠল। সেই শব্দ শুনে বোধ হয় কর্ণাটিক তার গতি ঈষৎ কমিয়ে দিলে।

ফগের নৌকা তখন কর্ণাটিক জাহাজের কাছে এল। জাহাজের কর্মচারী ও নাবিকের সকলে মিলে ডেকের উপর থেকে একটা দড়ির সিঁড়ি ফেলে দিল। ফগ্‌ ও আয়ুধা সেই দড়ির সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে উঠলেন।

নৌকার মাঝি বুন্‌সবিকে তাঁর প্রতিশ্রুত তিন হাজার টাকা ও ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দিতে ফগ্‌ এবার কর্ণাটিক জাহাজের যাত্রী হলেন।

এদিকে জনের যখন গুলির আড্ডায় জ্ঞান হল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি ফগের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এসে অন্য মাঝিদের কাছে শুনল ফগ একটা নৌকা ভাড়া করে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে।

জন ভাবল, "নিশ্চয়ই তিনি ইয়োকোহামায় গেছেন। ব্যাপারটা সুবিধার নয় ভেবে জন তখনি সন্ধান নিতে লাগল আর কোন জাহাজ ইয়োকোহামায় যায় কি না। সে জানতে পারল একটা যাদুকরের দল অন্য একটা জাহাজে ক'দিন পরেই ইয়োকোহামায় যাচ্ছে। জন সেই দলের কর্তার কাছে চাকুরির জন্য চেষ্টা করল।

তার হাতে তখন একটি পয়সাও নাই। ক্ষুধাতৃষ্ণায় সে কাতর হয়ে পড়ল। তার অবস্থা দেখে ও সে ব্যায়াম জানে শুনে যাদুকর দলের কর্তা তাকে চাকরি দিলেন। তাকে দলের সঙ্গে থেকে কিছু কিছু ব্যায়াম কৌশল দেখাতে হবে এই কথা রইল। কদিন সে মঞ্চের প্রদর্শনীতে যোগ দিল।

ক'দিন পরেই যাদুকর দলের সঙ্গে একটি জাহাজে জন ইয়োকোহামায় গিয়ে পৌছল।

সেইদিন রাত্রেই ফগের নিউইয়র্ক যাবার কথা, জন উৎকণ্ঠিত হয়ে নানা স্থানে খোঁজ নিয়ে শেষে ফগের কাছে উপস্থিত হল। ফগ তাকে দেখে শুধু বললেন, "আমি তোমাকেই এখানে প্রতীক্ষা করছিলাম।" আয়ুধা ব্যস্ত হয়ে জনকে তার এরূপ বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। জন সমস্ত কথা ফগ ও আয়ুধাকে বললে।

ফগ বললে, নিউইয়র্ক থেকে আবার যেতে হবে সানফ্রান্সিসকোতে। আমি হিসেব করে দেখলাম আমাদের ২৪ ঘণ্টা সময় অপব্যয়িত হয়েছে। অবশ্য যদি এখনও সব ঠিকমত চলে।" পরদিন নিউইয়র্ক থেকে মেল ট্রেণে তিনজনে যাত্রা করলেন সানফ্রান্সিসকোর উদ্দেশ্যে। সে ট্রেণেই আবার মিঃ ফিক্স যে যাচ্ছেন, সে কথা কিন্তু এঁরা জানতে পারলেন না।

ট্রেণ তীব্রগতিতে প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। হঠাৎ একটা ছোট স্টেশনে থামার সিগন্যাল দেখে ট্রেণ থেমে গেল। সকল যাত্রীই উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে, "ব্যাপার কি? ট্রেণ থামল কেন?"

গার্ড খবর নিয়ে এসে বললে, "ব্যাপার খুবই গুরুতর। সামনের নদীর সেতুর খানিকটা ভেঙ্গে গেছে, তবে একেবারে পড়ে যায় নি। সেটা মেরামত না হলে এ ট্রেণ আর চলবে না। অন্ততঃ ছ' ঘণ্টা লাগবে সেটা মেরামত হতে। অবশ্য ওপারে আর একটা ট্রেণ আছে যাবার।"

ফগ শুধু বললেন, "নদীটা পার হবার কি কোন উপায় নেই?"

গার্ড বললে, "আছে, কিন্তু বৃষ্টিতে যে রকম জলের স্রোত বেড়েছে তাতে কোন নৌকা যে নদী পার হতে সাহস করবে, তা ত বুঝতে পারছি না।"

"তবে উপায় কি?" ফগ অলসভাবেই যেন প্রশ্নটা করলেন।

ড্রাইভার, গার্ড ও কয়েকজন রেলকর্মচারী মিলে কি একটা পরামর্শ করতে লাগল। শেষে জানা গেল ড্রাইভার প্রবল বেগে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে সেই ভাঙ্গা সেতুর উপর দিয়েই নদী পার হবে। লাইন ত ঠিকই পাতা আছে।

সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। ড্রাইভার বললে, "এ আর শক্ত কাজ কি? তবে কাজটাতে খুবই দায়িত্ব আছে। এরকম দু'এক ক্ষেত্রে আমি জয়লাভ করতে শুনেছি।"

যাত্রীদের মধ্যে তখন খুব কোলাহল পড়ে গেল। কেউ বললে, "অসম্ভব", কেউ বললে, "সম্ভব হতেও ত পারে।" শেষে স্থির হ'ল ড্রাইভারের কথা মতই কাজ হোক।

তখন গার্ড ও ড্রাইভারের অনুরোধে যাত্রীরা ট্রেণ থেকে নেমে পড়ল। তারপর সকলে সারি দিয়ে ধীরে ধীরে সেই ভগ্নপ্রায় সেতুর উপর দিয়ে সাবধানে হেঁটে পরপারে গেল। পরপারে একটা ছোট ষ্টেশন ছিল। সেখানে প্ল্যাটফরমে সকলে মিলে অপেক্ষা করতে লাগল ট্রেণটার দুঃসাহসিক পরিচালনায় কি ঘটে তা দেখবার জন্যে।

এদিকে এপারে ড্রাইভার সমগ্র ট্রেণটাকে অনেক দূর পিছিয়ে নিয়ে তারপর অতি প্রবলবেগে ইঞ্জিন চালিয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে এগিয়ে এল। সে যে কি প্রচণ্ড গতি তা সহজে অনুমান করা যায় না। মনে হ'ল যেন একটা কামানের গোলা ছুটে এল। ড্রাইভার ইঞ্জিনের সমস্ত ষ্টীম প্রয়োগ করে ইঞ্জিনকে পুরোদমে চালিয়েছে। ঘণ্টায় একশ মাইলেরও অধিক বেগে। ইঞ্জিন ট্রেণটিকে নিয়ে মুহূর্ত মধ্যে যেন এক লম্ফে পার হয়ে গেল সেই ভগ্নপ্রায় সেতু। সে যে কি ভয়ানক কাণ্ড তা ভাবলেও হৃদ্‌কম্প হয়। ট্রেণটি পরপারে যেতেই সকলের আনন্দোচ্ছ্বাসে আকাশ-বাতাস যেন ভরে উঠল।

তখন আবার উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে ট্রেণ চলল। যাত্রীরা আবার নিজ নিজ কামরায় গিয়ে উঠল। ফগ তখন ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে মিঃ ফিক্‌সকেও সুস্থ অবস্থায় সে ট্রেণে দেখতে পেলেন। জন ও আয়ুধা ফিক্‌সকে চিনতে পেরে ভাবলেন, "এ লোকটাও দেখছি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে।"

ট্রেণে সময় কাটাবার জন্যে ফগ তাসখেলার আয়োজন করলেন। যাত্রীদের মধ্যে যারা ভাল তাসখেলা জানে তারা এগিয়ে এল। গাড়ির কামরার মধ্যে হুইষ্ট তাসখেলা চলতে লাগল। রাণী আয়ুধা ট্রেণের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

খেলা বেশ জমে উঠেছে, প্রায় প্রতিবারই ফগ জিতে যাচ্ছেন। হঠাৎ একবার একটা খেলায় তাস দেবার সময়ে তাঁর পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "ও তাসটা দেওয়া ঠিক হবে না, আপনি দেখছি হুইষ্ট খেলাই জানেন না।"

ফগ তার দিকে ফিরে দেখেন একজন সবল ও দৃঢ়দেহ সৈনিক পুরুষ তাঁর দিকে চেয়ে ঐ কথা বললে।

ফগ শান্তস্বরে বললেন, "আপনিই ভুল করছেন, এই তাসখানা না দিলে আমি বাজী জিতব কি করে?"

"না, ও তাস আপনি যদি দেন, তা হলে বুঝব আপনি একদম আনাড়ি খেলোয়াড়, জীবনে কোনদিন তাসের মুখ দেখেন নি।"

পূর্বের মত শান্তস্বরে ফগ বললেন, "তাসখেলা কাকে বলে সেটা আমি ভালই জানি।"

"না, জানেন না"—উদ্ধতস্বরে সৈনিক পুরুষটি অসহিষ্ণুভাবেই কথাটা বললে।

"আমার খেলার উপর আপনার কথা না বলাই ভাল।" ফগ তাসের পিঠগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতে কথাটা বললেন।

"বটে! জানেন আমি আপনাকে কান ধরে হুইষ্ট খেলা শিখিয়ে দিতে পারি!" রাগতস্বরেই সৈনিক একথা বললে।

ফগ তখনি খেলা ছেড়ে উঠে পড়লেন, শান্তস্বরে বললেন, "জানেন, এর একমাত্র উত্তর আপনার সঙ্গে আমার ডুয়েল যুদ্ধ।"

"বেশ, আমি তাতে রাজী। আমি সেনাবাহিনীর একজন অফিসার, ও সব যুদ্ধে আমার হাতপাকানো আছে।"

ফগ শান্তস্বরে বললেন, "তা হলে পরের ষ্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে আমাদের ডুয়েল যুদ্ধ হবে।"

জন এসব কথায় এতই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে তার মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল, এখনি বুঝি সে চক্ষের নিমেষে সেই বর্বর সৈনিক পুরুষকে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দেবে!

হুইষ্ট খেলা বন্ধ হয়ে গেল। ডুয়েল যুদ্ধে ফগের সহচরস্বরূপ জন ও ফিক্‌স রইল আর সেই অফিসারটির পক্ষে একজন যাত্রী সহচর হতে স্বীকৃত হ'ল।

পরের ষ্টেশনে গাড়ি থামবার আগে হঠাৎ বাইরে থেকে ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ শোনা যেতে লাগল। তখন ফগ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন একদল লোক ঘোড়ায় চড়ে বন্দুক ও পিস্তল ছুড়তে ছুড়তে চলন্ত ট্রেণের দিকে এগিয়ে

আসছে। কারও কারও হাতে শাণিত তরবারি আস্ফালিত হচ্ছে। মুহূর্ত মধ্যে ট্রেণে ভয়ানক সোরগোল উঠল। সকলেই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, "সিয়োক্স ডাকাত। সিয়োক্স ডাকাত।"

ট্রেণের ড্রাইভার হাতে একটা গুলী খেয়ে তখনি ইঞ্জিনের উপরেই ঘুরে পড়ে গেল। ফায়ারম্যানের অবস্থাও তদ্রূপ। গার্ডও একটা পায়ে গুলী খেয়ে পড়ে গেল নিজের ভ্যানে।

তখন ট্রেণের উপর ডাকাতেরা চড়াও হয়ে যাত্রীদের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে দিয়েছে। তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেও তারা তৃপ্ত হয় নি, বেপরোয়া খুন-জখমও করছে।

ফগ, জন ও ফিক্স যথাসাধ্য ডাকাতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন ও আয়ুধাকে এক পার্শ্বে সরিয়ে রেখে তাঁকে রক্ষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশ্য আয়ুধাও পিস্তল নিয়ে গুলী ছুড়ছিলেন।

সিয়োক্স ডাকাতের নির্মম হস্তে বহু যাত্রী প্রাণ দিল, বহু যাত্রী সম্পূর্ণ নিঃস্ব হ'ল। ট্রেণের কামরাগুলিতে রক্তের স্রোত বইল। ট্রেণ তখন প্রায় থেমে গেছে, ফগ ও তাঁর সঙ্গীরা তখনও যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। হঠাৎ একজন ডাকাত ইঞ্জিনের উপর উঠে ইচ্ছামত একটা কল ঘুরিয়ে দিলে। সে ইঞ্জিন সম্বন্ধে কিছুই জানত না, শুধু ঔৎসুক্যের বশে এ কাজ করে বসল। সে জানত না, কি ভয়ানক কাণ্ডই সে করে ফেলল। যেই ইঞ্জিনের সেই কলটি ঘোরালো, অমনি হঠাৎ ইঞ্জিনের গতি অসম্ভব বেড়ে উঠল। প্রবল বেগে হুঙ্কার করতে করতে ইঞ্জিন ট্রেণখানিকে নিয়ে লাইনের উপর দিয়ে ছুটল। সেই গতিবেগে অনেক ডাকাত ট্রেণের পাদানি থেকে ছিটকে পড়ল, অনেক ডাকাত ঘোড়া নিয়ে সেই দুর্গম পথে ট্রেণের সঙ্গে আর ছুটতে পারল না, তারা তখন পিছিয়ে পড়ল।

অন্যান্য ডাকাত, যারা ট্রেণের ভিতরে খুনজখম ও লুঠপাট করছিল, তারা যখন দেখল ট্রেণ বিদ্যুৎগতিতে ছুটছে, তখন তারাও একটু ভয় পেলে। এ অবস্থায় লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে তারা নেমেই বা যায় কি করে? গার্ডকে ডাকাতেরা বন্দী করে তার বুকের উপর একটা রিভলভার চেপে ধরে তাকে নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল, সুতরাং এ সঙ্কটে গার্ডই বা কি করবে? ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান ত আগেই আহত হয়ে ইঞ্জিনের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। এ অবস্থায় ট্রেণ একটা ভীষণ দুর্ঘটনায় পড়বে আর যাত্রীদের মধ্যে যারা তখনও বেঁচে আছে, তারা সকলে নিশ্চয় মারা পড়বে।

ফগ, জন ও ফিক্স ব্যাপারটা বুঝে আরও আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাদের কামরা থেকে ডাকাতেরা পালিয়ে গেলেও, ট্রেণে এখন তাদেরই রাজত্ব। কিন্তু ট্রেণ থামাতেই হবে।

বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়ে ট্রেণ তখন উল্কাবেগে ছুটে চলেছে। দু' পাশের পাহাড় বন যেন নিমেষে সরে যাচ্ছে। পরের ষ্টেশন কিয়ার্ণি এখনই এসে পড়বে। সেখানে অন্য ট্রেণ যদি লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে তবে এ ট্রেণের সঙ্গে নিশ্চয়ই তার সংঘর্ষ হবে। নিশ্চিত মৃত্যুর ভয়ে এত বিপদের মধ্যে যাত্রীরা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

জন মিনিটখানেক কি ভেবে নিয়ে তারপর ট্রেণের পাদানিতে নেমে পড়ল, তারপর সেই চলমান ট্রেণের এক কামরার পাদানি থেকে অন্য কামরার পাদানিতে সুকৌশলী ব্যায়ামীর মত লাফিয়ে লাফিয়ে ইঞ্জিনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। সে ব্যায়ামের অনেক কসরৎ জানে, সার্কাসেও খেলা দেখিয়েছে। তার কাছে এ কাজ কঠিন নয়।

তার এই অসম সাহসিক কাণ্ড দেখে সকলে বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে তার দিকে চেয়ে রইল। জন ক্রমশঃ ইঞ্জিনের কাছে গিয়ে ট্রেণের সঙ্গে আটকানো লোহার শিকলটি খোলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু পারলে না। হায়! হায়! এত কষ্ট করে এসেও কি ব্যর্থ হতে হবে? জন চঞ্চল হয়ে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে ট্রেণটা একটা বাঁক পার হচ্ছিল। চাকাগুলো বুঝি এইবার লাইনচ্যুত হয়ে পড়ল বলে? সেই সময়ে বাঁকের মুখে লোহার শিকল একটু আলগা হওয়ায় জন এবার তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে শিকলের মুখটা একটু সরিয়ে দিলে। তখনই ট্রেণের গতিবেগে ঈষৎ আন্দোলিত হয়ে শিকলটা খুলে ঝুলে পড়ল। অমনি ইঞ্জিনখানা আরও দ্রুতগতিতে ধনুকের জ্যামুক্ত তীরের মত প্রবলবেগে ছুটে চলল ট্রেণকে পশ্চাতে ফেলে রেখে।

স্বাভাবিক গতিবেগে ট্রেণটি চলতে চলতে যেখানে থেমে গেল সেখান থেকে কিয়ার্নি ষ্টেশন স্পষ্ট দেখা যায়। ট্রেণটি থামতেই ডাকাতেরা তাড়াতাড়ি ট্রেণ থেকে নেমে মাঠের উপর দিয়ে পালাতে লাগল। যাবার সময় চারজন ডাকাত জনকেও ধরে নিয়ে গেল।

ষ্টেশনের পাশেই কিয়ার্নি দুর্গ। এ দুর্গটি ছোট এবং এর কাজ শুধু সীমান্তের খবরদারি করা। এখানে সৈন্যসংখ্যা বেশি নেই, মাত্র দু'শ। সেই সৈন্যদলের ক্যাপ্তেন ব্যাপার কি জানবার জন্যে কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ট্রেণের কাছে এলেন। ফগ তাঁকে সমস্ত কথা বলতেই তিনি বললেন, "এ সব কাণ্ড প্রায়ই ঘটছে। গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করেও এই সব সিয়োক্স ডাকাত ধরতে পারে নি। এরা পাহাড়ে থাকে আর লুটপাট করে চলে যায়।"

ফগ বললেন, "কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ত দুর্বল নন, তাঁরা ইচ্ছা করলেই ত এই সব হানাদার ডাকাতদের নির্মূল করতে পারেন।"

ক্যাপ্তেন বললেন, "পারেন, কিন্তু করেন না। আমরাও বিশেষ কোন আদেশ না পেলে ওদের ধরতে যাই না।"

ফগ বললেন, "কিন্তু এতে নিরীহ মানুষেরাই ধনেপ্রাণে মারা পড়ে। এ সবও ত আপনাদের দেখা উচিত।"

ক্যাপ্তেন বললেন, "ঠিক কথা বলেছেন, কিন্তু যেখানে গবর্ণমেণ্ট এ নিয়ে মাথা ঘামান না, সেখানে আমরা আর কি করতে পারি! আমরা নিজে কিছু করতে গেলেই আবার গবর্ণমেণ্টের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। আর সে কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হলেই আমাদেরই বিপদ। তাই আমরাও নিশ্চেষ্ট থাকি।"

ফগ বললেন, "প্রতিদিন হানাদার ডাকাতদের এই রকমের উৎপাত হচ্ছে অথচ মনে হয় গবর্ণমেণ্ট যেন এই হানাদারদেরই প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এই তোষণ-নীতি কোন বলিষ্ঠ গবর্ণমেণ্টের থাকা উচিত নয়। এতে লোকের মনে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অশ্রদ্ধা আসে।"

ক্যাপ্তেন এ বিষয়ে আর কিছু না বলে শুধু জানালেন, "বর্তমান ক্ষেত্রে কোন সাহায্য আবশ্যক হলে তিনি সে সাহায্য করতে সবদাই প্রস্তুত।"

ফগ বললেন, "দেখুন, আপনি যদি আমাকে কিছু সৈন্য দেন তা হলে আমি একবার হানাদারদের ধরবার চেষ্টা করে দেখি। আমার একজন ভৃত্যকে হানাদাররা বোধ হয় ধরে নিয়ে গেছে, তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। এ কথা আমরা ভুলব না যে আমার ভৃত্য জনের জন্যই আজ এতগুলি ট্রেণযাত্রীর জীবন রক্ষা হয়েছে। সে আমাদের জন্যে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে ইঞ্জিনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, আর তার প্রাণ রক্ষার জন্যে আমরা এগিয়ে যাব না, 'এটা কথনই হতে পারে না।"

ক্যাপ্তেন কথাটা বুঝলেন, তিনি বললেন, "বেশ, আমি আমার নিজের দায়িত্বে আপনার সঙ্গে পঞ্চাশ জন সৈন্য দিচ্ছি। কিন্তু তার বেশি আর দিতে পারব না। কারণ তা হ'লে দুর্গ অরক্ষিত থাকবে।"

"বেশ তাই দিন"—এই কথা বলে ফগ আয়ুধাকে সেই ট্রেণে শান্তভাবে থাকতে বলে ও ফিক্‌সকে তার তত্ত্বাবধানের জন্য অনুরোধ করে তখনই পঞ্চাশ জন সৈন্যের সঙ্গে ডাকাতদের আস্তানা সেই পর্বতগুলির দিকে সদর্পে অগ্রসর হলেন। সৈন্যদের সঙ্গে একজন প্রবীণ যোদ্ধা দলপতি হিসাবে রইল।

এদিকে আর এক কাণ্ড। যে ইঞ্জিনটি ট্রেণ ছেড়ে আপন খেয়ালে উন্মত্তের মত উল্কাবেগে ছুটে চলছিল, তার বাষ্প ফুরিয়ে আসাতে তার গতি ক্রমশঃ কমতে লাগল। শেষে লাইনের উপর একস্থানে সেই ইঞ্জিনটি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাইরে ঘন তুষারপাত হচ্ছিল। সেই শীতল হাওয়ার সংস্পর্শে এসে আহত ইঞ্জিন-চালক ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করল। প্রথমটা চারদিকে চেয়ে অবস্থাটা সে বুঝে নিলে তারপর দেখল যে পিছনে ট্রেণখানি নেই। তখন সে ভাবল নিশ্চয় ট্রেণখানি ডাকাতদলের হাতে পড়ে পিছনে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। তখন সে আবার ষ্টীম তৈরী করে ইঞ্জিনটি পিছনের দিকে দ্রুতবেগে নিয়ে চলল।

ডাকাতেরা চলে যাবার পর ইঞ্জিনহীন ট্রেণখানির অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। আহত যাত্রীরা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চিৎকার করছে, যারা আহত হয় নি, তারাও খাদ্য ও জলের সন্ধানে বিহ্বল হয়ে পড়ছে। আয়ুধা ও ফিক্‌স নানা চিন্তায় বিভোর। ফিক্‌স ভাবছেন যদি ফগ আর না আসেন, যদি তিনি এ সুযোগে সরে পড়েন, তা হলে ত ব্যাঙ্ক-চোর ধরার কৃতিত্ব ফিক্‌স-এর আর থাকে না। আয়ুধা ভাবছেন, জগতে এখন একমাত্র ফগই তাঁর পরম বন্ধু। তিনি যদি ফিরে না আসেন, জনও যদি না আসে তবে তিনি কোথায় আশ্রয় পাবেন। তাঁর শত্রু ত চারদিকে! কখন কোথা থেকে যে বিপদ আসে তা কে বলতে পারে?"

এদিকে ঘন ঘন হুইস্‌ল দিতে দিতে ইঞ্জিনটি ট্রেণের কাছে ফিরে এল। ইঞ্জিন দেখে আশান্বিত যাত্রীরা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ট্রেণে ইঞ্জিন লাগিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই আবার ট্রেণ চালাবে এই কথাই সকলকে বলে দিলে ড্রাইভার।

আয়ুধা ও ফিক্‌স্ কিন্তু সে ট্রেণের যাত্রী হতে রাজি হলেন না। ফগ্ ও জন্‌কে ফেলে তাঁরা কি সে স্থান ছেড়ে যেতে পারেন? কাজেই ষ্টেশনের নির্জন পরিবেশে তাঁদের প্ল্যাটফরমের এক প্রান্তে একটা ছাউনির নিচে বসে অপেক্ষাই করতে হল। ট্রেণ চলে গেল।

ঘন তুষারপাত হচ্ছে। হু হু করে একটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা তাঁদের সর্বাঙ্গে লাগছে। ষ্টেশন থেকে ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে অনেক আগেই ভয়ে চম্পট দিয়েছেন। জনহীন ষ্টেশন ক্রমে অন্ধকারে ছেয়ে এল।

শুধু চারদিকে বরফ পড়ার একটা অশ্রান্ত ঝির্ ঝির্ ধ্বনি। ষ্টেশনে বাতি জ্বালাবার কোন শ্রমিক নেই, অফিস ঘর তালাবন্ধ। আয়ুধা নীরবে উৎসুক নেত্রে সেই অন্ধকার প্রান্তরের দিকে চেয়ে বসে আছেন। আর ফিক্‌স্ ফগের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার কথা ভাবছেন ও পদচারণা করছেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হয়ে এল। সে অন্ধকার চারপাশের বরফের শুভ্রতায় যেন স্বচ্ছ। আকাশ যেন পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে গেছে। পৃথিবীতে যেন আর কোথাও কেউ নেই! শুধু ষ্টেশনের একপ্রান্তে ছোট্ট একটু ছাউনির নিচে একটি চিন্তাকাতরতা তরুণী ও একটি পদচারণরত পুরুষ।

ঠাণ্ডা বাতাসের বেগ ক্রমশ বাড়ল। আয়ুধা একবার আকাশের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা আছে কি না। অন্ধকার আকাশে সেটা ঠিক বোঝা গেল না। সারারাত্র এক ভাবেই কাটল। অবিশ্রান্ত তুষারপাত চলছিল চারপাশে। ঈষৎ-স্বচ্ছ অন্ধকারে মনে হচ্ছিল কে যেন রাশি রাশি তুলোর আঁশ চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে রাত্রিচর দু'একটা পাখী পাতার আড়ালে বসে ডেকে উঠছিল। গাছের পাতা-ডাল কিছুই দেখা যায় না, শুধু একটা সাদা চাদর কে যেন গাছের গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে।

ভোরের বাতাস এবার বইতে সুরু করেছে। আর প্রভাতের বিলম্ব নেই। পূবদিক ক্রমেই স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। সারারাত্র জেগে আয়ুধা ক্লান্ত চোখে একবার প্রান্তরের দিকে চেয়ে দেখলে। কই, কেউ ত কোথাও নেই! একটা দারুণ ভয় তাঁর হৃদয় অবসন্ন করে তুলল। তবে কি ফগ্—

আর যেন ভাবতে পারছেন না আয়ুধা। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ল!

প্রভাতের রঙ এবার যেন গেল বদলে। সমস্ত বরফ-ঢাকা প্রান্তর এক অপরূপ সৌন্দর্যে ঝলমল করে উঠল। কিন্তু চোখ দুটি পড়ে আছে সেই প্রান্তরপথে, যেখানে ফগ ও জন আবার ফিরে আসবেন ডাকাতদের দমন করে।

ফিক্‌স্-এর চিন্তাও হতাশাময়। ফগ ফিরে না এলে তাঁর এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ! ফগ্ যদি অবস্থা বুঝে সরে পড়েন? না, না, এ হতেই পারে না। নিশ্চয় তিনি ফিরে আসবেন। ব্যাঙ্কচোর ধরার পরোয়ানা ত তাঁর পকেটেই। তিনি ত সেখানা ফ্রান্‌সিস্‌কোতেই পেয়েছিলেন।

এবার আকাশে সূর্য আর একটু উঁচুতে উঠল। হঠাৎ দূর থেকে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল! কারা যেন দল বেঁধে আসছে। আয়ুধা ও ফিক্‌স্ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ক্রমে স্পষ্টভাবে তাঁরা দেখতে পেলেন সৈন্যদের সঙ্গে ফগ ও জন আসছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁরা ষ্টেশনের কাছে এসে পড়লেন। আয়ুধা দ্রুত ছুটে গিয়ে ফগ ও জনের সামনে অশ্রুসজল চোখে দাঁড়ালেন।

ফগ তখন বললেন, "আমাদের এ-অভিযান সার্থক হয়েছে। ডাকাতের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে কে যে কোথায় সরে পড়েছে তার ঠিক নেই। তাদের আস্তানা আমরা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে এসেছি।"

দুর্গরক্ষক ক্যাপ্টেন উৎসাহিত হয়ে বললেন, "এবার থেকে আমরা মাঝে মাঝে অভিযান চালিয়ে আর ডাকাতদের অত্যাচার যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করব।"

পূর্বদিন সন্ধ্যার আগেই ট্রেণ চলে গেছে শুনে জন্ অস্থির হয়ে পড়ল কিন্তু ফগ যেন নির্বিকার চিত্তে বললেন, "এখন আর ট্রেণ কি আসবে না?"

ষ্টেশন-মাষ্টার ততক্ষণে ফিরে এসেছেন। তিনি কথাটা শুনে বললেন, "ট্রেণের এখন ত আসবার কথা নয়, ট্রেণ আসবে আবার সেই সন্ধ্যায়।

"কিন্তু আমাকে যে আজই সিকাগো পৌছতে হবে, তা না হলে নিউইয়র্ক যাবার সন্ধ্যার ট্রেণ পাব না।"

ষ্টেশন-মাষ্টার বললেন, "এখান থেকে দু'শ মাইল পরে ওমাহা ষ্টেশন। সেখানে ঠিক দু'ঘণ্টা পরে আপনি সিকাগো যাবার ট্রেণ পাবেন। কিন্তু ওমাহা ষ্টেশনে যাবার ত কোন ট্রেণই এখন এখানে আসবে না।"

ফগ্ একবার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। প্রভাতসূর্যের আলোকে স্পষ্ট দেখা গেল পথ-প্রান্তর সব সাদা বরফে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

ফগ কি চিন্তা করে ষ্টেশন-মাষ্টারকে বললেন, "আচ্ছা, এখানে শ্লেজ্ ভাড়া পাওয়া যায়?"

"শ্লেজ?" একটু যেন বিদ্রূপের হাসি হেসে ষ্টেশন মাষ্টার কথাটা বললেন।

দৃঢ়স্বরে ফগ্ বললেন, "হাঁ, শ্লেজ। আমি ভাবছি এই বরফের উপর দিয়ে ওমাহা ষ্টেশনে পৌছাবার একমাত্র উপায় শ্লেজ।"

ষ্টেশন মাষ্টার কি যেন ভাবলেন। তার পর বললেন, "হাঁ শ্লেজ আছে বটে একখানা। এই ষ্টেশনের কাছেই একটা

লোকের। তবে সে সেখানা ভাড়া দেবে কি না বলতে পারি না। তবে আমি আপনার সঙ্গে লোক দিচ্ছি, সে আপনাকে এখনি তার কাছে নিয়ে যাবে।"

ফগ তখনি শ্লেজ ওয়ালার কাছে গেলেন। লোকটা আধবুড়ো তবে খুব হুঁসিয়ার বলেই মনে হল।

শ্লেজ-ওয়ালা বললে, "আমার শ্লেজ ভালই চলবে, তবে ভাড়া একটু বেশি পড়বে। পঞ্চাশ টাকার কমে আমি যাব না।"

ফগ বললেন, "বেশ, পঞ্চাশ কেন, আমি তোমাকে দু'শ টাকা দেব। কিন্তু আমাকে ওমাহা ষ্টেশনে সিকাগোর ট্রেণ ধরিয়ে দিতে হবে।"

উৎসাহিত হয়ে শ্লেজ-ওয়ালা তখনি রাজি হয়ে শ্লেজে পাল খাটিয়ে গদি পেতে প্রস্তুত হল। শ্লেজে ওরা চারজনে উঠতেই শ্লেজ-ওয়ালা শ্লেজ ছেড়ে দিলে। সেই তুষারমণ্ডিত মসৃণ পথে শ্লেজ বেগে চলল। তখন বেশ জোরে বাতাস বইছিল, সুতরাং শ্লেজের গতি আরও বাড়ল। ওর বড় পালটা বেশ ফুলে উঠে যেন শ্লেজকে সজোরে টেনে নিয়ে চলল। শ্লেজে চাকা নেই, শুধু দু'পাশে লম্বা লোহার পাটি। তাই সোঁ সোঁ করে শ্লেজ বরফের উপর দিয়ে ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ মাইল বেগে ছুটল।

শ্লেজ-ওয়ালা খুব দক্ষ চালক। সোজা রাস্তা পেলেই বেগ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। নদীগুলো জমে বরফ হয়ে যাওয়াতে শ্লেজের পক্ষে হল অবারিত গতি। হঠাৎ সেই বিস্তীর্ণ শুভ্র প্রান্তরে এক রকম অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল, আর দেখা গেল একদল জন্তু তাদের শ্লেজের দিকেই ছুটে আসছে।

ফগ জিজ্ঞাসা করলেন, "ওগুলো কি ছুটে আসছে?"

শ্লেজওয়ালা বললে, "নেকড়ে বাঘ। আমাদের আরও বেগে যেতে হবে দেখছি।"

'নেকড়ে বাঘ' এই কথা শুনে আয়ুধা ভয়ে শিউরে উঠলেন। জন ও ফিক্স্ বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে রইল। শ্লেজ-ওয়ালা বললে, "বন্দুক ছুড়লেই বিপদ বাড়বে। ওই নেকড়ের দল আরও ক্ষেপে উঠে শ্লেজ ধরবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন না হলে বন্দুক না ছোড়াই ভাল।"

কিন্তু এক ভয়ানক বিপদ ঘটল। এতক্ষণ জোরে বাতাস বইছিল, এখন বাতাস হঠাৎ থেমে যাওয়াতে ফোলা পাল ছোট্ট মাস্তুলের সঙ্গে যেন জড়িয়ে গেল। শ্লেজের গতি ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল থেকে একেবারে পাঁচ মাইলে দাঁড়াল। এদিকে হিংস্র নেকড়ের দল উল্কার মত ছুটে আসছে শ্লেজের দিকে।

শ্লেজওয়ালা দারুণ ভয় পেয়ে বললে, "আপনারা এবার প্রত্যেকে বন্দুক নিয়ে তৈরি হোন। যতগুলো পারেন মারতে থাকুন। এ ছাড়া এখন আর অন্য কোন উপায় নেই।"

কিন্তু আর এক বিপদ দেখা দিল প্রান্তরের আর এক দিকে। সেখান থেকে আরও এক দল নেকড়ে ছুটে আসছে দেখা গেল। এই দুটো দলে প্রায় একশ নেকড়ে ছিল। এ অসম্ভব ব্যাপার দেখে সকলের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল।

শ্লেজ-ওয়ালা বললে, "পূবদিকে মেঘ করাতে বাতাস যে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, নইলে ওরা আমাদের নাগাল পেত না। কিন্তু এ অবস্থায় আমাদের বাঁচবার আর কোন উপায়ই নেই। পূব দিক থেকে ঝড় আসতে পারে কিন্তু কখন আসবে তা বলা শক্ত।

ক্ষুধার্ত নেকড়ের দুটো দল সমানে ছুটে আসছে শ্লেজের দিকে। তাদের জিভ্ লক্ লক্ করছে। তারা যেন এখনই লাফিয়ে পড়বে শ্লেজের উপর। শ্লেজ-ওয়ালা একান্ত হতাশ হয়ে বললে, "না, নেকড়ের দল এসে পড়ার আগে ঝড় আর আসবে না।"

শ্লেজ যেন আর চলতে পারছে না। বাতাস একেবারে বন্ধ। চারদিক থম্ থম্ করছে। ফগ্, ফিক্স্ ও জন বন্দুক নিয়ে নেকড়ের দলকে তাগ করলেন। আয়ুধার হাতে একটা পিস্তল। শ্লেজ-চালকও একটা বড় ছোরা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল।

নেকড়ের দল তেমনিই ছুটে আসছে। আর বোধ হয় একশত হাত মাত্র। তাদের রক্তবর্ণ চোখগুলোও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

এবার একসঙ্গে তিনটে বন্দুক ও একটা পিস্তল গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চারটে নেকড়ে তখনি লুটিয়ে পড়ল বরফের উপর।

কিন্তু ওরা একবার মাত্র থমকে দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে এল বিদ্যুৎবেগে। আবার বন্দুক গর্জন করে উঠল। এবারেও চারটে নেকড়ের জীবনান্ত হল।

আবার গুলী ছুটল। ফগ, জন ও ফিক্‌স্ ক্রমাগত গুলি ছুড়তে লাগলেন। অনেক নেকড়ে নিহত হচ্ছে, কিন্তু তবুও যেন তারা ক্ষান্ত হচ্ছে না। এক একবার থম্‌কে দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে আসছে।

বাঁচবার আর ত কোন উপায় নেই। হতাশ হয়ে প্রত্যেকে উন্মাদের মত গুলি ছুড়তে লাগলেন।

হঠাৎ একটা সোঁ সোঁ শব্দ শোনা গেল, আর সেই মুহূর্তে একটা দমকা হাওয়ার স্রোত এসে পালে লাগ্‌ল। ঠিক সময়মত ঝড় এসে পড়েছে।

তখনি পাল ফুলে উঠল আর শ্লেজ আবার বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল। কৌশলী চালক অতি সাবধানে বরফের উপর দিয়ে শ্লেজ চালিয়ে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার হয়ে গেল। নেকড়ের দল তখন অনেক পিছিয়ে পড়েছে। আর মনে হল তারা দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর এগিয়ে আসবে না।

একটু দূরে এবার কতকগুলি ঘর-বাড়ী দেখা গেল। শ্লেজওয়ালা বললে, "আমরা এবার ওমাহায় এসে পড়েছি। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে শ্লেজ থেকে নেমেই তারা ষ্টেশনের প্যাটফর্মে গিয়ে ট্রেণে উঠলেন। সিকাগোর ট্রেণ তখন ছাড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল্। আর একটু বিলম্ব হলে আর পাওয়া যেত না।

পর দিন ফগ্ সিকাগোতে যখন পৌঁছলেন তখন বেলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে, সন্ধ্যার অল্প বাকি। ফগ্ হিসাব করে দেখলেন, সেদিন ১০ই ডিসেম্বর। বাজীর সময় মিলিয়ে তিনি জনকে বললেন, আমরা কয়েক ঘণ্টা এখনও পিছিয়ে আছি বটে, কিন্তু এ সময়টা আমরা পুষিয়ে নিতে পারব বলে আশা করি।"

সিকাগো থেকে নিউইয়র্কের ট্রেণ ঠিক সময়েই পাওয়া গেল। সকলেই আশান্বিত হয়ে উঠলেন। ফিক্‌স্ ভাবলেন, "ফগের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ত আমার পকেটেই আছে, আমি শুধু যেদিন ফগ ইংলণ্ডে পদার্পণ করবে সেইদিনই এটা কাজে লাগাব।"

নিউইয়র্কে পৌঁছেই তাঁরা লিভারপুলে যাবার জন্যে জাহাজঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ফগের দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র ৪৫ মিনিট আগে লিভারপুলে যাবার জাহাজ "চায়না" জেটি ছেড়ে গেছে। ১৪ই ডিসেম্বরের আগে আর কোন জাহাজ লিভারপুলে যাবে না।

এ নিদারুণ সংবাদে সকলে একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়লেন। ফগ্ নির্বিকার ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর সকলকে হোটেলে রেখে তিনি চলে গেলেন আবার জাহাজঘাটায়।

সন্ধান নিয়ে জানলেন সমুদ্রে পাড়ি দেবার মত কোন ষ্টীমার ভাড়া পাওয়া যায় কি না। অনেক সন্ধান করে তিনি প্রায় তিন ঘণ্টা ঘুরে জানতে পারলেন, "হেনরিয়েটা" নামে একখানি ষ্টীমার আছে, সেখানা মাঝে মাঝে ভাড়া খাটে।

হেন্‌রিয়েটার খোঁজ নিয়ে তিনি তার ক্যাপ্তেনের কাছে গেলেন। ক্যাপ্তেনের নাম আন্‌দ্রু সেপার্ড। লোকটাকে খুব চালাক বলে বোধ হল ফগের।

"তুমি তোমার 'হেনরিয়েটা' ভাড়া দেবে?" প্রশ্ন করলেন ফগ্, "আমি লিভারপুলে যেতে চাই।"

"না মশাই, আমি এ সময় ভাড়া দেব না। আমি আজই এক ঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি বোর্ডো।"

"আজ বোর্ডো না গিয়ে তুমি কি আমাকে লিভারপুলে পৌঁছে দিতে পার না?"

"বেশ কথা বললেন, মশাই, সাগর পেরিয়ে অতদূরে যাবার সময় আমার নেই, আর ইচ্ছাও নেই।"

'আমি তোমাকে প্রতিদিন হাজার টাকা দেব।"

"না, ওতে আমি রাজি নই, আমি ভাড়াই দেব না।"

"আমি তোমাকে প্রতিদিন দু'হাজার টাকা দেব।',

"না, না, ওতেও আমি রাজি নই, আমার এক কথা, আমি ভাড়া দেব না।"

"আমি যদি তোমাকে প্রতিদিন পাঁচ হাজার টাকা দি।"

"না, না, ওটাতেও আমি রাজি নই, আর এখন আমার ভাড়া দেবার ইচ্ছাও নেই।"

"আচ্ছা প্রতিদিন সাত হাজার।"

"না, ওতেও আমি রাজি নই।"

"বেশ, তবে ষ্টীমারখানা আমাকে বিক্রয় কর। আমি কিনতে প্রস্তুত আছি।"

"তাসখেলা কাকে বলে সেটা আমি ভালই জানি।"
পৃঃ ৩৯১

ক্যাপ্টেন আন্‌দ্রু সেপার্ড এবার একটু বিস্মিতভাবে ফগের মুখের দিকে চাইল। মনে মনে ভাবল, "কে এ লোকটা? নিশ্চয়ই খুব ধনী হবে! আর তা ছাড়া এর গরজও দেখছি বেশি। দেখাই যাক্ না কতদূর দর ওঠে।"

সে এবার বলল, "বিক্রী করব না। তবে ক'জন যাত্রী যাবে জান্‌তে পারলে ভেবে দেখতে পারি।"

ফগ বললেন, "চার জন।"

এন্‌দ্রু সেপার্ড ঈষৎ হেসে বললে, "আমি রাজি হতে পারি যদি আপনি প্রত্যেক যাত্রীর জন্যে সাত হাজার করে টাকা দেন।"

অকম্পিত স্বরে ফগ্ বললেন, "বেশ, আমি তাই দেব। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই ষ্টীমার ছাড়তে হবে।"

"বেশ, আমি রাজী। আপনারা এক ঘণ্টার মধ্যেই এসে ষ্টীমারে উঠতে পারেন। তবে টাকাটা আমি আগেই চাই।"

ফগ্ তখনি হোটেলে ফিরে এসে সব কথা বললেন, ও সকলকে নিয়ে আবার জাহাজঘাটায় গেলেন। তিনি তাঁর ব্যাগ থেকে আটাশ হাজার টাকার নোট ক্যাপ্টেনের হাতে অগ্রিম দিলেন।

'হেন্‌রিয়েটা' দ্রুতগামী ষ্টীমার। খুব বড় না হলেও বেশ মজবুত। জাহাজের নল থেকে তখন রাশি রাশি ধোঁয়া আকাশে ছড়িয়ে পড়ছিল। জাহাজ ঠিক সময়ে জেটি ছাড়ল।

ফগ্ হিসাব করে দেখলেন, ১৬ই ডিসেম্বর তাঁরা যাত্রা করলেন। তাঁর বাজীর ৭৫ দিন কেটে গেছে, আর মাত্র ৫ দিন বাকী। এই পাঁচ দিনে কি তিনি লণ্ডনে পৌঁছে বাজী জিততে পারবেন? ফগের মন চিন্তাকুল হয়ে উঠল। তিনি ভেবে দেখলেন, "ঠিক সময়ে যদি লিভারপুলে পৌঁছতে পারি তা হলে লণ্ডনগামী ট্রেণ ধরে তিনি ২১শে ডিসেম্বর ঠিক পৌনে ন'টার সময় সংস্কৃতি ভবনের বন্ধুদের কাছে উপস্থিত হতে পারবেন। বাজীতে তাঁর জয় হবে।

ফগ্ এবার ষ্টীমারের ডেকের উপর এসে দাঁড়ালেন। আয়ুধা তাঁর নির্বিকার মুখের দিকে চেয়ে শুধু বললেন, "পথে কোন বিভ্রাট না ঘটলে আমরা বোধ হয় ঠিক সময়ে লণ্ডনে পৌঁছতে পারব।"

ফগ্ বললেন, "তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য যদি ষ্টীমার হেন্‌রিয়েটা ঠিকমত চলতে পারে।"

কেহ আর কোন কথা বললেন না। সম্মুখে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন।

অ্যাটলান্টিক মহাসাগর উত্তাল তরঙ্গমালা বুকে করে দূর দিগন্তে মিশে গেছে। নীল ঢেউয়ের মাথায় উচ্ছ্বসিত ফেনার রাশি সূর্যকিরণে রামধনুর রঙে ক্ষণে ক্ষণে শোভা পাচ্ছে। উড়ন্ত সমুদ্র-শকুনের দল আকাশে ঘুরপাক খেয়ে এক একবার ষ্টীমারের মাস্তুলে এসে বসছে। সমুদ্রের কি রকম এক সোঁদা সোঁদা গন্ধ। ষ্টীমার ঢেউয়ের বুকে নেচে নেচে

চলছে। 'হেন্‌রিয়েটা' বেশ গতিসম্পন্ন ষ্টীমার। ক্যাপ্তেন এন্‌ড্রু সুদক্ষ চালক। ফগ্‌ হিসাব করে দেখলেন ষ্টীমারের যে গতিবেগ, তাতে লিভারপুলে তাঁরা কয়েকঘণ্টা আগেই পৌঁছতে পারবেন।

ফগ্‌ ষ্টীমারের যতগুলি খালাসী ছিল সকলকে টাকা দিয়ে বশ করে ফেললেন, তাঁর ধারণা হল খালাসীরা যদি চেষ্টা করে তবে ষ্টীমারের গতি আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

হঠাৎ কয়েকজন খালাসীর কাছে তিনি শুনলেন, ষ্টীমার লিভারপুলের দিকে যাচ্ছে না। যাচ্ছে বোর্ডোর দিকে।

ফগ্‌ আশ্চর্য হয়ে ক্যাপ্তেনের কাছে গেলেন, প্রশ্ন করলেন, "ষ্টীমার নাকি বোর্ডোর দিকে যাচ্ছে?"

"তাতে হয়েছে কি? আগে বোর্ডো গিয়ে তার পর লিভারপুল যাবে। আপনার লিভারপুলে পৌঁছলেই হল ত!" একটু যেন চড়া গলায় ক্যাপ্তেন কথাগুলো বললে।

"কিন্তু আমি তোমার এ জাহাজ ভাড়া করেছি লিভারপুলে যাবার জন্যে, অন্য কোথাও যাবার জন্যে নয়।" শান্ত স্বরে বললেন ফগ।

"ভাড়া দিয়েছি বলে ত আমি আমার স্বাধীনতা হারাই নি। আমি এ ষ্টীমারের ক্যাপ্তেন। আমার ইচ্ছাতেই ষ্টীমার চলবে। আমি কারোর আদেশ মেনে চলতে রাজি নই।"

"কিন্তু আমি যে উদ্দেশ্যে তোমার ষ্টীমার ভাড়া নিয়েছি, আমার সে উদ্দেশ্য সফল না হলে আমার ত চলবে না।"

"আমি যদি আগে বোর্ডো যাই, তা হলে আপনি কি করতে পারেন?"

পরক্ষণেই ফগ্‌ একটি পিস্তল ক্যাপ্তেনের বুকের উপর তাগ করে বললেন, "তোমার বুকে একটা গুলি ছুঁড়তে পারি। নাও, এখন উপরে হাত তোল।"

ক্যাপ্তেন ভয় পেয়ে তার দু'হাত উপরের দিকে তুলে ধরলে। সেই সময়ে জন ক্যাপ্তেনের কেবিনে ঢুকে ব্যাপার দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।

ফগ্‌ বললেন, "জন, ক্যাপ্তেনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল।

জন প্রভুর আদেশ তখনি পালন করল।

এই সময়ে ক্যাপ্তেনের সহকারী এসে উপস্থিত হল। ফগ্‌ বললেন, "আমি এ জাহাজ লিভারপুলে যাবার জন্যে অনেক টাকায় ভাড়া নিয়েছি। ক্যাপ্তেন নিজের খেয়ালে বোর্ডোতে আগে যেতে চায়। আমি তা হতে দেব না।"

সহকারী ক্যাপ্তেন এতে খুসীই হল। তার সঙ্গে ক্যাপ্তেন এন্‌ড্রুর খুব রেষারেষি চলছিল। ফগ্‌ সেটা জানতে পেরেছিলেন। আর খালাসীরাও এন্‌ড্রুর উপর কেউ সন্তুষ্ট ছিল না।

ফগ্‌ সহকারী ক্যাপ্তেনকে বললেন, "আমি তোমাকেই এ জাহাজের ক্যাপ্তেন করে দিলাম। আমি লিভারপুলে পৌঁছে এ উদ্ধত ক্যাপ্তেনকে সায়েস্তা করব। এখন একে কেবিনে বন্দী করে রাখ।"

নূতন ক্যাপ্তেনের কথায় খালাসীরা এন্‌ড্রুকে নিচের একটা কেবিনে বন্দী করে রাখলে। ব্যাপার শুনে ফিক্‌স্‌ ভাবলেন—ভালই হল, অন্য কোথাও না গিয়ে আগেই লিভারপুলে ষ্টীমার নিয়ে যাওয়া দরকার। তা না হলে ব্যাঙ্কচোর ফগ্‌কে ইংলণ্ডের মাটিতে ধরব কেমন করে?"

ফগের ব্যবহারে জাহাজের খালাসীরা সকলেই খুব সন্তুষ্ট ছিল। তাই এ ব্যবস্থায় তাদের কেউ আর আপত্তি করল না। ষ্টীমার যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল।

হঠাৎ পরদিন সকালে ইঞ্জিনম্যান ও নূতন ক্যাপ্তেন এসে ফগকে জানাল, "ষ্টীমার আর যেতে পারবে না।"

"কারণ?" একটু বিস্মিত স্বরেই প্রশ্ন করেন ফগ।

"কয়লা ফুরিয়েছে।"

"সে কি! আগে যথেষ্ট পরিমাণে কয়লা নাও নি কেন?"

"বোর্ডো যাবার মত কয়লা নেওয়া হয়েছিল। তার পরে লিভারপুল যাবার কথা ওঠে। তাই তাড়াতাড়িতে সে পরিমাণ কয়লা নেওয়া হয় নি।"

"এখন উপায়?" একটু শান্ত স্বরেই প্রশ্ন করলেন ফগ্‌।

"উপায় ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।" নূতন ক্যাপ্তেন উদ্বিগ্ন ভাবেই উত্তর দিলে।

"কয়লা ত এ মাঝ-সমুদ্রে পাওয়াও যাবে না। লিভারপুল আর কতদূর বলতে পার?" ফগ্‌ প্রশ্ন করলেন।

নূতন ক্যাপ্তেন সমুদ্রের চার্ট দেখে হিসাব করে বলল, "এখান থেকে লিভারপুল ৭৭০ মাইল দূরে।"

ফগও মিনিট দুই কি হিসাব করে বললেন, "আজ ১৮ই ডিসেম্বর, আমার ২১শে ডিসেম্বর লণ্ডনে পৌঁছানো চাই, নইলে আমি তিন লক্ষ টাকার বাজি হারব।"

"এ ক্ষেত্রে আমি আর কি করতে পারি?" হতাশ স্বরে বললে নূতন ক্যাপ্টেন।

ফগ্ মুহূর্ত মাত্র কি ভাবলেন, তার পর নূতন ক্যাপ্টেন, জন ও ফিক্স্কে সঙ্গে নিয়ে আগের ক্যাপ্টেন এনড্রুর কাছে গেলেন।

এনড্রু ফগকে দেখে ক্রোধে গর্জন করে উঠল, তার পর বললে, "আবার কি চাও?"

ফগ্ শান্ত কণ্ঠে বললেন, "চাই আমি তোমার এ ষ্টীমারখানা কিনতে।"

"কখনই না। আমাকে বন্দী করে রাখার শাস্তি আমি তোমাকে দেবই।" আবার গর্জন করে উঠল এনড্রু।

"আমি তোমাকে এক লাখ টাকা দিচ্ছি, কেমন, রাজী ত?" ফগ্ শান্ত কণ্ঠে বললেন।

"এক লাখ টাকায় হবে না, দেড় লাখ দিতে পার?"

"বেশ, আমি দেড় লাখই দিচ্ছি।"

ক্যাপ্টেন এনড্রু বললে, "তা হলে এখনি টাকাটা দিতে হবে কিন্তু। 'পরে দোব' বললে চলবে না।"

"হাঁ, এখনি দিচ্ছি।"

"বেশ, আমি বিক্রী করতে রাজি। কিন্তু আমাকে মুক্তি দিতে হবে।"

"নিশ্চয় মুক্তি দোব, কিন্তু সেটা হবে লিভারপুলে পৌঁছবার পর।"

"ষ্টীমারখানা এই মাঝ-সমুদ্রে কেনবার তোমার এত আগ্রহ কেন?" একটু সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করল এনড্রু।

"কারণ, কয়লা ফুরিয়েছে। আমি ষ্টীমারের যত কিছু কাঠ আছে, অর্থাৎ কেবিনের কাঠের দেওয়াল, ডেক্, মাস্তুল, জানালা সব কিছু কাঠের জিনিষ আগুনে পোড়াতে চাই। আমাকে যে কোন উপায়েই হোক ২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার আগেই লণ্ডনে পৌঁছতে হবে। আগুন না জ্বললে বাষ্প হবে না, বাষ্প না হলে ষ্টীমার চলবে কি করে এ কথাটা ত তোমার অজ্ঞাত নয়।"

ক্যাপ্টেন এনড্রু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, "তা হলে দেখছি এই হেন্রিয়েটা ষ্টীমারের এটা শেষ জলযাত্রা।"

"না, আমি ষ্টীমারটা কিনলেও, আমি তোমাকে এর ইঞ্জিন ও খোল উপহার দোব। তুমি দুটো ফেরৎ পেয়ে জাহাজ ডক্ থেকে আবার ওর উপরে কাঠের সব কিছু গড়ে নিতে পারবে।"

"বেশ, তাই হবে, কিন্তু আমার মুক্তি?"

"আগেই বলেছি ত, সেটাও তুমি পাবে লিভারপুলে পৌঁছবার পর।"

এনড্রু এ কথার পর আর কোন আপত্তি করল না। একেবারে দেড় লাখ টাকা লাভ, তার সঙ্গে ইঞ্জিন, খোল ফেরৎ-এর চেয়ে লাভজনক আর কি হতে পারে?

ফগের আদেশে অনেক টাকা বক্শিস্ পেয়ে খালাসীরা ষ্টীমারের কাঠ-জিনিষ কেটে কেটে ষ্টীমারের ইঞ্জিনের আগুনে ফেলতে লাগল। ষ্টীমার আবার যথেষ্ট বাষ্প পেয়ে তীব্র গতিতে অ্যাট্লান্টিকের উপর দিয়ে লিভারপুলের দিকে ছুটল।

দেখতে দেখতে ষ্টীমারের সব কিছু কাঠের জিনিষ ইঞ্জিনের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

লিভারপুল আর একশ মাইল। কিন্তু আর কাঠ কই? সবই ত আগুনে দেওয়া হয়ে গেছে।

ফগ্ সকলকে নিয়ে জাহাজের খোলে নেমে গেছেন। শুধু নূতন ক্যাপ্টেন লোহার কলের সামনে দাঁড়িয়ে ষ্টীমার চালাচ্ছে।

আর ত কাঠ নেই, এই শেষ একশ মাইল ষ্টীমার যাবে কি করে?

নূতন ক্যাপ্টেন বললে, "লিভারপুলের আগে আমরা যদি উপকূলের কুইন্সটাউনে যেতে পারি তা হলে আমাদের প্রায় ৮০ মাইল পথ বেঁচে যায়।"

ফগ্ হিসাব করে দেখে বললেন, "অগত্যা এ ছাড়া আর উপায়ই বা কোথায়? কুইন্সটাউন থেকে ট্রেণে লিভারপুল যাওয়া সহজেই চলতে পারে।"

কিন্তু কুইন্সটাউনে যাবার ২০ মাইল পথই বা ষ্টীমার যাবে কি করে? বাষ্প চাই ত!

এবার ফগ্ আদেশ দিলেন, "লাইফ বোটগুলো কেটে টুকরো করে আগুন জ্বালো।"

মাত্র চারখানা লাইফ বোট ছিল 'হেন্‌রিয়েটা' ষ্টীমারে। ফগের আদেশে সেই লাইফ বোটগুলো সঙ্গে সঙ্গে কেটে টুকরো করে আগুনে দেওয়া হ'ল।

সকলে ম্লান মুখে ঘোরাফেরা করছে, মনের মধ্যে যেন একটা কি-হয় কি-হয় ভাব। আবার নূতন বাষ্প পেয়ে ষ্টীমার ছুটল অ্যাট্‌লান্টিকের সেই বিশাল ঢেউ মথিত করে।

'হেন্‌রিয়েটা'র কাঠের সব জিনিষই গেছে। ষ্টীমারকে দেখলে মনে হয় শুধু একটা জাহাজের খোল ভেসে চলেছে, না আছে তার কেবিন, না আছে মাস্তুল, না আছে ডেকের পাটাতন, না আছে কোন লাইফ বোট। শুধু চিমনি থেকে বেরুচ্ছে অনর্গল কালো ধোঁয়া, যা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে উঠতে সমুদ্র-বাতাসে ছোট মেঘের মত পিছনের দিকে ভেসে চলেছে।

কুইন্সটাউনের আলোর সারি এবার দেখা গেল। আর দু'মাইল মাত্র। সকলে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। শেষ কাঠের অর্ঘ্য আগুনে দিয়ে সর্বহারা 'হেন্‌রিয়েটা' ষ্টীমার জোয়ার আসবার পরেই জেটিতে এসে লাগল ঠিক রাত্রি একটায়। ফিক্‌স্ সকলের আগেই নেমে জেটি অফিসে গেলেন।

ক্যাপ্টেন এন্‌ড্রুকে মুক্ত করে তার হাতে আরও কিছু টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিয়ে সকলের সঙ্গে করমর্দন করে যেই মাত্র ফগ্ জেটির বাইরে যাবার জন্যে উদ্যত হয়েছেন, ঠিক সেই সময়ে ফিক্‌স্ দুজন পুলিশ কর্মচারীর সঙ্গে সেখানে এসে বললেন, "মিঃ ফগ্, আমি আপনাকে পুলিশ-পরোয়ানা বলে ব্রিটেনের মাটিতে আপনাকে ব্যাঙ্ক-চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করলাম।"

সকলে স্তম্ভিত। জন ত তখনি ফিক্‌স্‌কে ঘুষি মারবার জন্যে প্রস্তুত, আয়ুধা ত কেঁদেই ফেললেন। ফগ্ শুধু বললেন, "এখনও আমার হাতে ১৮ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সময় আছে।"

ঘোড়ায় টানা পুলিশ-ভ্যান্ ফগ্‌কে নিয়ে চলল হাজতে। আয়ুধা ও জন তাঁহার সঙ্গে গেলেন।

রাত্রি একটা। নির্জন রাজপথের উপর দিয়ে ছুটে চলল পুলিশ-ভ্যান্। ঘোড়ার পায়ের শব্দে রাজপথ মুখরিত হয়ে উঠল। ফগ্ ভাবতে লাগলেন, কোথায় তিনি জয়মাল্য পরে সকলের কাছে সম্মানিত হবেন, তা না হয়ে তাঁর ভাগ্যে এ কি বিড়ম্বনা ঘটল! তিনি এত কষ্ট সয়ে, এত অর্থ ব্যয় করেও একটা লোকের ভুলের জন্যে হাজতবাস করতে চললেন, এ দুঃখ তিনি যেন আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তবুও তিনি নির্বিকার ভাবে ভ্যানে বসে রইলেন, শুধু মাঝে মাঝে আয়ুধাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

জন ভাবতে লাগল, উঃ, ফিক্‌স্ লোকটা কি ভয়ানক! সে যে পুলিশের গুপ্তচর তা আগে জানলে ওকে নিশ্চয়ই জন খুন করে ফেলত। এত মাখামাখি বন্ধুত্বের পরেও কি এমন কাণ্ড করতে হয়! জন ত জানে, তার প্রভু ফগ্ সাধুপ্রকৃতির লোক। তিনি কি কখনও ব্যাঙ্কচোর হতে পারেন? যদি সম্ভব হত, সেই মুহূর্তেই জন ফিক্‌সকে আক্রমণ করে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিত।

প্রতিটি মুহূর্ত চলে যাচ্ছে, আর ফগ্ জয়লাভের সম্ভাবনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। এবার পুলিশ ভ্যান্ এসে থানার সামনে দাঁড়াল। ফগকে রাখা হল হাজত ঘরে। জন ও আয়ুধা বসে রইলেন ম্লানমুখে অফিসঘরের চেয়ারে।

ফগ্ হিসাব করতে লাগলেন, "৪৫ মিনিট কেটে গেছে, এখনও হাতে আছে ১৮ ঘণ্টা সময়।"

সময় কাটতে লাগল মন্থরগতিতে। ফগ্ ঘড়ি ধরে শুধু হিসাব করে চললেন। এবার বাকী আর ১৭ ঘণ্টা সময়। এখনও তিনি লণ্ডনে গিয়ে অনায়াসে বাজী জিততে পারেন।

রাত্রি প্রভাত হ'ল। সারা রাত্র কারোর চোখে ঘুম ছিল না। ফগ্ পুলিশের কাছে জামিনের প্রার্থনা করেও বিফল হলেন। লণ্ডন ব্যাঙ্কের দুর্ধর্ষ চোরকে জামিন দেওয়ার অর্থ ই হ'ল তাকে পালাবার সুযোগ দেওয়া, এইটাই থানার পুলিশ-অফিসারের ধারণা।

জন সকাল থেকেই ব্যস্ত হয়ে অনেক উপায়ই বার করবার চেষ্টা করল, কিন্তু এ রকম গুরুতর অভিযোগে কেউ সাড়া দিলে না।

সংস্কৃতি সমিতির ভবনের সভ্যগণের কাছে যেতে তিনি জনকে বারণ করলেন।

আয়ুধা সারাটা দিন কিছুই খেলেন না। তাঁর শুধু চোখের জলে বুক ভাসতে লাগল। নিরুপায় জন এ অবস্থায় যেন বিহ্বল বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আর কোন আশা নেই। ফগ শুধু গম্ভীর মুখে নীরবে বসে রইলেন। জনের মনে শুধু এই অনুতাপ জাগতে লাগল যে কেন সে আগে তাঁর প্রভুকে সাবধান করে দেন নি ফিক্‌স্-এর সম্বন্ধে।

আর যখন বাজী জিতবার কোন আশাই নেই, তখন সে চিন্তা মন থেকে দূর করবার চেষ্টা করতে লাগলেন ফগ্।

রাত্রি আটটার সময় হঠাৎ হাজত-ঘরের দ্বার উন্মুক্ত হ'ল। থানার পুলিশ-অফিসার, ফিক্স্ ও আরও দু'জন পুলিশের লোক এসে অত্যন্ত অনুতপ্ত স্বরে ফগকে জানালেন যে ভুল করে তাঁকে ধরা হয়েছে—তিনি মুক্ত। আসল ব্যাঙ্ক-চোর এক ঘণ্টা আগে লণ্ডনে ধরা পড়েছে। সে স্বীকার করেছে, সে-ই ব্যাঙ্কের সাড়ে আট লক্ষ টাকা নিয়েছিল।

ফগ কিছুক্ষণ প্রস্তর মূর্তির মত বসে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বললেন, "আপনারা জানেন না, আপনারা আমার কি ক্ষতি করেছেন। আমার তিন লক্ষ টাকা ত গেছেই, তা ছাড়া ক্লাবে আমার সুনাম কলঙ্কিত হয়েছে।" এবার তিনি থানার বাইরে এলেন। ফিক্স্ অনুনয়ের স্বরে ফগের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে চাইলেন, ফগ তাঁকে শুধু একবার কাছে আসতে বললেন। তারপর ফিক্স্ কিছু বলবার আগেই তাঁর গণ্ডে এক প্রচণ্ড ঘুষি মারলেন। সে ঘুষিতে ফিক্স্ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন কিন্তু ফিক্স ক্রোধ প্রকাশ না করে পুনরায় এই নিদারুণ ভুলের জন্যে ফগের মার্জনা ভিক্ষা করলেন। ফগ তখন তাঁর করমর্দন করে তিক্ততার আর পুনঃ প্রকাশ হতে দিলেন না।

সব আশা শেষ। ফগের তখন আর সংস্কৃতি সমিতিতে যাবার ইচ্ছা নেই। আর গিয়েই বা কি হবে। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে আবার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে লাভ কি? সেখানে ত উপহাস ছাড়া আর কিছুই তিনি পাবেন না।

তিনি লিভারপুলের ট্রেণ ধরে লণ্ডনে ফিরে এসে সর্বপ্রথমে তাঁর বাড়ীতে গেলেন। সেখানে আয়ুধার জন্যে অপর একখানি কক্ষ নির্দিষ্ট হ'ল। আয়ুধার মর্মযাতনাই সবচেয়ে বেশী। কেন ফগ ভারতবর্ষে তাঁকে চিতানল থেকে রক্ষা করতে গেলেন, তাই ত তাঁর বিলম্ব ঘটল।

ফগ মৃদু হেসে বললেন, "পৃথিবী ভ্রমণে আমার ত বিলম্ব ঘটে নি রাণী আয়ুধা। আমি ত ঠিক সময়েই ইংলণ্ডে ফিরেছিলাম, কিন্তু ভাগ্য আমার প্রতিকূল, তাই এ বিপত্তি ঘটল।"

আয়ুধা বললেন, "আমার মত দুর্ভাগিনীকে আশ্রয় দিয়েই আপনার এই ভাগ্যফল। আবার কখন কি ঘটে, তাই আমি ভাবছি আপনাকে আর আমি বিব্রত করব না। আমি এখানে কোন একটা লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানে কাজ করে হয়ত নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিতে পারব।"

ফগ আবেগভরা কণ্ঠে বললেন, "সে ত হতে পারে না রাণী আয়ুধা। আমি আপনাকে আমার গৃহপরিজনের মতই মনে করি। বিশেষতঃ সন্ধান পেলে এখনও আপনার শত্রুরা যে বুন্দেলখণ্ড থেকে ইংলণ্ডে এসে আপনাকে হত্যার চেষ্টা করবে না, সে কথা কে বলতে পারে। এরূপ অবস্থায় আমার মনে হয়, আপনার এখানে থাকাই উচিত।"

আয়ুধা বললেন, "আপনার কথা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এরূপ ভাবে আপনার আশ্রয়ে থাকাটা কি নিন্দনীয় বলে গণ্য হতে পারে না?"

ফগ মৃদু হেসে বললেন, "কিন্তু নিন্দনীয় না হতে পারে এমন কিছু একটা কি আপনি ভেবে দেখেছেন?"

লজ্জিত ভাবে আয়ুধা বললেন, "আপনিও কি কিছু ভেবে দেখেন নি? অবশ্য আমি জানি, এ সব ভাববার আপনার অবসরই ছিল না।"

"আমি ভেবে দেখেছি কিন্তু আপনাকে সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারি নি রাণী আয়ুধা।"

মৃদু হাসি হেসে আয়ুধা বললেন, "কেন বলুন ত?"

"কারণ, আমি এখন নিঃস্ব, বাজীতে প্রায় তিন লক্ষ টাকা হেরেছি, তা ছাড়া পৃথিবী ভ্রমণে আমার আরও প্রায় তিন লক্ষ টাকা গেছে। একজন সর্বহারার পক্ষে একটা অশোভন উক্তি কি শোভা পায় রাণী আয়ুধা?"

"কিন্তু মনের দিক দিয়ে আপনি ত নিঃস্ব নন। আপনার মত এত উদার, নির্ভীক, পরোপকারী, বিবেচক ও চরিত্রবান লোক পৃথিবীতে আর একজনও আছেন কি না জানি না।"

"আমি যে-সব বিশেষণের অনুপযুক্ত, সেগুলি আমার উপর প্রয়োগ করে আমাকে লজ্জা দিয়ে আর লাভ কি? এখন আপনি কি চান আমাকে বলুন।"

লজ্জায় আরক্ত হয়ে আয়ুধা ধীরে ধীরে বললেন, "আমি আপনার আশ্রয় থেকে কোথাও যেতে চাই না। না, আমি স্বর্গেও যেতে চাই না।" মুখ নত করে যেন হাঁপাতে লাগলেন তিনি।

এবার ফগ এগিয়ে এলেন আয়ুধার কাছে। নীরবে তাঁর সুকোমল শুভ্র হাতখানি আবেগভরে তুলে নিলেন আপন হাতে। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, "তবে তাই হোক। তুমি এখন আমার—হাঁ—আমারই।"

"আপনিও কি কিছু ভেবে দেখেন নি ?

আয়ুধাও ধীরে ধীরে বললেন, "আমিও এখন তোমার—হাঁ—তোমারই। তুমি ছাড়া এখন থেকে আমার আর কেউ আপনার নয়।"

ঠিক সেই সময়ে জন কি কাজে ঘরে প্রবেশ করছিল, হঠাৎ প্রভুকে সেই অবস্থায় দেখে ও আয়ুধার শেষ কথা কয়টি শুনে উল্লসিত হয়ে উঠল। প্রভু যে বাজী জয় করতে পারেন নি, তার জন্যে তার মনে যত কষ্ট হয়েছিল তার চেয়ে এখন প্রভু যে আবার বিবাহ করে সুখী হবেন, এটাই জনের পরম আনন্দের কারণ হয়ে উঠল।

জনকে দেখে ফগ বললেন, "তুমি এখনই মেরিলিবোন্ গির্জার পাদ্রীকে এই শুভ সংবাদটা দিয়ে এস। কাল আমাদের বিয়ে হবে, তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন। আমি পরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।" এখন রাত্রি আটটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়েছে। এ সময় নিশ্চয়ই তিনি এখনও নৈশ আহারে বসেন নি।

জন প্রভুর এই আদেশ পেয়ে তাড়াতাড়ি চলল মেরিলিবোন গির্জার দিকে।

গির্জার প্রৌঢ় পাদ্রী তখন সংবাদটা শুনে খুবই খুশী হলেন। তিনি ফগকে বিলক্ষণ চিনতেন। তাঁর বিয়ে হবে শুনে তিনিও খুব আনন্দিত হলেন। তবে তিনি বললেন, কাল রবিবার, "কাল ত বিয়েটা হতে পারে না!"

"সে কি ? আজই যে রবিবার।"

"না, আজ শনিবার, ২১শে ডিসেম্বর।"

"সে কেমন করে হবে ? আমার প্রভুর ত এ রকম ভুল হয় না।"

পাদ্রী তখন ক্যালেণ্ডার নিয়ে জনের সামনে ধরলেন। জন স্পষ্ট দেখল সেদিন শনিবার—২১শে ডিসেম্বর। গির্জার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল যে তখন মাত্র পনের মিনিট সময় বাকি আছে ৮-৪৫ হতে।

জন এবার সত্যই রাজপথে ছুটতে লাগল। সে যেন কোন দৌড়-প্রতিযোগিতায় দৌড় দিচ্ছে এমনই তার দৌড়ের বেগ। ছুটতে ছুটতে যখন ফগের বাড়ীতে এসে সে পৌছল তখন ফগ ও আয়ুধা তার মুখের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন

"প্রভু, প্রভু, চলুন—চলুন, এখনি চলুন—আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব নয়!"

"কি হয়েছে জন? কোথায় যাব?"

"সংস্কৃতি ভবনের ক্লাবে।" বলে হাঁপাতে লাগল জন।

"কেন?" বেশ উদ্বিগ্ন স্বরেই প্রশ্ন করলেন ফগ।

"আজ শনিবার।"

"অসম্ভব, আজ রবিবার।"

"না, প্রভু না, আজ শনিবার! গির্জার পাদ্রী বলেছেন, কাল রবিবার, তাই রবিবারে বিয়ে হতেই পারে না।"

সেই ঘরের দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার ঝুলছিল। ফগ সেটার পানে চেয়ে বললেন, "সত্যিই ত!"

আয়ুধাও ব্যাপারটা শুনে খুবই উৎসাহিত হয়ে পড়েছিলেন। তখনি ফগ জনের সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পথে একটা ভাড়ার ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছিল, ফগ তাকে ডেকে বললেন, "যত জোরে পার চল সংস্কৃতি ভবনের ক্লাব—হাজার টাকা বকশিস পাবে যদি ৮-৪০ মিনিটে আমাকে তুমি সেখানে পৌছে দিতে পার।"

ঘোড়ার গাড়ি ফগ ও জনকে নিয়ে উল্কাবেগে ছুটল।

এদিকে ক্লাবে তখন সকল সভ্যই এসে জুটেছেন। আজই ফগের ফেরবার শেষ দিন—ঠিক ৮-৪৫ মিনিটের মধ্যে তিনি যদি এসে পৌছতে না পারেন তবে তাঁর বাজী হার হবে।

খবরটা প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গে বহুলোক ক্লাব-ঘরের বাইরে এসে সমবেত হয়েছেন। বড় বড় খবরের কাগজের রিপোর্টারেরাও এসেছেন। চারিদিকে যেন একটা পরম উৎকণ্ঠার ভাব।

ক্লাব ঘরের বড় টেবিলটার চারপাশে বহু ধনকুবের সভ্যের সঙ্গে বসেছিলেন আনড্রু ষ্টুয়ার্ট, জন সালভান্, স্যামুয়েল ফলেন্টিন, টমাস ফ্ল্যানাগেন ও গথিয়ার রালফ্। তাঁরাই এ বাজীর কর্তা।

তাদের সামনে টেবিলের উপর একটা জাহাজের তালিকা পড়েছিল। গথিয়ার রালফ্ সেই তালিকা দেখিয়ে বললেন, "প্রাচ্য দেশ থেকে যে সব জাহাজ আমেরিকা হয়ে ইংলণ্ডে আসে তার মধ্যে সকল জাহাজই সকাল ও দুপুরের দিকে জেটিতে পৌছে গেছে। তাদের আরোহীদের তালিকাও এই কাগলগুলিতে ছাপা রয়েছে। সে সব নামের মধ্যে মিঃ ফগের নাম নেই।"

"তা হ'লে আমাদের বুঝতে হবে, মিঃ ফগ কোন জাহাজেই লণ্ডনে ঠিক সময়ে এসে পৌছতে পারেন নি। অতএব এ বাজী আমরাই জিতেছি।" কথাটা বললেন আনড্রু ষ্টুয়ার্ট।

জন সালভান্ বললেন, "যখনই মিঃ ফগ ৮০ দিনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরে আসবেন বলে বাজী ধরেছিলেন, তখনি বোঝা গিয়েছিল তাঁর মস্তিষ্ক ঠিক নেই। এখন ৮-৪০, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কি তিনি সত্যই এসে পৌছতে পারবেন? এখন পর্যন্ত ত তাঁর কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না।"

স্যামুয়েল ফলেন্টিন বললেন, "বেশ ত, আর কয়েক মিনিটি মাত্র। তারপর আমরাই ত তিন লক্ষ টাকার বাজী জিতব।"

টমাস ফ্ল্যানাগেন বললেন, "এখন মাত্র দু' মিনিট বাকি। এ বাজী আমরাই জিতেছি।"

সকলেই ঘড়ি খুলে টেবিলের উপর রাখলেন। গণনা চলতে লাগল—আর এক মিনিট মাত্র। সেকেণ্ড গণনা চলল এবার। এক—দুই—তিন—চার—

হঠাৎ বাইরে একটা প্রচণ্ড কলরবের সাড়া শুনতে পেলেন সকলে। ব্যাপার কি? তবুও সেকেণ্ড গণনা সমানেই চলতে লাগল। বাজী জিততে ফগ আর বুঝি পারলেন না!

রালফ বললেন, "এ যে একেবারেই অসম্ভব! মাত্র দশ সেকেণ্ড বাকি।"

হঠাৎ সেই মুহূর্তে ঘরের দরজা খুলে গেল। হাস্যমুখে সকলকে অভিবাদন করে ফগ বললেন, "অসম্ভবও সম্ভব হয়, বন্ধুগণ।"

সকলে জয়োল্লাস করে ফগকে প্রত্যভিবাদন করলেন। ফগেরই বাজী জিৎ হ'ল। একটু আগে যিনি নিজেকে সর্বহারা নিঃস্ব বলে মনে করছিলেন, আজ তিনি আবার সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ধনী।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই—ফগ লণ্ডন থেকে পূর্ব মুখে যাত্রা করেছিলেন। পৃথিবীর আবর্তনের নিয়মে এই ভাবে অগ্রসর হ'লে ৮০ দিনে চব্বিশ ঘণ্টা সময় অর্থাৎ একটা গোটা দিন বেশী পাওয়া যায়। কারণ, পৃথিবীও ঘুরছে, আর

যাত্রাও চলছে। তাতে একটা দিন ত বেড়ে যাবেই আবর্তনের পথ এই ভাবে হওয়াতে। সুতরাং ৮০ দিনে চব্বিশ ঘণ্টা এগিয়ে থাকবে বৈ কি! আবার ফগ যদি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতেন তা হলে হিসাবে একটা দিন কম হ'ত। কারণ পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হলে ঐ রকমই কম হবে বিজ্ঞানের নিয়মে।

সুতরাং এ ভুলটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ফগ প্রতিদিন ডায়েরী রেখেও এ ভুলের হাত থেকে পরিত্রাণ পান নি। তিনি এ ভাবে পূর্বদিক ঘুরে পশ্চিমে আসাতে ৭০ দিনে ৮০ বারই সূর্য্যের উদয় ও অস্ত দেখেছিলেন, কিন্তু লণ্ডনে বসে থাকলে তিনি দেখতেন ৭৯ বার। সুতরাং লণ্ডনে ফিরে এসে তিনি পেয়েছিলেন গোটা একটা দিন হাতে।

তাই অসম্ভবও সম্ভব হ'ল ফগের অদৃষ্টে।

—০—

প্রাচীন পোলিশ নৃত্য

ভৃত্যের নৃত্য

নাগা খোঁপা

"শিব-কামিনী"

প্রাচীন ভারতে কেশবিন্যাসের সৌন্দর্য্য

ইলা পালচৌধুরী

ভারতবর্ষে যেমন স্থাপত্যে, শিল্পে, ভাস্কর্য্যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যসম্ভার আছে—এমন বোধ হয় আর কোথাও নেই।

পাথরের উপর মন্দিরের নানা মূর্ত্তি, নায়িকা, অপ্সরা, বিদ্যাধরীদের অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্যে ও বেশভূষায় এবং কেশচর্চ্চায় অপরূপ শোভা।

অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করে দেখি না তাই চোখে পড়ে না, সেইজন্য সেই সব আশ্চর্য্য-সুন্দর কেশবিন্যাস আজ আমরা ভুলতে বসেছি।

এখন চারিদিকে দেখা যায় উৎকট বিদেশী অনুকরণ, যার সঙ্গে আমাদের দেশের মেয়েদের চেহারার ও কাপড়-চোপড়-এর কোথাও সামঞ্জস্য নেই।

ইতিহাসের পটভূমিকায় দেখলে দেখা যাবে কেশ-বিন্যাস একটি কলাবিদ্যার পর্য্যায়ে সমাদৃত। মহাভারতের অর্জ্জুন অজ্ঞাতবাসের সময় গাণ্ডীব ছেড়ে "সৈরিন্ধ্রী" সেজে-ছিলেন এবং কেশবিন্যাসে পটু ছিলেন! তার থেকেই বোঝা যায় যে, সেদিনের "সৈরিন্ধ্রী"রা সাজসজ্জা কেশ-রচনা ইত্যাদি সম্বন্ধে ভালভাবেই ওয়াকিবহাল ছিলেন।

রঘুবংশতে বলা হয়েছে—

"স্নানার্দ্র মুক্তেন্দ্বণুধূপবাসং
বিন্যস্ত সায়ন্ত নঃ মল্লিকেষু।
কামো বসন্তা অয়মন্দবীর্য্যঃ কেশেষু
লেভে বলাঙ্গনানাম্॥"

সেই সুদূর খ্রীঃ পূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীতে অজন্তার ১ নং গুহাতে যে কেশবিন্যাস আছে তা দেখলে আশ্চর্য্য হতে হবে।

প্রতি কবরী রচনার সঙ্গে তার আনুসঙ্গিক গহনা ছিল, সে সব হয়ত আজকাল পাওয়া যাবে না, তবুও কিছু পুরানো ধাঁচের পরিকল্পনাগুলি যদি উদ্ধার করা যায় কত অপূর্ব্ব শোভা ও শিল্পীর অনুভূতি পাওয়া যাবে। নামগুলিই বা কত সুন্দর—"লক্ষতারা" হার! গহনা তখন শুধুমাত্র সোনার বা পাথরের দামে তার যাচাই

প্রজাপতি খোঁপা

হয় না—সেটি শিল্পীমনের সঙ্গে মিশে শীতের আকাশের লক্ষতারার সঙ্গে বিচরণ করে, তবেই একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা সৃষ্টি হয়।

অজন্তার গুহাগুলিতে বহু সুন্দর কেশ-রচনা আছে। ১৭ নং গুহাতে, এও খ্রীঃ পূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীতে দেখা যায়, অপ্সরারা যেমন কেশ রচনা করতেন। পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সর্ব্ব সুখের আধার, এমনই মাধুর্য্য, আয়ত নয়ন হাসিতে উজ্জ্বল।

বিরূপাক্ষ মন্দিরে খ্রীঃ পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দীতে পাট্টাদা-কালে দেখুন শিব-কামিনীকে—সত্যিই শিব-কামিনীর উপযুক্ত, সমস্ত অঙ্গ-সৌষ্ঠবের সঙ্গে শিব-কামিনীর আদি সৌন্দর্য্যসম্ভার যেন মেঘেতে মিশেছে—সেই চূড়াকৃত কেশ মনে হয়, যদি শিব-কামিনী খুলে দেন, তা নিবিড় নিশিথিনীর মত শিবের চরণে লুটিয়ে পড়বে। শিবের বামহস্ত সেই চূড়া-করা কেশের উপর হাল্কাভাবে রক্ষিত মূর্ত্তি, প্রাণবন্ত, দু'জনেরই মুখে আনন্দের আভাস।

সুরসুন্দরীরা নানা ভাবে কেশ-চর্চ্চা করতেন নিশ্চয়ই। খাজুরাহ, মধ্যপ্রদেশে বিশ্বনাথের মন্দিরে তাঁদের দেখা যায়। একেবারে মন্দিরের মণিকোঠার দেয়ালে ইনি রয়েছেন—খ্রীঃ পূর্ব্ব ১১ শতাব্দীর ভাস্কর্য্য। দেবসভায় সুরসুন্দরীদের আনাগোনা, কাজেই নয়ন-ভোলান রূপ তাঁদের ছিল।

মাদুরাই-এর মিনাক্ষী মন্দিরে, কোনারকের সূর্য্য মন্দিরে, কত অভিনব কেশ-চর্চ্চা! বাঙ্গলা দেশের খ্রীঃ পূর্ব্ব ১৫ শতাব্দীর একটি কেশবিন্যাস আছে, অতি অপরূপ। নরম স্বাভাবিক ঢেউখেলান চুলে "হংসেশ্বরী" খোঁপা।

"কন্যাকুমারী" খোঁপার সঙ্গে চাই তেমনি বাহারে শাড়ী—সব মিলিয়ে দেখলে মনে হবে, বীণা ও মৃদঙ্গ সহকারে মন্দিরে পূজা-নৃত্যের দৃশ্য। ধূপের ঘন গন্ধ—মৃদঙ্গর গম্ভীর তাল মন্দির-প্রাঙ্গণে শতদীপের দীপালী।

বাঙ্গলার নিজস্ব পান খোঁপা, প্রজাপতি খোঁপা, অনেকেরই স্মরণ আছে। "পান" খোঁপাটি বেশ, আধা-বয়সী গৃহিণীরাও বাঁধতেন—"নক্ষত্রমণি" হার পরে, সোনার চিরুনি, কালোচুলে খুবই মানাত।

"প্রজাপতি" খোঁপা বিয়ের কনের একচেটে। ছোট্ট কনে, তখনও লজ্জা করতে শেখে নি।

পুরানো ছড়া আছে, মনে পড়ে যাবে।

"অজন্তা"

"ভালই আছে সোনার কন্যা
ভালই বাঁধে চুল
হেসে দুলে নাচে চলো
যেন নাগকেশরের ফুল"।

কাঠের চিরুণি দিয়ে বনের ফুল দিয়ে নাগা মেয়েদেরই বা কি সুন্দর চুলের বাহার! বনানীর সজীবতা তাদের মুখে-চোখে চিতার নখের গহনা—রঙ্গিন পাখির পালকের সাজে অদ্ভুত সৌন্দর্য্য।

"দীপলক্ষ্মী" খোঁপা খ্রীঃ পূর্ব্ব ১৬-১৭শতাব্দীর অবদান, গুজরাটের একটি পিতলের মূর্ত্তিতে পাওয়া যায়।

দীপ হাতে নিয়ে রাধা যেন বেরিয়েছেন—শ্রীকৃষ্ণের খোঁজে, বেশি গহনা নেই, ফুলের মালা, মাথায় সর্পিল বেণীর শোভা, মূর্ত্তিটি গতির ছন্দে জীবন্ত।

আকাশে ঘন মেঘ "অভিসারিকা" বেরিয়েছেন—যাকে সমস্ত মন-প্রাণ খুঁজছে তার সঙ্গে যখন মিলন সম্ভাবনা, তখন কেশের বিন্যাসেও সেই মধুর রেশ।

"অভিসারিকা"

পান খোঁপা

জীবনে হয়ত অনেক খুঁজতে হবে—কিন্তু খোঁজা সার্থক হবে, কারণ বাঁশী যে ডাকছে সেই বাঁশী শুনে চললেই পথ মিলবে—

"আমার প্রেম তোমার লাগি
পদ্ম সম ফোটে
পূর্ণ চাঁদে আমার প্রেমের
প্রেম জ্যোছনা ছোটে
বংশী আমার ডাকে তোমায়
সব ছাড়িও বধূ
আমিই তোমার প্রাণের ঠাকুর
আমিই তোমার বঁধু—"

যে কেশের সঙ্গে এত ভাব, এত সৌন্দর্য্য ভারতবর্ষের শিল্প ও কৃষ্টিজড়িত, সে কেশবিন্যাস কি আমরা ভুলে যাব?

—০—

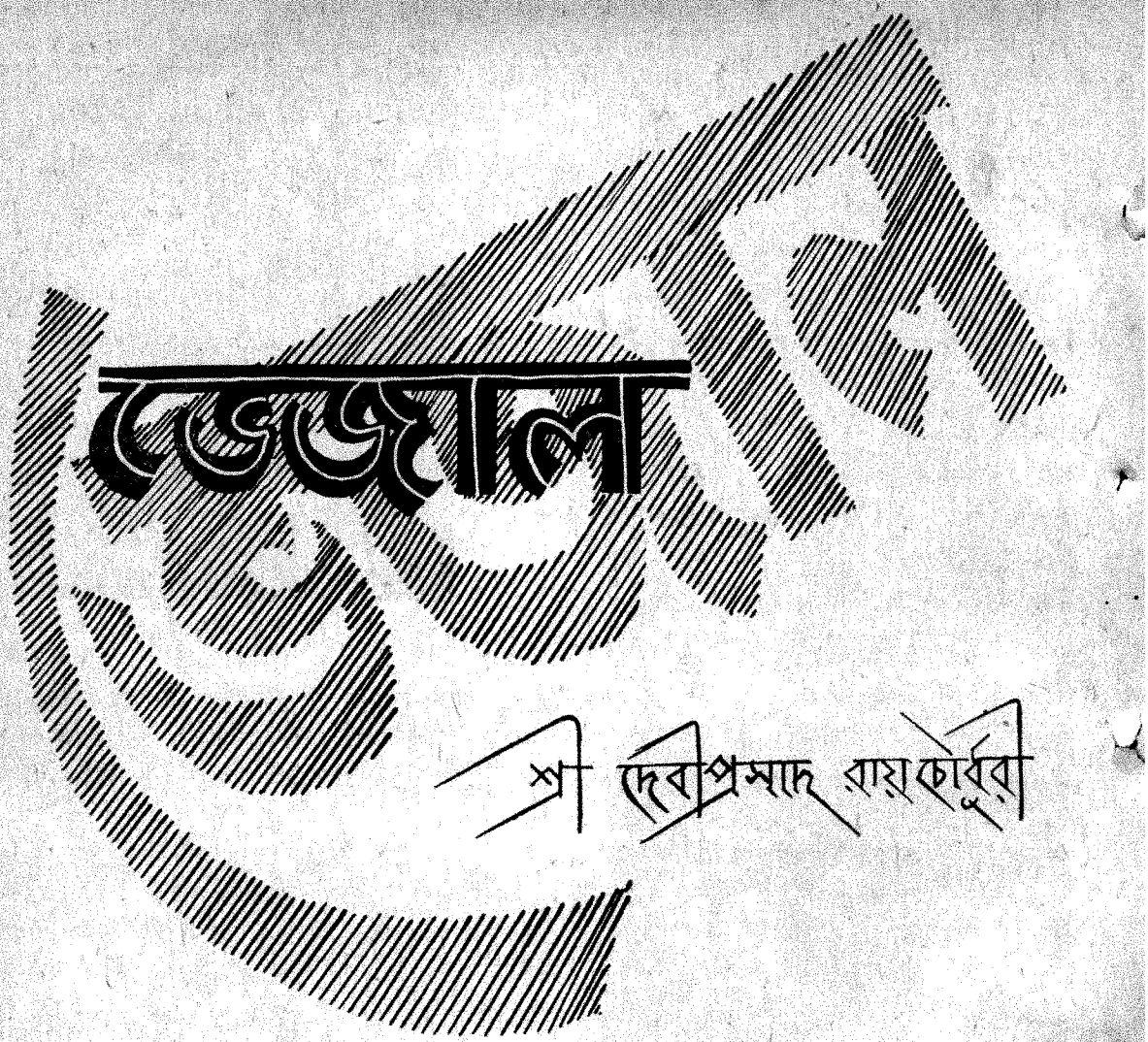

অনেকদিন পরে মানিকদার সঙ্গে দেখা। ভিড়ের মাঝে প্রথমটা চিনতে পারি নি, পারার কথাও নয়, দূর থেকে দেখেছিলাম, তার ওপর অদ্ভুত দাড়ি গজিয়ে এমন ভাবেই ভোল পালটিয়েছিলেন যে আদালতে হলফ খেয়ে সনাক্ত করায় দ্বিধা আসে। সে কি যে সে দাড়ি! না আছে কোন ধর্মের ঝাঁঝ, না পাওয়া যায় বয়সের পাত্তা। সে দাড়ি ধর্মপ্রাণ মোল্লার নয়, উদার হৃদয় পাদ্রীর নয়, এমন কি নিষ্কাম সাধু সন্ন্যাসীর ধারেও ঘেঁষে না। তথাপি লোমশ মুখটি বৈশিষ্ট্যের গর্বে গরীয়ান। প্রশ্ন ওঠে বৈশিষ্ট্যটা কি? বৈশিষ্ট্যের জটিলতার পাশ কাটিয়ে আন্দাজের শরণাপন্ন হতে পারলে বলা চলে নব্য-পন্থী শিল্পীদের ট্রেড মার্ক। অর্থাৎ আঁটসাট ছাঁটে কাটা দাড়ির মালিককে ধরে নিতে হয় ইনটেলেকচ্যুয়াল গুণ্ডাদের দলভুক্ত অথবা দাগী শিল্পী যার পেশা হল জুতসইভাবে বেচারা ধরনের মানুষ পেলেই প্রগতিশীল চিন্তাধারায় দীক্ষা দেয়া। সংক্ষেপে দীক্ষার ব্যাপারটা ধর্ম্মের সঙ্গে জড়ালে coerced conversion to new faith-এ দাঁড়ায়।

জবরদস্তি জ্ঞান প্রচারের প্রকরণে ঊর্ধ্বস্তরের আদর্শ বুঝি বা না বুঝি বিপদের আশঙ্কা থাকায় না হয় মেনে নিলাম প্রেম, যুদ্ধ ও রাজনীতির কূট চক্রান্তে অথবা সরল ভাবাধিক্যে যেমন স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে সবই সম্মত, সেইরূপ নয়া কৃষ্টির দোহাই পাড়লে সবই শিরোধার্য। তাই বলে দাদার মত একটি অটল বাস্তববাদী এবং পরম নিষ্ঠাবান বেরসিকও

যে স্বপ্নবিলাসী শিল্পীদের খপ্পরে পড়তে পারেন তা কল্পনাতেও আনতে পারি নি। তাঁর স্বরূপ ধরা পড়ল বঙ্কিম-মুরারীর মত দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে, তার সঙ্গে ছিল তাঁর নিজস্ব মুদ্রাদোষ, যাকে বলা চলে কথাকলি প্রথায় কণ্ঠনৃত্য। সোজা ভাষায় বললে দাঁড়ায় মাংসপেশীর আড়ষ্টতা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আকস্মিক গলার ঝাঁকুনি। এই সময় দাদার লোলচর্মের আবরণ খেলনার বেলুন ফোলার মত স্ফীতরূপ নিয়ে হঠাৎ চুপসে যায়। কণ্ঠে অন্তর ও বাহিরের এইরূপ কসরৎ একমাত্র মানিকদার পক্ষেই সম্ভব।

এগিয়ে যাচ্ছিলাম ভিড়ের দিকে, হাজার হোক চেনা মানুষ, একটু খোঁজ নিতে হয়। লোকে যাই বলুক দাদার কাছ থেকে মাঝে মাঝে রেস খেলার ভাল টিপ পাই। সপ্তাহের শেষে শনিবার এগিয়ে এলে দাদার বাড়ীতেও অনেকে ওই খবরের আশায় ভিড় জমিয়ে দেয়। ভাবলাম এখানেও গুণগ্রাহীরা খবর কাড়াকাড়ির জন্য জড় হয়েছে, কিন্তু উত্তেজনায় কেমন একটা বিপদের সঙ্কেত পেলাম। কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখি, দাদা ভিড়ের ব্যূহে শুধু আটক পড়েন নি, তাঁকে ঘিরে কেমন একটা অস্বস্তিকর আপ্যায়নের সাড়া উঠছে। ধুপধাপ কিলচড়ের শব্দ ত আছেই, তার ওপর শালা সম্বোধন সতেজ হয়ে ওঠায় অনুমান করলাম চাঁদার মারের দাধন সুরু হয়েছে, উৎসব ধুম করেই চলবে।

কলকাতার মত শহরে, বড় রাস্তার বুকে ভিড় করে একটি লোকের ওপর বড় কুটুম্বের দাবি জোর গলায় পেশ করলে ধরে নিতে হয় সম্বোধনের মানুষটি অভিজ্ঞ গাঁটকাটা, বেসামাল হওয়ায় বামাল সমেত ধরা পড়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে আত্মার শুদ্ধির প্রয়োজন থাকায় কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিরা সমাজের কল্যাণার্থে তড়িৎবেগে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়ে থাকেন। অন্যথায় ভিড়ের দিকে চলন্ত পাহারাওয়ালার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বিচিত্র নয়, ও দৃষ্টি আবার সকলে সইতে পারে না। কার দোষে কাকে নিয়ে টানাপোড়েন চলবে ঠিক নেই, সুতরাং শান্তি রক্ষার আচরণকে অনধিকার চর্চা বলতে হয় যা দানের পুণ্যে ব্যাঘাত ঘটিয়ে থাকে।

বড় কুটুম্বের চরিত্রশুদ্ধির প্রকরণে যে পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল তাতে ভিড় সরিয়ে ঘটনাটির সঠিক খবর জানার চেষ্টা করলে জনমতের প্রত্যাশা অনুসারে দাদার মাথায় অন্ততঃ একটি শাস্ত্রসঙ্গত চাঁটি কষিয়ে আসতে হয়, অন্যথায় আমাকেই চোরের মাসতুতো ভাই সাব্যস্ত করে চরিত্রবানরা চাঁটিয়ে সারবে। সম্ভাবনা সুবিধাজনক লাগল না, একটু দূর থেকেই ঘটনাটি দেখতে লাগলাম, দেখার পুরোমাত্রায় সুবিধা না থাকায়, অনুমানকে যথাসম্ভব কাজে লাগাতে হল।

ব্যাপারটা খুলে বলি, চাঁদার মারে, চাঁটির দানে পুণ্যের পুঁজি বাড়ার প্রতিশ্রুতি থাকায় ভিড় এত বেড়ে গিয়েছিল যে চাঁটি যার পাওনা সে নাগালে না থাকায় অপাত্রে দানের বহরও বাড়তে সুরু করল, অর্থাৎ আড়ালের আশ্রয় পেলেই যে যাকে পারল তাকেই কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত চরিত্রশুদ্ধির নিষ্ঠায় গলদ এসে পড়ল। তার সঙ্গে স্থানটি বিপদসঙ্কুলও হয়ে উঠল। কার দোষে কে চাঁটি খাবে ঠিক না থাকায় যাঁরা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনকে কাছে পাওয়ায় জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে বলুন ত? আহা বেচারা ভদ্রসন্তানকে ঐভাবে..." কথাটা শেষ করতে পারলাম না। একেই প্রত্যাগত ভদ্রলোক মারের উৎসবে যোগ দিতে পারেন নি, তার ওপর দুর্বৃত্ত সম্বন্ধে দরদে চোবানো কথা শুনে ঝাঁঝালো ভাষায় উত্তর দিলেন, "ঐ ঘি-খোর হল কিনা বেচারা! আজকের দিনে মানুষ যখন খেতে পায় না, নগদ দাম দিয়ে এক মুঠো চাল কেনার উপায় নেই, রেশন কার্ড হাতে নিয়ে রোদ্দুরে ঝলসে গেলেও কেউ ফিরে তাকায় না, তখন কি না ঐ লোকটা বিনা মূল্যে এবং পরমানন্দে ঘি খায়। তাও আবার শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত। 'বিনামূল্যে' কথাটা মিছে বলি নি মশায়, ধারে কিনে দাম না দিলে বিনামূল্যেই বলতে হয়।" আমার সমবেদনাকে বিধ্বস্ত করার জন্য ভদ্রলোক তেজীয়ান হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর উক্তির পিছনে যে অখণ্ডনীয় প্রমাণ ছিল তাই জানাবার জন্য বলে যেতে লাগলেন..."বিশ্বাস করুন, আমি ঘি-ওয়ালার পাশেই দাঁড়িয়ে-

ছিলাম, ঘটনাটির সব কিছুই নিজের কানে শুনেছি এবং স্বচক্ষে দেখেছি। পানওয়ালার দোকানের সামনেই ঘটনাটি ঘটে। আমার আধ-খাওয়া বিড়িটা আবার ধরিয়ে নেবার দরকার থাকায় চিরজ্বলন্ত ঝোলানো দড়ির দিকে এগুচ্ছিলাম। দেশলাই কিনে নেশার পিছনে খরচ আমার ধাতে সয় না, বিড়িটাও পেয়েছিলাম নিখরচায়, এক বন্ধু ভদ্রাচারের খাতিরে দান করে ফেলেছিল। পানওয়ালা নির্বিচারে মুখাগ্নির সুব্যবস্থা ঝুলিয়ে রাখার সুবিধাটি কাজে লাগানোর জন্য সবে হাত বাড়িয়েছি, এমনি সময় ঐ দাড়িআলা মানুষটি আমাকে প্রায় ঠেলে দিয়ে দড়ির দিকে ঝুঁকে পড়ল। বুঝলাম লোকটা আমারই মতন একজন সাধক মিতব্যয়ী, বেওয়ারিশ মালের ওপর দাবি চালাতে এসেছে। বর্ব্বরের স্বার্থ যখন প্রবল হয়, তখন সিদ্ধির পিছনে পাশবিক আচরণই স্বাভাবিক। নিজের আত্মমর্য্যাদা ভেবে লোকটার অগ্রিম দাবি মেনে নিলাম। বিজয়ী দাবিদার বিড়িতে আগুন লাগিয়ে সবে একগাল তৃপ্তির ধোঁয়া ছেড়েছে এমনি সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। দেখলাম, একটি পরিপুষ্ট দোহারা মানুষ হঠাৎ পিছন থেকে দাড়িআলাবাবুর কর্ণচুম্বী শার্ট ধরে মারল টান। গলার কাছে কড়া ইস্তিরি থাকায় পরিচ্ছদের ঐ অংশ কতকটা বর্ম্মের কাজ করলেও গলা টিপে ধরার মধ্যে একটা হিসেব করা অভিসন্ধি ছিল, যার ফলে দেখা গেল দাড়িআলাবাবু বেশ কাবু হয়েছেন। পুষ্ট লোকটি দু একটি জোর ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, বাছাধন, এইবার ধরেছি, আর যাবে কোথায়? যতই ভোল বদলাও, আমার চোখে আর ধুলো দেওয়া চলবে না; তোমার ছাগলদাড়ি, সাধুর জটা, কিম্বা Non-violent পরিচ্ছদ কোনোটাই ঠগির মুকুট খসাতে পারবে না"। বক্তব্য শেষ হবার পরেই গলার ওপর যে অধিকন্তু চাপ পড়ল তাতে কণ্ঠনালী থেকে এমন একটি ক্ষীণ শব্দ বেরিয়ে এল যাতে ঘটনাটিকে হত্যার পূর্বাভাষ বলেই মনে হয়।

দিনের বেলায় সহরের মাঝ রাস্তায় গলাটিপে মানুষ মারার প্রদর্শনী একটি প্রমোদাত্মক আকর্ষণের বস্তু! মানুষ জন্মালেই মরে, একটা কোন কারণের অছিলা দেখিয়ে, এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। শান্তভাবে চরম শান্তির দাবি পেশ করলে অনেক সময় আপত্তিও ওঠে না। বরং শোক প্রকাশে উৎসবের আয়োজন এসে পড়ে। এটা অবশ্য অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা, কিন্তু অযথা মার খেয়ে সর্ব্বসমক্ষে মরার প্রদর্শনী অনেকে আরামপ্রদ মনে করে না। দুর্ব্বল আত্মরক্ষার জন্য বাঁচার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে। আততায়ীকে দূরে রাখার জন্য দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকে, তখন কাণ্ডজ্ঞানহীনের দু একটা ছটকে-আসা ঘুঁষি আমার ওপর পড়লে বেদনাটা আমাকেই ভোগ করতে হবে। ভদ্রসন্তানের পক্ষে দাঁড়িয়ে মার খাওয়াটা সঙ্গত মনে করি না। হাজার হোক আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আমার থাকা স্বাভাবিক, কারণ ছেলেবেলা থেকেই আমি শান্ত-প্রকৃতির মানুষ। এ বিষয়ে পিসীমার Certificate এখনও আমার Moral Strength হয়ে আছে। তিনি চিরকাল বলে এসেছেন, 'পুঁটুর ছেলে (অর্থাৎ আমি) চোর হোক, ছ্যাঁচোর হোক, ছোটলোকের নতন মারপিটের দিকে কখনও ঘেঁষে না। একান্তই মার খেলে ছেলেটা কখনও 'রা' পর্য্যন্ত করে না, কেবল চোখের জলেই অভিযোগটা সেরে নেয়।'

এইবার চাঁদার মারের কথায় ফিরে আসি। নেহাৎ কর্ত্তব্যের খাতিরেই লোকটার উপকার করতে এসেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, ভিড়ের আড়ালে পিছন থেকে দু এক ঘা চড় কষিয়ে দিতে পারব। পালোয়ানদের আখড়ায় বলে 'শও ডন এক লপ্টন,' সেই রকম একশ উপদেশের কথা যে কাজ করে তাই দুই চাঁটিতে বুঝিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু দানের পাত্র বিচার না থাকায় আমাকেও এক ঘা খেতে হয়েছিল। গত্যন্তরে একটু সরে দাঁড়ালাম। কর্ত্তব্যসাধনে আমি নিজে অপারগ হলেও অপরে দুর্ব্বৃত্তকে শাস্তি দিচ্ছে সেখানে বেশ একটা আত্মতৃপ্তি বোধ করি। ঐটুকু সান্ত্বনার লোভে ঘটনার খুব কাছে থাকতে হয়েছিল, কারণ সন্দেহ ছিল না লোকটা চোর সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে

প্রবল শক্তিতে গলা টিপে ধরা সত্ত্বেও কোনদিক থেকে প্রতিবাদ না ওঠায় বলপ্রয়োগের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে উঠল। পুষ্ট মানুষটি পরের কণ্ঠমর্দ্দনের ব্যায়ামে গলদঘর্ম্ম হয়ে উঠেছে। ঘটনাটি চলতি নিয়মের ব্যতিক্রম বলেই ধরতে

মানিকদা

হয়, কারণ যাঁর ওপর পীড়ন চলে তাঁরই নালিশের দাবি থাকে আগে। ঐটুকুই দুর্ব্বলের অবলম্বনই এবং সহানুভূতি সংগ্রহে সঙ্গত রীতি। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ঘটল বিপরীত। দেখা গেল ঘিআলার হৃদয়স্পর্শী অভিযোগে অনেকেরই মন টলেছে। দুঃখের কাহিনী শোনার জন্য অনেকেই প্রস্তুত এবং নিরপেক্ষ বিচারের জন্য উৎসুক। পূর্ব্ব বিবৃতির জের টেনে একজন বললে, "আর কত শুনব? সবকিছু যে ঝিমিয়ে আসছে।" ঘিআলা ভাবলে এখুনি দরদকে চেপে ধরতে না পারলে বিচারে গলা টেপাটা দোষ বলে ধার্য্য হতে পারে। গতিক খারাপ অনুমান করে সে সকলকে মিনতির স্বরে জানালে, "আমার দুঃখের কাহিনী পুরোটা শুনলে বুঝবেন কিভাবে এই দাড়িআলা মুখোশ পরা লোকটি আমায় ঠকিয়েছে। রেস খেলার লোভ দেখিয়ে নাজেহাল করে সেরেছে। ঘিয়ের ব্যবসা নিয়েই আলাপ। লোকটার নিজের কেনার মুরোদ ছিল না, পাড়ার কয়েকজন খদ্দের জুটিয়ে দিয়ে ফাউয়ের ভাগটা আদায় করে নিত। ফাউয়ের ওজন আসলের চেয়ে বেড়ে গেলে কিছু বলতে পারতাম না, কারণ কথায় কথায় আমার ভবিষ্যতকে রাঙা করে তুলত। আস্কারা পেয়ে যখন-তখন বাড়ী চড়াও হতে লাগল। বস্তাবন্দী উপদেশের বোঝা নিশ্চিন্ত মনে আমার স্কন্ধে চাপাতে সুরু করল।

"সেদিন শনিবার, ভোর না হতেই দরজায় সাংঘাতিকভাবে ধাক্কা পড়তে লাগল, যেন পলাতক কয়েদিকে ধরার জন্য গোয়েন্দার হানা। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, দরজার হুড়কো খুলতেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে এই সর্বনেশে হিতৈষী। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই আমার মুখের কাছে হাত এনে বললে, 'চুপ! চুপ! কাউকে কিছু বলো না, ঠাকুরের কাছ থেকে স্বপ্ন পেয়েই ছুটে এসেছি। একেবারে আদেশ, বাজে ঘোড়ায় বাজি মারবে। ধরত একদিনেতেই রাজা, না ধরলে আদেশ অমান্য করা হবে। বুঝতেই পারছ, ঠাকুরের কু-দৃষ্টি পড়লে কি হতে পারে? ঠাকুরের নামে মিথ্যা বলবে এখন কথা ভাবতেই পারি নি, ছাপোষা মানুষ, অভাব ঘরে লেগেই থাকে, ছেলেদের মুখ চেয়ে যা পারলাম তাই দিলাম এই লোকটাকে। হবি ত হ—সত্যই বাজিমাৎ। জিতের সব টাকাই আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'কেমন জাগ্রত ঠাকুর দেখলে ত? তবে এই বাজিই ত শেষ বাজি নয়, ভবিষ্যতে আরও বড় দাঁও মারতে হলে স্বপ্নাদেশের আগেই ঠাকুরের পুজোয় কিছু খরচ করতে হয়, নৈবেদ্যকে শাস্ত্রমতে সাজাতে হলে কি রকম টাকা লাগে জান ত? তারপর নৈবেদ্যর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুরোহিতের দক্ষিণাও আছে। সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ ত চারটিখানি কথা নয়, তার পর জাগ্রত দেবতা নিয়ে কারবার। ভেবে দেখলাম পুরোহিতের মারফৎ ঠাকুরের কৃপা যদি সহজে পাওয়া যায় ত কিছুতেই ছাড়া নয়। কি করি, জিতের টাকা থেকেই বেশ কিছু ভবিষ্যতের জন্যে এই লোকটাকে দিয়ে দিলাম। কিন্তু পরের ঘটনায় জিতের চেয়ে হারের দিকটাই বাড়তে লাগল বেশী। তারপর এমন সময় এল যখন মন্ত্রপড়া ঘোড়ার টিপ একেবারে বেকার হয়ে গেল। এই বাবু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলে বলত, 'ঘোড়া দৌড়াবার বদলে হাঁটতে সুরু করলে ধরে নিতে হবে। পুরোহিত পূজার মন্ত্রে গলদ এনে ফেলেছে, কিংবা কুগ্রহের প্রভাব ঠাকুরের কৃপাকে দাবিয়ে দিয়েছে। ঠাকুর খুশী হলে তবেই ত বরদানের কথা উঠে। তোমার খাঁটি ঘিই ত যত গোলের গোড়া। একেই সুগন্ধি গাওয়া ঘি, তাতে পরিমাণটাও বেশী, লোভ সামলাতে না পেরে পুরোহিত বোধহয় ঠাকুরের সামনেই কাঁচা খানিকটা খেয়ে ফেলে থাকবে। জাগ্রত ঠাকুর, তার চোখের সামনে জানিয়ে-শুনিয়ে চুরি শুধু নয়, ঠাকুরকে উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইয়ে দেয়া, ঠাকুরের জাতমারা, এত বড় বেয়াদবি কি ধর্ম্মে সয়, কাজে কাজেই তোমার ঘোড়া দৌড়াবার বদলে যদি হাঁটতে সুরু করে তবে দোষ দেব কাকে।

"ভেবে দেখুন দেখি, আপনারাই বিচার করুন এই লোকটাকে। খাঁটি গাওয়া ঘি খাইয়েছি। বাপ-ঠাকুরদার সময় হলে লোকে বলত জাত ব্যবসায়ে ধর্ম্ম খুইয়েছি। জ্ঞাতি-কুটুম্বদের কাছে এত বড় দুর্নাম রটে যাওয়ার পরেও লোকটার তোয়াজ করেছি। তার বিনিময়ে বলে কি না 'সামান্য ঘি দিয়েই এত লম্ফঝম্ফ, তাও আবার দান নয়, কেবল

হয়-পুচ্ছ আন্দোলিত কেশবিন্যাস

সধবার কর্ত্তিত কেশে বৈধব্যের বিলাস

পাওনার দাবি পুষিয়ে দিয়েছে, রেস খেলতে গেলে হারজিত আছেই। তাই বলে টিপ সংগ্রহের জন্যে যে খাটুনি হয়, তার দাম দেবে না, পেটে ছুরি চালানোর পর রোগী মরে গেলেও Successful operation-এর জন্য ডাক্তার পুরো ফি আদায় করে ছাড়ে। পেট কেটে মানুষ মারার জন্য কেউ ত তাকে নরঘাতক বলে না। মোকর্দ্দমা করতে গিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হলেও আইনজ্ঞের উপদেশ দাম দিয়ে কিনতে হয়। এমন দাম যার জন্য মাথা পর্য্যন্ত বিকিয়ে যায়। আর রেসে ঘোড়ায় বাজি হারল, তুমি এলে জিতের টাকা আদায় করতে। বাড়ী চড়াও হয়ে ভদ্রসন্তানকে অপমান করতে তোমার বাধে না?'

"তোমার ঘি যে ভেজাল তা পেটুক পুরোহিত না জানুক, আমি ত জানি। ভেজাল নিয়ে এত বাড়াবাড়ি। ভেজালের কথায় প্রতিবাদ করতে গেলে তেড়ে উঠে বলে, 'থাক, থাক, হয়েছে সকলেই জানে ভেজালটাই তোমাদের কারবারে খাঁটি জিনিষ।' সোনায় খাদ না মেশালে যেমন মনোমত গয়না গড়ানো যায় না, গুণী কারিগর বলে, খাঁটি সোনা এত নরম যে পূর্ণাঙ্গী সুন্দরীর ছোঁয়া লাগলেই রূপের তাপে গলতে থাকে। তাই খদ্দের বুঝে বানির দাম কমে-বাড়ে, খাদের কম-বেশী হিসাব ত এইখানেই, এটা ওস্তাদ ঘরোয়ানা কারিগরের গোপনীয় সম্পদ যা প্রকাশ্যে সকলেই জানে! ঠিক এইভাবেই গয়লার পেশায় দুধে জল না মেশালে উপায় নেই। নিজের ছেলেকে দুধ দিতে হলে খাঁটির সঙ্গে খানিকটা ভেজাল মেশাতে হয় ছেলের স্বাস্থ্য বাঁচাবার জন্য। সুতরাং বুঝতে হবে ব্যবসায়ের লাভের দিকটা দেখতে হলে ভেজালকেই খাঁটি না করে উপায় নেই।"

ঘি-আলার লম্বা অভিযোগের বিবরণে আবার বাধা পড়ল। 'এ যে কলেজী লেকচার সুরু করলে। সোজা কথা সংক্ষেপে বল না, ঐ দাড়িআলা লোকটা তোমাকে ঠকিয়েছে এবং এখুনি শাস্তি না হলে ভবিষ্যতেও ঠকাবে।' ঘি-আলা উত্তর দিল, 'ভবিষ্যতের জন্য কিছু থাকলে তবে ত ঠকাবে।' উত্তরটি মনোমত না হওয়ায় আর একজনকে বলতে শোনা গেল, ঘিআলার মাথা খারাপ হয়েছে, যা-তা বকছে। চুরির প্রমাণ পেতে সময় লাগবে, এই ঘটনায় অত উদার হওয়া চলে না। ধরা যখন পড়েছে তখন লাগাও শালাকে থাপ্পড়।' বিচারের নিষ্পত্তি এবং আদেশ কার্য্যকরী হতে সময় লাগল না। একজন দাড়িআলার কাছে আসতে না পারায় ঘিআলাকেই সম্বোধন করে বলল, 'দাও গলায় চাপ ভাল করে, ও শালা শুধু চোর নয়, দাগী খুনে, নিশ্চয়ই অনেকবার ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছে, পেহ্লাদ (প্রহ্লাদ) মার্কা জান, দড়ি দিয়ে ঝোলালেও ও প্রাণ মরে না, টেপ, টেপ, ভাল করে গলাটা টেপ।'

ভক্তির পরিবেশে কীর্ত্তনের সুর ভক্তকে ভাবের ঘোরে নাচিয়ে দিলে যেমন ভক্তির চরম প্রকাশে মানুষ আত্মভোলা হয়ে যায়, তাল বেতাল সুর বেসুর, নামের মহিমা সবকিছু অজানা অসীমে বিলীন হয়ে যায়, সেইরূপ দুশ্চরিত্রকে আদর্শ চরিত্রের পর্য্যায়ে তুলতে যাওয়ায় সকলেই আপনভোলা হয়ে গেল। মারের বিধানে কোন নিয়ম রইল না। দাড়িআলা বাবুর আত্মা যে ইতিমধ্যে দেহত্যাগের আয়োজন চালিয়েছে তা কাহারও নজরে পড়ে নি। ধরা পড়ল লোকটার সারা দেহের কাঁপুনি থেকে। ক্রমান্বয়ে হাঁটু মোচড় খেতে লাগল, গলা দিয়ে ঘর্ঘর শব্দ বার হতে লাগল, দৃষ্টিও অর্দ্ধনিমীলিত। লক্ষণগুলি সহজবোধ্য হওয়ায় ভোজবাজির খেলার মত ভিড় যেন উপে গেল। যিনি এতক্ষণ প্রধান সাক্ষী হিসেবে আমার সামনে ঘটনার বিবৃতি দিচ্ছিলেন, তিনিও কি ভাবে অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান করলেন বুঝতে পারলাম না।

ভিড় কেটে যেতে দেখলাম দাদা চিৎ হয়ে রাস্তার উপর পড়ে আছেন, মুখ আকাশের দিকে থাকলে কি হয়, আধখোলা চোখ গিরগিটির মত মুখ না নাড়িয়ে আশেপাশে দৃষ্টি চালিয়ে চলেছে। মারের বহর পানওয়ালা দেখেছিল, লোকটা এই অবস্থায় পড়ে আছে দেখে আড়াই ফুট চওড়া দোকানের মঞ্চ থেকে নেমে এল লোকটা মরেছে কি না দেখবার জন্য। দোকানের সামনে এবং অত কাছে একটা লোক মার খেয়ে মারা পড়লে পুলিশ দোকানদারকে জবরদস্তি সাক্ষী করে সারবে। আদালতে টানাপোড়েন ছোটখাটো দোকানীর পক্ষে একটি আতঙ্কের বিষয় তাই পরীক্ষার তাগিদকে সে অবহেলা করতে পারল না। বুকের ওপর কান রেখে পানওয়ালা নিশ্চিন্ত হল হৃদযন্ত্রটি খাসা চলেছে, তার আর ভয়ের

কারণ নেই। পানওয়ালার দয়াজ হৃদয় দেখে দাড়িআলা বাবু জড়ানো ভাষায় জানালেন তিনি তৃষ্ণার্ত্ত। দাড়িআলা বাবুকে এখন থেকে দাদা বলে সম্বোধন করা যাক। দাদা যে অবস্থায় পড়েছিলেন তাতে তৃষ্ণার্ত্ত বললে মহা পাষণ্ডকেও দয়া প্রকাশ করতে হয়, কিন্তু পানওয়ালা ঝানু ব্যবসাদার। একধার থেকে কোকোকোলা, ওরেঞ্জ ক্রাস, পাইন আপেল ইত্যাদি বোতলস্থ পানীয়ের বিভিন্ন দাম জানিয়ে দিল। দাদা বললেন 'কোকোকোলা'। যথাসময় শোষণকাঠি সহ কোকোকোলা তাঁর কাছে উপস্থিত হল। দাদা তখন উঠে বসেছেন। তাঁর পাশেই দেখলাম একটি সুদৃশ্য সাহেবী চালে বাঁধা চতুষ্কোণ পুলিন্দা, মনে হয় দুর্লভ মহামূল্য কিছু ওর ভিতরে আছে। উঠে বসেই দাদা যে ভাবে পুলিন্দার ওপর হাত রাখলেন এবং সাবধানে নিজের কাছে টেনে নিলেন তাতে ধারণা করা চলে যে বাহারে পোঁটলার ভিতরে ছবি আছে। দাড়ির সঙ্গে যোগ রাখতে হলে এ ধারণা পাশ কাটাবার উপায় নেই। দাদা ছবি আঁকেন! রহস্য আমাকে কৌতূহলী করে তুলল। এক পা, দু পা করে দাদার কাছে এসে পৌঁছলাম এবং কিছুই না জানার ভান করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাস্তার মাঝখানে বসে পড়েছেন, আছাড় খেয়েছেন বুঝি, বড্ড লেগেছে?' দাদা ধরে নিলেন আমি কিছুই জানি না। আমার প্রশ্ন শুনে উত্তর দিলেন, 'দরদের কথা বাদ দিয়ে কোকোকোলার দামটা চুকিয়ে দাও। ছোট রেজকী যে আমার কাছে থাকে না সে খবর কি রাখ না?' কথাগুলো উঁচু গলায় বলেছিলেন যে পানওয়ালাকে শোনাবার দরকার ছিল। কি দুর্ভোগ! কাছে আসতেই গুনাগার। কোকোকোলার দাম আমাকে কেন দিতে হবে বুঝলাম না। আকস্মিক আদেশ এবং অশোভনীয় প্রত্যাশায় অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর প্রতিবাদের জন্য মন দৃঢ় হয়ে উঠল। কয়েকটা কড়া কথাও সংগ্রহ করে ফেলেছিলাম। কিন্তু শাস্ত্র মানতে হলে অপ্রিয় সত্যকে আসল রূপে প্রকাশ করা নিষেধ। ভব্যতাও দেখছি ভেজালের খুঁটি না পেলে সভ্যসমাজে চালানো দায়। অবশেষে, রাগ চাপা দিয়ে পকেট হাতড়াতে লাগলাম। একেই ত দাদার আছাড় খাওয়া মেজাজ, তার উপর চাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুললে হয়ত তেড়ে উঠে প্রমাণ করে দেবেন টাকাটা আমার পকেটে আছে বলেই তাতে আমার অধিকার স্বত্ব জন্মায় না এবং স্বত্ব কোনো প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হলেও অর্থনীতির প্রত্যাশা অনুসারে টাকাটা চালু থাকা দরকার, কোন বিশেষ পকেটে দম বন্ধ হয়ে মরার জন্য টাকার জন্ম টাঁকশালে হয় নি। পকেট হাতড়াবার দিকে দাদা কড়া দৃষ্টি রেখেছিলেন, খুব সম্ভবতঃ ধরে নিলেন খুঁজে-পেতে আমি নেই বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। সূক্ষ্মানুভূতির সাহায্যে আমার দেউলিয়া পকেটের গোপনীয় খবর পেয়ে গিয়েছিলেন। কুঞ্চিত ভ্রূ ঊর্দ্ধে তুলে বললেন, 'মনে হচ্ছে অতগুলো টাকা সব খরচ করে ফেলেছ, পকেট হাতড়ে যেভাবেই আত্মস্তোক্ যোগাড় কর, আমি জানতাম ওটা দোষ স্খালনের পুরাতন চাল, অভ্যাসটি ধর্ম্মে গাঁথা, ও কি উপদেশে পোষ মানে।'

দাদার সঙ্গে আমার কালে-ভদ্রে দেখা হয়, পথ চলতে দূর থেকে 'কেমন আছেন' বলাতেই ঘনিষ্ঠতার শেষ। ঐটুকুর সুবিধা নিয়েই মনগড়া সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে এমন ভাবেই বিরক্তি প্রকাশ করলেন যে পানওয়ালা ঠিক করে নিল দাদা সব সময় মোটা টাকা আমার জিম্মায় রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি কৃপণ স্বভাবের মানুষ, স্বদেশীয়ানার প্রভাবে পড়ে বিড়ি খাওয়া ধরেছেন। স্বদেশী ধোঁয়ায় একবার প্রাণ মজে গেলে গঞ্জিকা ভিন্ন অন্য কিছুতে মন টলে না, রাস্তায় ঘাটে ভদ্রলোকের ছেলেও গাঁজায় দম দিতে পারে না। যাই হোক, কোকোকোলার দাম দেবার কথায় আমার পকেট হাতড়ানো দেখে পানওয়ালা ঠিক করে নিল খোঁজার প্রদর্শনী একটা ধাপ্পার প্যাঁচ, অথবা এও হতে পারে সেয়ানার সেয়ানায় বোঝাপড়া করতে গেলে কোন্ ইসারায় কি চাল চালে সহজ বুদ্ধিতে বোঝা শক্ত। কোকোকোলার দামটা শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যাবে ত, বিলম্ব দেখে পানওয়ালা কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটার দৃষ্টির ডগায় যেন ধারালো বল্লম লাগানো ছিল। চেহারাটা আরও ভীতিপ্রদ। একেবারে পেশাদার জোয়ান। পালোয়ানের মতন দেখতে, কান দুটো তোবড়ানো, গর্দ্দানটা ষাঁড়ের মত, বুকটা কবাটের মত চওড়া, তাও আবার চিতিয়ে আছে

যেন এই মারি তো এই মারি ভাব। এই ধরনের লোকের সঙ্গে কোন লেনদেনের কারবার আমি মোটেই পছন্দ করি না। ভিতরটা তখন ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ছে। ঐ দৃষ্টির তাড়না থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় কায়মনোবাক্যে ভিন্ন পকেট হাতড়াতে লাগলাম। একেই পুরোনো কোট তায় একদিককার পকেটের সেলাই ছেঁড়া, তায় জোর তদন্তের অত্যাচারে ছিদ্রদ্বার আরও উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। উত্তেজিত সন্ধানের চেষ্টায় দুমুখো পকেট থেকে একটি এক টাকার মোচড়ানো নোট গোড়ালির কাছে পড়ে গেল। এই টাকাটি খুঁজে পাওয়ার জন্য কাল নাজেহাল হয়ে গিয়েছিলাম। নিষ্পেষিত সেলাইয়ের খাঁজে কিভাবে নোটটা ঢুকে গিয়েছিল, কাছে থেঁষতে পারে নি। পকেটের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে নোটের আবির্ভাব ও পতন দাদার নজরে আটক পড়ল। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ধনুষ্টঙ্কারের মত দাদার ঠোঁটে বাঁকা রেখা দেখলাম। বক্রহাসিতে যেন খোলা তলোয়ার ঝলসে উঠল। কাল বিলম্ব না করে দাদা কতকগুলো কথা যেন চিবিয়ে আমার দিকে ছুড়ে মারলেন। টাকা যে দেখছি পকেট থেকে উপচে পড়ছে, নোটগুলো নিজের নয় তাই বুঝি এত দরদ। এ বিষয়ে পরে কথা বলব, এখন দামটা চুকিয়ে দাও।' গ্রহের ফেরে যে অবস্থায় এসে পড়েছিলাম তাতে করে টাকা কাকে দেব ভাববার সময় ছিল না। রচসা এসে পড়লে দাদা কি বলতে আরো কি বলবেন তার ঠিক নেই। সত্যকে প্রমাণ করতে গেলে তুমুল কাণ্ড বেধে যাবে। অধিকতর দুর্ঘটনাকে নিমন্ত্রণ পাঠানোর চেয়ে দামটা দিয়ে ফেলাই ভাল। নোটটি পানওয়ালার হাতে দিয়ে ফিরতি রেজকির জন্য অপেক্ষা করছি, এরই ভিতর দাদা পুঁটলি পিঠে ঝুলিয়ে প্রায় সামরিক প্রথায় উল্টোদিকে মুখ ফেরালেন। তারপর বললেন, "অতগুলো টাকা নিশ্চয়ই খরচ করে ফেলেছ। পরের টাকায় হিসেব রাখা তোমার ধাতে সয় না, নিজে কখনও উপায় করলে না ত, যাই হোক, তোমার দিল-দরিয়া খরচের দিকে এবার থেকে নজর রাখতে হবে।' দাদার কথা শুনে একটু রুখেই আরো এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমার উদ্দেশ্য বুঝে দাদা বললেন, "থাক, থাক, এখন আর খরচের অজুহাত দিতে হবে না, বেজায় তাড়া, আমি চললাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে হবে। ওখানে বিদ্যার আড়ৎদাররা এতক্ষণে জমা হয়ে গিয়েছে, অচল Dead stock নিয়ে সকলেই কাবু, বুদ্ধিমন্থনে হুল্লোড় চলেছে, আমি না যাওয়া পর্য্যন্ত হলাহল গিলে ফেলার সাহস কারো আসবে না। বুদ্ধির গভীরতলে যে রত্নসন্ধানে ঘুরতে পারে সে ত এই শর্ম্মা।" দাদার বোলচালে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, ভাবলাম লোকটা শেষ পর্য্যন্ত পাগল হল নাকি, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবেন, বলে কি! আমার মুখ দেখে প্রথমটা দাদা ভড়কে ছিলেন, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললেন, "তোমরা যা ভাব কিংবা যতটা ভাবতে পার তা আমার অজানা নেই, তবে আমি যে-সব কথা বিশ্ববিদ্যালয়ে বলতে যাচ্ছি তা তুমি বুঝবে না, আর্টের কথা - যা আধুনিকদের মতে ইনটেলেকটেরও বাইরে, সব বিশ্বাসে ঘেরা উপলব্ধির বস্তু। বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলতেই অবাক হয়ে গিয়েছিলে, সেখান থেকেই আবার সন্ধেবেলায় International Art-এর Seminar Academyতে আছে, আমিই সেখানে প্রধান বক্তা, কারণ সকলেই জানে Quotation-এর আড়াল থেকে আমি নিজের অজ্ঞতাকে বাঁচাবার চেষ্টা করি না। পণ্ডিতের খেতাব নিয়ে পরের বুদ্ধির মোটও বই না, আমি যা বলি তা বুঝেই বলি এবং বোঝাটা নিজের মস্তিষ্কের ব্যবহারে হয় এবং বোঝাটা পরের দেওয়া পুনরাবৃত্তি নয়। যাক, এ সব কথা তোমাকে বলে লাভ নেই, তুমি বুঝবে না, মিছে সময় নষ্ট।" চরম কথা শেষ হবার পর আমাকে বোকা বানিয়ে দাদা দ্রুতগামী পদক্ষেপ সামনে এগিয়ে দিলেন। কৃষ্টির দলন-মলনের জন্য দাদার লম্বা লম্বা পা দুটো যেন উটপাখীর মত চালে ছুটতে লাগল।

দাদা দেবেন আর্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা, তাই শুনতে আসবে খেতাবপ্রাপ্ত বিদেশী বিদ্বানরা। Seminarএ প্রগতিশীল নয়া চিন্তাধারার সঙ্গে প্রাচীন আদর্শের সহিত মতদ্বৈধতা কোথায় তারই বিচার ও বিশ্লেষণ হবে। শুধু বিশ্লেষণ নেয়, নতুন ও পুরাতনের সংঘর্ষণ লাগিয়ে দিয়ে একটি এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্বের আবিষ্কার হবে যাতে যাবতীয় বিস্ফোরণের

মধ্যেই শান্তির ধ্বজা উঠবে। কিন্তু বেএক্তিয়ার বুদ্ধির বোমা ফাটলে যাদের বিচারশক্তি বেকার হয়ে যাবে, তারা শান্তি নিয়ে করবে কি? এ সব বিষয়ে বেশী ভাবতে গেলে আমাকেই ডাক্তার বাড়ী ছুটতে হবে মাথার চিকিৎসার জন্য। দাদাকে অনুসরণ করার ইচ্ছা থাকলেও নিজেকে সংযত করলাম। ইতিমধ্যে, মলিন ও দলিত নোটটি তখনও পানওয়ালার নির্দয় পরীক্ষায় মোচড় খাচ্ছে। উল্টে-পাল্টে আলোর বিপরীত দিক থেকে দেখেও লোকটা সন্তুষ্ট হতে চায় না। পরীক্ষার পীড়নে নোট জর্জ্জরিত হয়ে যাবার পর পানওয়ালা ভাঙা বাংলায় বললে, 'এ নোট ত বাজারে কই লিবে না, মালুম হইতেছে এ জাল আছে, তবে হামারা জানপয়চান আদমি আছে যে চালু করিয়ে দিতে পারে, মগর উওকাম ভী ত মুশকিল কো হ্যায়, পুলিশ দেখিয়ে ফেলে ত আপকো ভি ছোড়বে না। আপ ভদ্র আদমী আছে, আউর হাম ভি রোজ ভগবানকো নাম লিয়ে থাকি, উসি লিয়ে বলছে এদিক-উদিক কিছু দিয়ে দিলে নোটটা চলিয়ে যাবে। কমসে কম টাকায় চার আনাসে কমতি হবে না, ত আপনি ভাবিয়ে লিন ওটা বাটা।"

ব্যবসা-বুদ্ধির প্রখরতা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। টাকায় চার আনা বাটা! প্রথমটা ভেবেছিলাম দরকার নেই, বলি নোটটা ফেরত দাও কিন্তু জাল নোটের কারবারে আমাকে জড়িয়ে দেওয়ায় পুলিশের ভয়ে আমি আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিলাম, তার ওপর পানওয়ালা যে রকম জোয়ান তাতে ওর কাছ থেকে নোটটা কেড়ে নেবারও উপায় নেই। গত্যন্তরে বলতে হল, 'তথাস্তু'। এখন ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি, যা পাওয়া যায়, তাই লাভ। পানওয়ালাকে জানালাম রেজকির ফেরতটা তাড়াতাড়ি দিতে।

বেআইনী ব্যবসায়ে লোকটা কত টাকা জমিয়ে ফেলেছে কে জানে? এই ভাবে অর্থ সঞ্চয়কে নিশ্চয়ই সদাচার বলা চলে না, মনকে স্তোক দিলাম এই ভেবে যে, পাপী যেভাবেই নিজেকে ভগবানের নাম নিয়ে প্রশ্রয় দিক, আসল ধর্ম্মের ঢাক বাজলেই খানাতল্লাসী আরম্ভ হয়ে যাবে। তখন গণেশ ওল্টালে বাছাধনের আজকের ঘটনা মনে পড়বে। ভবিষ্যতের সুবিচার কামনা ছাড়া প্রকাশ্যে কোন অভিশাপ দেওয়ার সাহস আমার ছিল না। টাকায় চার আনা বাটা মেনে নেওয়ার পর নোটটি একটী ছিদ্রযুক্ত কাঠের বাক্সে স্থান পেল, তারপর পানওয়ালা সামনের পিতলের বাটি থেকে এক মুঠো নয়া পয়সা তুলে নিয়ে গুণতে লাগল। পানওয়ালার ঘর থেকে যা বার হয় তা একাধিকবার না গুণলে চলে না। কোকাকোলার দাম বাদ দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত হিসাব আট আনাতে দাঁড়াল। পানওয়ালা নিশ্চিন্ত মনে তাম্রখণ্ডগুলি আমার হাতে তুলে দেওয়ার আগে অনেকগুলি বিঘ্ন ঘটে গেল। দেখলাম পান-বিড়ি বিক্রয় তার একটা অছিলা, আসলে বড় ব্যবসা থাকে গোপনে, কোন্ রাস্তায়, কোন্ বাড়ীতে কখন কোন্ প্রয়োজনীয় মানুষের সঙ্গে দেখা হতে পারে সে খবর পানওয়ালা রাখে এবং উপযুক্ত মানুষের চাহিদা অনুসারে খবর দিলে সঙ্গে সঙ্গে বেশ মোটা কিছু লাভ হয়ে যায়। খবর দেওয়ার দায়িত্ব ছাড়া ছোটখাটো বন্ধকী কারবারেও লোকটার হাত-যশ আছে। অগ্রিম সুদ নিয়ে দেনাদারকে অর্ধেক টাকা দিয়ে পুরোর হিসাবে সই করিয়ে নেয়।

স্বোপার্জ্জিত একটি গোটা হারানো টাকা ফিরে পেয়েও তার দুরবস্থা দেখে মন দমে গিয়েছিল। বাড়ী ফেরাও চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল। মাত্র দশ কি বারো আনা পুঁজি, তাই দিয়ে গোটা সংসারের বাজার সামলানো অসম্ভব। সুতরাং বাড়ী ফিরতে হলে হেঁটেই সারাটা পথ শেষ করতে হবে। অফিস বন্ধের লগ্নে ট্রাম বা বাসে স্থান পেতে হলে ভগবানের বরপুত্র হতে হয়। এ দিকটা বরাবর দেখেছি তাঁর পক্ষপাতিত্ব অন্যদিকে। ট্রাম বা বাসের ভিতরে স্থান না পেলেও ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো চলে, এবং লিখিত আইন না থাকলেও সকলেই জানে বিপদসঙ্কুল স্থানটিতে দাঁড়াবার জন্য ভাড়া দাবি নিষিদ্ধ। মানলাম, ভাড়ার খরচটা না হয় বাঁচল, কিন্তু ফুটবোর্ডে দাঁড়ালে ঝাঁকুনির সঙ্গে মাটিতে গড়াবার ইচ্ছে না থাকলে দেহে সমভার রক্ষার জন্য দুটো হাতই জোড়া রাখতে হয়। সেই সময় নয়া পয়সার ওজনে ভারগ্রস্ত দুমুখো পকেটকে সামলাবে কে? চৌরঙ্গীর কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম, চতুর্দ্দিকেই কেবল চলন্ত গাড়ি আর মানুষ, আমিই

কেবল ফুটপাথের প্রান্তে অচলায়তন হয়ে গিয়েছি। কিভাবে বাড়ী পৌছাব তাই ভাবছি এমনি সময় তীর্থযাত্রীপূর্ণ প্রাচীন কালের একটি থার্ডক্লাস বন্ধ গাড়ি আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। মোড়ে লাল বাতি জ্বলে ওঠায় সব গাড়ি থেমে গিয়েছিল। সামনের পাল্কি-গাড়ি মানুষে ঠাসা, ছাদ কিংবা ভিতরে একটি বাড়তি মানুষের স্থান নেই, এরূপ প্রত্যাশাও অন্যায়, কারণ মাথা-পিছু ভাড়ার সর্ত্ত না থাকায় একজনের কোলে আর একজন চেপে বসেছে। দূর দেশের গ্রাম থেকে ওরা এসেছে কলকাতার তাজ্জব শহর দেখতে। শহর দেখার সঙ্গে গল্পগুজব ও চানা খাওয়া চলছিল। এই কারণেই বোধ হয় পিছনের সহিসের যায়গায় কেউ বসে নি। জায়গাটি যেন আমার জন্যে খালি ছিল। বিচার করে দেখলাম এর চেয়ে আরামপ্রদ ভ্রমণ আমার আশা করা উচিত নয়, এখন কোন প্রকারে গাড়োয়ানের দৃষ্টি এড়িয়ে যথাস্থানে বসে পড়তে পারলেই হয়। এইরূপ চোরাই আরাম, বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ছোট ছেলেরাই নিয়ে থাকে। কিন্তু আমাকেও অবস্থার ফেরে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকতে হল। গাড়ীটা যাচ্ছিল কালীঘাটের দিকে, অনুমান ভুল নয়—কারণ সকলেই তীর্থযাত্রী। সকলের কপালেই মোটা তিলকের দাগ, কালীঘাট যেতে হলে ভবানীপুর পার হতে হবে। ঐ দিকেই আমার মেসের বাসা। উঠে ত বসলাম, কিন্তু আশঙ্কা পিছু নিয়ে রইল। থার্ড ক্লাশের গাড়োয়ানেরা বেজায় ধূর্ত্ত মানুষ, পিছনে চোখ না থাকলেও দেখে। অনুভূতি অদৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করিয়ে ছাড়ে। গাড়ি যেভাবেই বোঝাই হোক, চালাক গাড়োয়ান বাড়তি মানুষের ওজন ঠিক বুঝতে পারে। আমার মত ভদ্রসন্তান আত্মমর্য্যাদা খুইয়ে সহিসের আসনে বসলেও পরিত্রাণ নেই! আন্দাজেই সব দেখে চাবুক চালিয়ে দেয়, উপস্থিত ক্ষেত্রে রক্ষা এই যে, ঘোড়ার বদলি মানুষকে মারতে গেলে কয়েকজন ছাদের যাত্রীর কপালেও চামড়ার চাবুক ছুঁয়ে যাবে। দেউল থেকে পাওয়া সিঁদুরের তিলকে অস্পৃশ্য চামড়ার ছোঁয়া লাগলে একটা হৈ চৈ বেধে যাওয়া সুনিশ্চিত। অতএব গাড়োয়ানের ইচ্ছা থাকলেও চাবুক চলবে না।

আরামেই যাচ্ছিলাম, তবে মাঝে মাঝে দৈত্যের মত বিশালকায় ডবল ডেকার বাসগুলো চাপা দেবার জন্য তেড়ে এলে ভগবানকে স্মরণ করতে হচ্ছিল। পুরোহিত মারফৎ Through proper channel আবেদন পাঠালে খবর পৌছবার আগেই red tapism-এর আইন আমায় চাপা পড়িয়ে ছাড়ত। কিন্তু direct appeal-এ ফল ভালোই পাওয়া গেল। বেঁচে গেলাম। বাড়ীর মত গাড়িগুলো পাশ কাটিয়ে চলে গেল। রাস্তা আর ফুরোতে চায়না, পিছনের যত গাড়ি আমাদের ফেলে এগিয়ে চলেছে; এই ত হ'ল থার্ড ক্লাস ছ্যাকরা গাড়ির বৈশিষ্ট্য, তবে পিছিয়ে থাকলেও চলে এবং কোন প্রকারে গন্তব্যস্থানে মাটির ঠিকানায় পৌছিয়ে দেয়। দ্রুতগামী নয় বলে অভিযোগ করা চলে না। দানাহীন হাড়-বের-করা ছাগলের মত ঘোড়ার ওপর চাবুক চালালে গতির কিছুমাত্র প্রভেদ হয় না। যাই হোক, আমিও ধীরে-সুস্থে তাজ্জব শহরের নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি এসে পৌছে গেলাম। চৌমাথার মোড়ে আসতেই লালবাতির সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশে সব গাড়ির চলৎশক্তি অসাড় হয়ে গেল। সামনে বোধ হয় কোন একটা Accident ঘটেছিল। অচিরাৎ নীলবাতি জ্বলার কোন আশা না থাকায় আমার আসন থেকে নেমে পড়লাম। যেটুকু সময় গাড়ি থেমেছিল তাতেই কয়েকটি ডেঁপো ছোকরা আমাকেই সহিসের আসনে বসা দেখে হেসেই লুটোপুটি। ওদের ভ্রূক্ষেপ করি নি, এমনি সময় চাবুকের ডগা গাড়ির পাশ থেকে আমার মুখের কাছে এসে পড়ল। বুঝলাম এটা গাড়োয়ানের অভ্যাস-দোষ, দ্রুত নেমে পড়ে একটু নিরাপদ দূরত্বে পৌছানোর পর মনে হল আর একবার চাবুক চালালে গাড়োয়ানকে একবার দেখে নিতাম। পুলিশের দৃষ্টি টেনে এনে লোকটাকে জানিয়ে দিতাম লাভের টাকা বাড়ানোর জন্য যতখুসী সোয়ারি নেওয়া চলে না। জানোয়ার হলেও ঘোড়ার বহন-শক্তির একটা সীমা আছে, তার বাইরে ওজন চাপালে আইনের খপ্পরে পড়তে হয়। গাড়োয়ানকে শাস্তি দেওয়ার কথা ভাবতে-ভাবতে অনেকটা এগিয়ে এসেছিলাম। বিবেচনা করে দেখলাম চাবুক আমার মত সোয়ারিকে লক্ষ্য করে চালালেও আমার মুখে ত লাগে নি সুতরাং এই নিয়ে কোন ঝামেলা না করাই ভাল।

খ

পরের দিনের কথা। মশা আর ছারপোকা সারারাত গা ঘেঁষে থাকায় ওদের ইচ্ছামত কামড়ে ভাল ঘুম হয় নি। শেষরাত্রে উৎপাত সহ্য করতে না পেরে ঘরের সামনের রোয়াকে মাদুর নিয়ে এসেছিলাম মুক্ত আকাশের তলায় ঘুমের ব্যাঘাতটা পুষিয়ে নেব বলে। আমাদের রোয়াকটি একটি নিরিবিলি গলির ভিতর, এমন রাস্তা যে কালে-ভদ্রে ময়লা-ফেলা গাড়ি ছাড়া অন্য কোন যান এদিকে চলে না। তবু গলির একধারে ফুটপাথ আছে। ফুটপাথের গায়ে লাগাই আমাদের রোয়াক, লম্বায়-চওড়ায় তেমন কিছু নয়, তবে কয়েকজন মিলে বৈঠকি আসর সরগরম করে তোলা যায়। সমস্ত দিন অফিসের খাটুনির পর সন্ধ্যার দিকে ক্লান্তি লাঘবের জন্য ওইটুকু আমাদের সম্বল। মুখরোচক ভাষার সহযোগে পরকীয়ার আলোচনায় আমরা কৃষ্টির সাধনা করে থাকি। নিরীহ উত্তেজনায় সময়টা কাটে ভাল।

যথাস্থানে এসে দেখি রোয়াক বেদখল হয়ে গিয়েছে, গৃহহীন ভবঘুরের দল দিব্যি নিজেদের শোবার ব্যবস্থা করে পরমানন্দে ঘুমের ঘোরে বিভোর হয়ে আছে—অতিথি-সেবার জন্য গভীর রাত্রে গৃহস্বামীকে অযথা বিরক্ত করে নি, অনাহূত অতিথিদের কৃপায় সমস্ত রোয়াকটাই প্রায় ভরে গিয়েছে, যেটুকু জায়গা খালি ছিল তাও পাড়ার ঘেয়ো কুকুরটা নিজের ব্যবহারে লাগিয়ে নিয়েছে।

অন্নসন্ধানী জানোয়ারটা পাড়া ঘোরায় ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমাদের রোয়াকে এসে শুয়ে পড়ে। মেসের সকলেই তা জানে, কেউ আপত্তি করে না বরং আহারের পর উচ্ছিষ্ট যা থাকে তা কুকুরটাকে ছুড়ে দেওয়া হয়। এই কারণে আমাদের বাসার অনেককেই কুকুরটা চেনে। কুকুরটাকে আশ্রয় দিয়ে আমাদের অনেক উপকার হয়েছিল। বস্তির লোকেরা জানোয়ারটিকে পাগল সাব্যস্ত করেছিল, কারণ স্থানীয় টলায়মান মাতাল রোয়াকের দিকে আসছে দেখলেই কুকুরটা আর্তনাদ করে উঠত। মাতালও বেরসিক ভেবে নিজের টলা পা-কে ভিন্ন দিকে টলিয়ে দিত। কুকুরটা অজ্ঞাতে আমাদের উপকার করলেও আজ ওর উপস্থিতি মোটেই ভাল লাগল না, নিদ্রারত মানুষদের জাগিয়ে তুলে আমার অধিকারের কথা বলতে সাহস পাই নি। রোয়াকে ওদের বেআইনী দখলের কথা তুললেই বলে বসবে রাস্তার ধারে রেলিংহীন রোয়াক মানেই ক্লান্ত পথিককে বিশ্রাম দানের স্থায়ী আমন্ত্রণ। বিশ্রামের আরামে যদি অবসাদগ্রস্ত মন শরীরকে শুইয়ে দেয়, তা হলে শয়নকে ক্লান্তের ন্যায্য পাওনা বলে মানতে হয়। মোক্ষম যুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা চলে না, কারণ ঘুম ভাঙালেই ওরা দলবদ্ধ হয়ে আমাকে বলপ্রয়োগে আমার অনধিকার চর্চ্চার কথা বুঝিয়ে ছাড়বে।

কুকুরটা আমার উপস্থিতি জানতে পেরে চেনা লোকের কাছ থেকে আদরের আশায় লেজ নাড়তে লাগল। ঘায়ে-পচা লেজ পায়ের ওপর দুচারবার আছাড় খেতে অস্পৃশ্যের ছোঁয়ায় গা ঘিন ঘিন করে উঠল। দিলাম কষিয়ে একটি মনোমত লাথি। কুকুরটার আর্তনাদ করারও শক্তি ছিল না, পিঠের ওপর সজোরে পদাঘাত পড়তেই 'কুঁক' করে উঠে দূরে পালাল।

যাক, শেষ পর্য্যন্ত শোবার একটু জায়গা পাওয়া গেল। পা ছড়াবার স্থান না থাকলেও মাদুরের ওপর গা এলিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রাবেশে অভিভূত হয়ে পড়তে লাগলাম। সবে বয়েস কমানো স্বপ্নের এলাকায় এসে পৌঁছেছি, এমনি সময় শূন্য থেকে সবেগে একটি হাওয়াই চাঁটি আমার মুখের ওপর এসে পড়ল। ওজনহীন মারে চোখ খোলার আগেই বুঝলাম খবরের কাগজ পৃথিবীর বার্ত্তা বহন করে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

খবরের ডাকে উঠে বসতে হল। তখন সকাল হয়ে গিয়েছে, প্রত্যহ কাগজওয়ালা চলন্ত বাইসাইকেল থেকে এইভাবে রোয়াকের ওপর দৈনিক পত্রিকাটি ছুড়ে ফেলে দেয়। এটা কি কাগজ-বিক্রেতার সুবিধার কথা,

তৃতীয় ব্যক্তির প্রশ্ন করার অধিকার নেই। বাইসাইকেল থেকে প্রতিবার নেবে প্রত্যেক বাড়ীতে মালিকের হাতে কাগজ তুলে দেওয়ার প্রত্যাশা বাড়াবাড়ি বলতে হয়।

কাগজওয়ালার কথা ভেবে কোন লাভ নেই, পত্রিকাটি আমি নিয়মিতাবে পড়ে থাকি, নিজেকে well-informed বলে আত্মশ্লাঘা সংগ্রহ করে থাকি। চলন্ত সিনেমা তারকাদের ইভনিং পার্টি থেকে আরম্ভ করে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলোয়াড়দের বহুবিধ কৌশলের কথা পড়ি, তা ছাড়া আদালতের আদিরসাত্মক মামলার খুঁটিনাটি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠান্তে স্মরণীয় করে রাখি। চারিত্রিক নীতির বিরুদ্ধাচরণ সম্বন্ধে লোমহর্ষকর ঘটনার বিবরণ সব সময় কাগজে বিশদভাবে ছাপে না বলেই যা উহ্য থাকে তা কল্পনার সাহায্যে মনোমত গড়ে নিতে হয়। এটা নিরবচ্ছিন্ন মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ, যার জন্য মস্তিষ্ককে ভালভাবেই খাটাতে হয়—লোকে বলে এই জাতীয় চিন্তাশীলতা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকারী। আমারও এ বিষয়ে দ্বিমত নেই।

প্রথম পাতা ওলটাবার পরেই দেখি বেশ বড়-সড় করে মানিকদার লোমশ মুখটি ছাপানো হয়েছে। দাড়ির বিজ্ঞপ্তি দেখলে যে কোন যশোলোভীর ঈর্ষ্যান্বিত হবার কথা। দাদার চেহারার এপাশে-ওপাশে নানারকমের হিজি-বিজি ছাপানো হয়েছে। গোটাপাতা জুড়েই দাদার গুণকীর্ত্তন। কৌতূহলকে সামলে রাখা সম্ভব হল না। দাদার খবরটাই সর্ব্বাগ্রে পড়তে সুরু করে দিলাম। তাঁহার জন্ম-তারিখ, শিক্ষা, বংশ-পরিচয় ইত্যাদি বিবৃতি শেষ করে লেখক ছবির বিশ্লেষণ সুরু করেছেন। এতক্ষণে বুঝলাম খবরের কাগজে হিজিবিজি ছাপা হলেই তাকে ছবি বলে মানতে হয়। ছবিগুলির নামও রহস্য জড়ানো। সমালোচকের তাল-ঠোকা সমঝদারি বুলি আরও বিস্ময়কর। ভাষা যেন দর্শককে বলতে চায়, যা বলি তা শোন এবং তা বোঝো, অন্যথায় গিলিয়ে বোঝাব। ঠাসা বন্দুকে (Muzzle-loader gun) বারুদ ঠাসার মত। বারুদের ওজন ঠিক না থাকলে ঘোড়া (Trigger) টেপার পরে যে নলও ফাটতে পারে এ খবর অধিকাংশই আধুনিক সমালোচকরা ভাবেন না। কিংবা ভাবতে চান না। যাই হোক, জন্মতারিখ হিসাব করে দেখলাম বয়স সম্বন্ধে যে বৎসরের হিসাব ছাপা হয়েছে—তা দাদার হাঁটু পর্য্যন্ত এসে পৌছায়। বাকি দেহটা কি তা হলে ভৌতিক ব্যাপার।

সত্য কথা লুকাবো না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বলতে হয় দাদার বয়েস হয়েছে। তবে কোনকালে যৌবনের সঙ্গে যে রীতিমত দহরম-মহরম ছিল তা বর্ত্তমান গোঁফের তোয়াজ দেখলেই বোঝা যায়। সাহেবি চালে চাড়া দেওয়ার মত ডগা একেবারে কড়ি-বড়গার মত সোজা। শেষের দিকে ছুঁচলো, পাশ দিয়ে লোক চললে খোঁচা লেগে যায়, কিন্তু সে যুগ পার হয়ে কালের গতি এখন যেখানে এসে পৌছিয়েছে এবং ধাবমান সময়ের প্রতিক্রিয়ায় তাঁহার দৈহিক গঠনের ও মুখশ্রীর যে পরিবর্ত্তন হয়েছে তাতে কলপের যুগ দিয়ে আসল যৌবনের সঙ্গে সোহাগ চলে না। কলপ লাগিয়ে নিজের মনকে যেভাবেই চোখ ঠারুন, আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই। দাদা তাজা হয়েই বাঁচুন এইটিই আমরা চাই, তাই বলে বিনা নোটিশে রাতারাতি 'জিনিয়াস' হয়ে যাবেন, সাধারণের গণ্ডি থেকে ঊর্দ্ধলোকে চড়ে বসবেন, আর আমরা ওই মহাশিল্পীর পাড়ায় থাকি বলে নিজেদের পরিচয় হারিয়ে বলতে হবে আমরা অমুক শিল্পীর পাড়াপড়শি, দুবেলা দেখা হয়, আমাদের সঙ্গে কথাও বলেন। সব সমানের যুগে এতটা অসহ্য।

পটুয়ারাও শিল্পীর মত কারিগর, ওরা বুঝে-সুঝে জাঁকের ডঙ্কা বাজায়, জিনিয়াসের ঝাঁঝে তেজে ওঠা মৌলিকতা ওদের মাতাল করে দেয় না। শোনা যায়, আত্মশ্রদ্ধার তাড়নায় জিনিয়াস নিজেকে একঘরে করে ফেলে। তার উপর চালাক সমালোচকের বেপরোয়া বিশেষণের তোয়াজে যদি মাথাটা ধড়ের উপর না থাকে, তা হলে যে মানুষ গুণকীর্ত্তনে অযথা উদার হয় তাকে পরবর্ত্তী ঘটনার জন্য দায়ী করা উচিত। আসল কথা, তৃতীয় ব্যক্তির স্বার্থের চক্রান্তে পড়ে গেলে, আপনভোলা জিনিয়াস প্রশংসার মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে খ্যাতির কারাগারে নিজেকে বন্দী করার জন্য। হুঁসিয়ার সমালোচক পাহারায় থাকায় প্রাণপণ চেষ্টা করলেও মুক্তির আশা নেই। ঘটনাটি কতকটা স্বখাত সলিলে ডুবে মরার মত।

রাজনৈতিক ব্যাপারে নোটিশ দিয়ে অনশনে আত্মঘাতী হওয়ার প্রথা আছে, শিল্পজগতে এইরূপটি ঘটবে কেউ ভাবে নি। যাই হোক, একটা সান্ত্বনা এই যে জিনিয়াস মরেও মরতে চায় না। অতএব যেভাবেই সমালোচকের প্ররোচনায় মহাশিল্পী নিজের পরিণতি সৃষ্টি করুক, একান্ত মরার মত না মরলে নিজেকে নিয়ে সে যা খুশী তাই করতে পারে। ফলে নবাগত জিনিয়াসের তাড়নায় আইন রক্ষা করা পর্য্যন্ত বেয়াকুব বনে গিয়েছে।

ভেবে দেখ কাণ্ডটা, কেন রে বাপু—মৌলিকতার নেশায় মাতাল হওয়াই বা কেন, এবং বেহুঁশ অবস্থায় ছবির নকশায় তালগোল পাকিয়ে একটা অবোধ্য কিছু করায় বাহাদুরিই বা আছে কি? আমরা ত বুঝি ছবিতে আসলে শিল্পী কিছু বলতে চায়, বলার কথা শোনার জন্য কেউ যদি উৎসুক না হয় এবং চেষ্টা করেও যদি বক্তব্যকে বুঝতে না পারে, তা হলে স্বীকার করতে হয় বলার মধ্যে কোন গোল আছে, কিংবা যে বুঝতে চায় তার ভাষায় দখল নেই—এ ত গেল আমাদের কথা। ওরা বলে, যা বুঝবে না তা নিয়ে মাথা ঘামাও কেন? জিনিয়াসের কাজ জনসাধারণের জন্য নয় এবং সুন্দর হলেই সে কতটা সুন্দর তা বোঝার জন্য মাথা ঘামাতে হবে এমন কোন সর্ত্ত রসগ্রহণের নীতিতে নেই। রসগোল্লা কিংবা সন্দেশ খেয়ে চিনির পরিমাণের ত কেউ খবর নিতে যায় না। কোকিলের ডাক শুনে কোন্ পর্দ্দায় তার কণ্ঠধ্বনি বার হচ্ছে এ বিষয়ে চিন্তা অবান্তর, কারণ কোকিলের ধ্বনিই রসোচ্ছ্বাসকে নাড়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এসব কথা শুনলে মাথা গুলিয়ে যায়। কথা শুনব অথচ তার মানে থাকবে না, এমনটি ত পাগলের উক্তিতেই মানায় ভাল। এদিক দিয়ে পটুয়াকেই বলব আমাদের আপনজন, ওরা সোজা মানুষ, নিজেদের আঁকা ছবি বারবার নকল করতে পারলেই সন্তুষ্ট এবং নকলের স্বীকারোক্তিতে গর্ব্বের অংশও যথেষ্ট থাকে। ওইটুকুই ওদের জীবিকা উপার্জ্জন, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সম্বল। বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত নকলের পেশা চালিয়ে আসছে, হুবহু নকলই হল ওদের কারিগরির সম্পদে খাঁটি জিনিষ। নতুন হাওয়ার ঝটকা টানে ওরা যদি নকলনবিশী ছেড়ে নতুন কিছু করতে যায়, তা হলে অচেনা দেব-দেবীর পট দেখে পিসীমা প্রণাম করবে না, ফলে বিকিকিনির কারবারে গণেশকে উলটিয়ে বসাতে হবে। সরস্বতী ঠাকরুণের আড়াল দেওয়া আধুনিকের স্বচ্ছ পরিচ্ছদে চিত্তাকর্ষক নগ্নরূপের আভাস দেখে পুরুত ঠাকুর মন্ত্র ভুলবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ ছাড়াও আছে, দুর্গার পূজায় অসুর সংহারে কোন এক মাপে বাঁধা বিশ্বশ্রীকে যদি চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে মা দুর্গা সংহারের বদলে অসুরকে কৃপার পাত্র ভাবতে পারেন কারণ তার সাজোনো মাংস-পেশীর তলায় যা থাকে তা শক্তির ভেজাল, সব ফাঁপা। কুস্তির আখড়ায় এই রকম একটি শ্রীমণ্ডিত ব্যক্তিকে একজন ছোটখাটো জোয়ানের কাছে আছাড় খেতে দেখেছি, সে আছাড় কি সোজা আছাড়, একেবারে পিণ্ডি-চটকানো।

এতক্ষণ পটুয়াদের কথা বললাম, কারণ এদের কথায় গল্পের উপর জুলুম এসে পড়লেও তা মানতে হবে, আমি নাজেহাল হয়েই ওদের দিকে হেলেছি।

আসল কথা, ব্যবসার খাতিরে পটুয়াদের ব্যক্তিগতভাবে হামবড়ায়ের ইচ্ছা থাকলেও দম্ভটা ঘরোয়া চালে আটপৌরে করে রাখতে হয়। সমালোচকের সাহায্যে মৌলিকতার প্রচার কাগজে কাগজে বার করা চলে না। এ বিষয়ে অনেক কিছু বলার আছে। পটুয়াদের কাজ ছাড়ান দিয়ে হিজিবিজি সম্বন্ধে সমালোচক কি লিখেছেন দেখা যাক। কয়েকটা ছবির উপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। এই সময় ভাগের খবরে ভাগ বসাবার জন্য মেসের আরও কয়েকজন বাসিন্দা আমার পাশে এসে বসলেন। এক নম্বর ছবির নাম 'অনন্ত', বিরাট দামী ক্যানভাস, শত শত ছোট-বড় ছিদ্রে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এক জায়গায় ত্রিকোণাকারে কাটা অর্দ্ধ উন্মীলিত জানালার মত ঝোলায়মান ক্যানভাসের টুকরা দর্শকের দিকে হেলিয়ে দেওয়া আছে। এটা অনন্তলোকের অজ্ঞাত পর্দ্দানশীন আত্মাকে মর্ত্ত্যের দিকে উঁকি মারার ব্যবস্থা হতে পারে। ক্যানভাসের তলায় একটি তোবড়ানো বাইসাইকেলের চাকা অদ্ভুত প্রথায় লাগানো হয়েছে, ছোট ছেলেদের কাগজের খেলনার মত হাওয়া লাগলে আপনা থেকেই মৃদু দোলে, দোলায় কি সঙ্কেত আছে

সনাতন বিড়ার বাঁধনে কেশবিন্যাস

জটার সেবায় সৌখীন বৈরাগ্য

জানি না, সাইকেলের চাকার কাছেই একটি বৃহৎ খাগড়াই পালিশকরা উজ্জ্বল কাঁসার থালা, জ্যোতির্ম্ময় পদার্থটি হয়ত সূর্য্যের স্থান দখল করেছে এবং ছিদ্রগুলি সৌরজগৎ ও তার বাইরের তারকামণ্ডলীর প্রতীক।

ভুল হল, বোঝার দিককে একটু বাস্তবমুখী করে দিলাম। শুনেছি জিনিয়াসরা পাগলের কাছাকাছি হয়, কথায় কথায় রাগে, কথায় কথায় হাসে, কথায় কথায় কাঁদে, ওদের উচ্ছ্বাস ও সৃষ্টির প্রেরণা কখন যে কি করে তার ঠিকানা নেই। বিচার করে দেখলাম মৌলিক সৃষ্টির চিন্তায় ব্যর্থতা রূপস্রষ্টাকে ক্রোধোন্মত্ত করে তুলেছিল, ফলে ক্যানভাসের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা। কিন্তু সমালোচকের ব্যাখ্যায় ব্যর্থতা বা হতাশার কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং ধরে নিতে হবে আত্মশক্তির উপর অতিবিশ্বাসই ক্যানভাসের এই দুরবস্থা ঘটিয়েছে। ছবির উপকরণগুলি জোড়াতাড়া দিয়ে আবার অনন্তকে খোঁজার কাজে লেগে গেলাম। নিশ্চয় হেঁয়ালি টপকাতে পারলেই একটি বিরাট সত্যের মাঝখানে গিয়ে পড়ব। দৃঢ়সঙ্কল্প সহায় ছিল, ঠিক করেছিলাম যেমন করে পারি অজানা অনন্তের সঙ্গে একলা বোঝাপড়া করে নেব। সদ্যজাগ্রত সমালোচকরাও ত নয়াপন্থী, ওরা আবার পটুয়াদের চেয়েও দক্ষ নকলনবীশ, ওদের চিন্তা বাইরে থেকে আমদানি—একেবারে টাটকা প্যাকিং খোলা মাল, নিখরচায় Import, সুতরাং হিসাবহীন বিশেষণের ব্যবহারে ওদের পুঁজি খালি হয় না, তারপর প্রশংসার ওজনে ছবির আসল গুণ যদি দম বন্ধ হয়ে মরার পর প্রাণহীন রূপের পচাগন্ধে আমার মত একটি নিরীহ প্রাণীর আত্মাকে খাবি খাওয়াতে থাকে তা হলে নিজের বিচারের উপর নির্ভর করাই যুক্তিসঙ্গত। সূক্ষ্মানুভূতির শরণাপন্ন হয়ে অনন্তকে অন্তরে উপলব্ধির জন্য খোলা চোখ বন্ধ করে দিলাম। তাতেও কি অনন্তের খোঁজ পাওয়া যায়? মনের চোখ দিয়ে যেদিকে তাকাই সেই দিকেই দেখি ভীতিপ্রদ অতল গহ্বর। গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, ওদিকে এগুলেই নয় তলিয়ে যেতে হবে, অথবা দিশাহারা হয়ে নিজেকেই খুঁজতে থাকব। তখন ওই থালার কাল্পনিক জ্যোতির্ম্ময় রূপ থেকে যে তীব্র রশ্মি বার হবে তা আমার চোখ ঝলসিয়ে দেবে, তখন আমার কাছে আলো ও অন্ধকার সব একাকার হয়ে যাবে। আমি যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই থেকে যাব। চিন্তা আরও গাঢ় হয়ে উঠল, মাথাটা টিপ টিপ করতে আরম্ভ করেছে, আশঙ্কান্বিত হয়ে ভাবতে লাগলাম আধুনিক আর্টের প্রগতিশীলতার প্রকোপে নিরীহ মানুষ যে এইভাবে নির্য্যাতিত হয় তা জানা ছিল না। আর বেশীক্ষণ অনন্তের খোঁজে থাকলে অসময়ে ডাক এসে যাবে, হয়ত ওই তোবড়ানো বাইসাইকেলের চাকায় চড়িয়ে আমাকে অনন্তের দিকে ছোটাবে। টাল-খাওয়া বাইসাইকেলে চড়লে বাহন ও বাহক উভয়ই টাল খেতে থাকবে, চাকা কিন্তু চলবে না।

দ্বিতীয় নম্বর ছবির নাম 'মিলন'। ছবিটা আদিরসাত্মক রহস্যের ঘোরপাকে পড়েছে, রূপের অস্পষ্ট ইঙ্গিত কল্পনাকে পুলকমিশ্রিত উত্তেজনায় ভরিয়ে তুলল, ছবিতে যা নেই তাই বাসনা তৃপ্তির প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। সমালোচক যদি কল্পনার কান মুচড়ে খুশীমত রূপ দেখেন এবং ভাষার কেরামতির সাহায্যে কৌতূহলী অবুঝ দর্শককে রসোপলব্ধির ইচ্ছামত দীক্ষা দিতে পারেন, তা হলে আমার নিজের মতকে অবহেলা করব কেন? যুক্তি-সঙ্গত মনে হতেই নজর অন্তর্ভেদী হয়ে উঠল। দেখলাম, নিষিদ্ধের বাহ্যিক প্রকাশ, ছবির এলাকায় শালীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। রেখা ও রূপের জড়ামড়িতে কি একটা ঘটছে, এমন একটা কিছু, যা লোকচক্ষুর সামনে সোজাসুজি দেখার উপায় নেই। সর্ব্বসমক্ষে সাধারণের সামনে চরিত্র ধ্বংসকারী ছবির বে-আব্রু উদ্দেশ্য দেখে নিজের প্রতি লজ্জা এসে গেল। ভাবলাম, আমার নজরের ওপর কারুর দৃষ্টি পড়ে নি ত? কাছেই আমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত প্রবীণ মেসের বাসিন্দা বসেছিলেন। তিনি বললেন, 'ছবিটা যখন ক্যানভাসের ওপরই আঁকা তখন একটা কোণ কেটে ওদের লজ্জা নিবারণের কি সুবিধা হয় না আর একজন পাশেই ছিলেন, তিনি বোধ হয় বড়দরের সমঝদার, একটু বিরক্তির স্বরেই উত্তর দিলেন, 'তোমার মনকে কাপড় পরাও হে। আর কিছু না হোক ছবির রসকে বেইজ্জত করার ইচ্ছা থাকলে ভগবানের কাছে কামনা করব তোমার চোখে ছানি পড়ুক।'

বাতিকগ্রস্ত দৃষ্টির ওপর ছানি পড়িয়ে দেওয়ার ঘরোয়া বিবাদের সূত্রপাত হল, যার সঙ্গে গল্পের বিশেষ যোগ নেই সুতরাং পরের ঘটনার দিকে এগোই।

(গ)

দাড়ির কৃপায় দাদার অভাবনীয় প্রতিষ্ঠা লাভ, তার সঙ্গে দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় অহরহ যশকীর্ত্তন আমার অন্তর্দাহকে প্রায় স্থায়ী রোগে পরিণত করে সারল। পরশ্রীকাতরতায় কখনও ভুগি নি এমন কথা বলি না কিন্তু সে জ্বালা ছিল সাময়িক, সিনেমা বা ফুটবল ম্যাচ দেখার জন্য পাসের সুবিধা পেলে পরের ভালোকে ক্ষমা করতে পারতাম। কিন্তু দাদার গুণকীর্ত্তন সবসময় পিছু লেগে থেকে আমাকে প্রতিনিয়ত নত করিয়ে রাখার দরুন মনে হল রোগটা মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তারকে দেখানো ভাল। কিন্তু যে রোগের কোন বর্ণনা দেওয়া যায় না সে বিষয় ডাক্তার খোঁজ নিয়ে যদি কিছু না পায় তা হলে বলে বসবে রোগটা এলার্জিক। তারপর রোগের প্রমোশন ত আছেই। তখন বড় ডাক্তারের দক্ষিণা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে। শেষ পর্য্যন্ত ভাবলাম, লুকিয়ে দাদার সঙ্গে দেখা করি। তিনি হাজার হোক এখন উর্দ্ধলোকবাসী, আমার মতন গরীবকে কিছু মতলব বাতলে দেওয়ায় বাধা আসবে না। দাদার আর্থিক উন্নতি এবং মার্জ্জিত সমাজে যে প্রতিপত্তি পেয়েছেন তাতে নিশ্চয় কোন মন্ত্রশক্তি তাঁকে সৌভাগ্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। সেদিনই আমাদের রোয়াকের বৈঠকে শুনলাম পাড়ার ঝুনো খবরী গজেন বললে, 'শুনেছ হে তোমাদের মানিকদার কারবার, এখন তার মাটিতে পা পড়ে না, নিত্য নোতুন মোটর চড়ে ঘোরে, কোন কোন দিন দেখি লোকটার গা ঘেঁষে বসেছে যৌবনে ঝলসানো মেয়ে। আমাদের পাড়ার খেঁদী, টেঁপী, পোটলীর সঙ্গে কেমন সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়, তথাপি মেয়েটি ফ্যাসনের ছাঁচে ফেলা জীব। একবার দেখলে দুবার দেখার ইচ্ছা আসে, গঠনকে যেন ফাঁপিয়ে তুলে চিত্তাকর্ষক করা হয়েছে। যৌবনকে আঁকড়ে ধরার ব্যবস্থায় এমন কৌশল আছে যাতে মনে হয় constant repair চললেও সৌন্দর্য্য চির নূতন থেকে যাবে, এ যেন চিরযৌবনা উর্ব্বশী ঠাকরুণের মর্ত্ত্যে আগমন। এ ত গেল সরস কেলেঙ্কারীর কথা, বাসি হয়ে যাবার ভয়ে টাটকা খবরটা দিয়ে দিলাম। এ বিষয় বেশী বললে তোমাদের হ্যাংলামি মেটাবার জন্য একটা গল্পই ফাঁদতে হবে। সেদিন দেখি সেই ছোকরা সমালোচক, যে সব সময় টাল খেয়ে চলে এবং যার কাজ হল কেবল জিনিয়াস গড়া, মানিকদার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একদৃষ্টিতে শ্যাওলা-পড়া বালি-খসা পুরাণো দেওয়ালের দিকে ধ্যানমগ্নের মত নতুন রূপের নক্সা খুঁজছে। আমারও মনে হল ওই ছোকরার দেখার মধ্যে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আছে, ওই দেওয়ালে প্রাচীন চীনাদের আঁকা ছবির ইতিহাস খুঁজে পেয়েছে। চীনকে নাগালে না পেলেও আধুনিক আর্টের নক্সা নিশ্চয়ই ওই ফাটা দেওয়ালের মধ্যে রূপ নিয়েছে। ছোকরা যখন সুন্দরের সন্ধানে আত্মহারা সেই সময় প্রকাণ্ড এক ঘরোয়া মোটর এসে মানিকদার দরজার সামনে দাঁড়াল। খোলা গাড়ি, খাঁটি সাহেব পিছনের সিটে বসে, গাড়ির ভেঁপু শুনে ছোকরা সাহেবের দিকে মুখ ফেরাল। মোটর গাড়ির চালক সেও সাহেব, পিছনের সিটের দরজা খুলে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। সমালোচক ও সাহেবের মধ্যে জানার-স্বীকৃতি আদান-প্রদানের পর সওয়ারী সাহেব গাড়ি থেকে নেমে এলেন। ইতিমধ্যে সাহেব ও সমালোচকের আগমনবার্ত্তা কেমন করে যথাস্থানে পৌছিয়ে গিয়েছিল।

অল্প সময়ের ভিতর মানিকদার বাড়ীর দরজা খুলল এবং পূর্ব্ব বর্ণিত ছবির ক্যানভাসের টুকরার মত রাস্তার দিকে একটু হেলে গেল। বোধ হয় দরজার দু' একটা কব্জা বিকল হয়ে থাকবে। দেখলাম, মানিকদা সাংঘাতিক মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে মুখ বার করলেন। আশে-পাশে সন্দিগ্ধ (reconnoitrer-এর) দৃষ্টি ঘুরে আসার পর গোটা দেহটা বেরিয়ে এল। একেই কণ্ঠনৃত্যের মুদ্রাদোষ, সব সময়ে গলা জড়িয়ে থাকে, তার উপর অনভ্যস্ত সাহেবি গলার ফাঁসের (নেকটাই) অস্বস্তিকর বাহার তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। মাথার ঝাঁকুনিটা আরাম খোঁজার ব্যর্থতায় বিরক্তিকর অভিযোগ—

এ কথা আগেই বলেছি। কিন্তু বিরক্তিপূর্ণ মুখে কণ্ঠের তেড়ে ওঠা ঝাঁকুনিতে সহজে অনুমান করা চলে উহা বিশিষ্ট অভ্যাগতকে গলা ধাক্কা দেবার ইঙ্গিত। অতটা না হলেও ধরে নেওয়া চলে 'সামনে থেকে দূর হও'।

এইরূপ অশোভনীয় অভ্যর্থনার পর সাহেব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি ধরে নিলেন প্রত্যাশিত অতিথির প্রতি ভারতীয় ভদ্রাচার এইভাবেই প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তিনি খুশীই হলেন এবং ঠিক করে নিলেন বর্ব্বরতাই কৃচ্ছ্রসাধনে ভারতীয়দের একটি বিশেষ সম্পদ। হৃষ্টচিত্তে তিনি ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নোটবুকে তাড়াতাড়ি লিখে নিলেন। সমালোচক সবই লক্ষ্য করছিল, তার বুঝতে বাকি রইল না একটা অপ্রীতিকর কিছু নথীবদ্ধ হয়েছে, কারণ সাহেবকে শহরের জ্ঞানী ও গুণীদের সহিত পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভার পড়েছিল সমালোচকের উপর। এটা সরকার-দত্ত সম্মান কি না এখনও জানা যায় নি। গুণী ও জ্ঞানীদের সহিত পরিচয় হবার আগে ও পরে এইভাবে অনেক তত্ত্ব সাহেব ইতিপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং অনেক ভুল বা মনগড়া সংবাদও ইতিমধ্যে পরদেশে চলে গিয়েছে। যাই হোক, সমালোচকের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ও দেশপ্রীতি সজাগ থাকায় নতুন গলদকে প্রশ্রয় দেবার ইচ্ছা ছিল না। তাই সাহেবের সহিত দৃষ্টি বিনিময় হতেই ঘটনাটি সহজ করার জন্য মাত্র একটি কথা উচ্চারণ করলেন 'জিনিয়াস', অর্থাৎ আপনভোলা চিন্তাশীল রূপস্রষ্টার পক্ষে কিছুই অশোভনীয় নয়। তার ব্যবহার সত্যই ভদ্ররীতির বাইরে গেলে ধরে নিতে হবে ঐ রূপটিই প্রয়োজন ছিল।

জিনিয়াস যে চলতি নিয়মে চলে না তা সাহেব জানতেন। সুতরাং বিচারে ভুল হওয়ায় নোট বুক বার করে যা লিখেছিলেন তা কেটে দিলেন। তারপর অবনত মস্তকে অভিজাত-সুলভ সাহেবি-কেতায় নমস্কার করলেন। বিনম্র আচরণের দৃশ্যটি দাঁড়ালো বেতো রোগী কোমর ভাঙা অবস্থায় পিছন দিকে বেদনার স্থলে হাত রেখে যন্ত্রণার অনুভূতি আরেক হাতে টুপি নেড়ে জানাচ্ছে। সাহেবি চালে কোমর-ভাঙ্গা নমস্কারের পর তিনি শিল্পীকে গাড়িতে ওঠার অনুরোধ জানালেন। খাস সাহেবের পাশে বসার সাহস দাদার ছিল না, তাঁহার ইতস্ততঃ অবস্থা দেখে সমালোচকও বিব্রত হয়ে পড়েছিল। মানিকদাকে ইঙ্গিতে জানালো গাড়িতে উঠে বসুন। মানিকদা সাহেব সাজলে কি হয়, সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত নয়। খ্যাতির বিড়ম্বনা ও কিছু অর্থ সংস্থানের সম্ভাবনায় তিনি নিজেকে হারিয়েছিলেন। সাহেবের আচরণে তাঁর মনে হল কাঠের পুতুলের মত দাঁড়ান চালককে অভিবাদন জানান হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক, কারণ গাড়িতে ঐ চালকের কল টেপায় যাত্রীর মরণ-বাঁচন সম্বন্ধ জড়িয়ে থাকে। মানিকদাও চালককে সাহেবের অনুকরণে দু'চারবার নমস্কার জানিয়ে দিচ্ছিলেন, নমস্কারের পাঁয়তাড়া আর থামতে চায় না, প্রতিবারই তাঁর মনে হয়েছে নমস্কারের চালটা কায়দা-দুরস্ত ভাবে হয় নি। শেষ পর্য্যন্ত নমস্কারের প্রদর্শনী কতকটা সার্কাসে ক্লাউনের খেলার মত দাঁড়াল। গতিক খারাপ দেখে সমালোচক প্রায় জোর করেই মানিকদাকে গাড়ির ভিতর চালান করে দিল। তার পর নিজে যুগল-মূর্ত্তির সামনে আসন ঠিক করে নিতে গাড়ি ছেড়ে দিল।

সাহেব সাধু উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছেন। আমাদের দেশের যাবতীয় কৃষ্টির সম্পদ ও তার মূলসূত্র আবিষ্কার করে বিখ্যাত ব্যক্তিদের সহিত পরিচয় এবং বহু বিষয় আলোচনা ইত্যাদির পর একটি সারগর্ভ গ্রন্থ প্রকাশ করে ভারতকে বাইরে পরিচিত করানোর জন্য তিনি উৎসুক। সংক্ষেপে, পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের সহায়তায় আমরা কতটা আদিম বুনো রুচি পরিত্যাগ করতে পেরেছি, এবং কতটা বর্ব্বরতা আমাদের কাছে অবর্জ্জনীয় হয়ে আছে তারই নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে উপস্থিত লেগে আছেন। ভারতে যে ক'টাদিন থাকবেন তারই ভিতর শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, ধর্ম্ম, সামাজিক ও সাংস্কারিক রীতি-নীতি ইত্যাদি সব বিষয়ের মালমশলা সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। যে দেশে কোটি কোটি মানুষের বাস, বিভিন্ন ভাষা ও ধর্ম্ম যে দেশের একটি বৈশিষ্ট্য, হাজার হাজার বৎসর ধরে বিভিন্ন দিকে যে দেশের ঐতিহ্যে ক্রম-পরিবর্ত্তন ও সংস্কার ঘটেছে তারই বিশদ বিবরণ কয়েক দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। এটা সাহেবি প্রোগ্রামের

নীতি, ঝটপট কাজ না সারলে অযথা আয়ুক্ষয়ের জন্য নিজের কাছেই জবাবদিহি করতে হবে। অতএব সব কিছু আগে থাকতে প্রস্তুত থাকে, নড়চড় নেই।

এই জাতীয় পণ্ডিত পরিব্রাজকের লিখিত সারগর্ভ গ্রন্থের সহিত আগেও আমাদের পরিচয় হয়েছে। আংশিক বিবরণ এইখানেই বলতে চাই, যথা, বিশ্ববিখ্যাত শান্তিনিকেতনের বিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করতে গিয়ে ভদ্রলোক লিখেছিলেন, গায়ক-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত শান্তিনিকেতন সত্যিই একটি অপূর্ব্ব কুঞ্জবনে ঘেরা বিদ্যাপীঠ। হিমালয়ের পাদমূলে, হিংস্র জন্তু ও বিষধর সরীসৃপ পরিবেষ্টিত পীঠস্থানটি যেন মায়ার সৃষ্টি, ভয়ঙ্করের গা ঘেঁষে সুন্দরের বসবাস—এমনটি কুত্রাপি নেই। সুন্দরের আকর্ষণে বাঘ, ভাল্লুক পর্য্যন্ত পোষা কুকুর বেড়ালের মত কুঞ্জবনের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। কত হাজার বৎসর আগে এই মোহন শক্তির আবিষ্কার হয়েছিল তা আজও ঐতিহাসিকরা ঠিক বলতে পারেন না। এই বর্ণনার প্রারম্ভেই কাঞ্চনজঙ্ঘার এক টুকরো আলোক-চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে, সুতরাং মানতেই হবে শান্তিনিকেতন হিমালয় পাদমূলে প্রতিষ্ঠিত। ইতিবৃত্তটি কোন এক জৌলুসযুক্ত সুদৃশ্য বাঁধান পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছিল।

শান্তিনিকেতনের উক্ত বিবরণ যিনি লিখেছিলেন তিনি আজও হয়ত সুস্থ দেহে বেঁচে আছেন এবং আর অনেক খবর তাঁহার কৃপায় বিদেশে প্রচার লাভ করছে। উপস্থিত আমরা যে সাহেবের সহিত পরিচিত হয়েছি তাহারই কথা বলি। ভদ্রলোক সম্ভবত মার্কিন দেশের মানুষ, এবং অন্যায়ভাবে ধনী। ভারত থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সোভেনীর (Souvenir) হিসেবে স্থানীয় কারু ও চারু শিল্পের নিদর্শন নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নিশ্চয় মার্কা কর্ত্তব্য কর্ম্মতালিকার পাতায় লেখা ছিল। ইতিমধ্যে সংগ্রহের তালিকায় পিতলের গাড়ু পিলসুজ ও পিকদানি, রঙবেরঙের বাহারি শিক্কা, বিচিত্রিত পোড়ামালসা থেকে আরম্ভ করে তালপাতায় তৈরী চাষীর মাথার টুপি, দরজায় লাগাবার বেজায় বড় তালা আর কত কি উদ্ভট জিনিষ বলা যায় না যোগাড় হয়ে গিয়েছিল। যে কয়টি সংগ্রহ হয়েছিল সেগুলিকে functional করার জন্য তাঁহার হোটেলের বৃহৎ ঘরে নানাভাবে সাজানো হয়েছে। পিতলের পিলসুজে তৈলাক্ত পোলতের বদলে একটি ইলেকট্রিক বাল্ব দেওয়া হয়েছে এবং বাল্বের ঢাকনার জন্য চাষীর টুপি পিলসুজের উপর বিরাজ করছে। পিকদানি হয়ে গিয়েছে পুষ্পাধার, বাহারি শিক্কায় ঝোলানো বিচিত্রিত পোড়া মালসার ভিতর আশ্রয় পেয়েছে সবুজ Money Plant। এইভাবে সাজিয়ে দেওয়ার ভার ছিল আমাদের রুচিসম্পন্ন সমালোচকের উপর। শিল্পকলার নিদর্শন সংগ্রহ ছাড়া সাহেব শিল্পীদের সঙ্গে মেলামেশাও করেছেন তাদের চিন্তাধারা ও অঙ্কন পদ্ধতির সহিত পরিচিত হবার জন্য। এই সূত্রে প্রদর্শনীতে দাদার আঁকা অনেকগুলি হিজিবিজির নক্সা ভদ্রলোক মোটা টাকা দিয়ে কিনে ফেলার পর দাদাকেও চিনে নেওয়া দরকার ছিল, তাই সমালোচকের দ্বারা সাহেবি-নিয়ম অনুসারে সময় নির্দ্দিষ্ট করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে দাদাকে প্রধান অতিথি করে cocktail partyতে নিমন্ত্রণ করার জন্য। অত বড় খ্যাতিবান শিল্পীর সম্মানে cocktail দিতে হলে Elites of the cityকেও ডাক দিতে হয়—এ ব্যবস্থা নাকি দস্তুর মতো কায়দা মেনেই হয়েছে।

দাদা গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের আশেপাশে ঘুরলেও জীবনে কখনও দামী গালিচা পদদলিত করে চলেন নি। সাহেবি জুতো পরাও তাঁর অভ্যাস ছিল না। দু'চারদিন ব্যবহার করায় মোজার আবরণ থাকা সত্ত্বেও নতুন পাদুকার ঘর্ষণে দু পায়ের গোড়ালিতে আধুলির মত বড় ফোস্কা হয়ে গিয়েছে। এখন ঘর্ষণ মেনে চলতে হলে গোটা পায়ের উপর দেহভার দেবার উপায় নেই, দেহের ওজন পায়ের ডগায় চাপিয়ে চলতে হয়। ঘটনাচক্রের ফলে চলাটাও অসাধারণ হয়ে দাঁড়াল। নতুন প্রথায় কেবল হাঁটা নয়, তার সঙ্গে কণ্ঠ-নৃত্যের যোগ হওয়ায়, আশেপাশের লোক দাদাকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। এইরূপ অবস্থায় দাদা নিজেকে মাস্তবর জীব ভাবলেই হিসাবটা চলনসই হ'ত কিন্তু সকলের

দৃষ্টি তাঁহারই উপর পড়ায়, দাদা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। দৃষ্টির দ্বারা তাঁহাকে পরীক্ষার পিছনে কাহার কি উদ্দেশ্য ছিল জানা না থাকায় দাদা পদক্ষেপ একটু দ্রুত করে দিলেন। দাদার কারবার ত একজনকে নিয়ে নয়, তাহার কীর্ত্তির নজিরও বহুমুখী—সুতরাং ভয় পেলে দাদাকে অভদ্র বলা চলে না। শেষ পর্য্যন্ত দাদা নিমন্ত্রণ আসরে উপস্থিত হলেন বটে কিন্তু পায়ের জ্বালায় জুতোর ভিতর পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। কানে কানে সমালোচককে তাঁহার দুরাবস্থার কথা জানালেন, উত্তর পেলেন, পরিচয়ের পালা শেষ হলে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

ঘরের ভিতর নিমন্ত্রিতদের ভিড় জমকালো হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকের হাতে খর্ব্বাকার পান-পাত্র। ভিড়ের মধ্যে সাহেব-মেমদের সংখ্যাও কম নয়। পানরত অবস্থায় অতিথিরা একের পর এক জিনিয়াস খেতাব-গ্রস্ত দাদার সহিত পরিচিত হতে আরম্ভ করেছেন, সকলেই তাঁহার ছবির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। তবে অনেকেই ছবি দেখেন নি। তাতে কিছু আসে-যায় না, অপরের ছবির প্রশংসা কাগজে বার হয়েছিল তাই যথাসম্ভব স্মরণ করে দাদার উপর বর্ষিত হতে লাগল। দাদাও গুরুপাক বিশেষণগুলি নিশ্চিন্ত মনে গিলতে লাগলেন। বদহজম সুনিশ্চিত জানলে হয়ত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাববার অবসর পেতেন।

ছোকরা সমালোচক দাদার পাশেই দাঁড়িয়েছিল, দোভাষীর কর্ত্তব্য সামলাবার জন্যে। ইচ্ছামত অনুবাদ চলছিল, ভুল অর্থকরণের জন্য কাহারও কাছ থেকে আপত্তি শোনা গেল না। নিমন্ত্রণ-পত্রে To meet-এর অনুরোধ থাকলেও অভ্যাগতদের আসল দায়িত্ব ছিল cocktail-এর পাত্রগুলি উদার ভাবে খালি করা।

কর্ত্তব্য সাধন পরম নিষ্ঠার সহিত চালিত হওয়ায় পাঁচমিশালি উগ্র পানীয় তৃষ্ণার্ত্তদের অন্তরকে রঙীন করে তুলেছে। যাঁহারা পৌরুষের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা চঞ্চল চিত্তকে উৎকোচদানে শান্ত করার জন্য রঙ মাখানো অসাড় ক্যানভাসের প্রসঙ্গ ছেড়ে সচল রঙদার স্বচ্ছ শাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। পরিবেশ তখন রোমাঞ্চের সাড়ায় ভরপুর হয়ে উঠেছে। সাড়ার ডাকে সায় দিতে হলে পরকীয়ার প্রতি রস নিবেদন শাড়ির তারিফ থেকেই সুরু হয়। পরিচ্ছদের বর্ণনায় কতটাই বা বলতে পারি, কারণ কতটুকুই থাকে ঢাকা। শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা আছে-কিন্তু-নেই গোড়ালিযুক্ত পাদুকার উল্লেখ না করলেও চলে না, কারণ চলার বেসামাল ভঙ্গিতে waltz step-এর আভাস পাওয়া যায়। হাতে গহনার পরিবর্ত্তে বাহারি চ্যাপ্টা ঝুড়ি ভ্যানিটি কেসের স্থান নিয়েছে। মুখশ্রীর স্থায়ী যৌবন মেরামতের জন্য ঐ ঝুড়ির ভিতর নাকি বহুবিধ মাল মশলা থাকে। আকর্ষণের কারণ কি কেবল এইখানেই শেষ? রুক্ষ কেশের কবরী বন্ধনও চিত্ত দোলায় সহায়ক হয়ে উঠেছে। অপূর্ব্ব রুচির সমাবেশ, কাহারও মাথার উপর জটার সেবায় সৌখীন বৈরাগ্য যেন কামদেব রতি ঠাকুরের মন্দির গড়ে তুলেছে। স্থাপত্যে দেশী মাটির কলসীর প্রভাব সুস্পষ্ট। কেহ বা আধুনিক রীতির বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের স্বামীকেই বগলদাবা রেখে কর্ত্তিত কেশে বৈধব্যের বিলাসে আত্মহারা, গ্রামবাসী প্রাচীনপন্থীরা এইরূপ চুলের বাহার দেখলে বলতেন, 'কার বাগানের গাছে চড়ে ফল চুরি করতে গিয়েছিলে বাছা, যে চুলের ঝুঁটি ধরে বঁটিকাটা করে ছেড়েছে।" দোলায়মান দীর্ঘ কেশেরও অভাব নেই। এই চালের চুলের প্রদর্শনীকে মার্জ্জিত মতে বলা হয় পনিস টেল। আগের দিনে জানোয়ার, মাছ, পাখী এমন কি ভক্ষ্যণীয় ফলের সহিত তুলনায় মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য্যের সাদৃশ্য খোঁজা হত, যেমন সিংহকটি, বৃষস্কন্ধ, মরালগ্রীবা, মীন বা খঞ্জনাক্ষী। পটলচেরা চোখ ত আছেই। সেইরূপ অধুনা ঘোটকপুচ্ছ সৌন্দর্য্যের আদর্শ হলে নতুনকে না মেনে চলে না।

পরিস্থিতির প্রভাব দাদার স্কন্ধেও ভর করেছিল। হয়ত বা কিঞ্চিৎ মাত্রাধিক্যও ঘটেছিল। পরের খরচে এইরূপ ঘটা দাদার পক্ষে নতুন কথা নয়। বিশেষ করে অর্কেষ্ট্রাবাদ্যের সহিত যখন বলনৃত্য দাদার অন্তরকেও নাচিয়ে তুলছিল। দাদা তখন বেপরোয়া দেখে-শুনে বেশ একটি পুষ্ট ধরনের মেমসাহেবের কাছে উপস্থিত হয়ে নাচের প্রস্তাব করলেন।

ছোকরা সমালোচক এতক্ষণ দাদার দেহরক্ষী হয়ে কাছেই ছিল, কিন্তু তরলাগ্নি তাতিয়ে তোলায় দেখা গেল কোন একটা কারণ খুঁজে দাদাকে স্বাবলম্বী হতে দিয়ে অন্তর্ধান করেছে। স্বাবলম্বী দাদা কি ভাবে নৃত্যের আশায় অগ্রসর হলেন ইতিপূর্ব্বেই বলেছি।

এখানেও সত্য কথা লুকাবো না। দাদা অপরকে নাচালেও নিজে কখনও নাচ শেখেন নি। এই সময় দাদার দুপায়ের যমজ ফোস্কা বিশেষভাবে কাজে লেগে গেল। যে মহিলার কাছে নাচের প্রস্তাব করলেন, তাঁহার পক্ষে প্রত্যাখ্যান সম্ভব নয়। কারণ দাদা হলেন প্রধান অতিথি। নাচ সুরু হল, এবং অর্কেষ্ট্রার সহিত বলনৃত্যের তালে গোড়ালির বেদনা অপূর্ব প্রথায় দাদাকে নাচাতে সুরু করল। দুচারজন অতি আধুনিক ফ্যাশনপন্থী বোধ হয় ঠিক করে নিলেন—এইরূপ রিদমিক (Rhythmic) পদক্ষেপ একটি নতুন নাচের ভঙ্গি, সুতরাং অনুকরণীয়। শেষ পর্য্যন্ত খুঁড়িয়ে চলাও বলনৃত্যের অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। এর পর দাদাকে নিয়ে আরও অনেক কিছুই ঘটেছে যার বিবৃতি দিতে হলে আমাকে নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হয়, তেমন শক্তি বা সাহস আমার নেই, সুতরাং…

আবার দাদাকে নিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড, কাগজে কাগজে হৈ হৈ পড়ে গিয়েছে। খবরের প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে লেখা—বাঁদর শিল্পী গ্রেপ্তার, তার পরেই দাদার ছবি। তলায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়ে অবাক হয়ে গেলাম। সমালোচক বেশ কিছু দিন ধরে বিদেশ থেকে বিনামাশুলে অতি আধুনিক ছবি আনাচ্ছিল বাজারে চালু করার জন্য। নতুনের ফ্যাসানের ছোঁয়াচে রোগ তখন এপিডেমিকের স্তরে এসে গিয়েছে। সমালোচক এই সময় মহৌষধের ব্যবস্থা করছিল। দাদার মত দুচারজনকে শিল্পী বানিয়ে ব্যবসা বেশ ফাঁপিয়ে তুলেছিল, তার সঙ্গে খেঁদী, টেপী ইত্যাদির টোপ থাকায় তাজা উগ্র সারের গন্ধে অনেকেই টোপ না গিলে পারে নি। দাদাও এদিক দিয়ে বাদ পড়লেন না, সেইটাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি শুধু টোপ গিললেন না, তেফলা বঁড়শীর মধ্যে আটক পড়লেন। মোটর গাড়িতে দাদার পাশে যিনি চড়তেন তিনিও ছিলেন ভেজাল। দাদার মত ওস্তাদও ভেজালের প্রেমে পড়ে এমনই নাকানি-চোবানি খেলেন যে শেষ পর্য্যন্ত বাঁদরের original ছবির নকল আপন বলে চালানোর জন্য শ্রীঘরবাসের ব্যবস্থা হল। আমার বক্তব্য এই, যাঁরা originalityর নকল করেন তাঁরাও যেন দাদার কথা একবার ভাবেন।

—০—

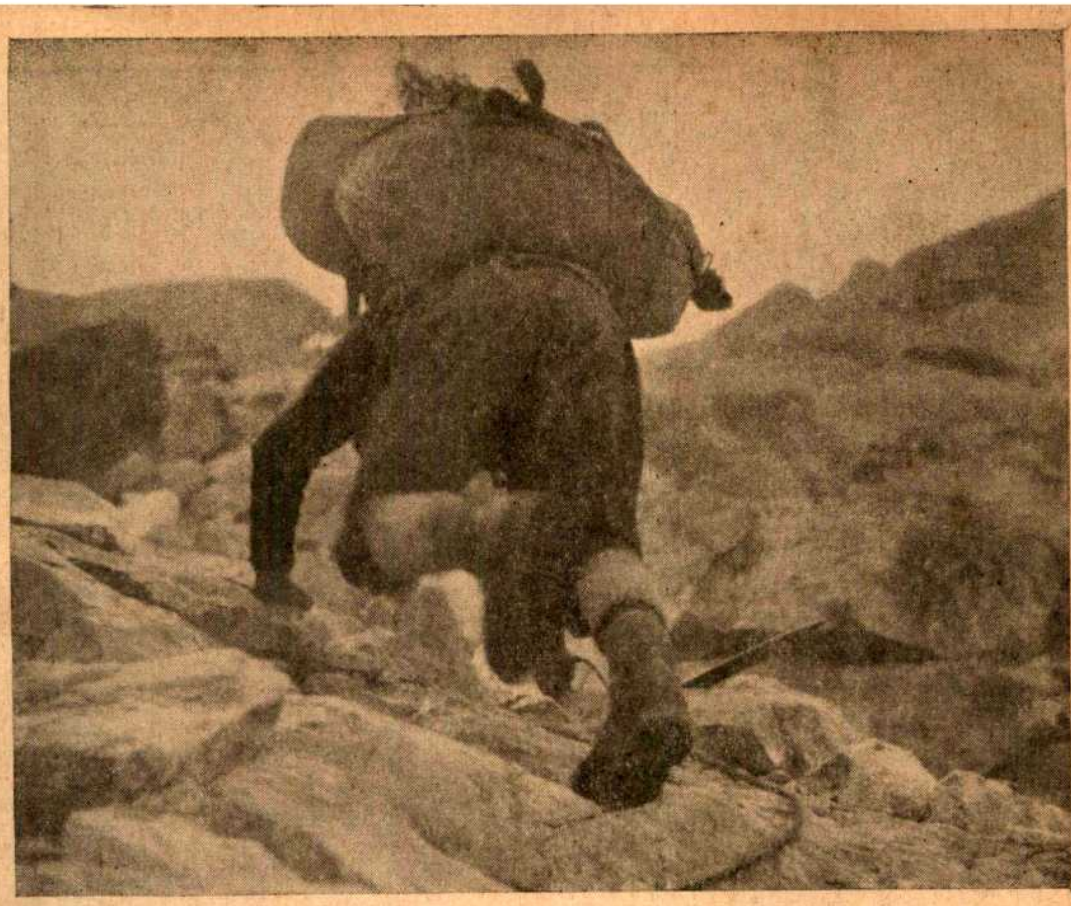

পর্বতারোহণে-বিফলতা সফলতার কারণ

বিশ্বদেব বিশ্বাস

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে হিমালয়ে পর্বত আরোহণ পশ্চিমবাসীদের একচেটিয়া ছিল। স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষে তার জন্ম। সেই হিসাবে ভারতবর্ষ পর্বত আরোহণ জগতে এখনও নাবালক মাত্র। তবে এভারেষ্ট আরোহণ করে ভারতের পর্বত আরোহণ স্নাতকের সম্মান অর্জন করেছে। অলৌকিক ক্ষিপ্রতা নিঃসন্দেহ।

তথাপি হিলারী এভারেষ্টের সাফল্য প্রসঙ্গে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে ভারতীয় পর্বতারোহণের সমালোচনা করে বলেছেন,

Indian mountaineering in its more technical aspects, has still a long way to go to reach the highest world standards. There is still too much dependence on the strength and skill of the Sherpas. . . . ."

হিলারীর কথার সদর্প প্রতিবাদ করে তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার ক্ষমতা, স্বীকার করব, দল হিসাবে

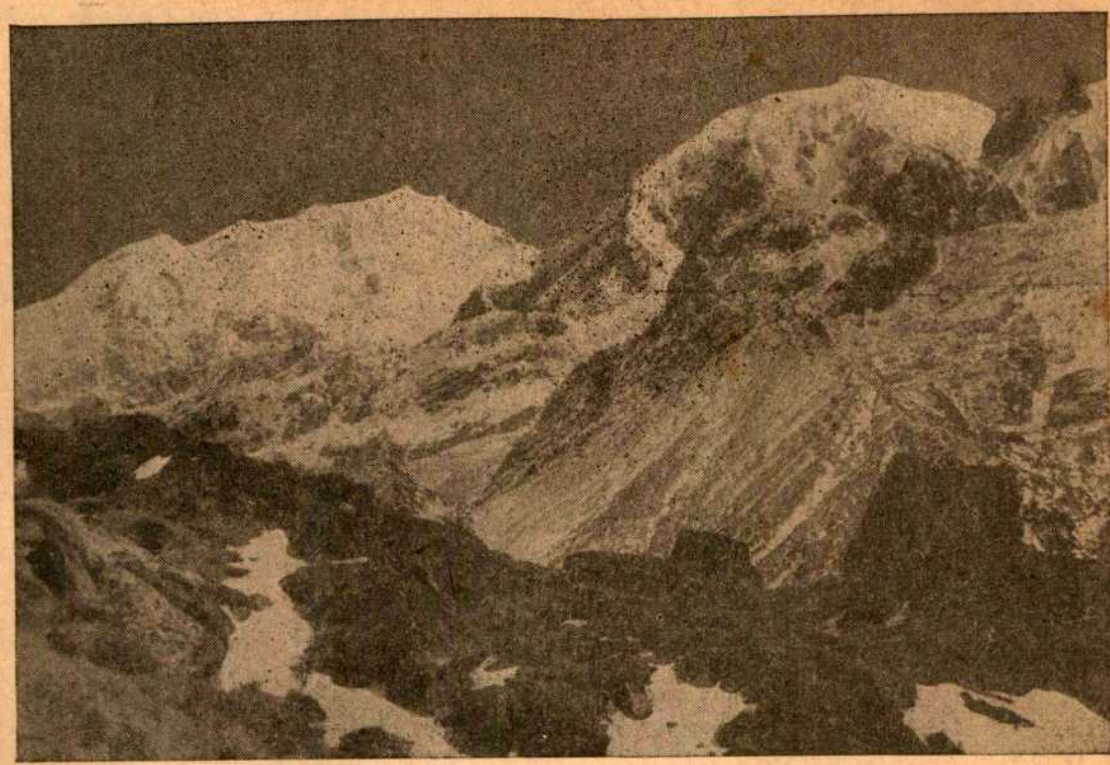

বামদিকে—দক্ষিণ কাক্র (২৪,০৭৫ ফুট) ডানদিকে—কাক্রডোম (২১,৬৫০ ফুট)

বর্তমানে ভারতের কোন দলেরই নেই। তবে ভারতে সরকারী ভাবে পর্বত আরোহণের জন্ম মাত্র এক যুগ আগে,—১৯৫৩ সালে এভারেষ্টে তেনজিং-এর সাফল্যের পর। একথা অনস্বীকার্য যে-শিশুর জন্ম মাত্র ১১।১২ বৎসর আগে সেই শিশু এই ১১।১২ বৎসর বয়সেই দুঃসাহসের সঙ্গে সমান তালে বিশ্ব দৌড়ের পাল্লায় নেমেছে,—এবং সফল হয়েছে। কালে শতাব্দী শেষে এই শিশুও যে সবল ও সুদৃঢ় হয়ে বিশ্বের সেরা পর্বত আরোহীদের সমান তালে চলতে সক্ষম হবে তা সহজেই অনুমেয়।

ভারতে এই রাজকীয় Sportটি কিন্তু মুখে সোনার চামচ নিয়েই জন্মেছে। সুরু থেকেই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা। সংগঠনায় কেবলই সেনাবাহিনী। তারপর ১৯৬০ সালে বেসামরিক সংগঠনের প্রথম দায়িত্ব বাংলা দেশ গ্রহণ করে। এবং পাঁচ বছরের ব্যবধানে শুধু বাংলা দেশ থেকে পাঁচটি বড় অভিযান সংগঠন বিরাট এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। অবিশ্বাস্য রকম ক্ষিপ্রতায় এ এক অস্বাভাবিক সাফল্য লাভ। ১৯৬০ সালে নন্দাঘুন্টিতে বাংলা দেশের পর্বত আরোহণের যে ইতিহাসের সূচনা হল পরে তারই কয়েকটি গৌরবময় অধ্যায় যোগ হ'ল মানা, নীলগিরি, কাক্রডোম, দক্ষিণ কাক্রর গায়ে ও ত্রিশূলী অভিযান দ্বারা।

শ্রীঅশোককুমার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা দেশের কয়েকটা দুঃসাহসিক তরুণ এই গৌরবময় ইতিহাস রচনা সুরু করল।

পর্বত আরোহণের এ সম্মান বাংলা দেশের পর্বত অভিযাত্রীদের স্বোপার্জিত। "কিন্তু পর্বত আরোহণে কেবল অর্জনেই অধিকার জন্মায় না,"—কথাটা বাঙ্গালী পর্বতারোহীদের সমালোচনা করে বলেছে আমাদেরই এক বন্ধু পর্বত সঙ্গী ধ্রুব মজুমদার। কথাটা সাধারণ লোকের কাছে হেঁয়ালী মনে হবে। কিন্তু পর্বত অভিযাত্রীরা জানে কথাটা কত বড় চিরন্তন সত্য। কিছু পয়সা যোগাড় করে হৈ হৈ

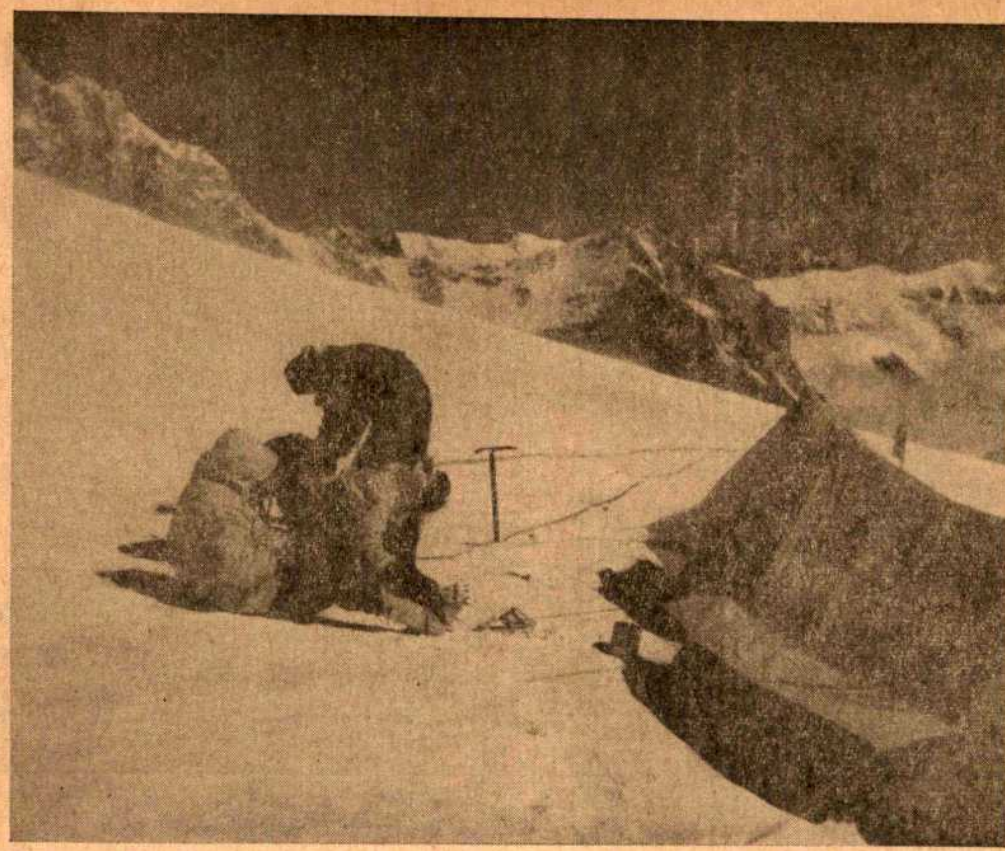

মানা অভিযানের শেষ শিবির,—চিরতুষার শয্যা।

করে নামের লালসায় পাহাড়ে গেলেই তাকে প্রকৃত পর্বত আরোহীর স্বীকৃতি দেওয়া যে শুধু অযৌক্তিক হবে তা নয়,—তেমনি অন্যায় হবে।

পর্বতারোহীর সংজ্ঞা ভিন্ন রকম। সাধারণ Sportsmanদের থেকে পর্বতারোহীরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক ব্যতিক্রম। পর্বত আরোহণ শুধু সবলদেহ ও শক্তি নয়। আরও বিরাট এক জিনিষ। শক্তিমান মানুষ প্লাস্ কয়েকটা বিদ্‌ঘুটে বিশেষ গুণ—এই মিলে হল পর্বতারোহী। পাহাড়ে সবকিছু বিরূপ,—সবকিছু চরম। বাস করা, চিন্তা করা,—এমন কি বেঁচে থাকাটাই যেখানে একটা ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টা সেখানে অন্ধের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠে যাওয়াটাই পর্বত আরোহণ নয়।

পর্বত আরোহীদের কাছে পাহাড়ের নির্মম দাবী। কোন অজ্ঞতার ক্ষমা পাহাড় করে না,—কোন ঔদ্ধত্যের জবাব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দেয়,—তার মূল্য সময় সময় ভয়ঙ্কর হতে পারে। সৌভাগ্যবশত পাহাড়ে কখনও একবার সাফল্য অর্জন করলেও সে অর্জনের মধ্যে কোন অধিকার জন্মায় না! আমরাও এই সত্যটি জেনেছি আমাদের তিনটে অভিযানের শেষে।

সূচনাতেই স্বীকার করব,—নন্দাঘুন্টিতে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জনেও আমাদের কোন অধিকার ছিল না।

সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা থেকে নন্দাঘুন্টি অভিযানের জন্ম। কতকগুলা আকস্মিক ঘটনার যোগফল ছিল নন্দাঘুন্টি অভিযান। যেমন আকস্মিক দলের সদস্যদের পরস্পরের পরিচয় তেমনি অবিশ্বাস্য দলটির সঙ্গে আনন্দবাজার তথা শ্রীসুবল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোককুমার সরকারের যোগাযোগ। এই দুই অবিশ্বাস্য আকস্মিক যোগাযোগের অনিবার্য ফল নন্দাঘুন্টি অভিযান।

প্রথম প্রয়াস, তাই ভুল ত্রুটি অনিবার্য। নন্দাঘুন্টি পাহাড় হ্রস্ব—প্রকল্প ক্ষুদ্র, প্রয়াস নতুন, সকলে সম্পূর্ণ

অনভিজ্ঞ। তারই মধ্যে এক দুর্জয় সঙ্কল্প ও অসীম সাহসিকতা অভিযানের সামগ্রিক সাফল্য এনে দিয়েছে।

পর্বত আরোহীদের অভিযানের প্রথম কাজ যে অঞ্চলে, যে পাহাড়ে সে আরোহণ করতে চায় তার বহিঃপ্রকৃতির পূর্ণ বিবরণ যতটা বিশদ ও বিস্তৃত সম্ভব সংগ্রহ করা। তারপর নির্ভুল ম্যাপ ও কম্পাসের ব্যবহার দ্বারা অনুসন্ধান করতে করতে পাহাড়ের উপর পথ নির্দ্ধারণ। প্রথমেই বলেছি নন্দাঘুন্টি আমাদের প্রথম প্রয়াস, সুতরাং পাহাড় সম্বন্ধে পূর্ব কোন অভিজ্ঞতাই আমাদের থাকার কথা নয়। তার উপর কোন পূর্ব অভিযান এ পথে হয় নি। স্থানীয় কোন অধিবাসীও এ পথে আগায় নি। সুতরাং পূর্বসুরীদের অভিজ্ঞতার কোন লিখিত বিবরণই নন্দাঘুন্টি অভিযাত্রীদের অনভিজ্ঞতা লাঘবে সহায়করূপে পাওয়া যায় নি। সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়েছে ম্যাপ ও কম্পাসের উপর। যে কোন অভিযাত্রীর পক্ষে এই অজানা দুরধিগম্য পথে শুধু ম্যাপ্ খুঁজে আগিয়ে যাওয়া যে কি রকম দুরূহ ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়।

একটা স্বল্প পরিচিত পর্বত শীর্ষ, অপরিচিত পথ, অনভিজ্ঞ অভিযাত্রী ও অত্যন্ত দীন পোশাক ও প্রস্তুতি,—

পাহাড়ী ললনা

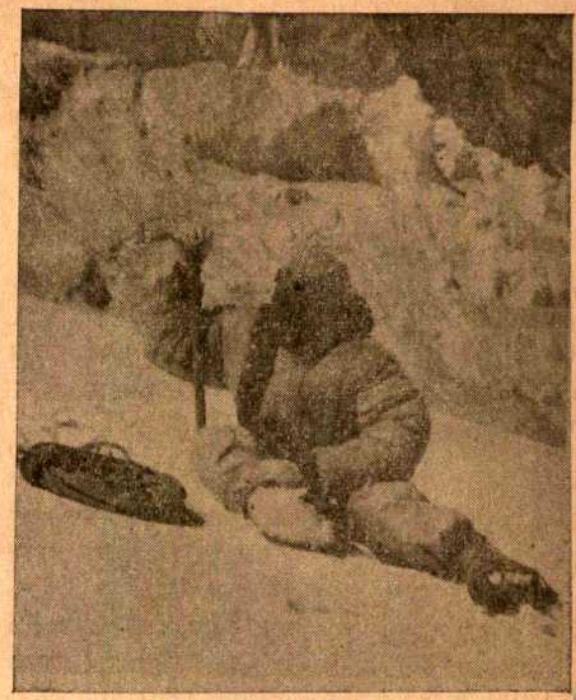

পাখীর পালকের পোষাক পরিহিত

এই হল নন্দাঘুন্টি অভিযান।—আমাদের একটা সামগ্রিক সৌভাগ্যের সাফল্য।

নন্দাঘুন্টি অভিযানে অনেক কিছু শেখার সুযোগ ছিল। শিখেছিলামও বেশ কিছু। কিন্তু ভুলেছি প্রায় সবকিছু। নন্দাঘুন্টির সাফল্যে বিরাট এক আলোড়ন উঠেছিল। আনন্দ উচ্ছ্বাসের বন্যা। তারই প্লাবনে আমাদের কয়েকজনার মহামূল্য অভিজ্ঞতা ভেসে গেছে। তাই একবার অন্তত জানলাম সফলতা কত বড় ব্যর্থতার কারণ হয়। এখনই বন্ধুবর ধ্রুবর কথাটার যাথার্থতা বুঝলাম,—"যে পর্বত আরোহণে অর্জন করলেই শুধু তাতে অধিকার জন্মায় না।"

* * * *

ব্যর্থতা যে কতবড় সফলতার কারণ হতে পারে সেটা আমরা জেনেছি আমাদের মানা অভিযানে। আমাদের মানা অভিযানের বীজ নিহিত ছিল আমাদের নন্দাঘুন্টি অভিযানের সাফল্যে।

অভিযাত্রীরা প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষী, স্বপ্নবিলাসী। নচেৎ নন্দঘুন্টির লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন না করে মানা অভিযানে ব্রতী হত না।—মানা ছিল আমাদের পরাভূত প্রচেষ্টা।

রাজ জ্যোতিষী

বিশ্ববিখ্যাত ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ও তান্ত্রিক, জ্যোতিষশাস্ত্রে গবর্ণমেণ্ট উপাধিপ্রাপ্ত

মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডঃ **হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী,** জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং হস্ত, কপাল, রেখা ও নির্ভুল কোষ্ঠিবিচারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রশ্ন গণনায় সিদ্ধহস্ত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে অদ্বিতীয়।

যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়া এবং শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা দুর্ভাগ্যের ও কোপিত গ্রহের প্রতিকার এবং জটিল মামলা মোকর্দ্দমায় নিশ্চিত জয়লাভে সহায়তা করিতে তাঁহার ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। ভারত, পাকিস্থান, বর্মা, সিংহল, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, আফ্রিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের বহু বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দ জাতিধর্মনির্বিশেষে পণ্ডিত মহাশয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া অযাচিত সহস্র সহস্র প্রশংসা-পত্রাদি দিয়াছেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ৺শ্রীশ্রীকালী ও নবগ্রহ মন্দিরে নিজ তত্ত্বাবধানে আর্য ঋষিদের শাস্ত্রানুযায়ী তন্ত্রমতে প্রত্যেকটি কবচের পুরশ্চরণাদি কার্য সুসম্পন্ন হয় বলিয়াই কবচগুলি অত্যাশ্চর্য শক্তিশালী ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ হয়।

মহাশক্তিসম্পন্ন কয়েকটি জাগ্রত কবচ ঃ

শান্তি কবচ ঃ—পরীক্ষায় পাশ, মানসিক ও পারিবারিক ক্লেশ, আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি সর্বদুর্গতি-নাশক। সাধারণ—৫৲; বিশেষ—২০৲।

বগলা কবচ ঃ—মামলায় জয়লাভ, রাজকৃপালাভ, ধন ও সম্মান বৃদ্ধি, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও সর্বকার্যে যশস্বী হয়। গৃহীদের মঙ্গলদায়ক। সাধারণ—১২৲; বিশেষ—৪৫৲।

আকর্ষণী কবচ ঃ—শত্রুকে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ করিতে এবং অভীষ্টজনকে বশীভূত করিতে ইহার ক্ষমতা অপরিসীম। সাধারণ—১২৲, বিশেষ—৫০৲।

পণ্ডিত মহাশয়ের লিখিত হস্তরেখা বিচারের সহজ ও সরল বাংলা ও ইংরাজী বই পড়ে নিজেই নিজের ও পরিজনদের ভাগ্য জানুন—

সামুদ্রিকরত্ন (বাংলা) দ্বিতীয় সংস্করণ ৬৲

জুয়েল অব পামিষ্ট্রী (ইংরাজী) ৭৲

সাক্ষাৎ করুন অথবা লিখুন—**হাউস অব এষ্ট্রোলজি,** ১১এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬ (হাজরা পার্কের ঠিক পূর্বে)। ফোন ঃ ৪৭-৪৬৯৩।

স্বীকার করব, ১৯৬১ সালে মানাতে অভিযান করার অধিকার আমাদের ছিল না। মানা হিমালয়ের একটা 'মেজর পিক্'। সুতরাং সেই পিক্-এ আরোহণ করার জন্য হিমালয়-সদৃশ বড় অভিযানের প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। বড় অভিযানে আরও ব্যাপক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। মানা অভিযানের সময় আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ শখের পর্বতারোহী। তাই হয়ত অকৃত-কার্যের অভিজ্ঞতাই আমাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। মানা অভিযানে পরাজয় পর্বত আরোহণকে আমাদের অন্তরে অনুপ্রবেশ করিয়েছে। নির্দ্বিধায় কবুল করব মানায় অকৃতকার্যতার মূলে আমরা নিজেরা—আমাদের সামগ্রিক অজ্ঞতা। তবে একথাও সত্য, প্রকৃতিও আমাদের দুঃসাহসিকতাকে কিছুমাত্র ক্ষমা করে নি, সহায়তা করে নি। এই অজ্ঞতার খেসারত আরও ভয়ঙ্কর ভাবে পাহাড় নিতে পারত। আভাস মাত্র দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। জানিয়ে দিয়েছে পাহাড়ে দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যের পিছু পিছু চলে।

আমাদের মানা অভিযানের জন্মলগ্নে মনে হয় কোন দুষ্টগ্রহ থেকে থাকবে। গোড়ায় অবশ্য তার কোন নিশানা ছিল না। অর্থানুকূল্য যথারীতি অশোকবাবু তথা আনন্দবাজারের কাছ থেকেই এসেছিল। সকলের সহযোগিতার অভাব হয় নি। যার কাছ থেকে যা চেয়েছিলাম সবাই সব দিয়েছিল। দেশবাসীর ক্রমবৃদ্ধি উৎসাহ দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম। প্রথম বাধা এল প্রকৃতির কাছ থেকে। পরবর্তী বাধাগুলোর উৎসও ঐ এক,—প্রকৃতি। হঠাৎ কলকাতাতেই আচম্বিতে একদিন দুষ্টগ্রহের দুষ্টামি সুরু হয়ে গেল।

কলকাতা ছেড়ে যাত্রার মাত্র দশদিন বাকি। প্রস্তুতিতে তখন সমাপ্তির টাচ দেওয়া হচ্ছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি নামল। বৎসরের রেকর্ড বৃষ্টিপাত। আমাদের ষ্টোর ছিল ঠন্‌ঠনিয়ায়। সেখানে ঘরের ভিতর একহাঁটু জল। ষ্টোরে সঞ্চিত সব মাল ডুবল। তখনও বুঝি নি এই সঙ্গে আমাদের ভাগ্যটাও ডুবেছে। এক ঔষধ নষ্ট হল পাঁচ হাজার টাকার। জলে ভিজে লেবেল উঠে গেছে। সেই একদিন।

আর একদিন। প্রচণ্ড বর্ষায় রাস্তা ভেঙ্গেছে। হরিদ্বার থেকে যোশীমঠের রাস্তা। মাঝ-পথে সহসা আমাদের হতাশ করে দিয়ে গাড়ি থামল, ততোধিক নিরাশ হয়ে জানলাম অন্তত দু'এক দিনের মধ্যে এ গাড়ি আর চলবে না। কারণ—ধ্বস্ নেমেছে। গিয়ে দেখলাম

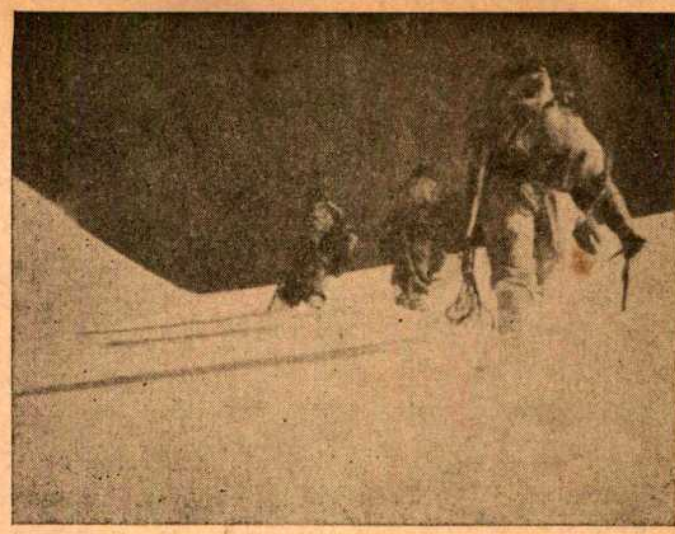

বরফ সমুদ্র পার হয়ে
চলেছে—লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে

ধ্বস্ নয়, একটা গোটা পাহাড় যেন উপরে পড়েছে। তারই উপর দিয়ে তীব্র বেগে কলোন্মাদে নামছে বিরাট এক জলস্রোত। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্ধকার নেমে এসে সমস্ত পাহাড় বনস্থলীটাকে ঘন কালিমায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সঙ্গে অভিযানের পাঁচ টন মাল। ঐ ধ্বস্, ঐ জলস্রোত, ঐ অন্ধকার ভেদ করে অপর পারে নিয়ে যেতে হবে। অভিযাত্রীরা প্রমাদ গুণল। তবে ক্ষণেকের জন্যে। চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতেই পর্বত অভিযাত্রীর আপন স্বকীয়তায় সবাই উন্মত্ত হয়ে উঠল।

বিরাট বিরাট যা কিছু অসাধ্য, যা কিছু দুঃসাধ্য পর্বত আরোহীদের পথে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় তারই মোকাবিলা করার জন্য এদের সদা আগ্রহ। বাধা আছে বলেই পর্বতারোহণে এত উৎসাহ,—সমস্যা আছে বলেই তার সমাধানে এত আনন্দ। নচেৎ পর্বত অভিযান অনুভূতি-বিহীন একটা নিস্তেজ যান্ত্রিক খেলা বলে মনে হত।

ঐ অন্ধকারের মধ্যে ঐ বিভীষিকাময় ধ্বস্ পার হয়ে নিজেরা মাথায় করে পার করলাম অভিযানের পাঁচ টন মাল। উদরে আহার জুটল না;—যা জুটল তা অনাহারের নিয়মভঙ্গ মাত্র। সারারাত্রি বিনিদ্র কাটল বৃষ্টির মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসে।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, অনাহার, অনিদ্রা, অতৃপ্ত পিপাসা নিয়ে, তবু আমরা মানা পর্বতে পৌঁছেছিলাম। তারপর আরও উঠে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। দুর্ভাগ্য নতুনরূপে ব্যাপকহারে হানা দিল।

প্রথম ক্যাম্প স্থাপন করতে গিয়ে প্রকাণ্ড এক পাথরের প্রচণ্ড আঘাতে ভূতলশায়ী হয়ে সুবিমল জানল পর্বত আরোহণ শিক্ষা ও পর্বত অভিযান সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। দুয়ের মধ্যে বাস্তবের ব্যবধান বিস্তর।

৩ নং ক্যাম্পে আঠার বছর বয়সের তরুণ শেরপা কার্মাং চু যখন তার অপেক্ষা দ্বিগুণ বয়সের বৈজ্ঞানিক শরদিন্দু বসুকে ২০ হাজার ফুটে বরফের উপর থেকে অচৈতন্য ও অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পিঠে করে বয়ে নিয়ে এল ক্যাম্পে তখন আমাদেরও নাড়ী ছেড়ে গিয়েছিল এক অশুভ আশঙ্কায়। এমনটি ভাবি নি। এ পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা এর আগে কখনও হয় নি। সেদিন সেই পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের যথার্থ বুদ্ধি হারিয়ে যায় নি। কার্যেরও এতটুকু বিলম্ব হয় নি। হলে ঘটনা অন্যরকম হত, যার পরিণাম ভয়াবহ।

শরদিন্দুবাবু ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে অবসন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। ওদিকে সুযোগ পেয়ে 'তুষার-কামড়' সুরু হয়েছিল পা থেকে। 'ফ্রস্ট বাইট,'—যার একমাত্র চিকিৎসা তৎক্ষণাৎ ক্ষতস্থান কেটে বাদ দেওয়া। যমের সঙ্গে লড়াই করে যে মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় আমাদের কাছে তার প্রমাণ শরদিন্দু-বাবু। চার ঘণ্টা ধরে নিরবচ্ছিন্ন রুদ্ধশ্বাস সংগ্রাম করে তাঁকে বাঁচান গেছে, নিরলস চেষ্টা করে তাঁর পা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারা গেছে।

সেই মুহূর্তে তিনি বেঁচে গেলেন। তাঁর পা দুটিও অক্ষুণ্ণ থাকল। তথাপি তাঁর সম্বন্ধে আমাদের আশঙ্কা বিন্দুমাত্র কমল না। কারণ,—এর পরবর্তী ভয় 'নিউমোনিয়া'। বরফের উপর নিউমোনিয়া ধরলে ডাক্তার চিকিৎসার জন্য পুরো একটা দিন সময়ও পায় না। রাত্রি পোহায় না,—রোগী মারা যায়। প্রাতঃকালে আমাদের আশঙ্কা প্রায় নির্ভুল প্রমাণ হতে যাচ্ছে তার আগেই দ্রুত শরদিন্দুবাবুকে বেসক্যাম্পে

ডাক্তারের কাছে নামিয়ে দেওয়া হল। তিনি সুস্থ হলেন।

অসুস্থ হয়ে পড়ল শেরপা সর্দার আংশেরিং। তার বুকের পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে গেছে। জল জমেছে। সেও নেবে গেল।

অনেক বাধা ঠেলে, মানা পর্বতের অনেক কাছে এগিয়েছিলাম। প্রকৃতি দু'হাজার ফুটের খাড়া এক প্রাচীর তুলে রুদ্ধ করেছিল আমাদের গতি। দুরূহ দুর্লভ এই প্রাচীর। মানার দুর্ভেদ্য এই দুর্গ প্রাকার। অভিযাত্রীদেরও অনির্বাণ উৎসাহ, দুর্জয় সঙ্কল্প। এই প্রাচীর তারা অতিক্রম করবেই। অভিযাত্রীদের অমিত বিক্রম সংগ্রাম—তাদের মরণ পণ।

অসম্ভব। "উত্তরের পথে মানায় আরোহণ অসম্ভব" —স্মাইথ অনেক পর্যবেক্ষণ করে এই রায় দিয়েছেন। তাই এপথ ছেড়ে তিনি মানা শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন দক্ষিণের পথে। এই 'অসম্ভব' কথাটাকে পর্বত অভিযাত্রীরা তাদের অভিধানে স্থান দিতে নারাজ।

কবিশেখর কালিদাস রায় অনূদিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

মেঘদূত ৮.০০

মূল কাব্যের পরিপূর্ণ রস ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলে শুধু বিদগ্ধ পাঠক নয় সাধারণ পাঠক শ্রেণীকেও মেঘদূতের মুক্ত অঙ্গনে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন কবিশেখর। রুচিশীল পাঠকের ও পাঠাগারের অবশ্য সংগ্রহযোগ্য।

সুশীল আচার্য-র একটি অসাধারণ উপন্যাস

প্রতীক্ষা ৪.০০

বাদল ঘোষের বাস্তবধর্মী নূতন উপন্যাস

দেবযানী ৩.০০

এবার পূজায় ছোটদের মনোমত বই

সুজিতকুমার নাগ সম্পাদিত

সবার সেরা রূপকথা ৩.০০

পনের জন প্রখ্যাত লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা সংকলন

এস. কে. পালিত এণ্ড কোং

৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সব দেশে সব কালে কিছু কিছু লোক জন্মায় যারা নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করার জন্য বদ্ধপরিকর, তাদের কেউ কেউ গণ্ডী অতিক্রম করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। কেউ বা হয়ত সফল হয়েছে। পর্বত অভিযাত্রী মাত্রেই অসম্ভবের সাধক।

নিজের চরিত্র নিয়েই স্মাইথ জানতেন পর্বত অভিযাত্রীদের চরিত্র বড় অদ্ভুত, সৃষ্টিছাড়া। যার মধ্যে অসম্ভবের সন্ধান আছে, যার মধ্যে প্রাণের ঝুঁকি নেবার সুযোগ আছে, তারই মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে অভিযাত্রী মন অস্থির উন্মাদ হয়ে উঠবে। তিনি জেনেছিলেন মানার এ পথের বিপদ পর্বত অভিযাত্রীদের একদিন প্রলোভিত করবে,—এ পথের অসম্ভাবনা অভিযাত্রীদের আকর্ষণ করে আনবেই। এখানে পর্বত আরোহণের রোমাঞ্চ। তাই তিনি সম্ভাব্য অভিযাত্রীদের শতেক সাবধান করে দিয়েছেন—যেন বিশেষ আমাদেরই উদ্দেশ্যে। এ পথে মানা আরোহণে আমরাই প্রথম প্রয়াসী।

মানার দু'হাজার ফুটের দুরূহ বরফ-প্রাচীর আমরা অতিক্রম করেছি। তথাপি মাত্র তিন শত ফুটের জন্যে শীর্ষ লাভে বঞ্চিত হয়ে বিফল হয়ে মদন গৌরাঙ্গের দল ফিরে এসেছে। শীর্ষে পৌঁছানোর পথ তারা পায় নি। চতুর্দিক তন্ন তন্ন করে দেখেছে। স্মাইথের অলঙ্ঘ্য, অনারূহ, অসম্ভব কথাটা পরখ করে নেমে এসেছে।

অসম্ভব কথাটা অভিযাত্রীদের নতুন করে প্রেরণা যোগাল। যে শক্তি নির্মম, দুর্ধর্ষ তার সঙ্গে সংগ্রাম করার প্রেরণা এ অভিযাত্রীদের জন্মগত। মানার প্রকৃতি তখনও উদার, তখনও আহ্বানকারী। এমন দুর্লভ আবহাওয়া ছেড়ে নেমে আসতে অভিযাত্রীদের মন চাইল না। সুতরাং দ্বিতীয় চেষ্টা,—এই উত্তর পথেই মানায় উঠব। সেদিন আমরা অনেক ভেবেছি। মানার উত্তর পথের বিপদ, মানার আকস্মিক মারমূর্তির কথা আমরা জানি। পর্বত আরোহীদের এই একগুঁয়েমি জেদের জন্যে বহু প্রাণ খেসারত দিতে হয়েছে। আর এক একটি প্রাণ বলির অর্থ হয়েছে পরবর্তী অভিযাত্রীদের নতুন অনুপ্রেরণা।

আবার সুরু হল মানা আরোহণ।

চতুর্থ শিবির থেকে উঠছি। প্রদ্যোৎ, আমি, শেরপা নরবু ও আংদাওয়া। সঙ্গে আরও দুজন শেরপা আছে, রসদ পৌঁছে দিচ্ছে। উঠেছি প্রায় এক হাজার ফুট, আকাশ সহসা রূপ বদলাল। রুদ্ররূপ। দলটার দৃঢ়তা

দেখে মানা তার প্রতিরক্ষা আরও সুদৃঢ় করায় মন দিল। আকাশে মেঘ জমল। ক্রমান্বয়ে প্রচণ্ড হয়ে উঠল। বাতাস উঠল। সে বাতাসের নাম 'ব্লিজার্ড'। পর্বতের এটি শেষ ও মোক্ষম অস্ত্র।

সকাল ৮টায় রওনা হলে বেলা ১২টার মধ্যে পঞ্চম শিবিরে পৌঁছবার কথা। কিন্তু আমরা যখন পঞ্চম শিবিরে পৌঁছলাম বেলা তখন ৫টা বেজে গেছে। বিলম্বের কারণ—ঐ ব্লিজার্ড (,—) তুষার ঝড়।

ব্লিজার্ড কথার অর্থ যে কতটা মারাত্মক তা আমরা পূর্বে শুনে থাকলেও প্রত্যক্ষ করলাম সেদিন মাত্র। ঝড়ের বেগ সম্ভবত ঘণ্টায় ৬০ মাইলের বেশী ছিল না। কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন ১৬০ মাইল। পাহাড়ের গা থেকে ঘূর্ণি-ঝড়ে বরফ উড়ে আসছিল। সেই বরফই পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে অনেকগুণ বেশী জোরে আমাদের গায়ে লাগছিল। ঘূর্ণি-ঝড়ে প্রবল বেগে বরফ এসে যখন আমাদের উপর চড়াও হচ্ছিল তখন দেহের কোন অংশটা যে বেশী ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল তা খেয়াল নেই। অন্ধ ঝড় আমাদেরও অন্ধ করে দিয়েছিল। ঝড় সামলাতে কোথায় কতক্ষণ মাথা গুঁজে বসেছিলাম খেয়াল নেই। বরফের উপর তৃষ্ণায় গলা যে শুকিয়ে এমন আবদ্ধ হয়ে যায় তা আগে জানতাম কিন্তু অভিজ্ঞতা ছিল না। এবার হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, যেটুকু জলের পুঁজি নিয়ে বেরিয়েছিলাম তা দু-তিন শত ফুট উঠতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারপর থেকে বরফ খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করেছি। বলাবাহুল্য তৃষ্ণা তাতে বেড়েছে বই কমে নি। মানুষের মুখ দিয়ে জীবন্ত অবস্থায় যে ফেনা ওঠে তা এই প্রথম দেখলাম। তথাপি কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নেবার উপায় নেই। এই পরিস্থিতিতে পালিয়ে নেবে আসাই কর্তব্য। কিন্তু ঐ ঝড়ের মধ্যে মাঝপথ থেকে নেমে আসা ছিল আরও বিপদজনক। সুতরাং আমরা সংগ্রাম করছিলাম পাঁচ নং ক্যাম্পে উঠবার জন্যে—বেঁচে থাকবার জন্যে।

৫ নং ক্যাম্পে যখন পৌঁছলাম তখন আমাদের অবস্থা চেতন, অচেতন, কি অবচেতন তা খেয়াল ছিল না। শক্তিহীন হয়ে অত্যন্ত অবসাদে যখন এই নিদারুণ অবস্থার হাতে নিজেদের অসহায়ভাবে সঁপে দিলাম তখন নরবু এসে আমাদের ক্রমাগত মেরে, ধাক্কা দিয়ে সচেতন করে দিয়ে থার্মোমিটারটি চোখের সামনে তুলে ধরল। আঁতকে উঠলাম। থার্মোমিটারের পারা নেমে গেছে মাইনাস ২০ ডিগ্রি। অর্থাৎ কুড়ি ডিগ্রি বিলো

জীবনরজ্জুবদ্ধ আরোহী

ফ্রিজিং। ঐ ঠাণ্ডায়, ঐ ব্লিজার্ডের মধ্যে সকল চেতনাকে সবলে জাগিয়ে না রাখলে শেরপাদের ভাষায় 'মূর্তি' হয়ে যেতে হত।

আমাদের দুর্ভাগ্যের সেইখানেই শেষ হয় নি। ঐ অবস্থায় ষ্টোভগুলো ধর্মঘট করেছিল। তারও কারণ ঐ ঝড়। অক্সিজেনের অভাব। অত উঁচুতে আমরা এর আগে কখনও উঠি নি, কখনও রাত কাটাই নি। এই অবস্থার কোন অভিজ্ঞতাই আমাদের ছিল না। তবে সেদিন এইটুকু বুঝেছিলাম যে বিনা গরম পানীয়ে ঐ ঠাণ্ডায় ঐ ঝড়ের মধ্যে রাত কাটান মানে—সেটা হবে "কালরাত্রি।"

আমাদের অবস্থার আর অবশিষ্ট কিছু ছিল না। শত চেষ্টাতেও ষ্টোভ যখন জ্বলল না তখন আমরা জেনে গিয়েছিলাম যে আজকের রাতটাই আমাদের শেষ রাত্রি। এ আর পোহাবে না। কাল আর জাগব না। ষ্টোভ না জ্বললে বাঁচব না, রাত না থামলে নামা ত সম্ভব হবে না। তাই নরবু পরামর্শ দিয়ে বলেছিল,—সাব, সব কথা ডায়ারীতে লিখে রাখ। নীচের লোকেরা আমাদের মৃত্যুর পর যাতে জানতে পারে আমরা ঝড়ের কাছে হেরে যাই নি। শেষ পর্যন্ত লড়েছি। খুব বেশী উদ্বিগ্ন হই নি। কারণ উদ্বিগ্ন হবার মত শক্তিটুকু ছিল না। সে

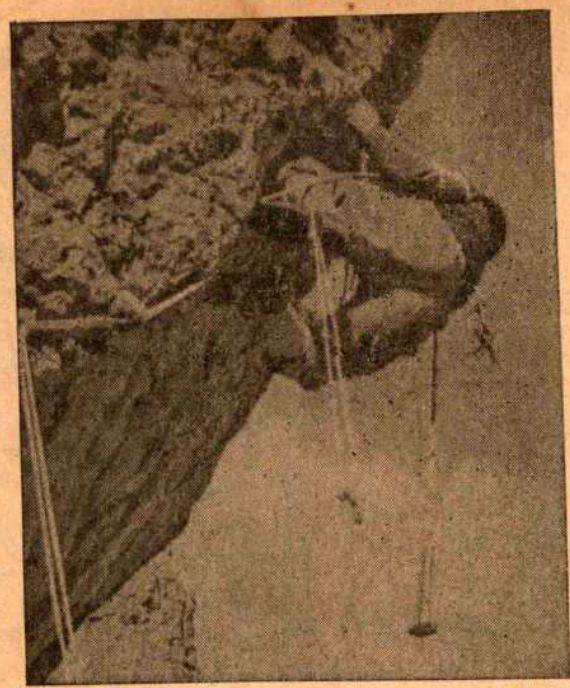

"রক্ ক্লাইমিং"

দিনের সেই চূড়ান্ত অবসাদে মৃত্যুকেও কেমন যেন নিরীহ বলে মনে হয়েছে।

মানা অভিযান ব্যর্থ হয়েছে।

মানা অভিযানের লক্ষ্য ছিল মানা শীর্ষে আরোহণ করা। আপাতদৃষ্টিতে সেই উদ্দেশ্য সফল হয় নি।

মানা অভিযান ব্যর্থ হয় নি। মানা অভিযানের ব্যর্থতাই আমাদের সব চাইতে বড় সার্থকতা। মানার ব্যর্থতা আমাদের পরবর্তী অভিযানে সফলতার সুদৃঢ় সোপান। মানা অভিযান ব্যর্থ না হলে প্রকৃত পর্বত অভিযান কি তা আমরা জানতাম না।

মানা অভিযান আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। মানার পর্বতের কথা আমরা চিরকাল স্মরণ রাখব। যতদিন না আবার মানায় ফিরে যেতে পারছি—সকল আরোহণের দ্বারা মানার সঙ্গে সখ্যতা হচ্ছে—ততদিন সুস্থির থাকতে পারব না।

* * * *

মানা অভিযানের ব্যর্থতার মূল্য শুধু আমরাই জানি নি। আর একজন জেনেছিলেন। যাঁর অর্থানুকূল্যে এই অভিযান, তিনিও জেনেছিলেন। তিনি তখনই উপলব্ধি করেছিলেন এদের দৃঢ়তা আছে, ঐকান্তিকতা আছে। এদের সাহায্যের প্রয়োজন। তিনি তখনই সিদ্ধান্ত করেছিলেন এদের শুভ যাত্রাপথে যেন কোন পার্থিব বাধা না থাকে।

পর্বত আরোহীর কাছে পর্বতে আরোহণই বড় কথা। সফলতা বা ব্যর্থতা গৌণ। অশোকবাবুও ঠিক সেই কথাই বললেন। 'খেলতে নেমে প্রতিবারই জিতব এমন কথায় ত আমি বিশ্বাসী নই। এরা নিশ্চয়ই যাবে এবং সেজন্যে আমার সহযোগিতার কোন দিন অভাব হবে না। এরা যেদিন কাঞ্চনজঙ্ঘায় যাবে সেদিনও এদের জন্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে।' তাঁরই অকৃত্রিম উদার সহযোগিতায় আমাদের সিকিম হিমালয় অভিযানের প্রস্তাবনা—আমাদের সিকিম হিমালয় অভিযান সত্য হয়েছে ;—কাব্রুডোম সফল হয়েছে।

সিকিম হিমালয় অভিযানের জন্মের সময়েও বোধ হয় তার রাশিচক্রে বৃহস্পতির স্থানে শনি ছিল। এই শনির দশা আমাদের সিকিম হিমালয় অভিযানকে প্রায় গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল। পর্বত অভিযান বিষয়ে আমাদের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়ে আছে।

পর্বত অভিযাত্রীদের কোনদিন রাজনীতি করতে হয় না। কারণ প্রয়োজন হয় না। পর্বত আরোহণের ঐ পবিত্রতার মধ্যে কেন রাজনীতির নোংরামি নেই বলেই পর্বত আরোহণ আজও সকল ক্রীড়ার ঊর্ধ্বে। সেই কারণেই পর্বত আরোহণ সত্যের সততায় চির পবিত্র ছিল। ইদানীং ভারতে পর্বত আরোহণের ক্ষেত্রে কয়েকজন দুষ্ট লোকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তারা মিথ্যা ভাষণে পর্বত আরোহণের পবিত্রতা নষ্ট করছে—

তেমনি ঘৃণ্য রাজনীতি ঢুকিয়ে এটাকে ক্লেদাক্ত করেছে। আমাদের সিকিম হিমালয় অভিযানে আমরা সেই রাজনীতির বলি হয়েছিলাম।

সিকিম ভিন্ন রাষ্ট্র। সুতরাং যথারীতি আমাদের সবকিছু মহারাজাকে বুঝিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়েছিলাম। সঙ্গে তাঁর আন্তরিক অভিনন্দনও পেয়েছিলাম।

হঠাৎ তাঁর মতি পরিবর্তন হল। অভিযানে বেরিয়ে পড়ার পর মাঝপথে ধরে পুলিশ পাহারায় আমাদের প্রস্তাবিত পথ পালটে দেওয়া হল। আমাদের প্রস্তাবিত পথে "প্রবেশ নিষেধ"-এর বোর্ড ঝোলান হল। কারণ নাকি ধর্মীয়। অথচ এই পথেরই অনুমতি পূর্বে আমরা পেয়ে এসেছিলাম মহারাজার কাছ থেকে। বলাবাহুল্য সিকিম সরকার পর্বত আরোহণের ঐ ঘৃণ্য রাজনীতির শিকার হয়েছে। সিকিম সরকার নানা অজুহাতে আমাদের পরিকল্পনা, আমাদের অভিযান বানচাল করতে উদ্যত।

একটি অভিযানের গতি পরিবর্তন মানে সবকিছু পালটে গেল! পাহাড় একই—কিন্তু তার এক একটি দিক মানে এক একটি নতুন পাহাড়। তার পর্বত-প্রকৃতি আলাদা, তার বাধা-বিপদগুলো আলাদা, তার গতিপথ আলাদা। তার জন্যে চাই আলাদা প্রস্তুতি, ভিন্ন পরিকল্পনা। অর্থাৎ পাহাড়ের দিক পরিবর্তন মানে সম্পূর্ণ নতুন অভিযান—তার জন্যে চাই ভিন্ন প্রস্তুতি। আমাদের অভিযানের গতিপথ পরিবর্তন করে সিকিম সরকার আমাদের এক অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিল। আমাদের পায়ের তলা থেকে হঠাৎ মাটি সরে গেল। উদ্দেশ্য, আমাদের পরাজয়—কারণ, ঐ রাজনীতি।

সিকিম হিমালয় অভিযানে আমাদের পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। এবারের দল ছিল পূর্বাপেক্ষা আরও বলিষ্ঠ, আরও একনিষ্ঠ। সাফল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। হঠাৎ এই বাধা পেয়ে সকলে মরিয়া হয়ে উঠল। তাদের দুর্জয় মরণপণ সঙ্কল্প। সকলের এক কথা, "পথে যখন বার হয়েছি তখন শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় দেখব। একেবারে পরাজিত হবার আগে কোন রকম পরাজয়ই মানব না।" —কথাটার মধ্যে বড় বেশী অহমিকা আছে। তার থেকেও বেশী আছে—আত্মপ্রত্যয়। পর্বত আরোহীর চরিত্র মাত্রেই এই অহঙ্কাররূপী আত্মপ্রত্যয়ের অলঙ্কারে ভূষিত। এই আত্মপ্রত্যয় না থাকলে পর্বতারোহী হওয়া যায় না।

পরাজয় আমরা মানি নি। কিন্তু পরাজয় মানাটা

PHONE: 34-3770
For PROMPT SUPPLY OF QUALITY
● BLOCKS
● STEREOS
● MATS
CALCUTTA PRESS SERVICE
249, BEPIN BEHARI GANGULY ST., CALCUTTA-12

নিশ্চিত ছিল। পথটাই একটা মূর্তিমান পরাজয়। অবশ্য জয়, পরাজয় এসব কথাগুলো সম্বন্ধে পর্বত আরোহীরা নির্লিপ্ত। সব কথাগুলোর অর্থই তাদের কাছে এক অর্থ। সবেরই অর্থ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। এই অভিজ্ঞতা লাভের প্রেরণাই অভিযাত্রী মানুষগুলোকে ঐ অহমিকার দীপশিখায় প্রজ্বলিত করে রাখে।

যে নিশ্চিত পরাজয়ের পথে আমাদের ঠেলে দেওয়া হল তার নাম 'কাক্রু হিমপ্রপাত'। আমাদের অভিযাত্রীরা যখন সেই কাক্রু হিমপ্রপাতের সাক্ষাৎ পেল তখন তারা দেখল যে নিশ্চিত পরাজয়ের সঙ্গে আর একটা আশঙ্কা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে, তার নাম প্রাণ সংশয়। এই বিভীষিকাময় কাক্রু হিমপ্রপাত অতিক্রম করতে গেলে পরাজয়টাই একমাত্র অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নয়—প্রাণ নিয়ে ফিরে আসাটাও বুঝি আর এক সমস্যা।

বিরাট বিরাট বরফের চাঁই—অসংখ্য, অজস্র। ওজন কয়েক মণ থেকে কয়েক শত টন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ওলোট-পালোট হয়ে এ ওর ঘাড়ে পড়ে আছে বিস্তৃত স্থান জুড়ে। যেন একটা সঙ্কীর্ণ গলি। তার দুধারে সুবিন্যস্ত গাঁথা ছিল বরফের ঐ বিরাট বিরাট চাঁইগুলো দিয়ে আকাশ-ছোঁয়া বাড়ী। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে ধ্বসে পড়েছে ঐ পথের ওপরে। কোথাও সিঁড়ির ধাপ, কোথাও প্রাচীরের পর প্রাচীর, কোথাও গম্বুজের পর গম্বুজ। মাকড়সার জালের মত অসংখ্য ফাটল। কোথাও দুধারে উঁচু উঁচু প্রাচীরের উপরে ঝুলছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাঁই। কথার আওয়াজেই যেন ভেঙ্গে পড়বে। এই সব মিলে হল কাক্রু হিমপ্রপাত—কাক্রু পর্বতের ফাঁদ পাতা গোলকধাঁধা। এর মধ্যে একবার ঢুকলে বেরিয়ে আসা মুস্কিল। এ পথে প্রতি পদক্ষেপে দড়ি লাগাতে হবে। এ পথে একটা ভুল পদক্ষেপের ক্ষমা নেই।

এর উপর আছে এভ্যালাঁস্। দুপাশের পর্বত প্রাচীর থেকে মুহুর্মুহু তুষার ধ্বস নামছে আর ক্ষণে ক্ষণে পালটে দিচ্ছে কাক্রু হিমপ্রপাতের আকৃতি।

কাক্রু হিমপ্রপাতে এর আগে পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে ভারতীয় এভারেষ্ট অভিযাত্রী দল। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে দু-একটা বিদেশী অভিযান।

এভারেষ্টের পথে 'খম্বু হিমপ্রপাত' নামে এক হিমপ্রপাত আছে। বিস্তৃতি তার কাক্রু হিমপ্রপাতের বহুগুণ হলেও প্রকৃতি প্রায় অভিন্ন। তাই এভারেষ্টে যাওয়ার পূর্বে হিমপ্রপাত অতিক্রমের অভ্যাস আরও নিপুণ করার জন্য সেই একই অভিযাত্রীদের কাক্রু হিমপ্রপাত অতিক্রম করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হিমপ্রপাত অতিক্রমের পদ্ধতি কমবেশী প্রায় সমান। বলাবহুল্য, এভারেষ্টে অভিযাত্রীরা খম্বু হিমপ্রপাত অতিক্রম করতে সফল হয়েছিল—কাক্রু হিমপ্রপাতে তারা পরাজিত।

আমাদেরও অপ্রস্তুত অবস্থায় গিয়ে কাক্রু হিমপ্রপাতে পরাজিত হওয়াটা অবধারিত ছিল। কিন্তু পরাজিত আমরা হই নি। সফল হওয়াটা স্বতঃসিদ্ধ ছিল না বলেই আমরা তাকে নিপাতনে সিদ্ধ করেছিলাম। কাক্রু হিমপ্রপাত আমরা অতিক্রম করেছিলাম। তবে সহজে হয় নি।

পাহাড়ে সবকিছু অনিশ্চয়তার মধ্যেও একটা জিনিষ নিশ্চিত থাকে—সেটা হিসাব। যাদের হিসাব যত

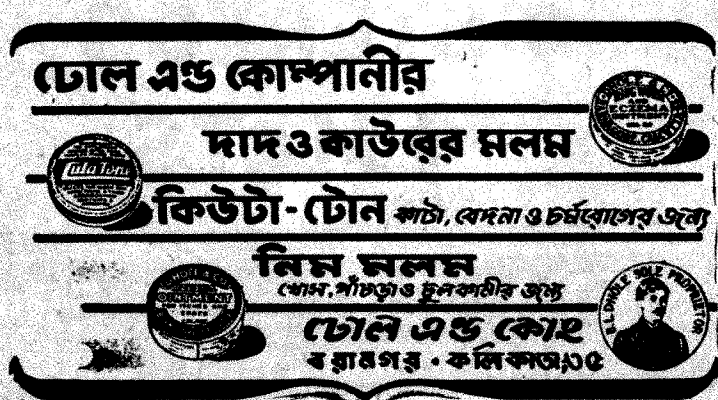

সূক্ষ্ম ও নিখুঁত তাদের নিরাপত্তা তত সুদৃঢ়। হিসাবের গড়-মিলেই যত বিপর্যয়। যাদের দূরদর্শিতা যত প্রখর তাদের হিসাব তত নির্ভুল। কিন্তু পাহাড়ের আব-হাওয়া সব হিসেবের বাইরে। পর্বত অভিযানে এই আবহাওয়াই একটা মস্তবড় গরমিল ব্যাপার। পাহাড়ে আবহাওয়া যদি বিশ্বাসঘাতক হয়ে ওঠে তাহলে কারু হিমপ্রপাতের মত স্থান থেকে বেঁচে ফিরে আসা—সম্পূর্ণ ভাগ্য জোরে।

আমরা সবে কারু হিমপ্রপাতের সঙ্গে পাঞ্জা কষব বলে হাত বাড়িয়েছি সহসা আবহাওয়া মারমুখি হয়ে উঠল। বলাবাহুল্য তার কবল থেকে আমাদের যারা বেঁচে ফিরল—সম্পূর্ণ তাদের ভাগ্যগুণে।

আবহাওয়া মারমূর্তি হয়ে যখন প্রচণ্ড ব্লিজার্ডের রূপ নিল তখন মদন, প্রদ্যোৎ, আংশোরিং, আজীবা ও আরও কয়েকজন পোড়-খাওয়া বাঘা বাঘা শেরপা কারু হিম-প্রপাতের উপরে ১৭,৫০০ ফুট ও ১৮,৬০০ ফুট উচ্চতায় যথাক্রমে ১নং ও ২নং শিবিরে ছড়ান।

সকাল থেকেই যেন মেঘে আকাশ পাহাড় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বাতাস একদম বন্ধ। কি রকম যেন থমথমে ভাব। যেন মৃত্যু-গম্ভীর নিস্তব্ধতা চারিদিকে। নিজেদের নিশ্বাসের ঘন ঘন আওয়াজ এই নিস্তব্ধতা ভেদ করে নিজেদের কানে বাজছে।

মদন অশুভের গন্ধ পেল। মানা অভিযানে লব্ধ অভিজ্ঞতার অণুবীক্ষণে অনুসন্ধান করে বুঝল, এ অবস্থা আর কিছু নয়—প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ। রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। সন্ধ্যার পূর্বেই ঝড় উঠল। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই তীব্র গতি হয়ে হা হা করে উন্মত্তের মত ছুটে এসে পড়ল পাহাড়ের গায়ে। যেন তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সুরু হয়ে গেছে হিংস্র তুষার-ঝড়ের প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব নৃত্য।

পাহাড়ের জায়গা অনুযায়ী ২নং শিবির হাওয়া আসার এক গলিপথের মুখে। সেই কারণে ২নং শিবিরে যারা আছে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। ঝড়ে তাঁবু উড়ে যাওয়া ঠেকাতে ওরা তাঁবুর চতুর্দিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। ঝড়ের বেগ ওদের শোয়া অবস্থা থেকে উঠিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। উঠব না বলে জোর করে ঝড়ের বিরুদ্ধে শুয়ে থাকতে গিয়ে আংশেরিং-এর কোমরের হাড় সরে গেছে। যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। উপায় নেই। সেই আর্ত চীৎকার ঝড়ের মুখে ভেসে গিয়ে পাহাড়ের বুকে মিলিয়ে গেছে। আংশেরিং বুঝেছে

আরোহণ

এই ঝড় ভাল নয়, সুযোগ পেলেই পালাতে হবে—নচেৎ মৃত্যু অনিবার্য।

আংশেরিং তবে দীর্ঘ শেরপা জীবনে পাহাড়ে এই রাত আর একবারই দেখেছিল। ১৯৩৪ সালে। নাঙ্গাপর্বতে। সে এক মর্মান্তিক অলৌকিক ঘটনা। নাঙ্গাপর্বতে ৭নং শিবিরে তখন পাঁচজন জর্মন সাহেব আর ছজন শেরপা। ঝড় উঠল। হিংস্র ঝড়ের কবল থেকে বাঁচবার জন্য পাঁচজন সাহেব চারজন শেরপাকে নিয়ে পালিয়ে এল। অন্ধ ঝড় আংশেরিংকে অন্ধ করে দিয়েছিল। সাহেবরা অন্ধ আংশেরিং ও একজন অসুস্থ শেরপাকে মৃত্যুর দরজায় আগিয়ে দিয়ে পালিয়ে আসে।

ঝড় চলেছিল সাতদিন। মৃত্যুর অপেক্ষা করে অন্ধ আংশেরিং বেঁচেছিল শুধু বরফ খেয়ে। নামার পথে দেখেছিল পালিয়ে আসা সকলেই একের পর এক দশজন মারা গেছে। কেউ ঠাণ্ডায় মরেছে, কেউ না খেতে পেয়ে মরেছে, কেউ বা নামবার পথে ফিক্সড্ রোপে ঝুলে প্রাণ হারিয়েছে। এ বিয়োগান্ত নাটকের একমাত্র ভাষ্যকার আংশেরিং বেঁচে ফিরেছে, তবে অক্ষত নয়। দুটো পায়ের সমস্ত আঙ্গুল সমেত দুটো পাতার অর্দ্ধেক করে সেলামী দিয়েছে।—কেটে বাদ দিতে হয়েছে 'ফ্রস্ট বাইটে'।

সেই বিধ্বংসী ঝড় নাঙ্গাপর্বতের পর আবার কাক্রু ডোমে আংশেরিং দেখছে। ঝড় আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠার আগেই আর একবার না মরার চেষ্টা করতে হবে। মদন, প্রদ্যোৎ, আংশেরিং সবাই সব রসদ-পত্র ফেলে শুধু প্রাণটুকু নিয়ে পালিয়ে এসেছিল।

ওরা পালিয়ে এসেছিল তাই বেঁচে গিয়েছিল। নচেৎ পরে গিয়ে দশবার ফুট বরফের স্তূপ খুঁড়ে ওদের মৃতদেহ পাওয়ার জন্য অনুসন্ধান করতে হত। ভাগ্য ভাল, সে পরিণতি হয় নি।

কাক্রু হিমপ্রপাত আমরা অতিক্রম করেছি। যে ফাটল পার হওয়া দুঃসাধ্য আমরা তাতে দড়ি লাগিয়ে লাগিয়ে অতিক্রম করেছি। যে প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য, তার গায়ে ধাপ কেটে কেটে উঠেছি। দিশেহারা গোলকধাঁধায় ঢুকে পথের সন্ধান করে ফিরে এসেছি।

কাক্রু ডোমে আমরা সফল হয়েছি।

আরও উঠেছি। দক্ষিণ কাক্রুর (২৪,০৭৫ ফুট) গায়ে ২৩,৮০০ ফুট পর্যন্ত। আমাদের চোখে তখন অন্য নেশা। মনে উত্তেজনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। থার্মোমিটারের পারা নেমে গেছে চল্লিশ ডিগ্রি বিলো ফ্রিজিং। কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

* * * *

কাক্রু ডোমে সফলতা মানা অভিযানের ব্যর্থতার গৌরবময় পরিণতি। সূচনায় যে স্বীকারোক্তিতে বলেছি, নন্দাঘুন্টির সাফল্য অর্জনে আমাদের অধিকার জন্মায় নি; সেই ভাষাতেই বলব কাক্রুডোমে সাফল্য আমাদের অভিজ্ঞতার অর্জিত মূল্য। এই অর্জনে আমাদের অধিকার আছে, আমাদের অধিকার জন্মেছে। আমরা জেনেছি আমরা কি।

তথাপি কোন খেলাতেই নিপুণতার শেষ নেই, পর্বত আরোহণেও অভিজ্ঞতা লাভের সীমা নেই। তাই সদা-উন্মুখ, আবার কবে পাহাড়ে যাবার সুযোগ পাব।

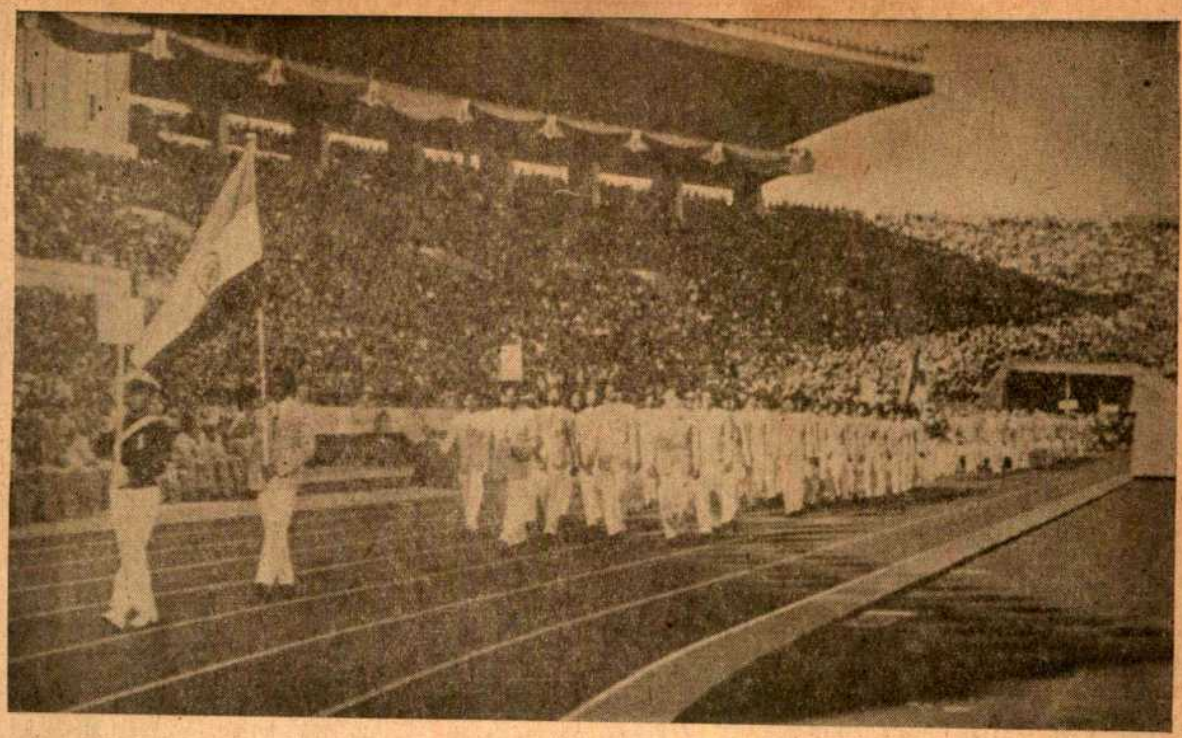

টোকিও অলিম্পিকের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধি দল মার্চ্চপাষ্ট করিয়া ষ্টেডিয়ামে প্রবেশ করিতেছে

অলিম্পিক

শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত

১৯৬৪ সালে অলিম্পিক মশালের টোকিওতে আগমন উপলক্ষে প্রায় দশ লক্ষ জাপানী উৎসাহ ভরে অপেক্ষা করছিল। এদিন ছিল অক্টোবরের বুধবার, ঝির ঝির বৃষ্টি হচ্ছিল এবং 'বানজাই' চিৎকার করে ঐ দশ লক্ষ জাপানী স্বাগতম জানাল নিপ্পন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ বছর বয়স্ক তাকিও উহেদা ও ১৮ বছর বয়স্ক শিরো ইশিয়ামাকে যখন তাঁরা মশাল নিয়ে পৌঁছল। দীর্ঘ ৪৮ দিন ধরে অপেক্ষা করছিল জাপান এই দিনটির জন্য। খুবই খুসী হল উদীয়মান সূর্য্যের দেশ যখন মশাল ১২টি দেশের মধ্য দিয়ে ১৬,০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পৌঁছল টোকিও সহরে।

উৎসাহ ও উদ্দীপনার শেষ হল না এখানে। বরং দিনকে-দিন তার প্রকাশ পেল সর্ব ব্যাপারে। জাপানীরা অতিথির যাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, তার জন্য সব সময়ই যেন অপেক্ষা করছিল। কোন অতিথি অখুসী হয় নাই, বরং খুসীই হয়েছে আতিথেয়তায়। তাছাড়া সাংবাদিকদের বিশেষ সুবিধা ছিল এইবার, কারণ খেলা-ধূলার সংবাদ সরবরাহর জন্য এঁদের সামনে ছিল এক-একটি টি. ভি. সেট।

ভারতবর্ষ টোকিও অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করে, যেমন সে করে আসছে ১৯২০ সাল হতে। সর্বশুদ্ধ এবার ৭৫ জন ভারতীয় যান। এঁদের নেতৃত্ব করেন রাজা ভালীন্দর সিং। হকি, এ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, ভারোত্তলন, কুস্তি, রাইফেল সুটিং ও জিম্‌নাষ্টিকস্ প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করে ভারতীয় প্রতিনিধিরা। এ সমস্তের ফলাফল

মার্চ্চপাষ্টের পর সকল দেশের
প্রতিনিধিবৃন্দ শপথ গ্রহণ করিতেছেন

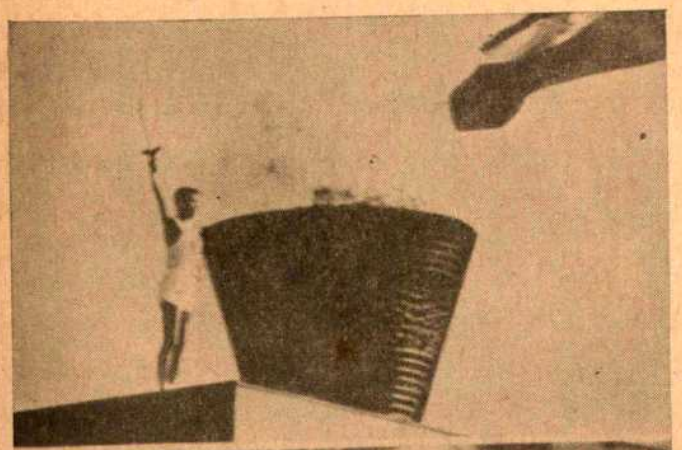

★

শেষ মশালবাহী অলিম্পিক মশাল হাতে
ষ্টেডিয়ামে প্রবেশ করিতেছেন।
(উপরে) পূতাগ্নির বেদীতে অগ্নি
সংযোগ করা হইতেছে

জাপান সম্রাট টোকিও অলিম্পিকের উদ্বোধন-ঘোষণা করিতেছেন

এখন বলা খুব যুক্তিসঙ্গত হবে না বলেই এখানে বলা হল না; তবে একথা বলা যায় ফলাফল যাই হোক বা কতগুলি স্বর্ণপদক বা রৌপ্যপদক পেল কি না তা দিয়ে বিচার করা যায় না খেলাধূলায় অংশগ্রহণকারীদের।

তবে এইখানে মনে পড়ে সেদিনের কথা, যেদিন স্যার দোরাব টাটা নিজ অর্থ দিয়ে ভারতীয় দলকে পাঠিয়েছিলেন এন্টোয়ার্পে, ১৩২০ সালে। তখন ইংরেজ শাসক উৎসাহ দেয় নি। খেলাধূলার জগতে ভারতকে কেউ

মনের মত
শাড়ী পেতে হলে
হরলালকায় আসুন
হরলালকা এণ্ড কোং কলিকাতা

পূজার বাজারে
আপনার এবং
পরিজনদের
পোশাক পরিচ্ছদে
একমাত্র
হরলালকাই
মন ভরে দিতে
পারে।

জাপানের জাতীয় ষ্টেডিয়ামের আভ্যন্তরীণ একটি দৃশ্য

জানত না! শুধু তাই নয়। এই সময় চারজনের ভারতীয় দলে ছিলেন একমাত্র বাঙ্গালী শ্রীপূর্ণ ব্যানার্জী এবং ইনি ৪৪০ ও ৮৮০ গজ দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। অবশ্য আজ সকলে দীর্ঘ দৌড় প্রতিযোগিতায় নাম শুনেছে শ্রীমিলখা সিং-এর।

বাংলা দেশ তখন খেলাধুলায় দেশের মধ্যে একটা নিজ স্থান করে নিয়েছিল। আজ হয়ত তেমন নেই। তার কারণ বোধ হয় তখনকার দিনে ভারতবর্ষে সর্বক্ষেত্রে বাংলা দেশ কিছু দেবার জন্য এগিয়ে আসত এবং আহরণ করত অন্য জায়গা হতে যা কিছু ভাল। তাই দেখা যায় ১৯২৪ সালে প্যারীতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকসে মোট ছয়জন ভারতীয় দলের মধ্যে ছিলেন কলকাতার ৩ জন এবং ম্যানেজার ছিলেন শ্রীদলজিৎ সিং সহ শ্রীসুরজিৎ মুখার্জী।

এই তিনজন হলেন; টি. কে. পিট; জে. হল ও ডব্লিউ হিলড্রেথ। ১৯২৮ সালেও আমষ্টারদামের অনুষ্ঠানে ভারতীয় দলকে প্রেরণ করা হয়। এই দলে বাংলা থেকে একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবের মুলজী কিন্তু তিনি অসুস্থতার জন্য শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। তবে এই বছরের বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে হকি প্রতিযোগিতা। ভারতের বিশেষ অনুরোধে দীর্ঘদিন পর আবার হকি প্রতিযোগিতা সুরু করা হয়। বাংলা থেকে তখন এককালের অক্সফোর্ডের ছাত্র শ্রীজয়পাল সিং এই দলের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হন এবং ম্যানেজার হন এ. বি. রসার, সেক্রেটারী বি. এইচ. এ. আর খেলোয়াড় হিসাবে দলে যোগদান করেন এ্যালেন ও সওকত আলী।

তারপর অলিম্পিকের অনুষ্ঠান হয় ১৯৩২ সালে লস্ এঞ্জেলসে। লেখক এই সময় হকি দলের নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন হিসাবে সেখানে যান। বাংলার এন. সি. মল্লিক সাঁতারে যোগদান করেন। চীফ গু মিশন ও

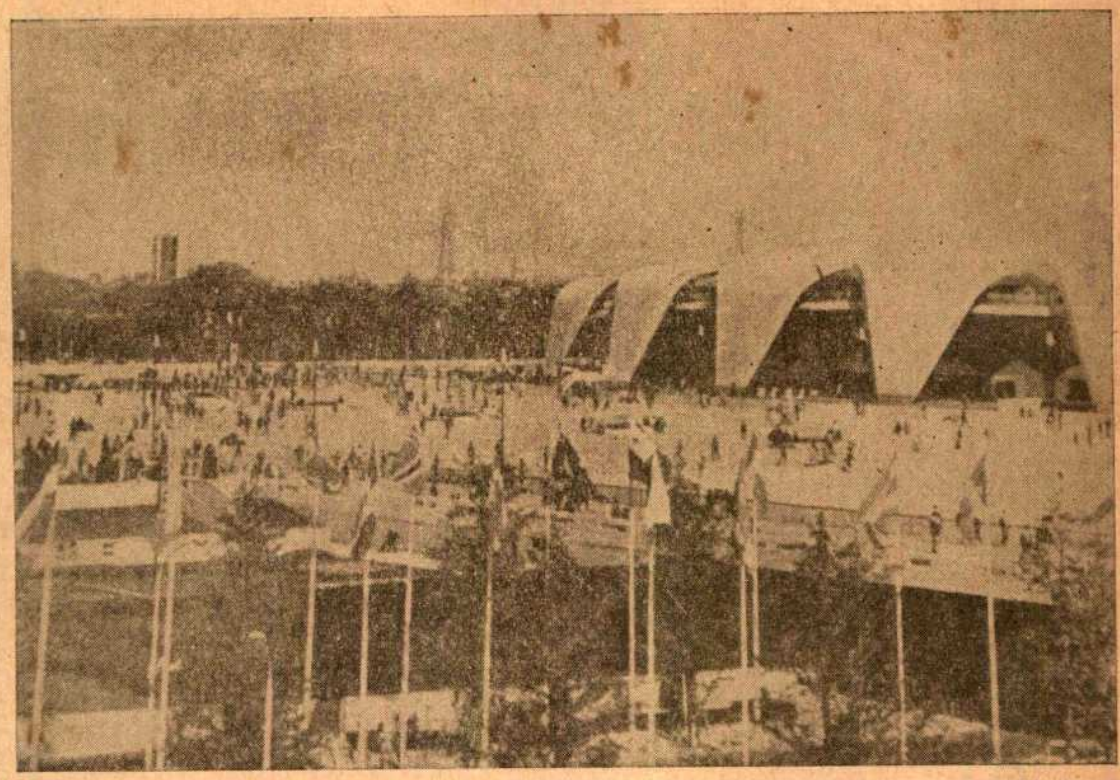

একটি ষ্টেডিয়ামের বহির্দৃশ্য

হকি দলের ম্যানেজার ছিলেন জি. ডি সোন্ধি। যাক, এ সময় লেখকের বেশ কয়েকটি অভিজ্ঞতা হয়। লেখককে একটি সভায় বক্তৃতা দিতে বলা হয়। বক্তৃতায় তিনি ক্যাথারিন মেওর 'মাদার ইণ্ডিয়া' সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলায় আমেরিকায় অবস্থিত ব্রিটিশ রাজদূত ডেকে লেখককে রাজনৈতিক ব্যাপারে কোন কিছু বলতে মানা করে দেন। শুধু তাই নয়, এই সময় হলিউডের ইউনিভার্সাল ফিল্ম কোম্পানী লেখককে ফিল্মে অভিনয়ের জন্য বেশ একটা ভাল প্রস্তাব করেন কিন্তু লেখকের কাছে তখন ঐ প্রস্তাব তুচ্ছ মনে হয় দেশের কথা ভেবে। যাবার পথে জাপানে দেখা হয় শ্রীরাসবিহারী বোসের সাথে। এই সাক্ষাৎ লেখকের প্রাণে এক নতুন স্পন্দন সৃষ্টি করে, যা আজও স্তিমিত হয় নি।

অনেক কথাই মনে পড়ে যায় কিন্তু তাড়াহুড়াতে সব গুছিয়ে বলার জন্য চাই সময় বা হওয়া চাই পেশাদার লেখক। যাক, ১৯৩৬ সালে যে ভারতীয় দল বার্লিনে যায় তার চীফ ঙ্ক মিশন ছিলেন জি. ডি. সোন্ধি, হকি ম্যানেজার ছিলেন লেখক ও স্বামী জগন্নাথ, ভারোত্তলনে ছিলেন হরেন কাবাসী। দৌড়ে অংশ গ্রহণ করেন জি. পি. ভাল্লা এবং ম্যারাথন দৌড়ে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের স্পোর্টস এডিটর সি. এস. স্বোয়ানী। এই সময় নাজী নেতৃত্রয় হিটলার, গোয়েরিং ও গোয়েবলসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় লেখকের। একসাথে ছবিও তোলা হয়। তখন যেন মনে হয়েছিল এই নেতৃত্রয় একটু বিশেষভাবে ভারতীয়দের প্রতি সুনজর দিচ্ছিলেন। কারণ কি তা বলা এখানে বোধ হয় সমীচীন হবে না, আর তা সকলেরই জানা আছে। যাক, আজ তাঁরা নেই আর ইতিহাস কিভাবে তাঁদেরকে মনে রাখবে তা রাজনীতিবিদদের গবেষণার বস্তু।

এরপরে এল মহাযুদ্ধ। যে হাসি-আমোদের মধ্যে

সবাই একমত

বঙ্গলক্ষ্মীর মিলে তৈরী শাড়ী যে ভাল আর টেকসই সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। গত ৫০ বছরেরও উপর বঙ্গলক্ষ্মীর জনপ্রিয়তা বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প জগতে এক বিরাট ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে। দেশের ক্রমবর্দ্ধন চাহিদা মেটাবার জন্য সম্প্রতি উন্নতধরণের যন্ত্রপাতী আমদানী করে মিলের উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে।

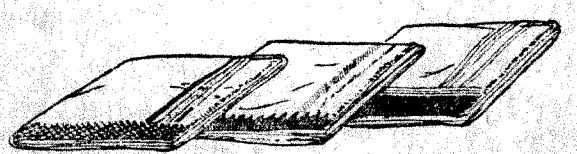

বঙ্গলক্ষ্মী

কটন মিলস্ লিমিটেড.

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

KALPANA B.L.S.B

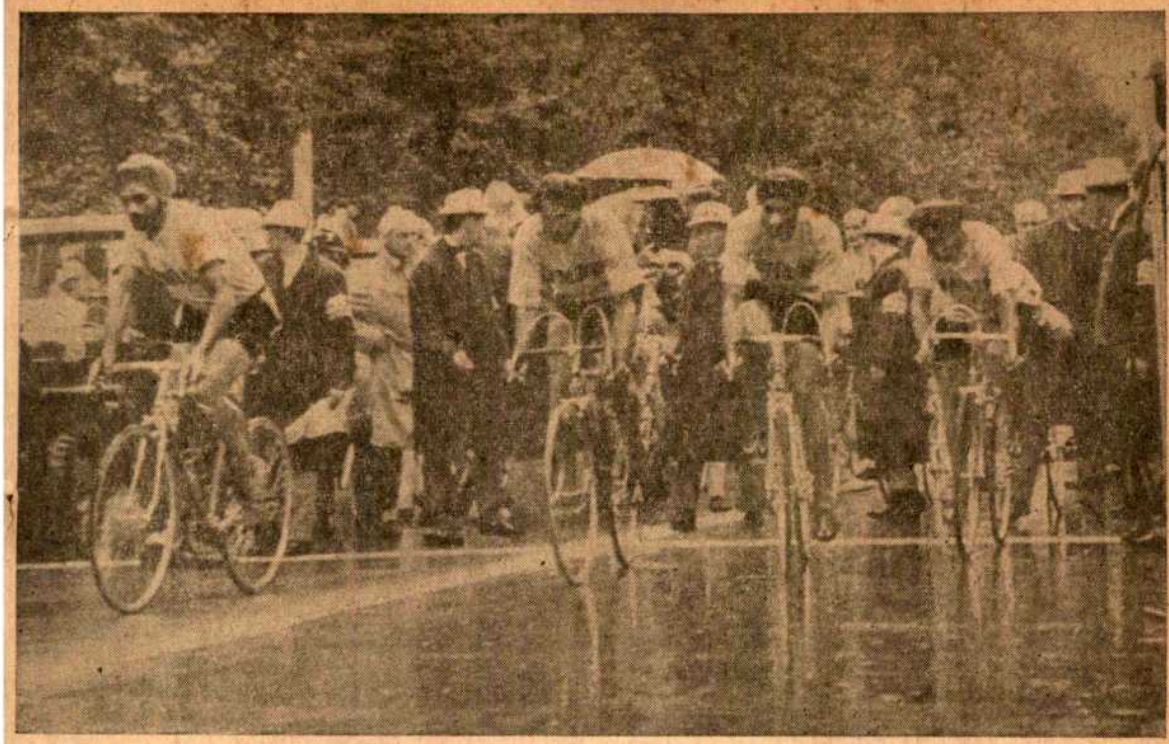

ভারতীয় সাইক্লিষ্ট দল প্রতিযোগিতা শুরু করিতেছে।

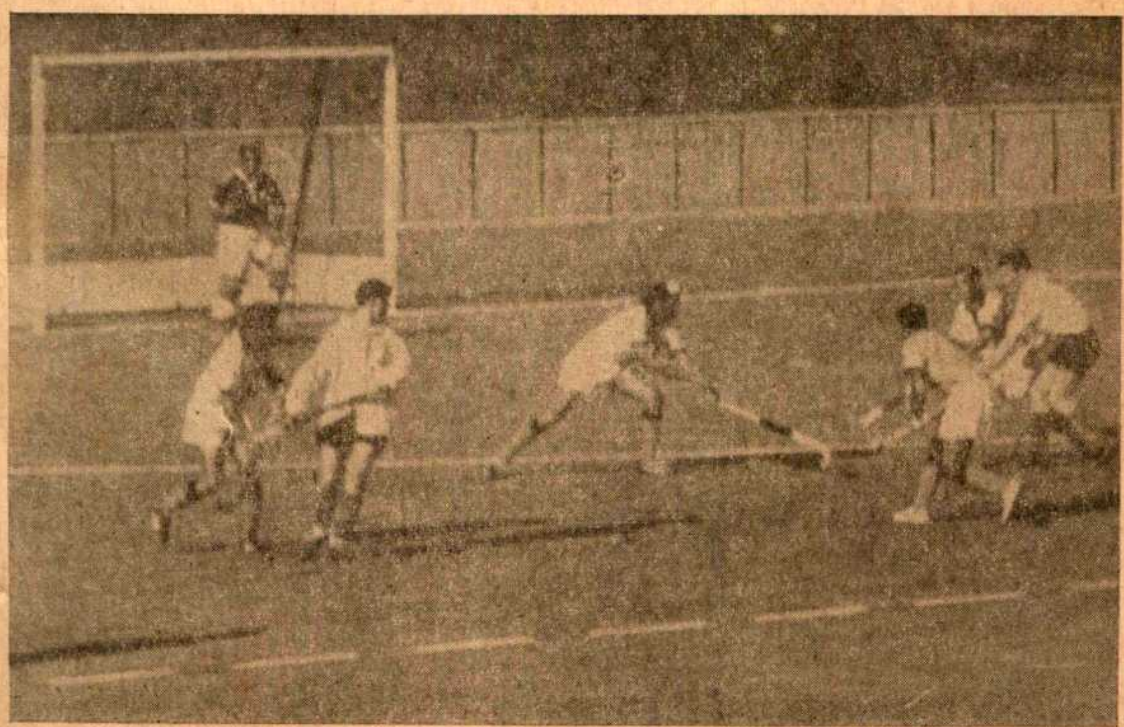

অলিম্পিক অনুষ্ঠানে হকি খেলার একটি দৃশ্য।

টোকিও অলিম্পিকে হকিতে
স্বর্ণ পদক বিজয়ী ভারতীয় হকি দল
সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে

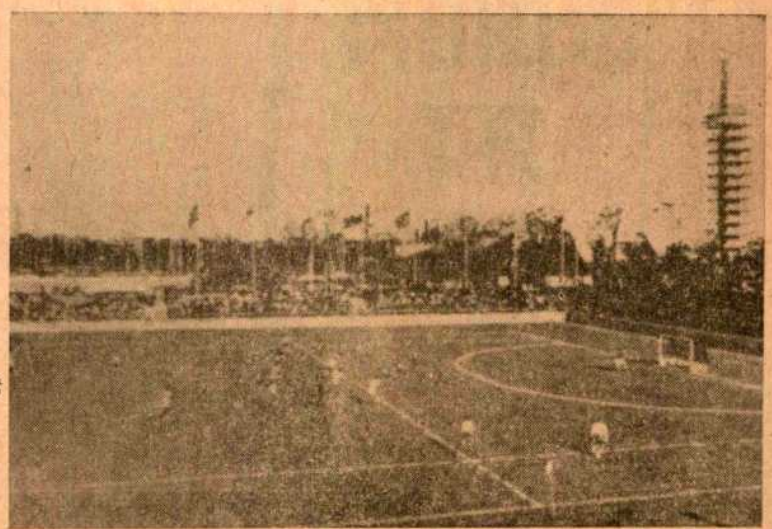

অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারত একটি
বৈদেশিক দলের সহিত
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে।

বয়সটাই সব নয়···অতীত ঐতিহ্যের মূল্য নিঃসন্দেহে অসামান্য, তবু শুধুমাত্র তাই সম্বল করে কোন প্রকারে দিনপাত করতে আমরা চাই নি। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সব প্রতিষ্ঠান শিল্পায়নের দ্বারা দেশকে আত্মনির্ভর করার পুণ্য ব্রত নিয়ে পদক্ষেপ করেছিল সেই পথিকৃৎদের মধ্যে মার্টিন বার্ন সংস্থা অন্যতম। সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিচক্ষণতা এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সর্বজনগ্রাহ্য সূত্রগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করাই আমাদের সিদ্ধিলাভের মূল মন্ত্র। আমরা কখনও স্থিতাবস্থার সঙ্গে আপোস করি নি, কিংবা উৎপাদনের পরিমাণ না বৃদ্ধি করে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা স্বতঃই প্রসার লাভ করবে এমন আশাও পোষণ করি নি। আমাদের বিশ্বাস বর্তমানে যে সমৃদ্ধি এবং সুসম অখণ্ডতা আমরা লাভ করেছি তা সম্ভব হয়েছে এই সব কারণেই। যতটুকু সুনাম আমরা অর্জন করতে পেরেছি সর্বপ্রযত্নে তা রক্ষা করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বয়সটাই সব নয়...

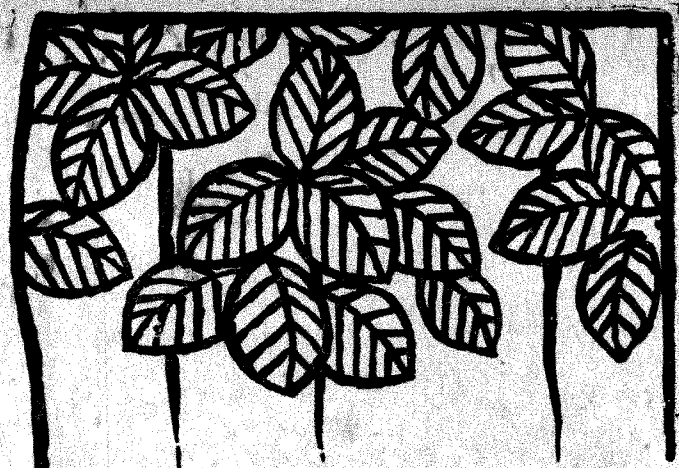

মার্টিন বার্ন গোষ্ঠীর অন্তর্গত শিল্প-প্রতিষ্ঠান:

দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড: বাৎসরিক দশ লক্ষ টন ইস্পাত তৈরী হয় এঁদের বার্নপুর কারখানায়। বার্নপুর বর্তমানে উৎপাদন শক্তি আরও দ্বিগুণ করার দ্বিপর্যায়ুক্ত এক নতুন পরিকল্পনায় ব্যস্ত। কুলটিতে এঁদের ঢালাই কারখানাটি কমনওয়েলথের মধ্যে সর্ববৃহৎ। এই কারখানার উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি ও নতুন কর্মপদ্ধতি প্রয়োগে এঁরা সর্বদাই সচেষ্ট।

দি ইস্কো স্ট্যানটন পাইপ অ্যাণ্ড ফাউণ্ড্রি নামে সম্প্রতি এই কোম্পানির অন্তর্গত একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়েছে—এঁদের কারখানাটি হল উজ্জয়িনীতে। অতি আধুনিক পদ্ধতিতে স্পান পাইপ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক জিনিস এখানে তৈরী হবে।

বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ—হাওড়া: গোড়াপত্তন ১৮৭১ সালে। ভারতের প্রথম ঢালাই কারখানা—মালগাড়ি প্রভৃতি নানাবিধ রেলওয়ে সামগ্রী এবং ইস্পাতের বড় বড় কাঠামো ইত্যাদি প্রস্তুতকারক।

বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ রিফ্র্যাক্টারি গোষ্ঠী: চারটি রাজ্যে অবস্থিত আটটি কারখানা—যাবতীয় রিফ্র্যাক্টারি সামগ্রী প্রস্তুতকারক। ইস্পাত কারখানা, বিজলী উৎপাদন কেন্দ্র, রেলওয়ে—এক কথায় যেখানেই ফার্নেস ব্যবহার করা হয় সেখানেই বার্ন কোম্পানির রিফ্র্যাক্টারির প্রয়োজন।

দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানি লিঃ, সান্তা: একান্তভাবে মালগাড়ি নির্মাণে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। বস্তুত এদেশে মালগাড়ি নির্মাণ শিল্পের প্রধান উদ্যোক্তা বলা চলে। বর্তমানে এখানে ভারী শিল্প ও মোটর গাড়ির জন্য শিয়ার, ফোর্জিং, স্ট্যাম্পিং প্রভৃতিও প্রস্তুত হয়।

দি হুগলি ডকিং অ্যাণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ: ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। শিপ বিল্ডিং ইয়ার্ড, ডাই ডক ইত্যাদি সর্ববিধ ব্যবস্থাসম্পন্ন জাহাজ তৈরি ও মেরামতের কারখানা।

রবার্ট হাডসন (ইণ্ডিয়া) লিঃ: ছোট রেলের নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রণী। বিবিধ খনিজ শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

লাইট রেলওয়ে কোম্পানি: ভারতের প্রথম ছোট রেল প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম—চারটি রাজ্যে ছ'টি রেলওয়ে প্রতিষ্ঠান।

ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং: বিজলী উৎপাদন ও সরবরাহের কয়েকটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। উত্তর ও মধ্যপ্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে বিজলী উৎপাদন ও সরবরাহ করে।

দি ভন বার্ন ক্রেন কোম্পানি লিঃ—ম্যাকেস্টারের ভন ক্রেন কোম্পানির সহযোগিতায় হস্তচালিত ও বিদ্যুৎচালিত ওভারহেড ট্র্যাভলিং ক্রেন প্রস্তুতকারক। চেনপুলি ব্লকও প্রস্তুত করে।

রেরোল বার্ন লিমিটেড: ইংলণ্ডের এ, রেরোল অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত এই কারখানায় বিশেষ ধরনের ইলেক্ট্রিক সুইচগীয়ার তৈরী হবে।

মার্টিন বার্ন লিমিটেড
কলিকাতা নয়াদিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

mb

MBBC-35 BEN

বিজয়ী মঞ্চে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক চরণজিৎ সিং।

নাদেশ অংশ গ্রহণ করল বার্লিন অলিম্পিকে তাঁরাই সব মৈত্রীবন্ধন যেন হয়ে গেল ছিন্ন। অশ্রু ও রুধির
কছুদিন পর হয়ে দাঁড়াল একে অন্যের হত্যাকারী এবং স্থান নিল মৈত্রীর স্থলে। কিন্তু যুদ্ধ একদিন থামল এবং

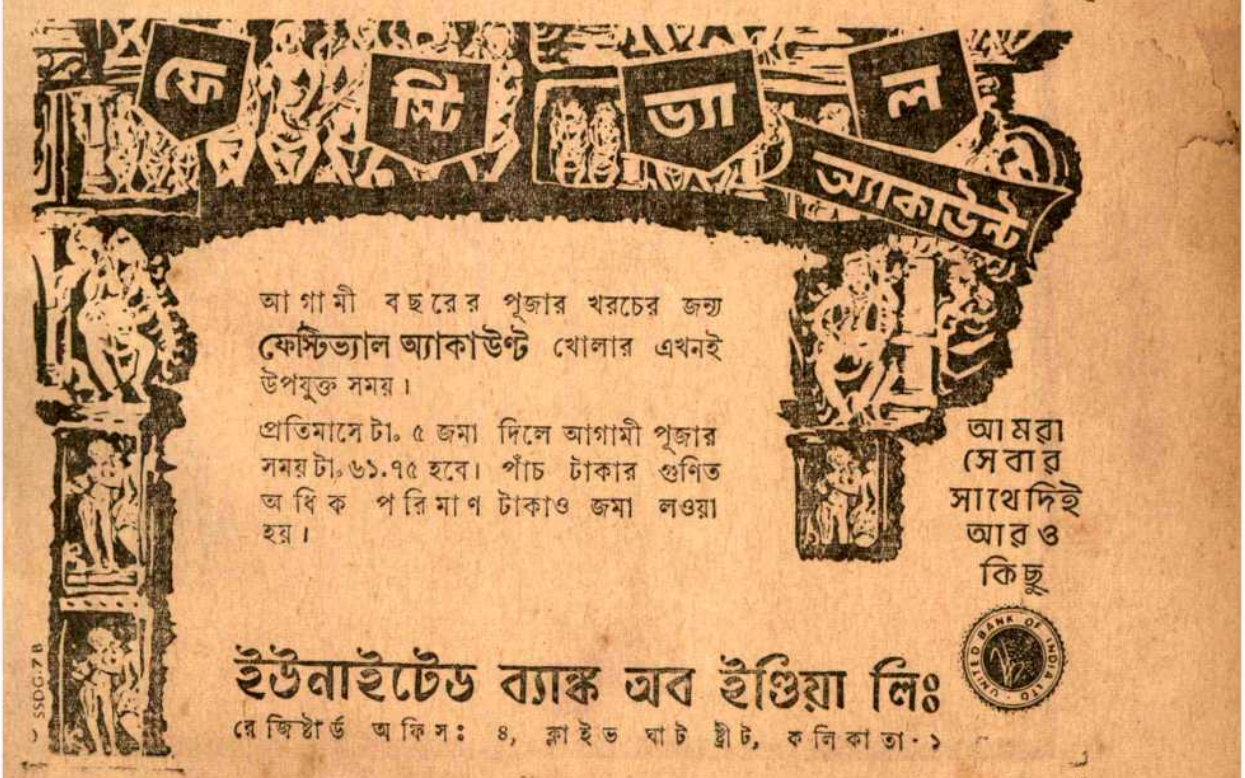

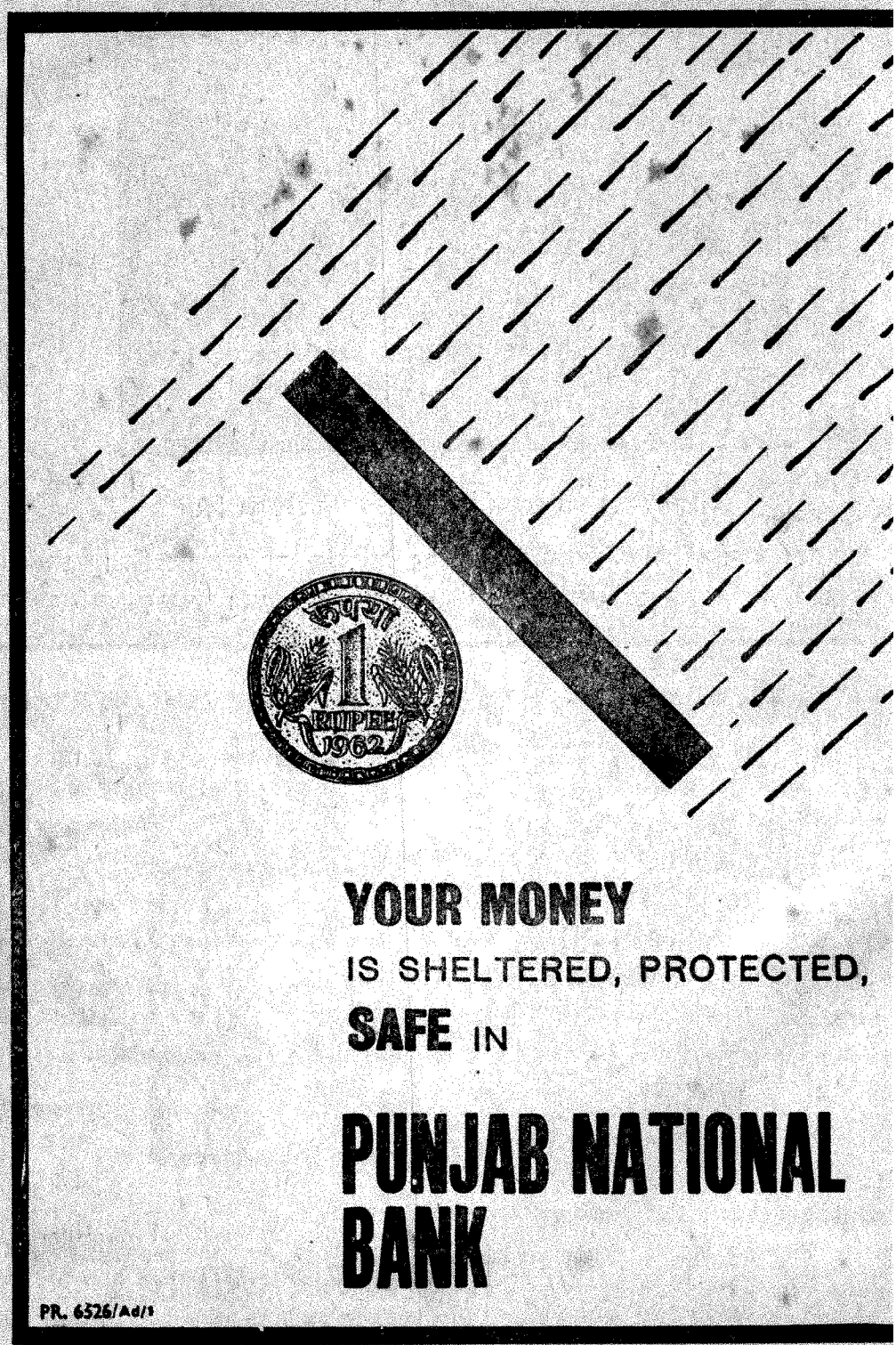

YOUR MONEY
IS SHELTERED, PROTECTED,
SAFE IN

PUNJAB NATIONAL
BANK

PR. 6526/Ad/1

টোকিও অলিম্পিকের সমাপ্তি উৎসবের একটি দৃশ্য। এই উৎসবে পরবর্ত্তী অলিম্পিক মেক্সিকোতে হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

ন ভুলে যেতে চাইল এই হানাহানি। পৃথিবীতে দেখা দিল লোক-মুখে হাসি এবং ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত হল অলিম্পিকস।

ন তখনও যুদ্ধের ধ্বংসের পরে ফিরে পায় নি, যুদ্ধ-স্থা বা চেহারা। যাক্, তবুও সে সাদরে অভ্যর্থনা পৃথিবীর নানাদেশের অতিথিদের। নতুন ওয়া বইতে সুরু করল। এই সময় ভারতীয় ীফ ড্য মিশন হলেন মৈনুল হক, হকি দলের ার হলেন এই লেখক ও ডাঃ এ. সি. চ্যাটার্জী। রতীয় দল অংশ গ্রহণ করল হকি, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, লন, সাঁতার, ওয়াটার পোলো ও সাইক্লিং-এ। শ গ্রহণ করেছিল ফুটবলে। এই প্রথম ফুটবল শ গ্রহণ করল আন্তর্জাতিক মঞ্চে। এই প্রথম প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ভারত ১৯৫৬ লবোর্ণে চতুর্থ স্থান অধিকার করে।

তারপর আমরা দেখতে পাই অনেক বাংলার প্রতিনিধি, যথা বীরেন বসাক, শচীন নাগ, মনু চ্যাটার্জী, কেদার সাহু, শম্ভু সাহা প্রভৃতি ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে। এরপর অলিম্পিক অনুষ্ঠান হয় ১৯৫৬ মেলবোর্ণে এবং ১৯৬০ সালে রোমে। ভারত প্রত্যেক অলিম্পিকে যোগদান করে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল প্রত্যেক অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিদের যোগ্যতার ফলাফল দেখানর প্রয়াস না করার কারণ হল যে ফলাফল সকলেরই জানা আছে। শুধু এক দীর্ঘ তালিকা দিয়ে ধৈর্যচ্যুতি না করাই ভাল।

দীর্ঘদিনের সংস্পর্শের ফলে নিজ অভিজ্ঞতা হচ্ছে অলিম্পিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন জাতির মধ্যে এনে দেয় মধুর প্রতিবেশী-সুলভ মনোভাব।

॥ এই মুহূর্তের কর্তব্য ॥

রক্তদান করুন

পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের মোকাবি
অবশ্যই করতে হবে

ভারতের স্থল-বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান-বাহিনীর
জওয়ানেরা পাকিস্তানী আক্রমণের বিরুদ্ধে
সকল রণাঙ্গনেই অসীম শৌর্যে লড়াই করছেন

তাঁদের পিছনে আজ আমাদের সবাইকে
ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে

"সীমান্তের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আমাদের জওয়ানদের প্রাণ রক্ষার জন্য আজ আমাদের অকুণ্ঠ ভাবে রক্তদানের প্রয়োজন—আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে সর্বক্ষণ রক্ত মজুত ক'রে রাখতে হবে, যাতে ক'রে প্রয়োজন হলেই জওয়ানদের জন্য রক্ত সরবরাহ করা যায়। জাতির এই চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে দেশবাসীর কাছে তাই আমার আবেদন—আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন, রক্তদান করুন।"

পূরবী মুখোপাধ্যায়

স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

নীচেকার ঠিকানায় গিয়ে রক্তদান করতে পারেন :

(ক) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কলিকাতা
(খ) শেঠ সুখলাল কারনানী মেমোরিয়াল হাসপাতাল, কলিকাতা
(গ) আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কলিকাতা
(ঘ) যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল
(ঙ) কংগ্রেস ভবন ৫৯ বি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

এবং

অধিকাংশ জেলা হাসপাতাল

ডব্লিউ, বি (আই অ্যাণ্ড পি আর) এডিভি-ডি ৬০৩৫ (২)/৬৫

পশাদারী
টিযুদ্ধ

ীশ্বর মিশ্র

শাদারী মুষ্টিযুদ্ধ ভারতবর্ষে পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ থকীকরণ হয় প্রকৃতপক্ষে ১৯২০ সালেরও পরে। হিসাবে ১৯১০ সাল হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ী ও অপেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ সমশ্রেণীভুক্ত থাকে।

তৎকালীন অনেক অপেশাদারী মুষ্টিযোদ্ধা নিজস্ব ওজনের প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে পেশাদারী াদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে বাধ্য কিন্তু কোন সময়েই অপেশাদারী সংস্থার মুষ্টি- মুদ্রা-পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই। ১৯২৪-২৫ তে অপেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ ভারতবর্ষে এক প্রকার ব সংগঠিত হয়। বাঙালীর আদর্শস্থানীয় শ্রীযুক্ত ল রায় (পি. এল. রায়) কেমব্রিজে অধ্যয়নরত লীন "মুষ্টিযোদ্ধা ব্লু" আখ্যা অর্জন করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি বাংলা দেশে বাঙালী য়ান ও ইঙ্গ ভারতীয় মহলে মুষ্টিযুদ্ধ প্রচার ও বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ী-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে র অনুশীলন সুরু করেন। তৎকালে ভারতের প্রদেশে রেলকর্মী ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে কিছু পেশাদারী মুষ্টিযোদ্ধার আবির্ভাব হয়। ভারতীয় ভারেশনের একজন বিশিষ্ট সদস্য **Mr. Rex** তাঁহার বাল্যজীবনের (১০ বৎসর বয়সের) হইতে ১৯০৮ সালের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া তিনি আগ্রার ক্যান্টনমেণ্টে তদানীন্তন ইংরেজ সৈন্য ছাউনিতে রয়েল আরটিলারি বাহিনীর একটি বিশেষ প্রদর্শনী মুষ্টিযুদ্ধ অনুষ্ঠানে জগৎ-বিখ্যাত জি. ডব্লিউ ওয়েল্‌সকে প্রতিযোগিতা করিতে দেখেন। ঐদিনের মুষ্টিযোদ্ধাদের তালিকায় কিছু সংখ্যক বেসামরিক ইংরাজ এবং ইঙ্গ ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণ করিতে দেখেন। ইঁহারা বেশীর ভাগই রেল এবং তার বিভাগের বিশিষ্ট কর্মচারীদের মধ্য হইতে প্রতিযোগিতার শ্রেণীযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বোম্বাডিয়ার বিলি ওয়েল্‌স পরে ইংলণ্ডের একজন প্রথমশ্রেণীর মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে গণ্য হন।

সেকালে আন্তর্জাতিক অপেশাদারী মুষ্টিযোদ্ধা সংস্থা অধিষ্ঠিত না থাকায় পৃথিবীর সর্বত্র এ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশন অফ ইংলাণ্ডের নিয়মাবলী অনুযায়ী অপেশাদারী মুষ্টিযোদ্ধা সকল নিয়ন্ত্রিত হইতেন। পূর্বানুপর ইহা বলা যাইতে পারে যে ব্রিটিশ সৈন্য সংস্থা সংশ্লিষ্ট সমস্ত মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতাই অপেশাদারী (**Amateur**) নিয়ম-কানুন ভুক্ত ছিল। এবং ইহাও জানা যায় যে, ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব অলিম্পিক অপেশাদারী নিয়ম-কানুন (**Amateur code**) বিশদভাবে মানিয়া চলা হইত।

কিন্তু কোন কোন সময় বিশেষ নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসারে এবং ব্রিটিশ এ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশন অফ ইংলণ্ড-এর (**A. B. A. of England**) সম্মতিক্রমে অপেশাদারী মুষ্টিযোদ্ধা এবং পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধার মধ্যে প্রতিযোগিতার চলন ছিল।

এই সমস্ত বিশেষ প্রতিযোগিতা অপেশাদারী নিয়ম কানুন ও পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু কোন সময়েই অপেশাদারী মুষ্টিযোদ্ধাগণ মুদ্রা-পুরস্কার গ্রহণ করিতেন না।

সেকালে সামরিক এবং বেসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায়। যে কোন প্রাদেশিক সৈন্য সংস্থার ছাউনিতে বেসামরিক মুষ্টিযোদ্ধা কোন সামরিক মুষ্টিযোদ্ধার (তাঁহার নিজস্ব ওজনের) সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইচ্ছুক হইলে তাহা সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আদেশ সাপেক্ষ ভাবে অনুষ্ঠিত হইত এবং খুব আদর ও যত্নের সহিত তাঁহারা এই সমস্ত মুষ্টিযুদ্ধের অনুষ্ঠান করিতেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের কিছুপর হইতে লাহোরের

অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতি

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিষার্ণব, রাজজ্যোতিষী এম্-আর-এ

(জ্যোতিষ-সম্রাট)

নিখিল ভারত ফলিত ও গণিত সভার সভাপতি এবং কাশীস্থ বারাণসী পণ্ডিত সভাসভার স্থায়ী ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের বিচার ও প্রস্তুত এবং অশুভ ও দুষ্ট গ্রহাদির প্রতিকারকল্পে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি, তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্র কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ডাক্তার কবিরাজ পরি রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা **ইংলন্ড, আ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর** প্রভৃতি দেশস্থ মনীষীবৃন্দ তাঁহার দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্র বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত

সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, আসামের মাননীয় রাজ্যপাল স্যার এস, ফজল কে-টি, বার-এট-ল লিখিয়াছেন—"আমি আপনার জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানি বলিয়াই ত প্রতিষ্ঠানের সহিত আমাকে জড়িত রাখিয়াছি। আপনি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।" পশ্চিম বাংলা বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী ও বর্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের **মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, (ক্যাণ্টাব), বার-এট-ল** বলেন—"জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীরমেশচন্দ্রের, অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী আমি নিজে করিয়াছি ও তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অদ্ভুতভাবে মিলিয়া গিয়াছে।" **কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচ মিঃ জে, পি, মিত্র এম-এ (অক্সন) বার-এট-ল** বলেন—"জ্যোতিষ-সম্রাট মহাশয়কে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধ তিনি যে একজন শক্তিমান ব্যক্তি এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার সান্নিধ্যে আসিতে পারিয়া আমি নিজেকে করিতেছি।" **কলিকাতার মাননীয় মেয়র শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জী এম-এ, বি, এল** বলেন—"জ্যোতিষ সম্রাট মহাশয় একজন অলৌকিক দৈবশক্তিমান পুরুষ। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ও অলৌকিক কার্যাবলী আমি বি অবগত আছি। জ্যোতিষ ও তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার ক্ষমতা এবং অগাধ পাণ্ডিত্য সমগ্র পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়াছে। পৃথিবীর কাছে তিনি ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি ভারতের গৌরবস্বরূপ। আমি সমগ্র কলিকাতার বৃন্দের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি এবং তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।" **বাংলার ওয়ার্কস এণ্ড বিল্ডিংস বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত** বলেন— জ্যোতিষ-সম্রাট মহাশয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদগণের অন্যতম হিসাবে প্রভূ অধিকারী হইয়াছেন।" **কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত রম মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহোদয়** বলেন—"ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত রমেশচন্দ্র পিতৃসদৃশ অশেষ গুণাবলীর অধিকারী হইয়া প্রভূত যশঃ ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।" **পশ্চিমবঙ্গ বিভাগীয় মন্ত্রী মাননীয় শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়** বলেন—"ইহা একটি শুভ লক্ষণ যে, সোসাইটির প্র জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক জ্যোতিষশাস্ত্রের গৌরব এবং মর্যাদা বর্ধিত হইয়াছে। তিনি শাস্ত্রে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাবলে কেবল ভারতবর্ষ নহে সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছেন।" **কলিকাতা হাই মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত ডি. এন. সিংহ** বলেন "জ্যোতিষ সম্রাট পণ্ডিত শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের জে হিসাবে অশেষ গুণাবলীর কথা আমার আত্মীয়বর্গ ও বন্ধুদের মুখে শুনিয়াছি। তিনি যে একজন ক্ষমতাবান্ জে —ইহাতে সন্দেহ নাই।" চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে. রুচপল বলেন "আপনার তিনটি প্রশ্নের আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।" জাপানের মিঃ জে. এ. লরেন্স, আমেরিকার মিঃ এনড্রি টেম্পি, অ মিঃ ঈশাক মামি এটিয়া, ইংলণ্ডের মিঃ এন. টেইলর প্রভৃতি। ইহা ছাড়াও সহস্র সহস্র প্রশংসাপত্র আছে।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তন্ত্রোক্ত অত্যাশ্চর্য্য কবচ

ধনদা কবচ—ধারণে স্বল্পায়াসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তন্ত্রোক্ত)। সাধারণ ৭·৬২ বৃহৎ ২৯·৬৯ মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক ১২৯·৬৯ (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও অবশ্য ধারণ কর্তব্য)। **সরস্বতী কবচ** স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সুফল ৯·৫৬ বৃহৎ ৩৮·৫৬। **মোহিনী** (বশীকরণ) ধারণে অভিলষিত স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত এবং চিরশত্রুও মিত্র হয় ১১·৫০ বৃহৎ ৩৪·১২ মহাশক্তিশালী ৩৮৭·৮৭। **বগলামুখী** ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ ৯·১২ বৃহৎ শক্তিশালী ৩৪·১২ মহ ১৮৪·২৫ (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়ী হইয়াছেন)।

(স্থাপিতাব্দ ১৯০৭ খৃঃ) অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (রে

হেড অফিস ঃ ৫০—২ (গ), ধর্মতলা ষ্ট্রীট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (প্রবেশ পথ ৮৮/২, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটস্থ গেট) কলিকাতা—১৩। ফোন সময়—বৈকাল ৫টা হইতে ৭টা। **ব্রাঞ্চ অফিস** ঃ ১০৫, গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা—৫, ফোন ৫৫-৩৬৮৫। সময় প্রাতে ৯টা

অপেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ

ute-এ একটি বাৎসরিক মুষ্টিযুদ্ধ প্রতি- এবং ইহাতে সামরিক ও বেসামরিক অংশ গ্রহণ করিতেন বলিয়া জানা যায়। ক্ষেত্রেই এই সমস্ত প্রতিযোগিতায় সামরিক জয়লাভ করিতেন ও দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ করায়ত্ত থাকিত। ১৯২৬ সালে রেল ck O'Niel লাইট্ ওয়েটের চার রাউণ্ড প্রতি- দানীন্তন ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল সিভিল সার্ভিস্- Clarke-কে পয়েন্টে পরাজিত করেন। বাংলা, বোম্বাই, নাগপুর, ব্যাঙ্গালোর এবং মাদ্রাজের কিছু সংখ্যক মুষ্টিযোদ্ধার উৎ পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতের আন্তর্জ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিবার সুযে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ১৯৪৮ সালের লণ্ডনে অলিম্পিক অনুষ্ঠানে। সে সময়ে বাংলা অপরাপর প্রদেশ অপেক্ষা অপেশাদারী হিসাবে পরিগণিত হয় এবং সে সময়ে অপেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিষ্ঠানের স্থিতি সালের বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতা যোদ্ধাদের অংশ গ্রহণের আবেদন "

আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

জে.আর.এস

"Companion"

- মাডেল - জে, এম ৫।
- মূল্য - ২৪৫৲ টাকা।
- উৎপাদন শুল্ক সহ।
- স্থানীয় কর আলাদা।

ডিষ্ট্রিবিউটার্স

নাগ এণ্ড কোং

৬নং রাধা বাজার লেন,

কলিকাতা-১

ARM1/6/P

সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত

রচনাবলী সিরিজ

বঙ্কিম রচনাবলী

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪টি) একত্রে, প্রথম খণ্ড [১২·৫০]।
উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য-অংশ একত্রে, দ্বিতীয় খণ্ড [১৫·০০]।
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত এবং জীবনী ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

ল রায়ের সমগ্র রচনা দুই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট। প্রথম খণ্ড [১২·৫০]। দ্বিতীয় খণ্ড [১৫·০
ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং জীবনী ও সাহিত্য সাধনা আলোচিত।

রমেশ রচনাবলী

শচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬টি) একত্রে [৯·০০]। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক
সম্পাদিত এবং জীবনী ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত।

মধুসূদন রচনাবলী

মধুসূদনের সমগ্র রচনা ইংরেজিসহ একত্রে। ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত এবং জীবনী ও
সাহিত্য-সাধনা আলোচিত। প্রকাশন অপেক্ষায়।

সাহিত্য সংসদ

৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃ ঃ কলিকাতা-৯

দি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লি

হেড অফিস ঃ ১০, ব্র্যাবোর্ণ রোড, কলিকাতা ১

আই. পি. গোয়েঙ্কা

চেয়ারম্যান

অনুমোদিত মূলধন	৮,০০,০০,০০০৲
লগ্নীকৃত মূলধন	৫,৬০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন	২,৮০,০০,০০০৲
স্থায়ী আমানত এবং অন্যান্য খাতে	৩,৩৭,০০,০০০৲

শাখা ঃ ভারতের সকল বড় বড় শহরে এবং পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংক
যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এজেন্সি ব্যবস্থা। ভারতে এবং অন্য
সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং সার্ভিস দিতে ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাদি সর্ব্বোত্তম।

আর. বি. শা

জেনারেল ম্যানেজার